নবীনচন্দ্র রচনাবলী

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

সম্পাদক

ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীহরিবন্ধু মুখটী



দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স
কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৬৩

নবীনচন্দ্র গ্রন্থ প্রচার সমিতির পক্ষে শ্রীসঞ্জীব দত্ত চৌধুরী কর্তৃক সমিতির কার্যালয়
১৩৬ রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, দমদম, কলিকাতা-২৮ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীবিমলচন্দ্র বেরা
কর্তৃক দি এলায়েড এণ্টারপ্রাইজার্স ২০৯সি বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

কোন লেখক। শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন এই ধরনের জীবনী লেখকদের অন্যতম এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। "চন্দ্রকুমার জিতেন্দ্রিয় ; আমি ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ" অথবা "তখনও আমার চরিত্র এত অশান্ত যে, বিদ্যালয়ে সর্বসম্মতিক্রমে আমি wicked the great —দুষ্টশিরোমণি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।" নিজের কীর্তি সম্বন্ধেও কবি বলেছেন, "এবংবিধ কীর্তির ইতিহাস আমার অঙ্গে অঙ্গে লিখিত হইয়াছিল।" নিজের সম্বন্ধে এই ধরনের ব্যঙ্গোক্তি ক'জন করতে পারেন? যে সমালোচক নবীনচন্দ্রের অতি-কথন বা অহং-এর ওপর তীব্র নজর রেখেছেন তিনি লেখকের নিজের সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তিগুলোকে যেন চোখেই দেখেননি মনে হয়।

লেখকের "আমার জীবন"-এ এমন কথা আছে যা পরবর্তীকালের খ্যাতিমান সাহিত্যিকরা স্বচ্ছন্দে প্রয়োগ করেছেন। বড় কাকা সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র বলেছেন, "একদিন শিক্ষক কি বলিয়াছিল? তিনি তাহার সঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের নিয়মবহির্ভূত ব্যবহার করিয়া যে পৃষ্ঠ দেখাইলেন, আর ফিরিলেন না।" শরৎচন্দ্র ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রায় এই কথাই বলিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়া দরকার—বঙ্গসাহিত্য, সমকালীন লোকচরিত্র প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষের সমাবেশ এতে ঘটেছে।

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

সম্পাদকের নিবেদন

মানুষ বাঁচে স্মৃতিতে আর শ্রুতিতে ; অর্থাৎ মানুষটির সম্বন্ধে যে কথাগুলো মনে পড়ে এবং তার সম্বন্ধে যা শোনা যায় তাই মানুষটিকে হারিয়ে যেতে দেয় না। কবির বাঁচার সুযোগ তাই বেশী। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন যে, মানুষের জৈব সত্তা বহু জায়গা জুড়তে চায় আর চায় বহুদিন বাঁচতে আর তার আত্মিক সত্তা যেমন চায় বহুদিন টি'কে থাকতে তেমনি চায় বহু মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন পেতে। এটা যখন জানি, তখন এটা সহজেই মেনে নিই যে, নবীনচন্দ্র নিশ্চিতরূপে বহু মানুষের মনে বহুদিন ধরে বেঁচে থাকবেন তাঁর কবিতার মধ্য দিয়েই। মনে তাই জিজ্ঞাসা জাগে কবি কেন লেখেন 'আমার জীবন'?

নিজেকে প্রকাশ করাই কবির ধর্ম। কাব্যে প্রকাশিত হয় কবিসত্তা। কবিসত্তার পেছনে কাজ করছে যে ব্যক্তিসত্তা তার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকলে তবেই কবিকে সঠিকভাবে বোঝা যায়। তাই কবি কখনও কখনও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধরা দিতে চান। কবির মনের বিচিত্র ভাবের সংবাদ পাই তাঁর কাব্যে কিন্তু এই বিচিত্র ভাবগুলো কোন্ পথ ধরে এল, অনেক কাহিনীর মধ্যে কেনই বা কবি বেছে নিলেন তাঁর কাব্যের কাহিনীগুলো তা জানার প্রচেষ্টা আজকের দিনে বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে।

নবীনচন্দ্র কতখানি রসিক ছিলেন তা আমরা "আমার জীবন" ওল্টালেই বুঝতে পারি। এই রসিকতা জ্ঞান "আমার জীবন'কে রসসাহিত্যের পর্যায়েও অনেক সময় নিয়ে গেছে। জন্মের তৃতীয় দিনে উৎসবের আয়োজন উপলক্ষে গৃহে আগুন লেগে সমস্ত গ্রামটি ভস্মীভূত হয়ে যাওয়ায় কবির নাম রাখা হয় 'নবীন'। কিন্তু কবি এতে খুসী নন। পৌরাণিক উদাহরণটাই তাঁকে আকর্ষণ করেছে বেশী, তাই বললেন, "রামায়ণ হইতে পৌরাণিক নামটি গ্রহণ করিলে নামের তদপেক্ষা সার্থকতা হইত, এবং পশ্চিম ভারতে সে নামের পূজা দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম।"

মানুষের স্বভাবে অনেক পরিবর্তন হ'লেও অনেক বিষয়ে মানুষের খুব বড় রকম বিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। ধনী বা প্রভাবশালীকে তোষামোদের মনোভাব একালের মতো সেকালেও ছিল। কবির "পিতার তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ", সুতরাং কবিরও 'আদরের আবদারের' সীমা নাই। "অঙ্কে অঙ্কে বিরাজ করিতেছি। কাপড়ওয়ালারা নানা কাপড় দিতেছে" ইত্যাদি। "আমার জীবন"-এ সমকালীন মানুষের জীবনও বেশ স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।

আত্মজীবনী লিখতে যাওয়ার একটি বিশেষ বিড়ম্বনা আছে। অনেকেই নানা বিশ্লেষণ ক'রে দেখান যে আত্মজীবনী লিখতে ব'সে লেখক নিজেকে কিছু অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেন। নবীনচন্দ্র সেন সম্বন্ধেও কোন কোন সমালোচক এই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। স্বদেশী কবিতা রচনার সময় নিয়ে কবির যে দাবী কোন কোন সমালোচক সে সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য করেছেন। চুলচেরা বিচার করলে হয়তো সত্য সন্ধান করা যেত। কিন্তু মোটামুটিভাবে কবি অসত্য ভাষণ দিয়েছেন বলা যায় না। আত্মজীবনীতে অতিকথন দোষ থাকতে পারে কিন্তু নিজেকে ক্ষুদ্র অথবা ব্যঙ্গের পাত্র করেও তুলেছেন কোন

প্রকাশকের নিবেদন

আজ ঠিক এক বছর পর নববর্ষের পুণ্যদিনে প্রকাশিত হলো নবীনচন্দ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড। এক বছর সময় হিসেবে যদিও বেশী মনে হয়, তথাপি আমরা মনে করি প্রাচীন ক্লাসিক রচনাবলী ছাপার ক্ষেত্রে এক বছর বেশী সময় নয়।

এ খণ্ডটি গত ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হত, কিন্তু এ খণ্ডের দশটি সম্পূর্ণ ছাপা ফর্মা বাঁধাই কারখানা থেকে চুরি যায়। একদিকে কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির মূল্য বেড়েছে দ্বিগুণের বেশী, তার উপর চুরি যাওয়া ফর্মাগুলিকে আবার ছাপতে হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঠক মহাশয়গণ সহজেই বুঝতে পারছেন কি নিদারুণ লোকসানের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি আমরা।

ক্লাসিক রচনাবলী প্রকাশ করা যেমনি ব্যয়বহুল তেমনি সময় সাপেক্ষ। যে বই পাঠকের ঘরে অন্ততঃ তিন পুরুষ ধরে থাকবে সে বই যেমন-তেমন করে ছাপা উচিত নয়। তার ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই উচ্চমানের হওয়া প্রয়োজন—এ ব্যাপারে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটীই রাখিনি। বইটি নির্ভুল করার জন্য শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয় প্রচুর পরিশ্রম সহকারে এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিশেষ করে নবীনচন্দ্রের লেখা নাটক ও বিবিধরচনা যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল তা তিনি সংগ্রহ করে দিয়ে আমাদের যথেষ্ট উপকার সাধন করেছেন এবং বহুবার এই অংশের প্রুফ মিলিয়ে দিয়েছেন, উপরন্তু তিনি যত্নসহকারে গ্রন্থ-পরিচিত ও নির্ঘণ্ট লিখেছেন, এজন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আমাদের এই রচনাবলী ছাপার ব্যাপারে যেসব ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের মধ্যে প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এবং শিক্ষা বিভাগের মাননীয় সচিব মহোদয়গণকে। তাঁরা এই রচনাবলী ছাপার জন্য সমিতিকে আংশিক অনুদান দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন [চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী—আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রসারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের সুলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে]। দ্বিতীয়তঃ নানাভাবে সাহায্য করেছেন আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, দেশ, অমৃত এবং বাংলাদেশ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ—এদের সবাইকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে সম্পাদকদ্বয় শ্রদ্ধেয় ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও বন্ধুবর শ্রীহরিবন্ধু মুখটীকে জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁরা যেভাবে এই দুরূহ কাজটি সম্পাদম করলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

যদিও বইটিকে নির্ভুল করে ছাপার চেষ্টা করেছি তবুও নির্ভুল ছেপে ছাপার জগতের 'ট্রাডিসান্'-এ ছেদ টানতে পেরেছি—প্রকাশক হিসাবে এ বড়াই করতে পারছি না। পাঠক-গণের সুবিধার জন্য আমরা কবির সমগ্র রচনা গদ্য ও পদ্য এই দুই অংশে ভাগ করেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁর সম্পূর্ণ গদ্য রচনা প্রকাশিত হল। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সম্পূর্ণ পদ্য রচনা প্রকাশিত হবে।

ইতি—

প্রকাশক

সূচীপত্র

নবীনচন্দ্র

শশাঙ্কমোহন সেন

কবি নবীনচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। বঙ্গদেশের অঞ্চলস্থা "শৈলকিরীটিনী, সাগর-কুন্তলা, সরিৎমালিনী" চট্টলভূমির এক প্রান্ত হইতে যে স্বাধীন স্বভাব গায়ক বঙ্গ-সাহিত্যের রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া চল্লিশ বৎসর উৎকল সঙ্গীতে বাঙ্গালীর হৃদয় মুগ্ধ করিতেছিলেন, আপনার জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, এই লোকে তাঁহার কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার শেষ উক্তি —"আজ আমার বিজয়া।"

বিদায় নহে, প্রস্থান নহে, নির্ব্বাসন বা মুক্তি নহে—বিজয়া? আমাদের শাস্ত্র বলেন, মানুষের চিরজীবনের আন্তর ধর্ম্ম মৃত্যুকালে প্রবল হয়, এবং তাহারই বর্ণে বর্ণিত হইয়া জীবাত্মা পরলোকে প্রস্থান করে। ইহাই "ধর্ম্মস্তমনুতিষ্ঠতি" বাক্যের লক্ষ্য; ইহাই চিত্রগুপ্তের কার্য্য। নবীনচন্দ্রের এই শেষোক্তিতে প্রকৃত মানুষটির, প্রকৃত কবিটির অন্তর্গত ধর্ম্মের ছায়া কি পরিমাণে পতিত হইয়াছে, আহাই অদ্য আমরা চিন্তা করিব। তাঁহার মাহাত্ম্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করাই, অদ্য আমাদের শোক প্রকাশের লক্ষণ হইবে, স্বর্গগতের উদ্দেশে কোনরূপ শোক প্রকাশ আমাদের সমাজধর্ম্মে ইতিপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যদিচ, আমরা কালবশে একটা বিদেশী প্রথাকে গ্রহণ করিতেছি, তবে উহাকে অদ্য স্বীয় সমাজের ভাবানুগত করিয়াই গ্রহণ করিব। পরলোকগত মহাত্মাদের চরিত্র চিন্তে ও মাহাত্ম্য নিরূপণে জীবিতগণের যে লাভ আছে, অদ্য এই শোক সভায় তাহার অংশভাগী হইতে চেষ্টা করিব।

মানুষের প্রকৃত জীবন অদৃষ্ট; অন্ধকারাচ্ছন্ন, বাহ্য দর্শনে তাহার স্বরূপ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যাঁহারা সত্যকে বা ভাবকে উপলব্ধি করেন বা প্রকাশ করেন—স্থূল কথায়, যাঁহারা কবি বা দার্শনিক, তাঁহাদের জীবনী এই কারণেই মানব সমাজের অমূল্য সম্পত্তি। বিশেষতঃ, কবিগণের সুখ-দুঃখ, দোষ-গুণ, কিংবা পাপ-পুণ্য, তাঁহাদের সারল্য ও ব্যবসায় ধর্ম্মে, জ্ঞাতসারে অথবা অতর্কিতে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়, উত্তরাধিকারিগণ উহার অনুধাবনে আপনাপন জীবনের পরমার্থ অর্জ্জন করিতে পারে। এই কারণেই কবি-জীবনী, হয়ত শতদোষ স্পৃষ্ট হইয়াও, শত শত শাস্ত্র বা অনুশাসন গ্রন্থ অপেক্ষা মহার্ঘ্য বিবেচিত হয়; এবং কবিগণের গ্রন্থাবলী শিক্ষা ও আনন্দের যুগবৎ সংবিধান করে বলিয়া, পরম যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে; আর কবিগণ মরিয়াও ইহলোকে অমর, বরণীয় ও মহনীয় হইয়া থাকেন।

মানুষের অন্তিমোক্তি অনেক সময় তাহাদের সমস্ত জীবনের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সুতরাং অদ্য আমরা সর্ব্বাগ্রে এই কবির অন্তিমোক্তি ও শেষ অভিপ্রায় চিন্তা করিব। কবির শেষ মুহূর্ত্ত, শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছিলাম। যাইয়া দেখি গৃহে লোকারণ্য; রোগী-চর্য্যার সংযতভাব চলিয়া গিয়াছে। অন্ত্যেষ্টির উপকরণ প্রস্তুত করিয়া সকলেই ব্যাকুলভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে মহাক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, কবি সেইমাত্র দীর্ঘ মোহাবসানে নেত্রোন্মীলন করিলেন, আমাকে দেখিয়া চিনিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। উৎফুল্ল মুখে কহিলেন, "আজ বিজয়া"। কবির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় স্কুল ছুটি হইয়াছিল। একান্ত দর্শনেচ্ছু ছাত্রগণ গবাক্ষপথে কবিকে দেখিয়া যাইতেছিল। তিনি উহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বিজয়ার সংবাদ সকলেই পাইয়াছে।" পুনর্ব্বার "আজ বিজয়া", কহিতে কহিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তৎপর হইতে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীনভাবে আরো দুইদিন

বাঁচিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু ভবপুরীর সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই ঘটনার পূর্ব্বদিন, নবীনচন্দ্র সহোদরকে তাঁহার শেষ অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। তাহা এই, তাঁহার মৃতদেহ স্রক্-চন্দনে ও গৈরিক বসনে সজ্জিত করিয়া জন্ম-পল্লীতে লইয়া যাইবেন; মুখ মৃত্যুচ্ছায়ায় অবিকৃত থাকিলে তাহা অনাবৃত রাখিয়া বহন করিবেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদব্রজে শববাহনের অনুগমন করিবেন; পিতৃ শ্মশানের পার্শ্বেই তাঁহার অন্তিম শয়ন রচিত হইবে ও ইহ পরকালের একমাত্র সম্বলস্বরূপ গীতা গ্রন্থ, তাঁহার বক্ষস্থলে ও সঙ্গে দিতে হইবে।

এই অপূর্ব্ব অন্তিমোক্তি ও শেষ আশা যতই চিন্তা করি, ততই এই ক্ষণজন্মা পুরুষের সমগ্র জীবনে ও অন্তরতত্ত্বে নব নব আলোকপাত হইতে থাকে; বলা বাহুল্য, আমি এই আলোচনার শেষ পাই নাই, ইহার সীমা নাই, উহা চিরকালের জন্য অনাগত শত পুরুষের ও সাহিত্যসেবীর কৌতূহলী হইয়া রহিল।

মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আজ বিজয়া"। এই বাক্য তাঁহার সমস্ত জীবন মন্থিত করিয়া আপন অর্থসামার্থ্য সংগ্রহ করিয়াছে, ও সহজে ও অতর্কিতে বাহির হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের মুখচ্ছবি মৃত্যুর করাল গ্রাসেও বহুক্ষণ বিকৃত করিতে পারে নাই, ঐ কথাটি কহিবার সময় মুমূর্ষুর সেই অম্লান চিরতেজস্ক মুখচ্ছবি যে অপূর্ব্ব তেজঃপ্রদীপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা আমি কখনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার এই স্বল্প জীবনের গুটিকতক উজ্জ্বল স্মৃতির মধ্যে, আমার জন্মভূমির বরপুত্রের এই "শেষ দিন", চিরকাল পরম মহার্ঘতায় দেদীপ্যমান থাকিবে।

কথা একটি পাইয়াছি—"আজ বিজয়া!" বিজয়া "কাহার?" আমাদের দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন স্মরণ করি, বিজয়ার দিনেই বিসর্জ্জন। সাধক যে প্রতিমা রচনা করে, যাহাতে দেবাধিষ্ঠান উদ্বোধিত করিয়া সাধনা করে, তাহার বিসর্জ্জন। কেন না, চতুর্থ দিনে—সিদ্ধির পর দিনে, তাহা মৃত্তিকা মাত্র। নবীনচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, ঐ দিন তাঁহার সংসার সাধনার শেষ, তাই ঐ দিন তাঁহার বিজয়া। আবার, বিজয়া হর্ষ-বিষাদের দিন। হর্ষ, সাধকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। বিষাদ, সেই মৃন্ময়ী-মূর্ত্তির সাহায্যে চিন্ময়ীকে পাইয়াছে। সেই পরমপ্রিয় কমনীয় মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে। নবীনচন্দ্রের আত্মাদর অতি প্রবল ছিল। তিনি কবি, তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন। এই প্রতীতি, এমন কি অভিমান তাঁহার জন্মিয়াছিল। তাই, সেই দিন ভবসাধনার অবসানে তিনি উৎফুল্ল মুখে হর্ষ-বিষাদে বলিয়াছিলেন "আজ আমার বিজয়া।"

আবার দেখি, "বিজয়া" কাহার? জিগীষু বীরের। এই অধঃপতনের দিনে বিজয়ার মাহাত্ম্য আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সুদিনে বিজয়াকামী নৃপতিগণ এই দিনেই বিজয়যাত্রা করিতেন। এই কারণেও বর্ষান্ত শুক্লা-দশমীর নাম বিজয়া। নবীনচন্দ্র ভবপুরী হইতে নির্গত হইয়া অমরলোকে অভিযান করিতেছিলেন। কবি নবীনচন্দ্রের, প্রকৃত নবীনচন্দ্রের জীবন ঐ দিন হইতেই আরব্ধ হইতেছিল। সাংসারিক দুঃখ-দৈন্য, দুর্ব্বলতার, কবল হইতে মুক্ত হইয়া, কবির আত্মা আপন স্থির জীবন-প্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত হইতেছিল, নবীনচন্দ্র ঐ অর্থটিও কি চিন্তা করিয়াছিলেন? কিছু করিয়াছিলেন বই কি? ঐ অবস্থায় সাংসারিক লোক বলিত 'বিদায়'; জ্ঞানী বলিত—প্রস্থান; যোগী বলিত—'নির্ব্বাণ' বা 'সমাধি'। নবীনচন্দ্র জ্ঞানপন্থী বা যোগী ছিলেন না। সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র বৈরাগ্য ছিল না। সাংসারিক ঋদ্ধি ও কবিকার্য্যের কৃতার্থতা লাভই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, উহাই এই বীর প্রকৃতি, কর্ম্মশীল কবি-জীবনের ধর্ম্ম-সাধনা ছিল। কবিকৃত্যের মধ্যে ও ভাব-বিহ্বলতার মধ্যেই তিনি অসীমের ও আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করিতেন। কাব্যরসে বিভোর হইয়া ভক্তের মত ভাব-পুলকিত হইতেন;

ইহাই তাঁহার জীবনের ও কাব্যের সাত্ত্বিকতা। স্বকীয় কাব্যের স্থান বিশেষ পাঠ করিতে করিতে তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত হইয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি।

মনীষী কবি গেটের শেষ উক্তি "আলোক। আরো আলোক"। সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি কীটসের শেষ উক্তি—"সুন্দর—অতি সুন্দর"। বীরধর্ম্মী ভাবুক কবি নবীনচন্দ্রের শেষ উক্তি—"আজ বিজয়া"। ইঁহাদের প্রত্যেকের শেষ উক্তিকেই, চিরজীবনের অনুসৃত হৃদগত ধর্ম্ম প্রমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণের চক্ষে, সংসার-জীবনে তাঁহারা ক্ষণিকের দৈন্য দুর্ব্বলতাবশতঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মাপুরুষ সমস্ত সাংসারিক বিবাহ বিক্ষোভের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও যে উন্নত লোক হইতে আপন আহার্য্য সংগ্রহ করতঃ সসার হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিগণকে ভাব ও ভাষার সাধনা করিতে হয়; মনকে নিশ্চল বা সংযমাধীন রাখিতে গেলে কাব্য রচনা হয় না. অনন্যযোগে ভাবের অন্বেষণে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে ও মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে চিত্ত চালনা করিতে হয়, উহাই কবি-জীবনের সঙ্কট স্থান। এই কারণে অনেকের চিত্তও অতর্কিতে চাঞ্চল্য ও রজোগুণাপন্ন হইয়া যায়; অনেকের চরিত্র বা সাংসারিক জীবনও সঙ্কট ও বিঘ্ন-সঙ্কুল হইয়া পড়ে। হয়ত, নিজের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গত অনভীপ্ট কার্য্যও তাঁহাদিগকে করিয়া বসিতে দেখা যায়। সাধারণ জনমানবের চক্ষে ঐরূপ কবির জীবন যেরূপই প্রতিভাত হউক না কেন, এই বিশ্ব ভুবনরূপ কাব্যের কবি যিনি, যিনি অন্তঃকরণ তত্ত্বের পরীক্ষায় ভালমন্দ বিচার করেন, তাঁহার নিকট কবির প্রেতাত্মা যে পরম প্রীতি কারুণ্যভাজন হইয়া থাকে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। শত দোষ সত্ত্বেও, অনেক কবি সংসারে যে উত্তরোত্তর প্রীতি ও পূজা প্রাপ্ত হন, অনেক প্রকৃত সাধু সাধক অপেক্ষাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, যেরূপ মরিয়াও অমর থাকিয়া যান, বিভু করুণার ইহাই যথেষ্ট নিদর্শন নহে কি?

পৃথিবীর সকল প্রকৃত কবির নিকট আপন কবিকর্ত্তব্যই ধর্ম্ম। সকল প্রকৃত কবিই আপন প্রাণের ভাবতন্ময়তার ভিতরে সত্য শিব সুন্দরকে অনুভব করিয়া গিয়াছেন। অপর কোন উপাসনা প্রণালীর অনুসরণ আবশ্যক মনে করেন নাই. প্রকৃত কবি যুগপৎ স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, তাঁহাদের হৃদয় সহজে আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া রসময়ী কবিতায় পরিস্ফুরিত করে, অনেকেই যুগপৎ যোগী ও ভোগী। নবীনচন্দ্রও শ্রেষ্ঠ কবি-হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। বৃদ্ধ ব্রহ্মার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্নেহদান তিনি কি প্রকারে আপন কবি-কৃত্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, জীবন সাধনাকে কিরূপে মহিমময়ী বিজয়ার দিকে, সার্থকতার দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাই আমরা অদ্য সংক্ষেপে চিন্তা করিব।

নবীনচন্দ্রের আন্তরিক চরিত্র বেগবান, ভাবপ্রবণ, সুখে বিহ্বল, দুঃখে অসহিষ্ণু ও যুগবৎ অভিমানী ও সরল ছিল। আমাদের শাস্ত্র এই সকলকে রজোগুণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। বস্তুতঃ এই কবির হৃদয় রজঃ প্রধান সত্ত্বগুণে পূর্ণ ছিল। তাঁহার 'শেষ আশা'র "স্রকচন্দন ও শ্রগ্গৈরিক বসনে" সম্পূর্ণভাবে তাঁহার জীবনের অন্তরস্থ বীরাদর্শ-উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কবি হইতে পারে না? নবীনচন্দ্রের কার্য্যাদিতেও যে সাত্ত্বিকতার পরিচয় আছে, তাই উহাও রাজসিক উপকরণ সাহায্যেই প্রকট ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাই গীতা অধ্যয়ন করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র গীতার কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছিলেন। অধ্যাত্মযোগ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আত্মপ্রকৃতি যাহার অনুরূপ বা নিকটবর্ত্তী, তাহাই মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে, অন্তকরণ তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য না ঘটিলে কবির হৃদয় কোন বিষয়ে কাব্য প্রয়াসে প্রেরিত হইতে পারে কি? তাই কবি নবীনচন্দ্রের সমগ্র জীবনের পরিণত চিন্তার ফল রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মূল উদ্দেশ্য 'ধর্ম্ম সংস্থাপন' নহে, 'ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন'; কবি নবীনচন্দ্র কর্ম্মী;

জ্ঞানপন্থার ধ্যান ধারণা সমাধি তাঁহার কোন কালেও মনঃপূত নহে। রজোগুণাপন্ন অর্জ্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ভৈরব রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই আত্মরূপ। কেননা, আত্মরূপই বিশ্বরূপ। তৎসঙ্গে নবীনচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি; কেন না, তিনিও স্বয়ং কর্ম্মী। মানুষের পরমার্থ কর্ম্মে, কর্ম্মেই মনুষ্যত্ব, এবং ঐ কর্ম্মের ফল ও কর্ত্তৃত্ব ভক্তিযোগে ভগবানে আরোপ করাই পরমপুরুষার্থ— ইহাই নবীনচন্দ্রের ধর্ম্ম। এই প্রাচীন ধর্ম্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় তমোমিশ্র রাজসিক ভাবের প্লাবন যুগে, সুষুপ্ত ভারতে নূতন করিয়া প্রচার করাই নবীনচন্দ্রের দীক্ষা। আপন প্রকৃতির প্রবল স্বাধর্ম্মবশেই তিনি এই দীক্ষা লাভ করেন। এই দেশের কবিসমাজে এই সুমহৎ কর্ত্তব্য গ্রহণে তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভাও বীরধর্ম্মাপন্ন ছিল। এই কারণে সমধিক সূক্ষ্মদর্শন বা প্রকাশ অপেক্ষা উহার দ্রুতগতি ও বিপুল শক্তিই সর্ব্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। এই কারণে নবীনচন্দ্রের কাব্যাদিও সর্ব্বত্র ভাবের বিপুল উচ্ছ্বাসে, ভাষার ঝঙ্কারে ও উদ্গত জ্বালা প্রাঞ্জলতায় অবকাশরঞ্জিনী হইতে অপ্রকাশিত চৈতন্য পর্য্যন্ত। তাঁহার চরিত্রের সমস্ত সদ্‌গুণে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের সহিত পরিচয় মাত্রেই, যেমন অর্ব্বাচীন ব্যক্তিই তাঁহার সমস্ত গুণ ও দোষের পরিচয় পাইয়াছে, তেমনি, নির্ব্বিশেষ সরলতার দরুন, তাঁহার সমস্ত কাব্যের গুণ বা দোষও অতি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হইয়া আছে।

এই কারণে, কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে, নবীনচন্দ্র অতি সূক্ষ্ম দর্শন করিতেন না; ব্যায়ত দর্শন তাঁহার কবিতার মূলতত্ত্ব। ইংলণ্ডীয় কবিগণের মধ্যে কেবলমাত্র বায়রণ ও সেক্‌সপীয়রই এই গুণের বহুলভাবে অধিকারী ছিলেন। তবে সেক্‌সপীয়র প্রোক্ত উভয় গুণেরই সমান অধিকারী; বলা বাহুল্য, সাহিত্য জগতে তৎসদৃশ এতদুভয়ের উচ্চ সমঞ্জসিত শক্তিযুক্ত কবি বিরল। বৃহৎ ভাবকে বৃহৎ-ভাবে বুঝিতে, দ্রুতবেগে বড় বড় তুলিকা সঞ্চালনে তাহার রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে, ও তৎসঙ্গে পাঠকের অনন্যতন্ত্র সহানুভূতি জাগ্রত করিতে নবীনচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। তাই, সাধ্য বিষয়ে বিহ্বল ঐকান্তিকতা, প্রাঞ্জল-রস-সমুজ্জ্বল ভাষা নবীনচন্দ্রের লেখনীর নিত্য সহচরী ছিল। অন্যদিকে, স্বয়ং করুণরাগিণী আলাপের সময়, অকস্মাৎ নিজের সমগ্র প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে হাস্যরস জমাইবার সময় অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া বিভোরভাবে হাসিয়া ফেলিতে, মহিমার কথা সমুচ্চ কণ্ঠে আলাপ করিতে করিতে অতর্কিতে স্বয়ং আত্মহারা হইয়া মুগ্ধ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িতে, একমাত্র কবি নবীনচন্দ্রেই সম্ভবে। সাহিত্য শাস্ত্রে নাকি ইহা অসঙ্গত—আর্ট বা শিল্পকলা-বিরুদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রের কথা মানে কে? পলাশীর যুদ্ধ, রঙ্গমতী, কি রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে কবি যে স্থানেই শাস্ত্র অবহেলা করিয়া, যবনিকা মধ্য হইতে স্বয়ং মুগ্ধভাবে নগ্নদেহে বাহির হইয়া আসিয়া অভিনেতৃগণের সঙ্গে মাতিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই উহার ফল কবির সপক্ষে আশাতীত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সামাজিকগণ কবির এই অনৌচিত্য বিচার করিবার অবকাশ চাহে নাই; কবির আন্তরিকতায়, সরলতায় ও ব্যক্তিগত সংঘর্ষে মুগ্ধ হইয়া, আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক, নবীনচন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান সৌন্দর্য্য এই আন্তরিকতা ও আত্ম-সম্পর্ক Personal element পাঠক যেন অন্তরে অন্তরে জানিতে চায় কবি একটা ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছেন, না সত্য প্রদর্শন করিতেছেন? কবি স্বকৃতির মধ্যে আছেন কি? নিজের কথা নিজে বিশ্বাস করেন কি? এই সকল প্রশ্নে আশ্বাস পাইলে পাঠকগণ যেন প্রীত হয় এবং কবিকৃতির মাহাত্ম্য এই কারণেই অনেক বাড়িয়া যায়। নবীনচন্দ্রের বেলায় এই তথ্যের বহু সমর্থন হইয়া গিয়াছে। বায়রণের কবিতাতেও এই Personal element প্রবল ছিল। তবে, বায়রণের অভিমান, সমাজ ও নীতি-দ্রোহিতা

ও বিদ্বেষভাব এত প্রবল ছিল যে, উহাতেই তাঁহার কবিতার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বরং বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে; পাঠকের হৃদয়ে উহা বহু স্থলে, এমন বেদনাদায়ক হইয়া গিয়াছে যে, বায়রণের উচ্চ মুগ্ধকারী কবিত্ব-শক্তিও কুলাইয়া উঠে নাই।

নবীনচন্দ্রের কবিতাতেও প্রথম প্রথম বায়রণের কোন কোন দোষ যে ছিল না, এমন নহে, তবে, বয়সের প্রৌঢ়তায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংসর্গের ফলে নবীনচন্দ্রের কবিতা হইতে, ঐ সমস্ত দোষ ক্রমে নিরাকৃত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের মতন পরিণত বয়স্ক ও সুস্থিত হইতে পারিলে, ইংলণ্ডের বায়রণও নবীনচন্দ্রের ন্যায় শ্রেয়োমুখী, সমাজ-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে উপনীত হইতে পারিতেন কিনা, চিন্তার বিষয়। পরন্তু এই উভয় কবির প্রতিভার প্রকৃতি ও স্ফুরণ বিচার করিতে বসিলে, উভয়ের নানা স্বধর্ম্ম চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে। অশুভবাদী ও বিদ্বষধর্ম্মী Mantred cain অথবা Heaven and erath না হইয়া কোন শুভ দৃষ্ট-গুণে বাঙ্গালার বায়রণের (?) প্রতিভা রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসের ও বুদ্ধ চৈতন্যের নিষ্ঠা তত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই পরম কুতূহল ও প্রণিধানের বিষয়। বায়রণ অতি প্রদীপ্ত ধ্বংসশীল উল্কাশিখার মতন স্বপ্রকৃতির অমিতাচার ও স্বাভাবিক ফলেই যেন অকালে নিবিয়া গিয়াছিলেন। আর, ভারতবর্ষীয় নবীনচন্দ্র মিত-কর্ম্মা ও সুরক্ষিত থাকিয়া, দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত, আপন জীবনকে বিশ্বাসে ও ধর্ম্মে বিকশিত করার সুবিধা পাইয়াছিলেন। সেইভাবে এই কবির ধর্ম্ম ও সমাজজীবন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুধাবনও প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর বিশেষ কৌতুকাবহ হইবে. সন্দেহ নাই।

আমাদের এই কবি পণ্ডিত বা কোন বিষয়েই ঐশ্বর্য্যশালী অধীতী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার পঠিত বিদ্যা কোনরূপেই বহু প্রসারী বা গভীর ছিল না। প্রথম পরিচয়ে তাঁহার লাইব্রেরীর গ্রন্থাল্পতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম. সেক্সপীয়রের গ্রীক ও লাটিন বিদ্যা বিষয়ে কবি গ্রীন সে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন-জ্ঞান বিষয়েও এই সাক্ষ্য নির্ভয়ে দেওয়া যাইতে পারে। যে বায়রণের সহিত সচরাচর তাঁহার তুলনা করা হয়, যাঁহার নিকটে তিনি বহু পরিমাণ ঋণী, এমন আশঙ্কাও করা হয়, সেই বায়রণের Child Harold ও Hours of Idleness মাত্র পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন, এ-কথা তিনি আমার কাছেই স্বীকার করিয়াছেন। অবকাশরঞ্জিনী ও পলাশীর যুদ্ধের পর, আর তাঁহার বায়রণের সহিত কোন সামঞ্জস্যই দেখিতে পাইতেছি না।

তিনি স্বীয় প্রতিভার অদৃষ্টগত সামঞ্জস্যবশেই বায়রণের সমভাবাপন্ন কবি, এই ধারণা আমার দৃঢ়মূল হইয়াছে। আপনার মানসিক শান্তির বিপুল প্রেরণা ও স্বাভাবিক প্রতিভাবশেই এই কবি চকিতবেগে কার্য্য-বিষয় দর্শন করিতেন ও অবলীলাক্রমে কবিতা চয়ন করিয়া যাইতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ইংরাজী শিক্ষা, ইতিহাস. দর্শন ও কাব্যচর্চ্চা ও প্রাকৃত সমসাময়িক বঙ্গসমাজের আবহাওয়া হইতে পরিমিত জীবনী-রস সংগ্রহ করিয়া এই স্বভাব কবি, আমাদের দেশের অযত্ন-সংবর্দ্ধিত অশ্বত্থ তরুর ন্যায় আকাশের ঝড়ে ও রৌদ্রে পরিপুষ্ট প্রকাণ্ড ও মহীয়ান হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন অনায়াসসিদ্ধ ক্ষিপ্রতা, প্রকাণ্ডতা, নিশ্চিন্ত নির্ভীকতা সাহিত্য জগতে অত্যল্প কবির বেলাতেই পাওয়া যায়। যিনি স্বয়ং পণ্ডিত নহেন, তাঁহার কাব্য অপরকে পাণ্ডিত্য লাভে সহায়তা করিবে; যিনি স্বয়ং নিশ্চিন্ত নিমেষে লিখিয়া যাইতেন, তাঁহারই কবিতা অন্যকে গভীর চিন্তায় দীক্ষিত করিবে, শক্তিমাতার সুপ্রফুল স্নেহ ও পক্ষপাতিতার ফলে না হইলে বর্ত্তমান কালে সাহিত্য-জগতে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইত না। আমরা দেখিতেছি. পাশ্চাত্ত্য কবি বা কাব্যপ্রথার নিকট মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের ঋণ অনায়াসে স্থির করা

যায়; কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবি-ঋণ নির্ভয়ে নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য।

আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটা নূতন 'হুজুক' উঠিয়াছে, তাহার মূলমন্ত্র 'art for arts sape' উহার মর্ম্ম—আত্মনিষ্ট শিল্পকলা; অর্থাৎ কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলার একমাত্র উদ্দেশ্য অনলঙ্কৃত স্বভাব বর্ণন। অথবা একোদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্য সৃজন, কাব্যের কোনরূপ নৈতিক বা শ্রেয়স্কর উদ্দেশ্য রক্ষার নাকি আবশ্যকতা নাই। এই মতের ভাল মন্দ বিচার বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত; সুতরাং এই মাত্র বলিয়া রাখিব যে, ইতিমধ্যে য়ুরোপেই গেটে, টলষ্টয়, রাস্কিন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি মনীষিগণ এই মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রকে এই বিজাতীয় মত স্পর্শ করে নাই। মধুসূদনে উহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিদৃষ্ট হইবে, নবীনচন্দ্র ভারতীয় ঋষি-সেবিত সাহিত্যগঙ্গা হইতেই স্নানপূত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই নবীনচন্দ্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবপুঞ্জের বংশধর; দৈবক্রমে ভারত-সমুদ্রের তলদেশ হইতে ঝটিকাজুষ্ট কবিধাত্রী চট্টলভূমির উপকূলে উন্নীত হইয়াছিলেন। যাঁহারা পৃথিবীর অন্ধকার যুগে ভারতীয় সাহিত্যে সুবিপুল রামায়ণ, মহাপুরাণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট ও শ্রীমদ্ভাগবত রাখিয়া গিয়াছেন, ও পরকালে যাঁহারা চৈতন্য-চরিত, চৈতন্যভাগবতে এবং এই দেশে সুবৃহৎ 'জাগরণ' ও 'মনষার পুঁথি' গান করিয়া গিয়াছেন, এই নবীনচন্দ্রের সহিত তাঁহাদেরই 'শোণিত' ও সবর্ণ সম্বন্ধ দেখিতেছি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র শক্তিধর কবি হইয়াও বিদেশী প্রভাবে ভারতবর্ষীয় মনুষ্য হৃদয়ের মর্ম্মস্থান চিনিয়া লইতে পারেন নাই ও তাহাদের সুবৃহৎ কাব্যসম্ভার, য়ুরোপীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসাবে, হয়ত অনবদ্য হইয়াও, বঙ্গসমাজের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই, স্বভাব কবি নবীনচন্দ্রের বিষয় নির্ব্বাচন, বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সুবিহিত হইয়াছিল কিনা, বঙ্গদেশের পাঠক-সাধারণ চিরকাল সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জগন্মাতা সর্ব্বপ্রথম সেই শক্তি প্রদানে এই কবিকে প্রেরণ করেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনচন্দ্র প্রকৃতিদত্ত শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপে উন্নতি ঘটন অথবা নূতন অর্জ্জন করেন নাই। অবকাশরঞ্জিনীর নবীনচন্দ্রে বা চৈতন্যের নবীনচন্দ্রে মৌলিক কোন পার্থক্যই নাই, এই দীর্ঘ জীবন কবি স্বীয় প্রারব্ধের দ্বারা তাহার গুণগত কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। রচনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি বা শক্তি একই জাতীয়। ইহাতেই দেখা যাইবে, এই কবির কবিত্ব শক্তির মূল মস্তিষ্কে নহে—হৃদয়ে। এই ক্ষেত্রে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের সহিত নবীনচন্দ্রের সবর্ণ সম্পর্ক আরও পরিস্ফুট। ভাবে গদগদ, প্রেমে মুগ্ধ নবীনচন্দ্র হৃদয়ের সামর্থ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছেন; জীবন-পথেও হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। স্বকৃতি বা পরকৃতি তিনি হৃদয়ের দ্বারাই বিচার করাইতেন। রসের উদ্দীপনা করিয়া তাঁহার হৃদয় স্পন্দন জানাইতে পারিলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন, ও অকপটে অতিশয়োক্তি-বহুল প্রশংসা করিয়া ফেলিতেন। বঙ্গদেশের অনেক নবীন সাহিত্যিক কবির এই অকৃত্রিম সহৃদয়তার ও অনসূয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যাত্রার আসরে বা অভিনয় মঞ্চে কোনমতে রসের উদ্রেক করিতে পারিলেই, সর্ব্বাগ্রে নবীনচন্দ্রকে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত করা কত সহজ হইত, তাহা এই দেশের সকলেই জানেন।

এই হৃদয়ধর্ম্মে নবীনচন্দ্র কখনও নিজের অন্তরতত্ত্বে দৃষ্টি করেন নাই; ভিতরের মানুষটার প্রতি সবিতর্ক দৃষ্টি নবীনচন্দ্রের প্রণালীবিরুদ্ধ। তাঁহার আত্মজীবনের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে কবিটা কোথায়? পলাশীর যুদ্ধ, বা রৈবতক বা কুরু-ক্ষেত্র-প্রণেতা বাল্যজীবনের কোন্ স্থানে আপন প্রাণরস প্রাপ্ত হইতেছে? উহার বর্ণিত ঘটনাবলীতেও কেবল একটা উদ্ধত, দুর্দ্দান্ত, সুখ-দুঃখে অতিপ্রবণ স্বভাবশিশুকে দেখিতেছি, কবি আত্মজীবন বিবৃত করিতে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এত

সরল, নির্ভীক এবং স্বাভাবিক যে, তাহাই অতর্কিতে তাঁহার চরিত্রের মূলবর্ণ প্রকাশ করিতেছে; এই জাতীয় কবির রচনা-রীতিই তাঁহাদের চরিত্রের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে। উহা জীবন-যাপনের ইতিবৃত্ত মাত্র; জীবন গঠনের বা দর্শনের নহে। জার্ম্মানীর গেটে যেমন শৈশব হইতেই আপনার কবি-জীবনের প্রতি মালীর ন্যায় সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন ও নিজকে জীবনের ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়া জাগ্রতভাবে বাহিয়া নিয়াছেন; নবীনচন্দ্র তেমন কখনও করেন নাই। তিনি অতর্কিত কবি। কথাটি সম্পূর্ণ অর্থবাচক হইল না। নবীনচন্দ্র নিজের অদৃষ্ট ও জীবন-দেবতার অনুগ্রহ বিধান বশতই কবি। ঘটনাবিধান বিপরীত হইলে, এমন কি, পিতার মৃত্যুর পর সংসার যে তাঁহাকে করাল বক্ত্র বিকৃত করিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল, তাহা পরাবৃত্ত না হইলে, ও উচ্চ রাজকীয় পদ লাভান্তে জীবনোপায় সুখ সুবিধাজনক না হইলে, তিনি কি হইতেন বলা যায় না। মনীষী কার্লাইল স্বকীয় 'বীর-পূজা' নামক গ্রন্থে যে সমস্ত শক্তিধর সর্ব্বতোভদ্র পুরুষকে 'বীর' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও এই জাতীয় 'বীর' ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। কবি প্রতিভার প্রবৃত্তি তাঁহার সমগ্র চরিত্রের অনেকগুলি প্রবল প্রবৃত্তির একতম মাত্র; যে যে দিকে ছুটিত, অদ্য সকলকে অভিভূত করিয়াই ছুটিতে পারিত। দেখা যাইতেছে, প্রকৃতিপ্রিয় পুত্রকে এই ক্ষেত্রে অনুপমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি পরম স্নেহে ও সাগ্রহে নবীনচন্দ্রকে হৃদয়ে ও কার্য্যে কবি করিয়া তুলিয়াছিলেন, কেবল কবি নহে, ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবতরঙ্গে ঝঙ্কৃত—এমন কবিত্ব নহে, তাঁহার সমস্ত জীবনকে সর্ব্বতোভাবে একটা বিশিষ্ট মঙ্গল লক্ষ্যে প্রেরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় উহা পরিস্ফুট হয়।

অবকাশরঞ্জিনীর ক্ষুদ্র কবিতা সমূলে কিশোর বয়স্ক ও যুবক নবীনচন্দ্রের অন্তরে তত্ত্বের পরিচয় পাই। স্বাধীন উদ্ধত স্বভাব-শিশু, পরিবারের ও স্বদেশের প্রেমে বিগলিত, সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত, ভাবুকতায় উন্মত্ত, সৌহার্দ্দে সকরুণ, কৃতজ্ঞতায় নতশির ও সর্ব্বপ্রকার নীচতার প্রতি একান্ত অক্ষমশীল। নবীনচন্দ্র এই দুই কাব্যের প্রতিছত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। পরিণত বয়সেও তাঁহার চরিত্রের এই সমস্ত মূলবর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। নবযুবক যে স্থানে 'কীর্ত্তিনাশা'র কূলে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—

কীর্ত্তিনাশা; বৃথা নাম বৃথা অভিমান।
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার?

যে স্থলে কালপ্রবাহে অক্ষত তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া বিহ্বল হইয়া গিয়াছে, যে স্থলে, সেই ভাবমুগ্ধ পরমৌগ্ধত্যের মধ্যেই ভবিষ্য-কবিবরের পরিচয় পাই; সেই স্থলেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'পলাশীর যুদ্ধে'র বিভাবিনী শক্তি প্রকট হইয়াছে।

তারপর 'পলাশীর যুদ্ধ' কেবল প্রতিভার স্বেচ্ছাদৃপ্ত সঙ্গীত, আপাত দর্শনে, উহার কোন লক্ষ্য নাই, কোন নৈতিক ভিত্তি নাই। উহা কেবলি আনন্দ প্রকাশ? কবির হৃদয় আনন্দে নাচিতেছে। কবি হৃদয়ের মধ্যে আত্মপ্রতিভার সমুদ্র কল্লোল ও কামান গর্জ্জন শুনিতেছেন—গান ত অপরিহার্য্য; এখন যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াই চলুক। বাহ্যতঃ, উদ্দেশ্য ভারাক্রান্ত নহে বলিয়া পলাশীর যুদ্ধ নববসন্তের উৎকট পিকবরের নূতন উজ্জ্বল, মধুর, রসাল; এক শ্রেণীর কাব্য-রসিকের নিকট চিরকাল হৃদয়গ্রাহী; চিরকাল কবির পরবর্ত্তী সিদ্ধলক্ষ্য গ্রন্থাবলী অপেক্ষাও সমাদৃত।

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমাদের অবস্থা বৈগুণ্যেই প্রকটিত হইতে পারে নাই। আমরা দেখিব, প্রেম—স্বদেশের প্রেম, স্বজাতি-প্রেম সর্ব্বত্র নবীনচন্দ্রের প্রতিভার উদ্দীপক শক্তি ও অবলম্বন। মধুসূদনে যে স্বদেশ বা স্বজাতি প্রেমের অভাব, অন্ততঃপক্ষে অস্ফুটতা, সহৃদয় হেমচন্দ্রে নানাস্থানে যাহার কিংকর্ত্তব্যশূন্য উত্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস;

নবীনচন্দ্রে তাহারই সমঞ্জসিত লক্ষ্যে স্ফূর্ত্তি ও প্রয়াস। বুঝি, ঐ জন্যই, নবীনচন্দ্র কখনও 'মানবতার' ভূমি পরিহার করেন নাই, কখনও অনৈতিহাসিক বা অতিমানব ঘটনাবলম্বনে কাব্য প্রণয়নে নিযুক্ত হন নাই। 'পলাশীর যুদ্ধে'র অন্তস্থলেও ঐ স্বদেশ-প্রেমই কার্য্য করিয়াছে; কবি উহাই উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি গঠন-প্রয়াসী কবি; বায়রণ বা ভলটেয়ারের মতন ধ্বংস-প্রয়াসী নহেন। অধিকন্তু 'পলাশীর যুদ্ধে' কবি কেবল 'সেরাজুদ্দৌলা বধ' লিখিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কোনরূপ 'বধ' কিংবা 'সংহার'। লক্ষ্য করিয়া কবি কেবল 'আত্মনিষ্ট শিল্প কলা'র আদর্শে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পরাধীন দেশের কবি নবীনচন্দ্রের সতর্করুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাস 'পলাশীর যুদ্ধে'র প্রধান সৌন্দর্য্য, এই গ্রন্থের স্থল বিশেষের জন্য কবিকে নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন-প্রকৃতি নবীনচন্দ্র এই জন্য নিজের সেবা বৃত্তিকে চিরকাল ধিক্কার দিয়া আসিয়াছেন; সময় সময় নিজের অবস্থা নিয়ন্ত্রণায় নিদারুণ যাতনানুভব করিয়া গিয়াছেন।

তৎপর রঙ্গমতী, এই কাব্য কবির আত্মপ্রতিভার প্রতিকৃতি। জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ কবি, প্রত্যক্ষভাবে, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে আপন বীণাপাণিকে স্থাপন করিয়া, যদৃচ্ছ সঙ্গীতে আপন হৃদয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন, কোন বাধা নাই, অপর কেহ শুনিতেছে কিনা, বিচার করিতেছে কিনা, যেন সেই দিকে কবির কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই, আপন আনন্দ-দম্ভে প্রবাহিনী আমাদের এই কর্ণফুলীর ন্যায়, সমস্ত ছন্দোবন্ধ, শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতার মধ্যেই কবির প্রকৃত অন্তরতত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, সেই গ্রন্থের নায়ক প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং নবীনচন্দ্র, বীরেন্দ্র প্রভৃতি বাহ্যিক উপলক্ষ্য মাত্র। সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েতে'র ন্যায় এই গ্রন্থ কবির প্রথম যৌবনোল্লাসের আত্মিক প্রতিকৃতি।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই জাতীয় ভাবমুগ্ধ কবির পক্ষে, ছন্দোবন্ধ যেমন একদিকে নিয়ন্ত্রণারূপে কার্য্য করে। অন্যদিকে তেমনি, কবির স্বেচ্ছাচার সীমাবদ্ধ করিয়া মহদুপকার সাধিত করে। মিলটন 'প্যারেডাইস লষ্ট' কাব্যের ভূমিকায় কাব্যের ছন্দবন্ধকে নিগৃহীত করিয়া একভাবে সমুচ্চ সাহিত্যের মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন। মিলটনের প্রতিভা একদিকে যেমন সমুদ্রের ন্যায় বিপুল উচ্ছ্বাস ও সামর্থ্যময়; অন্যদিকে, তেমনি, আপন প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠ সংযমবশে নিয়ন্ত্রিত ও নিগৃহীত, মিলটনের পক্ষেই অমিত্রছন্দের স্বাধীনতা সুফলপ্রসূ হইতে পারিয়াছে। আমাদের মধুসূদনও সর্ব্বত্র এই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। 'পলাশীর যুদ্ধে'র ছন্দোবন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া, নবীনচন্দ্র পরবর্ত্তী কাব্যাদিতে, এক দিকে যেমন স্বাধীনতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্য দিকে, তেমনি, ছন্দের সালংকার ধ্বনি গৌরব ও সংযমনিষ্ঠাকে হারাইয়া ছিলেন। এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক নবীন সাহিত্য-সেবীর প্রণিধানের বিষয় হইয়া থাকিবে।

রঙ্গমতীতে এই পরাধীন জাতির কবির নিপীড়িত হৃদয় স্বাধীনতার লোকপাবনী মূর্ত্তির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়াছে; স্বদেশের স্বজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা পরিদর্শন করিয়া অশক্ত আকুলতায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। এই রঙ্গমতীর মধ্যেই রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মূল উদ্দেশ্যের সূত্রপাত দৃষ্ট হয়। কবি অতঃপর দীর্ঘ জীবন উহারই অনুধাবনে ব্যয়িত করিয়া ঐ কাব্যত্রয়ের বিপুল আয়তনের মধ্যে, সর্ব্বপ্রযত্নে, ঐ মহাসমস্যার পূরণেই চেষ্টিত হইয়া গিয়াছেন।

কবি-ধর্ম্মের মধ্যেই এই দেশের, এই বিশাল হিন্দু-বৌদ্ধ-মোসলেম-খৃষ্টান নিষেবিত ভারতবর্ষের ভবিষ্য উদ্ধার-বীজ দর্শন করিয়াছিলেন। তাই, কিরূপে এই বিভেদ বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে "এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান" সুপ্রতিষ্ঠিত

করিতে পারা যায়, সমস্ত বিভেদের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহার আদর্শ স্থাপনে কবি-হৃদয় এত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র প্রভাস সেই উদ্দীপনার ফল; ভারতবর্ষের অতীত যুগ হইতে, সংস্কৃত সাহিত্যের গুহাগত ভাবধারা নব পরিচ্ছদে পুনরাবর্ত্তিত করিবার উহাই হেতু। "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" রচিত হইবার আধ্যাত্মিক কারণ। চণ্ডী ও গীতার অনুবাদ, খৃষ্ট, অমিতাভ, চৈতন্য ও মহম্মদের অনুকল্পনা তাহারই অবান্তর ঘটনা মাত্র।

আমাদের সাহিত্যের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, কবি এই 'চৈতন্য' সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই বঙ্গদেশের কবিগণের মধ্যে চৈতন্যের ভক্তি সমুচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্য ছিলেন একমাত্র নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র একদিকে যেমন ক্লিওপেট্রা ও জরৎকারুর চরিত্রকে অনুপমভাবে বুঝিয়াছিলেন, অন্য দিকে তেমনি শৈশবে সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও, স্বীয় হৃদয়-সাধর্ম্মে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন ও শ্রীচৈতন্যের চরিত্রকে বুঝিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের শ্রীকৃষ্ণে গৌরাঙ্গেরই পূর্ব্বাভাষ পাইয়াছিলাম। চৈতন্যে উহাই সংযত হইতেছিল। ইতিমধ্যে মহাকালের আশ্বাস আসিয়া পড়িয়াছে; কবি স্বদেশের হৃদয়ে অসম্পূর্ণ কর্ম্মসন্তাপ রাখিয়াই মহা-প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এইরূপে স্বদেশানুরাগে ও বিশ্বজনীন প্রেমে, স্বদেশের ক্ষেত্রে, এই স্বপ্ন-মুগ্ধ বিরাট কবি-হৃদয় আমরণ একনিষ্ঠ থাকিয়া, আপনভাবে মানব সেবায় ইহজীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মসাধনা। কাহারও মুখাপেক্ষা করেন নাই। সম্মিলনের আদর্শ সংস্থাপন করিতে যাইয়া, স্বসমাজের প্রবল ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে নিগৃহীত করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন মহাভারতের মুক্ত বায়ু ও ভারত সমুদ্রের কলকল্লোল প্রবাহিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষুদ্র স্বার্থ বা অভিমান আহত হইতেছে কি না, তাহার বিচার করিতে চাহেন নাই।

কোন প্রাচীন পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যে এক অদ্ভুত প্রণালীর সমালোচনার রেখা চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। "কাব্যেষু মাঘঃ, কবিঃ কালিদাসঃ।" কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? না মাঘের শিশুপালন বধ, আর কবি কে? না কালিদাস। কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাস্য নহে; কারণ প্রশ্নকর্ত্তা অপর কাহাকেও কবি বলিয়া জানেন না; বহু কবির অস্তিত্ব বিষয়ে কোন আশঙ্কাই হয় নাই। কবি কাহাকে বুঝ?—না কালিদাসকে। কালিদাস উৎকৃষ্ট কাব্যকার না হইতে পারেন, তবু তিনিই কবি। উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়াও যাহার নিকট কবির সার্টিফিকেট পাওয়া গেল না, এমন সমালোচকটি কে? ফলতঃ, কথাটির বিস্তর সারবত্তা আছে। উৎকৃষ্ট কাব্য নানা কারণে হয়। কিছু শক্তি, বিস্তর শ্রম ও 'মধ্য রাত্রির তৈল খরচ', অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্র। এত সমস্তের মিলনেই শিশুপাল বধের মত উৎকৃষ্ট (?) কাব্য রচিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া, কবি! কবি, সংস্কৃত সাহিত্যে কেবলই একজন।

এইভাবে আলোচনা করিতে বসিলে বলিতে পারা যায়, পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট কাব্যের সংখ্যা অগণ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কবির সংখ্যা 'হাতের কড়ায়' গণিয়া লওয়া যায়। আরও দেখা যাইবে, তাঁহাদের অনেকেই হয়ত উৎকৃষ্ট কাব্য একটিও লিখিয়া যাইতে পারেন না, ঐ হিসাবে নবীনচন্দ্রের লেখা বিচার করিতে বসিলে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই এই ধারণা হইতে থাকে—এই একজন প্রকৃত কবি; জগতের কবি-গণনায় যাঁহার নাম বাদ পড়িবে না, তেমনই একজন কবি, তাঁহার কাব্য হয়ত রসজ্ঞ পাঠকের মন সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না; স্থানে স্থানে হয়ত 'আফশোষ' রাখিয়া যাইবে—কিন্তু তবু কবি। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র বা বায়রণ যেমন শত শত ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও চিরকালের রোঘাতে বরেণ্য কবি—এই জাতীয় একজন কবি। সাহিত্যজগতে

এমন কবি দুর্লভ—যাহার কবিত্ব শক্তি ঝড়ের মত,—কোন বাধা বিচার নাই। ভাষার, ব্যাকরণের, ছন্দের অলঙ্কারের মশখাপেক্ষা নাই; যাহার চাল-চরিত্রে কোনরূপ সংযম নিরোধ নাই; ভিতরে বাহিরে কোনরূপ ভয় বিক্ষোভ নাই;—যে আপন শক্তিদম্ভে যথেষ্ট আস্ফালনে ছুটিয়াছে; এই ভারতবর্ষের প্রাচীন শিখর শিরোদেশ হইতে নিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় ছুটিয়াছে—অথচ সিন্ধুলক্ষ্যে, ভারত মহাসমুদ্রের দিকেই ছুটিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কবিতার রচনা, প্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে বসিলেও তাহাই বুঝিব। কোনরূপ নিয়ম শৃঙ্খলা বিচার বিতর্ক নাই; সংশোধন প্রসাধন গোপন নাই। প্রবাহের মত তর তর বেগে ছুটিয়াছে। সময় সময় এক বৈঠকেই এক-একটা 'সর্গ' উৎসারিত হইয়া তদবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রগত হইবার জন্য গিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কোন লেখার নকল-নবীশের আবশ্যক পড়ে নাই। নবীনচন্দ্রের চিন্তা ও রচনা সমগতিক ছিল। বীণার ঝঙ্কারের ন্যায়, তাঁহার ভাবাহত হৃদয়ের স্পন্দনগুলিই কবিতারূপে প্রকটিত। তাঁহার হৃদয়-শোণিতের সাহায্যেই তাঁহার কাব্যাদি লিখিত হইয়াছে। আত্মজীবনীর পিতৃ-বিয়োগা-ধ্যায়ের ও কুরুক্ষেত্র প্রভাসের স্থল বিশেষের, হস্তলিপি এক অপূর্ব্ব। পরম পবিত্র ও সযত্ন-রক্ষণীয় পদার্থ। নবীনচন্দ্রের হৃদয়োৎসারিত বড় বড় অশ্রুবিন্দুতে স্থানে স্থানে মসীলিপি স্খলিত হইয়া গিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিয়াও তাহাই দেখিব, সম্পূর্ণ স্বাধীন—এমন কি, স্বেচ্ছালতিক জীবন। শৈশব হইতেই উহার কোন অভিভাবক নাই; শৈশবে জননী অন্তরালে থাকিয়া সরিয়া গিয়া, বালকটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন; অতি স্নেহময় পিতাও স্বীয় হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া বালকের সমস্ত বন্ধন কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ইষ্টদেবতা ভোলানাথের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বালক সমবয়সীর সমস্ত সৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া, খেলিয়া, নাচিয়া, গাইয়া, শিক্ষকদিগকে, পাড়া-প্রতিবেশীদিগকে বিধিমতে উৎপীড়িত করিয়া, দম্ভ ও অহঙ্কারে উৎকণ্ঠ হইয়া দেশময় ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর সাক্ষ্যভূমি হইতে পিতার প্রস্থান—ক্ষণকালের জন্য সংসারের বিভীষিকা মূর্ত্তির প্রকাশ—তাহাতেই জাগরণ। প্রকৃত কবি নবীনচন্দ্রের জাগরণ! সেইদিন দুঃখের দীক্ষায়, পবিত্র পিতৃভক্তির অশ্রুজলে, দীনহীনা চট্টলভূমির এক প্রান্তে যে কবি জাগিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যকুঞ্জ সেই অকৃত্রিম স্বভাবকবির প্রেম ও সঙ্গীতেই এতদিন মুখরিত হইতেছিল; এবং আজ তাঁহারই সার্থক জীবনের 'বিজয়া' সমাহিত হইয়া গিয়াছে।

আমরা তাঁহার স্বদেশীয় গণ, তাঁহার অনুরক্তগণ, তাঁহার কবিতার ভক্তগণ, আজ আমাদের হৃদয়-বেদনা কিরূপে প্রকাশ করিব? আমাদের হৃদয় কি প্রতি মুহূর্ত্তে বলিয়া দিতেছে না, এই দেশের জ্যোতিঃ চলিয়া গিয়াছে; আমাদের প্রিয়তম সুহৃদ, আমাদের সাহিত্যের রসকৌমুদী-নির্ঝর নবীনচন্দ্র আর ইহজগতে নাই! যিনি আমাদের জন্ম-ভূমিকে এত ভালবাসিতেন; জন্মভূমির কোন লোক সাহিত্য সেবা করিতেছে জানিলে, যাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইত। জন্মভূমি যাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' ছিল; যিনি যত্র-তত্র সগর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন; এই দেশের শৈল নদী-সাগর-কান্তরের মাহাত্ম্য-প্রতিভা যাঁহার কবিতায় সর্ব্বত্র শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, জন্মভূমির যে বাৎসল্য-মুগ্ধ শিশু প্রতি বৎসর দূর প্রবাস হইতে মাতৃবক্ষে ফিরিয়া আসিয়া স্নেহগদগদ কণ্ঠে অনুপম ভাষায় ডাকিতেন :—

মা! মা! মা! কত কাল পরে
ডাকিলাম ওমা পরাণ ভরে!
শৈল কিরীটিনী,

সাগর কুন্তলা
মারুৎ মালিনী—হেরিলাম তোরে।

জন্মভূমির সেই প্রিয়তম পুত্র যখন নিজের জীবনের শেষ জানিয়া, দূরদেশ হইতে জন্মভূমির বক্ষে, পিতৃশ্মশানের পার্শ্বে বিশ্রামের জন্য ফিরিয়া আসিলেন, ও অবশেষে যোগীবেশে জন্মভূমির বক্ষে সংসার সন্তপ্ত বক্ষঃ রাখিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, তখন কি ই বহু প্রাচীনা অবলাভূমি, ইহার শৈল-নদী-কান্তার সমুদ্র সহ পরম শোকাবেগে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে নাই? যে কবি যৌবনের প্রারম্ভে গাইয়াছিলেন :—

একদা প্রভাতে সখে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদ মালায়,
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়!
তেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর
রহিয়াছে স্থিরভাবে প্রবাহ খেলিয়া;
ঊর্ম্মির উপরে যেন ঊর্ম্মি সাজাইয়া।
নিম্নস্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ
উচ্চস্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন।

জন্মভূমির সেই হৃদয়ঙ্গম সন্তান আজ কোথায়? আজ তাঁহার অভাবে এই ভূমি কি আপনার বিপুল সঞ্চিত ভাবনা, শক্তি ও মমতা-বিধায়িনী স্নেহ-করুণা লইয়া পুনঃ প্রতীক্ষায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন না! এই ভূমি চিরকাল কবিভূমি, সাধু, যোগী, ফকীর, দরবেশের ভূমি। এই ভূমিই অতীতকালে আপন মোহনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও জ্ঞান-গরিমায় 'রম্যভূমি' ও 'পতিত বিহার' নামে খ্যাত হইয়াছিল ও ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যবিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্মকে আপন নিভৃত শৈলকন্দরে আশ্রয়দানে রক্ষা করিয়াছিল; এই ভূমিই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে, বাঙ্গালী জাতির জাগরণ যুগে, নবদ্বীপচন্দ্রের বিশ্ব-বিজয়ী ভক্তি সংকীর্ত্তনে, আপনার শান্ত নিভৃত গুহাসদন হইতে স্বভাব সুকণ্ঠ মুকুন্দ ও ভক্ত পুণ্ডরীককে প্রেরণ করিয়াছিল; এই ভূমিই বঙ্গ-সাহিত্যের নিদানস্বরূপে রামায়ণ ও মহাভারতের পাবনী ভাবধারা ভাষান্তরিত করিয়া আপন দরীফাদার রক্ষা করিয়াছিল; ও শত শত কবির হৃদয়-রত্নাকর হইতে সুবৃহৎ 'জাগরণ' ও 'মনসার পুঁথি' সঞ্চিত করিয়াছিল; এই ভূমিই মোসলেম-যুগে সংস্কৃত-পারশীক উর্দ্দু ও বাঙ্গলা ভাষায় ও ভাবের মহামিলন সংঘটনে, বাঙ্গালার সাহিত্য-মঞ্চ কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত একাসনে বসিবার জন্য, কবিবর আলাওলকে সমুদ্দীপ্ত করিয়াছিল এবং এই ভূমিই পরিশেষে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যসভ্যতার সম্মিলন স্থলে, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্কট যুগে, প্রাচীন মহাভারতের চিরন্তন আদর্শকে নব-পরিচ্ছদে পুনঃ-প্রচার করিবার চেষ্টাকল্পে, আপনার শৈল নদী সমুদ্রের প্রতিভায় সমুদ্দীপ্ত করিয়া নবীনচন্দ্রকে বঙ্গ দেশের সাহিত্য-রঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিল। মায়ের এই শেষ আশা ও প্রযত্ন সফল হইয়াছে কি না, বা কি পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহার বিচার করিবার ক্ষমতা বা কর্ত্তব্য আমাদের নহে। আজ আমরা জননীর প্রিয়পুত্র প্রিয়তম আত্মীয়কে শ্মশানানলে ভস্মীভূত করিয়া শোকভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি।

আমার জীবন

চতুর্থ ভাগ

ফেনী

ইহার কিছুদিন পরেই আমার ফেনী বদলি গেজেট হইল। আমরা পূর্ব্বাহ্নে আহারের পর গোযানের অপূর্ব্ব ট্রেন খুলিয়া, স্মরণ হয়, ২৩শে নবেম্বর ফেনী রওনা হইলাম। বন্ধুগণ ও বহুতর লোক বহুদূরে আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহাদের বিদায় দিয়া যখন আমি গাড়ীতে উঠিলাম, এবং কিছুক্ষণ পরে একটা অচেনা বৃক্ষতলায় পৌঁছিলাম, হৃদয় হইতে সেই ওলাউঠা-ভীতি নামিয়া গেল, এবং পথের উভয় পার্শ্বে খোলা মাঠের বিশুদ্ধ বাতাস লাগিয়া শরীরে এবং গ্রাম্য প্রাকৃতিক শোভায় নয়নে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। বড় আনন্দে সাতাইশ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া গভীর রাত্রিতে ফেনী পৌঁছিলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয়কে আমার জন্য ফেনী দীঘির পাড়ে তাঁবুখানি খাড়া করিয়া রাখিতে লিখিয়াছিলাম। গাড়ী হইতে তাঁবুতে যাইতে অন্ধকারে একফুট কাদায় পড়িয়া গেলাম। শুনিলাম, একমাত্র আফিসের সম্মুখদিক্ ভিন্ন অন্যস্থান দিয়া রাস্তা হইতে দীঘির পাড়ে যাইবার পথ নাই। তখন স্ত্রীর গাড়ী ঘুরাইয়া সেই পথদিয়া আনিল। রাত্রিতে শিবিরে শুইয়া ভাবিতেছিলাম, শ্রীভগবানের কি অনুগ্রহ! বেহারে যখন তিনবৎসর শেষ হইয়া বদলি আসন্ন হইল, তখন স্বামী স্ত্রী দুজনে ভাবিতাম যে, বহুবর্ষ বিদেশে—উড়িষ্যা বাঙ্গালা বেহার ঘুরিয়া কাটাইলাম। যদি বাড়ীর নিকটে ফেনী সবডিভিসনটি পাইতে পারি, বড় সুবিধা হয়। শ্রীভগবান্ সেই আশা আজ পূর্ণ করিলেন। মনে কত আনন্দই হইয়াছে। আমি পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট থাকিতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এ সবডিভিসন খোলা হইয়াছিল। এ স্থানটি চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও কুমিল্লা হইতে বহুদূরে, অথচ তিন জেলার রাস্তার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে দিনে ডাকাতি হইত। আমার চেষ্টায় সবডিভিসন খোলা হয়, এবং এই স্থানটি নির্ব্বাচিত হয়। এ কারণে এই স্থানটির উপর আমার একটুক আন্তরিক স্নেহ ছিল। আটবৎসর চলিয়া গিয়াছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে উহা একটি অন্য সবডিভিসনের মত একটা সুন্দর স্থান হইয়াছে। কিন্তু রাত্রিতে কাদায় পড়িয়া মনে কেমন একটা খট্‌কা পড়িয়াছে। অথচ রাত্রির অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি শয্যা হইতে শিবিরের গবাক্ষের আবরণ উত্তোলন করিলে যে দৃশ্য নয়নে পতিত হইল, তাহাতে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা। চারিপাড় প্রায় একমাইল হইবে। জল নির্ম্মল,—নব শীতের আকাশের মত নির্ম্মল। তাহাতে প্রভাতানিলে লীলা করিয়া হিল্লোলমালা খেলিতেছে। কিন্তু জল শেয়ালা ও টপ্‌টপি পত্রে সমাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজকুসুমরাজি ফুটিয়াছে। দীর্ঘিকার চারিপাড় পর্ব্বতাকার উচ্চ, এবং এরূপ জঙ্গলাবৃত যে, তাহা হইতে রাত্রিতে শিবাকণ্ঠে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইয়াছে। পরে দেখিলাম, দিবাভাগেও ফৌজদারী কোর্টের অবমাননা করিয়া, এ সঙ্গীতে দীর্ঘিকা মুখরিত হয়। শুনিলাম, সময়ে সময়ে নেকড়ে বাঘও পেনাল কোড এবং পুলিস না মানিয়া, তাহাতে আশ্রয় লইয়া, সবডিভিসনাল অফিসারের সঙ্গে রাজ্য ভাগ করে এবং ক্ষমতার পরীক্ষা করে। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় চট্টগ্রাম-ঢাকা ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে গো-গৃহের মত দুইখানি কুঁড়িয়া ঘর ঝড়ে ধরাশায়ী হইয়াছে। শুনিলাম, উহাই কাচারি এবং তৎপশ্চাতে তিতুমিরের কেল্লার মত একটা স্থান আস্ত মুলিবাঁশের ঘেরা। শুনিলাম—সেটা জেল। পশ্চিম পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকখানি কুঁড়িয়া ঘর ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইখানি গোগৃহ শত-তালি-যুক্ত হইয়া মাথা তুলিয়া আছে। শুনিলাম, উহা পুলিস ষ্টেশন। তাঁবু হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, দীর্ঘিকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ স্পর্শ করিয়া ঢাকা-চট্টগ্রাম রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তাহার দক্ষিণ ও পূর্ব্বপাড়ের পার্শ্ব দিয়া 'ছাগল-গাইয়া' থানার দিকে এবং উহার ও ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গমস্থল হইতে নোয়াখালির দিকে দুই রাস্তা গিয়াছে। এই

সঙ্গম-স্থানের নিকটে এক গর্ত্তের মধ্যে চারিখানি কুঁড়িয়া ঘরে সবডিভিসনাল অফিসার বাস করেন এবং প্রত্যেক মাসে বাড়ীভাড়ার দরুন গবর্ণমেণ্ট হইতে পঞ্চাশটাকা গ্রহণ করেন। আমি নোয়াখালি থাকিতে চারিখানি কুঁড়িয়ার মূল্য তিনি আমার কাছে ষাটটাকা চাহিয়াছিলেন। মূল্যের কথা শুনিয়া উহা কিরূপ, আমি বুঝিয়াছিলাম এবং কিনিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। তিনি উহা একজন মুসলমান মোক্তারের কাছে ষাটটাকাতে বেচিয়াছেন। আমি উহা না লইয়া ভাল করি নাই বলিয়া তিনি ও সকলে অনুযোগ করিলেন। এই 'দৌলতখানা' ভিন্ন ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্বে আরও কয়েকখানি কুঁড়িয়া ঘর। উহা আমলা মোক্তারদের আবাসগৃহ। অনেকের গরুর ঘরও তাহা অপেক্ষা ভাল থাকে। দেখিয়া আমার হৃদয় ডুবিয়া গেল। কোথায় সে বেহার—একটি মহানগর! আর কোথায় ধান্যক্ষেত্রবেষ্টিত এই জঙ্গলাকীর্ণ শেয়ালাসমাচ্ছন্ন স্থান। হাট বাজার পর্য্যন্ত আড়াইমাইলের মধ্যে নাই। কেন এমনস্থানে সাধিয়া আসিলাম, স্ত্রী ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। আমার মনেও অনুতাপ হইল।

"কিন্তু হস্তচ্যুত পাশা হয়েছে যখন
কি হবে ভাবিয়া বল?"

যখন আপনি ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছি, তখন কাহার দোষ দিব?

নূতন ফেনীর সৃষ্টিপ্রকরণ*

১। উপনগর

ভাবিলাম, রামচন্দ্র চৌদ্দবৎসর এবং পাণ্ডবেরা বারবৎসর বনবাস করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজা ছিলেন। আর আমি দরিদ্র তিন চারিটি বৎসর কি তাহা পারিব না?

বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি একটা মহাজন ও পণ্ডিত হইলে যেখানেই যাই, সেখানে একটুক দাঁড়াইবার স্থান করিতে পারিব। মনে করিলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেববাক্যের সার্থকতার সময় উপস্থিত হইয়াছে। আমাকেও এখানে একটু দাঁড়াইবার স্থান করিতে হইবে। গাইলাম—

"নগর থেকে কানন ভাল নাইকো হেথা কোলাহল।
ভক্তিভরে, উচ্চস্বরে, মন রে! একবার হরি বল॥"

হরি বলিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। সাইক্লোন এই গোশালাসকল ধরাশায়ী করিয়া আমার বড়ই সাহায্য করিয়াছিল। আমার কার্য্যভার গ্রহণ করা পর্য্যন্ত গৃহাদির পুনর্নির্ম্মাণ আমি স্থগিত রাখিয়াছিলাম। প্রথম স্থির করিলাম যে, দীঘির চারিটি পাড় চারিহাত কাটিয়া নীচু করিব ও তাহাদের পরিসর বৃদ্ধি করিব। তাহার চারিদিকে কাচারি ও আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিব। নাজির এষ্টিমেট দিলেন, কেবল মাটি কাটার কার্য্যে ছয়শত টাকা লাগিবে। দেখিলাম, কাচারি পুনর্নির্ম্মাণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয় যে এষ্টিমেট

* ফেনীতে আমি অনুমান নয়বৎসর ছিলাম এবং বর্ত্তমান ফেনী আমি সৃষ্টি করিয়াছিলাম। আমার অনেক কার্য্য, শুনিয়াছি, পরবর্ত্তীরা ধ্বংস করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় যদিও ফেনীবাসীর পক্ষে উপাদেয় হইবে, উহা পড়িতে সাধারণ পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হইতে পারে। এরূপ পাঠকেরা কেবল এই অধ্যায়ের হেডিংগুলি দেখিয়া গেলে, আমি ফেনীতে কি কি কার্য্য করিয়াছিলাম, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। কোন স্থানের জন্য কোন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট এরূপ খাটিয়াছেন কি না, জানি না।

মঞ্জুর করাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা প্রায় তাহাতেই নিঃশেষ হইবে। এতটাকা কোথায় পাইব? কৌশল করিয়া কার্য্যটা নিলামে দিলাম। বলিলাম, যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অল্প টাকায় উহা করিবে, তাহাকে লোকাল বোর্ডের কন্ট্রাক্ট দিব। ডাক ছয়শত হইতে একবারে নব্বই টাকাতে নামিল। এই নব্বই টাকা লোকাল বোর্ডের টাকা হইতে দীঘির পাড়ে রাস্তার জন্য দিলাম। থাকিবার স্থান নাই। আমার তাঁবুর পার্শ্বে একখানি চাটাইয়ের ঘর, একজন শ্বেতচর্ম্ম ওভারসিয়ার প্রস্তুত করাইয়াছিল। সে চলিয়া গিয়াছে। এখন উহাতে কাচারি হইতেছে। আমার ভৃত্যেরা তাহাতে আশ্রয় লইয়াছেন। শ্বেতচর্ম্মের ভয়ে বোধ হয়, প্রভঞ্জনদেব এ কুঁড়িয়াখানি ধরাশায়ী করেন নাই। অন্যথা উহাতে বাঁশের খুঁটি মাত্র। চাটাইয়ের পুরাতন বেড়াতেও শত ছিদ্র। অতএব একদিন মাত্র ফেনীতে থাকিয়া পাড় কাটার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মফঃস্বল যাইব স্থির করিলাম। কিন্তু কোথায় কিরূপে যাইব? কোনদিকে রাস্তা নাই। পাল্কীর বেহারার বেতন অতিরিক্ত। মাইল প্রতি এক কি দেড়টাকা পড়িবে। পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়েরা আগরতলার মহারাজার হাতী আনিয়া মফঃস্বল যাইতেন। তাহাতে আমিই বা গেলাম। কিন্তু পত্নী হস্ত্যারোহণে যাইবেন কিরূপে? তাহা ছাড়া হাটের মধ্যে ভিন্ন তাঁবু ফেলিবার স্থান কোথায়ও নাই শুনিলাম। এখন হাটের মধ্যেই বা পত্নীকে দাখিল করি কিরূপে? একবার 'স্ত্রী-স্বাধীনতা'র জন্য মাদারিপুরে গালি খাইয়াছি।

"হাট বাট মাঠ ফেরনু, ফেরনু বহুদেশ—"

উহা কাব্যে সম্ভব হইলেও কার্য্যে বোধহয়, বঙ্কিমবাবুও অনুমোদন করিতেন না। অবশেষে শুনিলাম, 'করাইয়া' নামক একটি হাটে তখনও নৌকায় যাওয়া যাইতে পারে। তাহাও আড়াই মাইল হাঁটিয়া গিয়া 'সিলোনিয়া' নদীতে নৌকায় উঠিতে হইবে। যাহা হউক, তাহাই স্থির করিলাম। স্ত্রী পাল্কীতে গিয়া নৌকায় উঠিলেন। কিন্তু এই আড়াই মাইলই এরূপ অগম্য যে, হস্তীতে যাইতেও গলদ্‌ঘর্ম্ম হইল। 'করাইয়া'য় দশদিন থাকিয়া ফেনী ফিরিলাম। নদী হইতে ফেনীতে সন্ধ্যারপর হাঁটিয়া আসিতে প্রায় দ্বাদশটি আছাড় খাইলাম। তাহার পর যদিও বড় সাধ করিয়া নদীর জল হইতে মৎস্য আনিয়াছিলাম, তাহা লবণাভাবে খাওয়া হইল না। আড়াই মাইল না গেলে লবণ পাওয়া যায় না। এত রাত্রিতে কে যাইবে? সেই রাত্রি আছাড় মাত্র খাইয়া কাটাইলাম। 'করাইয়া' বাজারের পার্শ্বে একটুক স্থান করিয়া লইয়া শিবির ফেলিয়াছিলাম। সেখান হইতে তালুকদারী এক ঘোটকে গিয়া বড় ফেনী নদীর তীরে একটি স্থান দেখিয়া, সেখানে তাবু পাঠাইতে আদেশ দিয়া আসিয়াছিলাম। আর একদিন সেই চাটাইয়ের বাঙ্গালায় থাকিয়া, আবার তাঁবুতে সেখানে নৌকাপথে গেলাম। এদিকে ক্রমে ক্রমে পাড়ের মাটি কাটা শেষ হইল। মাটি কাটিবার সময়ে শত শত নরমুণ্ড বাহির হইতে লাগিল। দক্ষিণ পাড় নিকটবর্ত্তী গ্রামের কবরস্থান ছিল, এবং ডাকাতেরা খুন করিয়া অন্য পাড়ে শব পুতিয়া রাখিত। উত্তর পাড়ের ঠিক মধ্যস্থলে বাঁশের মাচার উপর আমার বাসগৃহ প্রস্তুত করিলাম। তাহার সম্মুখে দীর্ঘিকার দিকে একটি গোল বারান্দা, এবং পশ্চাতে ধান্যক্ষেত্রের দিকে একটি চৌবারান্দা বাহির করিলাম। দীঘির চারি পাড়ের ভিতর কিনারা দিয়া এক রাস্তা চালাইলাম। তহার ভিতরপার্শ্বে জলের ধার দিয়া এক সারি নারিকেলবৃক্ষ রোপণ করিলাম। পাড়ের উপরে স্থানে স্থানে বৃক্ষের স্তবক (tope), এবং বাহিরপার্শ্বে 'বোটানিক্যাল' উদ্যান হইতে আনিয়া, নানাবিধ আম্র ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া, তাহার মধ্যে ঝাউ রোপণ করিয়া দিলাম। আমার আবাসগৃহের সম্মুখে দীঘির পার্শ্বে হৃদয়াকৃতি, পূর্ব্বদিকে দীঘির পাড়ে গোলাকৃতি, পশ্চাতে দীঘির পার্শ্বে ত্রিকোণাকৃতি, এবং পশ্চিম পার্শ্বে দীঘির পাড়ে চতুষ্কোণাকৃতি পুষ্পোদ্যান রোপণ করিলাম। পশ্চিমে বাগানের অপর দিকে রান্নাঘর।

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি পদ্মাকৃতি বেদি। তাহার পার্শ্বে 'পুলিনকুটীর' এই নাম বাগান-শোভা শাকের দ্বারা রচিত পদ্মপত্রের মধ্যে লিখিত হইল। বেদির মধ্যস্থলে ভূগর্ভে নিমজ্জিত একটি প্রকাণ্ড গামলায় পদ্মের সময় পদ্ম, অন্য সময়ে মরশুমি ফুল (season flower) ফুটিয়া থাকিত। প্রাঙ্গণের চারি সীমায় নানাবিধ ফুলের কেয়ারি। গৃহের চারি দ্বারের উভয় পার্শ্বে শেফালিকা ও গন্ধরাজ রোপণ করিয়াছিলাম। ফুলের সময়ে গন্ধে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত। গৃহের উপর কাপড়ের ছাদ, এবং বাঁশের বেড়ায় উৎকৃষ্ট কাপড়ের পর্দ্দা দিয়াছিলাম, এবং তাহার উপর নানাবিধ ছবি ও গৃহসজ্জার উপকরণ বসাইয়াছিলাম। আলিগড় হইতে সতরঞ্জি আনিয়া সমস্ত গৃহতল আবৃত করিয়াছিলাম। এক কক্ষ Drawing room (বৈঠকখানা) এবং তাহার পার্শ্বে শয্যাকক্ষ। পশ্চাতে চতুষ্কোণ বারান্দা Dining room (আহারের স্থান), এবং সম্মুখের গোল বারান্দা আমার কবিগিরির বা লিখিবার স্থান। ইহারই সম্মুখে বিস্তৃত দীর্ঘিকার তরঙ্গায়িত সুনীল সলিলশোভা। আগরতলা রাজবংশের শাখাবিশেষের কোন পুণ্যবতী রাজকন্যা এই দীঘি কাটাইয়াছিলেন। সেইজন্য ইহা 'রাজার ঝি দীঘি' বলিয়া পরিচিত। পুণ্যবতীর পুণ্য-রাশির ন্যায় অমৃতনিভ সলিলতরঙ্গে 'রাজবালা' নামাঙ্কিত তরণী (Life boat) হংসিনীর মত নৃত্য করিতেছে। তাহার বহির্ভাগ সবুজ ও অন্তর্ভাগ শ্বেতবর্ণে চিত্রিত। দুইহাতে দাঁড় টানিয়া কখন বা স্ত্রীকে, কখন বা কোন বন্ধু বা অতিথিকে লইয়া, কখন বা একা সন্ধ্যা হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জলক্রীড়া করিতাম, এবং এই বোটের দ্বারা দীঘি এমন পরিষ্কার করাইয়াছিলাম ও পরিষ্কার রাখিতাম যে, কোথায়ও একটি তৃণও পরিলক্ষিত হইত না। দূরে পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশের গায়ে ত্রিপুরার পর্ব্বতমালা মেঘবৎ শোভা পাইতেছে। পশ্চাতের বারান্দার সমক্ষে বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, নিত্য হরিৎ, পীত, শ্যাম ও স্বর্ণশোভায় হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি সঞ্চার করিতেছে। এই বারান্দা বা কক্ষে আহার করিতে বসিয়া, এবং সম্মুখের গোল বারান্দায় বিশ্রামার্থ বসিয়া কত ইংরাজ প্রাকৃতিক শোভার প্রশংসা করিতেন। পূর্ব্ব-দিকের চারি তোরণ (gate) সমন্বিত গোল বাগানের পশ্চিমদিকে অতিথি অভ্যাগতের জন্য বৈঠকখানা ঘর এবং তাহার পূর্ব্বে আস্তাবল ইত্যাদি দীঘির উত্তরপূর্ব্ব কোণায় পূর্ব্বোক্ত রাস্তার পার্শ্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত গৃহ ও উদ্যান ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে, বলা বাহুল্য, আমার বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। পশ্চিম পাড়ে নানা আকৃতির গৃহের দ্বারা কোর্ট, ট্রেজারি, পুলিস ষ্টেসন, এবং উত্তর-পশ্চিম কোণায় ইন্‌সপেক্টরের গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম। প্রত্যেক ঘরের স্বতন্ত্র আকৃতি। প্রত্যেক ঘরের পনর কি বিশ চাল, নানারূপ কোণ ও চক্রে প্রত্যেক গৃহের স্বতন্ত্র শোভা। এ অঞ্চলে কি কোনও অঞ্চলে এমন কবিত্বপূর্ণ বাঁশের ঘর কেহ কখনও দেখেন নাই। বাঁশের কুটীর যে এমন সুন্দর হইতে পারে, এ ধারণাও কাহারও ছিল না। এ অঞ্চলে এ সকল ঘর লইয়া মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহুদূর হইতে দলে দলে লোক এ সকল ঘর দেখিতে আসিতে লাগিল।

২। বাজার

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করিয়া যেন দাঁড়াইবার স্থান করিলাম।

কিন্তু,—"খুন হয়েছিনু বাছা! নুন চেয়ে চেয়ে,
শেষে না মিলিল কড়ি আনিলাম চেয়ে।"

নুন 'চেয়ে' না পাইয়াও একরাত্রি যে অনাহারে ছিলাম, তাহা বলিয়াছি। পশ্চিম দিকে 'পাঁচগাছিয়া' খুব বড় হাট—আড়াইমাইল ব্যবধান। উত্তর দিকে 'দেওয়ানগঞ্জ' মুন্সেফির

হাট—তাহাও আড়াইমাইল, এবং উত্তর পূর্ব্ব দিকে 'রাণীর হাট', তাহাও প্রায় ততদূর। অতএব এই আড়াইমাইল ব্যবধান না গেলে নুনটুকুও পাওয়া যায় না। এই অভাব অনুমান করিয়া আমার পূর্ব্ববর্ত্তী একজন ত্রিপুরার মহারাজার তিনহাজার টাকা ব্যয় করিয়া হাটের জন্য উপরোক্ত তিন রাস্তার সঙ্গমস্থলে একটি সুন্দর বিস্তৃত স্থান ক্রয় করিয়া, তাহাতে পুষ্করিণী পর্য্যন্ত কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনদিকে তিনটা হাট থাকাতে হাট মিলিল না। যাহা মিলিয়াছিল, তাহা পুলিসের ও তাঁহার নিজের ভৃত্যদের অত্যাচারে উঠিয়া গিয়াছিল। এখন একখানি দোতালা কুঁড়ে ঘর আছে। তাহাতে সীতাকুণ্ডযাত্রীদের জন্য চিড়া ও গুড় মাত্র পাওয়া যায়। 'পাঁচগাছিয়া' কি 'রাণীর হাট' ভাঙ্গাইতে গেলে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লবের কথা। তাহাদের মালিকেরা আচন্দ্রভাস্কর পর্য্যন্ত না লড়িয়া ছাড়িবে না। একমাত্র উপায়, যদি মুন্সেফি শুদ্ধ দেওয়ানগঞ্জ হাট উঠাইয়া আনা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফৌজদারির চোটে। ফলে এই হইয়াছিল—মুন্সেফের নামে ফৌজদারী কোর্টে ফৌজদারী মোকদ্দমা, এবং সবডিভিসনাল অফিসারের নামে মুন্সেফি কোর্টে মুন্সেফি মোকদ্দমা বহুসংখ্যক উপস্থিত হইয়া একটি বহুবর্ষব্যাপী প্রকাণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহা সম্প্রতি ত শেষ হইয়াছে। দেওয়ানি পক্ষ তাহাতে জয়ী হইয়াছে। মুন্সেফি দেওয়ানগঞ্জে রহিয়া গিয়াছে। আমি দেখিলাম যে, সেই বীরত্বে কিছুই হইবে না। আমি প্রথমতঃ মুন্সেফকে হাত করিলাম। তখন যিনি মুন্সেফ, তিনি বড় ভালমানুষ। বেচারি আপনি আমার কাছে কাঁদিয়া বলিল, সেখানে সে দিনরাত্রি আপনার আমলা ও উকিলের ভয়ে জড়সড় থাকে। কোন কার্য্যের জন্য কোন পেয়াদাকে ডাকিলে সে বলে যে, উকিল কি আমলার কাজ ফেলিয়া আসিতে পারে না। কারণ, মুন্সেফ দুইদিন মাত্র থাকেন। উকিল আমলা চিরস্থায়ী। অতএব মুন্সেফ অপেক্ষা তাঁহাদের খাতির বেশী করিতে হয়। সুতরাং মুন্সেফ সেখান হইতে মুন্সেফি উঠাইয়া আনিতে পারিলে রক্ষা পায়। আর সেই কারণেই উকিল ও আমলারা এরূপ প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। দেওয়ানগঞ্জ তাহাদেরই রাজ্য। ফেনীতে আসিলে তাহারা কেবল রাজ্যচ্যুত হইবে, এমন নহে ; ফেনীতে সবডিভিসনাল অফিসার ও পুলিসের ছায়াতে তাহাদিগকে নগণ্য ব্যক্তি হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব আমি মুন্সেফকে সম্মত করাইয়া মুন্সেফি উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব কলেক্টরের কাছে পাঠাইলে, উকিল ও আমলারা তাঁহার ও জজের কাছে ঘোরতর প্রতিবাদ করিল। কলেক্টর তদন্ত করিতে ফেনীতে আসিয়া দেওয়ানগঞ্জে গেলে তাহারা খুব কলাগাছ পুতিয়া ও গেট করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল, এবং তাঁহার কাছে আমার প্রতিকূলে যথাসাধ্য বুঝাইল। বলিয়াছি, লোকটি বড় দুর্ব্বলহৃদয় ছিলেন। তিনি সেই খোসামুদিতে ভুলিয়া গিয়া আমাকে বলিলেন যে, সবডিভিসনাল আফিসের উপযুক্ত স্থান ফেনী নহে, তিনি উহা বরং দেওয়ানগঞ্জে, কি অন্য কোন স্থানে উঠাইয়া লইবেন। তিনি তাহার জন্য স্থান দেখিতে লাগিলেন। দেওয়ানগঞ্জ বলিতে একটা ক্ষুদ্র ভরাট দীঘির এক পাড় মাত্র। তাহাতে একটা ক্ষুদ্র বাজার ও ঘরে ঘরে লাগা গরুর ঘরের মত মুন্সেফের আফিস ও উকিল আমলার ঘর। ভরা পুষ্করিণীটির উপর তাঁহাদের পায়খানা এবং উহা তাঁহাদের ও তাঁহাদের মক্কেলদের মলমূত্রে পূরিত। আমার কালাচাঁদ কলেক্টর এখানেই সবডিভিসন 'হেড কোয়ার্টার' (কার্য্যস্থান) করিবেন! আমি দেখিলাম, এই পদার্থশূন্য লোকের দ্বারা কিছুই হইবে না। তাঁহার ভাব দেখিয়া উকিল আমলারা উল্লম্ফন আরম্ভ করিল। আমি দেখিলাম, তাঁহাদিগকে আমার পাকাহাত দেখাইতে হইবে। প্রথম স্থির করিলাম, একদিনে দেওয়ানগঞ্জের হাট ভাঙ্গাইব। দেখিব কালাচাঁদ কি করেন। এক হাটের দিন কিছু কিছু দূরে প্রত্যেক লোকসমাগমের রাস্তায় কনষ্টেবল রাখিয়া দিলাম। তাহারা লোকদিগকে বলিয়াছিল যে, দেওয়ানগঞ্জের হাটে না যাইয়া, সবডিভিসনে নূতন হাট বসিয়াছে, সেই হাটে যাইতে সবডিভিসনের হাকিম হুকুম দিয়াছেন।

ফেনীর হাটে সমস্ত লোক উপস্থিত হইল। দেওয়ানগঞ্জ হাট একবারে লোকশূন্য। উকিল আমলাদের আনন্দের নৃত্য ভঙ্গ হইয়া আতঙ্কের ছুটাটুটি আরম্ভ হইল। অথচ কারণ কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। রাস্তার উপর হইতে সাধাসাধি করিয়া, পরে পেয়াদার দ্বারা জোর করিয়া লোক লইতে চেষ্টা করিলেন, একটি প্রাণীও গেল না। সন্ধ্যার সময়ে একটি কনষ্টেবল ফেনী ফিরিবার সময়ে একটা দোকানে তামাক খাইতে গেলে, তাহার উপর কা কা করিয়া কাকের পালের মত উকিল আমলার পাল পড়িলেন, এবং পুলিস দুষ্টামি করিয়া তাঁহাদের হাট ভাঙ্গাইয়াছে বলিয়া, তাহাকে গালি দিয়া আক্রমণ করিলেন। গালিতে কনষ্টেবলের প্রতিযোগী তাঁহারা হইতে পারিবেন কেন? সে সুদ সমেত প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাদের মর্ম্মান্তিক উপহাস করিতে করিতে চলিয়া আসিলে, তাঁহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ দলে বলে আমার কাছে আসিয়া নালিস করিলেন যে, পুলিস হাটের লোকের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া, তাঁহাদের বহুকালের প্রসিদ্ধ হাটটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আমি পুলিসের উপর চটিয়া লাল হইয়া, ইন্‌স্‌পেক্টর ও সবইন্‌স্‌পেক্টরকে তলব দিলাম, এবং কৃত্রিম কোপে তাঁহাদিগকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া এই অত্যাচারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা দুজনে তদ্রূপ কৃত্রিম ক্রোধে বলিলেন—"কোন্ মিথ্যুক পাজি এরূপ কথা আপনাকে বলিয়াছে, আমরা তাহার নাম চাহি। কারণ, তাহার নামে আমরা অপবাদের ফৌজদারী নালিস উপস্থিত করিব। কোনও পুলিস দেওয়ানগঞ্জের আশে পাশে যায় নাই। দেওয়ানগঞ্জ মলমূত্রের গঞ্জ। গন্ধের জন্য লোকেরা দেওয়ানগঞ্জের হাটে তিষ্ঠিতে পারে না। উকিল আমলা বাবুদের যেন উহা আতর গোলাপ হইয়াছে। ফেনীতে বাজার বসিতেছে শুনিয়া লোকেরা আপনি আনন্দের সহিত চলিয়া আসিয়াছে। কেবল একজন কনষ্টেবল কর্ম্মোপলক্ষ্যে অন্যস্থানে গিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়ে দেওয়ানগঞ্জে তামাক খাইতে বসিলে, বাবুরা তাহাকে মারপিট করিয়া, তাহার পেটি ও সরকারি কাগজ পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছেন। কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস, ঐ সকল কাগজে হাট ভাঙ্গিবার অবৈধ হুকুম আছে। অতএব কনষ্টেবল তাঁহাদের নামে ৩৫৩ ধারামতে পুলিস বেদখলের এজেহার দিয়াছে।" "বড় গুরুতর ব্যাপার!"—আমি মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলাম। আর তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, কেহ অত্যাচার করিয়া হাট ভাঙ্গাইয়া থাকিলে তাঁহারা পুলিসে এজাহার দিন। উভয় মোকদ্দমার তদন্তের ভার ইন্‌স্‌পেক্টরের উপর দিলাম। ইন্‌স্‌পেক্টর বলিলেন—"কে এজাহার দিবেন চলুন!" বাবুদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিষন্নমুখে ইন্‌স্‌পেক্টরের পশ্চাতে চলিলেন, ঠিক যেন ফাঁসিকাষ্ঠে যাইতেছেন। তাহার পর আমরা পতি পত্নী দুজনে খুব হাসিলাম। কিছুক্ষণ পরে ইন্‌স্‌পেক্টরের সঙ্গে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন এবং বলিলেন, তাঁহারা কোনও নালিস করিতে চাহেন না। আমি তখন আরও গম্ভীর ভাবে বলিলাম—"তাও কি হয়। আপনারা যখন আমার কাছে বলিয়াছেন, তখনই নালিশ হইয়াছে। উহা আর চাপা দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কনেষ্টবল যখন এজাহার দিয়াছে, তখন সে মোকদ্দমা ত আর বারণ করা যাইতে পারে না।" তাহার পর তাঁহারা অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত আমার কাছে কাঁদাকাটা করিয়া অব্যাহতি চাহিতে লাগিলেন। বহু অনুনয়ের পর আমি বলিলাম যে, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, কিন্তু ব্যাপার বড় গুরুতর। তাহার পর প্রায় পনরদিন যাবৎ পুলিস-বেদখলের মোকদ্দমা তদন্ত হইল। এই পনরদিন তাহাদের আর ভয়ে আহার নিদ্রা ছিল না। এই কয়দিনেই ফেনীতে শুধু হাট নহে, একটা দৈনিক বাজার পর্য্যন্ত বসিয়া গেল, এবং বহুতর দোকানঘর প্রস্তুত হইয়া গেল। মহারাজার মোক্তারের দ্বারা কিছু টাকা আনাইয়া লইয়াছিলাম। প্রথম কয়দিন হাটে জিনিসপত্র সন্ধ্যার সময়ে যাহা অবিক্রীত থাকিত, তাহা মোক্তার কিনিয়া লইতেন। মাছ বাসায় বাসায় বিলি করিয়া মূল্য আদায় করা হইত, এবং অবশিষ্ট দ্রব্য পরের হাটে মোক্তার বিক্রয় করাইতেন। তদ্ভিন্ন দোকানদারদের গৃহ নির্ম্মাণের

জন্য, জালজীবী ও অন্যান্য ব্যবসায়িগণকে অন্যান্য দ্রব্যের জন্য কিছু কিছু অগ্রিম দেওয়া হইল। এ সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে, এবং হাটে যাহাতে কোনওরূপ অত্যাচার না হয়, তাহা দেখিতে আমি একটা 'হাট কমিটি' নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। এরূপ সুবন্দোবস্তের দরুণ অপর্য্যাপ্ত দ্রব্যাদি—এমন কি, দশমাইল দূর হইতে বড় ফেনী নদীর মৎস্য পর্য্যন্ত এ বাজারে ও হাটে আসিতে লাগিল। বাজারটি দুই চতুষ্কোণে বিভক্ত করিয়া, পশ্চিম দিকের চতুষ্কোণে আর একটি পুষ্করিণী কাটাইয়া, উহাও ভরাট করিয়া, সে দিকে গোহাটা প্রভৃতির স্থান করিয়া দিলাম। দুই পুষ্করিণীর পাড়ে নারিকেল, এবং বাজারের উভয় খণ্ডে বিলাতি কৃষ্ণচূড়া ও নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করিয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে টিনের ঘর ও পাকা দোকান প্রস্তুত হইতে লাগিল। যতদিন পুলিসের মোকদ্দমা তদন্তাধীন ছিল, ততদিন বাবুরা আসিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমার কাছে কাঁদাকাটা করিতেন। পুলিস 'সি ফরম' দিলে, এবং আমি উহা খারিজ করিয়া দিলে তাঁহাদের যম-যাতনা শেষ হইল। একদিনে দেওয়ানগঞ্জের বাজার ভাঙ্গিয়া আনিয়াছি, ফেনী উপবিভাগে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

৩। মুন্সেফি পরিবর্ত্তন

ফৌজদারী মোকদ্দমা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া উকিল মহাশয়েরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন। কালাচাঁদ তাঁহাদের সহায়। বাজার এরূপ কৌশলে ভাঙ্গাইয়া আনিয়াছি যে, তিনি কোনওরূপ ফাঁক পাইলেন না। তাহাতে তাঁহার জিদ আরও বাড়িয়াছে। আমি তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, বরাবর জনসাধারণের পক্ষে মুন্সেফি উঠাইয়া আনিবার জন্য হাইকোর্টে আবেদনপত্র পাঠাইতে আরম্ভ করিলাম। হাইকোর্ট জজ মিঃ গনের (Gun) মত চাহিলেন। ইনি ফেনী আসিলে আমি ও মুন্সেফ এই প্রস্তাবের অনুকূলে, এবং উকিল মহাশয়েরা ঘোরতর প্রতিকূলে ও জজ নোয়াখালি ফিরিয়া গেলে, স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্রও যথাসাধ্য প্রতিকূলে বলিলেন। তিনি জজকে বলিলেন যে, তিনি ফেনী হইতে সবডিভিসনের হেড কোয়ার্টার উঠাইয়া লইতে রিপোর্ট করিয়াছেন। তাহাতে জজ ভয় পাইলেন। আমরা তৎপ্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টকে এক আবেদন পাঠাইলাম। গবর্ণমেণ্ট ফেনীতে জমি ও দীঘি ক্রয় করিতে ও আফিসাদি নির্ম্মাণ করিতে অনুমান দশহাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন খ্যাতনামা লায়েল (Lyall) সাহেব কমিশনর। তিনি আমার একজন নিতান্ত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি তৎপূর্ব্বেই কলেক্টরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া জজকে লিখিয়াছিলেন। জজ এখন মুন্সেফি উঠাইয়া ফেনীতে আনিবার জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করিলেন। এ দিকে উকিলেরাও সাধারণ লোকের ও তাঁহাদের নামে হাইকোর্টে ও গবর্ণমেণ্টে রাশি রাশি দরখাস্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আমি এরূপ করিয়াছি যে, এখন তাঁহারা নুনের জন্য খুন হইতেছেন। দেশের লোকে সকলে চাহে, সমস্ত আফিস ফেনীতে একত্রিত হউক। কারণ, তাহা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর ও সুবিধাজনক। অতএব এরূপ হইয়াছে যে, ফেনীর কি অন্য হাটের দোকানদার ও ব্যবসায়ীরা তাঁহাদের কাছে কোনও জিনিস বিক্রয় করিতেছে না। তাঁহাদের সময়ে সময়ে নিরম্বু একাদশী করিতে হইতেছে। মুন্সেফ মধ্যে মধ্যে আমার এখানে আসিয়া বলিতেন যে, না খাইতে পাইয়া মারা গেলেন, এবং আমার এখানে খাইয়া যাইতেন। হাইকোর্ট যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে মুন্সেফি ফেনীতে উঠাইয়া আনিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত ফেনীবিভাগের লোক আনন্দে নাচিতে লাগিল। অপমানে উকিলদের ও তস্য মুরুব্বি কালাচাঁদের মুখ চূন হইয়া গেল। যে দিন দুর্গাপূজার জন্য মুন্সেফি বন্ধ হইবে, সে দিন হাইকোর্টের আদেশ আসিয়া পৌঁছিল। জজ মুন্সেফকে লিখিয়াছেন যে, মুন্সেফের কাচারি গৃহাদি ফেনীতে উঠাইয়া আনিয়া, তারপর তিনি বাড়ী যাইতে পারিবেন। মুন্সেফকে সাহায্য করিতে আমাকে এক ডেমি-

অফিসিয়াল পত্র লিখিয়াছেন। মুন্সেফ বেচারি বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি আসিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে আমাকে বলিলেন যে, কাচারি ফেনীতে উঠাইয়া তাঁহাকে বাড়ী যাইতে হইলে তবে তাঁহার আর এ বন্ধে বাড়ী যাওয়া হইবে না। অতএব তাঁহার উপায় কি? আমি বলিলাম, তাঁহার কোনও ভয় নাই। পরদিনই তিনি এবং উকিলেরা বাড়ী রওনা হইবার পূর্ব্বে কাচারি ফেনীতে উঠিয়া আসিবে। একদিনে একমাসের কার্য্য কেমন করিয়া হইবে,—তিনি বিস্ময়ের সহিত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম—নিশ্চয় হইবে, তিনি বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আমি সেই সন্ধ্যার সময়ে ইন্‌স্‌পেক্টর ও সব-ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলিলাম যে, ফেনীর আশে পাশে যত গরুর গাড়ী আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং ফেনীর চারিদিকের লোককে বলিতে হইবে যে, তাহারা যে মুন্সেফি উঠাইয়া আনিবার জন্য এত কাল আগ্রহ করিয়াছে, এখন তাহা উঠাইয়া আনিবার জন্য তাহাদের সকলকে একদিন মজুরি করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে দেওয়ানগঞ্জে প্রায় পঞ্চাশখানা গাড়ী ও পাঁচশত মজুর সমবেত। যাহারা কখনও মজুরি করেনাই, তাহারাও গিয়াছে। লোকের আর আনন্দ ধরে না। তামাসা দেখিবার জন্য শত শত লোক উপস্থিত। নিকটস্থ সমস্ত গ্রাম লোকশূন্য হইয়াছে। অনুমান আটটার সময়ে আমার গৃহের পশ্চাতের চৌ-বারাণ্ডায় বসিয়া স্বামী ও স্ত্রী দেখিতেছি, প্রথম গরুর গাড়ীর ট্রেনে কাচারির জিনিসপত্র—এমন কি, ঘরের বেড়া ও খুঁটি ইত্যাদি আসিতেছে। তাহার পর বড়ই কৌতুক-দৃশ্য!—এক একখানি আস্ত ঘর যেন হাঁটিয়া আসিতেছে এবং হরিধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতেছে। এত লোক জুটিয়াছে যে, ঘরের চারিখানি চাল না খুলিয়া, লোকে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেছে। দূর হইতে দেখিতে চারি চালের নীচে চারি সারি লোক যেন সজীব খুঁটি বোধ হইতেছে। ঘর যেন হাঁটিয়া আসিতেছে। এ দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই। রাস্তার দুইধারে লোকারণ্য। গৃহসকল এরূপ হাঁটিয়া যাইতেছে দেখিয়া নর নারী হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। হরি-ধ্বনিতে ও 'বদর' ধ্বনিতে চারি দিকে প্রতিধ্বনি তুলিয়া দেওয়ানগঞ্জের মুন্সেফি এরূপে ফেনীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং সেইদিনই দিনে দিনে গৃহাদি ফেনী দীঘির পূর্ব্বপাড়ে উঠাইয়া, ও তাহাতে জিনিসপত্র সজ্জিত করিয়া, আমি ও মুন্সেফ উভয়ে জজের কাছে টেলি-গ্রাফ করিলাম। শুনিলাম, যখন লোকেরা হরিধ্বনি ও বদরধ্বনি দিয়া কাচারিঘর ভাঙ্গিয়া লইয়া আসিতে লাগিল, উকিল মহাশয়েরা দাঁড়াইয়া অপমানে অশ্রুবিসর্জন করিতেছিলেন।

তাঁহাদের অশ্রুপাত ও অপমান-ভোগ এখানে শেষ হইল না। মুন্সেফি খুলিলে, তাঁহারা বাড়ী হইতে ফিরিলেন। প্রধান উকিলেরা ঢাকা অঞ্চলের লোক। কেহ ফেনীতে বাসাবাড়ী করিবার স্থান পান না। কয়েকদিন পদব্রজে পাঁচমাইল হাঁটিয়া দেওয়ানগঞ্জ হইতে কাচারি করিলেন। কারণ, গরুর গাড়ীও পান না। ফেনীর লোকেরা কেহ তাঁহাদের কাছে বাসা-বাড়ীর জন্য জমি বিক্রয় করিতে, কি বন্দোবস্তি দিতে চাহে না। যদি কেহ চাহে, সে এরূপ মূল্য ও খাজনা চাহে যে, তাহা দেওয়া অসম্ভব। অগত্যা বাজারের দোকানঘরে তাঁহারা বাসস্থান লইলেন। তাঁহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছে। তখন আমার কাছে আসিয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে, তাঁহারা আমাকে লোকের চক্ষে এতক্ষুদ্র করিয়াছেন যে, আমার কথা কেহ শুনিবে না। আমি তাঁহাদের সাধাসাধি করিয়া একটা গবর্ণমেণ্টের কাচারি উঠাইয়া আনিতে পারি নাই। তাঁহাদিগকে নিজের জমি দিতে প্রজা-দিগকে আমি কেমন করিয়া বাধ্য করিব? তাঁহারা জেলার কলেক্টরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। তাঁহারা তাহা করিতেও ছাড়েন নাই। কিন্তু কালা কলেক্টর কি করিবেন? তিনি জোর করিয়া কাহারও জমি হস্তান্তর করিতে পারেন না। শেষে তাঁহাদের দুর্গতিতে ফেনীর পুলিসের ও আমলা মোক্তারদের পর্য্যন্ত দয়া হইল। সকলে আমাকে ধরিলেন। আমি ট্রাঙ্ক রোডের ধারে, বাজারের অপরদিকে একটা সুন্দর স্থান পূর্ব্বেই মনোনীত করিয়া

রাখিয়াছিলাম। তাহা তাঁহাদের উচিত খাজনায় বন্দোবস্তি দিতে প্রজাদের বলিয়া দিলাম। কিন্তু তাঁহারা মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের এত নিকটে থাকিতে চাহেন না। তাঁহারা একটি জঘন্য স্থান বাজারের উত্তরদিকে কিছুদূরে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। সেখানে তাঁহাদের স্থান দিলে ফেনী দেখিতে অতি কদর্য্য দেখাইবে। আরও কিছুদিন দুর্গতি ভুগিয়া শেষে তাঁহারা আমার মনোনীত স্থানই স্থির করিলেন। কিন্তু একজন ঢাকা অঞ্চলের উকিল তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ক্রূরপ্রকৃতির লোক। তিনি অতিরিক্ত টাকা স্বীকার করিয়া উক্ত কদর্য্য স্থানে তাঁহার বাসা নির্ম্মাণের বাঁশ বেত সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্য উকিলেরা সঙ্কটে পড়িয়া, তিনি যাহাতে সেখানে বাসা নির্ম্মাণ করিতে না পারেন, তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে বড়ই অনুনয় করিলেন। আমি সেইদিনেই সেখান দিয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার জন্য নিশান খাড়া করাইয়া দিলে, তিনি আমার কাছে আসিয়া মাথা কুটিতে লাগিলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বলিলাম, সেখান দিয়া রাস্তা না করিয়া উপায়ান্তর নাই। তিনি কিছু টাকা সে প্রজাকে অগ্রিম দিয়াছিলেন। সে তাহা ফেরত দেয় না। অবশেষে তিনি লোকের উপহাস উদরস্থ করিয়া এবং এই টাকা দণ্ড দিয়া, অন্য উকিলদের সঙ্গে আমার নির্ব্বাচিত স্থানেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিলেন। আমার দেখাদেখি তাঁহারা ও আমার কোর্টের উকিল, আমলা, মোক্তারেরা সকলেই সুন্দর সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ফেনী একটি সুন্দর উপনগর হইয়া উঠিল। তখন উকিল মহাশয়েরা পর্য্যন্ত আমার জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। কারণ, তাঁহাদের স্থানটি বড় মনোরম হইয়াছিল। দেওয়ানগঞ্জে মাত্র বাকী রহিল "পরিদর্শন বাঙ্গলা"টি—উহা পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের। তাহাদের দরবার বৃহৎ ব্যাপার। এমন সময়ে জেলার পূর্ত্তকার্য্য গবর্ণমেণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে দিলেন। আমি তখনই সেই বাঙ্গলাটি সেইখান হইতে উঠাইয়া আনিয়া ট্রাঙ্ক রোডের সংলগ্ন, দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আমার 'ফেশন'মতে বিচিত্র অবয়বে নির্ম্মাণ করিলাম এবং উহার ও আমার কাচারির মধ্যস্থলে সুগন্ধ পুষ্পের অর্থাৎ বকুল, নাগেশ্বর, চম্পক, কদম্ব প্রভৃতির একটি গোল স্তবক (tope) রোপণ করিলাম। বাঁশের কেল্লা জেলখানার পরিবর্ত্তে পাকা জেলের প্রস্তাব কিছুকাল যুদ্ধের পর মঞ্জুর করাইয়া, উহা দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণার নীচে মাঠে নির্ম্মাণ করিলাম। কারণ, পূর্ত্তবিভাগের প্রভুরা বলিলেন যে, পাকা গৃহ দীঘির ভরা মাটির উপর স্থায়ী হইবে না। কিছুদিন পরে পশ্চিম পাড়ের পার্শ্বে একটা পাকা ট্রেজারিও নির্ম্মাণ করাইলাম।

৪। ডিস্‌পেনসারি

ডিস্‌পেনসারি ও একজন হস্‌পিটাল এসিষ্টেণ্ট পূর্ব্বে হইতে ছিল। তবে ডিস্‌পেনসারির শোচনীয় অবস্থা। স্থানটি কদর্য্য। রোগী থাকিবার কোন বন্দোবস্ত নাই। এমন কি, ঔষধ পর্য্যন্ত নাই বলিলেও চলে। ডাক্তার ডিস্‌পেনসারি হইতে বহুদূরে থাকেন। পরিদর্শক সকলে বহু কাল যাবৎ 'ছি ছি' করিতেছেন। আমি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে প্রস্তাব করিলাম যে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হয় দুইহাজার টাকা ব্যয় করিয়া ঘরখানি ও স্থানটি ভাল করিয়া ও ডাক্তারের বাসস্থান সেইখানে নির্ম্মাণ করিয়া দেন; কিম্বা দুইশত টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেন। ফেনীর উন্নতি সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রস্তাব লইয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে আমাকে একটা যুদ্ধ করিতে হইত। উকিল মেম্বারদের বিশ্বাস যে, আমি ডিঃ বোর্ডের সমস্ত টাকা ফেনীতে লইতেছি। তাঁহারা প্রথমতঃ বাৎসরিক দুইশত টাকা সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। আমি তাহাতে একটুক হাসিলে তাঁহারা মনে করিলেন—তাঁহারা ঠকিলেন, তখন তাঁহারা গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য দুইহাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন। আমি তাহাতেও হাসিলে ইংরাজ কলেক্টর চেয়ারম্যান (তখন কালাচাঁদ চলিয়া গিয়াছেন) বলিলেন—"এই দেখ,

নবীনবাবু হাসিতেছেন। তোমরা এ প্রস্তাবে ঠকিয়াছ।” তখন তাঁহারা আবার বাৎসরিক সাহায্যের জন্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। কলেক্টর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আচ্ছা! আপনি এখন সরলভাবে বলুন, ইঁহাদের হার হইল, না আপনার হার হইল।” আমি বলিলাম,—“ইঁহাদের নিশ্চয় হার হইল। এই বাৎসরিক সাহায্যই আমার উদ্দেশ্য ছিল। সোজাসুজি তাহা চাহিলে এই প্রভুরা দিবেন না বলিয়া আমি কৌশল করিয়া বিকল্পে দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। এই সাহায্য চিরস্থায়ী হইল। গৃহাদির কার্য্যের জন্য আমি চাঁদা বাড়াইয়া টাকা জমা করিয়াছি। আপনি আর পনরদিন পরে ফেনী গেলে সকলই নূতন দেখিবেন।” তখন সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং সভ্য মহাশয়েরা বড় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—“সার! ইঁহার সঙ্গে পারিবার জো নাই।” আমি ফিরিয়া আসিয়া, ডিস্‌পেনসারির পার্শ্বের পুষ্করিণীটির সংস্কার করিয়া, গৃহের চতুর্দ্দিকে যে সকল নানা অবয়বের এবং নানাবিধ দুর্গন্ধ আবর্জ্জনাপূর্ণ গর্ত্ত ছিল, তাহা ভরাট করিয়া এবং স্থানটি উচ্চ করিয়া, সেখানে ডাক্তারের সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া দিলাম এবং গৃহখানি সম্পূর্ণরূপে আমার 'ফেশন'মতে সংস্কার করিয়া, তাহার চারিদিকে পুষ্প ও ফলোদ্যান রোপণ করিয়া দিলাম। তাহার সম্মুখে ট্রাঙ্ক রোডের অপর পার্শ্বে যে একটা কুৎসিত পদ্মপুকুর ছিল, তাহার পাড় সকল ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া উহাও একটা উদ্যান-সরোবরের মত করিয়া দিলাম। কলেক্টর আসিয়া প্রকৃতই বলিলেন—“নবীনবাবু! তুমি সত্য সত্যই এই কয়দিনে একটা fairy scene (অপ্সরা দৃশ্য) সৃষ্টি করিয়াছ।” তখন হইতে যে পরিদর্শক আসিতে লাগিলেন, সকলেই বাহবা দিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া আমি 'ছাগলগাইয়া' থানাতেও ডিস্‌পেনসারি খোলাইয়াছিলাম স্মরণ হয়।

৫। এণ্ট্রান্স স্কুল

আমি যখন ফেনীর ভার গ্রহণ করি, তখন তথায় একটি মাইনর স্কুল, এবং তাহারও নিতান্ত শোচনীয় অবস্থা ছিল। স্কুলগৃহখানি ইংরাজদিগের মুরগীর ঘর বলিলেও চলে। শিক্ষকদিগের বেতন বাকী পড়িয়াছে। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে চাঁদা উশুল হইত না। মাইনর স্কুলও এক অপূর্ব্ব খিচুরি বা গরমাগরম সাড়ে আঠার ভাজা। ছেলেদের বয়সের সংখ্যা অপেক্ষা পুস্তকের সংখ্যা বেশী। বঙ্গভাষায় অপূর্ব্ব পাঠ্য পুস্তক সকলের দ্বারা ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, এমন তত্ত্বই নাই, যাহা পঠিত হইতেছে না। সঙ্গে সঙ্গে আবার ইংরাজী শিক্ষাও আছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের বেতন পনর, কি কুড়ি মুদ্রা। তাঁহার ইংরাজী জ্ঞানও সেই পনর কি কুড়ি মুদ্রানুযায়ী। তাঁহার নিজের ইংরাজী উচ্চারণ অপূর্ব্ব এবং ছাত্রদের অপূর্ব্বতর। এ ত শিক্ষাদান নহে—বলিদান। যাহারা পাশ হইতেছে, তাহাদের মধ্যে দুই এক জন কোন মতে কোন এণ্ট্রান্স স্কুলে পড়িতে যাইতেছে। অবশিষ্ট পেয়াদাগিরি বা কনষ্টেবলগিরির উমেদারসংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাসার চাকর পাইবে না। কিন্তু পেয়াদাগিরি, কি কনষ্টেবলি একটা খালি হইলে দুইশত লোকে উমেদার হইবে এবং বিনা পয়সায় বাসার চাকরি করিতে সম্মত হইবে। যাহাদের তাহাও জুটে না, তাহারা “টাম্নিগিরি” করে এবং মিথ্যা মোকদ্দমায় দেশের সর্ব্বনাশ ঘটায়। যাহাদের সেই শক্তিও নাই, সে রাণী এলিজাবেথের সময়ের ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া হাকিমের কাছে বেনামী পত্র লেখে। একজন মেথর ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা ঢাকায় ইংরাজদের চাকরি করিয়া সুন্দর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিল। ইহার ছাত্রবৃত্তি পাশের ফলে সেই ব্যবসা ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে ভূসম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিয়া খাইয়াছে। এখন আর কিছুই নাই। তাহার দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া আমি তাহাকে “একটিং” পেয়াদার কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সমস্ত আফিস বিদ্রোহী হইল। কেহ তাহার হাত হইতে কাগজখানি পর্য্যন্ত লইতে

চাহে না। মুন্সেফ চেষ্টা করিলেন, তাঁহার আফিসেও সেরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। অবশেষে তাহার একটি ভাইকে স্কুলের বাগানের মালী নিযুক্ত করিয়া দিয়া একটি পরিবারকে অনশন হইতে রক্ষা করি।

ফেনীতে একজন মাত্র মালী ছিল। সে সমস্ত আফিসে, বাজারে ও হাটের কাজ করিয়া মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা পাইত। কাজকর্ম্ম করিয়া গিয়া দুপুরে বেলা রামায়ণ পড়ে। দেখিতে একটি ভদ্রলোকের মত। একদিন তাহার পুত্রটিকে আমার কাছে আনিল। বয়স উনিশ, কি বিশ, সুন্দর ছেলে। আমি তাহাকে দেখিয়া আমার নিজ বাসায় চাকর রাখিতে চাহিলে তাহার পিতা করজোড়ে বলিল,—"কর্ত্তা, তারে লিখাইছি।" আমি মনে করিলাম—"তাহার মাথাটি খাইয়াছ।" পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের পর তাহার পেয়াদাগিরির চেষ্টা বিফল বুঝিয়া, তাহাকে বাড়ীতে লইয়া তাহার ভাইয়ের সঙ্গে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিল। কিন্তু প্রাইমারি শিক্ষা তাহার পক্ষে মহামারী হইয়াছে। সে তাহা পারিবে কেন? কিছুদিন পরে তাহার পিতা আসিয়া একদিন আমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, তাহার ভাই মরিয়া গিয়াছে। জায়গা জমি সব পড়িয়া রহিয়াছে। অতএব তাহার পুত্রকে তাহার কার্য্যে রাখিয়া, তাহাকে ছুটি দিলে সে গিয়া কৃষি করিবে। তাহার পুত্র তাহা পারে না। পুত্রটি তখন ক্ষেত্রতত্ত্ব পোড়াইয়া তাহার পৈতৃক ব্যবসা ভূমিতত্ত্ব ও ভূমিমালিত্ব ধরিল। তাহার পর বেশ কাজ করিতে লাগিল।

একদিন একটি মৎস্যজীবিনী তাহার চৌদ্দ পনর বৎসরের এক পুত্র লইয়া আসিয়া আমার পায়ের উপর ফেলিয়া বলিল যে, সে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছে, 'মাইনর' পড়িতে চাহে। এই ছেলেটিও দেখিতে ভদ্রলোকের মত। আমি তাহাকে আমার বাসায় রাখিয়া পড়িতে দিলাম। কিন্তু স্কুলে ও আমার গৃহে বিদ্রোহ উপস্থিত। স্কুলে উকিল মোক্তার ও আমলার ছেলেরা তাহার সঙ্গে বসিতে চাহে না। বাসায়ও ভৃত্যেরা কবুল জবাব দিল, তাহার সঙ্গে তাহারা এক চালের নীচে খাইবে না, কি থাকিবে না। হতভাগ্য শিশু উঠানে আহার করিত এবং আমার বাইরের ঘরে এক স্থানে শুইয়া থাকিত। সুন্দর জ্যোৎস্না, অধিক রাত্রি হইয়াছে,—আমি মফঃস্বল হইতে আসিতেছি। প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে আমি ধীরে ধীরে অশ্ব চালাইয়া আসিতেছি। দীঘির পাড়ের উপর উঠিলে সুন্দর সঙ্গীতের স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুমধুর বালককণ্ঠ গগন ব্যাপিয়া উঠিতেছে। আমার বৈঠকখানার নিকটে আসিয়া বুঝিলাম, সে বালকটি নির্জ্জনে গাইতেছে—

"তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে,
কেমন করে যজ্ঞে যাই বল না?
তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে,—
আমি গেলে পিতা কথা কবে না।"

আমার বোধ হইল, যেন তাহার অবস্থায় ব্যথিত হইয়া সে প্রাণ খুলিয়া গাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অশ্রু বর্ষণ করিতেছে। আমি চুপি চুপি ঘোড়া হইতে নামিয়া স্ত্রীকে ডাকিলাম। উভয়ে তাহার গান শুনিতে লাগিলাম। উভয়ের চক্ষে জল আসিল। স্ত্রী বলিলেন— "কিন্তু কি করিবে? তুমি ত মফঃস্বল চলিয়া গিয়াছিলে। হতভাগার বিরুদ্ধে সমস্ত সবডিভিসন দাঁড়াইয়াছে। উকিল মোক্তারেরা তোমার কাছে আসিয়া বলিবে যে, তাহাকে রাখিলে এই স্কুলে তাহাদের ছেলেরা পড়িবে না। বাসায় চাকরেরাও জবাব দিয়াছে, তাহাকে রাখিলে তাহারাও চাকরী ছাড়িয়া দিবে।" আমি তখন বুঝিলাম, সেই মনস্তাপে বালক ঐ গীত ধরিয়াছে। গীত ত নহে, যেন প্রত্যেক অক্ষরে ও মূর্চ্ছনায় তাহার হৃদয়ের শোণিত নির্গত হইতেছে। আমিও প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম, সমস্ত রাত্রি আহার নিদ্রা হইল না। স্ত্রী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। দেখিলাম, তাহাকে রাখিলে এক দিকে স্কুল

ভাঙ্গিয়া যায়, অন্য দিকে ভৃত্যশূন্য হই। তখন তাহাকে আমি বড় স্নেহের কণ্ঠে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম এবং বিদায় দিলাম। বিদায়ের সময়ে সেও কাঁদিল, আমিও কাঁদিলাম। একটি নিরপরাধ শিশুর প্রতি যে ধর্ম্ম ও সমাজ এরূপ অত্যাচার করিতে পারে, তাহার অধঃপতন হইবে না কেন?

ইহার কিছুদিন পরে তেমনি প্রস্ফুটিত জ্যোৎস্নারাত্রি। গ্রাম্য প্রকৃতি নির্ম্মল-রজত-বরণ-মণ্ডিত হইয়া চারিদিকে কি শান্তির হাসি হাসিতেছেন! আমি মুগ্ধপ্রাণে সেই শোভা দেখিতে দেখিতে নৌকায় মফঃস্বল হইতে ফেনী ফিরিতেছি। আমাদের নৌকার সম্মুখ দিক্ হইতে সুমধুর বালককণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। ক্রমে নৌকা অগ্রসর হইলে, সে কণ্ঠ যেন সেই বালকের বোধ হইতে লাগিল। বালক একখানি জেলে ডিঙ্গিতে শুইয়া গান করিতেছে, ডিঙ্গির সম্মুখে জাল বসান রহিয়াছে। আমার আদেশমতে আরদালি জিজ্ঞাসা করিল—"কে রে! গোপাল নাকি?" তাহার নাম গোপাল। সে তাড়িত-সংস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে ও, আরদালি দাদা! বাবা কি নৌকায় আছেন?" আরদালি বলিল—"হাঁ।" তখন সে বড় ব্যস্ত হইয়া বলিল—"নৌকা একটুক রাখ।" আমিও নৌকা রাখিতে বলিয়া দাঁড়াইলাম—"গোপাল, গোপাল," বলিয়া ডাকিলাম। তাহার ক্ষুদ্র নৌকাখানি নক্ষত্রবেগে আমার নৌকার দিকে ছুটিয়া আসিল। আমার নৌকা সেই নৌকা ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, তাহার নৌকা আমার নৌকার সংলগ্ন করিয়া, সে কতকগুলি মাছ নৌকায় আরদালির কাছে দিয়া, ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল। জ্যোৎস্নালোকে দেখিলাম, তাহার মুখে সেই বিষাদ নাই, সুন্দর মুখখানি এখন প্রসন্ন, হাসি হাসি। আমি তাহার মুখখানি বাম হাতে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে গোপাল, তুই এখন কি করিতেছিস্।" সে হাসিমুখে উত্তর করিল—"বাবা! আপনার উপদেশমতে একখানি জাল কিনিয়াছি এবং নদীর এই স্থানটি বন্দোবস্তি লইয়া এখানে জাল বসাইয়া থাকি।" আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম—"বেশ করিয়াছিস্, এখন তোদের কোন কষ্ট নাই ত?" উত্তর—"না বাবা, আমরা মায়ে ছেলেয় বেশ আছি। আমরা মায়ে ছেলেয় মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব।" তাহাকে একটি টাকা দিতে আরদালীকে বলিলে, সে বলিল, সে টাকা লইবে না। না লইলে আমি দুঃখিত হইব বলিলে, টাকা লইয়া, আবার আমাকে নমস্কার করিয়া, তাহার নৌকায় গিয়া উঠিল। আমার নৌকা চলিল। যতক্ষণ দেখা গেল, সে ও আমি স্থিরনয়নে জ্যোৎস্নায় পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার প্রাণেও যেন কি একটা আনন্দের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল। কারণ, এ শিশুটি শিক্ষাবিভ্রাট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে।

এইরূপে নিম্নজাতীয় ছেলেগুলি কর্ত্তাদের প্রাথমিক বা সাংঘাতিক শিক্ষার ফলে এক-দিকে মারা যাইতেছে, অন্য দিকে উচ্চজাতীয় ছেলেদেরও মাইনর শিক্ষার দ্বারা কিছুই লাভ হইতেছে না। অতএব মাইনর স্কুলটি এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করিতে ভদ্রলোকেরা সকলে আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। ফেনীতে এখন অনেক ভদ্রলোক। তাহাদের ছেলেদের কি হইবে। আমারও একমাত্র সন্তান, একটি পুত্র। মাদারিপুরে কেবল মাইনর স্কুল ছিল বলিয়া ভাই দুইটিকে বাড়ী পাঠাইয়া মাটি করিয়াছি। অন্যদিকে ফেনী বিভাগ কেবল কৃষকের বাসস্থান বলিলেও হয়। অর্দ্ধেক বিভাগের জমিদার ত্রিপুরার মহারাজা এবং অপরার্দ্ধের জমিদার কুর্জ্জন (Courjon) সাহেব। উভয়েই ঘোরতর ঋণগ্রস্ত। তাহার পর অল্প কয়েকজন সামান্য তালুকদার, অন্য সকলেই কৃষক। টাকা পাইব কোথায়? বাহিরে ভিক্ষা করিয়া চারিশত টাকা মাত্র পাইলাম। তাহার পর ভিক্ষা-পাত্র হস্তে করিয়া সবর্ডিভিসনে বাহির হইলাম। শীতের সময়ে যেখানে যেখানে শিবির পড়িত, সেখানে তালুকদারদের ও অবস্থাপন্ন কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে ডাকিয়া যে যাহা দেয়, মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত লইয়া আর

নয়শত টাকা তুলিলাম। এক পাপিষ্ঠ ব্যবসায়ীর সত্তরহাজার টাকার মহাজনী ও প্রকাণ্ড কারবার আছে। অনেক পীড়াপীড়ির পর দশটাকা মাত্র স্বাক্ষর করিয়া দিল, তাহারও তিন-টাকার বেশী কিছুতেই উশুল করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, সে কোথায় নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে একবার সমস্ত দিন উপবাসে পড়িয়া ছিল। বয়স ষাটবৎসর। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহার পুত্র তাহাকে এক মুষ্টি চাউল, একটা বাতাসা ও এক ঘটি জল আনিয়া দিল। সে চীৎকার করিয়া, এই কুপুত্র তাহার সংসার ডুবাইবে বলিয়া গালি দিতে দিতে চাউল মুটো চাউলের এবং বাতাসাটি বাতাসার মটকায় রাখিয়া দিল। তারপর কেবল এক ঘটি জল পান করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। আর এক মুসলমান জমিদার ও মহাজন, তাহারও ষাট, সত্তর হাজার টাকার মহাজনী আছে। শুনিলাম, দশদিন নির্য্যাতনের পর বিশটাকা স্বাক্ষর করিয়াছিল এবং তাহাও আর দশদিন যাবৎ আমার শিবিরের বাহিরে ধর্না দিয়া পড়িয়া থাকিয়া, কোন মতে অব্যাহতি না পাওয়াতে দিয়াছিল। রুপচাঁদের কি মাহাত্ম্য! যাহার নাই, সে দুঃখী। কিন্তু যাহার আছে, সে পাপিষ্ঠ।

যাহা হউক, পুরাতন মাইনর স্কুলগৃহে ফেনীর এণ্ট্রান্স স্কুল খুলিলাম। উপরোক্ত মতে যে তেরশত টাকা চাঁদা পাইয়াছিলাম, তাহার দ্বারা ফেনী দীঘির পূর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া, তাহাতে মাটির দেওয়াল তুলিয়া, কুড়িটি কোণ ও চাল-সমন্বিত একটি বিচিত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিলাম এবং মাটির দেওয়াল ও 'পিলার' এরুপভাবে নির্ম্মিত ও রঞ্জিত করিয়াছিলাম যে, কাহারও সাধ্য নাই যে, উহা ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা বলিয়া মনে না করিবে। তাহার সম্মুখে হৃদয়াকৃতি একটি সরোবর কাটাইয়া, তাহার তীরে ফুল ও ক্রোটনের উদ্যান রোপণ করিয়াছিলাম, এবং উদ্যানের বাহির দিয়া হৃদয়াকৃতিতে স্কুল-প্রবেশের রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তাহার দুই পার্শ্বে নারিকেলের দুইটি সুন্দর স্তবক এবং স্কুল-গৃহের দুইপার্শ্বে "বোটানিকেল গার্ডেন" হইতে আনীত বহুমূল্য আম্র লিচু ও নানাবিধ ফলের কলমের স্তবক রোপণ করিয়াছিলাম। পশ্চাতে প্রকাণ্ড খেলার প্রাঙ্গণ। তাহার চারি ধারে আয়ত রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানাবিধ আম্র, পনস ও ফলবান্ বৃক্ষ এবং বকুল, চম্পক, অশোক, নাগেশ্বর প্রভৃতি ফুলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া-ছিলাম। প্রাঙ্গণের চারিকোণায় চারিটি বিলাতী কৃষ্ণচূড়া রোপিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন হাতার চারি সীমাতে ঐরুপ ফল ও ফুল বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল।

স্কুলে নানাবিধ নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিলাম। অন্যান্য স্কুলে নয় দশটি ক্লাস, ক্লাস ডিঙ্গাইতে ডিঙ্গাইতে ছেলেদের ইহকাল শেষ হইয়া যায়। আমি মোটে ছয়টি ক্লাস মাত্র খুলিলাম। কেবল শেষ ক্লাসে দুইটি মাত্র বিভাগ রাখিলাম। যাহারা প্রথম আসিয়া ভর্ত্তি হইবে, তাহারা দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পাইবে, এবং প্রথম বিভাগের উপযুক্ত হইবামাত্র বৎসরের মধ্যেই সেই বিভাগে উন্নীত হইবে। তাহার পর প্রত্যেক শ্রেণীকে দুইভাগে বিভক্ত করিলাম। (Big boys & little boys section) বড় ছেলের ভাগ ও ছোট ছেলের ভাগ। যাহারা বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি মাইনর ইত্যাদি পাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বয়স বেশী, চরিত্রও কলুষিত। তাহাদের সঙ্গে যাহারা কেবল ইংরাজী স্কুলে পড়িয়াছে, তাহাদের প্রতিযোগিতা বড় কঠিন হয়, এবং সংস্রবও দূষণীয়। কেবল তাহা নহে। বড় ছেলেগুলি বাঙ্গালাতে অঙ্ক ও ইতিহাস শিখিয়া এত দূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া আসে যে, ইংরাজী স্কুলের ছোট ছেলেরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। অতএব আমাদের দুই বিভাগের জন্য পারিতোষিকও স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছিলাম। এই ব্যবস্থা নিবন্ধন উভয় দলের মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। ছোট ছেলেরা কোন বিষয়ে বড় ছেলেদের অপেক্ষা পরীক্ষায় নম্বর বেশী পাইলে—প্রায়ই পাইত—বড় ছেলেদের প্রাণে আঘাত লাগিত। অন্যদিকে বড় ছেলেদের দ্বারা ছোট ছেলেদের চরিত্র কলুষিত

হইবার কোন অবসর ছিল না। এই প্রতিযোগিতা প্রত্যহ সজীব রাখিবার জন্য আমি প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যহ নম্বর দেওয়ার নিয়ম করিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক শনিবার এক এক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা হইত। ইহার ফল সোমবার দিন আমি বিশেষ করিয়া দেখিতাম। যদি কোন বিষয়ে কোন শ্রেণীর ফল সন্তোষজনক না হইত, তবে সেই বিষয়ের শিক্ষককে তজ্জন্য দোষী করিতাম এবং সেই বিষয়ের অধ্যয়নের সময় বেশী করিয়া দিতাম। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শনিবার ব্যায়ামের, পরিচ্ছন্নতার এবং চরিত্রের জন্য নম্বর দেওয়া হইত এবং সাপ্তাহিক নম্বরের মোট, পরীক্ষার ফল ও শিক্ষকের মন্তব্য একখানি বহিতে লিখিয়া ছাত্রের দ্বারা তাহা অভিভাবকের কাছে পাঠাইতাম এবং ছাত্র তাহা অভিভাবকের স্বাক্ষর করাইয়া আনিত। অতএব স্কুলে ও গৃহে, দুইদিকে ছাত্রের প্রতি দৃষ্টি থাকিত এবং এ সকল নিয়মের ফল যে কি শুভময় হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পারি না।

পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে আমি নূতন নিয়ম করিয়াছিলাম। এখন প্রত্যেক শ্রেণীতে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র পাঠ্য পুস্তক। ইহাতে যে কেবল নূতন নূতন পুস্তক কিনিয়া অভিভাবক-দের রক্ত শুষ্ক হয়, তাহা নহে; ছাত্রদেরও প্রত্যেক শ্রেণীতে নূতন নূতন ভূগোল, ইতিহাস, এবং ব্যাকরণ পড়িবার ফল এই হয় যে, কিছুই ভালরূপ শিক্ষা হয় না। আমি নিয়ম করিয়াছিলাম, এই সকল বিষয়ে একই পুস্তকের এক এক ভাগ এক এক শ্রেণীতে—পঞ্চম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পঠিত হইবে। তাহার পর দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে এণ্ট্রান্সের নির্দ্ধারিত পুস্তক সকল পঠিত হইবে। নিম্নতম শ্রেণীতে বাঙ্গালার শিশুরক্তশোষী পাঠ্যপুস্তকলেখকদের ছাই ভস্ম পড়িতে না দিয়া, রামায়ণ পড়িতে দিয়াছিলাম। তাহা হইতে আপত্তিজনক অংশ সকল আমি নিজে শিক্ষকের হস্তের বহি হইতে বাদ দিয়াছিলাম। তিনি ছাত্রদের হস্তের বহি হইতে বাদ দেওয়াইয়া দিয়াছিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা কি আনন্দের সহিত উহা পাঠ করিত!

অধ্যাপনা সম্বন্ধেও আমি নিয়ম করিয়াছিলাম যে, প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য ও অঙ্ক লইয়া অবশিষ্ট সময় অন্য শ্রেণীর সাহিত্য পড়াইবেন। নিম্নশ্রেণীর বালকদিগকে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দিবার ভার অল্প বেতনের নিম্ন শিক্ষক-দের উপর রাখিলে তাঁহাদের দ্বারা কিছুই ভাল শিক্ষা হয়না, এবং সেখানে উচ্চারণ ইত্যাদি বিগড়াইলে পরে তাহা সংশোধন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। একারণে যে সকল ছাত্র মাইনর পাশ করিয়া আসে, তাহাদের ইংরাজী উচ্চারণ এরূপ বিগড়াইয়া যায় যে, তাহারা বি. এ., এম. এ. পাশ করিয়াও উহা শুধরাইতে পারে না। ভূগোল ও ইতিহাস শিক্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত, আমি নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকের হাতে এবং অঙ্ক শিক্ষার ভার চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত একজন ছাত্রবৃত্তি পাশ করা শিক্ষকের হাতে দিয়াছিলাম, চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাস বাঙ্গালায় শিক্ষা হইত। ইহাতে একদিকে শিক্ষকের বেতন কম লাগিত, অন্য দিকে ছাত্রদের রক্তশোষণ কম হইত। এ সকল বিষয়ে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ইংরাজী স্কুলে পড়াইয়া কি চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়, আমি বুঝি না। Island is a piece of land surrounded by water সমস্ত রাত্রি জাগিয়া মুখস্থ করিতেছে, অথচ একটি অক্ষরও বুঝে নাই। যদি বাঙ্গালাতে বলি যে, একখণ্ড ভূমির চারিদিকে জল থাকিলে তাহাকে দ্বীপ বা island বলে, এবং তাহা একটি নক্সায় দেখাইয়া দিই, সে তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে, এবং চিরদিন উহা তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অঙ্ক বাঙ্গালায় শিশুদের শিক্ষা দেওয়া কত সুবিধা, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। এন্ট্রান্সে যে দেশের ইতিহাস নির্ব্বাচিত হয়, তাহার একটা সরল বাঙ্গালা ইতিহাস নিম্ন শ্রেণীতে পড়িয়া, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজীতে তাহার পর সেই ইতিহাস শিক্ষা করিতে কত সুবিধা, তাহা আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। মোট কথা, আমি চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত

ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষা (Second language) করিয়া সমস্ত বিষয় বাঙ্গালায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

ব্যায়ামের ব্যবস্থাও কিছু নূতন রকমে করিয়াছিলাম। মধ্যে এক ঘণ্টা কাল বিশ্রামের (Recreation) জন্য প্রত্যহ সময় দিয়াছিলাম। শীতকালে এই বিশ্রামসময়ে এবং স্কুলের পর ছেলেরা 'ক্রিকেট' খেলিত। তাহার জন্য আমি Great Eastern Hotel (গ্রেট ইষ্টারণ হোটেল) হইতে ভাল ব্যাট্‌বল, লেগিং (পায়ের চর্ম্মাবরণ) ও দস্তানা আনাইয়া দিয়াছিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বড় ও ছোট ছেলেরা দুইভাগে খেলিত। গ্রীষ্মের ও বর্ষার সময়ে সেরূপ খেলিবার সুবিধা হইত না। অতএব বিশ্রামসময়ে ছেলেরা গৃহে আমাদের দেশীয় মতে বুকডন ইত্যাদি করিত। এই খেলা ও ডনের সময়ে শিক্ষকদের থাকিতে হইত। এ কারণে এক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় শিক্ষকেরা বিশ্রামের সময়ে ও স্কুলের পর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আমাদের কত কিছু শিক্ষা দিতেন এবং তাহার পর খেলার সময়ে উপস্থিত থাকিয়া কত উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সেরূপ শিক্ষক স্বপ্ন হইয়াছে। এখন যাঁহারা শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় উহা একটা 'বেগার' কার্য্য বলিয়া মনে করেন। কোনমতে দিনটা গণাইতে পারিলে হয়। ছাত্রদের অসচ্চরিত্রের এবং শিক্ষকদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের কথা এখন প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না হইবে কেন? শিক্ষকের যদি ছাত্রের প্রতি সুদৃষ্টি ও সহানুভূতি না থাকে, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা থাকিবে কেন? একদিন হেডমাষ্টার আমাকে বলিলেন যে, ছাত্রেরা ব্যায়াম করিতে চাহে না। তাহারা বলে—খেসারির ডাল খাইয়া কি ব্যায়াম করা যায়? আমি বুঝিলাম যে, এই ওস্তাদি তাঁহার নিজের। আমি সে আপত্তি অগ্রাহ্য করিলাম। পরদিন কোর্টে একদল ছাত্র এক দরখাস্তহস্তে উপস্থিত। তাহাতে লেখা আছে যে, তাহারা ব্যায়াম করিতে পারিবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেন পারিবে না?" উত্তর—"খেসারির ডাল খাইয়া কি ব্যায়াম করা যায়?" আমি বলিলাম—"বটে! আচ্ছা, খেসারির ডাল খাইয়া বেত খাইতে পারা যায় কি না আমি দেখিব।" কোর্টের বেত্রাঘাতের ত্রিকোণ কাষ্ঠ আনিতে আমি আর্দালিকে আদেশ করিলাম। ছাত্রেরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, এবং মোক্তার আমলারা চমকিয়া উঠিলেন। কাষ্ঠখানি কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, প্রত্যেক ছেলেকে কুড়ি বেত দেওয়ার আদেশ দিলাম। তাহারা চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমার কোর্টের মোক্তার আমলারা, এবং দীঘির অপর পার হইতে মুন্সেফের উকিল আমলারা আসিয়া দোহাই দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, যখন আমার কোর্টের সম্মুখে আসিয়া পর্য্যন্ত এমন কথা বলিয়াছে, তখন আমি কখনও এই দুর্ব্বিনীত ছাত্রদিগকে ক্ষমা করিব না। তখন তাহারা কাঁদিয়া বলিল যে, এ কথা বলিতে এবং দরখাস্ত দিতে হেডমাষ্টার মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি এ দরখাস্ত লেখাইয়া দিয়াছেন। ছাত্রদের ব্যায়াম করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। স্কুলের ব্যায়ামের সময়ে শিক্ষকদের থাকিতে হয় বলিয়া, তাঁহারা এই ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছেন। অভিভাবকেরা বলিলেন, তাঁহারা ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না। ছেলেদের এমন হিতকর কার্য্যে কেহ প্রতিবন্ধকতা করিবে না। আমি তখন ছেলেদের সাবধান করিয়া বিদায় দিয়া, হেডমাষ্টারকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করিয়া, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফেনী ত্যাগ করিতে আদেশ প্রেরণ করিলাম। সন্ধ্যার সময়ে প্রধান উকিল মোক্তারেরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার গৃহে উপস্থিত। তিনি অধোবদনে কাঁদিয়া আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আমি ভদ্রলোকদের অনুরোধে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বলিলাম, তিনি ভবিষ্যতে যদি এরূপ ব্যবহার করেন, আমি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ডিরেক্টরকে জানাইব, যেন তিনি গবর্ণমেণ্টের কোনও কার্য্য না পান। বলা বাহুল্য, তাহারপর হইতে আমি যে কয় বৎসর ফেনী ছিলাম, খেসারির ডাল খাইয়া বেশ ব্যায়াম চলিয়াছিল। দেখিতে

দেখিতে ছেলেদের স্বাস্থ্য এত ভাল হইল যে, তাহাদের—তন্মধ্যে আমার পুত্রের স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তি দেখিলে মনে আনন্দ হইত।

এই সকল নিয়মের ফলে সামান্য বেতনের শিক্ষকের সাহায্যে ফেনী স্কুলের ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পর্য্যন্ত পাইয়াছিল। সেই কৃষকের দেশে, যেখানে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর ভদ্রলোকের সংখ্যা অতি অল্প, এরূপ ফল আশাতীত। স্কুলের এরূপ সুনাম বাহির হইয়াছিল যে, অন্যান্য এণ্ট্রান্স স্কুলের ছাত্রেরা এই স্কুলে আসিতেছিল। শুধু তাহা নহে, পূর্ব্ববঙ্গের স্বনামখ্যাত স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু দীননাথ সেন পরিদর্শনে আসিয়া এ সকল নিয়মাবলী ও আমার কার্য-প্রণালী দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছিলেন। আমি শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তিনি প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালীর একজন সারথি হইলেও তিনি উহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এতদূর বিরোধী যে, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার একমাত্র শিশু পুত্রকে কোনও স্কুলে পড়িতে দেন নাই। বাড়ীতে শিক্ষক রাখিয়া তিনি আমার প্রণালীমতে শিক্ষা দিতেছেন। আমি বলিলাম যে, এ ব্যবস্থা মন্দ নহে। তিনি প্রত্যহ লক্ষ শিশুর মুণ্ডপাত করিতেছেন, অথচ এই শিশুমেধ যজ্ঞ হইতে আপনার পুত্রকে সরাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, তিনি কি করিবেন। শিক্ষা প্রণালীতে তাঁহার হাত নাই। উহার পরিচালনে মাত্র তাঁহার অধিকার। তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রকেও রামায়ণ পড়িতে দিয়াছেন, এবং যেরূপ বাদ দিয়া আমি পড়াইতে দিয়াছি, সেরূপ একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রামায়ণ আমি ছাপিলে শিশুদের বড়ই উপকার হইবে। তাহাদের চরিত্র গঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার এমন বহি আর নাই। আমি বলিলাম, শিক্ষাবিভাগে উহা পাঠ্য না করিলে সাধারণ লোক উহা অঙ্গহীন রামায়ণ বলিয়া কিনিবে না। অথচ মুদ্রাঙ্কনে বহু ব্যয় হইবে। তিনি বলিলেন, আমি একখানি বহি ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া পাঠাইলে তিনি উহা ছাপাইয়া দিবেন। সর্ব্বশেষ আমার নিয়মাবলীর একখণ্ড প্রতিলিপি তিনি চাহিলেন। আমি বলিলাম, যখন যে নিয়ম আবশ্যক বোধ হইয়াছে, আমি তখন উহা লিখিয়া পাঠাইয়াছি। একস্থানে সমস্ত নিয়ম নাই। তিনি বলিলেন যে, আমার সমস্ত নিয়ম সঙ্কলন করিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত হেডমাষ্টারদের আহ্বান করিয়া, এক সভাতে উহাদের আলোচনা করিয়া, সমস্ত স্কুলে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিবেন। ঢাকা ফিরিয়া গিয়া আমাকে তাগিদ দিতে লাগিলেন। তখন আমি সমস্ত নিয়মগুলি সঙ্কলন করিয়া পাঠাইলাম। তিনি সেই গ্রীষ্মের অবকাশে পূর্ব্ববঙ্গের হেড-মাষ্টারদের ঢাকায় আহ্বান করিয়া, বহুদিন যাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহাদের আলোচনা করেন। যাঁহারা বহুদিন যাবৎ শিক্ষকতা করেন, তাঁহারা একপ্রকার রামপ্রসাদের 'চোকবাঁধা বলদের মত' এক পথই মাত্র দেখেন এবং সেই পথেই ঘুরিতে থাকেন। সেই পথ প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী। তাহার বাহিরে তাঁহারা কিছুই দেখেন না এবং দেখিতে চাহেনও না। তথাপি তাঁহারা আমার কোন কোন নিয়ম অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে দীননাথবাবু ডিরেক্টরের কাছে এক রিপোর্ট করিলেন, এবং তাহার এক নকল আমার কাছে প্রেরণ করিলেন। তাহার পর সেই রিপোর্টের কি হইল জানি না। দীননাথবাবুও কিছুদিন পরে পূর্ব্ববঙ্গকে একটি অমূল্য রত্নহীন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার মত সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা না হউক, শক্তিসম্পন্ন মনস্বী ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই

৬। দীঘিসংস্কার

ফেনীর 'রাজাঝি'র বা 'রাজনন্দিনী'র দীঘির জল এমন চমৎকার ছিল যে, একজন রাজসাহীনিবাসী ইন্‌স্‌পেক্টর আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁহার সমস্ত পরিবার ম্যালেরিয়া রোগে কঙ্কালশেষ হইয়া, ফেনীতে আসিয়া, কেবল এই দীঘির জল খাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণেরও সেরূপ ধারণা ছিল। আমিও প্রায়

আট বৎসর ফেনী ছিলাম, কিন্তু কখনও মাথাব্যথা পর্য্যন্ত আমার, কি আমার পরিবারবর্গের হয় নাই। অন্য স্থান হইতে পীড়িত হইয়া কেহ ফেনী আসিলে সেই জলেই ভাল হইয়া যাইত। কি পুণ্যবতীই এই দীর্ঘিকা খনন করিয়াছিলেন! চারি দিকের গ্রামের ও ট্রাঙ্ক রোডের যাত্রী শত শত লোক প্রত্যহ তাহার জল পান করিত। উহা ফেনীর জীবন ও শোভা, উভয় বলিলেও হয়। কিন্তু বহু পুরাতন দীঘি বলিয়া তাহার জল গ্রীষ্মের সময়ে বড়ই কমিয়া যাইত। এ জন্য তাহার সংস্কার আবশ্যক হইয়াছিল। আমি দেখিলাম যে, এই বিস্তৃত সরোবরের সংস্কার করিতে অন্যূন পাঁচ হাজার টাকা লাগিবে। কিন্তু ফেনীর জন্য এত টাকা চাহিলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্যগণ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বসিয়া থাকিবেন। অতএব আমি প্রথমে কেবল আঠার শ টাকার এষ্টিমেট পাঠাইলাম। এবং একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর তাহা মঞ্জুর করাইলাম। এই কার্য্য শেষ হইবার সময়ে রিপোর্ট করিলাম যে, আর দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া আরও এক ফুট না কাটাইলে এই আঠার শ টাকা জলে গেল। এ টাকাও তাঁহারা বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর তিক্তমুখে মঞ্জুর করিলেন। উহা নিঃশেষ হইবার সময়ে আবার রিপোর্ট করিলাম, আরও এক হাজার টাকা না দিলে এই আটত্রিশ শ টাকা জলে গেল। নোয়াখালি অঞ্চলে একরূপ গাজীর গান আছে, তাহার নাম 'চৌধুরীর লড়াই'। নোয়াখালির এক চৌধুরী জমিদার ত্রিপুরা রাজবংশের এক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; ইহা তাহারই 'ইলিয়ড' বা রামায়ণ। এ প্রস্তাব লইয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেও একটা 'চৌধুরীর লড়াই' হইল। স্বয়ং ইংরাজ কলেক্টর-চেয়ারম্যান পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষের সেনাপতি। আমি অভিমন্যুর মত একবারে সপ্ত রথীর দ্বারা আক্রান্ত হইলাম। প্রশ্ন হইল, তিন বার এষ্টিমেট না পাঠাইয়া আমি প্রথম বারেই কেন পাঁচ হাজার টাকার এষ্টিমেট দেই নাই? উত্তর—আমি ত সর্ব্বজ্ঞ নহি, এবং একজন বিরাট্ ইঞ্জিনিয়ারও নহি ; মৎস্যও নহি যে, জলের নীচের মাটির অবস্থা আমি দেখিব। দিব্য চক্ষুও আমার নাই। আমি কেমন করিয়া জানিব যে, এত টাকা লাগিবে? চেয়ারম্যান চটিয়া বলিলেন যে, আমি সকল কার্য্যে কূটনীতি খাটাইয়া থাকি। আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, তাহা হইলে আমি ইংরাজরাজমন্ত্রী হইবার উপযুক্ত। তিনিও হাসিলেন। তাহার পর আমি দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি কেবল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নহেন, আপনি কলেক্টর-ম্যাজিষ্ট্রেট ও আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী। আপনার ও আমার মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ শোভা পায় না। আপনি মধ্যস্থের মত থাকিয়া এই মেম্বর মহাশয়দের আমাকে আক্রমণ করিতে দেন। আমি যদি তাঁহাদের পরাস্ত করিতে না পারি, আপনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবেন।" তিনি এই ভর্ৎসনায় নরম হইয়া চুপ করিলেন। তারপর আমি তীব্র শ্লেষাস্ত্রে অপর রথীদিগকে ধরাশায়ী করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা তর্কে পরাভূত হইলেও আর টাকা মঞ্জুর করিবেন না। আমি বলিলাম, তাহাতে আমার কিছু আপত্তি নাই। ফেনীর দীঘি আমি ফেনী হইতে বদলি হইলে পকেটে করিয়া লইয়া যাইব না। গরিব করদাতাদের আটত্রিশ শ টাকা যদি তাঁহারা জিদ করিয়া ফেনী নদীর জলে নিক্ষেপ করেন, এবং দীঘিটি এই অবস্থায় রাখেন, উহা তাঁহাদেরই একটা সৎকীর্ত্তি বলিয়া চিরদিন পরিচিত হইবে। তখন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারকে ডাক পড়িল। ইনি আমার একজন বিশেষ বন্ধু এবং তিনিই আমার কথামতে এ সকল এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, কত টাকাতে এরূপ একটা পুরাতন দীঘির সংস্কার হইতে পারিবে তাহা পূর্ব্বে বলা অসাধ্য ছিল। কাজ হইতে হইতে ইহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। আর এক হাজার টাকার কার্য্য না হইলে দীঘিটি বড় শোচনীয় ও হাস্যকর অবস্থায় থাকিবে। তখন চেয়ারম্যান বলিলেন—"আচ্ছা, এই এক হাজার টাকাও মঞ্জুর করা যাউক। কিন্তু যদি নবীনবাবু আর খুনাখুনিও করেন, আর টাকা আমরা দিব না। এই টাকার দ্বারা কার্য্য শেষ করিতে হইবে।" আমি দীর্ঘ ধন্যবাদ দিলাম। কেবল টাকা পাইলাম তাহা নহে, তাহার সঙ্গে একটা 'ডিনার'ও পাইলাম।

চেয়ারম্যান মিঃ মেকফারসন মনে করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কূটনীতি কথায় চটিয়াছি। মিটিংএর পর উঠিয়া যাইতে আমাকে বলিলেন যে, আমাকে সে দিন থাকিয়া, রাত্রিতে তাঁহার সঙ্গে ডিনার খাইয়া যাইতে হইবে। নোয়াখালির প্রায় সমস্ত ইংরাজ কলেক্টরই আমাকে এরূপে নিমন্ত্রণ করিতেন, এবং আমার প্রতিনিমন্ত্রণ ফেনীতে গ্রহণ করিতেন। দীঘির সংস্কারকার্য্য শেষ হইল। বহুকালের শেওলা ইত্যাদি উন্মূলিত হইয়া দীঘির জল এমনই নির্ম্মল হইল ও তাহার এমনই শোভা হইল যে, তাহা দেখিলে প্রাণ শীতল হইত।

এরূপে নিজ ফেনীর সৃষ্টিপ্রকরণ শেষ হইল। ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে জঙ্গলাবৃত এবং শেওলাসমাচ্ছন্ন একটি দীঘিসর্ব্বস্ব যে ফেনী আমি পাইয়াছিলাম, ডাকবাংগলার সম্মুখে ইংরাজ পরিদর্শক অশ্ব বা গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই ফেনী দেখিয়াই বলিলেন—"O what a charming place!"—কি সুন্দর স্থান! ইতিমধ্যে তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। দীঘির সলিলসীমায় যে সকল নারিকেল ও পাড়ে এবং তদ্বহির্ভাগে, স্কুলে ও বাজারে যে সকল ঝাউ-মিশ্রিত ফলফুলবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম, তাহারা এখন মাথা তুলিয়া সমস্ত স্থানটিকে একটি নবজাত উপবনের শোভা প্রদান করিয়াছে। প্রথমতঃ কমিশনর লায়েল সাহেব আসিয়া সমস্ত স্থান বেড়াইয়া দেখিয়া আনন্দে শতমুখে আমার কার্য্যের ও রুচির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি বিভিন্ন আকৃতির এতগুলি বাঁশের গৃহ দেখিয়া আমাকে বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি এরূপ গৃহ কি কোথাও দেখিয়াছিলাম? উত্তর—এরূপ বাঁশের ঘর ত আর কোথায়ও নাই। কোথায় দেখিব? তিনি বলিলেন যে, ডেপুটি মাজিস্ট্রেট না হইয়া আমার ইঞ্জিনিয়ার বিভাগে যাওয়া উচিত ছিল। সর্ব্বশেষ স্কুল দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এরূপ একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে এক টাকশাল টাকা (mint of money) কোথায় পাইলেন?" আমি—"আপনি কত টাকা ব্যয় হইয়াছে, মনে করেন?" তিনি—"বিশ হাজার টাকার কম এরূপ একটা গৃহ হইতে পারে যে, আমি ত বিশ্বাস করি না।" আমি বলিলাম যে, জমি, গৃহ, পুষ্করিণী, উদ্যান, সকল মিলিয়া নয় শ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছে। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের সহিত চাহিয়া রহিলেন। আমি—"আপনি গৃহটি পাকা মনে করিতেছেন?" তিনি আবার বিস্ময়ে—"তা নহে ত কি?" আমি—"উহা মাটির নির্ম্মিত।" "মাটি!" বলিয়া তিনি আরও বিস্মিত হইলেন। "মাটির এমন সুন্দর ঘর হইতে পারে?" আমি বলিলাম—"আপনি লাঠির দ্বারা দেয়াল খোঁচাইয়া দেখুন।" তিনি দেখিলেন, সাদা চূণের বর্ণের অভ্যন্তরে মাটি। তখন পিলারশ্রেণীর দিকে চাহিয়া, তাহাদের সেই সুগোল গঠন, সেই প্রসারিত কার্ণিস এবং সিমেণ্টের মত বর্ণ দেখিয়া বলিলেন—"অন্ততঃ এগুলি সিমেণ্টের। আমি—"আমি এত টাকা কোথায় পাইব। এগুলিনও মাটির।" এবার তিনি অবিশ্বাস করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তিনি যখন লাঠির অগ্রভাগ দিয়া পরীক্ষা করিয়া মাটি দেখিলেন, তখন তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার পর উদ্যান, বৃক্ষস্তবক, ক্রীড়াঙ্গন, এবং সর্ব্বশেষ স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া কতই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে আমার ছেলের মুখে একটা ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি শুনিয়া, স্কুলে ইংরাজ শিক্ষক কেহ আছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ নাই শুনিয়া, আমার ছেলের ইংরাজী উচ্চারণের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া, তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং কত আদর করিলেন। হায়! সেই সকল সহৃদয় ইংরাজ আজ কোথায়?

তাঁহার বিদায়ের সময়ে মেনসন্ কমিশনর হইয়া ফেনী দর্শন করিতে আসেন। মিঃ কুকের পূর্ব্বে তিনি নোয়াখালির কলেক্টর ছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে দীঘির কোণায় আসিয়াই বিস্ময়ের সহিত চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমি কি ফেনী দেখিয়া গিয়াছিলাম, আর আজ কি ফেনী দেখিতেছি! আপনি কি কোনও ইন্দ্রজাল জানেন? আপনি কেমন করিয়া

এত অল্পকালের মধ্যে ইহার এই অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটাইলেন? আমি চট্টগ্রামে আপনার কার্য্যের কথা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু ফেনীর যে এরূপ বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমি কখনও মনে করি নাই।" তিনি অন্যান্য সাহেবদের ন্যায় এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া ফেনী দেখিতে চাহিলেন এবং যতই দেখিতে লাগিলেন, মায় তালবৃক্ষের যে জলপ্রণালী বসাইয়াছি, তাহা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, আমার প্রত্যেক কার্য্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমার 'এজলাসে' আসিয়া বসিয়া পরিদর্শনকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি কাগজপত্র দেখিবেন কি, স্থিরনেত্রে সরোবরের সলিলের দিকে চাহিয়া আছেন। গভীর নীলামৃতবৎ সলিলরাশি শীতসমীরণে ঈষৎ লহরী তুলিয়া নাচিতেছে, এবং রবিকরে কি শান্ত মহিমার হাসি হাসিতেছে! সলিলবক্ষে স্থানে স্থানে আমার পালিত নানাবিধ মরালদল বিচিত্র কুসুমরাশির মত ভাসিতেছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া কলকণ্ঠে দীর্ঘিকা পূর্ণিত করিতেছে। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার 'রাজবালা' তরণী (life boat) হিল্লোলে ভাসিতেছে, নাচিতেছে। একটি লোক তাহা ভাসাইয়া, সরোবরের বক্ষে যে সকল পত্র-তৃণাদি বাতাসে উড়াইয়া ফেলিয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিতেছে। তীরস্থিত নারিকেল-তরুশ্রেণীর শীর্ষ শ্যাম চামরের মত মৃদুমন্দ অনিলে ঈষৎ দুলিতেছে। তিনি দেখিতেছেন, আর যেন কি এক বিষাদে তাঁহার নেত্র সিক্ত হইয়া আসিতেছে। পরে শুনিলাম যে, তিনি শেষ বারে যখন ফেনীতে আসেন, তখন তাঁহার স্ত্রী সঙ্গিনী ছিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে চট্টগ্রামে হারাইয়া শোকে বড়ই অভিভূত হইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই স্মৃতিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইতেছিল। আমি তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার এজলাস তাঁহার কেমন লাগিতেছে। তিনি যেন স্বপ্নোত্থিতবৎ উত্তর করিলেন—"আমি এমন সুন্দর এজলাস, এবং তাহার সম্মুখে এমন মনোহর দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই।" পরিদর্শনের পর আমি তাঁহাকে অনেক করিয়া ফেনী থানার 'পরিদর্শনকক্ষে' থাকিতে অনুরোধ করিলেও তিনি থাকিলেন না। তখন পাবলিক ওয়ার্কের বাঙ্গলা দেওয়ানগঞ্জে ছিল। তিনি সেখানে যাইবেন বলিলেন। আমি তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিলাম না। কারণ, থানার পরিদর্শনকক্ষ আমি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলাম। যাইবার সময়ে তিনি আমার কার্য্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার 'প্রোমোশনে'র সময় নিকট হইয়াছে। যদি তিনি আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এক লাইন চীফ সেক্রেটারীর কাছে লিখিলে আমি উপকৃত হইব। তিনি বলিলেন—"আমি নিশ্চয় বাঙ্গলায় গিয়াই চীফ সেক্রেটারীকে পত্র লিখিব, এবং আপনি এখানে কি যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা জানাইব। যদি এমন কার্য্যক্ষম ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী 'প্রোমোশন' না পায়, তবে তাহা গবর্ণমেণ্টেরই কলঙ্ক।" পরে শুনিলাম যে, তিনি কিছুই আহার না করিয়া, সমস্ত রাত্রি সেই বাঙ্গলায় কেবল রোদন করিয়াছিলেন। কারণ, শেষ বার ফেনীতে আসিয়া সস্ত্রীক সেই বাঙ্গলাতেই ছিলেন। এমন পত্নী-প্রাণ পতি অল্পই দেখিয়াছি। চট্টগ্রামে তাঁহার পত্নী-বিয়োগের পরও তিনি বহু বৎসর কলেক্টর ছিলেন। তিনি প্রত্যেক রবিবার পুষ্পের দ্বারা তাঁহার পত্নীর কবরের পূজা করিতেন, এবং তাহার উপর মস্তক রাখিয়া রোদন করিতেন। তাহার পর তিনি ফেনীর পূর্ব্বাবস্থা ও বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিয়া প্রায় দশ বার পৃষ্ঠা পরিদর্শনমন্তব্য লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে আমার বড়ই প্রশংসা করিয়াছিলেন।

নোয়াখালির জজ মিঃ গন্ (Gun) একবার 'ক্যামেরা' আনিয়া ফেনীর নানা স্থানের ও আমার গৃহের ফটোগ্রাফ তুলিয়া লইয়াছিলেন। তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে, অবশেষে আমার ও আমার পুত্রের ফটো পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ছুটির সময়ে তাঁহার স্থলে একবার আমার বন্ধু মিঃ আহমদ জজ হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, ফেনী ছাড়িয়া তাঁহার নোয়াখালিতে যাইতে ইচ্ছা করিত না। তিনি একবার আসিলে কয়েক

দিন না থাকিয়া যাইতেন না। সমস্ত অপরাহ্ন ও রাত্রি দশ এগারটা পর্য্যন্ত আমার গৃহে কাটাইতেন। দুইটি বেহালার সঙ্গে নির্ম্মল গান করিত। সে আট নয় বৎসরের শিশু মাত্র। তিনি তাহার শিশুকণ্ঠের গান শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন, এবং প্রত্যেকটি গানের পর তাহাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন করিতেন। কখনও বা রাত্রিতে দীঘিতে নৌকা ভাসাইয়া গায়কদের গাইতে ও বাজাইতে আদেশ করিতেন, এবং ডাকবাঙ্গলায় কিম্বা আমার গৃহে বসিয়া সে সঙ্গীত শুনিতেন। কখন বা তিনি ও আমি নৌকায় ভাসিয়া ভাসিয়া পাড়স্থিত সঙ্গীত শুনিতাম। কি আনন্দেই রাত্রি গভীর হইতে গভীরতরা হইয়া উঠিত, উভয়ের কেহ টের পাইতাম না। এরূপে আরও কত বন্ধু ফেনী দেখিতে, এবং কবি কিরূপে থাকে, তাহা দেখিতে আসিতেন। দেখিতে দেখিতে আমার গৃহখানি চারি দিকে পুষ্পোদ্যান এবং লতায় ক্রোটনে সজ্জিত হইয়া এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, উহাকে দেখিলে বৈষ্ণব কবিদের একটা কবিতা মনে পড়িত।

"লতার উপর লতার বাঁধনি,
তাহার উপরে ফুল।
ফুলের উপরে ভ্রমরা গুঞ্জরে,
কালায় মজাল কুল॥"

একবার এক মাসের জন্য চট্টগ্রাম হইতে এলেন সাহেব (C. G. H. Allen) নোয়াখালির কলেক্টর হইয়া আসেন। ইনি এখন কলিকাতা করপোরেশনের চেয়ারম্যান। ইনি নোয়াখালি পৌঁছিয়াই, একদিন হঠাৎ দুই প্রহর রৌদ্রে ফেনীতে উপস্থিত। পূর্ব্বে কোনও খবর দেন নাই। আমি সংবাদ পাইয়া ডাকবাঙ্গলায় যাইয়া দেখি, তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন মাত্র। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, তিনি আফিস পরিদর্শন করিতে আসেন নাই। তিনি ফেনীর ও ফেনী-নির্ম্মাতার এত প্রশংসা শুনিয়াছেন যে, তিনি উভয়কে একবার দেখিতে মাত্র আসিয়াছেন। তাঁহার এত আগ্রহ যে, তিনি আমার নিষেধ না শুনিয়া ও এক মিনিটও বিশ্রাম না করিয়া, সেই মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ফেনী দেখিতে চলিলেন। প্রথম গৃহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এটি আপনার গৃহ?" উত্তর—"না, উহা আমার আফিস।" দ্বিতীয় গৃহ দেখিয়া—"এটি আপনার গৃহ?" উত্তর—"না, উহা ট্রেজারি।" তৃতীয় গৃহ দেখিয়া—"এটি আপনার গৃহ?" উত্তর—"না, উহা পুলিস ষ্টেশন।" অবশেষে উত্তর পাড়ের মধ্যস্থলে গিয়া বলিলেন—"এটি নিশ্চয় আপনার গৃহ।" উত্তর—"হাঁ।" প্রশ্ন—"আমি গৃহখানির অভ্যন্তর একবার দেখিতে পারি কি?" উত্তর—"আমি তাহাতে পরম সম্মান মনে করিব।" তখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন, এবং বহুক্ষণ আমার এই গোল বারাণ্ডায় বসিয়া, বিস্তীর্ণ সরসী-শোভা দেখিয়া দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ ও প্রশংসা করিলেন। তাহার পর উঠিয়া স্কুল দেখিতে যাইতে দীঘির উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় একটি বিশাল বটবৃক্ষ, একটি গোলাকার উচ্চ মৃত্তিকাবেদির উপর দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বৃক্ষটি অতি পুরাতন। পাড়ের মাটি কাটিয়া নীচু করিবার সময়ে আমি বৃক্ষটি না কাটিয়া তাহার চারি দিকের মাটি গোলাকার করিয়া রাখিয়া দিয়াছি, এবং মাটির বেদিকার গায়ে দুর্ব্বা লাগাইয়া দিয়াছি। দেখিলে বৃক্ষতলস্থ বেদিটি যেন শ্যাম গালিচাসমাচ্ছন্ন বোধ হইত। বৃক্ষের ডালে বহুবিধ বিহঙ্গেরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং ডালে ডালে মধ্যাহ্ন-ছায়ায় বসিয়া গান করিতেছে। তিনি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া, বৃক্ষতল ও বৃক্ষবেদিকার শোভা দেখিলেন, এবং বলিলেন যে, এত ক্ষণে একটি বিষয় অপূর্ণ রাখিয়াছি বলিয়া তিনি বলিতে পারেন। যদি এই বেদির উপরিভাগ প্রস্তরখণ্ডে সাজাইয়া, তাহাতে 'ফারন' (fern) লাগাইয়া দিতাম, তবে এই স্থানটির কি শোভাই হইত! আমি বলিলাম, পাথর কোথায় পাইব? তিনি দূরস্থ পর্ব্বতমালা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

উহাতে কি পাথর (rock) নাই আমি বলিলাম—থাকিলে আপনি নিশ্চয় এ অভাব অনুভব করিতেন না। সমস্তই মাটির পাহাড়। তাহাতে 'ফারন্' (fern)ও নাই। এই বলিয়া আমি বলিলাম যে, এখানেই ইউরোপিয়ান ও বাঙ্গালীর পার্থক্য। তিনি বলিলেন, তিনি বুঝিলেন না। আমি বলিলাম, কোনও স্থানে কখনও যদি একজন ইউরোপিয়ান কিছু দিন বাস করিয়া থাকেন সে স্থানটি দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। সে স্থানটির একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্য ও শ্রী থাকে। তিনি বলিলেন—"তাহা জানি না। কিন্তু আমি এ কথা বলিতে পারি যে. এ স্থানটি কোনও ইউরোপিয়ান ইহার অপেক্ষা সুন্দর করিতে পারিত না।" তাহার পর স্কুল দেখিয়া তিনিও লায়েল সাহেবের মত চমৎকৃত হইলেন। তাহার সমস্ত বিষয়ের কতই প্রশংসা করিলেন। ফিরিয়া রাস্তার উপর আসিয়া বলিলেন—"কই আমি আপনার ছেলেকে ত দেখিলাম না। আমি তাহাকে না দেখিয়া যাইব না।" আবার ফিরিয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিলেন। হেডমাষ্টার আমার শিশু পুত্রকে ডাকিয়া দিলে, তাহাকে কোলে লইয়া কত আদর করিলেন, এবং বলিলেন—"আমি ইচ্ছা করি, তুমি তোমার পিতার যোগ্য পুত্র হইবে।" ইঁহার মহত্ত্বের কথা পরে আরও বলিব। এরূপে যিনি ফেনী আসিতেন, তাঁহারই মুখে স্থানটির প্রশংসাস্রোত বহিত। সেনিটারি কমিশনর আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"আপনি একটি ক্ষুদ্র নরককে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন।" শ্রীরামপুরবাসী একজন মুন্সেফের ভৃত্য আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার্টিফিকেট দিয়াছিল —"বাপ! এ জায়গার আর সব লোকগুলির কোনও ফুর্ত্তি নাই। যত ফুর্ত্তি এই বাবুটির! এঁর হুকুমে যেন মাটি ফেটে বাড়ী, ঘর, গাছ, বাগান উঠে।"

৭। রাস্তা ও খাল

যখন ফেনী পোঁছিয়া, গোযান হইতে অবতীর্ণ হইয়াই কর্দ্দমে পতিত হইয়াছিলাম, তখন ফেনীর উপরিভাগের রাস্তার অবস্থা সহজে বুঝা যাইতে পারে। কেবল ট্রাঙ্ক রোড ও নোয়াখালির রাস্তা ভিন্ন আর কোনও রাস্তাই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ছাগলগাইয়া রোড ও তস্য শাখা পরশুরাম রোড যাহা ছিল, তাহাতে শীত ভিন্ন অন্য ঋতুতে যাতায়াত অসম্ভব ছিল। তাহাদের প্রস্থতা ও উচ্চতা এরূপ যে, শীত ঋতুতে অশ্বপৃষ্ঠে গমনও আশঙ্কাজনক ছিল। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে, পার্ব্বত্য বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ মাটির উচ্চ বেড়া প্রস্তুত হইয়াছে। পুল নাই কেন, এবং রাস্তা অসংখ্য স্থানে ভাঙ্গা কেন? পার্ব্বত্য বন্যা পুল উড়াইয়া লয় এবং বৎসর বৎসর রাস্তা স্থানে স্থানে ভগ্ন করে। তদ্ভিন্ন রাস্তার দৈর্ঘ্যের এক অর্দ্ধ বন্যাতে প্রত্যেক বৎসর ভাঙ্গিয়া ফেলে। এ সকল কারণে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রায় এ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা এই দুই রাস্তায় ব্যয় করিয়া, এখন উহাদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইয়া হতাশভাবে সন্দেশ খাইতেছেন। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বলিলেন যে, তিনি তাঁহার ও উপরিস্থ কর্ত্তাদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান এই দুই রাস্তার উপর নিঃশেষ করিয়া, এখন 'তোবা' করিয়া বসিয়া আছেন। স্থির করিয়াছেন, পাকা 'কজওয়ে' ভিন্ন এ অঞ্চলে রাস্তা হইতে পারে না, এবং 'কজওয়ে' এত ব্যয়সাধ্য যে, তাহা অসম্ভব। পার্ব্বত্য বন্যার সময়ে আমি নৌকায় গিয়া দেখিলাম যে, রাস্তায় জল অবরুদ্ধ হইয়া তাহার এক পার্শ্বে যেন অনন্তবিস্তার মহাসাগর হইয়াছে। জলে লহরী খেলিতেছে, এবং তাহার আঘাতে স্থানে স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া ভীম গর্জ্জনে ও ভীষণ বেগে জলরাশি ছুটিয়াছে। কিন্তু রাস্তার অন্য পার্শ্বে এক বিন্দু জলও নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে আমার বে-ইঞ্জিনিয়ারী স্থূল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম যে, রাস্তার উচ্চতাই সমস্ত অনিষ্টের কারণ। তাহারই জন্য বন্যার জল নির্গত হইতে না পারিয়া এরূপ এক ভূমধ্যসাগর সৃষ্টি করে, এবং প্রত্যেক বৎসর রাস্তার

এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটাইয়া থাকে। আমি প্রস্তাব করিলাম যে, রাস্তার উচ্চতা খর্ব্ব করিয়া উহার পরিসর ও সেলমি (Slope) বৃদ্ধি করিলে, এবং ভাঙ্গা কয়েক স্থানে মাত্র জলনির্গমের জন্য পুল প্রস্তুত করিলে অতিরিক্ত বন্যার সময়ে বৎসরে দুই একদিন রাস্তার উপর দিয়া জল গড়াইতে পারে, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না। আমার প্রস্তাব শুনিয়া প্রথম ইঞ্জিনিয়ার ও ডিঃ বোর্ডের সভ্যগণ উপহাস করিলেন। বলিলেন, যদি এত সহজে এই দুই রাস্তা রক্ষা করা যাইতে পারিত, তবে তাঁহারা তাহাতে এত অর্থ ধ্বংস করিতেন না। যাহা হউক, আমি উপর্য্যুপরি জিদ করাতে, আমার প্রস্তাব রাস্তার এক অংশে পরীক্ষা করিবার জন্য কিছু টাকা তাঁহারা অনিচ্ছায় মঞ্জুর করিলেন, এবং কার্য্যভার আমার হস্তে দিলেন। সে বৎসর সে অংশের উপর দিয়া বন্যা একদিন মাত্র গড়াইল, কিন্তু আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না। রাস্তার উচ্চতা কম এবং বিস্তৃতি বেশী, এবং বিস্তৃত পার্শ্বের উপর চাপড়া বসান থাকাতে, জল রাস্তার উপর দিয়া গড়াইয়া গেল। তাহাও রাস্তার অন্যাংশ বন্যা অবরোধ করার ফল। ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার বাবুর চক্ষু খুলিল এবং বোর্ডের কর্ত্তাদেরও জ্ঞান চৈতন্য হইল। তাহার পর দুটি রাস্তাকেই এরূপভাবে রূপান্তরিত করিলে, বন্যা দুই এক স্থানে রাস্তা ভাঙ্গিয়া এবং কোনও কোনও স্থান ডুবাইয়া প্রবাহিত হইয়া গেল। রাস্তার কোনও ক্ষতি হইল না। পরের বৎসর ভগ্ন স্থানে ছোট পুল নির্ম্মাণ করিয়া দিলে, আমি যত বৎসর ফেনী ছিলাম, আর কখনও বন্যা রাস্তা ডুবিয়াছিল না, কিম্বা কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে পারিয়াছিল না। রাস্তাও এমন বিস্তৃত ও সুন্দর হইয়াছিল যে, আমি ঘোরতর বর্ষার সময়ে গাড়ীতে তাহার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছি। অথচ এ সকল কার্য্যে অতিশয় সামান্য ব্যয় মাত্র হইয়াছিল। তখন উপহাসের সময় উত্তীর্ণ—ধন্যবাদের সময় আসিল। তাহার পর ছাগলগাইয়ার একজন সম্পত্তিশালী ব্যবসায়ীকে ধরিয়া পঁয়ত্রিশ শ টাকা ব্যয়ে, ছাগলগাইয়া রাস্তার মহুরি নদীর উপর কাষ্ঠের পুল নির্ম্মাণ করিয়া, এই রাস্তাটি সম্পূর্ণ করিলাম। অসম্ভব এরূপে অতি সহজে সম্ভব হইল।

আমার পূর্ব্বে ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা গ্রাম্য রাস্তায় ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু কোনও গ্রাম্য রাস্তার চিহ্নও নাই। যত পুরাতন গ্রাম্য পথ আছে, তাহার উপর বিশ পঞ্চাশ টাকার মাটি বর্ষার পূর্ব্বে এখানে সেখানে দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহা বর্ষার সময়ে ধুইয়া গিয়া পথের অবস্থা পূর্ব্বের মত হইয়াছে। আমি আমার বেহারের প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বৎসর দুই একটি করিয়া প্রকৃত রাস্তা নির্ম্মাণের সংকল্প করিলাম। কিন্তু এখানের লোকের সংস্কার, বাড়ীর কাছে রাস্তা হইলে বাড়ী 'বেপর্দ্দা' হইয়া যায়। ফেনী আসিয়াই প্রথম শিবিরে যাইতে যে পথে বহু আছাড় খাইয়াছিলাম, প্রথমতঃ সে রাস্তাটি প্রস্তুত করিলাম। একটি লোকের বাড়ীর কাছে রাস্তার কার্য্য আরম্ভ হইলে, সে রাস্তার লাইনের উপর চিত হইয়া পড়িল, এবং বলিল, তাহার গলা না কাটিলে, সেখানে রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে পারিব না। কোনওরূপে বুঝাইয়া না পারিয়া, অগত্যা তাহাকে মড়ার মত সেখান হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। রাস্তা প্রস্তুত হইল। কেবল তাহার বাড়ীর নিকটে একটা ছোট পুল বাকী আছে। সে একদিন আসিয়া করযোড়ে বলিল—"কর্ত্তা! যদি নালাটার উপর আপাততঃ একটা বাঁশের পুলও দিতে আদেশ করেন, তবে বড় ভাল হয়। নদী হইতে আমার বাঁশগুলিন গাড়ীতে আনিতে পারিতেছি না।" তাহার উপরোক্ত কীর্ত্তির কথা বলিলে সে হাসিয়া বলিল—"কর্ত্তা! উমিলোক বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতেছি, এ রাস্তায় আমাদের কত উপকার হইয়াছে।"

এক গ্রাম্য রাস্তার সঙ্গে আর এক গ্রাম্য রাস্তা যোগ করিয়া, আমি এরূপে চারি দিকে দীর্ঘ দীর্ঘ রাস্তা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। বড় ফেনী নদীর সঙ্গে যেখানে সমুদ্রের সঙ্গম, সেই দিকে প্রায় বার মাইল দীর্ঘ এক রাস্তা এরূপে প্রস্তুত করাইতেছি। দুটি গ্রামের মধ্য-

স্থানে একটা ধানক্ষেতের উপর দিয়া অল্প রাস্তা প্রস্তুত করাইলে পথ সংক্ষেপ ও সোজা হয়। কিন্তু প্রথমতঃ সে দিক দিয়া প্রস্তাব করিলে ধান্যক্ষেত্রের মূল্য না দিয়া উপায়ান্তর নাই। দুটি গ্রাম্য রাস্তা এই ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ও পশ্চিম গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আমি এই দুইটাতে নিশান পুতিয়া দিলাম। একটা ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব-গ্রামবাসীরা বলে, পশ্চিম গ্রামের রাস্তাই প্রচলিত রাস্তা, এবং পশ্চিম-গ্রামবাসীরা এ বিপদ পূর্ব্বগ্রামের ঘাড়ে ফেলিতে চাহে। আমি একের বিপক্ষে অন্যকে এরূপে খেলাইতে লাগিলাম। শেষে বলিলাম, আমি নিরপেক্ষ ভাবে উভয় রাস্তা প্রস্তুত করিব। তখন তাহারা সেই কালাচাঁদ কলেক্টরের কাছে আপিল করিল। তিনি শাসনকার্য্যে একে অপটু, তাহাতে আবার আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বলিয়া লোকের কাছে প্রতিপন্ন হইতে তাঁহার বড় আগ্রহ। লোকের উপর এই ঘোরতর অত্যাচারের জন্য কেন গবর্ণমেণ্টে আমার প্রতিকূলে 'জুলুমবাজ' বলিয়া রিপোর্ট হইবে না, তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম যে, বার মাইল রাস্তা দুই দিকে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কেবল এ স্থানে মাত্র কয়েক চেন প্রস্তুত হইবার বাকী। দুই গ্রামের বিবাদের জন্য পারিতেছি না। তখন আদেশ আসিল—"কলেক্টরকে তাহারা মধ্যস্থ মানে কি না রিপোর্ট করিবে।" তিনি মনে করিয়াছিলেন, তিনি এ বিবাদ মিটাইয়া আমার অপেক্ষা তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি কত শ্রেষ্ঠ, তাহা দেখাইবেন। কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছে কালাচাঁদের প্রতিপত্তি অন্য রকম। তাহারা তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিতে অসম্মত বলিয়া দরখাস্ত দিলে, আমি উহা তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম। তাঁহার যেমন গাল, তেমন চড় পড়িল। লজ্জায় আর কথাটি না কহিয়া তিনি কাগজপত্র চুপে চুপে ফিরিয়া পাঠাইলেন। এখন তাঁহাকে জব্দ করিবার সময় আমার। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, তিনি ত কোনও আদেশ না দিয়া কাগজপত্র ফেরত পাঠাইয়াছেন। আমি এখন এ রাস্তার কি করিব? তিনি লজ্জায় তখন আর একটি কথা না বলিয়া, সশরীরে ফেনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে তাঁহার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া বলিলেন—"তুমি আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়া কর। তুমি সেই রাস্তাটা লইয়া আর গোলযোগ করিও না। তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর।" আমি বলিলাম—"তাঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আমার কি সুখ? তিনি কথায় কথায় প্রকাশ্য চিঠিতে আমাকে গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দেন। এ বারও তাহাই করিয়াছেন। আমি কেমন করিয়া এ গোলযোগ মিটাইব? লোকেরা আমাকে গ্রাহ্য করিবে কেন?" তিনি তখন একবারে মাটি হইলেন, এবং বলিলেন—"দোহাই তোমার, আর আমাকে লজ্জা দিও না।" আমি তাহার পর উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া, তাহাদের মধ্যে খুব একটা লড়াই লাগাইয়া দিলাম। সর্ব্বশেষ বলিলাম, যদি তাহাদের কোনও গ্রাম দিয়া রাস্তা না লইয়া, উভয় গ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে তাহাদের কোন আপত্তি আছে কি না? তাহারা মহাসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—তাহাদের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু ধানক্ষেত দিয়া কেমন করিয়া লইব? তাহারা বলিল—তাহাদের নিজের জমি যাহা পড়িবে, তাহারা ছাড়িয়া দিবে, এবং অন্যের যাহা পড়িবে, তাহারা মূল্য দিয়া পারে, কিম্বা বদল দিয়া পারে, তাহা লইয়া দিবে। তখন সেই মধ্যপথেই রাস্তা প্রস্তুত হইল। বুদ্ধদেবের 'মধ্য পথ' অনেক সময়ে ভাল। জমির মূল্য দিতে হইলে অন্যূন হাজার টাকা দিতে হইত। কিছু দিন পরে যখন আমি অশ্বারোহণে সেই পথ দেখিতে দেখিতে আনন্দে অধীর হইয়া শিবিরে যাইতেছি, অন্য গ্রামবাসীদের ন্যায় এই দুই গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া আমাকে কত কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিল, এবং যাহাতে শীঘ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুলগুলি নির্ম্মিত হইয়া, রাস্তাটি গাড়ী চলার উপযুক্ত হয়, তাহার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, এখন তাহাদের গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা লইলেও তাহারা আপত্তি করিবে না। এত দিনে তাহারা রাস্তার উপকারিত্ব বুঝিয়াছে।

বর্ষার সময়ে ফেনীর মত স্থানে নৌকায় যাতায়াতের বড় প্রয়োজন ও সুবিধা। একটা গাছ কুঁদিয়া এ অঞ্চলে নৌকা প্রস্তুত হয়, তাহাকে 'কোঁদা' বলে। আমি বলিতাম 'কুন্দ-নন্দিনী'। এ সকল 'কোঁদা' চারি আঙ্গুল জলের উপর দিয়াও চলিয়া যায়। বর্ষার সময়ে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়া অবলীলাক্রমে চলে। কিন্তু যেখানে মাঠে এরূপ জল থাকে না, সেখানে চলাচলের জন্য লোকের বাড়ীর ও রাস্তার গড় খালের ও নদীর সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়া আমি দশ পনর মাইল দীর্ঘ নৌকা চলাচলের জন্য খাল খুলিয়া দিয়াছিলাম। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ও ট্রাঙ্ক রোডের এক পার্শ্বের গড় এরূপ খুলিয়া দিয়া, ঠিক রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে 'কোঁদা' চলিবার খাল করিয়া দিয়াছিলাম। বর্ষার সময়ে এ সকল খাল দিয়া চলিতে কি সুবিধা ও আনন্দ বোধ হইত, তাহা আর কি বলিব? ইচ্ছা হয়, নৌকায় বসিয়া প্রকৃতির গ্রাম্য শোভা দেখ। ইচ্ছা হয়, রাস্তায় উঠিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া সেই শোভা দেখ। পূর্ব্বে নৌকাতে নোয়াখালি, কি অন্য কোন স্থানে যাইতে যে সময় লাগিত, তাহার অর্দ্ধেক সময়ে এ সকল খালে যাওয়া যাইত।

ছোট ফেনী নদীর একটি 'বাঁক' ছিল, তাহা নৌকায় ঘুরিয়া আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিত। বাঁকটি ঠিক একটি বেগুনের মত। তাহার বোঁটাটি এক বিঘা জমির বেশী হইবে না। সেরূপ ফেনী সহরের অন্য দিকে 'কতুয়া খালে'রও একটা তদপেক্ষা ছোট বাঁক ছিল। দেখিলাম, এ সামান্য বাঁকগুলি কাটিতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি চাহি। তাহার জন্য লাল ফিতা গলায় বাঁধিয়া কত প্রভুর দ্বারস্থই হইব! আমি চুপে চুপে এই উভয় বাঁকের গলার উপর দিয়া গ্রাম্য রাস্তা প্রস্তুত করিলাম, এবং তাহার সমস্ত মাটি এক পার্শ্ব হইতে তুলিলাম। বর্ষার সময়ে এই রাস্তার গড় নদীর জল ছুটিল, এবং দেখিতে দেখিতে নদী এ পথে প্রবাহিত হইল। আমার এক শ্রীমতী মানিনী ইংরাজ কলেক্টর—ইঁহার কথা পরে বলিব—এই সংবাদ শুনিয়া আমার উপর এক নিশিত শর ত্যাগ করিলেন। তিনি কমিশনরের কাছে রিপোর্ট করিলেন যে, গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া, আমি এই দুটি নদীর বাঁক কাটাইয়া গবর্ণমেণ্টের অবমাননা করিয়াছি। আমার কৈফিয়ৎ সহজ—আমি নদীর বাঁক কাটি নাই। লোকের সুবিধার জন্য গ্রাম্য রাস্তা করিয়াছিলাম মাত্র। নদী স্ব-ইচ্ছায় রাস্তার গড় কাটিয়া বাহির হইয়াছে। আমি কেমন করিয়া তাহার গতি রোধ করিব? কমিশনর তখন লায়েল সাহেব। তিনি কৈফিয়ৎ পড়িয়া না কি একটা "অশ্লীল হাসি" হাসিয়া ফেলিয়া-ছিলেন।

এরূপে এক একটি রাস্তা প্রস্তুত করিয়া ডিঃ বোর্ডের হাতে অর্পণ করিতাম। তাহার প্রত্যেকটি প্রস্তুত করিতে ডিঃ বোর্ডের কেবল জমির ক্ষতিপূরণ দিতেই বহু সহস্র টাকা যাইতে পারিত, অথচ কোন দিন কেহ তাহার জমি সম্বন্ধে কখনও একটি কথা বলে নাই। লোকে ক্রমে ক্রমে রাস্তার ও খালের উপকারিতা এত বুঝিয়াছিল যে, তাহারাও বেহারের লোকের মত নিজে অনেক ক্ষতি সন্তুষ্টির সহিত স্বীকার করিত। শুধু তাহা নহে, এ সকল খাল ও আমার অন্যান্য কার্য্য সম্বন্ধে বেহারের মত এখানেও কত গীত বাউলের সুরে লোকেরা বাঁধিয়াছিল। এ সকল গীত সর্ব্বত্র সবডিভিসনে গীত হইত। যাঁহারা লোকের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ও উৎপীড়ন করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে চাহেন, তাঁহারা কি ভ্রান্ত! এই সকল কার্য্যের ফলে যে ফেনী 'হেড কোয়ার্টারে' প্রথম রাত্রিতে পৌঁছিয়া রাস্তাভাবে কর্দ্দমে পতিত হইয়াছিলাম, সেই ফেনীর সমস্ত উপবিভাগে আমি শেষের কয় বৎসর ঘোড়ার গাড়ীতে সপরিবারে শিবিরে শিবিরে গমন করিয়া বেড়াইয়াছি। ক্রমে ক্রমে সুন্দর সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া, রাস্তার পার্শ্বে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাঙ্গলা প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। তাহার এক একটির চারি দিকে স্থানীয় দৃশ্যাবলী অতুলনীয় ছিল। স্বয়ং কমিশনর একবার শিকার করিতে গিয়া, এক বাঙ্গলায় প্রায় সপ্তাহকাল থাকিয়া, তাহার

কতই প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমার একটি শিবিরের স্থান বড়ই সুন্দর ছিল। তাহার নাম 'আর্মলিঘাটা'। পার্ব্বত্য শৈলমালা ভেদ করিয়া বড় ফেনীনদী যেখানে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে, সেখানেই 'আর্মলিঘাটা'। এখানে একটি অনুচ্চ পর্ব্বত উক্ত নদীতীরে অবস্থিত। তাহার সানুদেশ সমতল। তাহাতে সপ্তাহে একবার পার্ব্বত্য ত্রিপুরা জাতির বাজার বসিয়া থাকে। তাহারা দুট তিন দিনের ব্যবধান হইতে বহু পর্ব্বত বাহিয়া এই বাজারে পার্ব্বত্য কার্পাস ও তরকারি ইত্যাদি বিক্রয় করিতে আসে, এবং বিনিময়ে লবণ, শুষ্ক মৎস্য, ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য লইয়া যায়। বাজারের দিন স্থানটির বড় শোভা হইয়া থাকে। স্থানটি পার্ব্বত্য নর-নারীতে পূর্ণ হইয়া থাকে। রমণীদের বিবিধ বর্ণের স্বহস্ত-নির্ম্মিত পুরু পরিধেয়, এবং অর্দ্ধ-অনাবৃত বক্ষে লাল সালুর বক্ষ-আচ্ছাদনের জবা-কুসুম-প্রভা বাজারের বিচিত্র শোভা বিধান করে। আমি এই পর্ব্বতশিরে আমার শিবির স্থাপন করিতাম। হাটের দিনটা পতি পত্নী পার্ব্বত্য নর-নারীদের সঙ্গে বড় কৌতুকে কাটাইতাম। কখন বা নৌকায় তাহাদের পাড়ায় বেড়াইতে যাইতাম। সরল শৈল-সন্তানদের আদর অভ্যর্থনা কি সরল ও হৃদয়স্পর্শী! আমাদের জটিল সভ্যতা, যাহা পাশ্চাত্যানুকরণে দিন দিন আরও জটিলতর হইতেছে, তাহাদের সরল সভ্যতার পার্শ্বে কি কৃত্রিমই বোধ হইত। ইহাদের হৃদয়ে যেন চির-প্রসন্নতা ও চির-শান্তি বিরাজিত। এডেম এবং ঈভ প্রকৃত অবস্থায় যে বাস্তবিক স্বর্গসুখে ছিলেন, তাহা ইহাদের দেখিলে উপলব্ধি হয়। এই বাজার পর্ব্বতের নীচে। এই বাজারের সুবিধার জন্য ত্রিপুরার মহারাজার পক্ষ হইতে একটি সুন্দর সরোবর কাটাইয়া দিয়াছিলাম। আমি প্রত্যেক বৎসর এখানে পুরা দশ দিন শিবিরে কাটাইতাম। পূর্ব্বে এ স্থান প্রায় অগম্য ছিল। পরে ইহার নিকটেই একটা বাঙ্গলা প্রস্তুত করাইয়াছিলাম।

ঈশ্বর গুপ্ত একবার বড় দেমাক করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"যদ্যপি এ রসে শুনি বিরসের ধ্বনি,
শোব না এ ভবগৃহে, ছোঁব না লেখনী।"

আমার এ 'রসে' আমার সেই মানিনী 'বিরসের ধ্বনি' তুলিয়াছিলেন। আমি গ্রাম্য রাস্তার নাম দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট রাস্তা প্রস্তুত করিতেছি বলিয়া তিনি যে লায়েল সাহেবের কাছে একবার আমার ছুটির সময়ে নালিস করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লায়েল তাহা গ্রাহ্য না করাতে তখন তিনি জিদ করিয়া এ সম্বন্ধে আমার প্রতিকূলে দীর্ঘ দীর্ঘ রিপোর্ট করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা লায়েল লোক্যাল ওয়ার্ক ইন্‌স্‌পেক্টর মিলস্ (Mr. Mills) সাহেবকে তদন্তের জন্য পাঠাইলেন। তিনি আমার কৃত কয়েকটি রাস্তা, খাল ও বাঙ্গলা দেখিয়া, আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া এক দীর্ঘ রিপোর্ট দিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত লিখিলেন যে, এমন সুন্দর ও সুপ্রণালীতে প্রস্তুত গ্রাম্য রাস্তা তিনি আর কোথাও দেখেন নাই।

৮। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে

আমি ফেনী উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের লাইন ফেনীর সাত মাইল পশ্চিম দিক্ দিয়া স্থির হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষীয়দের এই রেলওয়ে মনোনীত না হওয়াতে, উহার নির্ম্মাণ তাঁহারা একরূপ অগ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষম লায়েল সাহেব কমিশনর হইয়া আসিলে আমি এই লাইনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তখন এ সকল স্থান একপ্রকার অজ্ঞাত দেশ ছিল। গোযান এ অঞ্চলে একমাত্র চলাচলের ভরসা। এ গোযানও একপ্রকার সত্যযুগের নিদর্শন বলিলেও চলে। তাহাতে ভ্রমণ জন্মান্তরীণ কুকর্ম্মের ফলভোগবিশেষ। আমি সেই জন্য

কবিকল্পনা খাটাইয়া একখানি চাটাইয়ের পাল্কী প্রস্তুত করিয়াছিলাম। চারি দিকে চাটাইয়ের বেড়া, তাহাতে গবাক্ষ ও দ্বার, এবং গবাক্ষে নীলবর্ণের নেটের পর্দ্দা। জলপথেও চলিবার একমাত্র উপায় কোঁদা ; আমি বলিতাম 'কুন্দনন্দিনী'। একটিমাত্র বৃক্ষ কুঁদিয়া এই নৌকা প্রস্তুত। তাহার উপর বাঁশের 'ছপ্পর'। উহাতে চলা একপ্রকার সিন্দুকের মধ্যে চলা। আমি তাহার জন্যও কবি-কল্পনা-প্রসূত একটি স্বতন্ত্র ছপ্পর প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। সামান্য গোশকটের, কি কোঁদার উপর এই 'ছপ্পর' বসাইয়া বড় আরামে যাওয়া যাইত। আমি জলপথে, কি স্থলপথে, যে দিকে যাইতাম, আমার এই দুই কল্পনা-সৃষ্টি লোকের এত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত যে, আমার এই দুই বংশনির্ম্মিত কাব্যের দ্বারা আমি এ অঞ্চলে অমরতা লাভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, লায়েল সাহেব এ অঞ্চলবাসী-দিগকে বলীবর্দ্দভ্রাতৃযুগলের (Bullock Brothers & Co.) এবং 'লগি'-সঙ্কলিত 'কুন্দনন্দিনী'র মন্থর গমন হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি নিজে একবার বড়ই দুর্ভোগ ভুগিয়াছিলেন। তিনি ফেনী হইয়া কুমিল্লা যাইবেন। ফেনীতে অশ্বারোহণে বেলা নয়টার সময় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বে, কি সঙ্গে ভৃত্যেরা আসে নাই দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তাহারা পশ্চাতে আসিতেছে ; তিনি তাহাদের ফেনী নদীর অপর পারে রাখিয়া আসিয়াছেন। ফেনী নদীর মধ্যে চর পড়িয়াছে, জোয়ারের সময় ভিন্ন গরুর গাড়ী পার হওয়া অসম্ভব। জোয়ারও সে দিন বেলা বারটার পূর্ব্বে সেখানে আসিবে না। তাহার উপর সেই ঘাট ফেনী আফিস হইতে সাত মাইল ব্যবধান। অতএব আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, তাঁহার ভৃত্যেরা দুইটার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিবে না। তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন যে, তিনি হস্তিপৃষ্ঠে ইন্‌স্‌পেক্টর অফ লোক্যাল ওয়ার্ক মিলস্‌ সাহেবকে রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই ভৃত্যগণ সহ আসিয়া পঁহুছিবেন। আমি বলিলাম, তাহা অসম্ভব। কারণ, বিভাগীয় কমিশনরের আদেশে নদীতে জোয়ার আসে না। তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, দেখা যাউক।" দেখা গেল। এগারটা বাজিয়া গেল। আফিস পরিদর্শন করিতেছেন, আর থাকিয়া থাকিয়া তৃষিত চাতকের মত রাস্তার দিকে চাহিতেছেন। কিন্তু মেঘরূপী ভৃত্য-মণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। আমি আবার বলিলাম—"তাহাদের দুইটার পূর্ব্বে পৌঁছিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। আমি কিঞ্চিৎ 'হুইস্কি' যোগাইতে পারি কি?" তিনি একটু নীরব থাকিয়া, আমার মুখের দিকে সহাস্যে চাহিয়া বলিলেন—"একটুখানি মাত্র, যদি আপনি ইচ্ছা করেন।" আমার গৃহ হইতে 'ডিকেণ্টারে' হুইস্কি ও সোডা আসিল। তিনি সত্য সত্যই একটুখানি হুইস্কিতে এক গেলাস সোডা লইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। বলিলেন—"উৎকৃষ্ট হুইস্কি; কেলনারের গ্রিন্‌ সীল।" কি আশ্চর্য্য! কেমন করিয়া চিনিলেন! আমাদের কাছে সকল প্রকার হুইস্কিই নীলাম্বরের বড়ি বা হোমিওপ্যাথিক টিংচারের মত অভিন্ন। আমি তখন তাঁহার প্রাতঃকালের আহারের ব্যবস্থা করিতে চাহিলে আবার সেরূপ কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন—"কেবল দুইখানি চপাটি, আর একটুক কারি যদি দিতে পারেন, আমাকে মিষ্টি দিবেন না।" ইঁহাদের বিশ্বাস, আমরা বাঙ্গালীরা কেবল মিষ্টি খাইয়া থাকি। আমি হাসিয়া বলিলাম—"ভয় নাই, আমি মিষ্টি দিব না।" আমার ভৃত্য অভয়চরণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা বিখ্যাত পাচক। তজ্জন্য কেহ কেহ একজন ডেপুটি কলেক্টরের বেতন দু শ আড়াই শ টাকা পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে। অভয়চরণ নিজে রন্ধনবিদ্যায় একজন 'রেঙ্গলার'। সে ষাট টাকার চাকরি করিত। এখন বৃদ্ধ বলিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাড়ী যাইতেছিল। স্ত্রীকে রন্ধনবিদ্যা শিখাইবার জন্য আমি তাহাকে সামান্য বেতনে রাখিয়াছি। অভয়চরণ দিনে তিন বার স্নান করে। দীঘির কোণের গোল বেদির উপর 'বোধিবৃক্ষ'তলায় বসিয়া তিন বার আহ্নিক করে। তাহার

রন্ধনশালা ও উপকরণ সকল পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ করে। আর রন্ধনকার্য্য তাহার এক তপস্যাবিশেষ। রাত্রিপ্রভাতে স্নান করিয়া, রন্ধনের উপকরণ লইয়া, রাত্রির আহারের জন্য আয়োজনে সমস্ত দিন অতিবাহিত করে। কারণ, প্রাতঃকালে আমি মাংসাহার করি না। মাসের পর মাস সে প্রত্যহ একটা নূতন খাবার প্রস্তুত করিত। অভয়চরণ সাহেবের জন্য প্রাতের আহার (ব্রেক্ ফাস্ট) প্রস্তুত করিয়া দিল। তিনি দুইটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, মিলস্ সাহেব আসিলে আহার করিয়া, মহানন্দে কাচারি আসিয়া আমাকে বলিলেন—"আপনি আমার পুরাতন বন্ধু অভয়চরণকে কোথায় পাইলেন? সে আমাকে চমৎকার ব্রেক ফাস্ট দিয়াছে। আমি অনেক দিন এমন ব্রেক্ ফাস্ট খাই নাই। সে আমার ও ডেম্পিয়ারের পাচক ছিল। বড় বেশী বেতন বলিয়া আমরা তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এমন পাচক আমি আর দেখি নাই।" পরে শুনিলাম, তিনি তাহাকে চারি টাকা পারিতোষিক দিয়াছিলেন। যাহা হউক সে দিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি বলিলেন—"নবীনবাবু! বিভাগীয় কমিশনর আমারই এই ঘাট পার হইতে ও এই পথে চলিতে যখন এরূপ বিভ্রাট ঘটিতেছে, তখন সাধারণ লোকের কি কষ্টই না জানি হয়। এত দিনে তোমার রেলওয়ের প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝিলাম। আমি আজ হইতে তাহার জন্য যত্ন করিব। তুমি আমার সহায় হইবে।" লাভ হইবে না বলিয়া এই রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তিনি ইহার ভাবী বাণিজ্যের অঙ্ক সঙ্কলন করিতে লাগিলেন। এ অঞ্চলের সঙ্কলনের ভার আমার উপর পড়িল। চট্টগ্রামের কেহ কেহ এই রেলওয়ে অসম্ভব জানিয়া, ঠাট্টা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, লায়েল সাহেব ও নবীনবাবু রেলওয়ে আনিয়া ফেলিবে। এ সময়ে আমি প্রস্তাবিত লাইনের নক্সা আনাইয়া দেখিলাম যে, লাইন ফেনীর সাত মাইল পশ্চিম ও নোয়াখালির বিশ মাইল পূর্ব্ব দিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উহাতে কোন স্থানেরই সুবিধা হয় নাই। তদপেক্ষা একেবারে আকাশের উপর দিয়া লইলেই হইত। আমি তখন বহু অন্বেষণের পর দেখিলাম, এই লাইন পূর্ব্বে সরাইয়া চন্দ্রনাথ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশ ও ফেনী দিয়া লাকসাম লইলে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ত কথাই নাই, রেলওয়ে কোম্পানীর ও গবর্ণমেণ্টের বহু লক্ষ টাকা ব্যয় লাঘব হইবে। বর্ত্তমান লাইন যেখানে ফেনী পার হইয়াছিল, সে স্থান ফেনী ও মহুরী নদীর সঙ্গমের নিম্নে হওয়াতে স্থানটি এতাদৃশ বিস্তৃত যে, কেবল এখানে পুলের জন্য দশ লক্ষ টাকা এষ্টিমেট হইয়াছে। লাইন পূর্ব্বদিকে সরাইয়া, ফেনী ও মহুরী নদীর উপর স্বতন্ত্র পুল দিলে এই দুই স্থানে নদীর এত অল্প পরিসর যে, দুই লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় লাগিবে না। তাহার পর পর্ব্বতপ্রান্ত দিয়া লাইন আসিলে রাস্তার ব্যয়েরও অনেক লাঘব হইবে। অনেক স্থলে কেবল পর্ব্বতমূল সমান করিয়া দিলেই হইবে। অন্য দিকে যেখান দিয়া লাইন জরিপ হইয়া গিয়াছে, উহা চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমে সমুদ্রের তটভূমি। সেখানে সমুদ্রতীরস্থ বাঁধের মত একটা পর্ব্বতপরিমাণ রাস্তার প্রয়োজন হইবে।

এতাবৎ বিষয় লিখিয়া, আমি পূর্ব্বলাইন পরিবর্ত্তন করিয়া, এই লাইন গ্রহণ করিতে রিপোর্ট করিলাম। তখন নিষ্কর্মা কালাচাঁদ আবার কলেক্টর হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন ভিন্ন কর্ম্ম নাই। তিনি এই কর্ম্ম ফেলিয়া এক পা গৃহের কি শিবিরের বাহিরে যাইতেন না। বিশেষতঃ তাঁহার চীন আমেরিকায় নোয়াখালির জাহাজ চালাইবার বিখ্যাত উদ্যোগ এবং ফেনী হইতে আফিস উঠাইয়া লওয়ার ব্রত নিষ্ফল হওয়াতে, তিনি এই হতভাগ্য দেশের কোনও কর্ম্মেই আর হস্তক্ষেপ করেন না। অতএব আমাকে উত্তর দিলেন যে, রেলওয়ের লাইনের সঙ্গে তাঁহার কোনও সংস্রব নাই। তিনি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তখন আমি ফেনী মহুরীর সঙ্গমস্থলে শিবির স্থাপন করিয়া আমার ডায়ারিতে (Diary) উপরোক্ত বিষয় সকল লিখিলাম। ডায়ারি কমিশনরের কাছে

যায়। তাহা কালাচাঁদের চাপিয়া রাখিবার সাধ্য নাই। তিনি আমার চতুরতা দেখিয়া এ প্রস্তাবের প্রতিকূলে ডায়ারির পার্শ্বে তীব্র ভাষায় লিখিলেন যে, তাঁহার নিষেধ না মানিয়াও আমি নিজের কার্য্য ফেলিয়া এই অপ্রাসঙ্গিক কার্য্যে আমার সময় নষ্ট করিতেছি। লয়েল সাহেব উক্ত ডায়ারি পাওয়া মাত্র নাচিয়া উঠিলেন। তিনি আমাকে বহু প্রশংসা করিয়া ও ধন্যবাদ দিয়া, এক ডি ও পত্র লিখিয়া ; আমার কাছে এই লাইন সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র রিপোর্ট চাহিলেন। আমি ডি ওর উত্তরে লিখিলাম যে, কলেক্টরের কাছে আমি স্বতন্ত্র রিপোর্ট করিয়াছিলাম, তিনি উহা কমিশনরের কাছে পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। তখন কমিশনর আমাকে লিখিলেন, যেন আমি রিপোর্টের আরম্ভে লিখি যে, তাঁহার আদেশমতে আমি এই রিপোর্ট করিতেছি। আমি তখন আমার পূর্ব্বরিপোর্টের আর এক নকল এই সকল ডি ও পত্র সহ কলেক্টরকে উপহার পাঠাইলাম। তিনি এ অপমান গলাধঃকরণ করিয়া, এবার কথাটি না কহিয়া, রিপোর্ট কমিশনরকে পাঠাইলেন। তিনি এই লাইন সমর্থন করিয়া আমার রিপোর্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে, এবং বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট উহা ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তসচিব একখানি নক্সাতে এই লাইনটি নীল পেন্সিলে টানিয়া দিয়া লিখিলেন—তিনি যত দূর দেখিতেছেন, এই লাইনটি পূর্ব্ব-লাইন অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতর। তবে এ পথে রেলওয়ে করিতে কোনও বিঘ্ন আছে কি না, তাহা জরিপ করিয়া দেখিবার জন্য রেলওয়ে কার্য্যে অশেষ পারদর্শী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার মেজর ষ্টোরিকে নিয়োগ করিয়াছেন। লায়েল সাহেব আমাকে এ সংবাদ দিয়া, মেজর ষ্টোরির সঙ্গে ফেনীঘাটে গিয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখে সাক্ষাৎ করিতে এবং আমার লাইন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে লিখিলেন। আমাকে উক্ত ম্যাপ দেখাইয়া মেজর ষ্টোরি বলিলেন যে, চট্টগ্রাম হইতে ফেনীতীর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান তিনি মোটামুটি দেখিয়া আসিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, পূর্ব্বের লাইন অপেক্ষা আমার প্রস্তাবিত লাইন অনেক শ্রেষ্ঠ ও সহজসাধ্য হইবে। অবশিষ্ট ভাগে কোনও বিঘ্ন আছে কি না, তিনি নক্সা দেখিয়া বলিতে পারিতেছেন না। তখন আমি বলিলাম, বিঘ্নের মধ্যে ফেনী নগরের উত্তরে 'কালীধরের বিল' এবং দক্ষিণ দিকে 'গুণবতীর বিল' মাত্র আমার আশঙ্কার বিষয় আছে। এই দুইটি বিল বহু মাইলব্যাপী প্রকাণ্ড জলা। চৈত্র বৈশাখেও সম্পূর্ণ শুষ্ক হয় না। তবে এই দুই স্থানে লাইন যদি বিলের এক পার্শ্ব দিয়া লওয়া যায়, তবে সম্ভবতঃ আর কোনও বাধা হইবে না।

তিনি চট্টগ্রাম ফিরিয়া গিয়া, সেখান হইতে জরিপ করিতে করিতে 'কালীধরের বিল' পর্য্যন্ত আসিয়া, তাঁহার শিবির সহ ফেনীতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত লাইন সেরূপই পাইয়াছেন। এ লাইনে আমার রিপোর্টের লিখিত কারণে যথার্থই বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ের লাঘব হইবে। কিন্তু 'কালীধরের বিল' ভয়ানক ব্যাপার! দেখিলাম, তিনি আকণ্ঠ কর্দ্দমে নিমজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার উচ্চ ঘোটকের কর্দ্দমাক্ত কলেবর দেখাইয়া খুব হাসিলেন। তাহার পর তিনি প্রায় এক পক্ষ কাল বহু পরিশ্রম করিয়া এবং প্রত্যহ প্রায় ঐরূপ অবস্থায় ফেনীস্থ শিবিরে ফিরিয়া, একদিন অপরাহ্নে আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রম সফল হইয়াছে, তিনি একটি কার্য্যযোগ্য (workable) লাইন পাইয়াছেন। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। ফেনী হইতে 'গুণবতী' গিয়া লিখিলেন যে, সে পর্য্যন্ত কোনও বিঘ্ন পান নাই, কিন্তু 'গুণবতী'র পর 'কালীধরের বিলে'র অপেক্ষাও আর এক গভীরতর ও বৃহত্তর বিল পাইয়াছেন, এবং উহা তাঁহাকে বড়ই ক্লেশ দিতেছে। আমি ভাবিলাম, এখানেই বুঝি পালা শেষ হয়। আমি লিখিলাম—আমার আশা আছে, তাঁহার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিভা ও পার-দর্শিতার বলে তিনি এই 'বিল'ও অতিক্রম করিতে পারিবেন। লিখিলাম বটে, লোকের মুখে

এই বিলের যেরূপ বর্ণনা শুনিতে লাগিলাম, উহা অতিক্রম করা কেবল রামায়ণের মহাবীরের সাধ্য। তবে তিনি একটি ক্ষুদ্র সাগর-শাখা মাত্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আর ইনি সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছিলেন। অতএব আমি নিরাশ হইলাম না। কিছুদিন পরে তিনি চাঁদপুরে পঁহুছিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন—"আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে। আমি এ অঞ্চল হইতে চলিয়া যাইতেছি। চট্টগ্রাম হইতে 'লাকসাম' পর্য্যন্ত আপনার মনোনীত লাইন পূর্ব্ব-লাইন হইতে অধিকতর সুবিধার ও অল্পতর ব্যয়-সাধ্য বলিয়া আমি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছি, এবং 'লাকসাম' হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত যে লাইন পূর্ব্বে জরিপ হইয়া রহিয়াছিল, উহা সামান্য পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক আমি মনোনীত করিয়াছি।" ফেনীতে একটি আনন্দের ধ্বনি উঠিল। লায়েল সাহেবও আমাকে আনন্দ প্রকাশ (Congratulate) করিয়া পত্র লিখিলেন।

তাঁহার অবিরাম চেষ্টায় 'আসাম বেঙ্গল' রেলওয়ে মঞ্জুর হইল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইল। ফেনী অংশের ইঞ্জিনিয়ার হইয়া মিঃ ব্রাউনজার (Mr. Brounger) ফেনী আসিলেন। তিনি বহু রেলওয়ের নির্ম্মাণ-কার্য্য করিয়াছেন, এবং একজন অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি আমার ফেনীর কার্য্য দেখিয়া বড়ই প্রশংসা করিতেন, এবং বলিতেন যে, আমার ফেনীস্থ বাঁশের গৃহসকলের আকৃতি অনুকরণ করিয়া চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর রেলওয়ের গৃহাবলীর নক্সা (Plan) প্রস্তুত করিতেছেন। আমার স্কুলগৃহের অবয়বের ও বাঁশের ছাউনির তিনি বড় পক্ষপাতী ছিলেন। দ্রুতবেগে রেলের কার্য্য আরম্ভ হইল, আর আমি এ সময়ে ফেনী হইতে স্থানান্তরিত হইলাম। আমার নিষ্ফল জীবন। সকল সবডিভিসনেই আমি ফুলের উদ্যান ও ফলবান্ বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছি। কিন্তু তাহাদের ফুল কি ফল দর্শন পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। ফেনীতে গোযানে পর্য্যটনের সুখভোগই আমার অদৃষ্টলিপি ছিল। রেলওয়ে ভ্রমণ আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন?

ইহার তিন বৎসর পরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে খুলিল। আমি তখন আলিপুরের ডেপুটি কলেক্টর। সেই বৎসর পূজার বন্ধে এই রেলপথে বাড়ী গিয়াছিলাম। ফেনী ষ্টেশনে ফেনীর আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোক এবং মফঃস্বল হইতেও বহু লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। ষ্টেশন ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসকল লোকপূর্ণ হইয়াছে। সকলের মুখেই আনন্দব্যঞ্জক কৃতজ্ঞতার কথা। আমার পরবর্ত্তী ডেপুটিবাবুও আসিয়াছেন। এই 'সিদ্ধবিদ্যা'র কীর্ত্তির কথা পরে বলিব। আমার প্রতি লোকের এই ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া তিনি ব্যথিতহৃদয়ে বলিলেন যে, ফেনীর লোক আমাকে দেবতার মত ভক্তি করে। বঙ্কিমবাবুর ভ্রাতা সঞ্জীববাবুর পুত্র এখানে পুলিস ইন্‌স্পেক্টর হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে এই অভ্যর্থনায় প্রথম পরিচয় হইল। দেখিলাম, তিনি চট্টোপাধ্যায়বংশের মত স্পষ্টবাদী। তিনি বলিলেন—"সকলকে আর করে না। যে ভক্তির উপযুক্ত কার্য্য করে, তাহাকে করে।" 'সিদ্ধ-বিদ্যা'র মুখ চুন হইয়া গেল। তিনি লোকের কাছে বড়ই অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি তখন পূর্ব্ববৎ ব্যথিতহৃদয়ে বলিলেন যে, আমার মত খ্যাতনামা অফিসারের স্থানে আসিয়া তাঁহার কার্য্য করা কষ্টসাধ্য হইয়াছে। ভদ্রলোকের অন্তর্দাহে আমার দুঃখ বোধ হইল। আমি সঞ্জীববাবুর পুত্রকে তাঁহার প্রতি আর অস্ত্রাঘাত করিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া, বিদায় হইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। ট্রেন খুলিলে স্কুলের ছাত্রগণ ট্রেনের সঙ্গে ছুটিল। আমি তাহাদের কত নিষেধ করিতে লাগিলাম। তাহারা তাহা শুনিল না। তাহারা এবং ফেনীর বহু লোকেরা স্ত্রীর গাড়ী গুলজার করিয়া তুলিয়াছিল। এই পথে যত বার আসিয়াছি, প্রায় প্রত্যেক বারই ফেনীর লোক জানিতে পারিলে আমার প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। একজন রেলওয়ে ভূমিগ্রাহক (Railway Land acquisition) ডেপুটি কলেক্টর ফেনী ষ্টেশনে আমার গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। তিনি

নীরবে এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ট্রেন খুলিলে তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। যখন পর্ব্বতমূল দিয়া ট্রেন ছুটিতেছিল, এবং আমি আনন্দে অধীর হইয়া গাড়ী হইতে এক দিকে চন্দ্রনাথ-পর্ব্বতমালার ও অন্য দিকে সমুদ্রের শোভা দেখিতেছিলাম, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার শেষ কাব্য কি?" আমি বলিলাম—আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ফেনী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এই লাইন। উহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বাস্তবিকই কবির উপযোগী। মিঃ ব্রাউনজার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এই লাইন নির্ব্বাচন করিয়া আমি রেলওয়ের প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যয় লাঘব করিয়াছি। ইহার কিছুকাল পরেই এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া এবং লায়েল সাহেবকে সাক্ষ্য মানিয়া গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন করিয়াছিলাম। গবর্ণমেণ্ট তাহার উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না। কোনও গৌরাঙ্গ এই কার্য্য করিলে 'ইংলিশম্যান', 'পাইওনিয়ারে' দুন্দুভিধ্বনি হইত, এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাকে লক্ষ টাকা পারিতোষিক দিতেন। একজন তৈলব্যবসায়ী বঙ্গচন্দ্র হইলেও কিঞ্চিৎ কৃপাভিক্ষা পাইত। কিন্তু আমি না গৌরাঙ্গ, না তৈলিক কৃষ্ণাঙ্গ।

একটি মানের পালা

আমি যখন ফেনী স্কুল স্থাপনের উদ্যোগে বিরত, সে সময়ে আমার কালাচাঁদ কলেক্টর বদলি হইলেন, এবং তাঁহার স্থলে একটি নীচপ্রকৃতির গোরাচাঁদ উপস্থিত হইলেন। ইনিই কোনও অনামা রোগে পীড়িত হইয়া পড়িলে, আমার কার্য্যের দ্বিতীয় বৎসরে আমি মাগুরা সবডিভিসনে প্রেরিত হইয়াছিলাম, এবং ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর মত কয়েক মাস কার্য্য করিয়াছিলাম। কারণ, তিনি দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। ইনি প্রথম ফেনীতে আসিয়া আমার সঙ্গে সে কারণে খুব সদ্ব্যবহার করেন। এমন কি আমার ঘরে আসিয়া আমার পুত্রকে কোলে করিয়া বসিতেন, এবং গৃহের ও গৃহসজ্জার কত প্রশংসা করিতেন। তিনি বরাবর বলিতেন যে, তিনি এরূপ গৃহ ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট অট্টালিকায়ও থাকিতে চাহিবেন না। কেবল নোয়াখালি ফিরিয়া যাইবার সময়ে আমাকে বলিলেন—"আমার সরল অন্তঃকরণে আপনাকে বলা উচিত যে, আমি শুনিয়াছি, আপনি এখন সার্ভিসের মধ্যে একজন দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু আপনি সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূল-পক্ষ এবং প্রজার অনুকূল-পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন।" আমি বুঝিলাম, নোয়াখালির সার্টিফিকেট-কার্য্য উপলক্ষ্য করিয়া কালাচাঁদ এরূপে তাঁহার মন বিষাক্ত করিয়াছেন। আমি বলিলাম—"আপনাকে এ কথা কে বলিয়াছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি। যদি সত্য সত্যই আমি তাহাই করি, আমি কি উচিত কার্য্য করি না? গবর্ণমেণ্ট অসীম ক্ষমতাশালী, এবং প্রজারা নিতান্ত দরিদ্র। অতএব দরিদ্রের পক্ষ অবলম্বন করা ধর্ম্মতঃ উচিত। তাহা ছাড়া রাজার ও প্রজার স্বার্থ অভিন্ন। যাহাতে প্রজার মঙ্গল হয়, তাহাই আমি গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল বলিয়া জানি।" তিনি আর কিছু বলিলেন না। পরে কিন্তু ইহাঁর মেজাজ বিগড়াইয়া যায় এবং আমাকে নানাদিক্ দিয়া অপদস্থ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। কালাচাঁদের ইংলণ্ড আমেরিকার সঙ্গে ষ্টীমার চালাইয়া নোয়াখালির বাণিজ্যের উন্নতির খেয়ালের মত ইহাঁর খেয়াল হইল যে, তিনি এক কৃষি-প্রদর্শনী মেলা করিয়া নোয়াখালির কৃষির উন্নতি করিবেন। এই খেয়ালের কারণও আমি। ফেনীতে অশ্বপৃষ্ঠে বেড়াইতে বাহির হইলে, দেশের যে দিন দিন একমাত্র কৃষিই উপজীবিকা হইতেছে, বিদেশীয় ব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতায় যে দেশের সকল ব্যবসায় প্রায় ধ্বংস হইয়াছে, কৃষি ও কৃষকের বৃদ্ধির সহিত গোচারণের জমি পর্য্যন্ত কর্ষিত হইয়া গোজাতি যে কঙ্কালশেষ হইতেছে, সমস্ত দেশে অন্ন জলের জন্য যে হাহাকার উঠিতেছে, এ সকল কথা আমি তাঁহাকে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতাম। প্রত্যেক বৎসর বাৎসরিক

রিপোর্টেও তাহা লিখিতাম। তাঁহার বিশ্বাস হইল যে, কৃষি-প্রদর্শনীর দ্বারা কৃষির ও গোজাতির উন্নতি হইবে। কিন্তু আমি জানি যে, সর্ব্বত্র কৃষি-প্রদর্শনীর অর্থ বাই-খেমটার নৃত্য ও ঢলাঢলি। তিনি যেই এ প্রস্তাব মুখ হইতে বাহির করিলেন, অমনি আমার ১নং মুরুব্বি খোসামুদির তৈলমর্দ্দনে উহা গরম করিয়া তুলিলেন। কলেক্টর সদর বিভাগে হুকুম প্রচার করিলেন যে, প্রত্যেক গ্রামের পঞ্চাইত সাত টাকা করিয়া গ্রাম হইতে টেক্স তুলিয়া দিবে। আমার কাছে পত্র আসিল যে, আমিই নিজে কৃষির উন্নতির জন্য তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, অতএব এ কার্য্যে তিনি আমার যোগ ও সাহায্য (co-operation) চাহেন। আমি এইমাত্র দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তের শ টাকা চাঁদা স্কুলের জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। আবার চাঁদা কি প্রকারে তুলিব? তাঁহার শ্বেত চর্ম্ম, তাঁহার বক্ষে সিভিল সার্ভিসের অভেদ্য বর্ম্ম আছে। তিনি পঞ্চায়েত হইতে এরূপ অবৈধ টেক্স তুলিলে কেহ কিছু বলিবে না। কিন্তু আমি কৃষ্ণচন্দ্র সে পথে গেলেই আমার 'অধীন (subordinate) সার্ভিসে' আমার কৃষ্ণপক্ষ উপস্থিত হইবে। আমি স্কুলের জন্য ফেনী নগর হইতে চাঁদা তুলিয়াছিলাম না। অতএব নিজে পঞ্চাশ টাকা দিয়া এবং ফেনী নগরবাসী হইতেও অতিরিক্ত চাঁদা আমার এই বিপদ্ দেখাইয়া তুলিয়া, তাঁহার কাছে আড়াই শত টাকা পাঠাইয়া দিলাম. এবং আমি যে সম্প্রতি স্কুলের জন্য চাঁদা তুলিয়া সঙ্কটে পড়িয়াছি, তাহাও লিখিলাম। তিনি সদর বিভাগে সাত হাজার টাকা তুলিয়াছেন, আর আমি আড়াই শত টাকা মাত্র পাঠাইলাম। তিনি ক্রোধে অগ্নি-মূর্ত্তি হইলেন। আগে আমার কাছে 'ডেমি' পত্র লিখিতে 'My dear Nabin Babu' (প্রিয় নবীনবাবু!) সম্বোধন করিতেন। এ টাকা পাইবামাত্রই আমার কাছে এক পত্র আসিল, তাহার সম্বোধন—Babu! (বাবু!) মাত্র। আর তাহাতে লেখা আছে—"আমার স্কন্ধের উপর দিয়া অন্য জেলার কর্ম্মচারীদের কাছে পত্র লেখা আপনার অভ্যাস দেখা যাইতেছে। আপনার মত যোগ্য এবং পুরাতন কর্ম্মচারীর জানা উচিত, এরূপ কার্য্য অবৈধ না হইলেও অনুচিত।" আমি বুঝিলাম, যে উৎপাতের ভয়ে আমি সমস্ত মুল্লুক ছাড়িয়া পৃথিবীর এই অজ্ঞাত ও নিভৃত কোণায় মনের শান্তির ও সাহিত্যচর্চ্চার জন্য আসিয়াছি, আমি আবার সেই উৎপাতে পড়িলাম। একটা দুর্জ্জয় শ্বেত মানের পালা আরম্ভ হইল। তিনি মনে করিয়াছেন, আমি আড়াই শত মাত্র টাকা পাঠাইয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা ও অপমান করিয়াছি। আমি যথাশাস্ত্র মানভঞ্জনের চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, শ্রীমতী আমাকে ক্ষমা কর।

"বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি হর তিমিরমতিঘোরং",।

তাহাতে মানের নিবৃত্তি হইল না। তখন আর এক ডিগ্রি চড়াইয়া বলিলাম—"দোহাই তোমার!

ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।"

"দোহাই তোমার! তুমি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! তোমার এ দুর্জ্জয় মান হইলে আমি যে ধনে প্রাণে মারা যাই।" তাহাতেও মনের বন্যা থামিল না। সর্ব্বশেষে বলিলাম।

"দেহি পদপল্লবমুদারম্"।

শ্রীমতী বলিলেন—"কৃষ্ণচন্দ্র! তোমার 'ডেমি' পত্রগুলিন বেশ। কিন্তু তোমার অফিসিয়ল পত্রগুলিন বেজায় কড়া।" আমি বলিলাম—"হে গৌরচন্দ্র! উহার 'কড়াত্বে'র দুটি কারণ। প্রথমতঃ আমি ইংরাজী ভাল জানি না, এবং তজ্জন্য আমি বড় লজ্জিত ও দুঃখিত। দ্বিতীয়তঃ এই উপবিভাগের চার পাঁচ লক্ষ লোকের অদৃষ্ট আমার হস্তে। (বাইবেল কোট করিয়া লিখিলাম) তাহাদের মঙ্গলের জন্য উপরিস্থদের কপাটে কেবল বারংবার নহে, একটুক

কড়াভাবে আঘাত না করিলে, আমার বিশ্বাস, তাঁহাদের দৃঢ় কপাট অবারিত হয় না।" তিনি তদুত্তরে লিখিলেন—"হে কৃষ্ণচন্দ্র! আপনার এই উভয় কৈফিয়ৎই আপনার চন্দ্রাবলীর কুঞ্জবিহারের পর চতুরালী মাত্র। যদি সত্য হইত, আমি উহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতাম। কিন্তু উহা সত্য নহে। প্রথমতঃ ইংরাজীর উপর আপনার যেরূপ অধিকার, এবং আপনি উহা যেরূপ জলের মত ব্যবহার করিতে পারেন, অনেক ইংরাজ তাহা পারেন না। আর দ্বিতীয়তঃ আমি স্বীকার করি যে, আপনি একজন অত্যন্ত দক্ষ এবং উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কর্ম্মচারী। কিন্তু আপনি যাহা করেন, তাহার কেবল বাবু এন. সি. সেনকে গৌরবান্বিত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য।"

সে সময়ে স্বনামখ্যাত অস্থিরমতি Skrine (স্ক্রীণ) সাহেব ত্রিপুরা জেলার কলেক্টর। তিনি জনরবে শুনিতে পান যে, পার্ব্বত্য কুকিরা আমাদের প্রান্তসীমাবাসীদের আক্রমণ করিবে, এবং তৎসম্বন্ধে আমি কি কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছি তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহার 'ডেমি' পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহার একখণ্ড নকল শ্রীমতীর কাছেও পাঠাইয়াছিলাম, এবং তিনি তাহার অনুমোদন করিয়া এবং তাহার জন্য আমাকে প্রশংসা পর্য্যন্ত করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। সেই কথার ধুয়া ধরিয়া, আমি তাঁহার স্কন্ধের উপর দিয়া চন্দ্রাবলী 'স্ক্রীণে'র কুঞ্জে গিয়াছিলাম। আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া!—বলিয়া, তিনি উপরোক্ত তীব্র মানের অস্ত্র আমার উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্রের উত্তরে উপরোক্ত সকল কথা লিখিলে তিনি নীরব হইলেন। কমিশনর লায়েল সাহেব বিভাগীয় নানা বিষয়ে আমার কাছে 'ডেমি' পত্র লিখিতেন। এমন সময়ে তাঁহার এক পত্র উপস্থিত। উহার উত্তর দিব কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া আমি শ্রীমতীর কাছে পাঠাইলাম। তিনি এবার লাঙ্গুল সঙ্কুচিত করিয়া লিখিলেন যে, তাঁহাকে না জানাইয়া কমিশনরের পত্রের উত্তর দেওয়াতে তাঁহার আপত্তি নাই। যাক্। চিরদিনই কাণা চোকে কুটা পড়ে। তাহার পর হঠাৎ পুরীর কলেক্টর হইতে আমার কাছে এক 'ডি ও' উপস্থিত। তিনি পুরীর রাজার হস্ত হইতে শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের মন্দির উঠাইয়া লইবার জন্য দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, মন্দির সম্বন্ধে আমার অনেক অভিজ্ঞতা আছে, অতএব আমার মত চাহিয়াছেন। আমি এই পত্রেরও উত্তর লিখিয়া মানিনীর নিকট পাঠাইলাম। তিনি এবার লাঙ্গুল আরও কুণ্ঠিত করিয়া লিখিলেন—"আমার নিজ জেলার বহির্ভূত বিষয়ে অন্য জেলার কর্ম্মচারীর পত্রের উত্তরও আমার অনুমতি ছাড়া আপনি দিতে পারেন। কিন্তু পুরীর মন্দির সম্বন্ধীয় এই বিচক্ষণ পত্রখানি আমার কাছে পাঠানতে আমি এত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিয়াছি যে, তজ্জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।"

শ্রীমতীর মান এরূপে দুই চারি ডিগ্রি নামিলে নোয়াখালির 'কৃষি-প্রদর্শনী' আরম্ভ হইল। কৃষির উপকারার্থ রঙ্গমঞ্চ (theatre) খুলিতেছে। তাহাতে আরম্ভে অভিনীত হইবার জন্য মানিনীর গৌরব ঘোষণা করিয়া একটা উপক্রমণিকা রচনা করিয়া পাঠাইতে আমার কাছে আমার ১নং মুরুব্বির ও সবরেজিষ্ট্রার বাবুর দুই অনুরোধপত্র আসিল। তিনি নিজেও আমার 'কবিগিরি'র কথা শুনিয়া, প্রদর্শনীতে সশরীরে উপস্থিত হইয়া, কার্য্যের বিশেষতঃ রঙ্গমঞ্চের সাহায্য করিতে এক স্বহস্তলিখিত নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইলেন। বিধাতা যখন বাম হন, তখন সকলই বাম হয়। সেই সময়ে আমার বাম শ্রীচরণের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, আমার চলিবার শক্তি নাই। অতএব যাইতে অক্ষম বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তিনি রোগের কথা বিশ্বাস করিলেন না। মান আবার ভীষণ ভাবে চাগিয়া উঠিল। তাহাতে অন্যরূপে আর এক স্ফুলিঙ্গ পড়িয়া একবারে লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত করিল। শারীরিক রোগনিবন্ধন উপক্রমণিকাও লিখিতে পারিলাম না। উহাও অবজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত হইল।

তাহার উপর আমি গোপনে এক বন্ধুর কাছে 'কৃষিপ্রদর্শনী'র একটা বর্ণনা পাঠাইলাম। বিজ্ঞাপনপত্রে ছিল যে, বাঁশে ও গাছে তেল দিয়া—বোধ হয়, এই তৈলের প্রস্তাবও আমার মুরুব্বির,—তাহাতে লোক উঠিতে (অবশ্য কৃষির উপকারার্থ) দেওয়া হইবে। আমার প্রেরিত বর্ণনাটি এরূপ—

"কিবা 'কৃষিপ্রদর্শন'! পক্ক রম্ভা অগণন,
চারি দিকে করে ঝলমল!
গাছে তেল, বাঁশে তেল, স্থানে অস্থানেতে তেল,
তেলের ভাণ্ডার 'বজলল'!"

বলা বাহুল্য, 'বজলল' আমার মুরুব্বির নাম। বন্ধু এ কবিতাটি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। উহা নোয়াখালিতে প্রচারিত হইল, এবং চারি দিকে উহার আবৃত্তির ও হাসির তুফান ছুটিল। মুরুব্বি বিদ্রূপে জরজর হইয়া, উহা শ্রীমতীর কাণে তুলিলেন, আবার আমার কপাল ভাঙ্গিল। এবার মান দুর্জ্জয়ের উপরে একবারে ৯০ ডিগ্রিতে উঠিল। তৎক্ষণাৎ আমার কাছে আবার বাবু সম্বোধনে এক পত্র আসিল—"বাবু! আমি এক বড় বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছি। আপনি আপনার এলেকার সবরেজিষ্ট্রারদের প্রত্যেক দলিলের রেজিষ্ট্রী ফিসের উপর আপনার স্কুলের জন্য চার আনা করিয়া টেক্স উশুল করিতে আদেশ দিয়াছেন। এই কথা সত্য কি না, আমি জানিতে চাহি।" ইহার অর্থ—"এবার তুমি যাবে কোথায়? তুমি আমার কৃষিপ্রদর্শনীর জন্য পঞ্চায়েত হইতে টেক্স লইতে পারিলে না, এখন বাবু এন. সি. সেনকে গৌরবান্বিত করিবার জন্য যে স্কুল স্থাপন করা হইয়াছে, তাহার জন্য কেমন করিয়া এ টেক্স উশুল করিতেছ?" আমি শান্তভাবে উত্তর দিলাম—"আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা একটা 'কালা মিথ্যা কথা' (black lie)। কোন্ পাজি (black-guard) আপনাকে এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহার নাম পাঠাইবেন। আমি তাহার নামে মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ উপস্থিত করিতে চাহি। আপনি ইংরাজ এবং আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী। আপনি অবশ্য এরূপ পাজি পৃষ্ঠদংশককে (rascally back-biter) ঘৃণা করিবেন।" এই উত্তর পাইয়া শ্রীমতী মান করিলেন—"বটে! আচ্ছা, রসো কালাচাঁদ! তোমার চতুরালি ধরিয়া দিতেছি।" আবার পত্র আসিল—"বেবু! তোমার স্কুলের জমার হিসাবটা আমার কাছে প্রতি ডাকে পাঠাইবে।" আবার তাঁহার সংবাদদাতার নাম চাহিয়া প্রতি ডাকে উহা প্রেরিত হইল। উহাতে কোনও সবরেজিষ্ট্রার হইতে সিকি পয়সাও জমা নাই। তখন শ্রীমতী ভাবিলেন—"আচ্ছা শঠ-চূড়ামণি! এবার ধরা পড়িবে, দেখ।" পত্র আসিল—"বেবু! আপনি যেরূপ চতুর (clever), এরূপ টাকা জমা দেওয়ার পাত্র আপনি নহেন। অতএব আমার কাছে প্রতি ডাকে স্কুলের খরচের হিসাব পাঠাইবেন।" তাহাও প্রতি ডাকে আবার তাঁহার সংবাদদাতা জটিলা কুটিলার নাম চাহিয়া পাঠাইলাম। এবার মানিনীর মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। এবার আর কথাটি না কহিয়া, শুধু একটি মোড়ক মাত্র দিয়া হিসাবের বহিখানি ফেরত পাঠাইলেন। এক পালা শেষ হইল। এরূপ কত পালাই চলিয়াছিল। লোকটা এত দূর নীচতা আরম্ভ করিয়াছিল যে, ফেনী দীঘিতে বর্ষার জলনির্গমের জন্য যে পাইপ বসাইলাম, উহা অপব্যয় বলিয়া তাহার খরচ আমাকে দিতে আদেশ দিয়াছিল, এবং তাহা লইয়া আর এক পালা লড়িয়া পরাস্ত হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমি তিন মাসের ছুটি লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যাই। কতক স্বাস্থ্যের জন্য, কতক বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া উত্তরপশ্চিম ভারত, রাজপুতনা ও বোম্বাই অঞ্চল দেখিবার জন্য এই ছুটি লইয়াছিলাম। দার্জিলিং, বৈদ্যনাথ, এলাহাবাদ, কানপুর, বিঠুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার, লাহোর, বরদা বম্বে পুণা, নাসিক,

নর্ম্মদা, জব্বলপুরে বেড়াইয়া স্ত্রীর কাছে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, উহা সুরেশ প্রথম সাহিত্যে, পরে পুস্তকে 'প্রবাসের পত্র' নাম দিয়া ছাপিয়াছেন। মিঃ দেখিলেন, ছুটির সময়ে পথ পরিষ্কার (coast is clear)। অতএব তিনি ফেনীতে আসিয়া এবং নিজ ফেনীতে ও ফেনীর এলেকায় এক মাস যাবৎ থাকিয়া, আমাকে তোপে উড়াইবার জন্য গোলা গুলি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আমি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছি বলিয়া লোকে বলিলে, তিনি বলিতেন —"হুঁ হুঁ! সে মন্ত্রী হইবার জন্য আগরতলা গিয়াছে।" ইহার কারণ, তিনি আগরতলা রাজ্যের ঘোরতর অনিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার জন্য পারেন নাই। সে কথা স্থানান্তরে বলিব। পশ্চিম অঞ্চল ও আগরতলার মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্য বই ত নহে। আফিসের প্রত্যেক রেজিষ্টারীর প্রত্যেক অঙ্ক এবং প্রত্যেক ফৌজদারী ও কলেক্টরী মোকদ্দমার প্রত্যেক নথির প্রত্যেক হুকুম খুঁটিয়া খুঁটিয়া দেখিয়া একরাশি নোট লিখিয়া লইয়াছেন। লাহোরে গেলে এ সকল সংবাদ আমার কাছে ফেনী হইতে পৌঁছিল। আমি উত্তর ও পশ্চিম-ভারত দর্শন করিয়া, চট্টগ্রাম ফিরিয়া কমিশনর লায়েল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি আমাকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি গ্রাম্য রাস্তার নাম দিয়া ডিস্ট্রিক্ট রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন?" আমি বুঝিলাম, আমার অসাক্ষাতে শ্রীমতী আমার প্রতি এই অস্ত্রত্যাগ করিয়া ডিঃ বোর্ডের টাকা অপব্যয় করিয়াছি বলিয়া আমার বদলির প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি কমিশনরকে তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাচীরে লম্বিত চট্টগ্রাম বিভাগের নক্সার কাছে গিয়া, দুইটি রাস্তা পেন্সিলে চিহ্নিত করিয়া দেখাইলাম যে, কতকগুলি গ্রাম্য রাস্তা যোগ করিয়া আমি এই দুটি রাস্তা প্রস্তুত করাইতেছি। তিনি তাহাদের উপকারিত্ব ও প্রয়োজন অনুভব করিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। শ্রীমতীর এ ক্রুর কটাক্ষও নিষ্ফল হইল। আমার বদলি হইল না। ফেনীতে সশরীরে শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে আবার অবতীর্ণ হইলাম দেখিয়া তিনি যে সকল মালমসলা এই কয় মাস জমা করিয়াছিলেন, তাহা গড়িয়া পিটিয়া আরও এক মাস পরে আমার কাছে তাঁহার ইন্স্পেকসন-(পরিদর্শন) মন্তব্য পাঠাইলেন। দেখিলাম, উহা দ্বাত্রিংশৎ ফণা-শীর্ষ একটি নাগপাশ। অন্ততঃ তিনি মনে করিয়াছিলেন তাই। আমার প্রতিকূলে অবৈধ কার্য্যের জন্য তিনি বত্রিশটি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল মোকদ্দমার নথি হইতে এই সকল অভিযোগ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, সেই সমস্ত নথি তিনি লইয়া গিয়াছেন। সেই সকল নথি ফেরত চাহিলে তিনি লিখিলেন যে, তিনি নথি ফেরত দিবেন না। তাঁহার আশঙ্কা, নথি পাইলে এই অত্যন্ত চতুর (too clever) লোকটি, তাহার বক্ষের উপর তিনি যে 'বত্রিশ সিংহাসন' পাতিয়াছেন, তাহা এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে। আমি লিখিলাম—তাহা হইলে আমি কৈফিয়ৎ দিতে অক্ষম। তিনি লিখিলেন যে, অমুক তারিখের পূর্ব্বে আমি যদি কৈফিয়ৎ না দিই, তবে আমি কৈফিয়ৎ দিতেছি না বলিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। আমি লিখিলাম যে, তাহা হইলে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া লেখেন যে, নথি ফেরত দিতেছেন না বলিয়া আমি কৈফিয়ৎ দিতে পারিতেছি না, এবং এ সমস্ত চিঠির নকল যেন সেই সঙ্গে গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দেন। তাহার পরে তিনি 'তোবা' করিয়া এক দিন লিখিলেন—

"Babu! thank god, I am transferred to Krishnagar and am relieved from the painful duty of controlling a subordinate like yourself"—"বাবু! আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, আমি কৃষ্ণনগর বদলি হইয়াছি, এবং আপনার মত একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে শাসন করারূপ কষ্টকর কর্ত্তব্য হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।"

কিন্তু ইহাতেও এ পালা থামিল না। তিনি যাইবার সময়ে কালাচাঁদ দ্বিতীয় বার নোয়াখালির কলেক্টর হইয়া আসিলে, এই বিষয়ে কমিশনর ও গবর্ণমেণ্টে আমার প্রতিকূলে

রিপোর্ট করিয়া তাঁহার মান রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া যান। কালাচাঁদ আবার পূর্ব্বোক্ত পালা দ্বিতীয় বার অভিনয় করেন। তিনি আমাকে খুব ধমকাইয়া বার বার লিখিলেন যে, নথি ছাড়া আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। আমি ভাবিলাম—"গোরাচাঁদের ধমক গ্রাহ্য করি নাই, তুমি ত কালাচাঁদ"। শেষে তিনি যখন দেখিলেন যে, নথি না দিয়া কৈফিয়ৎ দিতেছি না বলিয়া উপরে রিপোর্ট করিলে তিনিই বেকুব হইবেন, তখন অগত্যা নথিগুলি পাঠাইলেন—"never consenting consented"। আমি তখন এই বত্রিশ দন্তই ভাঙ্গিয়া দিলাম। আমি দেখাইলাম যে, এই বত্রিশ অভিযোগই শ্রীমতীর আইন ও বাঙ্গালা বুঝিবার ভুল!! কালা কলেক্টর আমাকে পরে বলিয়াছিলেন যে, আমার কৈফিয়ৎ পড়িয়া তিনি বড়ই হাসিয়াছিলেন। আমি শ্রীমতীকে একবারে কলহান্তরিতা নায়িকা বা হীরা মালিনী সাব্যস্ত করিয়াছিলাম—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কোন্দল ভেজায়।"

কালা কলেক্টর বলিলেন—"you made him a perfect fool." তিনি তখন বুঝিলেন যে, কেন শ্রীমতী নথি পাঠাইতেছিলেন না। ইনি এই কৈফিয়ৎ তাঁহার কাছে কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার মতে উহা কমিশনরের কাছে পাঠাইলে বড় সুবিধা হইবে না। এমন শঠচূড়ামণি কালাচাঁদের সঙ্গে "হাম অবলা অখলা" শ্রীমতী আর কি করিবেন। তিনি তিক্তমুখে আর কথাটি না কহিয়া উহা ফেরত পাঠাইলেন, এবং এইখানে এই দুর্জ্জয় মানের পালা শেষ হইল। তাহার পর শুনিলাম, শ্রীমতী কৃষ্ণনগরের এক ডেপুটির সঙ্গে আমার কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন—"he is a dreadful man,"—"একটি ভয়ানক লোক!" সে সময়ে যিনি ফেনীর মুন্সেফ ছিলেন, তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীমতীর সঙ্গে যে সকল পত্র লেখালেখি হইতেছিল, তাঁহাকে দেখাইতাম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইংরাজের সঙ্গে কেমন করিয়া ঝগড়া করিতে হয়, তিনি শিখিলেন। শ্রীমতী অফিসিয়াল কিছু না পাইয়া, আমার কাছে কর্কশ 'ডেমি' লিখিয়া চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, কিছু একটা অসম্মানের কথা আমি লিখিলে তিনি একবারে গবর্ণমেণ্টের দ্বারে তাঁহার অপমান করিয়াছি বলিয়া কাঁদিয়া উপস্থিত হইবেন। মুন্সেফবাবু একদিন বলিলেন—"আপনি বেচারিকে শালা ডাকিতেও humbly and respctfully (বিনয় ও সম্মানপূর্ব্বক) ডাকেন, তখন বেচারী আর কি করিবে?"

পাগ্‌লা মিয়া

একদিন পুলিস হইতে রিপোর্ট আসিল যে, 'পাগলা মিয়া' নামক এক জন প্রসিদ্ধ ফকির উক্ত পুলিসের এলেকায় পর্ব্বতের পাদমূলে এক গ্রামে বহুকাল যাবৎ আছেন। গ্রামটি বদ্‌মায়েসের একটা পীঠস্থান। পাগ্‌লা মিয়াকে নোয়াখালি ও কুমিল্লা অঞ্চলের লোকেরা দেবতার মত ভক্তি করে। তিনি নিজে নির্লিপ্ত। পাগলের মত ব্যবহার করেন, তাই তাঁহার নাম পাগ্‌লা মিয়া। কিন্তু যে বাড়ীতে থাকেন, সে বাড়ীর অধিকারীর উপঢৌকন ইত্যাদিতে মাসিক প্রায় এক শত টাকা আয় হয়। যে তাঁহাকে দর্শন করিতে যায়, তাঁহাকে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, টাকা পয়সা উপহার দিয়া থাকে। এ কারণে এই গ্রামস্থ চোরেরা সিঁদ দিয়া তাঁহাকে অস্থাবর সম্পত্তির মত এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে চুরি করিয়া লইয়া যায়। এরূপে তিনি একপ্রকার চোরা মালের মত হইয়াছেন। এখন এই চোরসম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাকে লইয়া এরূপ শত্রুতা হইয়াছে যে, তাহাদের নিকট হইতে গুরুতর সংখ্যায় শান্তি-রক্ষার জামিনমোচলকা না লইলে আশু ঘোরতর শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা।

কোর্টে এই বিচিত্র রিপোর্ট কোর্ট সব ইন্‌সপেক্টরের দ্বারা পঠিত হইলে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল। মোক্তার প্রভৃতির মুখে পাগ্‌লা মিয়ার ফকিরি সম্বন্ধে বহু উপাখ্যান

শুনিলাম। দেখিলাম, তাঁহারা সকলে তাঁহার পরম ভক্ত। তিনি পাগলের মত কথা বলেন ; এমন কি, লোককে প্রহার পর্য্যন্ত করেন। তথাপি সেই পাগলের প্রলাপবাক্য ও প্রহার হইতে অনেকে নাকি তাহাদের মনোগত বিষয়ের সকল উত্তর পাইয়া থাকে। একজন বৃদ্ধ মোক্তারকে তিনি পাদুকা লইয়া বহুদূরে পর্য্যন্ত প্রহার করিতে করিতে তাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতেই নাকি পাদুকার আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছিলেন। একদিন বহু লোক উপস্থিত। ফকির নানারূপ পাগলামি করিতেছেন। সকলে চূড়ামণি মহাশয়ের মত তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় নিযুক্ত আছেন। এমন সময় ফকির ছুটাছুটি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ধর! টান! বাঁধ! সাহাদের 'সুলুপ' মারা যাইতেছে।" এরূপ বলিতে বলিতে তিনি নিজেও যেন সুলুপের (চট্টগ্রামদেশীয় ক্ষুদ্র জাহাজ) দড়ি টানিতেছিলেন, এবং লোকদিগকেও টানিতে বলিতেছিলেন ও না টানিলে প্রহার করিতে-ছিলেন। কিছুক্ষণ এরূপ পাগলামি করিয়া বলিলেন—"রক্ষা পাইয়াছে।" ছাগলগাইয়ার সাহারা ব্যবসায় দ্বারা এক পুরুষে ধনী হইয়াছে। তাহাদের কাছে এ খবর গেল। তাহাদের একখানি 'সুলুপ' নারায়ণগঞ্জ হইতে চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসিতে ঠিক সেই সময়ে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়া আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। সে অবধি তাহারা ফকিরের বড় ভক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই বিচিত্র মোকদ্দমা লইয়া আমি সংকটে পড়িলাম। পেনেল কোডের কর্ত্তারা যেন নরকে প্রবেশ করিয়া, পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ সম্ভবে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পৃথিবীতে এমন পাপ নাই, যাহা পেনেল কোডে নাই। কিন্তু তাঁহাদের কল্পনাও এরূপ ফকির চুরি পর্য্যন্ত উঠে নাই। ফকিরকে আপাততঃ ত্রিপুরার মহারাজার ফুলগাজির কাচারিতে আনিয়া রাখিতে আমি পুলিসে অর্ডার পাঠাইলাম। তাঁহাকে ফেনীতে আনিয়া চোরের হাত হইতে উদ্ধার করিতে দেশ শুদ্ধ লোক আমাকে ধরিয়া পড়িল। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা আমি উচিত মনে করিলাম না। আমি নিজে ফুলগাজি গেলাম এবং একখানি পাল্কী উপস্থিত রাখিলাম। আমি ফুলগাজি কাচারিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, কাচারির দেউড়ির একটা কক্ষের চারি দিকে লোকারণ্য। কত লোকই ফকিরকে দর্শন করিতে আসিয়াছে, এবং পায়ে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। আমার সেই চট্টগ্রামের পোতন ফকিরের দৃশ্য মনে পড়িল। ফকির সামান্য অশিক্ষিত মুসলমান। খর্ব্বাকৃতি, শুষ্কদেহ, প্রৌঢ়। শরীরে তৈলাক্ত মসৃণ আভা। তখন তিনি মৌনাবলম্বী। শুনিলাম, তাঁহার দুই ভাব। মাসের ১৫ দিন পাগলামি করেন, এবং অন্য ১৫ দিন মৌনাবলম্বনে থাকেন। এখন তাঁহার সেই ভাব। নীরবে ধ্যানস্থভাবে তসবি (স্ফটিকের মালা) জপিতেছেন। আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে পুলিসের দারগা বলিল—"ফকির সাহেব! ফেনীর হাকিম আসিয়াছেন।" তিনি মাথা তুলিয়া আমার দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া রহিলেন। আমি সেলাম করিয়া স্থিরনয়নে তাঁহাকে দেখিলাম। তাঁহার আকৃতি ও ভাব দেখিয়া আমার ভক্তি হইল। আমি বলিলাম—"পুলিস রিপোর্ট করিয়াছে যে, আপনি কতকগুলি বদমায়েসের হাতে পড়িয়াছেন। তাহারা আপনাকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে চুরি করিয়া লইতেছে, এবং এখন আপনাকে লইয়া তাহাদের মধ্যে হাঙ্গামা খুন হইবার উপক্রম। অতএব আপনার অভিপ্রায় কি, আমি জানিতে আসিয়াছি।" তিনি কেবল একটি মাত্র কথা বলিলেন—"আল্লা তোমার ভাল করুক।" শুনিলাম, মৌনাবলম্বনসময়ে এই কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না। আহারাদিও কেহ মুখে তুলিয়া দিলে খান, না হয় অনশনে থাকেন। কিছু চাহেন না, কিছু বলেন না। এমন কি, আসন ত্যাগ করেন না। শৌচকার্য্যাদি পর্য্যন্ত করেন না। তিনি নীরব রহিলেন দেখিয়া আমি আবার বলিলাম—"আমি ফেনীতে আপনার জন্য দরগা প্রস্তুত করিয়া দিতে প্রস্তুত। আপনার যদি ফেনী যাওয়া মত হয়, তবে পাল্কী প্রস্তুত, আপনি পাল্কীতে গিয়া উঠুন। অন্যথা আপনি যাহাদের হাতে ছিলেন, তাহারাও

উপস্থিত আছে। আপনি তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন।" এই কথা শুনিয়া তিনি উঠিয়া গিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। সমবেত লোকেরা তাহাতে মহা আনন্দ প্রকাশ করিল। পাল্কী ফেনী ছুটিল। আমি আমার শিবিরে গেলাম।

তাঁহাকে আপাততঃ একটি মুসলমান মোক্তারের বাসায় রাখিয়া, তাঁহার জন্য বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আম্র-পনসবেষ্টিত আশ্রমের মত একটি স্থানে বাঁশের একটি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলাম। অন্য দিকে সেই বদমায়েসেরা গিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার প্রতিকূলে দরখাস্ত করিল যে, আমার ফেনীর বাজার মিলাইবার জন্য আমি বলপূর্ব্বক পাগ্‌লা মিয়াকে তাহাদের অধিকার হইতে কাড়িয়া আনিয়াছি। মাজিষ্ট্রেট আমার 'সেই মানিনী'। তিনি আমাকে জব্দ করিবার আর একটি অস্ত্র পাইয়া মহা আনন্দিত হইলেন। আমার কাছে তীব্র ভাষায় কৈফিয়ৎ তলব হইল। বদমায়েসেরা নৃত্য করিতে লাগিল। আমি উপরোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলাম। তখন ফকিরের পাগলামি ভাব আরম্ভ হইয়াছে। আমি ও মুন্সেফ একদিন অপরাহ্নে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছি। তিনি প্রলাপ বকিতেছেন ও ছুটাছুটি করিতেছেন। মধ্যে একবার বলিয়া ফেলিলেন—"মিয়া নোয়াখালি যাইবে।" একটি লোককে এক কঞ্চির বাড়ি দিয়া বলিলেন—"ওরে শালা চল্!" সে হাসিতে লাগিল। পরের দিন প্রাতে ডাকে ফকিরকে নোয়াখালি পাঠাইবার আদেশ আসিল। আমি অপরাহ্নে তাঁহার কাছে এ আদেশের কথা বলিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আবার সেরূপ প্রলাপ বকিতে বকিতে একবার বলিলেন—"না, মিয়া যাইবে না।" আমি লিখিলাম যে, ফকিরের যেরূপ পাগলভাব, বলপ্রয়োগ ভিন্ন তাঁহাকে নোয়াখালি পাঠান আমার অসাধ্য। তিনি নিজে যাইতে চাহিতেছেন না। কোন্ আইনমতে আমি বল-প্রয়োগ করিয়া পাঠাইব, তাহা আমি জানি না। গরুর গাড়ীতে ত পাঠান যাইবেই না। কারণ, পড়িয়া তাঁহার হাত পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা। পাল্কীতে পাঠাইতে আশী টাকা আবশ্যক। আমি এ টাকা কোথায় পাইব? তখন মাজিষ্ট্রেট আমাকে এক 'ডি ও' পত্রে লিখিলেন যে, আমি শিক্ষিত লোক হইয়া এরূপ Humbug (ভণ্ডামি) বিশ্বাস করিতেছি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন, এবং ভারতবাসীর শিক্ষা যে কিরূপ অসার, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আমি তদুত্তরে লিখিলাম যে, সম্ভবত আমার শিক্ষা অপূর্ণ। তবে 'হমবগ' (ভণ্ডামি) বুঝিবার শক্তির অভাব কেবল আমার নহে। ইউরোপ আমেরিকা এখন 'যোগদর্শন' লইয়া উলট-পালট খাইতেছে। তাঁহাদের শিক্ষা আমার মত অপূর্ণ হইতে পারে না। তখন তিনি পাগ্‌লা মিয়ার নামে উন্মাদের আইন (Lunatic Act) মতে কার্য্য করিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। আমি লিখিলাম যে, পাগ্‌লা মিয়া উন্মাদ বলিয়া পুলিস, কি অন্য কেহ আবেদন উপস্থিত না করিলে আমার উক্ত আইনমতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। লোকে পাগ্‌লা মিয়াকে এরূপ ভক্তি করে যে, দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিবে, তথাপি তাঁহার প্রতিকূলে উন্মাদ বলিয়া কখন রিপোর্ট, কি দরখাস্ত করিবে না। তখন মাজিষ্ট্রেট লিখিলেন—"পাগ্‌লা মিয়া উন্মাদ বলিয়া আমি তোমার কাছে সংবাদ দিতেছি। অতএব এখন তুমি আইনমতে কার্য্য কর।" এরূপ নীচপ্রকৃতির ইংরাজের উপরও ভারত-শাসনের ভার ন্যস্ত হয়। হায়! আমাদের অদৃষ্ট! তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া, ফকিরের প্রতি-কূলে উন্মাদের আইনমতে এক মোকদ্দমা (Proceeding) উপস্থিত করিলাম। বহু অনু-সন্ধানে জানিতে পারিলাম, তাঁহার এক 'চাচাত' ভাই আছে। তাহাকে আনাইয়া, এবং তাঁহার সংরক্ষণের জন্য তাহার জামিনমোচলকা লইয়া, তাঁহাকে নামতঃ তাহার জিম্মা করিয়া দিলাম। সে হাতে স্বর্গ পাইল। কারণ, পাগ্‌লা মিয়ার মাসে অন্যূন এক শত টাকা আয়। আমি তাঁহাকে ফেনীতে আনিয়াছি শুনিয়া চারি দিকে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আরও ছড়াইয়া পড়িল, এবং দেশ-দেশান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল। তৎসঙ্গে তাঁহার আয়ও বৃদ্ধি

হইতে লাগিল। কিন্তু মানময়ীর অনিদান মান ইহাতেও থামিল না। তিনি মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমি কখনও তাঁহার আদেশ পালন করিব না, এবং এবার তিনি আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবার একটা মাহেন্দ্র ক্ষণ পাইবেন। পাগ্‌লা মিয়া সম্বন্ধে আমি কি করিয়াছি, তাহা জানিবার জন্য তিনি নথি তলব দিলেন। তাহা প্রেরিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, আমি একটা চালাকি খেলিয়াছি। কিন্তু তাহা এরূপ আইন-সঙ্গত কার্য্য হইয়াছে যে, তাহাতে সূচ্যগ্রও চালাইবার ফাঁক নাই। তখন নিরাশ হইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নথি ফেরৎ দিলেন এবং এরূপে মানের এ পালাও নিষ্ফল হইল। কালাচাঁদ খয়া দিলেন না। তখন ফেনীব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল।

কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ইহাতেও থামিলেন না। এই পাগ্‌লা মিয়ার ব্যাপারটা কি, আমি সত্য সত্য তাঁহাকে এক ভাইয়ের জিম্মায় দিয়াছি কি না, তাহা গোপনে অনুসন্ধানের জন্য স্বয়ং পুলিস সাহেবকে পাঠাইলেন। পুলিস সাহেব অনেকেই গর্দ্দভ। ইনি তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেমন বৃহৎ কলেবর ও স্ফীত উদর, বুদ্ধিখানিও তথৈবচ। গোপন অনুসন্ধানে কিছু ফাঁক না পাইয়া একদিন তিনি আমাকে মুখ খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি একজন এত বড় শিক্ষিত লোক হইয়া কি 'ফকিরি' বিশ্বাস করি।

আমি। আপনি কি করেন না?

তিনি। কদাচ না।

আ। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখাইব যে, আপনি করেন।

তি। আপনি কখনও পারিবেন না।

আ। ঐ যে কৃষকেরা হাল চষিতেছে, উহাদের সঙ্গে আপনার কিছু মানসিক প্রভেদ আছে কি?

তি। আছে। তাহারা অশিক্ষিত, আমি শিক্ষিত। (সে সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল)।

আ। অর্থাৎ আপনার কতকগুলিন মানসিক শক্তি শিক্ষার দ্বারা বিকশিত হইয়াছে, উহাদের হয় নাই?

তি। হাঁ।

আ। এখন উপর দিকে চলুন। ভারতবর্ষের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডফারিনের সঙ্গে আপনার কিছু মানসিক প্রভেদ আছে কি?

তি। আছে। তিনি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক ও বাগ্মী।

আ। অর্থাৎ তাঁহার মনের কতকগুলিন শক্তি বিকশিত হইয়াছে, যাহা আপনার হয় নাই।

তি। হাঁ।

আ। আচ্ছা, রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের ও লর্ড ডফারিনের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে কি?

তি। আছে। লর্ড ডফারিন অপেক্ষা গ্লাডষ্টোন শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক ও বাগ্মী।

আ। গ্লাডষ্টোন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর রাজনৈতিক ও বাগ্মী হইতে পারে কি?

তি। পারিবে না কেন। মানুষের শক্তির অনন্ত বিকাশ হইতে পারে।

আ। আচ্ছা, গ্লাডষ্টোন ও সেক্ষপিয়ারের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে কি?

তি। আছে। সেক্ষপিয়ারের একজন জগতের সর্ব্বপ্রধান কবি। গ্লাডষ্টোন কবি নহেন।

আ। অর্থাৎ কবিত্ব একটা শক্তি মানুষের মনের আছে, যাহা সেক্ষপিয়ারে বিকশিত হইয়াছিল, গ্লাডষ্টোনে হয় নাই।

তি। হাঁ।

আ। সেক্সপিয়ার হইলে উৎকৃষ্টতর কবি ভবিষ্যতে হইতে পারে কি?

তি। কেন পারিবে না? মানুষের মনের শক্তি অসীম, অনন্ত।

আ। তবে মানুষের মনের শক্তি অনন্ত এবং তাহার বিকাশও অনন্ত। এক একজন শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ চিত্রকর, শ্রেষ্ঠ গায়ক। ঈশ্বরের কৃপায় ও অনুশীলন দ্বারা এক একজনের এক একটি শক্তির বিকাশ হইয়া তিনি অন্য লোক হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছেন। এ ফকিরেরও মনের অনন্ত শক্তির মধ্যে মনে করুন একটি বিশেষ শক্তি, ইংরাজিতে যাহাকে occult power বলে, ঈশ্বরের কৃপায় ও সাধনায় বিকশিত হইয়াছে, যাহা আমার, কি আপনার হয় নাই। অতএব ইহাতে অবিশ্বাসের বিষয় কি আছে?

তি। ও! আপনি এ ভাবে ফকির বিশ্বাস করেন।

আ। ইহার অন্য ভাব নাই। আমাদের একটা যোগশাস্ত্র বা Yoga Philosophy আছে, যাহা লইয়া এখন ইউরোপ এবং আমেরিকা আন্দোলিত। তাহাতে মানুষের শক্তি-বিশেষের অনুশীলনের উপায় লিখিত আছে। আমাদের সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা সেই উপায়ে সাধনার দ্বারা সেই শক্তি বিকাশের চেষ্টা করে। কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হয়। যেমন একজন প্রধান চিত্রকর যাহা চিত্র করিবে, আপনি আমি তাহা পারিব না, একজন প্রধান রাজনৈতিক রাজ্যের বিষয় অনেক দেখিবে ও বুঝিবে, যাহা আপনি আমি দেখিব ও বুঝিব না। তদ্রূপ এই সিদ্ধ সন্ন্যাসী ও ফকির এই বিশ্বের সূক্ষ্ম নীতি বা তত্ত্ব যেমন দেখিবে ও বুঝিবে, আমরা তাহা দেখিব কি বুঝিব না। ইহাতে অবিশ্বাসের কথা কি আছে?

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া, তাঁহার গোপন অনুসন্ধানের শুভাগমনের কথা আমাকে খুলিয়া বলিয়া, মাজিষ্ট্রেট মহাশয়কেও এরূপ বুঝাইবেন বলিয়া ফেনী হইতে বিজয়া করিলেন। হয় ত 'মানিনী' শুনিয়া গোবিন্দ অধিকারীর সুরে গাহিয়াছিলেন—"আহা মরি! হরি! হরি! কেন বা মনে করেছিলাম।" কিছুতেই কালাচাঁদ ডেপুটিটাকে জব্দ করিতে পারিলেন না।

দেখিতে দেখিতে পাগ্‌লা মিয়ার প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। তাঁহার তত্ত্বাবধারণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষা করিবার জন্য কয়েক জন মুসলমান ভদ্রলোকের একটা কমিটি গঠন করিয়া দিলাম। পাগ্‌লা মিয়া খুব সুখে ও সম্মানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। বলিয়াছি, তাঁহার জীবনে দুই পক্ষ—পাগলামি পক্ষ ও ধ্যান পক্ষ। পাগলামির পক্ষে সমস্ত ফেনী সহর ছুটিয়া বেড়াইতেন। মধ্যে মধ্যে আমার গৃহেও আসিতেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকের শ্রেণী থাকিত। তাহারা এ পাগলামির মধ্য হইতে নাকি তাহাদের মনোগত কথা বুঝিতে পারিত। তাঁহার গৃহ বা দরগা দিন রাত্রি নর-নারীতে পূর্ণ থাকিত। বাজারে পাগলামি করিতে করিতে দোকানদারদের কত জিনিস কত লোককে বিলাইতেন। পাছে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আমি তাহাদের দ্রব্যাদির মূল্য তাঁহার আয়ের টাকা হইতে দিতে আদেশ দিয়াছিলাম। কিন্তু কেহ প্রাণান্তে তাহা লইত না। বরং যে দোকানদারের দোকান হইতে এরূপে জিনিস বিলাইতেন, সে তাহাকে ভাগ্যবান্ মনে করিত। ফলতঃ দেখিতে দেখিতে ফেনীর বাজারেরও উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার উপহারের জন্য লোক প্রত্যহ যে সকল দ্রব্যাদি কিনিতে লাগিল, তাহাতেও বাজারের অনল্প শ্রী বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহার উপর শ্রীশ্রীসরস্বতী-পূজা উপলক্ষ্যে আমি একটা মেলার সৃষ্টি করিলাম। পূর্ব্বে সরস্বতীপূজা উপলক্ষ্যে ফেনীতে ঢাকাই আমদানি বাই খেম্‌টার নৃত্য মাত্র হইত। প্রথম বৎসর আমি এই নৃত্য দেখিয়াছিলাম। তাহাদের যেমন রূপ, তেমনি নৃত্য, আর বলিতে হইবে না—তেমনি ভাষা। আমি আগাগোড়া হাসিয়াছিলাম। বলিয়া না দিলে তাহাদিগকে তৈলাক্ত আফ্রিকার আমদানি বলিয়া ভ্রম হইত। অথচ এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে উকিল মোক্তার বাবুদের চারি শত

টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আমি তাহাদের নৃত্য বা লম্ফ দেখিতে দেখিতেই তাহার ইতি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। পরের বৎসর সরস্বতীপূজার সময়ে 'বাসন্ত উৎসব' নাম দিয়া একটা বাৎসরিক মেলা গঠিত করিলাম। হিন্দুরা সরস্বতীপূজা বাজারের কেন্দ্রস্থলে করিলেন, এবং পাগ্‌লা মিয়ার দরগার সম্মুখে সামিয়ানা খাটাইয়া মুসলমানদের জন্য 'মৌলুদ সরিফ্' বা শ্রীশ্রীমহম্মদের জন্মবৃত্তান্ত পাঠের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এই মেলা উপলক্ষ্যে একটা সমপ্রাণতা সঞ্চারিত হইল। এমন কি, মুসলমানেরা হিন্দুদের সরস্বতীপূজার আসরে সঙ্গীতে যোগ দিলেন, এবং হিন্দুরাও 'মৌলুদ সরিফে'র আসরে ভক্তির সহিত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিলেন। আজকাল দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। উহা বাঙ্গালীর নব্যতম হুজুগ। কিন্তু আমিই প্রকৃতপ্রস্তাবে বহু পূর্ব্বে দেশীয় দ্রব্যের সমাদরের সূত্রপাত করিয়াছিলাম। আমি ঢাকাই আমদানি বন্ধ করিয়া, নোয়াখালির এক নর্ত্তকীকে পেশোয়াজু পরাইয়া বাই খাড়া করিলাম, এবং যে বেদেদের মেয়েরা হাটে বাজারে গাইয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্য হইতে দুটিকে কাউন্সিলের ফাঁকা অনরেবল মেম্বরদের নির্ব্বাচন প্রথানুসারে নির্ব্বাচন করিয়া, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্বর্গপ্রদাতা সাবানের দ্বারা তাহাদের বাহ্যিক বহুবর্ষসঞ্চিত তৈলজাত অশ্লীলতা বিদূরিত করিয়া, যাত্রার দলের একটি গায়কের ও বাদকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। সে এক পক্ষের মধ্যেই উভয়কে অতিরিক্ত সাবান সেবার ও শিক্ষার দ্বারা উর্ব্বশী-মেনকাত্ব প্রদান করিয়া আসরে উপস্থিত করিল। বাইজী তিলোত্তমা ; কারণ, তিনি একাধারে বাই, খেমটা, যাত্রা ও থিয়েটার। তিনি সকল প্রকার সঙ্গীতে শিক্ষিতা হইয়াছিলেন। তাহার উপর সোনায় সোহাগা—তিনটিই সুন্দরী এবং তিনটিই ষোড়শী। তিনটাই স্থানীয় কীর্ত্তি (Indigenous production)। ঢাকাই আমদানি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও কেবল ফেনীতে বন্ধ হইল, এমন নহে ; এই অঞ্চলেই বন্ধ হইল। ইহাদের খুব পসার হইল, এবং দেখিতে দেখিতে নোয়াখালি ও কুমিল্লাতে আরও দল সৃষ্টি হইল। অথচ এই মহৎ স্বদেশপ্রেমিকের কার্য্য সম্পাদন করিতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ মুদ্রা মাত্র ব্যয় হইয়াছিল। শুধু ইহাই নহে। আমার মেলার উদ্দেশ্য ছিল—স্থানীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি। সপ্তদিবসব্যাপী মেলা। চারি দিকের হাট বাজার এই সপ্তাহে বন্ধ। ফেনীর দোকানদারদের দুর্গোৎসব। দিবসে বাণিজ্যের বাজার, আর রাত্রিতে আনন্দের বাজার। প্রত্যহ রাত্রিতে স্থানীয় বাই, খেমটা, স্থানীয় যাত্রায় স্থানীয় কবির বা কপির গান, গাজির গান, চৌধুরীর লড়াই গান, যাহা নোয়াখালির নিজস্ব (Indigenous)! সর্ব্বসুদ্ধ ব্যয় দেড় শত মুদ্রা। অতএব হে স্বদেশপ্রেমিক দেশীয় শিল্পের উন্নতিকারীর দল! হে চারি আনা মূল্যে ভারত উদ্ধারের দল! আমার ও কলিকাতার অভিনেত্রীস্রষ্টা গিরীশ ভায়ার দুইটি মূর্ত্তি কলিকাতার গড়ের মাঠে যথাশাস্ত্র তোমাদের স্থাপিত করা উচিত।

পাগ্‌লা মিয়ার প্রসঙ্গে আবার ফিরিতেছি। তাহার প্রতিষ্ঠা দিন দিন আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং এরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। স্থানীয় মুসলমান সবরেজিস্ট্রারের এক পুত্র আজন্ম বাতব্যাধিগ্রস্ত। তাঁহারা পতি পত্নী পাগ্‌লা মিয়াকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া, পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া, সেই পুত্রের সঙ্গে তাঁহাকে এক গৃহে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। এইরূপে দুই তিন দিন গেলে পাগ্‌লা মিয়ার ভাই আসিয়া আমার কাছে এই সংবাদ দিল। আমি সবরেজিস্ট্রারকে ডাকাইলাম। তিনি বলিলেন যে, ইতিমধ্যে তাঁহার পুত্রের রোগের কিছু উপশম হইয়াছে। সে হাত পা নাড়িতে পারিতেছে। আর দুই চারি দিন ফকিরকে তাঁহার গৃহে থাকিতে দিলে তাঁহার পুত্র নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে। তিনি বড় অনুনয় করিলে আমি সম্মত হইলাম। ইহার দুই তিন দিন পরে শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ফকির আর তাঁহার ঘরে থাকিতে অসম্মত হইয়া, তাঁহাদের পদানত পতি-পত্নীর

হাত ছাড়াইয়া যেমনি উঠানে নামিতেছিলেন, অমনি সিঁড়ি হইতে পড়িয়া নিজে বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন ও সেই অবস্থায় দরগায় আনীত হইয়াছেন। সবডিভিসনে একটা হাহাকার ধ্বনি উঠিল, এবং সকলে দরগার দিকে ছুটিল। আমি যখন উপস্থিত হইলাম, তখন স্থানটি লোকারণ্য হইয়াছে। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাহাকার করিতেছে, কেহ সবরেজিষ্ট্রারকে গালি দিতেছে। দেখিলাম, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অচল, কথা কহিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। তিনি সকরুণ নয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার বলিলেন, পূর্ণ বাতব্যাধি। তিনি দেখিতে দেখিতে ধ্যানস্থ বা যোগস্থ হইলেন। আমার বোধ হইল, যেন তিনি পতি পত্নীর কাতর ক্রন্দনে আপনা শরীর হইতে রোগীর অঙ্গে ক্রমাগত কয়েক দিবস তাড়িতক্ষেপ করিয়া আপনার শরীর এরূপ তাড়িতশূন্য করিয়াছিলেন যে, আর সামলাইতে পারেন নাই। এরূপে অনুমান, সপ্তাহ কাটিয়া গেল। একদিন কাচারিতে খবর আসিল যে, পাগলা মিয়া লীলা সম্বরণ করিতেছেন। কাচারি ভাঙ্গিয়া আমরা গেলাম, তাঁহার ভাই ও কয়েক জন মোক্তার বলিল যে, আজ তাঁহার কিছু হইবে না। গত রাত্রিতে ফকির একবার অকস্মাৎ বলিয়াছিলেন, তিনি বুধবার এত ঘণ্টার সময়ে কৈলাস যাইবেন। আজ সোমবার। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। তাঁহার ভাই বলিল যে, প্রাতঃকাল হইতে তিনি দক্ষিণ হস্তের মুঠি লইয়া বরাবর আমার গৃহের দিকে দেখাইতেছিলেন। সে তখন চেঁচাইয়া বলিল—"বাবু আসিয়াছেন। আপনি কি তাঁহাকে কিছু বলিতে চাহেন?" তখন তিনি আমার দিকে চাহিয়া মুঠি খুলিলেন। দেখিলাম, তাহাতে নিকটস্থ মাটির বাসনভাঙ্গা এক টুকরা চাড়া। ইহার অর্থ কি? আমাদের সকলের মনে এই ধারণা হইল যে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার সমাধির উপর একটি পাকা দরগা নির্ম্মিত হয়। আমি বলিলাম যে, তাঁহার আদেশ আমি প্রতিপালন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। দেখিলাম, আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। তাহার পর বুধবার ঠিক তাঁহার প্রতিশ্রুত সময়ে, তাঁহার সংখ্যাতীত ভক্তদের শোকাশ্রু লইয়া, তিনি 'কৈলাসধাম' চলিয়া গেলেন। তাঁহার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে আমার বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। ছাগলগাইয়ার সাহাদের কাছে পত্র লেখা মাত্র তাঁহারা সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিতে স্বীকার করিলেন। তিনি যে বাঁশের গৃহে ছিলেন, এবং যেখানে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, সেখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়াছিলাম, এবং তদুপরি বাঁশের গৃহের অনুকরণে সাহাদের ইষ্টকনির্ম্মিত অষ্টকোণসমন্বিত সুন্দর মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। সেই সমাধিমন্দিরে এখনও বহু লোকের নিত্য সমাগম হয়, এবং বহু উপহার সমাধিতে প্রদত্ত হয়। সাধু লোক চিরজীবী।

ফেনীর শাসন ॥ ১। 'জলচরে'র অত্যাচার

আমি কোনও সবডিভিসনের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ, কি প্রকারের মোকদ্দমা তাহাতে অধিক হয় ও কি কারণে হয়, তাহা জানিবার চেষ্টা করিতাম। সবডিভিসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় রিপোর্ট পাঠ করিতাম, এবং যত লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত—জমিদার, পুলিস ও অন্যান্য ভদ্রলোক, সকলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিতাম। এরূপে উক্তরূপ মোকদ্দমাধিক্যের যাহা কারণ, তাহা স্থির করিয়া, তাহার উপর পদক্ষেপ করিয়া দৃঢ়ভাবে বসিয়া থাকিতাম। মাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, গবর্ণমেণ্ট হাইকোর্ট যাহা বলুন, নীরবে তাহা উপেক্ষা করিয়া, আপনার কর্ত্তব্য যাহা স্থির করিয়াছি, তাহাতে অবিচল থাকিতাম। কিছু দিন ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রে আমার আসন টলটলায়-মান হইয়া যখন তাহা দৃঢ় হইত, তখন সবডিভিসনে এরূপ শান্তি স্থাপিত হইত, আমার ফৌজদারি কার্য্য এরূপ কমিয়া যাইত যে আমি আমার সমস্ত সময় লোকহিতকর কার্য্যে

নিয়োজিত করিতে পারিতাম। এখানেও আমাকে অনেক ঝড় বজ্র অবিচলিতভাবে সহিতে হইয়াছিল।

আমার এই কর্ত্তব্যে দৃঢ়তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া চট্টগ্রামের কমিশনর লায়েল সাহেব আমার দুই জন বন্ধুকে দুই বার বলিয়াছিলেন"নবীনবাবু যাহা ধরেন, মাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, এমন কি, গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত বিপক্ষতা করিলেও তাহা কার্য্যে পরিণত না করিয়া তিনি ছাড়েন না। এরূপ অবাধ্য ও একগুঁয়ে (head-strong and stubborn) না হইলে নবীনবাবু কোন্ কালে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট হইতে পারিতেন।" আমি বলিয়াছিলাম—"লায়েল সাহেবেরা কত ডেপুটিকেই ডিঃ মাজিষ্ট্রেট করিয়াছেন, (তখন পর্য্যন্ত তৈলসেবী রামচাঁদ, শ্যামচাঁদ কেহই ডিঃ মাজিষ্ট্রেট হন নাই)—কেবল আমিই বাকী। আপনি লায়েল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি যে, এরূপ আচরণ করিয়া থাকি, তাহা কেবল যে সাত আট লক্ষ লোকের সুখ দুঃখ আমার হস্তে গবর্ণমেণ্ট অর্পণ করিয়াছেন, তাহাদের জন্য নহে কি? অন্যথা তাঁহাদের ইচ্ছায় প্রতিকূলাচরণ করিয়া কি কারণে আমি আমার উন্নতির আশা বিসর্জন দিয়া থাকি? আমার উন্নতির অপেক্ষা লোকহিতে আমার অধিক আনন্দ। এই আত্মবলিদানমূলক প্রকৃতির জন্য দায়ী আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি নহি।"

যাহা হউক, আমি স্থির করিলাম যে, ফেনীর অশান্তির কারণ—(১) ত্রিপুরার মহারাজার প্রতিকূলে প্রজাদের বিদ্রোহ, (২) পুলিসের অত্যাচার ও অকর্ম্মণ্যতা, (৩) মুন্সেফি পেয়াদার অত্যাচার। ত্রিপুরারাজ্যের উপর বুঝি, বিধাতার কোনওরূপ অভিশাপ আছে। আমি একটি দিনও ইহার সুখশান্তির কথা শুনিলাম না। সে কথা পরে বলিব। ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন। সঙ্গীতে, সাহিত্যে ও চিত্রবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। তিনি এ সকল কলাবিদ্যায় এরূপ অনুরক্ত ছিলেন যে, রাজকার্য্যে তিনি পাঁচ মিনিট সময় মাত্রও নিয়োজিত করিতেন না। ইহার উপর তিনি পূর্ব্ববঙ্গচন্দ্রবিশেষের হস্তে পুতুল হইয়াছিলেন। ইহাদের স্বার্থ-সাধনের জন্য ইহারা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল যে, তিনি একটুক চেষ্টা করিলে, যদিও তাঁহার মূর্ত্তিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ত্রিপুরা জাতির মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছেন, তথাপি তিনি ক্ষত্রিয় হইতে পারেন। তিনি এই ফাঁদে পড়িলেন। বিক্রমপুর হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতপুঙ্গবদের আমদানি করা হইল। ইহাঁরা ব্যবস্থা দিলেন যে, তিনি ক্ষত্রিয়। তাঁহার সংস্পৃষ্ট জল ইহাঁরা উদরে বোঝাই করিলেন, এবং পরে বেগতিক দেখিয়া 'পদ্মার পারে' গিয়া মস্তক মুণ্ডন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে একটা দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। মহারাজার স্থানীয় সভাপণ্ডিত, কর্ম্মচারী, এমন কি, ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত এই জলাচরণভয়ে পলায়ন করিল। ষড়যন্ত্রকারীদের মনোরথ পূর্ণ হইল। এই জলপ্লাবনে পালে পালে তাঁহাদের আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া এই কর্ম্মচারীদের স্থান গ্রহণ করিল। আমি ইহাদের 'জলচর' (water fowl) আখ্যা দিয়াছিলাম। ফেনীর অর্দ্ধেক এলেকা মহারাজার জমিদারি। এই 'জলচরগণ' প্রজাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। ত্রিপুরারাজ্যের সুক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মন্ত্রীদের কল্যাণে প্রজাদের বন্দোবস্তি মাত্রই ছিল না। কাজেই খাজনার অঙ্ক জলচরদের স্বেচ্ছাধীন। তাহার উপর খাজনা দিলে দাখিলা দেওয়ার নিয়ম ত্রিপুরারাজ্যের নিয়মবহির্ভূত কার্য্য। আমি আমার প্রথম বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিয়াছিলাম যে, সেই সময়ে এ সকল কারণে রাজা প্রজার সম্বন্ধ এই দাঁড়াইয়াছিল ; জলচরেরা লাঠির জোরে যাহা লইতে পারে, এবং প্রজা লাঠির জোরে যাহা না দিতে পারে। কাজে কাজেই ত্রিপুরারাজ্যের জমিদারির অন্তর্গত ছাগলগাইয়া থানায় ও পরশুরাম আউট পোষ্টে সে সময়ে আগুন জ্বলিতেছিল। এত মোকদ্দমা হইয়াছিল যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় মাত্র স্নানাহারের জন্য রাখিয়া, সূর্য্যোদয় হইতে নিশীথ রাত্রি পর্য্যন্ত—কখন রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত কাচারি করিতেন।

আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সপ্তাহমধ্যে মহারাজার পাঠানগড় কাচারির নিকটে জলচর রাজকর্ম্মচারী ও স্থলচর প্রজাদের মধ্যে বলপূর্ব্বক ধান কাটা উপলক্ষ্যে একটা যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে উভয় পক্ষে প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিল, এবং একটি খুন ও কয়েক জন লোক আহত হইয়াছিল। ফেনীতে থাকিবার স্থানাভাবে আমি তখন 'করাইয়া হাটে'র নিকট তাঁবুতে ছিলাম। সংবাদ পাইবামাত্র আমি ঐরাবতপৃষ্ঠে ইন্দ্রদেবের মত দশ মাইল পথ চলিয়া, একেবারে পাঠানগড় কাচারির দ্বারে উপস্থিত হইলাম। তখন জলচরদলের সেনাপতি—দুই দেওয়ান কাচারিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের আড্ডা কুমিল্লায়। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা এ বিভ্রাটের কিছুই জানেন না। আমি বলিলাম—"তাহা ঠিক। আপনারা কেবল নিষ্কাম ভাবে কাচারিতে অধিষ্ঠিত হইয়া সঞ্জয়মুখে এই 'অমৃতসমান' যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন।" উভয়েই কৃষ্ণবর্ণ, ভীমোদর ; তাহা না হইলে দেওয়ানজি পদের শোভা হইবে কেন? আমার এই তীব্র বিদ্রূপে দেখিলাম, তাঁহাদের উদরমণ্ডলে একটা ভূমিকম্প হইল। আমি বলিলাম যে, হস্তীর সম্মুখে সম্মুখে অনুগ্রহপূর্ব্বক পদব্রজে গিয়া তাঁহাদের আমাকে ঘটনার স্থান দেখাইতে হইবে। তাঁহারা আবার বলিলেন যে, তাঁহারা কিছুই জানেন না। সেই দিন মাত্র আসিয়াছেন। দেখিলাম, ভয়ে তাঁহাদের কণ্ঠতালুকা শুষ্ক হইয়াছে। তাঁহারা আমার ক্রোধ দেখিয়া কাঁপিতেছিলেন। আর বাড়াবাড়ি না করিয়া, তাঁহাদিগকে পুলিসের পাহারায় রাখিয়া, আমি ঘটনার স্থান দেখিতে গেলাম। প্রহরীকে বলিয়া গেলাম যে, তাঁহারা যদি কোনওরূপে পলায়ন করিতে চাহেন, সে যেন বিশেষ প্রতি-বন্ধকতা না করে। স্থান দর্শন করিয়া আমি তাঁবুতে ফিরিলাম। পরদিবস কনষ্টেবল আসিয়া বলিল যে, উভয় দেওয়ান দুই পাল্কীতে পলায়ন করিয়া একেবারে পাহাড়ে মহারাজার এলেকায় প্রবেশ করিয়াছেন। পাল্কীতে কে,—লোকে জিজ্ঞাসা করিলে, বেহারারা বলিয়াছে —"দুমি মুন্সির বধূ ও পুত্রবধূ।" তাঁহারা পলায়ন করিবেন, এবং প্রজারা দেওয়ানজীদের পলায়ন দেখিয়া ভয়ে মৃতবৎ হইবে, ইহা আমারও উদ্দেশ্য ছিল। সর্বডিভিসনব্যাপী হাসির তুফান ছুটিল।

এরূপ হাঙ্গামা সম্বন্ধে আমার নীতি এই যে, আমি জমিদারপক্ষীয় লাঠিয়ালদের অপেক্ষা স্বয়ং জমিদার ও তাঁহার কর্ম্মচারীর উপর হাত চালাইয়া থাকি। কেবল লাঠিয়ালদের শাস্তি দিলে কোনও ফলই হয় না। এক দল জেলে যায় ; তাহাদের স্থান আর এক দল গ্রহণ করে। জমিদারের কিছু অর্থব্যয় হয় মাত্র। ত্রিপুরার মহারাজা স্বাধীন। তাঁহার গায়ে হাত দিবার সুবিধা নাই। আমি তৎক্ষণাৎ উভয় দেওয়ানের নামে হাঙ্গামা নিবারণ না করার ও তাহার সংবাদ না দেওয়ার অপরাধে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া একেবারে ওয়ারেণ্টের আদেশ দিলাম। পুলিস, উভয় পক্ষের কয়েক জন লাঠিয়াল মাত্র, যথাশাস্ত্র রজতমুদ্রা উদরস্থ করিয়া চালান দিল। দেওয়ানেরা উকিলপ্রমুখ সশরীরে কোর্টে আসিয়া ধরা দিলেন। এই মোকদ্দমায় তাঁহাদের কয়েক মাস নানা স্থানের জলপান করাইলাম ও অসহনীয় দুর্গতি ভোগাইলাম। তাঁহারা প্রকাশ্য কাচারিতে অশ্রুপাত করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অতঃপর তাঁহারা কখনও লাঠি ধরিবেন না। তাঁহাদের ভালমন্দ আমাকে জানাইয়া আমার পরামর্শমতে কার্য্য করিবেন। তখন লাঠিয়ালদের শাস্তি দিয়া তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দিলাম। অন্য পক্ষে প্রজাদের বলিলাম যে, যত দিন তাঁহারা লাঠি না ধরিবে, তত দিন আমি এরূপে তাহাদের অনুকূলে থাকিব। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহারা লাঠি ধরিবে, সে মুহূর্ত্তেই আমি তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হইব। তাহারাও উপরোক্ত মতে প্রতিজ্ঞা করিল। এরূপে এই এক মোকদ্দমায় মহারাজার এলেকা এরূপ ঠাণ্ডা হইয়াছিল যে, আমার আট বৎসর ফেনী অবস্থিতিকালে আর কখন একটা সামান্য মারপিটের মোকদ্দমাও রাজা প্রজায় হয় নাই।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থির ধীর শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাজেই

পুলিসের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। তাহার উপর তাঁহার জন্য এক কনষ্টেবল কবুতর আনিতে গিয়া একটি লোককে প্রহার করে। তিনি তজ্জন্য কনষ্টেবলকে ধন্যবাদ না দিয়া জরিমানা করেন। ইহাতে ডিঃ সুপারিন্টেন্ডেন্ট তাঁহার কোনও কার্য্য না করিবার জন্য পুলিসকে আদেশ প্রচার করেন। ইহার ফলে তিনি এক দিকে যেরূপ পুলিসের কাছে হতমান হন, অন্য দিকে সেরূপ পুলিসের প্রভাব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজাগণ পুলিসের প্রতিকূলে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। লবণ পরীক্ষা করা পুলিসের একটা শাস্ত্রসঙ্গত উপার্জ্জনের উপায়। ফেনীর সবইন্‌স্‌পেক্টর এক হাটে এই পরীক্ষা এরূপে অতিরিক্তভাবে আরম্ভ করেন যে, হাটের লোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার কনষ্টেবলকে এক কর্ম্মকারের কয়লা ভিজাইবার গর্ত্তে, উৎকোচের পরিবর্ত্তে উৎকৃষ্ট মুষ্টিপ্রয়োগ করিতে করিতে নিক্ষেপ করে। কার্য্যটার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; কারণ, উভয়ে এরূপ ঘন নিবিড় কৃষ্ণাঙ্গ যে, তাঁহাদের বর্ণ রঞ্জিত করিবার শক্তি অঙ্গারোদকের ছিল না। সেক্ষ্পিয়ার ইহাকে 'হাস্যকর অতিরিক্ত' (ridiculous excess) কার্য্য বলিয়াছেন। রঙ্গলাল তাহার অনুবাদ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"কোন্ মূঢ় চিত্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?"

কদাচ না। এই কৃষ্ণবর্ণের শোভা বাড়াইতে কয়লার সাধ্য কি? এই ঘটনা আমি যাইবার অল্প দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এরূপ অরাজকতানিবন্ধন, এবং ফেনী লুসাই পর্ব্বতের সান্নিধ্যে, এবং লুসাই আতঙ্কে আতঙ্কিত সবডিভিসন বলিয়া, উহা ক্ষুদ্র হইলেও আমাকে উহার ভার দেওয়ার জন্য কমিশনর গবর্ণমেণ্টকে জিদ করিয়া লিখিয়া দিলেন। আমি বড় সংকটে পড়িলাম। প্রমাণ কেবল যুগল পুলিস। ভ্রমেও সত্য কথা বলা অনেক পুলিসের ধর্ম্ম নহে। তাঁহারা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে গিয়া নিরীহ মেষশাবকের মত অকারণ প্রহারিত, রঞ্জিত, এবং ছিন্ন-পুলিস-পরিচ্ছদ হইয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্য ভূভারতে কে বিশ্বাস করিবে? যাঁহারা শাসনকার্য্য হইতে বিচারকার্য্য বিভিন্ন করিতে আন্দোলন করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি করিতে বলেন? পুলিস আত্মদোষ গোপনার্থ মিথ্যা বলিয়াছে এবং ঘটনা অতিরঞ্জিত করিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সমস্ত সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিয়া যদি আসামীদিগকে অব্যাহতি দেই, তবে পুলিস সাধারণের চক্ষে এরূপ হতমান হইয়া পড়িবে যে, শাসনকার্য্য কেন্দ্রভ্রষ্ট হইবে। ঘটনাটিও অমূলক নহে। অতএব আমি আসামীদের এরূপ কঠিন দণ্ড বিধান করিলাম যে, তাহাতে সবডিভিসন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু এরূপ ভাবে পুলিসের কার্য্যের ও প্রমাণের তীব্র সমালোচনা করিলাম যে, আপিল আদালত তাহা পাঠ করিয়া আসামীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। অন্য দিকে এরূপ সমালোচনায়, এবং বিচারসময়ে পুলিসের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনায় সমস্ত পুলিসের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে প্রত্যেক মাসে এরূপ পুলিস-বেদখলের ও প্রজার প্রতি পুলিসের অত্যাচারের ২।৪ নম্বর মোকদ্দমা হইতেছিল। ইহার পর আমি যে আট বৎসর ছিলাম, আর একটি মোকদ্দমাও হয় নাই।

এবার মুন্সেফীর পদাতিক প্রভুদের পালা। আমি ইহাদিগকে infantry বলিতাম। ইহাদের যে এখন দেশব্যাপী কিরূপ অত্যাচার, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে জানে না। সূর্য্যের প্রতাপ সহ্য হয়, কিন্তু রবিকরতপ্ত ক্ষুদ্র বালুকা অসহ্য। যেখানে ডিক্রীদার দেখিল যে, দায়িকের সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা ডিক্রীর টাকা আদায় হইবে না, সেখানে পদাতিক মহাশয় কিঞ্চিৎ দক্ষিণা লইয়া, কিম্বা যেখানে দায়িক তাঁহাকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিতে অসম্মত হইল, এই উভয় স্থানে, দায়িক বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বেদখল করিয়াছে বলিয়া তিনি ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। এরূপ মোকদ্দমাও পূর্ব্বে মাসে

২।৪ নম্বর উপস্থিত হইত। লোকে অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সময় সময় পদাতিককে পদাঘাতে আপ্যায়িত করিয়া পদাতিক নাম সার্থক করিত। এ কারণে তাঁহারা প্রত্যেক ডিক্রীজারির সময়ে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা বলিয়া থানাতে এজাহার দিয়া একজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইতেন। গোদের উপর বিস্ফোটক! একে ত পদাতিকের দক্ষিণা দিতে লোকের প্রাণান্ত, তাহার উপর আবার 'কনিষ্ঠ বুল' মহাশয়ের (জন বুলের ছোট ভাই) লাল পাগড়ির দক্ষিণা! এরূপে পদাতিক ও কনষ্টেবলদের আয় মুন্সেফের সেরেস্তাদার অপেক্ষাও অধিক দাঁড়াইয়াছিল। আমি সবর্ডিভিসনের ভার লইয়াই দেওয়ানী ডিক্রীজারিতে পুলিসের সাহায্য বন্ধ করিলাম। পেয়াদারা উত্তম মধ্যমের ভয়ে মুন্সেফকে গিয়া ধরিল। তিনি আসিয়া আমার উপর ধন্না দিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি এত ভাল লোক ছিলেন যে, পেয়াদাদের ভয়ে পর্য্যন্ত ভীত থাকিতেন। তিনি বলিলেন, দায়িকেরা পদাতিকদের হাড় গুঁড়া করিবে। আমি বলিলাম যে, পেয়াদারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম মাত্র করিলে লোকে কেন এরূপ করিবে? পদাতিকের অস্থিপঞ্জর-চূর্ণ আহার্য্য নহে, এবং তাহার সহিত দায়িকের মাধ্যাকর্ষণ-মূলক কোনওরূপ সংঘটনের কথা বিজ্ঞানে নাই। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা করিলে আমি পেনাল কোডের দ্বারা পদাতিক-পঞ্জরাভিলাষীদের পঞ্জর পরীক্ষা করিব। মোটের উপর আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, তাঁহার আদেশ পালনের জন্য পুলিসের সাহায্য লওয়া তাঁহার পক্ষে গ্লানির কথা। দেখিলাম, তিনি পেয়াদাদের অত্যাচারের কথা বড় বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই আমার হাতে প্রথম পেয়াদা বেদখলের মোকদ্দমায় এই রহস্যের উদ্ভেদ হইল। মোকদ্দমা বেশ প্রমাণ হইয়াছে। আসামী জবাব দিয়াছে যে, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। পেয়াদা অন্য লোকের গরু ক্রোক করিয়াছিল, এবং তাহার কাছে ঘুষ লইয়া ছাড়িয়া দিয়া, শেষে আসামীর কাছেও ঘুষ চাহে। সে দিতে অসম্মত হওয়াতে দায়িকের চক্রান্তে তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এজলাসের সম্মুখে এক বেঞ্চের কোণায় বসিয়া একজন বৃদ্ধ মোক্তার হাসিতেছেন। আমি তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আর একজন মোক্তার হাসিয়া বলিল যে, প্রকৃত অবস্থা কি, বৃদ্ধ তাহা জানেন। প্রথমোক্ত মোক্তার তাঁহার উপর মহাক্রোধ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, আমি তাঁহাকে থামাইলাম, এবং তাঁহার সাক্ষ্য লইতে চাহিলাম। তিনি অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া অব্যাহতি চাহিলেন। কারণ, তিনি কখনও সাক্ষ্য দেন নাই। নিজেও অবস্থাপন্ন লোক এবং পক্ষদের কাহাকেও তিনি চিনেন না। এ সকল কারণে আমি বরং তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া নিতান্ত আবশ্যক মনে করিলাম। আমি তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, সত্য সাক্ষ্য দেওয়াতে বরং ধর্ম্ম আছে, অধর্ম্ম নাই। অগত্যা তিনি প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া বলিলেন যে, "তিনি একদিন তাঁহার বাসার সম্মুখের পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সমক্ষে ট্রাঙ্ক রোডের উপর একটা গোলযোগ হইল। আসামী যেরূপ বলিয়াছিল, পেয়াদা একটি লোক হইতে কিছু লইয়া, তাহার গরু ছাড়িয়া দিয়া, উপস্থিত আসামীর কাছে কিছু চাহে এবং সে নিঃস্ব বলিয়া না দেওয়াতে তাহাকে ধমকাইয়াছিল। তিনি স্নান করিয়া গিয়া এই অত্যাচারের কথা তাঁহার প্রতিবাসী দ্বিতীয় মোক্তারকে বলিয়াছিলেন। তিনিও সে সময়ে স্নান করিতে যাইতেছিলেন। এ ঘটনার স্থান কোর্ট হইতে কয়েক হস্ত ব্যবধান মাত্র। পেয়াদার এরূপ স্থানে এরূপ নির্ভয় ভাবে এই অত্যাচারের ব্যাপার শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। পদাতিক মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গবাসী। তখন পূর্ব্ববঙ্গের মোক্তারগণ দলে বলে উঠিয়া তাহাকে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিয়া বলিলেন,—"সকল পেয়াদাই এরূপ করিয়া থাকে। এ ঘটনার পর আর করিবে না। ইতিমধ্যেই ধর্ম্মাবতারের কার্য্যকলাপে পেয়াদারা মহাভয় পাইয়াছে।" আমি মোকদ্দমাটি ডিস্‌মিস্ করিয়া, তখনই পেয়াদার প্রতিকূলে মুন্সেফের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য

মোকদ্দমা স্থাপন করিলাম, এবং তাহার দুই মাস কাল শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহার পর আর পেয়াদা-বেদখলের, কি প্রজার প্রতি পেয়াদার অত্যাচারের মোকদ্দমা আমার আট বৎসর ফেনী অবস্থিতিকালে হয় নাই। তখন সমস্ত নোয়াখালি জেলার আমলা উকিল ত ঢাকাজেলাবাসী ছিলেনই, পেয়াদারা পর্য্যন্ত সে অঞ্চলবাসী। এমন কঠিন ষড়্‌যন্ত্র যে, নোয়াখালিজেলাবাসীরা পেয়াদার কার্য্য পর্য্যন্ত পাইত না। আগাগোড়া একদল, এবং সে কারণে পেয়াদাদের এরূপ অপ্রতিহত প্রতাপ ও অকথ্য অত্যাচার। আমি জজ ও মাজিস্ট্রেটের কাছে এই ষড়্‌যন্ত্র উচ্ছেদ করি এবং তাহার ফলে আমার সময় হইতে নোয়াখালিবাসীর চাকরির আরম্ভ হয়।

২। ঘর পোড়া নিবারণ

ফেনীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎপাত ছিল—গৃহদাহ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চট্টগ্রামে এই গুরুতর অপরাধের প্রাবল্যের এবং তন্নিবারণের জন্য সর্ব্বত্র আমার নিয়োগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেখানে ইহার নাম—বেনাকানুন (torch law)। যখন কাহারও সঙ্গে কাহারও শত্রুতা হইল, কি মোকদ্দমা হইয়া আইন-কানুন-মতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়াই শেষ হইল, তখন এই 'বেনাকানুনে'র দ্বারা পরাজিত পক্ষ প্রতিহিংসার পরিতৃপ্তি করিত। অনেক স্থলে উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের এরূপে সর্ব্বস্বান্ত করিত। আমি ফেনী আসিবার কিছুদিন পরে একজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন যে, সপ্তাহ পূর্ব্বে ফেনী হইতে তাঁহার বাড়ী যাইতে পনর মাইল পথ তিনি কেবল গৃহদাহের আলোকে গিয়াছিলেন। কি ভয়ানক কথা! তাঁহার কথা অমূলক বোধ হইল না। সন্ধ্যার পর দীঘির পাড়ে বসিয়া আমি সেই শীতের সময়ে চারি দিকে দিক্‌দাহের মত অগ্নিকাণ্ড দেখিতাম। ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিলাম যে, লোকে অগ্নিভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে। অনেকে রাত্রিতে নিদ্রা যায় না। কেহ কেহ সমস্ত শীত গৃহের ছাউনি খুলিয়া রাখে। চট্টগ্রামে প্রত্যেকের বাড়ী একটি মাটির ঘর আছে। তাহাতে কোনও মতে যথাসাধ্য কথঞ্চিৎ সম্পত্তি অগ্নিদেবের গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারে। এ অঞ্চলে মাটির ঘর একেবারে নাই। সমস্ত গৃহ পার্ব্বত্য বাঁশের বেড়ার এবং 'শন' নামক এক প্রকার পার্ব্বত্য ঘাসের ছাউনির দ্বারা নির্ম্মিত। শনের দাহিকাশক্তি বারুদের মত বলিলেও হয়। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গও তাহাতে বিক্ষিপ্ত হইলে এমন প্রবলবেগে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে যে, তাহা নির্ব্বাপণ করা অসাধ্য। কয়েক মিনিটের মধ্যে এক গৃহস্থের সমস্ত ঘর, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একটি পাড়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। মোকদ্দমা করা নিষ্ফল। কারণ, এ অপরাধ এত সহজে এবং গোপনে সম্পাদিত হইতে পারে যে, কে আগুন দিয়াছে, তাহা প্রমাণ করা অসাধ্য। গৃহের বহু দূরে থাকিয়া তীরের দ্বারা অগ্নি নিক্ষেপ করিলেই যথেষ্ট। কিম্বা গভীর রাত্রিতে চালে আগুন গুঁজিয়া দেওয়াও সহজ। অপরাধী অদৃশ্য হইবার বহুক্ষণ পরে আগুন জ্বলিয়া উঠে। কিছু খরচান্ত করাইয়া যথাশাস্ত্র এক 'সি' ফারম্‌ প্রেরণ করিয়া পুলিস রিপোর্ট করে যে, বহুমতে গুপ্ত অনুসন্ধানে, কে পোড়াইয়াছে, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। অথচ গৃহ-স্বামী বিলক্ষণ জানেন, কে তাঁহার শত্রু এবং কে তাঁহার এরূপে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। কিন্তু আয়নার ছবি, ধরিবার জো নাই। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির প্রতিকূলে বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমা করিয়াও শমন করিবার উপায় নাই। কারণ, আইনকর্ত্তা প্রভুরা কার্য্যবিধির বদমায়েসির ধারা হইতে তাহার শেষ সংশোধনের সময়ে—সংশোধনই বটে!—Dangerous character (ভয়ানক চরিত্রের লোক) কথাগুলি বাদ দিয়া, কেবল যাহারা হরণ ও অপহরণ অপরাধের জন্য সন্দিগ্ধ, তাহাদের জন্যই এই অস্ত্রটি রাখিয়াছেন। ইহার ফলে এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কতকগুলি

বদমায়েস গৃহদাহ একটা ব্যবসা করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের শত্রুমিত্র নাই। ইহারা গ্রামে গিয়া বলে, আমাকে তোমরা চাঁদা করিয়া এত টাকা তুলিয়া দেও, না হয় তোমাদের বাড়ীঘর পুড়াইয়া দিব। যখন গৃহদাহ অপরাধ প্রমাণ করা অসাধ্য, এবং নালিস করিলেও ফল হয় না, তখন এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য চাঁদা না দিয়া উপায়ান্তর নাই। প্রকাশ করিলে পাছে সে জন্য বাড়ী পুড়াইয়া দেয়, এ জন্য প্রাণান্তে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ প্রকাশ পর্য্যন্ত করিতে চাহে না। একটা লোক দক্ষিণ অঞ্চলে এরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল যে, লোকে আর সহ্য করিতে না পারিয়া, আমি শিবিরে থাকিবার সময়ে আমাকে গোপনে সংবাদ দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করাইয়া ফেনী পাঠাইলে লোকের মনে সাহস ও ভরসা হইল, এবং পালে পালে বহু গ্রামের লোক সাক্ষ্য দিতে লাগিল। আমি তাহাকে ভয়প্রদর্শন ও অপহরণ (criminal intimidation and extortion) অপরাধের দুই অভিযোগে চারি বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কয়েদের আদেশ দিলাম। কিন্তু আপিলে জজ তাহাকে পরিষ্কার খালাস দিলেন,—এমনি ইংরেজ আমলের সুবিচারের গতি! তিনি বলিলেন, ইংরাজরাজ্যে একটি লোক এরূপ ভাবে প্রকাশ্য চাঁদা তোলে, তাহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। হায় রে আমার ইংরাজরাজ্য ও তস্য ধর্ম্মাবতার! সে ফিরিয়া আসিয়া যাহারা তাহার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিল, একে একে তাহাদের বাড়ী পোড়াইতে আরম্ভ করিল। আমি তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এক বাড়ীতে তাহার জন্য আমি বাঘধরা কলের মত কল পাতিলাম। খালাস হইয়া সে এত দূর নির্ভয় হইয়াছিল যে, সে পূর্ব্বে 'নোটিশ' দিয়া বাড়ী পোড়াইতে আরম্ভ করিল। এক বাড়ীতে চারি দিকে গ্রামবাসী ও পুলিসকে গোপনে রাখিলাম। সে বেনা হস্তে আগুন দিবার জন্য যখন মই লাগাইয়া এই গৃহস্থের চালে উঠিয়াছে—কারণ, চাল মাটি হইতে নাগাল পাওয়া যায় না, তখনই চারি দিক্ হইতে লোক আসিয়া 'গাছে তুলে দিয়া বঁধু কেড়ে নিলে মই!' মই সরাইয়া দীর্ঘ বাঁশের দ্বারা তাহাকে এরূপ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল যে, সে নামিতে না পারিয়া একেবারে ঘরের তুলিতে (শীর্ষভাগে) গিয়া আশ্রয় লইল। এ অবস্থায় পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া একেবারে আমার কাছে ফেনীতে লইয়া আসিল। প্রহারে তাহার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। আমি শিকারের অপেক্ষায় ছিলাম। সে অপরাধ একরার করিল। আমি তাহাকে এ বারে সেসনে সোপর্দ্দ করিয়া সেই ধর্ম্মাবতারের কাছেই প্রেরণ করিলাম, এবং আমার রায়ে লিখিলাম যে, এবার ইংরাজরাজ্যে ইহার অত্যাচারের কাহিনী তিনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করিবেন। প্রমাণ এত পরিষ্কার যে, বিশ্বাস না করিবার উপায় নাই। এ বার তিনি সেই অবিশ্বাসযোগ্য অপরাধের জন্য তাহার পাঁচ বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন। আনন্দে সমস্ত সবডিভিসন নাচিয়া উঠিল—'ঘর পোড়া'দের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

কিন্তু সকল 'ঘর পোড়া'কে এরূপে ধরিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব এই ভয়ের উপর আমি এই ভীষণ পাপ নিবারণের আর দুই উপায় উদ্ভাবন করিলাম। যে সকল নরপিশাচ শত্রুতা উদ্ধারের জন্য এরূপ মহাপাপ করে, তাহারা প্রায়ই পূর্ব্বে ধমকাইয়া থাকে। কারণ, কাহার দ্বারা গৃহদাহ হইল, গৃহস্বামী না জানিলে প্রতিহিংসার পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্তি হয় না। যাহাতে সে শুনিতে পায়, এ জন্য প্রায়ই তাহার আত্মীয়, কি প্রতিবেশীর কাছে বাহাদুরি করিয়া পাপীরা বলিয়া থাকে—"সে কেমন করিয়া চালের নীচে থাকে দেখিব।" যেখানে গৃহদাহ হইতে লাগিল, সেখানে আমি পুলিসকে এই ভয় প্রদর্শনের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রিপোর্ট করিতে কঠিন আদেশ দিলাম। তাহার ফলে প্রায়ই এরূপ ভয় প্রদর্শনের রিপোর্ট গৃহদাহের রিপোর্টের সঙ্গে আসিতে লাগিল, এবং আমি ভয় প্রদর্শনের জন্য 'সামারি' মতে তিন তিন মাস শ্রীঘরের ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। ইহার উপর আপিল নাই। 'অমৃতবাজারে'র শিশির ও মতি দাদারা 'সামারি' বিচারের যতই নিন্দা করুন, ইহা

অনেক সময়ে দেশরক্ষার অমোঘাস্ত্র। আর জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি দেশের চিরপ্রচলিত প্রথা নহে? পূর্ব্বে যে গ্রাম্য পঞ্চায়েত কি জমিদারে এ সকল মোকদ্দমা বিচার করিত, তাহাতে কি একটা প্রকাণ্ড নথি প্রস্তুত হইত? তাহাদের বিচারকার্য্যটা কি কেবল মুখে মুখে হইত না? হায়! তখন গ্রামে কত সুখ শান্তি ছিল। লোক তখন মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনা ঘোরতর অধর্ম্ম বলিয়া জানিত। দেশের সেই অসভ্য অবস্থা, আর আজ এই মোকদ্দমাদগ্ধ সভ্য অবস্থা!

যাহারা এত সাবধান যে, এরূপ ভয়প্রদর্শনও না করিয়া গোপনে নিজে বা ব্যবসায়ী 'ঘর পোড়া'র দ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আইন-বহির্ভূত উপায় অবলম্বন করিলাম। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ নামজাদা চোর ও জীবিকাশূন্য লোক। অতএব বদমায়েস বলিয়া তাহাদের এক বৎসরের জন্য সচ্চরিত্রের জামিনমোচলকা তলব করিয়া শ্রীঘরবাস ব্যবস্থা করিতে পারি। কিন্তু তাহাতে বরং ফল আরও বিষম হয়। এই শীতের সময়ে ঘর পোড়াইতেছে, কি চুরি করিতেছে বলিয়া যদি তাহাদের কয়েদ করিলাম, তাহারা পরের শীতে খালাস হইয়া আসিয়া, যাহারা সাক্ষী দিয়াছে, তাহাদের বাড়ী ঘর অগ্নিদেবকে উপহার দিবে। তখন তাহাদের আবার বদমায়েস বলিয়া আইনমতে কয়েদ করা যায় না। আইনকর্ত্তা প্রভুদের মত এই যে, এক বৎসর কয়েদ খাটিয়া তাহারা যে সংশোধিত হইয়া আসিল, তাহার পরীক্ষার জন্য তাহাদের কিছু সময় দেওয়া উচিত। ও হরি! জেলে গিয়া কি কেহ কখনও সংশোধিত হয়? বরং তাহার বিপরীত হয়। চোর-বদমায়েসের সঙ্গে মিশিয়া ও সমভাবে নির্য্যাতন ভোগ করিয়া ভাল মানুষও পাকা বদ্‌মায়েস হইয়া আসে। এ সকল কারণে আমি বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমার উপর বড় নারাজ। আমি এত ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সবডিভিসনে কার্য্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু মাদারিপুরের মত এমন ডাকাতের স্থানে, বেহারের মত এমন চোরের স্থানেও আমি বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমা করি নাই। দেশের অবস্থানভিজ্ঞ কোন কোন শ্বেতাঙ্গ প্রভুর শাসনের কয়েকটি সূত্র (axiom) আছে। শতকরা শাস্তি বেশী হইলে, বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমা বেশী হইলে, পশুর উপযোগী বেত্রাঘাত বেশী হইলে শাসনকার্য্য ভাল হইল, এবং যে কর্ম্মচারী বিবেককে ও মনুষ্যত্বকে বিসর্জ্জন করিয়া এই সকল সূত্র পালন করিল, তাহার উন্নতির পথ সমুজ্জ্বল, এবং সে ঐ প্রভুর কাছে একজন দক্ষ কর্ম্মচারী! ছোকরা মাজিস্ট্রেটগণ এই সকল ধুয়ার ক্রীতদাস। কিন্তু আমাকে বদ্‌মায়েসি মোকদ্দমা মোটেই করি নাই বলিয়া এই সূত্রভঙ্গ অপরাধের জন্য নিতান্ত পীড়াপীড়ি না করিলে আমি এই পথের পথিক হই নাই। এ সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্র প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। পুলিসে যে বদ্‌মায়েসের রেজিষ্টি আছে, তাহাতে প্রকৃত বদ্‌মায়েস ছাড়া আর সকলেরই নাম আছে। উহাই আমাদের অকর্ম্মণ্য পুলিসের ও শাসন-জ্ঞানশূন্য মাজিস্ট্রেটদের সম্বল। কোথায়ও চুরি হইল, ঘর পোড়া গেল, সে অঞ্চলের যে সকল লোকের নাম এই মহামূল্য রেজিষ্টিতে আছে, তাহাদের লইয়া কিছু দিন টানাটানি করিয়া কিছু দক্ষিণা আদায় করিলেই পুলিসতদন্ত শেষ হইল। তদ্ভিন্ন মাসিক ও ত্রৈমাসিক তাহার চরিত্র তদন্ত বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে পুলিসের বাঁধা ফিস ত আছেই। আমি এই অপূর্ব্ব রেজিষ্টির আশে পাশে ত কখন যাই না। আমি নিজে সবডিভিসনে শিবিরে ভ্রমণসময়ে লোকের কাছে তদন্ত করিয়া সকল প্রকারের বদ্‌মায়েস সম্প্রদায়ের একটি তালিকা (Black book) প্রস্তুত করি। এরূপ 'কৃষ্ণকাব্যে'র সাহায্যে মাদারিপুরে আমি নদী-ডাকাতের দলকে দল ধরিয়াছিলাম। এখানেও ঘরপোড়া ও অন্য বদ্‌মায়েসদের এরূপ এক তালিকা প্রস্তুত করিলাম। যে দিকে পরিভ্রমণে যাইতাম, সে দিকের দলকে দল ধরিতাম। গ্রামের লোককে শিখাইয়া দিতাম, যেন তাহাদের চরিত্র ভাল বলিয়া আমার কাছে প্রথম বার বলে। তাহারা সেরূপ বলিলে বদ্‌মায়েসদের এক 'লেকচার' দিতাম—"দেখিতেছিস্! তোরা এই বেচারিদের বাড়ীঘর পোড়াইয়া, চুরি করিয়া

সর্ব্বনাশ করিতেছিস, আর ইহারা তোদের বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছে। অতএব এবার তোদের ছাড়িয়া দিলাম। আমি আবার ছয় মাস পরে আসিয়া যদি তোদের বদ্-মায়েসির কথা গোপনে কাহারও মুখে শুনি, তবে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা করিব।" ইহার আশ্চর্য্য ফল হইত। ছয় মাস পরে গেলে গ্রামবাসীরা বলিত যে, বাস্তবিক এই বদ্মায়েসদের ইতিমধ্যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাদের আবার ধরিয়া আনিলে তাহারা গ্রামবাসী-দের পায়ের উপর পড়িয়া বলিত—"দাদা! তোরা বল্, আমরা এখন ভাল হইয়াছি কি না, চাষবাস করিয়া ও মজুরি করিযা খাইতেছি কি না।" লোকেরাও তাই বলিত। আমি আবার তাহাদের সেরূপ লেক্চার দিয়া ছাড়িয়া দিতাম।

তাহা ছাড়া যাহারা ঘোরতর দুষ্ট লোক, তাহাদের নামে নামমাত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া, পুলিসে তাহাদের গ্রেপ্তারের জন্য ওয়ারেণ্ট পাঠাইতাম। কিন্তু গোপনে পুলিসকে বলিয়া দিতাম যে, দুই চারি দিন পরে পরে বরাবর যেন হঠাৎ তাহাদের বাড়ীর উপর পড়িয়া একটা তোলপাড় করে; অথচ তাহাদের যেন পলায়নের পথ রাখিয়া পলায়ন করিতে দেয়। বাঘে খাওয়ার চাইতে, মার খাইবে—সে ভয় বেশী। এই বদ্মায়েসেরা এরূপে বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হইয়া খাইতে শুইতে পারিত না। এরূপে ভয়ে ভয়ে কিছু দিন কাটাইয়া, শেষে পুলিসের রিপোর্ট আসিত যে, তাহারা পলায়ন করিয়া আকিয়াব রেঙ্গুনে চলিয়া গিয়াছে। আমিও তখন মোকদ্দমা খারিজ করিয়া ফেলিতাম। সেখানে দুই তিন বৎসর থাকিয়া, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, ইহারা বেশ ভাল অবস্থাপন্ন হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিত। তাহার পরে আমি সে অঞ্চলে গেলে তাহারা আপনা হইতে আসিয়া আমাকে তাহাদের বিদেশে অবস্থিতির ও অর্থোপার্জ্জনের ইতিহাস বলিত ও কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। গ্রামের লোকেরাও তাহাদের সুখশান্তির জন্য ও ইহাদের এরূপে উদ্ধারের জন্য কত ধন্যবাদ দিত। আমি সূত্রধারী মাজিষ্ট্রেটদের জিজ্ঞাসা করি, এই শাসন কি ভাল নহে? বদ্মায়েসি মোকদ্দমায় গ্রেপ্তার করিয়া এই হতভাগ্যদের জেলে দিলে কি ফল হইত? ইহারা আরও কঠিন বদ্মায়েস হইয়া ফিরিয়া আসিত, এবং দেশের পক্ষে আরও ঘোরতর অশান্তির বিষয় হইত।

৩। পঞ্চায়েত দ্বারা তদন্তপ্রণালী

গুরুতর অপরাধ নিবারণ সম্বন্ধে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া, সামান্য অপরাধ সম্বন্ধে পঞ্চায়েতের দ্বারা তদন্তপ্রথা পূর্ণ মাত্রায় এখানে প্রচলিত করিলাম। এই প্রথা অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প মাদারিপুরে করি, কিন্তু সেখানে চালাইবার সময় পাই নাই। বেহারেও পূর্ণ মাত্রায় চালাইতে পারি নাই। কারণ, সেখানে পঞ্চায়েতগণ প্রায়ই নিরক্ষর। সে জন্য আমি বক্সি নিয়োজিত করাইয়া তাহাদের কার্য্য চালাইবার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম। কি সুন্দর ভাবে কার্য্য চলিতেছিল। কিন্তু কৃষ্ণদেশীয় লোকের প্রচলিত কোনও প্রণালী ষোল আনা গ্রহণ করিলে শ্বেত শাসনকর্ত্তাদের সম্মান থাকে না। তাঁহারা বক্সির স্থলে 'দফাদার' নামক দিল্লীর লাড্ডু সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রায়ই ফেনীর পঞ্চায়েত মোটামুটি লেখাপড়া জানে। এখানে সামান্য জমির, সমাজের ও পারিবারিক বিবাদ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা আমি পঞ্চায়েতের কাছে রিপোর্টের জন্য পাঠাইতে লাগিলাম। হুকুমনামায় আদেশ থাকিত—(১) পঞ্চায়েতগণ মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবে। (২) যদি তাহা না পারে, তবে তাহার অবস্থা সমস্ত পঞ্চায়েত মিলিয়া রিপোর্ট করিবে। ইহার ফল এই হইল যে, শতকরা ৭৫টি মোকদ্দমা গ্রামে আপোষ হইয়া যাইতে লাগিল। বাকি ২৫টি সম্বন্ধে যাহা রিপোর্ট আসিত, আমি কোর্টে একটু পীড়াপীড়ি করিলে তাহারও অনেক মিটিয়া যাইত। অবশিষ্ট শতকরা দশ পনেরটা যাহা বিচারে আসিত, তাহাতেও প্রায় পঞ্চায়েতের রিপোর্ট সত্য প্রমাণিত হইত। সহজে বুঝা যাইতে পারে যে, মোক্তার ও উকিলগণ এই প্রণালীর ঘোরতর

বিপক্ষ হইলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র এই প্রথার প্রতিকূলে দোহাই কুটেন ; কারণ, এত মোকদ্দমা মফঃস্বলে মিটিয়া গেলে তাঁহাদের অন্ন মারা যায়। এখন 'প্রাইমারি' বা মহামারী শিক্ষার কল্যাণে সকল জাতির লোক লেখাপড়া শিখে। উদ্দেশ্য পেয়াদাগিরি, কি 'কনষ্টেবলি'। তাহাও অধিকাংশের জোটে না। ইহারা হয় 'টাউট'। দেশ টাউটে মোক্তারে ছাইয়া গিয়াছে। গ্রামে দুটি লোকের মধ্যে একটুক সামান্য বিবাদ হইলে দুই পক্ষেই অমনি ছারপোকার মত 'টাউট' বা মোক্তার জুটিল, এবং নানা মিথ্যা প্রলোভনে উত্তেজিত করিয়া দুই পক্ষের দ্বারাই অতিরঞ্জিত মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। মোকদ্দমা উপস্থিত করিতেই যখন পক্ষরা দেখিল যে, প্রত্যেকের পাঁচ সাত টাকা ব্যয় হইল, এবং তাহাদের বলিদানের পাঁঠার অবস্থা হইল, তখন গ্রামে ফিরিতে ফিরিতে তাহাদের মাথা কতক শীতল হইল। এমন অবস্থায় পঞ্চায়েতেরা উভয়কে দু কথা বুঝাইয়া বলিলে তাহারা সহজেই বিবাদ মিটাইয়া ফেলে।

এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিব। একবার আমি জলপথে নোয়াখালি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভায় যাইতেছি। এক স্থানে খালের ধারে বহুতর লোক সমবেত। আমার নৌকা নিকট হইলে তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! লাল মিয়া মোক্তার হইয়া আসিয়াছে দুই মাসও হয় নাই। সে ইতিমধ্যে ছয়টি মোকদ্দমা এই দুই তিন গ্রাম হইতে দায়ের করাইয়াছে। সে আমাদের উৎসন্ন করিতেছে।" বিচিত্র কথা! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা তাহার কথায় মোকদ্দমা করে কেন? তাহারা বলিল যে, সে এরূপ প্রলোভন দেখায় যে, লোক তাহাতে ভুলিয়া এবং তাহার কথামতে মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়া জেরবার হইতেছে। তাহারা আমার নৌকা আটকাইয়া, আমার পায়ে পড়িয়া দোহাই দিতে লাগিল। তাহারা বলিল, ইতিপূর্ব্বে তাহাদের গ্রাম হইতে কোনও মোকদ্দমা হয় নাই। লাল মিয়ার জালে ভবিষ্যতে না পড়িতে নিষেধ করিয়া আমি হাসিয়া চলিয়া গেলাম। ফেনী ফিরিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই সে মোক্তার হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে সেই স্থান হইতে ছয়টি মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। আমি তাহাকে তাহার প্রতিকূলে গ্রামবাসীর নালিশের কথা বলিলে সে তোতলাইতে তোতলাইতে বলিল —"ধ—ধ—ধর্ম্মাবতার! তা—তা—রা—না—না—লিশ না—ক—ক—রিলে, আমি কি জো—জো—জোর করিয়া না—না—লিশ করাইতে পা—পা—রি?" আমি বলিলাম, সে অন্য স্থানের কোর্টে গিয়া মোক্তারি করিতে চাহিলে আমি অনুমতি দিব, কিন্তু এখানে তাহার মোক্তারির বার্ষিক সার্টিফিকেট সে আর পাইবে না। তখন সে চাঁদপুর কোর্টে চলিয়া গেল। তাহার জন্য, পরের বারে নোয়াখালি গেলে গ্রামবাসীরা আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

যাহা হউক, মোক্তারগণ আমার এই পঞ্চায়েত দ্বারা তদন্তের প্রথার প্রতিকূলে সর্ব্বত্র মাথা কুটেন। তাঁহারা বলেন যে, পঞ্চায়েতগণ ঘুষ লইয়া দেশের সর্ব্বনাশ করে। কিন্তু এ কথাটা তাঁহাদের স্বার্থপ্রণোদিত কল্পনা মাত্র। ইংরাজরাজ্যের কল্যাণে এখন প্রত্যেক গ্রামে দুই চারিটি দল, এবং এ সকল পঞ্চায়েতও দুই চারি দলের লোক। এরূপ পাঁচ জন হইতে একটা সম্মিলিত মিথ্যা রিপোর্ট সামান্য মারপিট মোকদ্দমায় আদায় করিতে কত টাকা ঘুষের আবশ্যক? তদ্ভিন্ন কোনও পক্ষ পঞ্চায়েতের রিপোর্টে অসন্তুষ্ট হইয়া আপত্তি করিলে আমি সেই মোকদ্দমার তলব দিয়া নিজে তদন্ত করি, এবং বিচার করি। এ কথা পঞ্চায়েতও জানে, পক্ষরাও জানে। কোনও পঞ্চায়েতদের রিপোর্ট মিথ্যা হইলে যে তাহাদের লইয়া টানাটানি করি, তাহাও তাহারা জানে। এমন অবস্থায় পঞ্চায়েত মিথ্যা রিপোর্ট দিতে সাহস করিবে কেন? পক্ষরা যখন জানে, পঞ্চায়েত রিপোর্ট অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবে না, আপত্তি করিলেই কোর্ট আবার মোকদ্দমা তদন্ত করিবে, তখন পঞ্চায়েতকে ঘুষই বা দিবে কেন? এরূপ বিপক্ষ দলের পাঁচ জন লোক মিলিয়া মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়াও অসম্ভব। ফলতঃ

আমি যে পঞ্চায়েতের কাছে মোকদ্দমা পাঠাই, তাহা কেবল আপোষ করাইয়া দিবার জন্য। তাহাদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া আমি কোনও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করি না। যেখানে পঞ্চায়েতদের এক সম্মিলিত রিপোর্ট না আসিয়া, দুই তিন রিপোর্ট আসে, সেখানে ত আমি নিজে প্রমাণ তলব দিয়া তদন্ত করি। এরূপ অবস্থায় পঞ্চায়েতদের কোনওরূপ অন্যায় আচরণের সম্ভাবনা নাই। আমি দেখিয়াছি, কিছু দিন এই ভাবে কার্য্য করিলে পরে মোক্তারগণ পঞ্চায়েতদের কাছে মোকদ্দমা তদন্তের জন্য পাঠাইতে নিজে প্রার্থনা করেন। ফেনীর মোক্তারেরা শেষে এই প্রথার ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং যদিও তাঁহাদের প্রাপ্য কিছু কম হইয়াছিল, তথাপি দেশের পক্ষে এই প্রথা প্রভূত মঙ্গলদায়ক বলিয়া তাঁহারা ইহার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন।

আমি আর একটি নিয়ম অবলম্বন করি বলিয়া তাঁহাদেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না। অনেক ম্যাজিষ্ট্রেট দরখাস্ত পাইয়াই নানা কারণে বহুপরিমাণ ডিস্‌মিস্ করেন। আমি দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের অনেকের বিশ্বাস এবং ইহাও একটি শাসনসূত্র যে, এরূপ করিয়া দরখাস্ত ডিস্‌মিস্ করিলে, খুব ভারি হাতে শাস্তি দিলে, কার্য্যবিধিমতে বেশী মাত্রায় শান্তিরক্ষার জামিনমোচলকা ও সচ্চরিত্রের জামিনমোচলকা লইলে এবং জমি সম্বন্ধীয় বিবাদে দখলের মোকদ্দমা স্থাপন করিলে, অপরাধের সংখ্যা কমিয়া যায়, এবং ভাল শাসন হয়। আমি দেখিয়াছি, এই সকল নীতির বরং বিপরীত ফল হয়। দরখাস্ত পাইয়াই ডিস্‌মিস্ করিলে লোকের মনে বিশ্বাস হয় যে, সামান্য মোকদ্দমা হাকিম লয় না। তখন নিজেরা লাঠি গ্রহণ করে, এবং গুরুতর ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। সামান্য অপরাধেও গুরুতর দণ্ডবিধান করিতে গেলে মিথ্যা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। একটুক সামান্য বিবাদ হইলেও টাউটরা বুঝাইয়া দেয় যে, নালিশ একটা করিলেই ক্ষতিপূরণ পাইবে ও অপর পক্ষের শাস্তি হইবে। একটা উদাহরণ দিব। বলিয়াছি, আমার বন্ধু চন্দ্রকুমার নোয়াখালির মুন্সেফ। তিনি পূজার বন্ধের পরে চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। ফেনী নদীর ঘাট পার হইয়া তিনি প্রভাত সময়ে বেড়াইতে বেড়াইতে পদব্রজে ফেনী আসিতেছেন। একটি মুসলমানের সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হইল। সেও ফেনী আসিতেছে। তিনি তাহার কাছে আমার কার্য্যের সংবাদ লইতে লাগিলেন। সে স্থানীয় উন্নতি সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিল এবং বলিল, আমি এমন সুন্দর সুন্দর ঘর প্রস্তুত করিয়াছি যে মানুষে কখনও কল্পনা করিতে পারে নাই। বিচার-কার্য্য সম্বন্ধে সে বলিল যে, বড় সুবিধা নহে। আমার বড় দয়া, আমি শাস্তি বড় কম দিয়া থাকি, সে জন্য লোকে খরচ করিয়া মোকদ্দমা করিতে চাহে না। কেবল এই কারণে আমার বদনাম হইতেছে। সে চন্দ্রকুমারকে চেনে না। চন্দ্রকুমার বলিলেন—"তুমি বুঝি টাউট।" উত্তর—"আজ্ঞা হাঁ"। সে তাহার পর বলিল, —"টাউটরা তাঁহার ভয়ে ফেনীতে প্রবেশ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। টাউট না হইলে লোকেরা মামলা মোকদ্দমা চালাইবে কিরূপে? কাজে কাজে মোকদ্দমা একেবারে কমিয়া যাইতেছে।" চন্দ্রকুমার তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া বড় হাসিলেন। ফেনী-নগরের সীমায় আসিয়া সে তাঁহাকে সেলাম করিয়া এক বৃক্ষতলায় দাঁড়াইল। সেই বৃক্ষতলা টাউটদের দপ্তর। আরও দুই একটি লোক সেখানে শিকার অন্বেষণে বসিয়া আছে। সে আর আসিবে না বুঝিয়া আমার আবাসগৃহ ফেনীর কোন্ স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছি বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলে, সে দীঘির উত্তর পারে গোল বারেণ্ডা ও বাগানবেষ্টিত বাড়ীর কথা বলিয়া, সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি তাঁহার বাসায় যাইতেছেন?" উত্তর শুনিয়া সে তাঁহার পায়ের উপর পড়িল এবং বলিল—"দোহাই আপনার! এ সকল কথা তাঁহার কাছে বলিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি নিজে তাঁহার বিচারের দোষ দিই না। তিনি একজন বড় ভাল বিচারক। এমন হাকিম ফেনী আসে নাই।" চন্দ্রকুমার হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি এ কথা আমার কাছে বলিলেও

আমার তাহাকে চিনিবার ত কোনও সম্ভাবনা নাই। সে বলিল—"হুজুর! না! তাঁহার কোনও দৈব শক্তি আছে। যাহা কেহ ধরিতে পারে না, তিনি তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলেন। আপনি এ কথা মুখের বাহির না করিতেই তিনি আমাকে ধরিয়া ফেলিবেন।" চন্দ্রকুমার আমার বাসায় পৌঁছিয়া হাসিতে হাসিতে এ গল্প করিলেন। আমি তাহার চেহারা সম্বন্ধে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাস্তবিকই তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলাম—সে লোকটি টন্নির শিরোমণি। তাহার উৎপীড়নে মোক্তারগণ ও মক্কেলরা অস্থির। সে কত লোককে ঠকাইয়াছে। আমি কিছুদিন হইতে তাহাকে ধরিবার চেষ্টায় আছি, কিন্তু লোকটি এমন চতুর, কিছুতেই তাহাকে পাকড়াও করিবার সুযোগ পাইতেছি না। ইহার অল্প দিন পরে একটি স্ত্রীলোক হইতে সে তাহার গহনা বিক্রয় করাইয়া, এক দেওয়ানি মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য ঠকাইয়া টাকা আনিয়া, কিছুই করে নাই বলিয়া একজন উকিল আমাকে গল্পচ্ছলে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করিলে, কেবল সেই স্ত্রীলোক নহে, আরও এক রাশি নালিশ তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইল। তাহাকে পূর্ব্বোক্তটির বিচারে দুই বৎসরের কারাবাসের আদেশ দিয়া, অন্য অভিযোগ সকল বিচারাধীন রাখিলাম। বলা বাহুল্য, ইহার পর টন্নিদের ফেনীর সীমান্ত বটতলার দপ্তরও বন্ধ হইল।

দরখাস্ত প্রাপ্তিমাত্র অধিক সংখ্যায় ডিস্‌মিস্‌ না করিলে, নালিশ করিলেই একটা কিনারা হইবে বলিয়া বিশ্বাসনিবন্ধন সামান্য বিবাদও লোকেরা কোর্টে উপস্থিত করে এবং এ কারণ মোক্তারদের বড় বেশী ক্ষতি হয় না। কোনওরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামা করিবারও প্রয়োজন হয় না। অতএব গুরুতর অপরাধের সংখ্যা কমিয়া যায়। সচ্চরিত্রের জামিনমোচলকার যে কিছু ফল হয় না, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শান্তিরক্ষার জন্য জামিনমোচলকার ও ভূমি দখলের মোকদ্দমার প্রশ্রয় দিলে—এমন কি, ভূমিসম্পর্কীয় বিবাদের মোকদ্দমা অবাধে গ্রহণ করিলে, বরং ঘোরতর শান্তিভঙ্গই ঘটিয়া থাকে, এবং গুরুতর অপরাধের মোকদ্দমা বৃদ্ধি হইতে থাকে। লোকে মনে করে, জমিতে হাল চাষ করিতে গেলে বিপক্ষ যদি কিছু গোলযোগ করে, তখনই একটা মারপিটের, কি নিতান্ত শান্তিভঙ্গের জামিনমোচলকার, কি দখলের মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ফৌজদারী কোর্টের দ্বারা জমিটা সহজে দখল পাইবে। কারণ, দেওয়ানী মোকদ্দমা বহু ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। ফৌজদারী মোকদ্দমা বৃদ্ধির ও হাঙ্গামা খুনের ইহাই একটি বিশেষ কারণ। এরূপ অবস্থায় প্রতিপক্ষ ছুটিয়া আসিয়া, সামান্য মারপিট না করিয়া, হয় ত সেই চাষের সময়ে হালচালকের, কি তাহার পৃষ্ঠপোষকের মাথায় এক লাঠি প্রহার করিল, আর সেখানেই একটা খুন হইল। অন্যথা উভয় পক্ষ মারামারি আরম্ভ করিল, দুই দিক্ হইতে আরও লোক যোগ দিল, এবং কোনও পক্ষে পাঁচ জনের বেশী হইলেই একটা হাঙ্গামা মোকদ্দমা উপস্থিত হইল এবং পুলিসের একটা শিকার জুটিল। ভূমিসম্বন্ধীয় বিরোধ পাইলেই পুলিসের পোয়া বার। কারণ, এরূপ মোকদ্দমায়ই উৎকোচটা অতিরিক্ত মাত্রায় আদায় করা যায়। এজন্য শাস্ত্রানুসারে পাঁচ জন কোনও পক্ষে না থাকিলেও পুলিস নিজে দুই এক জনের নাম যোগ করিয়া দিয়া একটা হাঙ্গামার এজাহার গ্রহণ করে, এবং একটা খণ্ড প্রলয় আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, দণ্ডবিধিমতে পাঁচ জন না হইলে পুলিসগ্রহণীয় হাঙ্গামা (rioting) মোকদ্দমা হয় না। একটা মারপিটেও পাঁচ জন আসামী হইলেই একটা শাস্ত্রসঙ্গত হাঙ্গামার মোকদ্দমা হইল। অথচ এরূপ শত শত মোকদ্দমা কোর্টে উপস্থিত হইয়া মারপিট বলিয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু পুলিসের হাতে পড়িলেই এই তিল গিয়া তাল হয়। অতএব আমি এরূপ মোকদ্দমা পূর্ব্বে পুলিসকে গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতাম। কিন্তু ইদানীং পুলিসের প্রতি এরূপ কোনও আদেশ প্রচার করা আমাদের পক্ষে পুলিসের কর্ত্তারা 'হারাম' বলিয়া 'গোলাকার' (Circular) আদেশ প্রচার করিয়াছেন। কারণ, তাহা হইলে পুলিসের গোলাকার জিনিসটা প্রাপ্তির পক্ষে ঘোরতর

অন্তরায় উপস্থিত হয়। তা কর্ত্তাদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আমি অন্য উপায়ে উহার নির্ব্বাণ ঘটাইয়া থাকি। যে পুলিস এরূপ মারপিটের মোকদ্দমা হাঙ্গামা সাজাইয়া গ্রহণ করে, আমি কোর্টে তাহাকে বানর সাজাইয়া থাকি। দুই এক মোকদ্দমায় এরূপ দুর্গতি ভোগ করিলে পুলিস আর এ পথের পথিক হয় না। আমি যেখানে গিয়াছি, সেখানে যে পুলিসের মোকদ্দমা কমিয়াছে, তাহার ইহাই একটি প্রধান কারণ। এ সকল মোকদ্দমাই পুলিসের কার্য্য। অন্যথা চুরি ডাকাতি ও গৃহদাহ ইত্যাদি গুরুতর অপরাধ কিনারা করা বর্ত্তমান পুলিস অনেকে তাহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না। কারণ, একদিকে তাহাতে কিছুই দক্ষিণা পাওয়া যায় না, অন্য দিকে উহাদের 'আস্কারা' (প্রমাণ) করিতে যে বিদ্যা-বুদ্ধি ও পরিশ্রম আবশ্যক, ছোট কি বড় দারোগা সাহেবদের পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও অনেকের তাহা নাই। শান্তিরক্ষার ও দখলের মোকদ্দমা এই সকল কারণে আমি প্রশ্রয় দিই না বলিয়া আমার কাছে প্রায় উপস্থিত হয় না। যাহা হয়, তাহাও আমি পঞ্চায়েতদের কাছে রিপোর্টের জন্য পাঠাইয়া দিয়া থাকি ; এবং উহা সেখানেই প্রায় আপোষ হইয়া যায়।

সবডিভিসনের পর সবডিভিসন শাসনে আমার এই সকল নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাস ও পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। ফেনীতে তাহা পূর্ণমাত্রায় অবলম্বন করাতে মোকদ্দমার সংখ্যা এরূপ কমিয়া গেল যে, আমার কি পুলিসের কিছুই কার্য্য রহিল না। আমি যেখানে গিয়াছি, সেখানের পুলিসের, আমার উর্দ্দু পরীক্ষার প্রশ্নের লিখিত সেই 'ফাকা দরফাকা' (উপবাসের উপর উপবাসের) অবস্থা ঘটে। এখানে তাঁহাদের একেবারে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল। কিছুদিন খাটিয়া পূর্ব্বের জঞ্জাল পরিষ্কার করিলে এবং আমার শাসনপ্রণালী পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত করিয়া তুলিলে আমার এক কি দুই ঘণ্টার বেশী কাজ রহিল না। অন্যান্য মাজিষ্ট্রেট কমিশনর আমাকে বাহবা দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই মানিনী মাজিষ্ট্রেটের সন্দেহ হইল যে, আমি অপরাধ গোপন করিতেছি। অন্যথা একটা সবডিভিসন এরূপ শান্তিপূর্ণ ও গুরুতর অপরাধশূন্য হইতে পারে না। আমার কাছে এক কৈফিয়ৎ তলব হইল। তাহার একটা ভিন্দিপাল গোছের উত্তর পাইয়া সেই স্ফীতোদর পুলিস সাহেবকে আর একবার গোপন অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার শ্রম এবারও পণ্ড হইল। শ্রীমতী কালাচাঁদ ডেপুটিকে কোনও মতে ধরিতে পারিলেন না।

রৈবতক কাব্য

"Out of evil cometh good".—

শ্রীভগবানের লীলা দুর্জ্ঞেয়। তিনি আমাদের ঘোরতর অমঙ্গলের মধ্য দিয়াও মঙ্গল বিধান করেন। আমি ঘোরতর বিপন্ন হইয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে চট্টগ্রাম হইতে শ্রীক্ষেত্র বদলি না হইলে আমার সেই যৌবনসুলভ বিলাস-বাসনাপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তির পবিত্র ছায়া পতিত হইত না ; আমার হৃদয়ে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইত না, আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য রচনা করিতে পারিতাম না। শ্রীক্ষেত্র যাইতে যাইতে সেই সকল অতুলনীয় মন্দিরমালা স্থানে স্থানে দেখিয়া, সর্ব্বশেষ শ্রীমন্দিরের চূড়া সুদূর আকাশপটে দর্শন করিয়া, পন্থাবাহী যাত্রীদের ও আমাদের পাল্কীবাহকদের "জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ!" ধ্বনি শুনিয়া ও সভক্তি আনন্দাশ্রু দেখিয়া, আমরাও পতিপত্নী অশ্রুপাত করিলাম। আমার হৃদয় কি এক অজ্ঞাত ভক্তির ও আনন্দের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইল। তাহার পর জগদ্বিস্ময়কর শ্রীমন্দির ও ভারতপূজিত বিগ্রহত্রয় দর্শন করিয়া আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আমি শ্রীক্ষেত্রে কার্য্যভার গ্রহণ করিবামাত্র শ্রীমন্দিরের ভার প্রাপ্ত হইলাম। ইতিপূর্ব্বে এই

ভার মাজিস্ট্রেট স্বয়ং আপনার হস্তে রাখিতেন। উৎসবের পর উৎসব ও অসংখ্য যাত্রীর ভক্তিগঙ্গা-প্রবাহ দেখিয়া, বিশেষতঃ শ্রীরথযাত্রার সময়ে আমি বালকের মত কাঁদিয়াছিলাম। কিরূপে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ষোড়শী যুবতী আমার বক্ষের উপর পড়িয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া, তাহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে বলে, সমস্ত যাত্রীর দর্শন বন্ধ করিয়া আমি কিরূপে তাহাকে শ্রীমন্দিরের মধ্যে লইয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাই, এবং কিরূপে তাহার আত্মীয়গণকে পুলিসের দ্বারা অন্বেষণ করিয়া আনিয়া, তাহাকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে চলিয়া গেলে, দর্শনমন্দিরের দক্ষিণ দ্বারস্থ সোপান-পার্শ্বে কৃত্রিম সিংহে মস্তক হেলাইয়া বসিয়া আমি ভাবিলাম যে, যদি একটি যুবতী কেবল জগন্নাথ দর্শনের জন্য ভক্তিতে এরূপ আত্মহারা হইয়া একজন অজ্ঞাত পুরুষের বক্ষে এরূপ পড়িতে পারে, তবে এরূপ রমণীরা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে তাঁহাকে লইয়া যে ব্রজলীলা করিবে, রাস-রাত্রিতে আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞানহীনা হইয়া তাঁহাকে যে শ্রীভগবান্‌জ্ঞানে আলিঙ্গন করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল। উৎসবে উৎসবে অসংখ্য যাত্রীর ভক্তির প্রবাহে আমার পাষাণ হৃদয়ও কৃষ্ণভক্তিতে আর্দ্র হইল। সেই সময়ে আমি ভাগবতের একখানি বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিতাম এবং উদ্বেলিতহৃদয়ে একাকী নির্জ্জন সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া সমুদ্রের লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে আমি কৃষ্ণলীলার লহরী ধ্যান করিতাম। এই উদ্বেলিতহৃদয়ে আমি শ্রীক্ষেত্র হইতে মাদারিপুর, মাদারিপুর হইতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বেহার সবডিভিসনে স্থানান্তরিত হইয়া যাই। বেহার বুদ্ধদেবের আদি লীলাভূমি। তাঁহার বিহারস্থল বলিয়াই ইহার নাম 'বিহার' বা বেহার। বেহার নগরের প্রান্তস্থিত শৈলশিখরে এখনও একটি বৌদ্ধ মন্দির এবং শৈল-অঙ্কে যে বেদিতে বসিয়া শ্রীবুদ্ধদেব ও তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহার ভগ্নাবশেষ আছে। এ সকল বেদির নামই 'বিহার'। বলা বাহুল্য, মন্দিরটি এখন মসজিদে পরিণত হইয়াছে। মহাভারতোক্ত 'গিরিব্রজপুরে'র ও বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত 'রাজগৃহে'র বর্ত্তমান নাম 'রাজগির'। রাজগির ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ, উভয়েরই ঐতিহাসিক লীলাক্ষেত্র, এবং উভয় লীলার স্মৃতি তাহার অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। গিরিব্রজপুর মহাভারতের বিখ্যাত মগধপতি জরাসন্ধের রাজধানী। মহাভারতোক্ত পঞ্চ গিরিবেষ্টিত গিরিব্রজপুরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। সেই পঞ্চ শৈলগিরি এখনও সেই প্রাচীন নামে অভিহিত। যে স্থানে গিরিমূলবাহী পঞ্চানন নদ পার হইয়া অর্জ্জুন ও ভীম সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ সেই শৈলদুর্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপাদস্পর্শে পবিত্রিত স্থানে এখনও একটি মেলা হইয়া থাকে, এবং এখানে প্রতি বৎসর বহু যাত্রী পঞ্চানন নদে অবগাহন করিয়া, সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী প্রদান করে। জরাসন্ধের যে মল্ল-ভূমিতে তাহাকে ভীমকর্ত্তৃক হত করিয়া, শ্রীভগবান্ জরাসন্ধের সেই রোমহর্ষণ-রাজমেধ-যজ্ঞ নিবারণ করিয়া, কিঞ্চিন্ন্যূন শত নরপতিকে কারামুক্ত করিয়াছিলেন, সেই মল্লভূমি মসৃণমৃত্তিকা বন্ধুর উপলখণ্ডের বক্ষে এখনও বর্ত্তমান। এই শৈলপরিখাবেষ্টিত ভীষণ দুর্গের বহির্ভাগে বৌদ্ধ ইতিহাসের 'রাজগৃহে'র ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকাস্তূপ স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। বুদ্ধদেব নিরঞ্জনাতীরে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া আসিয়া, রাজগৃহের সেই শৈলকক্ষে ধ্যানস্থ থাকিতেন, এবং তাঁহার তিরোধানের পর যে কক্ষে তাঁহার সার্দ্ধ দুই শত শিষ্য সম্মিলিত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের আদি গ্রন্থসকল প্রণয়ন করেন, সেই কক্ষও এখন শোচনীয় অবস্থায় বিদ্যমান। তাহার বর্ত্তমান নাম "সোনভাণ্ডার"। ইউরোপের কোন স্থান

হইলে আজ এই দুই কক্ষ, এই ঐতিহাসিক নিদর্শন সকল কি মহিমার সহিত রক্ষিত হইত! এতদ্ভিন্ন বেহারে এমন গ্রাম নাই, যাহাতে ভগ্ন বৌদ্ধমন্দিরের একটি স্তূপ, এবং তাহাতে স্থাপিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয় না। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ ব্রডলি (Broadley) এই সকল দেখিয়া বহুবিধ বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং যাইবার সময়ে উহা বেহারের স্কুল লাইব্রেরীতে দান করিয়াছিলেন। আমি এই সকল গ্রন্থ মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলাম এবং রাজগিরে প্রথম বার শিবিরবাসকালে মহাভারতের মূল উপাখ্যানভাগ আর এক বার পাঠ করিলাম। এত দিন ইংরাজের শিষ্যত্বের কল্যাণে আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মহাভারতখানি একটি অদ্ভুত গল্প মাত্র। বাস্তবিক শ্রীকৃষ্ণ কেহ ছিলেন না। থাকিলেও তিনি একজন কূটনীতিপরায়ণ রাজনৈতিক ছিলেন মাত্র। 'বঙ্গদর্শন' একবার বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতের বিসমার্ক (Bismark); অর্জ্জুনের রথে বসিয়া তিনি ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালে রাজগিরে শিবিরে বসিয়া মহাভারত পড়িতে পড়িতে আমার প্রথম ধারণা হইল যে, মহাভারত কেবল অতুলনীয় মহাকাব্য (stupendous epic) নহে, উহা ঐতিহাসিক মহাকাব্য। উহা মহাকাব্য হইলেও উহার প্রত্যেক শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে ইতিহাস প্রবাহিত। সেই প্রাচীন গিরিব্রজপুর কল্পনার সৃষ্টি নহে, উহা মগধরাজের ঐতিহাসিক রাজধানী। তাহার অস্থিপঞ্জর সকলই আমার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। মহাভারতে তাহার যে ভৌগোলিক নির্দ্দেশ (Geography) আছে, তাহা এখনও বর্ত্তমান। তাহার বহির্ভাগে সেই বৌদ্ধ-ইতিহাসের রাজগৃহের ভগ্ন অট্টালিকাস্তূপরাশি ও গিরিগুম্ফা এখনও তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস নীরবে দর্শকের নয়নে উদ্ঘাটিত করিতেছে। তখন দুটি মহামূর্ত্তি আমার হৃদয়ে আকাশে পূর্ণিমাসন্ধ্যার পূর্ণচন্দ্রের মত ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবুদ্ধ। বুঝিলাম, অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম **মহাভারত**। বুঝিলাম, মহাভারত ভরতবংশের ইতিহাস নহে, মহাভারত মহাভারতসাম্রাজ্য (the great Indian Empire.)। এই সাম্রাজ্যের নাম 'ধর্ম্মরাজ্য'; ইহার সম্রাটের নাম 'ধর্ম্মরাজ'; যে মহাক্ষেত্রে ইহা স্থাপিত হয়, তাহার নাম 'ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র'। এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি তাঁহার গীতোক্ত অনাসক্ত বা নিষ্কাম ধর্ম্ম। এই জন্য ইহার নাম ধর্ম্মরাজ্য। বুঝিলাম, শ্রীকৃষ্ণস্থাপিত ধর্ম্মরাজ্যই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য। বুঝিলাম, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না। বুঝিলাম, তিনি এবং তাঁহার শ্রীমুখের গীতোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আশা নাই। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পরে সেই মহাধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল। চতুর্বর্ণ 'গুণকর্ম্মবিভাগমূলক না হইয়া, জন্মগত হইয়া, ব্রাহ্মণপ্রাধান্যে ভারত আবার জীবঘাতী যাগ-যজ্ঞের জীব-রক্তে প্লাবিত হইতেছিল। তখন— "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং

সদয় হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং

কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর।"

তখন শ্রীকৃষ্ণ আবার বুদ্ধশরীর ধারণ করিয়া, তাঁহার বিষাণনিনাদে বর্ণভেদ উড়াইয়া দিয়া যে মহাসাম্যবাদ ও কর্ম্মবাদ প্রচার করেন, তাহা সহস্র বৎসর ভারত প্লাবিত করে। এখনও তাহা অর্দ্ধাধিক মানবের ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতেছে। সেই বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতবর্ষের রূপান্তরিত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিরত্ন—বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ আজ শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, বলভদ্র সুভদ্রা। বঙ্গের বরপুত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কৃপায় এখন কাহারও জানিবার

বাকী নাই যে, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের পূজার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা যে তিন মণ্ডল কল্পনা করিয়াছিলেন, জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা এই তিন মণ্ডলেরই আকৃতি মাত্র। সুভদ্রার বিবাহ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও বলভদ্র অর্জ্জুনকে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের প্রধান অস্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া, হিন্দু শাস্ত্রকার শ্রীবুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতারে ও শ্রীক্ষেত্রকে বিষ্ণুক্ষেত্রে পরিণত করিবার সময়ে উক্ত তিন মণ্ডলাকৃতিকে এই তিন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধ ও ধর্ম্মের মধ্যস্থলে যেমন সঙ্ঘ অর্থাৎ বৌদ্ধ শ্রমণ বা সন্ন্যাসিসম্প্রদায়, তেমন শ্রীকৃষ্ণ ও বলের অবতার অর্জ্জুনের মধ্যে সুভদ্রা। বুঝিলাম, অতিমানুষিক শক্তিবলে ও কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে ধর্ম্ম, রাজ্য ও সমাজ সংস্কার করিয়া এবং তিনই নিষ্কামমন্ত্রের উপর স্থাপিত করিয়া এই মহাধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই জন্যই ভারতীয় শাস্ত্রে অন্য সকলে অবতার, আর "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। অন্য সকলে অবতার,—কারণ তাঁহারা এক এক সংস্কারকার্য্য সাধন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সর্ব্বপ্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর কোনও অবতার বা ধর্ম্ম-প্রচারক তাহা করেন নাই। তাই তিনি পূর্ণ ভগবান্। আমি এই দুই মহামূর্ত্তি দেখিলাম, এবং ভক্তিতে অধীর হইয়া তাঁহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণত হইলাম। এক দিকে 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' এবং অন্য দিকে 'অমিতাভ' অঙ্কুরিত হইল।

এই সময়ে 'ষ্টেটস্‌ম্যান্' পত্রিকায় হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটি পত্রযুদ্ধ চলিতেছিল। যোদ্ধা এক পক্ষে "পিগট হেষ্টি মিষ্টি কথার" রেভেরেণ্ড হেষ্টি, অন্য পক্ষে 'রাম শর্ম্মা' নামধারী বঙ্কিমচন্দ্র। আমি বঙ্কিমবাবুকে লিখিলাম যে, একজন ভিন্নধর্ম্মদ্বেষী খ্রীষ্টান মিশনারীর সঙ্গে এই নিষ্ফল পত্রযুদ্ধে তাঁহার মহামূল্য সময় নষ্ট না করিয়া, তিনি যদি তাঁহার শেষ জীবনে, হিন্দুধর্ম্ম, গঙ্গোত্তরী বেদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, কিরূপে গঙ্গাসাগরে পরিণত হইয়াছে, তাহার একটি দার্শনিক ইতিহাস (philosophical history) লেখেন, তবে উহা তাঁহার প্রতিভার ও শক্তির একটি যুগান্তকারী কার্য্য হইবে। খ্রীষ্টা[illegible]র ধর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'বাইবেল' দেখাইয়া দেন। মুসলমানদের ধর্ম্ম কি, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা 'কোরাণ' দেখাইয়া দেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম কি,—তাহা যদি অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বী জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমাদের এমন কোনও গ্রন্থ নাই যে, তাহা দেখাইয়া দিতে পারি। আমাদের ধর্ম্ম-শিক্ষক অনন্ত, ধর্ম্ম-গ্রন্থও অনন্ত। এ কারণে আমরা আমাদের ধর্ম্মের কিছুই শিখিতে, কি আপন সন্তানদের শিক্ষা দিতে পারি না। লিখিয়াছিলাম যে, এই ইতিহাসে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীবুদ্ধের প্রাধান্য আসিবে। কারণ, আমার ধারণা হইয়াছে যে তাঁহাদের আমরা চিনিতে পারি নাই। বঙ্কিমবাবু এ পত্রের উত্তরে লিখিলেন যে, আমি যে বৃহৎ কার্য্য (grand work) তাঁহার দ্বারা করাইতে চাই, উহা শেষ জীবনে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ এরূপ কার্য্যের জন্য যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার নাই। তাহার পর আমি সুহৃদ্‌বর প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে লিখিলাম। তিনিও পারিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিলেন। কিন্তু আমি কেমন অস্থির ও আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমার হৃদয়ে কি এক মহাভাব, মহা আকাঙ্ক্ষা ও মহা আবেগ সঞ্চারিত হইয়া আমাকে পাগলের মত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার আহারে, বিহারে, আফিসের কার্য্যে কিছুতেই মন যাইতেছিল না। কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। আসনে, শয্যায়, বিচারালয়ে, অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণে, সকল সময়ে এই দুই মহামূর্ত্তি ও তাঁহাদের অমানুষিক লীলা আমার হৃদয়ে জাগিতে ও নয়নাগ্রে ভাসিতে লাগিল। আমি এই আত্মহারা ভাবে কি এক অচিন্তনীয় আবেগের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে খণ্ড ভারতে মহাভারত

স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কাব্যাকারে দেখাইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি কাব্যের প্রস্তাবনা লিখিলাম—'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাস'। রৈবতকের প্রথম তিন সর্গ লিখিয়া বঙ্কিমবাবুর কাছে উপরোক্ত ব্যাকুল ভাব উল্লেখ করিয়া সকল কথা লিখিলাম। তিনি আমার প্রস্তাবনা (plot) এবং রৈবতকের লিখিতাংশ দেখিতে চাহিলেন। আমি পাঠাইয়া দিলাম।

কয়েক মাস পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারিতে তিনি জাজপুর হইতে উহা ফিরাইয়া দিয়া আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাহাতে প্রথম লেখেন—

"You have planned a new 'Mahabharat' indeed—an exceedingly ambitious work—the most ambitious perhaps since the days of হরিবংশ and অধ্যাত্ম রামায়ণ। It is nothing against the plan that it is ambitious. Provided that you execute with the same grandeur as you have planned, you will perfectly justify yourself. Properly executed, the poem will of course take its rank as the greatest in the language."

"I warn you, however, not to be too cofident of success; of popularity I cannot promise you much. If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the nineteenth century."

এরূপে কার্যটি বড় কঠিন বলিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে উহা আগা গোড়া লিখিতে নিষেধ করেন—

"Blank verse is recognised as proper to Epic poetry in English—but it is certainly very unsuited to Bengalee epics. M. S. Dutta alone has been able to make something of it—but even his success has been achieved at a lamentable sacrifice of grammar, idiom and perspicuity. Even in English, it gives to even such a poem as the 'Paradise Lost' a weary uninformity which makes it very dismal reading. * * * *. If you continue the poem, my advice is that you should change the ছন্দ at every chapter, and let it generally be rhyme."

প্রথম তিন সর্গ ভিন্ন আর সমস্ত সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা আমারও উদ্দেশ্য ছিল না। তাহার পর কাব্যের দীর্ঘতা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া লেখেন—

"Lastly will your poem be historically and politically true? I have advised you to keep clear of history, but I cannot advise you to run counter to history. Even this you may do so far as individual characters are concerned, but I am hardly bold enough to advise you to do so in the case of large national movements. Now I believe that it is not historically true, either that Krishna set himself against Brahmanical authority (there was never a greater Champion of it)—or that the Brahmans ever coalesced with the non-Aryans in order to put down the Kshatriyas."

তাহার পর অভিমন্যুর মৃত্যু লইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাব্য লিখিতে নিষেধ করেন। কারণ—

"the death of Abhimanyu does not materially either retard or accelerate the main action or even its second stage, viz, the establish-

ment of the Empire." পত্রের উপসংহারে লেখেন—"You will thus see I have thus tried to act towards you honestly and conscentiously. I do not write to dissuade you from the attempt—but I warn you of the difficulties. The old Mahabharat is so grand and has such a deep hold of your readers that only first class execution can make the new acceptable to them."

রৈবতক কাব্যের হস্তলিপির প্রথম সর্গের নিম্নে লিখিয়াছেন—

REMARKS ON CHAPTER 1

Krishna preached, if he preached any thing devotion to the Brahmans. It is against all tradition and written knowledge to set him up against the Brahmans. But the modern poet is of course welcome to give a new character to Krishna, which this chapter does.

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্গ তখন এক সর্গ ছিল। তাহার নীচে লিখিয়াছিলেন—

The reflective, contemplative, descriptive, and sentimental portion in the earlier part of this chapter need be curtailed. They interfere with the action. The latter part (বর্ত্তমান তৃতীয় সর্গ) is excellent.

অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে একমত হইয়া কেবল আমার কাব্যের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে তাঁহাকে এক পত্র লিখিলাম। দুটি বিষয়ে আমি ইতিহাসের প্রতিকূলে যাইতেছি বলিয়া তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন—প্রথমতঃ আমি শ্রীকৃষ্ণকে Religious Reformer (ধর্ম্ম-সংস্কারক), এবং মহাভারত (the great Indian Empire) স্থাপক বলিয়া তাঁহাকে new character (নূতন চরিত্র) দিতেছি। দ্বিতীয়তঃ ইহা historically and politically untrue (ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ভাবে অসত্য) যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণশক্তির বিরোধী ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়দিগকে দমন করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা অনার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। এ পত্রের উত্তরে আমি তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যদি ধর্ম্মসংস্কার বা ধর্ম্মসংস্থাপন, এবং ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্য ছিল না, তবে তাঁহার লক্ষ্য কি ছিল? ভাগবতে দেখি শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরেই বৈদিক ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া ঘোরতর কর্ম্মবাদ প্রচার করেন? * ইহার অর্থ যদি ধর্ম্মসংস্কার না হয়, তবে কি? কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সমর্থনকারী (champion) হইলে ভাগবতের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা ক্ষুধার্ত্ত কিশোর কৃষ্ণকে এক মুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত ভিক্ষা দিয়াছিল না কেন? কৃষ্ণসখা বনবাসী পাণ্ডবদের দুর্ব্বাসা ঋষির সশিষ্য জব্দ করিতে যাওয়ার, এবং কৃষ্ণের শাকভোজনে তাঁহার পরাভবের অর্থ কি? ভৃগু মুনির কৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করিবার অর্থ কি? কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের পঞ্চ গ্রাম ভিক্ষা পর্য্যন্ত নিষ্ফল করিয়া, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ঘটাইয়া, ভারত নিক্ষত্রিয় করিল কে?—কর্ণ! কর্ণ কে? দুর্ব্বাসার মন্ত্রজাত কুন্তীর কানীন পুত্র। এই মন্ত্রজাত পুত্রের অর্থ কি? সূর্য্য কি মানুষীর গর্ভে এরূপে পুত্র উৎপাদন করিতে পারেন? ব্রাহ্মণ ঋষিঠাকুরদের অভিশাপ ক্ষত্রিয়াবশিষ্ট কৃষ্ণের বংশের ধ্বংসের এবং দুর্ব্বাসার অভিশাপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অপমৃত্যুর অর্থ কি? মুষলের ও দুর্ব্বাসার পায়সের গল্প কি বঙ্কিমবাবু বিশ্বাস করেন? আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে কৃষ্ণের অপমৃত্যু ঘটাইল কে?—অনার্য্য জরাব্যাধ! ব্রাহ্মণদের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসের ফলভোগ হইল কেন?—আবার অনার্য্য ব্যাধেরা যাদবদের সর্ব্বস্ব—এমন কি, রমণীদের পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিয়া লইল কেন? তাহার পর ব্রহ্মশাপে পরীক্ষিতকে হত্যা

করিল কে?—তক্ষক! তক্ষক কি সর্প, না অনার্য্য নাগপতি তক্ষক? অনার্য্য তক্ষক পরীক্ষিতকে হত্যা করিলেন কেন? তাহাও আবার ব্রাহ্মণের অভিশাপে। এরূপে সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণের অভিশাপ কার্য্যে পরিণত করিবার অস্ত্র,—অনার্য্য! ইহার কারণ কি? সর্ব্বশেষ জনমেজয়ের সর্পসত্রের অর্থ কি সাপ পোড়ান, না পিতৃহন্তা নাগজাতির সঙ্গে রাজ্যোদ্ধারার্থ যুদ্ধ? এই যুদ্ধে নাগজাতিকে কে রক্ষা করিয়াছিল?—আস্তিক। আস্তিক কে?—ব্রাহ্মণ জগৎকারু ঋষির পুত্র। তাহার মাতা কে?—অনার্য্য নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী জরৎকারু। ব্রাহ্মণ ঋষিঠাকুর তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি কি সাপ বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং সাপের গর্ভে মানুষ আস্তিক জন্মাইয়াছিল? এবম্বিধ ঘটনাবলীর অর্থ কি এই নহে যে, দুর্ব্বাসাপ্রমুখ এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের ঘোরতর বিরোধী হইয়াছিলেন, এবং অনার্য্য জাতির সঙ্গে মিলিত হইয়া সবংশ তাঁহার বংশের এবং সমগ্র ক্ষত্রিয়বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন? দুর্ব্বাসা যে কৃষ্ণবিদ্বেষী ছিলেন, বঙ্কিমবাবু এ কথা পরে 'কৃষ্ণচরিত্রে' স্বীকার করিয়াছেন। যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রকমসকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগকে আশ্রয় হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। উপসংহারে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি যখন এরূপ তীব্রভাবে এই কাব্য লিখিতে বারণ করিতেছেন, তখন উহা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আমি পরিত্যাগ করিলাম।

এই তীব্র সমালোচনায় ভগ্নসাহস হইয়া পড়িলাম। বঙ্কিমবাবুর উত্তর পাইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, আমার বন্ধু প্রফুল্লের মত চাহিয়াছিলাম। আমি এরূপ কাব্যে হাত দিতে সাহস করিয়াছি বলিয়া প্রফুল্ল দুর্ব্বাসার মত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর শাণিত বিদ্রূপ ও গালি বর্ষণ করিলেন। তাহার পর আমার অদৃষ্ট বন্ধু ঢাকার স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়েরও মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেবল তিনি মাত্র আমাকে কিঞ্চিৎ উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি আপনার কাব্য-সূচনীর এক খোষখত নকল করাইয়া রাখিয়াছিলাম। সেইটি ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া পড়িয়াছি। Conception extraordinarily grand. Execution ঠিক তেমনই হইবে কি না, সে বিষয়ে সংশয় আছে। মহাভারতরূপ কাব্যসমুদ্রকে আবার সাঁচে ঢালিয়া নূতন করিতে যাওয়া বড় স্পর্দ্ধার কথা, পারিলে অসামান্য সুখের কথা। আমি গৌরব না বলিয়া সুখ বলিলাম। কারণ, এখনকার দিনে বেণে ও মুদির দোকানেও যশ ও গৌরব খরিদ করিতে পাওয়া যায়। লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন কি? এই কাব্যের প্রকাশ দেখিয়া যাইতে পাইব কি? এত দিন বাঁচিব কি?"

আবার কয়েক মাস পরে, ১৮৮৩ সালের ১৩ই মে তারিখে, বঙ্কিমবাবু আমার উক্ত পত্রের উত্তরে আমার উত্থাপিত প্রশ্নাদির কোনও উত্তর না দিয়া কেবল এই মাত্র লিখিলেন—

"I do not quite understand why you should feel any diffidence in carrying on the Roibatak. My own plan is never to seek the opinions of others, and as I have found by experience that my interference in the way of advice or criticism has spoilt many a fine work, I give none myself. It is a rule with me at present to pass no opinion on contemporary productions. Genius—even mere latent,—must work out its conception."

আর লিখি কি না লিখি করিতে করিতে আরও কিছু দিন কাটিয়া গেল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে ভাগলপুরে বদলি হইয়াই তিন মাস ছুটির দরখাস্ত করিলাম, এবং ছুটি মঞ্জুর হইলে বাড়ী চলিয়া গেলাম। এরূপে যদিও বৎসরের অধিক চলিয়া গিয়াছে

এবং এরূপ নিরুৎসাহ পাইয়াছি, তথাপি আমি এক মুহূর্ত্তও এই বিষয় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। অবশেষে সেই অজ্ঞাত আবেগে ইচ্ছাহীন পুতুলের মত চালিত হইয়া আমি আবার 'রৈবতক' লিখিতে আরম্ভ করি, এবং এই তিন মাস ছুটিতে কয়েক সর্গ লিখিয়া ফেলি। তাহার পর নোয়াখালিতে কয়েক সর্গ লিখি, এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেনীতে উহা প্রায় শেষ করিয়া আমি গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়ি। প্রথমার্দ্ধ নকল করাইয়া সেই বৎসরই প্রেসে পাঠাই। স্মরণ হয়, শেষ দুই এক সর্গ মাত্র লিখিবার বাকী ছিল। দীর্ঘ কাল রোগে ভুগিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ১৬ই আগষ্ট ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফেনীতে এই কাব্য সমাপ্ত করি। প্রথম প্রেস প্রায় বৎসরকাল উহা ফেলিয়া রাখিয়া, দুই সর্গ মাত্র ছাপিয়া ফেল হয়। তখন উহা বসু প্রেসে অর্পণ করি, এবং বাকী অর্দ্ধাংশও প্রেসে পাঠাই। প্রুফ দেখিবার ভার কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা আমার পরম সুহৃদ্ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করি। ঈশান যেমন সুপুরুষ, তেমন সহৃদয়। ঈশান নিজেও কবি এবং তাহার কবিতা তাহার হৃদয়ের মত সুমধুর, সুকোমল ও সরল। কল্পনাপ্রবণ কবি-হৃদয় চিরদিনই কুটিল সংসারের ক্রীড়া-কন্দুক! মধুসূদনের শোচনীয় মৃত্যু লক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

> "হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
> কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
> যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
> সেই সে দরিদ্র হবে॥"

তিনি নিজেও সেই দুঃখে মরিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা ঈশান তাঁহার পূর্ব্বেই ততোধিক দুঃখে মরিয়াছিল। তবে তাহার মৃত্যু প্রেমিক কবির মৃত্যু।

ঈশান প্রথমার্দ্ধের মুদ্রিতাংশ ও হস্তলিপি প্রেস হইতে লইয়া ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে আমাকে লিখিলেন—

"শনিবার রাত্রে বসু প্রেস হইতে তোমার 'রৈবতকে'র হস্তলিপি ও মুদ্রিত অংশের এক এক ফরমা লইয়া তবে বাড়ী যাই। ** রৈবতকের তৃতীয় সর্গের কিয়দংশ মাত্র বাদে (উহা যন্ত্রস্থ ছিল) ১০ সর্গের আদ্যোপান্ত 'এক নিশ্বাসে'ই পড়িয়াছি। অধিক সময় লইতে পারিলাম না। কেন না, হস্তলিপি শীঘ্রই প্রেসে পাঠাইতে হইবে। রৈবতক কেমন হইয়াছে, সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তুমি আমা অপেক্ষা ঢের লিখিয়াছ—ঢের ভাবিয়াছ—ঢের পড়িয়াছ—ঢের বুঝিয়াছ। তোমার শিরায় শিরায়—মেদে মেদে—অস্থিতে অস্থিতে কবিতা—তোমার জীবন কাব্যপূর্ণ,—তুমি সাহিত্যের কবি,—তুমি সংসারের কবি,—তোমার কবিতা কেমন, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করা বিড়ম্বনা বই আর কি? আমি তোষামোদ করিতেছি না,—প্রাণের কথা বলিলাম। তোমার কবিতা আমার প্রতিভা,—আমি তোমার কবিতা না পড়িলে কাব্য লিখিতে পারি না। তোমার কাব্য না ভাবিলে আমার কল্পনা জাগে না। আমি প্রকৃতি দেখিয়া,—প্রণয়ে ডুবিয়া,—যে কবিতা বুঝি নাই,—তোমার কবিতায় তাহা সহজেই বুঝি। জানি না, ইহা কাহার বন্ধন! সত্যই আমার মনে হয় যে, আমাদের জীবনে এমন একটি একটি উৎস আছে, যাহা স্বতঃই একমুখী হইতে চাহিতেছে। নবীন! ইচ্ছা করে, তোমার আমার প্রাণের মিলন জগৎকে দেখাইয়া যাই। কিন্তু দেখাই কি করিয়া? আমি আমার যে কাব্যখানি তোমায় উৎসর্গ করিব, তাহার ভূমিকায় এ কথা প্রাণের সাধে বলিব। তোমার জীবনী আমার কাছে আদ্যোপান্ত পাঠাইও। জানি না, তোমার অপর বন্ধু বান্ধব কেমন। কিন্তু স্থির জানিও যে, মুগ্ধা রমণী প্রাণেশ্বরের প্রতি যেরূপ আসক্তা, আমি বুঝি তাহার কিছু মাত্র ন্যূন নহি। জানিও যে, তোমার জীবনের কবিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার মত বুঝি আর কেহ পারে নাই। তোমার কবিত্বের কেবলমাত্র মোহিনী শক্তি

করিতে আমার মত বুঝি আর কেহ পারে নাই। তোমার কবিত্বের কেবলমাত্র মোহিনী শক্তি অনেকে বুঝিয়াছে, কিন্তু তাহার মহত্ত্ব, দেবত্ব বুঝি অতি অল্প লোকেই বুঝিয়াছে। তুমি বুঝিও যে, তোমার জীবনী পড়িবার ও রাখিবার যদি কেহ উপযুক্ত হয়, তবে সে আমি। আমার ইচ্ছা করে যে, তোমার কোন পুস্তকের ভূমিকা লিখি। কিন্তু পাছে আমার নাম তোমার কাব্যের সহিত মিশাইলে তোমার কাব্যের গৌরব হ্রাস হয়, তাই ভরসা করিতে পারি না।"

হা! ঈশান! তুমি আজ কোথায়? তোমার পত্র পড়িতে পড়িতে আমি যে শিশুর মত আকুলহৃদয়ে কাঁদিতেছি, তুমি কি দেখিতেছ? আমার যে জীবনী তখনই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এবং যাহা তুমি এরূপ আকুলহৃদয়ে দেখিতে চাহিয়াছিলে, বিশ বৎসর পরে সেই জীবনী লেখা শেষ হইতেছে, আর তুমি আজ কোথায়? "তোমার নাম আমার কাব্যের সহিত মিশাইবার" জন্যই এই রৈবতকের ভূমিকায় তোমার নাম লিখিয়া রাখিয়াছি এবং তোমার এ অপার্থিব বন্ধুতার স্মৃতি এই জীবনীতে জড়িত করিয়া রাখিবার জন্য তোমার এই প্রেমপূর্ণ উচ্ছ্বাস এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ঈশান তাহার পর লিখিয়াছিলেন—

"রৈবতক সত্য সত্যই এক বৃহৎ ব্যাপার। রৈবতক তোমার তরঙ্গায়িত হৃদয়সমুদ্রের প্রশান্ত মূর্ত্তি। রৈবতকের এই কয় সর্গে তুমি দেখাইয়াছ যে, তোমার মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড জিনিস ঢুকিয়াছে। আমি রৈবতক পড়িতে পড়িতে যেন স্বপ্ন দেখিতেছি যে, একজন উন্নত কবি বিস্ফারিতনেত্রে শূন্য পানে চাহিয়া আছে। তাহার চক্ষের উপর সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় ভাসিয়া রহিয়াছে। রৈবতকের গাম্ভীর্য্য আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। ভাবের সঙ্গে ভাষাও মহামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।" তাহার পর তিনি 'পোড়ামুখী' 'ঠোন্‌কা' প্রভৃতি শব্দগুলি পরিবর্ত্তন করিতে অনুমতি চাহেন। ঠাট্টা তামাসার ভাব রক্ষা করিয়া পরিবর্ত্তন করিতে আমি অনুমতি দিয়াছিলাম। তাহার পর ঈশান দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশের নকল পাইয়া এবং ধীরে ধীরে আবার সমস্ত রৈবতক পাঠ শেষ করিয়া ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি হুগলী হইতে লেখেন—

"আমি তোমার 'রৈবতক' আদ্যোপান্ত পড়িলাম; এক নিশ্বাসে পড়িতে বলিয়াছিলে, তাহাই করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে বিস্মিত, মোহিত, উত্তেজিত ও ভক্তি-গদ্‌গদ হইয়াছি। কিন্তু কেবল গুণ গাহিবার সময় এখন নহে। এখন যাহাতে পৃথিবীর লোকে রৈবতকের গুণ গায়, যাহাতে সে গুণ-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে চির-জীবন আনন্দে বিভোর হইতে পারি, তাহার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছি। তবে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। তুমি স্থানে স্থানে দর্শন ও বিজ্ঞানের ভারি ভারি নিতান্ত দুরূহ কথাগুলি এমনি জলের মত বুঝাইয়াছ, ইংরাজ Roorki Ganges Canal লইয়া যেরূপ অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়া ক্রীড়া করিয়াছে, তুমিও কূটতত্ত্ব লইয়া তাহাই করিয়াছ। পড়িতে পড়িতে তোমাকে বুকে করিয়া ধরিতে ইচ্ছা করে। এক্ষণে আমার বক্তব্য বলি।

"সত্য সত্যই তুমি একখানি নূতন মহাভারত লিখিয়াছ। কিন্তু প্রাচীন মহাভারতের চরিত্র ও তোমার মহাভারতের চরিত্র এক নহে। মহাভারতের কৃষ্ণ দেবতা—তোমার কৃষ্ণ বিসমার্ক, নয় গ্লাডস্টোন, নয় রিসিলু। মহাভারতের কৃষ্ণ মুখব্যাদান করিয়া ব্রহ্মাণ্ড দেখান, মহাভারতের কৃষ্ণ ধ্যানবলে ত্রিকালজ্ঞ। মহাভারতের কৃষ্ণের কার্য্যে হিন্দুর দেবত্ব আছে। তোমার কৃষ্ণের কার্য্যে দেবত্ব যে একেবারে নাই, তাহা নহে; 'পলিটিকত্ব'তে সে দেবত্ব স্থানে স্থানে ঢাকা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমি জানি যে, প্রাচীন কথা ইংরাজি ফ্যাসানে না সাজাইলে এখনকার পাঠকের হৃদয়ে স্থান পাইবে না। কিন্ত তাই বলিয়া কি কৃষ্ণকে বিস-মার্ক, না হয় চাণক্য পণ্ডিত করিতে চাও?" তাহার পর ব্যাসদেবের চরিত্র আরও ফুটাইতে লিখিয়া, দুর্ব্বাসাচরিত্রের ঐতিহাসিকতা কি, জিজ্ঞাসা করিয়া ঈশান লেখেন—"তবে এই

পর্য্যন্ত জানি যে, যেখানেই শাপ দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, সংস্কৃত সাহিত্যে সেইখানেই দুর্ব্বাসার নাম।" এই সময়ে 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশিত হইতেছিল। তাহার যে অধ্যায়ে কৃষ্ণের 'আদর্শ মানবত্বে'র ব্যাখ্যা ছিল, উত্তরে আমি তাহার প্রতি ঈশানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম, এবং অন্যান্য কথারও উত্তর লিখিলাম। ঈশান তাহার উত্তরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি হুগলী হইতে লিখিলেন—"আমার প্রধান আপত্তি কৃষ্ণ-চরিত্র। তুমি যে বঙ্কিমবাবুর নজির দেখাইয়াছ, তাহা আমি মানি না। বঙ্কিমবাবু নিজে দেবতা গঠিতে জানেন না, তিনি কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ নরনারীচরিত্র গঠিতে জানেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে তাঁর নজির আমি গ্রহণ করি না। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও রৈবতক ছাপানের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নাম গোপন করিবার প্রয়োজন নাই।" সকলেরই এরূপ প্রতিকূল মত দেখিয়া ভয়ে আমার নাম গোপন করিতে চাহিয়াছিলাম। ঈশান সর্ব্বশেষ লিখিয়াছেন—"আমি তোমার রৈবতক পড়িতে পড়িতে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছি। ইন্দ্রনাথবাবুর সহিত খুব তর্ক চলিতেছে।" ভাবিলাম, যদি 'রৈবতকে'র প্রুফ দেখিতে দেখিতে ঈশানের মত লোক "হিন্দুধর্ম্ম লইয়া মাতিয়া উঠিয়া থাকে", তবে আর রৈবতকের কৃষ্ণ কেমন করিয়া বিসমার্ক বা গ্লাডষ্টোন হইলেন। তাহার পর ঈশান ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জানুয়ারি হুগলী হইতে লিখিলেন—"তোমার পত্রখানি পড়িয়া অনেকক্ষণ ভাবিলাম যে, প্রকৃত দেব-চরিত্র কি? যাহা অমানুষিক, তাহা বাস্তবিক ভেল্কি কি না? ভাবিতে ভাবিতে রামচন্দ্রের চরিত্র, সীতার চরিত্র, বুদ্ধের চরিত্র, চৈতন্যের চরিত্র, খ্রীষ্টের চরিত্র মনে হইল। মনে হইল যে, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ ছাড়া দেবত্ব আর কি হইতে পারে? এ কথা সত্য, তোমাতে আমাতে এ বিষয়ে মতভেদ নাই। ** আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে খানিকটা যোগ-বল ঢালিলে কি হয়? অবশ্যই খুবই কৌশলে ঢালিতে হইবে। তুমি বোধ হয় Lord Lytton এর Zanoni নভেল পড়িয়াছ। তাহাতে যে অমানুষিক কাণ্ড আছে, সেইরূপ একটা কিছু করিলে হয় না কি?" ঈশান এ সকল কথার উত্তর পাইয়া লিখিলেন—"রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের অঙ্কুর মাত্র সে কথা আমি তখন ভাবি নাই,—এখন ভাবিতেছি। এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণকে অধিক পাকা করিলে চলিবে না বটে।" সকল গোল মিটিল; 'রৈবতকে'র অপরিবর্ত্তিত ভাগে ছাপা আরও এক বৎসরে শেষ হইয়া, উহা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে প্রকাশিত হইল। আমি জানিতাম, 'রৈবতক' রচনা আমার জীবনের একটি নিষ্ফল পর্ব্ব। উহার এক কপিও বিক্রয় হইবে না; উহার এক অক্ষরও কেহ পড়িবে না।

প্রথম পত্র পাইলাম প্রফুল্লের। বলা বাহুল্য, উহা তীব্র বিদ্রূপ ও শ্লেষে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় সর্গ 'ব্যাসাশ্রম' বঙ্কিমবাবু বাদ দিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আমার পত্নী উহা কিছুতেই বাদ দিতে, কি পরিবর্ত্তন করিতে দেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রফুল্লের কেবল এই সর্গটি মাত্র ভাল লাগিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের পর এমন আশ্রমের বর্ণনা তিনি আর পড়েন নাই। সমস্ত বঙ্গ-সাহিত্য এক দিকে এবং এই সর্গটি এক দিকে। সমস্ত বাঙ্গালা সাহিত্য পোড়াইয়া ফেলিয়া কেবল এই সর্গটি রাখিলেই যথেষ্ট। একবার ভাবিলাম, এই পত্রখানি বঙ্কিমবাবুর কাছে পাঠাইয়া দি। কবিবর হেমবাবু 'রৈবতক' উপহার পাইয়া ভাষার এবং কবিত্বের খুব প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"তোমার এ কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দও তুমি যেরূপ জলের মত চালাইয়াছ, আমার বিশ্বাস যে, এত দিনে নাটক লিখিবার ভাষা সৃষ্ট হইল। তজ্জন্য আমি তোমাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। কিন্তু তুমি কৃষ্ণকে যে ভাবে দাঁড় করাইয়াছ, তিনি দেশের হৃদয়ে সে ভাবে দাঁড়াইতে পারিবেন কি না, আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আমার মতে সাদাসিদে 'সুভদ্রাহরণ' লিখিলে ভাল হইত।"

হা অদৃষ্ট! সুভদ্রাহরণ লেখা যে রৈবতকের উদ্দেশ্য নহে, তাহা কি হেমবাবুও বুঝিলেন না? কেবল আমার দাদা অখিলচন্দ্র রায় রৈবতকের, বিশেষতঃ বিষ্ণুর ধ্যানের ব্যাখ্যার বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কিছু দিন পরে প্রকাশকের পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, 'রৈবতক' বেশ কাটিতেছে। ইতিমধ্যে আফগানিস্থান হইতে পর্য্যন্ত কমিসেরিয়েট ডিপার্টমেণ্টের একজন 'রৈবতক' চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আরও কিছু দিন পরে 'সাধারণী'তে বহু প্রবন্ধে ইহার এক দীর্ঘ ও বিচক্ষণ সমালোচনা বাহির হইল। সমালোচনার ভাষার লীলাতরঙ্গ স্বয়ং 'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়বাবুর ভাষার মত। উহা তাঁহার রচনা কি না, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লিখিলেন যে, উহা তাঁহার রচনা নহে। যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার একজন কৃতী শিষ্য এবং "নবীন রসে টলটলায়মান।"

একদিন বন্ধু ঈশানের এক পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে—"সাবধান, তুমি 'ভারতী'কে 'রৈবতক' উপহার দিও না। সে দিন রবি ঠাকুরের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তোমার 'রৈবতকে'র উপর ভারি চটা। তুমি 'ভারতী'কে 'রৈবতক' উপহার দিলে খুব গালি খাইবে।" একটি লোক সাঁকো পার হইতেছে। নিকটে একটি পাগল দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি পাগলকে বলিল—"দেখ্ পাগ্লা! সাঁকো নাড়িস্ না।" পাগল বলিল—"ভাল মনে করিয়া দিয়াছিস্। তবে একবার নাড়িয়া দেখি।" আমারও পাগলের মত মনের ভাব হইল। আমি ঈশানকে লিখিলাম—"আমার কোনও বহি আমি 'ভারতী'কে উপহার দিই নাই। কিন্তু তুমি যখন এরূপ লিখিয়াছ, তখন 'রৈবতক' অবশ্য পাঠাইব। রবিবাবু যদি সরল অন্তঃকরণে 'রৈবতকে'র প্রকৃত দোষ দেখাইয়া দেন, তাহাতে আমারই উপকার। আর যদি বিদ্বেষজৃম্ভিত নির্জ্জলা গালি দেন, তবে অন্ততঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্মটা কি, তাহা বুঝিব। কারণ, রবিবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। বিশেষতঃ মন্ত্রিবর জলধর মেয়ে মানুষের 'বাপান্তে'র যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তুমি জান।" আমি ইহার পর এক খণ্ড 'রৈবতক' 'ভারতী'কে উপহার পাঠাইতে প্রকাশককে লিখিলাম। 'রৈবতক' প্রকাশিত হইবার প্রায় দেড় বৎসর পরে 'ভারতী'তে দেড় পৃষ্ঠা সমালোচনা বাহির হইল। তাহার যেমন ভাষা, তেমন ভাব, তেমন—দাদা কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষায়—'হৃদয়িকতা'! তাহাতে লেখা আছে, 'রৈবতকে'র কৃষ্ণ নবীনবাবুর মত "নবীন রসিক"। তাঁহার অপরাধ যে, তিনি সত্যভামা ঠাকুরাণীর শয্যাকক্ষে গিয়া গীতা প্রচার করেন নাই। এই রসপূর্ণ সমালোচনা এই বলিয়া শেষ করা হইয়াছে যে, বৃহৎ কাব্য 'রৈবতক'খানি "আগাগোড়া নচ্ছার"। ঈশান হো হো করিয়া হাসিয়া লিখিলেন—"তুমি ঠিক বলিয়াছিলে। ব্রাহ্মধর্ম্ম ধরা পড়িয়াছে।" ভারতী-সম্পাদিকাকে যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি কখনও দেখি নাই, তথাপি রূপে গুণে তাঁহাকে বঙ্গভাষার মূর্ত্তিময়ী ভারতী বলিয়া আমি শ্রদ্ধা করি। বুঝিলাম, এ সমালোচনা তাঁহার নহে। বাতাসের গলায় দড়ি দিয়া কোন্দল ভেজান যাঁহাদের প্রকৃতি, এরূপ কোনও 'সোনার চাঁদ' বা 'বিবিজান' ভারতীর অন্তরাল হইতে এই চোরা কুটিল কটাক্ষবাণে আমাকে 'লবেজান' করিয়াছেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে পশ্চিম বেড়াইয়া আবার এলাহাবাদে কংগ্রেস দেখিতে যাই। সেখানে একজন খর্ব্বাকৃতি, মসৃণ-তালুকা কৌতুকমূর্ত্তি লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া 'সাধারণী'তে 'রৈবতকে'র সমালোচনা আমার কেমন লাগিয়াছিল, চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করেন। প্রথম আশ্বাসবাণীর জন্য আমি লেখকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে, তিনিই সেই সমালোচনার লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। সেই অবধি দরিদ্র ঠাকুরদাস আমার বিশিষ্ট বন্ধুশ্রেণীভুক্ত হন।

এমন কাব্যরসজ্ঞ সমালোচক ও লেখক বঙ্গদেশে দু এক জন ছাড়া আর নাই। সাহিত্য-

সেবীর চিরসহচর দরিদ্রতা-রাক্ষসী অকালে বঙ্গসাহিত্য-কুঞ্জের এই সুরভি ফুলটি হরণ করিয়াছে। ঠাকুরদাস 'রৈবতকে'র একজন প্রগাঢ় রসজ্ঞ ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তদ্বিপরীত আর একজন সাহিত্যসেবী এলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন—"আপনার 'পলাশীর যুদ্ধে'র মত 'রৈবতক' আমার ভাল লাগে নাই। আপনি এই ভরা যৌবনে হরি-নামের মালা গ্রহণ করিলেন কেন?" তিনি 'অবকাশরঞ্জিনী'র অনেক কবিতা মুখস্থ আওড়াইলেন, এবং তিনি আমার খণ্ড কবিতার পক্ষপাতী বলিলেন। যদিও তাঁহার খর্ব্ব মূর্ত্তিখানি প্রেমিকের উপযোগী নহে, এবং উহা দেখিয়া কোন রমণীর "যোগিনী হইয়া, উহারে লইয়া, যাই পলাইয়া সাগরপারে" সম্ভাবনা নাই, তথাপি এখন প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত তিনি একজন প্রেমের কবি। তাঁহার সঙ্গে আর একটি ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তিনি তদপেক্ষাও প্রেম-কবিতার পক্ষপাতী। আমি তাঁহাদের বলিলাম—"এক দিন আসিবে, যখন আপনাদেরও হরিনাম ভাল লাগিবে।" বহু বৎসর পরে আমার কুমিল্লায় অবস্থিতিকালে অকস্মাৎ একদিন ইঁহার এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, আমার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছে। তাঁহার দিন আসিয়াছে। এখন তাঁহার হরিনাম ভাল লাগে। তাঁহার পত্রে আমার ও আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাসের প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস ঢালিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন যে, এই কাব্য তিনখানি তাঁহার জীবনের সহচর। নিদ্রার সময়েও তাঁহার বালিশের নীচে থাকে। যাহা হউক, ঠাকুরদাসের পূর্ব্বসমালোচনায় ও এলাহাবাদের আলাপে আমার হৃদয়ে ঘোরতর নিরুৎসাহ ও নিরাশার মধ্যে একটু আশার ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। এলাহাবাদ কংগ্রেসের সভাক্ষেত্রে বেড়াইতে গেলাম। সেখানেও সর্ব্বত্র 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রণেতা বলিয়াই আদৃত হইলাম। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অধিক শিক্ষিত ও ভাবুক, তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, 'রৈবতকে'র কাছে 'পলাশির যুদ্ধ' কিছুই নহে। দেখিলাম, তাঁহারা 'রৈবতকে'র বড়ই পক্ষপাতী। কেহ কেহ এ পর্য্যন্ত বলিলেন,—"রৈবতক বাঙ্গলা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। এত দিনে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে চিনিয়াছি ও বুঝিয়াছি। আপনি তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন।" একজন ভদ্রলোক এরূপ ক্ষেপিয়াছিলেন যে, তিনি আমার চিহ্ন রাখিবার জন্য আমার আলোয়ানের হাসিয়ার একটা সুতা ছিঁড়িয়া রাখিয়াছিলেন।

বোধ হয়, ইহার কিছু দিন পরে, ঠিক স্মরণ নাই, 'সাহিত্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয়, এবং তাহাতে প্রথম হইতে 'রৈবতকে'র একটি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচক্ষণ সমালোচনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। আমি তখন পর্য্যন্ত 'সাহিত্যের সম্পাদক, কি সমালোচককে চিনিতাম না। তাঁহাদের নামও শুনি নাই। সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আমাকে পত্র লিখিয়া এই ক্রমশঃ প্রকাশ্য সমালোচনা সম্বন্ধে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। আমি উহার অন্তরের সহিত প্রশংসা করিয়া লেখকের নাম জানিতে চাহিলে তিনি লিখিলেন, তাঁহার নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কলিকাতার একজন প্রধান ধনবানের পুত্র, এবং প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী। লক্ষ্মী সরস্বতীর এমন সম্মিলনের কথা আর শুনি নাই। পরে শুনিয়াছিলাম, এই সমালোচনা কলিকাতার কোন সাহিত্য-সভায় হীরেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক পঠিত হয়। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সভায় সভাপতি ছিলেন, এবং তিনি এই সমালোচনার বিপরীত মত প্রকাশ করাতে সভাতে তাহা লইয়া খুব একচোট বাক্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্যই সমালোচনাটি 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়।

আবার ইহার কিছু দিন পরে Calcutta Review পত্রিকায় New-Bengali Literature (নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য) নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক পাণ্ডিত্যাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি তখন আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন কি, তৎপূর্ব্বে তাঁহার নামও শুনি নাই। দেখিলাম, তিনি 'রৈবতক' কাব্যের মূলতত্ত্ব

বা কেন্দ্রস্থ ভাব যেরূপ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অল্প কথায় অথচ অদ্ভুত ভাষার ঝঙ্কারে বুঝাইয়া দিয়াছেন, এমন আর কোনও সমালোচক পারেন নাই। প্রবন্ধের এ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

The grandeur of the situation fails description. A dim pre-historic vista—a hundred surging peoples and mighty kingdoms, in that dim light clashing and warring with one another like emblematic dragons and crocodiles and griffins on some Afric shore,—a dark polytheistic creed and inhuman polytheistic rites,—the astute Brahmin priest fomenting eternal disunion by planting—distinctions of caste, of creed and of political government on the basis of Vedic revelation—the lawless brutality of the tall blonde Aryan towards the primitive dark-skinned, scrub-nosed children of the soil—the Kshatrya's star, like a huge comet brandished in the political sky casting a pale glimmer over the land—the wily Brahmin priests jealous of Kshatrya ascendancy, entering into an unholy compact with the Non-Aryan Naga and Dashuya hordes, and adopting into the Hindu Pantheon the Asuric Gods of the latter the trident bearing Mahadeva with troops of demons fleeting at his back or that frenzied Goddess, of war Kali with her necklace of skulls —the Non-Aryan Nagas and Dashuyas crouching in the jungles and dens like the fell beasts of prey—and in the foreground the figure of the half divine legislator Krishna, whom Bishnu, the Lord of the Universe, guides through mysterious visions and phantasms,—unfurling, in the fulness of his destiny, the flag of the Universal religion of Baishnavism to hurl down the Brahmanic priesthood and their cruel vedic ritualism, and to establish in their place the kingdom of God in Mahabharat,—one vast Indian Empire, a realised universal human brotherhood, embracing Aryan and Non-Aryan in bonds of religious, social and political unity, a grand design, scenic pomp, an antique as well as modern significance like this what national epic can show?

বুঝিলাম, আমার 'রৈবতক' রচনার শ্রম সফল হইয়াছে। 'রৈবতক' বঙ্গদেশের মনীষিগণের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। তাহার উচ্চ লক্ষ্য নিষ্ফল হয় নাই। হা ভগবান্! তোমার কার্য্য তুমি কর। "নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্"—যখন ভারতের অদ্বিতীয় বীরকেশরী অর্জ্জুনও তোমার এরূপ 'নিমিত্ত মাত্র', তখন আমি ক্ষুদ্র তৃণের আর কথা কি? তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া শক্তি ও সাহস না দিলে, আমি এত নিরুৎসাহের মধ্যে কখনও এই কাব্য রচনা করিতে পারিতাম না। কিন্তু এমন বিচক্ষণ সমালোচকেরও কি ভ্রান্তি আছে? তাঁহার মতে 'রৈবতকে'র যে দশম সর্গে শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস এবং অর্জ্জুনের যে চিত্র আছে, তাহার তুলনা জগতের সাহিত্যে নাই; কিন্তু রমণীচিত্রসম্বলিত অবশিষ্ট দশম সর্গ তাঁহার মতে 'অবকাশরঞ্জিনী'র কবির বিলাসী তুলিতে চিত্রিত। তাহা একেবারে পোড়াইয়া ফেলা উচিত। দেখিলাম, তিনি চৈতন্যদেবের মত 'প্রকৃতি'র উপর বড়ই নারাজ। হরি! হরি! সুভদ্রা, সুলোচনা, শৈলজা, রুক্মিণী বিলাসী তুলির চিত্র! তবে একটি গল্প বলিব।

ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি আমার পিতার একজন বিশিষ্ট বন্ধু। শুধু চট্টগ্রামের

নহে, সমস্ত বঙ্গদেশের তিনি একটি উজ্জ্বল রত্ন, এবং ব্রাহ্মসমাজের একজন নেতা ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে কেন তাঁহার নাম কর্কশ 'খাস্তগির' করিয়াছিলেন, জানি না। চট্টগ্রামে ইহাঁরা কাস্তগিরি বলিয়া পরিচিত। আমি সেই নামই ব্যবহার করিলাম। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি বঙ্গদেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কিঞ্চিৎ অস্থির-হৃদয় লোক ছিলেন। কখনও আমাকে খুব ভাল বলিতেন, কখন আবার আমার উপর ভয়ানক চটিতেন। তাঁহার 'আয়ুর্বর্দ্ধন' বহিখানি আমাকে আশীর্ব্বাদ উপহার দিয়া, আমার দুই শত বৎসর জীবন কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তার পর আবার শুনিয়াছিলাম, কি জন্য বড়ই চটিয়াছিলেন। এ সময়ে কলিকাতার রাস্তায় তাঁহার সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হইল। আমি কি জন্য ফেনী হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। পরদিন তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইবা মাত্র তিনি 'রৈবতকে'র কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন যে, 'রৈবতক' পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ে এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা 'রৈবতক' স্থানে স্থানে মুখস্থ করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা তাঁহার মুখে তিনি 'রৈবতক' শ্রবণ করেন। তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন। তিনি ও আমার আর একটি বন্ধুর কন্যা বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা 'রৈবতকে'র অনেক স্থান পড়িলেন, এবং কোনও কোনও স্থান কণ্ঠস্থ আবৃত্তি করিলেন। 'রৈবতকে'র প্রশংসা পিতা ও দুহিতার মুখে ধরে না। তিনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক তর্ক করিলেন। শেষে বলিলেন, তিনি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে বড় ঘৃণা করিতেন। কিন্তু 'রৈবতক' পড়িয়া অবধি তিনি একজন কৃষ্ণ-উপাসক হইয়াছেন। দেখিলাম, তাঁহার কন্যা সুভদ্রাচরিত্রে মুগ্ধা। তিনি বলিলেন—"আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন আপনার সুভদ্রার মত হইতে পারি।" যতই আমি তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলাম, ততই আমার হৃদয় বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিল। ডাক্তার কাস্তগিরি বড় সহজ লোক নহেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি তাঁহার এক বন্ধুর বিধবা বিমাতাকে পর্য্যন্ত বিবাহ দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার তিনি একজন প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা বি. এ. পাশ করিয়াছেন। কুচবেহারি কাণ্ডে কেশবচন্দ্র সেনের পতনের ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের ইনি একজন মহারথী। 'রৈবতক' পাঠে তাঁহার ও তাঁহার কন্যার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস ও ভক্তি, এবং এ মত-বিপ্লব!—ইহা অপেক্ষা 'রৈবতকে'র সফলতার প্রমাণ আর কি হইতে পারে? সে অবধি তাঁহার বিদুষী কন্যা পত্র লিখিয়া 'কুরুক্ষেত্র' লিখিতেছি কি না, উহা কবে শেষ হইবে, বরাবর আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহার বহু বৎসর পরে 'কুরুক্ষেত্র' বাহির হইবার পর, এক দিন ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে কলিকাতার 'ইউনিভার্সিটি হলে' সাক্ষাৎ হয়। দেখিলাম 'রৈবতকে'র নারী-চরিত্রাবলী সম্বন্ধে তখন তাঁহারও মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রচারক, না প্রবঞ্চক

মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের একটা হুজুগ উঠিয়াছিল। আমি যখন নোয়াখালিতে, তখন চূড়ামণি মহাশয় ধূমকেতুর মত বঙ্গের হিন্দুধর্ম্মের আকাশে কলিকাতায় উদিত হন। শুনিয়াছিলাম যে, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের বর্ত্তমান জড়ত্ব, যাহাতে হিন্দু জাতির এই অননুভবনীয় অধঃপতন ঘটাইয়াছে,—ঘুচাইয়া, তাহাতে নবজীবন সঞ্চারিত করিবার জন্য তাঁহাকে দাঁড় করাইয়াছিলেন। আমরা যে কথা বলি, এই জড়ত্ব-ব্যবসায়ীরা তাহা 'ইংরাজি শিক্ষার বিমল জলে ধৌত' অশাস্ত্রীয় বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু পণ্ডিতকুলের একজন চূড়ামণি সেই কথা বলিলে আর শাস্ত্রের দোহাই দিবার পথ থাকে না। অতএব

চূড়ামণি মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় দেশে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। হিন্দুধর্ম্মের প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের যে অজ্ঞানীর জন্য জড় (exoteric) এবং জ্ঞানীর জন্য আধ্যাত্মিক (esoteric) অর্থ আছে, তাহা আমরা বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছিলাম। একজন পণ্ডিত এখন এই শেষ অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন। প্রতিমাপূজার—পৌত্তলিকতা শব্দ আমাদের কোনও গ্রন্থে, কি অভিধানে নাই, উহা খ্রীষ্টান মিশনারির কল্পনামাত্র—চূড়ামণি মহাশয় যেরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহাতে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রবিপ্লবে যে হিন্দুধর্ম্ম সাত শত বৎসর মাটিচাপা পড়িয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধারের আশা সকলের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই মংগলশূন্য নহে। হিন্দুধর্ম্মের অধঃপতনে হিন্দু-সমাজের অধঃপতন সংঘটিত হয়। হিন্দুসমাজের অধঃপতনে ভারতে প্রথম মুসলমানরাজ্য, তার পর ইংরাজরাজ্য স্থাপিত হয়। ইস্‌লাম ধর্ম্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, সর্ব্বশেষ পাশ্চাত্য শিক্ষা, হিন্দুসমাজের মৃতদেহে যখন তাড়িতক্ষেপ করিয়া উহার জড়ত্ব ঘুচাইতে আরম্ভ করে, এবং প্রবল বেগে উহাকে আপনাদের শক্তিস্রোতে ভাসাইয়া লইতে থাকে, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম মৈনাকের মত সেই স্রোতগর্ভ হইতে শির উত্তোলন করিয়া হিন্দুসমাজকে রক্ষা করে, এবং তাহার পর 'থিওসফি' আসিয়া সদ্য চেতনাপ্রাপ্ত হিন্দুসমাজের চক্ষুরুন্মীলন করে। এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প করিব।

আমার বন্ধু ও সহোদরোপম নবীনচন্দ্র দত্ত এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া অযোধ্যা অঞ্চলে সীতাপুরে ছিলেন। তিনি বড় সুন্দর একটি টাট্টু ঘোড়া কিনিয়াছিলেন; কিন্তু টাট্টুটি এমনি স্বাধীনচেতা যে, তাহার পৃষ্ঠারোহণ করিলে সে একটি ফরাসি বিপ্লব উপস্থিত করিত। তিনি হতাশ হইয়া একদিন ঘোড়াটির দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতেছেন যে, নিকটস্থ সৈন্য-ছাউনি 'রাণীক্ষেতে' তাহাকে যথামূল্যে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করিবেন। এমন সময়ে হঠাৎ একটি বাবাজী কোথা হইতে ঘোড়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন যে, উহাকে 'রাণীক্ষেতে' পাঠাইতে হইবে না, উহা বেশ ঘোড়া হইবে। তিনি ঘোটকের অংগে হাত বুলাইয়া সহিসকে উহাতে আরোহণ করিতে বলিলেন। নবীন বিস্মিত হইলেন। লোকটি দেখিতে একটা খেলো বাবাজীর মত, কিন্তু তিনি যে ঘোড়া 'রাণীক্ষেতে' পাঠাইবেন ভাবিতেছিলেন, সে তাঁহার মনের কথা কিরূপে জানিল। তাহা ছাড়া অন্য কেহ ঘোড়ার গায়ে হাত দিলে সে লাফাইয়া উঠিয়া একটা লঙ্কাকাণ্ড করিত, কিন্তু বাবাজী হাত দেওয়া মাত্র চুপ করিয়া রহিল। নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবাজি! তুমি কি ঘোড়া ভাল করিতে জান?" তিনি বলিলেন—তিনি জানুন, না জানুন, ঘোড়া ভাল হইলেই ত হইল। তাঁহার কথামতে নবীন সহিসকে ঘোড়ায় চড়িতে আদেশ করিলেন। অন্য দিন ঘোড়ার পিঠে জিন পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই। কিন্তু আজ জিন দিতেও ঘোড়া চুপ করিয়া রহিল। সহিসটি যেন ফাঁসিকাষ্ঠে উঠিতেছে, এরূপ ভাবে ঘোড়ার পিঠে উঠিল। ঘোড়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। উহা অদৃশ্য হইলে নবীন ফিরিয়া দেখিলেন যে, বাবাজীটি নাই। ইহাতে তাঁহার বিস্ময় আরও বৃদ্ধি হইল। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। ইহার কিছু দিন পরে নবীন মফঃস্বল হইতে একটি পার্ব্বত্য পথে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছিলেন। পূর্ব্ব-ঘটনার পর হইতে ঘোড়াটি আশ্চর্য্যরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। এক স্থানে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। পথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ পর্ব্বত। অশ্বারোহী অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই এক পাও অগ্রসর হইতেছে না। সহিস পশ্চাতে পড়িয়াছে। তিনি বড় সংকটে পড়িলেন। পাহাড়ে কিছু দেখিয়া ঘোড়া ভয় পাইয়াছে মনে করিয়া তিনি পর্ব্বত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, এক পার্শ্বের পর্ব্বতের সানুদেশে দাঁড়াইয়া—সেই বাবাজী! তিনি কর প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং বলিলেন যে, তিনি ঘোড়া থামাইয়াছেন। নবীনের সংগে তাঁহার বিশেষ কথা আছে। এইবার নবীনের বিস্ময়ের

সীমা রহিল না। তাঁহার ঈঙ্গিতমতে নবীন ঘোড়া ফিরাইয়া, পর্ব্বতের পাদমূলে একটি নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, বাবাজী সন্ন্যাসী শিষ্যে বেষ্টিত হইয়া সেখানে আছেন। নবীন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, ঘোড়া কাহার কাছে রাখিবেন ভাবিতেছিলেন, সহিস পোঁছে নাই। বাবাজী বলিলেন—"ভয় নাই। তুমি অশ্বের বল্গা তাহার পৃষ্ঠোপরে ফেলিয়া রাখ, ঘোড়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।" তিনি এই বলিয়া অশ্বের গ্রীবায় আদরে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"খাড়া রহো বেটা!" অশ্ব মূর্ত্তিবৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তখন তিনি নিজে বসিয়া ও নবীনকে মৃগাসনে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, নবীনকে বহুদিন হইতে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। এক জ্যোৎস্নারাত্রিতে নবীন যখন যমুনার সেতুর উপর দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলেন, বাবাজী বলিলেন যে, তিনি ঠিক সে সময়ে তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং তাঁহার মনের অবস্থার অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। নবীন এইবার একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি এক সময়ে বড় উচ্ছৃঙ্খলচরিত্রের লোক ছিলেন, এবং ইউরোপীয়ান ও ইউরেসিয়ানদিগকে লইয়া বড় হুটাহুটি করিতেছিলেন। একদিন কোনও স্থানে পঞ্চ মকারে অর্দ্ধ নিশি অতিবাহিত করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, যমুনার সেতুর উপর উপস্থিত হইলে ফুল্লকৌমুদী-উদ্ভাসিতা সেতু-কণ্ঠিনী নীলমণিময়ী যমুনার সেই শোভা দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার মনে ধারণা হইল,—তিনি কি করিতেছেন? এই জীবনের সার্থকতা কি? পুলের রেলিঙে বক্ষ রাখিয়া, পবিত্রা যমুনার সেই শান্তিময়ী নৈশ শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার হৃদয়ে কি এক অচিন্ত্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। তিনি বহুক্ষণ আত্মহারাবৎ দাঁড়াইয়া, শেষে আপনার হ্যাট কোট যমুনায় বিসর্জ্জন করিয়া, সেই অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার বেহারা হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে মনে করিল, সুরাসুন্দরীর অতিরিক্ত কৃপায় প্রভু হ্যাট কোট হারাইয়া, এই হাস্যকর পরিচ্ছদে গৃহে ফিরিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! বাবাজী বলিতেছেন যে, সেই রাত্রিতে তিনি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার হৃদয়ের এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন! ভক্তিতে নবীনের হৃদয় পূর্ণ হইল। নবীন বুঝিলেন যে, কোনও মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হইয়াছে। তাহার পর সন্ন্যাসী ফ্রান্স, জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি নানা দেশের গল্প করিতে লাগিলেন। নবীন দেখিলেন যে, তিনি সকল দেশের ভাষায় পারদর্শী। সর্ব্বশেষ বলিলেন—"মহাত্মাগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিও। তাঁহারা অহরহ মানব-হিত-চিন্তায় নিরত, এবং মানবের মঙ্গলার্থ তাহাদের অদৃষ্টচক্র অচিন্ত্যভাবে সঞ্চালন করিয়া থাকেন। পশুবলে মানবের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে কি না, একবার তাঁহারা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহার ফল ফরাসীবিপ্লব। তুমি তৎসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিতে পাইবে যে, সে সময়ে কখন কখন ফ্রান্সের পথে ঘাটে ভারতীয় সন্ন্যাসিমূর্ত্তি দেখা যাইত। তাহা ভ্রান্তি নহে। যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, তাহাতে আর বেশী কিছু হইবার নহে, আর নররক্তে পৃথিবী প্লাবিত করা নিস্ফল, তখন একটি মাত্র লোক সেই বিপ্লবক্ষেত্রে উপস্থিত করিলেন, আর তাহার তর্জ্জনীসঙ্কেতে ফরাসীবিপ্লব নিবিয়া গেল। এখন তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ভারতের এই অধঃপতনের সময়ে বিদেশীয়ের মুখে না শুনিলে তোমরা কোন কথা বিশ্বাস কর না। অতএব শীঘ্র রাশিয়া হইতে একটি নারীরত্ন ও আমেরিকা হইতে একটি পুরুষপুঙ্গব ভারতে উপস্থিত হইয়া একটা ধর্ম্মান্দোলন সৃষ্টি করিবেন, এবং তাহাতে ভারতীয় ধর্ম্মে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে।" তাহার কিছুদিন পরে ম্যাডাম ব্লেভেটস্কি ও কর্ণেল অলকট আসিয়া 'থিওসফি'র বা ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। এই আলাপের সময়ে তাঁহাদের নাম মাত্রও কেহ ভারতে শুনে নাই। যোগিশ্রেষ্ঠ এই অদ্ভুত কথোপকথন শেষ করিয়া বলিলেন—"তুমি শীঘ্র লক্ষ্ণৌ আবার বদলি হইয়া যাইবে।" নবীন এ বদলির পূর্ব্বাভাস মাত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা অন্য কেহ জানিত না। লক্ষ্ণৌ গিয়া কি করিতে হইবে, তাহা উপদেশ দিয়া এই মহাপুরুষ তাঁহাকে বিদায়

দিলেন। বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে নবীনের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইহার কয়েক বৎসর পরে নবীন Supernumerary (অতিরিক্ত চিকিৎসক) হইয়া মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণস্থ এক গৃহে বাস করিতেছেন। হঠাৎ একদিন একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইল। পাহারা অতিক্রম করিয়া, কোনও সংবাদ না দিয়া, তিনি কিরূপে আসিলেন? নবীন বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে কণ্ঠ শুনিয়া বুঝিলেন তাঁহার গুরুদেব। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, বাবাজী বেশে ত প্রহরী তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। অতএব তিনি এই বেশ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রহরী মনে করিয়াছে একজন পাঞ্জাবী ছাত্র। পরে তিনি বলিলেন যে, তিনি দাক্ষিণাত্যে যাইতেছেন। সেখানে তাঁহার বহু কর্ম্ম আছে, অতএব বহু বৎসর নবীনের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। নবীন শীঘ্র বদলি হইয়া দ্বারাভাঙ্গা যাইবেন এবং সেখানে কোনও বিশেষ স্থানে তাঁহার এক শিষ্য আছেন, তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। নবীনের দ্বারভাঙ্গা বদলির কোনও কথাই তখনও হয় নাই। এ কথা তিনি কিরূপে পূর্ব্বে জানিলেন, নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বাবু! ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। তুমি ঐ যে বহিখানি পড়িতেছ, তোমার ঐ অশিক্ষিত ভৃত্যের পক্ষে উহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। কতকগুলিন কালির দাগ দ্বারা কেমন করিয়া মানুষের হৃদয়ের ভাব প্রকাশিত হয়, সে তাহা বুঝিতে পারে না। অথচ যে লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে উহা অতি সহজ ব্যাপার। এও তাই। আমিও একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, যাহা তুমি কর নাই। কাজেই আমার কার্য্য ও কথা তোমার কাছে বড় বিস্ময়কর বোধ হইতেছে। উহা শিক্ষা করিলে তুমিও বুঝিতে পারিতে যে, আমি যাহা বলিতেছি ও করিতেছি, উহাও অতি সহজসাধ্য। ইহার পর নবীন সত্য সত্যই দ্বারভাঙ্গা বদলি হইলেন এবং সত্য সত্যই সেরূপ স্থানে সেরূপ একটি লোকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তিনি নোয়াখালিতে সিবিল মেডিকেল অফিসার হইয়া আসিলেন। তাঁহার চরিত্রের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, এই অদ্ভুত উপাখ্যান তিনি আমাকে বলিলেন। তিনি সত্যবাদী, এবং এখন একজন পরম সাধু। এরূপ একটি উপাখ্যান কাল্পনিক হইতে পারে না। আমার মত বন্ধুকে তাঁহার প্রবঞ্চনা করিবারও কিছু প্রয়োজন ছিল না।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে ম্যাডাম ব্লেভেটস্‌কি রুশিয়া হইতে ও কর্ণেল অলকট আমেরিকা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিয়াছি, তাঁহারা উভয়ে 'কুথুমিলাল' নামক এক মহাত্মার শিষ্য। শুনিয়াছি, অলকট খ্রীষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইয়া, বড় অশান্তিতে পতিত হইয়া একদিন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে আমেরিকাতে এক ভারতীয় সন্ন্যাসী অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, তিনি ভারতবর্ষে গেলে তাঁহার সমস্ত সন্দেহ বিদূরিত হইবে। তিনি তদনুসারে ভারতে আসেন। ম্যাডাম ব্লেভেটস্‌কিও বহু বৎসর হিমালয়ে মহাত্মাদের শিষ্যত্ব করিয়া সে সময়ে ভারতে উপস্থিত হন। উভয়ের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ভারত ও জগৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। আমি ফেনী থাকিবার সময়ে কর্ণেল অলকট 'থিওসফি' প্রচার উপলক্ষ্যে নোয়াখালি আসেন, এবং অধ্যাত্ম জীবন (Spiritual life) সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় সে বক্তৃতার সভায় সভাপতিত্বে বরিত হই। বক্তৃতান্তে উহা কেমন হইয়াছিল, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম যে, আমি উহা উচ্চতর ভাবের হইবে বলিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে শ্রোতাদের মধ্যে কত জন তাহা বুঝিতে পারিত? সে জন্য তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের নিম্নতম ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, এ জন্য হিন্দুধর্ম্মে কস্মিন্ কালেও প্রচারক ছিল না, এবং এরূপ ভাবে ইহার প্রচারকার্য্যও হয় নাই। কারণ, হিন্দুধর্ম্মের অধিকারিভেদে সোপান আছে। এরূপ প্রকাশ্য বক্তৃতা করিতে গেলে, যাহারা

উচ্চতর অধিকারী, তাহাদের তৃপ্তি হয় না। অন্য দিকে উহা উচ্চতর অধিকারীদের উপযোগী করিতে গেলে নিম্ন অধিকারীদের উপযোগী হয় না। এ জন্য গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যাহাদের গীতোক্ত ধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি নাই, তাহাদের কাছে যেন তাহা বলিয়া, তাহাদের বিচলিত করা না হয়। বুদ্ধদেবও একদিন তাহাই বলিয়াছিলেন। একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে তিন বার জিজ্ঞাসা করিল—আত্মার মৃত্যু আছে কি না? তিনি নিরুত্তর রহিলেন। সে তাঁহাকে মূর্খ ও ভণ্ড মনে করিয়া চলিয়া গেল। তাঁহার শিষ্য আনন্দ তাঁহার নিরুত্তরের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, আত্মা অমর কি মর, তাহা প্রমাণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। যদি এ ব্যক্তির বিশ্বাস থাকে যে, আত্মা অমর এবং তিনি উহা সমর ব্যাখ্যা করেন, তাহার ফল এই হইবে যে, তিনি যাহা বলিবেন, সে তাহা ধারণা করিতে পারিবে না। অথচ তাহার যাহা বিশ্বাস আছে, তাহা বিচলিত হইবে। তদ্রূপ তাহার বিশ্বাস যদি থাকে যে, আত্মার মৃত্যু আছে, আর তিনি বলেন—আত্মার মৃত্যু নাই, তাহার ফলও ঐরূপ হইবে। অতএব এরূপ অবস্থায় নিরুত্তর থাকাই উচিত। কর্ণেল অলকট আমার কথার অনুমোদন করিলেন। তাহার পর হইতে এরূপ বক্তৃতার দ্বারা 'থিওসফি' প্রচারের স্রোত মন্দা হইয়া আসিয়াছিল। নোয়াখালির সকলে জবাব দিলেন, আমি 'থিওসফি' গ্রহণ না করিলে তাঁহারা কেহ করিবেন না, বিশেষতঃ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়। অলকট আমাকে সে জন্য পাকড়াও করিয়া বসিলেন। আমি বলিলাম, 'থিওসফি'র মূল ত্রিনীতি—সংস্কৃত ভাষার শিক্ষা, আধ্যাত্মিক বিদ্যার অনুশীলন, এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাহার জন্য শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতে আর একটি সম্প্রদায় সৃষ্টির প্রয়োজন কি, তাহা আমি বুঝি না। তিনি শেষে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন যে, আমি 'থিওসফি' গ্রহণ না করিলে তাঁহার নোয়াখালি আসা বিফল হয়। কারণ, তাহা হইলে আর কেহ গ্রহণ করিবে না। তখন অগত্যা আমি এগার টাকা দক্ষিণা দিয়া 'থিওসফি' গ্রহণ করি। অনুমান ২০ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমি না সংস্কৃত শিক্ষার, না আধ্যাত্মিক বিদ্যার অনুশীলন করিতে পারিয়াছি। এরূপ একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টির তাৎপর্য্যও বুঝিতে পারি নাই। তবে 'থিওসফি'র দ্বারা ভারতের ও জগতের যে প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা অন্ধও দেখিতে পারে। যে সকল আবর্জ্জনা হিন্দুধর্ম্মের এই জড়ত্বযুগে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, 'থিওসফি' আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, তাহা হিন্দুধর্ম্ম নহে। সেই ভস্মের অভ্যন্তরে যে বহ্নি আছে, উহাই হিন্দুধর্ম্ম। তবে ব্লেভেটস্কি ও অলকট বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকে বেশী গড়াইতেছিলেন। বাগ্‌দেবী-স্বরূপিণী কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা এনি বিশান্ত (Annie Besant) 'থিওসফি'র সেই গতি পরিবর্ত্তন করিয়া ও সনাতন আর্য্যধর্ম্মের গঙ্গাসাগরমুখী করিয়া, আমাদের পূজনীয়া হইয়াছেন। মহাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না কর, 'থিওসফি' প্রচারে এই নাস্তিকচূড়ামণি-স্বরূপিণী 'বিশান্তে'র মত শক্তি ও প্রতিভাশালিনীর হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ যে দৈব কার্য্য (miracle), তাহা সকলকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

যাহা হউক, তখন যেমন বিদেশীয়ের মুখে না শুনিলে আমরা কোনও কথা বিশ্বাস করিতাম না, এখন আবার হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা-ব্যবসায়ী এক সম্প্রদায় উঠিয়াছে যে, তাহারা বিদেশীয়ের মুখের শত যুক্তিপূর্ণ কথা বাঙ্গালীর উপযোগী রসিকতায় বা ইতরতায় উড়াইয়া দিবে, এবং অনুষ্টুপ্ ছন্দে নিতান্ত গর্দ্দভোপযোগী কোনও কথা কোথায়ও প্রক্ষিপ্ত থাকিলে তাহার দোহাই দিয়া কর্ণ বধির করিবে। ইহারা যে এই ছাই ভস্ম করে, তাহা নহে। তবে মুদি দোকানদার প্রভৃতিরা উহা বিশ্বাস করে,—এমন অদ্ভূত কথা কিছুই নাই, যাহা তাহারা শাস্ত্রের নামে বিশ্বাস করিবে না, এবং ও সকল অন্ধ জড়ত্বের দোহাই দিলে অর্থোপার্জ্জন চলে, এবং ব্যক্তিগত বিদ্বেষের তৃপ্তি সাধিত হয়। এ জন্য 'থিওসফি' বিদেশীয়

মুখে যাহা বলিতেছেন, তাহা শাস্ত্রব্যবসায়ী কেহ বলিলে, ইহাদের মুখ বন্ধ হইবে বিবেচনা করিয়া বোধ হয়, পূজনীয় বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি সেই অজ্ঞাতনামা পণ্ডিতচূড়ামণিকে এই ব্রতে ব্রতী করিলেন। তিনি কলিকাতা মহানগরীতে যখন প্রথমতঃ হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, তখন দেশে একটা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমি পাঠ্য অবস্থায় ব্রাহ্ম সমাজ—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নহে—ছাড়িয়া, আমাদের দেব দেবীর মূর্ত্তির ব্যাখ্যা করিয়া 'আবাহন' ও 'শবসাধন' প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছিলাম। এখন একজন পণ্ডিতের মুখে এরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার এত আনন্দ হইল যে, আমি তখন কলিকাতায় থাকিলে ইহাঁর কাছে দীক্ষিত হইতাম। বলা বাহুল্য, এরূপ ব্যাখ্যার পথ পূজ্যপাদ ও অদ্ভূতকর্ম্মা 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তৎশিষ্য 'কেশবচন্দ্র সেন পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন। শুনিলাম যে, 'নবজীবন' মাসিক পত্রে 'হিন্দুধর্ম্মে'র এই আধ্যাত্মিকতা ইংরাজি শিক্ষার পথে বঙ্কিমচন্দ্র ও তৎশিষ্যগণ এবং হিন্দুশাস্ত্রের পথে এই শক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রচার করিবেন স্থির হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দুধর্ম্মের আবর্জ্জনা-ব্যবসায়ীর দল দেখিল যে, তাহাদের ব্যবসা মারা যায়। তখন তাহারা এই চূড়ামণিকে হস্তগত করিয়া, তাহাদের দলভুক্ত করিল, আর তিনিও দেশ-পূজ্য স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 'বেদব্যাস' পত্রিকার বেদব্যাস হইলেন ও সেই সঙ্গে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। সাম্প্রদায়িকতা এ দেশের শত শত বৎসর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে। ভগবান্ জানেন, আরও কত শত বৎসর করিবে। এই নির্ব্বাণ লাভের পর ইনি জলপথে, এবং তাঁহার একজন সহযোগী স্থলপথে 'পেশাদারি' হিন্দুধর্ম্ম প্রচারার্থ আহূত হইয়া একবার চট্টগ্রামে আসিলেন। সহযোগী স্থলপথে যাইবার সময়ে ফেনীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তখন মহানির্ব্বাণ তন্ত্র পড়িতেছিলাম। পঞ্চ মকার-সম্বলিত দুইটি লাইন এক স্থানে তাঁহাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, উপরের ও নীচের সঙ্গে তাহার কি সংস্রব। 'মহানির্ব্বাণ'-পাঠক জানেন যে, উহাতে মদ্য পানের ঘোরতর নিন্দা আছে। পঞ্চ তত্ত্বেরও স্বতন্ত্র অর্থ আছে। কেবল দুই এক স্থানে এরূপ পঞ্চ মকার যুক্ত দুটি লাইন প্রক্ষিপ্ত হইয়া, শেষ ভাগে ভৈরবীচক্রের এক অধ্যায় আছে। শাস্ত্রান্তবাগীশ মহাশয় একটুক বিজ্ঞতার ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলেন যে, বঙ্কিমবাবুর ও আমার বিশ্বাস, শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বিষয় আছে,— আমার চণ্ডীর অনুবাদ ইহার পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল— কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রব্যবসায়ী তাহা স্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহারা শাস্ত্রকে সনাতন বলিয়া মানেন। তবে পঞ্চ মকারের প্রচলিত অর্থ যাহা, উহাদের প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। তিনি তখন প্রত্যেক শব্দের ধাত্বর্থ ব্যাখ্যা করিলেন। আমি বলিলাম, তবে মদ মেয়েমানুষ তাহার অর্থ নহে? তিনি বলিলেন—"এক শ বার না।" তখন আমি বলিলাম—"আপনারা চট্টগ্রামে যাইতেছেন। চট্টগ্রাম সুরাস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। চট্টগ্রামের জজ আদালতের সেরেস্তাদার এক জন উগ্র তান্ত্রিক। 'পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা যাবৎ পতিত ভূতলে' না হইলে মুন্সেফ কোর্টের একটি 'এপ্রেন্টিস' জোটে না। আপনারা তন্ত্রের পঞ্চ মকারের এই প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া কয়েকটি বক্তৃতা দিবেন কি?" তিনি বলিলেন, যদি তাহাই না করিবেন, তবে কেন আর দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। দ্বিতীয় কথা বলিলাম—"এক অশেষগুণ মোহন্তের দ্বারা চট্টগ্রামের বিখ্যাত সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথ তীর্থটি ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। আমি ১০।১২ বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছুই করিতে না পারিয়া, ইদানীং তাহাকে মোকদ্দমা করিয়া পদচ্যুত করিয়া তীর্থটি রক্ষা করিবার চাঁদা তুলিতেছি। আপনারা দেশের তীর্থগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন না কেন?" তিনি বলিলেন, তিনি শুনিয়াছেন যে, চন্দ্রনাথের মোহন্ত একজন নিতান্ত পাপিষ্ঠ। চট্টগ্রাম হইতে ফিরিয়া তাঁহারা তীর্থরক্ষাব্রতে হস্তক্ষেপ করিবেন ও চাঁদা সংগ্রহ করিবেন। তখন চন্দ্রনাথের দুরবস্থা সম্বন্ধেও একটি বক্তৃতা চট্টগ্রামে দিয়া, তাহার

উম্ধারের চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহাঁদের চট্টগ্রামে ধর্ম্মপ্রচারের ব্যয়ার্থ চাঁদা দিতে আমি পূর্ব্বে অস্বীকার করিয়াছিলাম। কারণ, ইহাঁদের উপর আমি বিশ্বাস হারাইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার মুখে এ সকল কথা শুনিয়া আমি ২৫৲ টাকার মনি অর্ডার পাঠাইয়া এই ব্যাপারের সম্পাদক মহাশয়ের কাছে লিখিলাম যে, শাস্ত্রান্তবাগীশ মহাশয় তন্ত্র ও তীর্থ সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বলিয়া আমি এই চাঁদা দিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ফেনীর উকীল মোক্তারগণ আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে প্রচারক মহাশয়ের স্কুলগৃহে বক্তৃতার জন্য আমার অনুমতি চাহিলেন। অনুমতি দিলাম, কিন্তু বলিলাম যে, তিনি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের, কি ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের একজন ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন যে, প্রচারক মহাশয় বলেন যে, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান বেটারা এত দিন হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া বেড়াইয়াছে, তাহাদের গালি না দিলে বক্তৃতার জোর হয় না। আমি জানিতাম, নির্ব্বাণের পর হইতে পর-ধর্ম্মনিন্দাই ইহাদের ব্যবসা হইয়াছিল। আমি বলিলাম, তিনি বড় বড় সহরে বড় বড় লোকের সমক্ষে জোরের বক্তৃতা করিতে পারিবেন। ফেনী ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র কৃষকের স্থান। এখানে বক্তৃতার জোর কিছু কম হইলে হিন্দুধর্ম্মের অচিন্তনীয় সর্ব্বনাশ হইবে না। বিশেষতঃ স্কুল উভয়ের—হিন্দু ও মুসলমানের অর্থে নির্ম্মিত। সেখানে কবির লড়াই বা ধর্ম্মের লড়াই গীত হইতে পারে না। সন্ধ্যার সময়ে স্কুলগৃহে তিনি বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই বলিলেন যে, সংসারটা মায়া ও মিথ্যা। পুত্র পিতার মুখানল করে, তাহার অর্থ এই যে, পুত্র বলে—"তুমি এই মুখে সংসার সংসার করিয়াছিলে, অতএব তোমার পোড়া মুখে নুড়োর আগুন দিতেছি।" এই পিতৃভক্তি ও পবিত্র মুখানলের ব্যাখ্যায় আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। আমি উঠিয়া বলিলাম—"হিন্দুধর্ম্মের এরূপ ব্যাখ্যা শুনিতে আমার শক্তি নাই। অতএব আমি চলিলাম।" সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন যে, বক্তৃতার চোটে ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, আর বলিবেন না। তখন কিছুক্ষণ বসিয়া দেখিলাম যে, লোকটির না আছে বক্তৃতাশক্তি, না আছে সামান্য চিন্তাশক্তি। বলিতেছেও ঐরূপ ছাই ভস্ম। আর উহা গলাধঃকরণ করিতে না পারিয়া সেই সন্ধ্যার বাসন্ত উৎসবের ও পাগলা মিয়ার দরগায় মৌলাদ সরিফ পাঠের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে বলিয়া, আমি চলিয়া আসিলাম। ইনি ইহার পর সীতাকুন্ডে গিয়া মোহন্তের কাছে যুগল রজতমুদ্রা পাইয়া বক্তৃতা দিলেন যে, এমন বিশুদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী মোহন্ত তিনি আর দেখেন নাই। তাহার পর চট্টগ্রামে গিয়া, তন্ত্রের কি তীর্থের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, সেরেস্তাদার মহাশয়ের অধিনায়কত্বে তাঁহাদের বক্তৃতার জন্য ২০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। তাঁহার যেরূপ প্রভুত্ব, সেখানে পঞ্চ মকারের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করিতে গেলে, তাঁহাদেরই বা 'পতন্তি ভূতলে' ঘটে! তাঁহার জুড়ি প্রচারকপুঙ্গব শিবচতুর্দশীতে চন্দ্রনাথ দর্শন জন্য মাতা ও পত্নীকে লইয়া আসিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার এমনই দৃঢ় বিশ্বাস যে, ৫০টি অখন্ড মন্ডলাকার রজতের জন্য, চন্দ্রনাথ মাথায় থাকুন, তিনি সেই দিন বক্তৃতা দিতে চন্দনাথের বিপরীত দিকে চলিয়া গেলেন! ইহাঁরা প্রচারক, না প্রবঞ্চক? কিছু দিন পরে চট্টগ্রামে গিয়া দেখি যে, টিকির ধুম পড়িয়া গিয়াছে। এত অল্প সময়ে টিকির এরূপ দীর্ঘতা হইতে পারে না। আমার বোধ হইল, কলিকাতার বিখ্যাত 'টিকির ডিপো' (depot) হইতে উহার বহুপরিমাণ আমদানি হইয়াছে। যে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে আমি ২৫৲ টাকা পাঠাইয়াছিলাম, পুরুষানুক্রমে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম কেহ গ্রহণ করে না। বলা বাহুল্য, তাঁহার টিকির দৈর্ঘ্য মর্কটলাঙ্গুলপরিমাণ গজাইয়াছে। তাঁহার কাছে শুনিলাম যে, হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় দেশ তোলপাড় হইয়াছে। প্রচারকচূড়ামণি মানুষের আত্মার আকৃতি, ও প্রকৃতির সের-মাপা ওজন পর্য্যন্ত বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"হিন্দুধর্ম্মের অর্থ

কি বুঝাইয়াছেন?" উত্তর—"কই, তাহা ত কিছু বলেন নাই।" প্রশ্ন—"ধর্ম্ম শব্দের অর্থ কি বুঝিয়াছ?" উত্তর—"কই, তাহাও ত কিছু বলেন নাই।" প্রশ্ন—"হিন্দুধর্ম্ম কি?" উত্তর—"তাহাও কিছু বলেন নাই।" তবে আর হিন্দুধর্ম্ম বুঝিবার বাকী কি? দিনকতক এরূপ প্রচারে ও প্রচারকে দেশের লোক জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছিল। আমার অমৃত ভাণ্ডার 'হলহলানন্দ স্বামী'তে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু শ্রীভগবানের রাজ্যে প্রবঞ্চনা চিরস্থায়ী হয় না। মানুষ একবার মাত্র বিজ্ঞাপন কি বক্তৃতার চোটে প্রবঞ্চিত হইতে পারে। আজ সেই প্রচার ও প্রচারক, উভয়ই নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে ডারউইনি টিকিসমূহও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য না হইলেও, দৈর্ঘ্যে অনেক হ্রস্ব হইয়াছে। পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া ডারউইনি অভিব্যক্তি-বাদমতে মনুষ্যত্ব লাভের আর বড় বাকী নাই। শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

কয়েক জন প্রকৃত মহাত্মার উল্লেখ করিয়া, এই হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক মহাশয়দের কীর্ত্তি-কাহিনীতে এই অধ্যায়টি শেষ করিতে কষ্ট বোধ হইতেছে। অতএব ফেনীর রাম ঠাকুরের কথা বলিয়া ইহার উপসংহার করিব। রাম ঠাকুরের বাড়ী বিক্রমপুর, বয়স ২৬।২৭ বৎসর মাত্র। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার গুরুদেব একজন প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। রাম ঠাকুরের যখন ৮ বৎসর বয়স, তিনি মৃত্যুমুখে তাঁহাকে বলিয়া যান যে, রাম ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার আবার সাক্ষাৎ হইবে। কথাটি শুনিয়া বালকের মনে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবে—ইহার অর্থ কি? বালক ইহার কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার প্রাণে কি এক উদ্যম সঞ্চারিত হইল। তাহার পড়াশুনাতে মন লাগিত না। অবশেষে সে ১২ বৎসর বয়সে গৃহ ত্যাগ করিয়া, নানা স্থানে নানা সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করে। এক দিন কামরূপের কামাখ্যা দেবীকে প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইবে, এমন সময়ে এক পার্শ্ব হইতে কে বলিল—"তুই আমার গাঁজা সাজাইয়া দিয়া যা।" সে ফিরিয়া দেখিল, একজন সন্ন্যাসী। চোখে চোখে দেখা হইলে তিনি বলিলেন—"তুই আমাকে চিনিতে পারিতেছিস না?" রাম ঠাকুরের বোধ হইল, এ কণ্ঠস্বর তাহার গুরুদেবের। পরে তাঁহার সঙ্গে বহু বর্ষ হিমালয় ভ্রমণ করে এবং মহাত্মাদের কলেবরপরিবর্ত্তন ইত্যাদি বহু অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করে। তাহার মাতা জীবিতা। এ জন্য তাহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত না করিয়া, তাহার গুরুদেব তাহাকে তাহার মাতার মৃত্যু পর্য্যন্ত সংসারাশ্রমে ফিরাইয়া পাঠান। রাম ঠাকুর তাহার গ্রামস্থ একজন ওভারসিয়ারের পাচক হইয়া নোয়াখালি আসে। গল্প উঠিল যে, এক দিন সে আহ্নিকে বসিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আহা! অমুকের শিশু পুত্রটি মারা গেল!" বাস্তবিক নোয়াখালি সহরের অন্য স্থানে ঠিক সে সময়ে সেই শিশুটির দৈব ঘটনাতে মৃত্যু হইল। তাহার পর ফেনীতে যে নূতন জেলখানা প্রস্তুত হইতেছিল, রাম ঠাকুর তাহার সরকার হইয়া আসিল। লোকে বলিতে লাগিল যে, কখনও তাহাকে গৃহে আহ্নিকে দেখিয়াছে, এবং পরের মুহূর্ত্তে রাম ঠাকুর অদৃশ্য হইয়াছে। কেহ তাহাকে রাত্রিশেষে রক্তচন্দনচর্চ্চিত অবস্থায় কোনও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে দেখিয়াছে। সর্প দংশন করিতে, গরু মহিষ মারিতে আসিতেছে, আর রাম ঠাকুর হাত তুলিয়া বারণ করা মাত্র চলিয়া গিয়াছে। নিজে কিছুই আহার করে না। কদাচিৎ দুগ্ধ বা ফল আহার করে। অথচ তাহার সবল সুস্থ শরীর। পরসেবায় তাহার পরমানন্দ। জেলখানার ইটখোলার গৃহে পাবলিক ওয়ার্ক প্রভুদের বারাঙ্গনাগণ কখন পালে পালে উপস্থিত হয়। কিন্তু রাম ঠাকুর তাহাদের ঘৃণা করা দূরে থাকুক, বরং সন্তোষের সহিত নিজে রাঁধিয়া তাহাদের অতিযত্নে আহার করায়, এবং মাতাল হইয়া পড়িলে তাহাদের আপন মাতা কি ভগিনীর মত শুশ্রূষা করে। সে সময়ে নোয়াখালি হইতে বহু দূর ভবানীগঞ্জে গিয়া ষ্টীমারে উঠিতে হইত। রাম ঠাকুর একদিন একটি আত্মীয়কে ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া ফিরিতে

রাত্রি হইলে, একটি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গভীর রাত্রিতে রাম ঠাকুর দেখিল, মসজিদ আলোকিত হইয়াছে, এবং তাহার গুরুদেব আর দুই জন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহারা কৌষিকী পর্ব্বত হইতে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। নির্জ্জন স্থানে, একাকী, গভীর রাত্রি ; রাম ঠাকুর ভীত হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে দেখিতে আসিলেন।

আর একটি গল্প বহু লোকের মুখে, সর্ব্বশেষ রাম ঠাকুরের নিজমুখেও শুনিয়াছিলাম। সে বৎসর শিবচতুর্দ্দশীতে চন্দ্রনাথে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া তাহার গুরুদেব প্রতিশ্রুত ছিলেন। রাম ঠাকুর ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পরিদর্শনে আসিবেন বলিয়া ওভারসিয়ার ছুটি দিলেন না। রাম ঠাকুর শিবচতুর্দ্দশীর প্রাতে বড় মনোদুঃখে বসিয়া গুরুদেব তাহাকে কেন এ দর্শন হইতে বঞ্চিত করিলেন ভাবিতেছে। এমন সময়ে টেলিগ্রাম আসিল যে, সাহেব আসিলেন না। তাহার ছুটি মঞ্জুর হইল। রাম ঠাকুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া চন্দ্রনাথদর্শনে ছুটিল, কিন্তু অকস্মাৎ উত্তেজনায় ভ্রান্ত হইয়া, দক্ষিণ মুখে না গিয়া উত্তর মুখে চলিল। কিছু দূর গেলে একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে বলিল যে, রাম ঠাকুর চন্দ্রনাথের বিপরীত দিকে যাইতেছে। তখন ভ্রম বুঝিয়া এক বৃক্ষতলায় বড় সন্তপ্তহৃদয়ে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটি সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়া, রাম ঠাকুর কি চন্দ্রনাথ যাইবে, জিজ্ঞাসা করিল। রাম ঠাকুর বলিল যে ভ্রমবশতঃ বিপরীত দিকে আসিয়াছে। অতএব সে দিন আর চন্দ্রনাথে পোঁছিবার সম্ভাবনা নাই। সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন, এবং পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া পার্ব্বত্য পথে তাহাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সানুদেশে উপস্থিত করিলেন! সে স্থান হইতে চন্দ্রনাথ চল্লিশ এবং ফেনী হইতে ত্রিশ মাইলের পথ। চতুর্দ্দশী রাত্রি সীতাকুণ্ডে অতিবাহিত করিবার পরদিন আবার সেরূপ অজ্ঞাত পথে অজ্ঞাতভাবে তাহাকে আনিয়া ফেনীর উত্তর দিকে একটি স্থানে রাখিয়া গেলেন। এখানে প্রত্যূষে একজন পেয়াদার সঙ্গে রাম ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইলে সে জঙ্গলে লুকাইতেছিল। পেয়াদা তাহাকে পাকড়াও করিল, এবং তাহার দ্বারা মহম্মদের এক রাত্রিতে বিশ্বভ্রমণের মত এই অদ্ভুত তীর্থদর্শন-কাহিনী প্রথম প্রচারিত হইল। রাম ঠাকুর দেখিতে ক্ষীণাঙ্গ, সুন্দর, শান্তমূর্ত্তি। নিতান্ত পীড়া-পীড়ি না করিলে কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করে না, কোনও কথা কহে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার ৮ হইতে ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষা মাত্র হইয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব—এমন কি, প্রণবের অর্থ পর্য্যন্ত সে জলের মত বুঝাইয়া দিত। আমি তাহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মধ্যে মধ্যে আমি তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়া আমার গৃহে আনাইতাম, এবং পতি পত্নী মুগ্ধচিত্তে তাহার অদ্ভুত ব্যাখ্যা সকল শুনিতাম। বলা বাহুল্য, সে পেশাদারি হিন্দু প্রচারকের ব্যাখ্যা নহে। একদিন রাণাঘাটে ঊষাক্ষণে জাগিয়া স্ত্রী বলিলেন যে, তিনি সেই বার কালী দর্শন করিতে গিয়া শুনিয়াছিলেন, রাম ঠাকুর কালীঘাটে আসিয়াছিল। আমাদের সঙ্গে কেন দেখা করিল না—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, কেমন করিয়া বলিব। মুখ প্রক্ষালন করিয়া আমি আফিসকক্ষে সোফার উপর বসিয়া যেই বাহির দিকে দেখিতেছি, দেখি আমার সম্মুখে বারান্ডায় অধোমুখে স্থিরভাবে রামকুমার দাঁড়াইয়া আছে। আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। আমার বোধ হইল, যেন রাম ঠাকুর আকাশ হইতে সে স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যথা আমি তাহাকে আসিতে দেখিতে পাইতাম। তাহার সঙ্গে আর আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। শুনিয়াছি, রাম ঠাকুর এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।

কথায় কথায় এই সময়ের আর একটি অদ্ভুত ঘটনা স্মরণ হইল। রাম ঠাকুরের কর্ত্তা ওভারসিয়ার মহাশয়ও একজন ঘোরতর তান্ত্রিক। তাঁহার সঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়ের

বিশেষ মনোবাদ উপস্থিত হইল। সে অবধি ইঞ্জিনিয়ারবাবুর একটি দশমবর্ষীয়া ভগিনীর উপর এক অচিন্তনীয় উপদ্রব উপস্থিত হইল। হঠাৎ তাহার কাপড়ে, গৃহের চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহাদের, বিশেষতঃ বালিকার আহার্য্য বস্তুতে ও অঙ্গে অকস্মাৎ ময়লা পড়িতে লাগিল। তাঁহাদের অবস্থা ভয়ানক শোচনীয় হইল। নিজ গৃহ ছাড়িয়া তাঁহারা ভুলুয়ার রাজার পাকা কাচারিগৃহে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু তাহাতেও উপদ্রব থামিল না। ইন্‌স্‌পেক্টর অব লোকাল ওয়ার্কস্‌ (Inspector of local works) বাবু সাধনচন্দ্র রায় একদিন ইঞ্জিনিয়ারবাবুর গৃহে আহার করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাদের আচার দিতে ভৃত্য বোতল আনিয়াছে, বোতলের কাকের উপর ময়লা। শেষে ইঞ্জিনিয়ারবাবু তাঁহার ভগিনীকে কলিকাতায় লইয়া যান। তাঁহাদের পাড়াতে একজন সন্ন্যাসী আসিলে তাঁহাকে তাঁহারা এ ঘটনার কথা বলেন। তিনি কি এক ক্রিয়া করিলে তাঁহাদের প্রাঙ্গণ হইতে একটি বাষ্পস্তম্ভ উর্দ্ধদিকে চলিয়া যায়। সে অবধি তাঁহার ভগিনী সেই উপদ্রব হইতে উদ্ধার লাভ করে। এই অদ্ভুত উপাখ্যান আমি স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ারবাবুর মুখে শুনিয়াছি। এই বিপদে পড়িয়া তাঁহার শরীরিক অবস্থা দারুণ চিন্তায় এরূপ হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিলে দুঃখ হইত। তাঁহার বিশ্বাস যে, উক্ত ওভারসিয়ারের একজন তান্ত্রিক গুরু আছেন। এই উপদ্রব তাঁহারই কার্য্য। ঠিক হইল, কিছু দিন পূর্ব্বে এরূপ উপদ্রব ফেনীতে নিকটস্থ একটি যুগী বিধবার উপর হইয়াছিল। কেহ তাহাকে দেখিতে গিয়া, সেই অদৃশ্য উপদ্রবকারীকে গালি দিলে, কেহ যেন অদৃশ্যভাবে তাহার ঘাড়ে ধরিয়া, অমানুষিক বলে তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিত। আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারবাবুর মত লোকের কথা অবিশ্বাস করিব কিরূপে? সেক্ষপিয়ার কবি সত্যই বলিয়াছেন—

"আছে স্বর্গে মর্ত্তে বহু বিষয় এমন,
দর্শন দেখেনি যাহা স্বপ্নেও কখন।"

১। গীতার অনুবাদ

ঘোরতর নিরুৎসাহে 'রৈবতক' রচনা শেষ করিয়া ও প্রেসে পাঠাইয়া, বেদব্যাসকে এখানে বিশ্রাম দিব, কি 'কুরুক্ষেত্রে' হাত দিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। শেষে স্থির করিলাম, কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া রৈবতকের ভাগ্য পরীক্ষা করিব। আমি এ পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পড়ি নাই। ভাগবতের ও মহাভারতের উপাখ্যানভাগের বঙ্গানুবাদ পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম ও রাজনৈতিকতা সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাই 'রৈবতকে' বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এখন পূজনীয় পণ্ডিত অভয়ানন্দ তর্করত্নের সাহায্যে মূল সংস্কৃত গীতা ফেনীতে পাঠ করিলাম। দেখিলাম, শাঙ্কর ভাষ্যে ও অন্যান্য টীকায় প্রবেশ করিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়, এবং মূল পড়িয়া যাহা বুঝি, তাহাও হারাইয়া ফেলি। অতএব টীকাকে প্রণাম করিয়া, আমি মূলই পড়িতে লাগিলাম, এবং তাহা যেন ভাল বুঝিতেছিলাম। অনেক সময় মূলের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে একটুক তর্ক করিতাম। তিনি একদিন বলিলেন যে, এক নিমন্ত্রণে তাঁহাকে একজন পণ্ডিত তাঁহার কাছে আমি গীতা পড়িতেছি কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহার কাছে গীতা পড়িতেছি, কি তিনি আমার কাছে পড়িতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ আছে। কারণ, আমি গীতা যেরূপ বুঝি, এবং তাহার যেরূপ সরল ব্যাখ্যা করি, কোনও পণ্ডিতের তাহা বুঝিবার, কি করিবার সাধ্য নাই। পণ্ডিত মহাশয় শিষ্য-বাৎসল্যবশতঃই অবশ্য এরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, আমরা ইংরাজীদর্শনের ছাত্রগণ যেরূপ সহজে গীতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, বর্ত্তমান গ্রন্থমুখস্থকারী পণ্ডিতেরা

তাহা পারেন না। তাঁহাদের বিশ্বাস ও শিক্ষা এরূপ লৌহনিগড়বদ্ধ যে, তাঁহাদের বিবেকশক্তি পূর্ণ উন্মেষিত হইতে পারে না এবং তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারেন না। যাহা হউক, গীতা যতই পড়িতে লাগিলাম, আমি ততই যেন কি এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম এবং কৃষ্ণভক্তিতে আমার হৃদয় ততই পূর্ণ হইতে লাগিল। গীতা শেষ করিয়া আমি বহুদিন পর্য্যন্ত আত্মহারাবৎ ছিলাম। হায়! এই অমূল্য গ্রন্থ ফেলিয়া, আমরা ইউরোপীয় দর্শন ঘাঁটিয়া জীবন কাটাইয়াছি।! খ্রীষ্টের মত সকল মনুষ্যই বুঝি, জীবনের এক অংশ ঘোরতর অরণ্যে কাটাইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এ পর্য্যন্ত আমার জীবনও আমি ইউরোপীয় দর্শনের অরণ্যে অপচয় করিয়াছি। গীতা পাঠ করিয়া আমি যেন এক নূতন জীবন লাভ করিলাম, এবং আমার স্ত্রীকে পড়াইবার জন্য উহার বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। শুনিয়াছি, একজন বিখ্যাত অঙ্কবিৎ সমগ্র সেকস্‌পিয়ার পড়িয়া বলিয়াছিলেন—what does it prove? ইহার দ্বারা কি প্রমাণ হয়? আমার স্ত্রীও গীতার অনুবাদ বহু কষ্টে পড়িয়া বলিলেন—"মানুষ কি এমন ধর্ম্মমতে চলিতে পারে?" তাঁহার হৃদয় একটি ক্রোধাভিমানের বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। গীতা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ইন্দ্রিয়সংযম শিক্ষা দিতেছে। স্ত্রীলোক অভিমান ত্যাগ করিবে,—তাহাও কি হয়? অভিমানহীনা আমার এক বন্ধুপত্নীকে তিনি 'কলাগাছ' আখ্যা দিয়াছিলেন। 'রৈবতকে'র কৃষ্ণ অন্যের কাছে ভাল লাগে নাই। গীতার অনুবাদ পড়িয়া কৃষ্ণের ধর্ম্মটাও আমার আপনার স্ত্রীর কাছে ভাল লাগিল না।

হাই কোর্টের একজন উকিল গীতা পড়িতেই পারিতেন না। তিনি বলিতেন—"তোমরা কি গীতা গীতা কর ও কৃষ্ণকে এত ভক্তি কর? অর্জ্জুন যুদ্ধ কর্‌বে না, কৃষ্ণ তাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যুদ্ধ করালে ও ভারতটা নিক্ষত্রিয় কর্‌লে? কৃষ্ণ অপেক্ষা অর্জ্জুন কত মহৎ ছিল!" কোনও গ্রামে রামায়ণ গান হইতেছিল। একটি গঞ্জিকাসেবকের স্ত্রী তাহাকে উহা শুনিতে যাইতে জিদ করিতেছিল, কিন্তু সে কিছুতেই যাইবে না। আর একদিন তাহার স্ত্রী দুটি টাকা তাহার কাপড়ে বাঁধিয়া দিয়া, নিতান্ত জিদ করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিল। পালা মারীচবধ। রমচন্দ্রের আর্ত্তনাদ শুনিয়া সীতা লক্ষ্মণকে যাইতে জিদ করিতেছেন। গাঁজাখোর স্বগত বলিল—"লখা! তুই যাস্‌ না!" সীতা যত বার লক্ষ্মণকে যাইতে বলিলেন, সে তত বার বলিল —"লখা! তুই যাস না!" শেষে সীতা গালি দিলে লক্ষ্মণ চলিয়া গেলেন। যখন রাবণ আসিয়া সীতার হাত ধরিল, তখন—'কোথায় প্রাণের দেবর লক্ষ্মণ!' বলিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন। তখন গাঁজাখোর লাফাইয়া উঠিয়া, কোমরে গামছা জড়াইয়া বলিল—"নে যা হারামজাদি বেটিরে! লখা যাবে না, তারে খুঁচিয়ে পাঠিয়ে দিলে। আর এখন বলে—কোথায় প্রাণের দেবর লক্ষ্মণ! মোকদ্দমা হয়, তার খরচ এই দুই টাকা দিলাম। পরে যা লাগে, আমি সব দেব।" উকিল মহাশয়ের সাক্ষাতে 'গীতা' অভিনীত হইলে তিনিও হয় ত বলিতেন—"দে খুনী বেটাকে ফাঁসি! হাইকোর্টে আপিল করে, মোকদ্দমা আমি চালাব।"

যাহা হউক, যদি অনুবাদটি অন্য কাহারও উপকারে আসে, এই বিশ্বাসে উহা ছাপিলাম। উহাতে আমার নিজের বিদ্যা বুদ্ধি কিছুই নাই। মূল সংস্কৃতের যথাসাধ্য অক্ষরে অক্ষরে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করিয়াছি মাত্র। তথাপি 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পর্য্যন্ত এই অনুবাদের এবং তাহার আরম্ভে গীতার যে সারাংশ অধ্যায়ে অধ্যায়ে বুঝাইয়া দিয়াছি, তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন।

"Babu Nobin Chandra Sen, the well-known author of the "Battle of Plassey" and other poems, has, we are glad to note, utilized his powers in the direction of religion philosophical subjects. The present book contains a translation of the *Gita*, and is a master-piece, showing, as it does, the depth of his learning and the extent of his ingenuity in

translating that abstruse poem, without affecting the letter or spirit of it. The poet gives in the preface a clear *resume* of the *Gita*, and thus helps the reader in mastering its contents. Babu Nobin Chandra Sen's rendering of the *Gita* is admirable, and a splendid acquisition to the poetical literature of the day."—*The Indian Mirror*..

দাদা অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিলেন—"তোমার গীতা তোমার বউ ঠাকুরাণীর কাছে তোমাপেক্ষাও আদরের বস্তু হইয়াছে। প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ের বাংগলা ভাগ অনেক স্থানই মুখস্থ। শিবপূজার পর এক বা দুই অধ্যায় প্রত্যহ ঠাকুরঘরে পাঠ করেন। গীতার প্রচার দিন দিন বাড়িতেছে; তুমি অর্দ্ধমূল্য করিয়া দিলে, তোমার গীতারই ভূয়ো প্রচার হয়।" তদনুসারে আমি এক টাকা হইতে উহার মূল্য আট আনা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু তখন 'গীতাহুজুগ' কলিকাতায় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভায় আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের ঢক্কানাদে কাণ ফাটিতেছে। অর্দ্ধমূল্যেই বা আমার অনুবাদের খবর কে লয়? সর্ব্বাপেক্ষা গীতানুবাদের শ্রমের সফলতা আমার সেই অন্ধ পিতৃব্য হইতে পাইয়াছিলাম। তিনি বৃদ্ধ, অন্ধ, এবং বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবী হইলেও তাঁহার শিক্ষা সেকালের পাঠশালার উপরে যায় নাই। আমি গীতার অনুবাদ করিয়াছি শুনিয়া তিনি এক খণ্ড চাহিয়া পাঠান, এবং তাঁহার পুত্রের মুখে উহা শুনিয়া, তাহার দ্বারা আমাকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহার বৃদ্ধবয়স। এ যাবৎ তাঁহার বাড়ীতে শ্রাদ্ধাদিতে বৎসর তিন চারি বার গীতা পাঠ হইয়াছে, এবং গীতাপাঠের দক্ষিণা দিয়াছেন। কিন্তু গীতা কি, তিনি এত দিন জানিতেন না। আমার অনুবাদের দ্বারা প্রথম জানিলেন। অতএব তিনি আমার মস্তকে পিতৃব্যের মত সস্নেহ সহস্র সহস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিয়াছেন। বহুদিন পরে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু শিশিরকুমার ঘোষ লেখেন—"তোমার গীতা পড়িলাম। তুমি অনুবাদে অতিশয় শক্তি দেখাইয়াছ। এমন কঠিন বিষয় এরূপ সহজ ভাষায় ও সহজরূপে প্রকাশ যে সম্ভব, তাহা আমার পূর্ব্বে বোধ ছিল না। তুমি বলেছিলে, গীতা জগতের ধর্ম্ম, গীতা কর্ত্তৃক সমস্ত জগৎ একত্রিত হইতে পারে। তাই বটে। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম্ম অল্প কয়েক জনের জন্য।" মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"আপনার গীতা আমার সহধর্ম্মিণীকে দিয়াছি ও পাঠ করিতে বলিয়াছি। 'গীতা' যে বাংগলা পদ্যে এত সংক্ষেপে অথচ এত সুন্দর ও বিশদরূপে অনুবাদিত হইতে পারে, ইহা আপনার অনুবাদ না দেখিলে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিত না। এই সানুবাদ গীতাখানি বাংগালী মাত্রেরই গৃহে থাকা বাঞ্ছনীয়।"

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে উত্তর ও পশ্চিম-ভারত বেড়াইতে গিয়া কানপুর ষ্টেশনে পেঁৗছিয়াছি। একটি ইউরোপীয় পরিচ্ছদধারী বাংগালী আমার ট্রেন-কক্ষের পার্শ্বে আসিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বাবু নবীনচন্দ্র সেন?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন, তাঁহার নাম মহেন্দ্রনাথ গাংগুলি। এলাহাবাদের কোনও বন্ধুর পত্রে আমি এই ট্রেনে কানপুরে আসিব শুনিয়া তিনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন। আমি কাহারও ঘাড়ে পড়িয়া অতিথি হইতে ভালবাসি না। বিশেষতঃ তাহাতে স্থান-দর্শনেরও অসুবিধা হয়। অতএব এলাহাবাদের অনেক বন্ধু কানপুরে তাঁহাদের বন্ধুদের কাছে পত্র লিখিতে চাহিলেও আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। তথাপি ইঁহার একজন বিশেষ বন্ধু আমার অজ্ঞাতে ইঁহাকে খবর দিয়াছেন। ইনি কানপুরের স্বনামধন্য ডাক্তার। তিনি আমাকে সভৃত্য তাঁহার প্রকাণ্ড 'ওয়েগনেটে' লইয়া তুলিলেন। আমি তথাপি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমাকে একটি ভাল হোটেলে লইয়া গেলে আমি তাঁহার কাছে অনুগৃহীত হইব। তিনি বলিলেন যে তিনি আমাকে একটি হোটেলেই লইয়া যাইতেছেন। এক স্থানে গাড়ী থামাইয়া বলিলেন —"ঐ ডান দিকে কানপুরের প্রধান ইংরাজী-হোটেল, এবং ঐ বাম দিকে গরিব আমার

'ডিস্‌পেন্সারি' এবং গৃহ। আপনি ক্ষেপিয়াছেন যে, আপনি হোটেলে যাইবেন। দেখিবেন, আপনাকে দেখিবার জন্য প্রায় দুই শত ভদ্রলোক আমার বৈঠকখানায় অপেক্ষা করিতেছে।"

তাঁহার 'ডিস্‌পেন্সারি'র মত এমন সুসজ্জিত ডিস্‌পেন্সারি আমি দেখি নাই। উহা যেন একটি Drawing room, বিলাতি সাজে সজ্জিত বৈঠকখানা। উহা দেখাইয়া তাঁহার দ্বিতলস্থ প্রশস্ত বৈঠকখানায় আমাকে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, মাথায় মাথা লাগিয়া ভদ্রমণ্ডলী বসিয়া আছেন। আমাকে বড়ই অভ্যর্থনা করিলেন, এবং একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত আমার গীতার অনুবাদের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া, আমার গীতার অনুবাদ তিনি কিরূপে দেখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। কারণ. গীতা তখনই মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন যে. গীতা কয়েকখানি ইতিমধ্যেই কানপুরে আসিয়াছে, এবং তিনি বাঙ্গলা জানেন। তখন তিনি গীতা সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিলেন। সমবেত ভদ্রলোকগণ এরূপ আত্মহারা হইয়া শুনিতেছিলেন যে, যখন মাথার উপর ঘড়ীতে দশটা বাজিল, তখন সকলের চেতনা হইল। ছয়টা হইতে চারি ঘণ্টা সময় কাটিয়া গিয়াছে, কাহারও জ্ঞান নাই। আমার তখনও পর্য্যটনের পরিচ্ছদ—সেই অর্দ্ধ ফিরিঙ্গি হ্যাট কোট। আর এ পরিচ্ছদে গীতার ব্যাখ্যা! আমি যে এলাহাবাদ হইতে একটানা কানপুর আসিয়াছি এবং জলবিন্দুও গ্রহণ করি নাই, এ কথা মহেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আমার জন্য কত রকমেরই জলখাবার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এতক্ষণ আমাকে মুখপ্রক্ষালন করিতে পর্য্যন্ত দেন নাই বলিয়া তাঁহার স্বামীকে ভর্ৎসনা করিলে তিনি বলিলেন—"এ দোষ আমার, না তাঁহার। কেবল আমি ত নহে, দু শ ভদ্রলোক এরূপ কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। এমন আলাপের শক্তি আমি আর কাহারও দেখি নাই। চারটি ঘণ্টা চলিয়া গিয়াছে. আমরা এতগুলি লোক কিছুই জানিতে পারি নাই।" পরদিন প্রাতে তিনি তাঁহার গাড়ীতে করিয়া আমাকে কানপুর দেখাইতে যাইতেছিলেন। পশ্চিমের শীতকালের প্রাতঃকাল। উপরে অভঙ্গ নীলাকাশ; প্রভাতানিল শরীরে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। প্রাণের আনন্দে আমি একটুক হাল্‌কা কথা বলিলাম। মহেন্দ্রবাবু বিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"সে কি মহাশয়! কাল সেই রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত গীতা. এবং উচ্চ অঙ্গের দর্শন. আর এখন এ কথা!" দেখিলাম, ইনিও 'ভারতী' ঠাকুরাণীর মত সত্যভামার শয্যাকক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতা শুনিতে চাহেন। আমি বলিলাম—"মহেন্দ্রবাবু! আপনি নিজে ডাক্তার। আপনার কিরূপে এমন ভুল হইতেছে! মানুষের তিনটা জিনিস আছে—দেহ. মন, আত্মা। এই তিনটারই চরিতার্থতা চাহি। গীতায় কিম্বা দর্শনে মানুষের ত ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না।" সমস্ত পূর্ব্বাহ্ণ, যে পর্য্যন্ত Memorial well, যাহাতে বিদ্রোহী সিপাহিরা ইংরাজ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার সমক্ষে না গিয়াছিলাম, নানাবিধ খোসগল্পে কাটাইলাম। সেদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার বৈঠকখানায় দর্শকের ভিড় আরও বেশী হইল। আবার গীতার কথা. উচ্চ অঙ্গের ধর্ম্মের ও দর্শনের কথা উঠিল। আবার রাত্রি দশটা হইল। তখন মহেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আপনারা তাঁহার এক মূর্ত্তি মাত্র দেখিলেন। তাঁহার আর এক মূর্ত্তি আছে। তিনি আজ সমস্ত প্রাতঃকাল ছয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত আমাকে হাসাইয়াছেন।" তখন যুবকসম্প্রদায় বলিলেন—"তবে এখন গীতা ও দর্শন থাকুক। আমরা সেই মূর্ত্তিটি কিছুক্ষণ দেখি।" কিন্তু এরূপ গভীর দার্শনিক আলাপের পর লঘু আলাপ মুখে আসিবে না, এবং রাত্রিও অনেক হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের কাছে ক্ষমা চাহিলাম। এই দূরদেশে গীতার অনুবাদের জন্য এই অভ্যর্থনা পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল।

২। 'পলাশির যুদ্ধে'র ইংরাজি অনুবাদ

আমি ফেনী আসিবার কিছু দিন পরে কুমিল্লার একজন ইংরাজ কার্য্যোপলক্ষ্যে ফেনী আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কথায় কথায় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রণেতা নবীনবাবু?" আমি বলিলাম—"লোকে তাহা বলে। আপনি এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তিনি বলিলেন—"কুমিল্লার সিভিল সার্জ্জন ডাক্তার ফ্রেণ্ড মলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি একজন আপনার একান্ত কবিতানুরাগী (great admirer)। তিনি আপনার 'পলাশীর যুদ্ধ' লইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। তিনি আমার সহবাসী। আমরা কুমিল্লায় এক গৃহে বাস করি। তিনি দিন রাত্রি যেরূপ ভাবে আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' পড়িতে পড়িতে পাগলের মত গৃহ পরিক্রমণ করেন, আপনার একবার দেখা উচিত। তিনি আপনার বহি ইংরাজি কবিতায় অনুবাদ করিতেছেন, এবং সময়ে সময়ে উহা আমাকে ও কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট স্ক্রীণ সাহেবকে—তিনিও একজন সাহিত্যানুরাগী—পড়িয়া শুনান। 'পলাশির যুদ্ধ'-প্রণেতা আপনিই নবীনবাবু শুনিলে তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন এবং আপনার কাছে পত্র লিখিবেন।" তিনি তাহার পর সত্য সত্যই পত্র লিখিলেন। ডাক্তার ফ্রেণ্ড মলেনের নাম পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। তিনি একজন বিখ্যাত ডাক্তার। মেডিকেল কলেজের প্রফেসার ছিলেন। [বিদেশী] রোগীর পথ্যের ব্যয় বৃদ্ধির জন্য লেঃ গবর্ণর এস্লি ইডেনের ঘোরতর প্রতিবাদ করাতে, প্রতিহিংসাপরায়ণ ইডেন তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ হইতে বদলি করিয়া, মফঃস্বলের নানা স্থানে ঘুরাইতেছেন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ডাক্তার মলেনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, ইডেন ইহার বেশী তাঁহার ক্ষতি করেন নাই। অতএব জানিতাম, তিনি একজন কেবল বিচক্ষণ ডাক্তার নহেন, একজন অতিশয় যোগ্য লোক, সাহসী, সুলেখক এবং সহৃদয়। দেশীয় রোগীর জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, এবং তাহাদেরই জন্য তিনি এত দূর আত্মবলিদান স্বীকার করিয়াছিলেন। এ আত্ম-বলিদানও নিস্ফল হয় নাই। ইডেন রোগীর পথ্য-ব্যয়বৃদ্ধি রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম পত্রেই আমাকে লিখিলেন যে, তিনি আমার একজন গুণানুরাগী (admirer)। তিনি 'পলাশির যুদ্ধে'র অনুবাদ করিতেছেন, এবং উহা ছাপাইবার সময় ভূমিকায় তিনি দেখাইবেন যে, গভর্ণমেণ্টের আমাকে বাঙ্গলার Poet Laureate (রাজকবি?) করা উচিত। মন্দ কথা কি? 'বঙ্গদর্শন' আমাকে বাঙ্গলার 'বাইরন' আখ্যা দিয়াছিলেন, ইনি তাহার উপর 'পোয়েট লরিয়েট' করিতে চাহেন। গোদের উপর বিস্ফোটক। তিনি 'কাদম্বরী'র উপাখ্যান ইংরাজি কবিতায় রচনা করিয়া, তাহার নাম 'চন্দ্রাপীড়' দিয়া ছাপিয়াছেন। তাহার এক কপি আমাকে উপহার পাঠাইলেন। দেখিলাম, ইংরাজি ভাষা ও কবিতার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তাহার পর আমি শিবিরে এক দিন 'ম্যাপে'র মত একটা গোলাকার পার্শেল পাইলাম। খুলিয়া দেখি, তিনি রঙ্গমতীর 'চন্দ্রকলার গীতে'র এক অদ্ভুত ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। প্রত্যেক শ্লোকে চন্দ্রকলার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার এক ছবি আঁকিয়াছেন। ছবির নিম্নে এক পার্শ্বে বাঙ্গলা শ্লোকটি অতি সুন্দর বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার অপর পার্শ্বে তাহার ইংরাজি অনুবাদ দিয়াছেন। ছবি অবশ্য বাঙ্গালী রমণীর ছবির মত হয় নাই, ইউরোপীয় মহিলার মত হইয়াছে। যদিও তিনি তাহাকে শাড়ী পরাইয়াছেন, শাড়ীর ভঙ্গিও বিলাতি রকমের হইয়াছে। ঠিক যেন কোন ইউরোপীয় রমণী বাঙ্গালীর শাড়ী পরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপে ১২ মাসের ১২ শ্লোকের ১২টি স্বতন্ত্র ভাবের ছবি ১২ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন।

এই উপহার পাইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া লিখিলাম যে, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইংরাজ বাঙ্গালী, উভয় জাতি যে, এক স্থানে বাস করিয়াও একাধারে তেল জলের মত স্বতন্ত্র

ও সম্পর্কহীন, তাঁহার ছবিগুলিই তাহার একটা শোচনীয় প্রমাণ। তিনি বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা কখনও দেখেন নাই। কেমন করিয়া তাহাদের ছবি আঁকিবেন। অতএব ছবিগুলি বিচিত্র ভঙ্গিতে শাড়ীপরিহিতা ইউরোপীয় মহিলার ছবি হইয়াছে। ডাক্তার ফ্রেঞ্চ মলেন কেবল 'আইরিশম্যান' নহেন, কিরূপ 'আইরিশম্যান', তাঁহার নিম্ন উদ্ধৃত পত্রখানিতে পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমার উক্ত পত্রের উত্তরে তিনি এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন।

I am glad you liked my illustrations; but you did not say you liked the translation. I did not quite understand the original and this together with the exigencies of verse prevented a literal translation. I do not think I have the book in which the other verses you refer me to occur. My servants are, I am afraid, given to relieving me of many of my volumes. I want very much to see your work on Krishna. I wrote a sonnet on his death (taken from the Mahavarat) which I will send you—a mere translation. It would take a great deal of money to print the illustrations I sent you as they are so large. I can draw small illustrations for you whenever you require them. When you are bringing out some new edition of some of your works, I could make some drawings for them—they might add to the interest of the work, the more so far being done by a European. But I should have originals to copy from. I could at the same time given an English translation of the lines referring to the picture. I am always scribbling—whatever weighs on my mind I put into a sonnet or verses of some kind. Some of the grievances of the Indian people have been running through my head lately, and in my note book I find them more or less crystalized in the following sonnets.

REDUCTIONS

Each high official, in his office chair, must needs
Some large economies suggest—since gold is
Scarce in the Imperial chest, and starving
Peasants no new tax can bear : no chicken
Heart hath he the weak to spare.

I find this sonnet has not been completed. My reason for giving the sonnet is to illustrate my expression of astonishment that no Bengali poet has ever, as far as I know put forth the real grievances of the people in verse. My daughter in her last letter wrote the following ludicrous couplet—

I wish the English Government
Could be kicked out of Parliament.

Here is the last speech of my son (aged 5 years and 2 months)—
Ladies & Gentlemen,—I am going to see how O'Brien is getting

on. I shall knock Balfour into a cocked hat; I shall get Reggy Dillon to squash him.

Balfour shall be put in jail; and if he goes to England I will kick him out. If he remains in Dublin I will thrash him; and if he is in the train I will thrash him still. The Lord Mayor will be out in a few days. I will speak to the Government; I will say :—"Good morning! now I have come to talk to you about the Lord Mayor; I will smash you if you don't take the Lord Mayor out of the prison; and if you don't do it I will throw hot and cold water on you. I will die for my country like O'Brien. Marrie my queen will help me to drive the Saxons into the sea."

Ladies and gentlemen, I must think I have finished my speech. I will not allow the priests to be put in jail. I will go over to them and say :—"You need not be afraid, Priests! Parliament is going to be opened and I will get up and make a speech. I am king of Ireland, I am not afraid of the Government.

I do not blame the police; the government tell them to fire on the people, and it is not their fault.

I am going to make a meeting here in Dublin; now I shall be in it myself. I will go to the Town Hall and speak—I don't care what they say,—if they say a word I will thrash them.

I shall be a soldier and die in the battlefield, I will thrash Balfour here in Dublin; I will get my hounds to tear him in pieces. Now ladies and gentlemen, I have finished. God save Ireland."

এই পত্র পাইয়া তাঁহার কাছে আমার বহি এক সেট উপহার পাঠাই। তখনও 'রৈবতক' প্রকাশিত হয় নাই। তিনি এই উপহার পাইয়া যে পত্রখানি লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

I must apologise for leaving your last letter so long unanswered, and for not thanking you sooner for your handsome present of your own works; but the fact is, I was waiting till the "Battle of Plassey" should be copied, that I might send it to you. It has been copied, but as a number of corrections are required I will not send it just now. Mr. Skrine, our Magistrate, is looking through it now and will assist me in revising it. He says,—"It is well worth publishing." It speaks well of the original when this can be said of the translation. I wish to translate some other pieces of yours, as English readers would like to see several subjects treated. Perhaps the piece on the Prince of Wales. I give you outside a hurried translation I made of one of your pieces the other day. If there is any particular piece, you would like translated, you might let me know.

আর্য্যদর্শন

From the *Bengali* of **Nabin Chandra Sen.**

O cruel soul which thus hast deeply sinned
In trailing through the dirt a glorious name,
Since we the sons of this degenerate Ind
For such proud title are too meanly tame!
As well in some parched desert waste exclaim,
'Spring waters' in the thirsty traveller's ear
For in that glorious word lies buried fame
Whose trumpet sounded once sublime and clear
Through this most ancient land where now we
crouch in fear.
Thou sure hast heard the sound in some deep dream
Thy mind o'erstrain'd with passion for our cause,
And newly landed from that treacherous stream
Where crocodiles await with open jaws.
The pilot careless of stern reason's laws.
But on that stream only the echo floats,
The sound itself has sunk into the maws
Of adverse ages, and what History quotes
Are but the echoes of sublime and godly notes.
Yet even from much erring History's pages
We get a glimpse of that eventful time
Beyond the limit of succeeding ages
When this most ancient land was in its prime—
Before the swell of sycophancy's shine
Filled all the plain from Indus to the sea,
Or night became the cloak of hideous crime,
And every year brought widening poverty
For this is now the Ind which all around we see.
Oft times, indeed, I doubt if this can be
The land where Kurukshetra's fight was fought
By those great heroes whose descendants we
Assert ourselves. The fateful theme is fraught
With pit-falls such as if some sage had sought
To prove mere fire-fly phantoms of the night
Direct descendants of those orbs which taught
The fields to flower, the Sea to show its might
When first Creation made the black of chaos bright
Sound not the name of Aryan in our ears
For those were warriors of the shaft and bow

Who loved that title in those far off years
When joy was visible in Ganges' flow,
And in the flowers that every where did grow;
While we who tread the India of to-day
Ply the slave's pen, oppressed by hungry woe;
And India's Soil is turned to barren clay
Where Disease stalks around and kills her helpless prey.
Great Lord of all the Worlds including this!
Men say that thou art strong and just and good,
Yet hast thou made this holy land of bliss
The home of millions calling loud for food;
And that proud name which like Himala stood
A monument of power and peace and fame,
Has long been swept away before the flood
Of alien conquerors, till now the name
Stands like a phantom sphinx, a monument of shame
So let the name of Aryan slumber deep,
Ne'er wake it by the merest whisper—yet!
Be calm and silent tho' thou still must weep
Since India's Sun of glory long hath set;
It is not needful that thou shouldst forget,
But utter not that grief inspiring sound,—
Ganges some future day will cease to fret
When Freedom's sun shall take an upward bound
And spread its hallow'd light o'er India's holy ground.

ক্রমে 'পলাশির যুদ্ধে'র সর্গের পর সর্গ ইংরাজী কবিতায় অনুবাদ আসিতে লাগিল। তিনি Alexandrine ছন্দে উহার অনুবাদ করিয়াছেন, এবং তাহাতে এরূপ অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়াছেন যে, অনুবাদ মূল অপেক্ষা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর বোধ হইতেছিল। কিন্তু একে ত 'পলাশির যুদ্ধে'র জন্য আমি গবর্ণমেণ্টের কাছে 'চিহ্নিত লোক', তাহাতে তিনি কেবল দূর (free) অনুবাদ করিতেছেন এমন নহে, তাহার উপর আগুন ঢালিতেছেন। আমি দেখিলাম, এই অনুবাদ প্রকাশিত হইলে আমার ফাঁসির ব্যবস্থা হইবে। তিনি লিখিলেন যে, ভূমিকায় উহা 'পলাশির যুদ্ধে'র দূর অনুবাদ বলিয়া লিখিবেন। তৎসম্বন্ধে এক পত্রে লিখিলেন—

"—mind you, I can translate your stanzas literally one by one with no great difficulty, so that if you prefer me to do so I will. But I have never seen such a literal translation of any poem which was worth reading save for the story."

তাহা ঠিক। কোনও কবিতার ঠিক অক্ষরে অক্ষরে কবিতায় ভাষান্তর করা অসম্ভব। তাঁহার আর একখানি পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

MEDICAL COLLEGE, CALCUTTA.
Decr. 14, 1885.

I send you a translation of the fourteen stanzas that refer to the interview between Clive and Britannia. Eight of them you have not previously seen and the others I have altered. Of course I do not consider it a trouble, but on the contrary a great pleasure to translate your poem; and now that I see I was so much mistaken in not translating the 8 verses referred to above. In the first instance, I am still more anxious to translate all the other verses that up to this time I have left untranslated. I see from your notes to my manuscript that in many places I failed to grasp the real meaning of the original, not to speak of the mistakes on every page made by the copier. But the plant on which the tender flower of poetry blooms requires a lot of nursing particularly where the work to be done is that of translating another's work, so that I fear if left to myself I shall not succeed in making a presentable translation of the Battle of Plassey. You say I have not dealt fully with Meermadan or Mohanlal's (I forget which for the moment and cannot find your letter) soliloquy; also that I did not explain fully Mirjaffar's treachery during the battle. Could you not give me a literal translation of the parts alluded to? I desire to have every verse readable, and this I think I can do by re-writing those that are weakly rendered. Above all, I think it necessary to translate every verse in the original. I thought the description of Britannia could not be rendered into the flat sounding English tongue without a number of repetitions, but I am well satisfied with the manner I have done it; and having studied the original I argee with those who think it about the best part of the book. Please send me a literal translation of the General's solioquy. My translation of your prize poem was the better for your help, for you suggested phrases I otherwise should not have thought of, besides making the meaning of the original clear. My brother at Ulwar was delighted with my rendering of your prize poem. It would be a most pleasing thing for me if I could do your epic, the Battle of Plassey, even moderate justice, whereas should I present the public with a worthless rendering of a high class poem I should get censured deservedly. I think it a pity you sent back the manuscript, if you intend helping me to revise the poem, as you will not remember the parts needing revision most. I fear, as you say, the latter stanzas are too free, but I was in a hurry to complete my pleasant task. The songs for the most part will have to be rewritten. I could not be very literal in describing the 'Battle" as I wished to keep the same metre, it

being well adapted for the description of such scenes; but where I failed to retain important parts of the story I should like to make up the difficiency.

Please make all necessary corrections in the verses I send you.

ইহার পর তাঁহার অনুবাদ সংশোধিত করিয়া, ছাপিবার জন্য ছুটি লইয়া তিনি বিলাত যান। সেখান হইতে আমাকে লেখেন যে, তিনি Alexandrine ছন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া 'পলাশির যুদ্ধে'র উপযুক্ত অনুবাদ করিতে পারেন নাই। অতএব তিনি Browning-র দেড়গজি ছন্দে তাহার নূতন করিয়া অনুবাদ করিবেন। আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম! কি আশ্চর্য্য অধ্যবসায়! একবার একখানি বহি ছন্দে অনুবাদ করিয়া, আবার নূতন এক ছন্দে তাহার দ্বিতীয় বার অনুবাদ করিতে যাওয়া কি অসাধারণ অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের কথা! আমি তাঁহাকে লিখিলাম, এরূপ পরিশ্রম গ্রহণ করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তিনি যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহার যেরূপ সংশোধন উপরোক্ত পত্রে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু ইউরোপীয় জাতির শ্রমপ্রিয়তা আমরা আলস্যপরায়ণ জাতি বুঝি না। তিনি আমার পত্র পাইয়া বিরক্ত হইলেন। তাহার পর তাঁহার অনুবাদের কথা আর কিছু শুনি নাই। তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এক বন্ধুর কাছে বলিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহাকে নিরুৎসাহ করাতে ও সাহায্য না করাতে তিনি দ্বিতীয় অনুবাদের সংকল্প ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব অনুবাদও প্রকাশিত করেন নাই। তিনি এমন সুন্দর অনুবাদটি প্রকাশ করিলেন না, আর আমরা বাঙ্গালী এক লাইন অপাঠ্য কবিতা লিখিলে তাহা কেমন করিয়া একটা সভা ডাকিয়া, পড়িয়া শুনাইব এবং তাহা ছাপাইব, তজ্জন্য আহার-নিদ্রা-বঞ্চিত হই।

'রৈবতক' প্রকাশিত হইলে উহা উপহার পাইয়া তিনি আর একখানি ছবি আঁকিয়া 'রৈবতকে'র কয়েক ছত্র অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 'রৈবতকে'র দ্বিতীয় সর্গে যেখানে আলুলায়িত-কুন্তলা সুভদ্রা ঘোরতর ঝটিকায় শৃঙ্গপ্রান্তে উপলখণ্ডে বসিয়া স্থিরনয়নে ঝটিকাচ্ছন্ন সান্ধ্য আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, তিনি সুভদ্রার এই ছবি আঁকিয়াছেন, এবং ছবির নিম্নে আমারই কবিতা কয় ছত্রের অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

একবার আমি তাঁহার একখানি 'ফটো' চাহিলে, তিনি তাঁহার পত্রের শেষ ভাগে তাঁহার, পত্নীর ও পুত্র-কন্যাদের এক চিত্র আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহাদের কাছে কি আমরা মানুষ? ইনি একাধারে ডাক্তার, কবি ও চিত্রকর।

আবার চট্টগ্রামে

ইংরাজী ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে একদিন প্রাতঃকালে ডাকে চট্টগ্রামের কমিশনর লায়েল সাহেবের একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে—"তোমার দেশস্থ কার্য্যাধ্যক্ষের জড়বুদ্ধিবশতঃ (through the stupidity of your managers at home) চট্টগ্রাম সহরস্থ তোমার সুন্দর দ্বিতল গৃহখানি কল্য রাত্রিতে ধরাশায়ী হইয়াছে। আমি অদ্য প্রাতে ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার ও এঃ ইঞ্জিনিয়ারকে লইয়া পরীক্ষা করাইলাম। তাঁহারা বলিলেন, উহা ভিত্তি পর্য্যন্ত ভগ্ন করিয়া আবার নূতন প্রস্তুত না করিলে সংস্কার অসম্ভব। তোমার বড় গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। তুমি নিজে এখানে না আসিলে ইহার পুনর্নির্ম্মাণকার্য্য হইতে পারে না। এজন্য আমার পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট-পদে তোমাকে অস্থায়িরূপে নিযুক্ত করিতে আমি গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলাম।" অকস্মাৎ মস্তকে বজ্রপাত হইলে আমরা পতি পত্নী অধিক বিস্মিত কি ব্যথিত হইতাম না। স্ত্রী শরবিদ্ধ বিহঙ্গিনীর ন্যায় শয্যায়

পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি তড়িতাহতবৎ পত্রহস্তে দীর্ঘিকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। বাড়ীখানি বিস্তৃত হাতাযুক্ত, বড় সুন্দর ও ইংরাজ অঞ্চলে স্থিত। তাহার ক্রয়ে ও সংস্কারে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। দশহাজার টাকায়ও সেরূপ একখানি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন আমি প্রথম বার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইয়া আমার যৌবনের প্রথম ভাগের তিনবৎসর এই গৃহে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। ইহার তলায় তলায় কক্ষে কক্ষে, এমন কি, ইণ্টকে ইণ্টকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম স্মৃতি অঙ্কিত ছিল। আমার চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে এই গৃহ প্রায় প্রত্যহ আনন্দ-ধ্বনিতে ও সঙ্গীতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত নাট্যশালার মত মুখরিত থাকিত। প্রায় প্রত্যেক শনিবারে ও আফিস বন্ধের দিনে নিমন্ত্রিত বহু বন্ধুর আনন্দ উৎসবে পূর্ণিত থাকিত। যখন বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের ষড়যন্ত্রে ঘোরতর বিপদস্থ হইয়া ১৮৭৭ সনের জুন মাসে এই গৃহ জীবনের মত ত্যাগ করিয়া মৃতকল্প অবস্থায় কলিকাতায় চলিয়া যাই, তখন এই গৃহতল আমার পতিপ্রাণা অভিমানিনী পত্নীর কত অশ্রুতে সিক্ত হইয়াছিল। ইহার সম্মুখস্থ হৃদয়াকার উদ্যানস্থ প্রস্ফুটিত সুবৃহৎ গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্পরাজি দেখিয়া তিনি সুখের সময়ে কত হাসিয়াছিলেন, এই বিপদের সময় কত কাঁদিয়াছিলেন। পরদিন খুড়তত ভ্রাতা রমেশের পত্র আসিল—"আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ দ্বিতল গৃহখানি পড়িয়া গিয়াছে।" আমার যাবৎজীবন তিনিই আমার দেশস্থ কার্য্যাধ্যক্ষ। তিনি ভিন্ন আমার দুই সহোদর মাত্র জীবিত—প্রাণকুমার ও অতুল। ইহারা দুইটিই সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা ও সংসার-জ্ঞান-বর্জ্জিত। খুড়তত ভাইও প্রায় তাই। তবে তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস যে, তিনি একজন খুব বুদ্ধিজীবী লোক। তাঁহার এই আত্মাভিমান আমার ও তাঁহার একপ্রকার সর্ব্বনাশের কারণ। লায়েল সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহারই জড় নির্ব্বুদ্ধিতায় গৃহখানি ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু তিনি সে কথা কখনও স্বীকার করিবার লোক নহেন। অতএব তিনি সকল বিষয়ে যেমন করিয়া থাকেন, এই দুর্ঘটনাও সেইরূপ 'দুরদৃষ্টে'র ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। দুরদৃষ্টটা এরূপ—বৎসর বৎসর তিনি অট্টালিকার ছাদ মেরামত করান, কিন্তু কার্য্যটি এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় যে, প্রত্যেক বৎসর বর্ষার সময়ে গৃহে জল পড়ে, এবং ভাড়াটিয়া ভদ্রলোক আমাকে আশীর্ব্বাদ করে। আমি জ্বালাতন হইয়া অগত্যা ছাদের উপর টিনের বা খড়ের ছাউনি দিয়া এই অসাধ্য সাধন করিতে বলি আমার বংশীয় এক খুড়া ডিঙ্‌ ইঞ্জি-নিয়ারকে। তিনি এবার 'এষ্টিমেট' করিয়া দিয়া আমাকে লিখিলেন যে, এরূপভাবে মেরামত হইলে যদি জল পড়ে, তবে তিনি দায়ী হইবেন। সমস্ত বৎসর গৃহখানির মেরামত হইতে দেওয়া হয়। শ্রাবণ মাস; চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য বর্ষা; একুশ দিন মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। এ সময়ে ছাদ খুঁড়িয়া জলনির্গমের পয়ঃপ্রণালীগুলি বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। এই দারুণ বর্ষায় কিরূপে জল সরিতেছে, গৃহটির কি অবস্থা হইতেহে, একবার দেখিতেও একটি প্রাণী যায় নাই। আমার বন্ধু সবরেজিষ্ট্রার আফিস হইতে আপন বাসায় ফিরিবার সময় দেখিতেছেন যে, জল ছাদ হইতে নির্গত হইতে না পারিয়া উপরের তলার বারাণ্ডার বৃহৎ পিলারের গায়ে ঝরণার মত শত সহস্র ধারায় ছুটিয়া পড়িতেছে। তিনি ডাকিলেন। গৃহ হইতে কাহারও সাড়া পাইলেন না। বলিলেন—"এ গরীবের কি দেশে কেহ নাই? এ সুন্দর মূল্যবান্ বাড়ীটি যে এখনই পড়িয়া যাইবে।" সেই রাত্রিতেই বারাণ্ডার পিলারগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া উপরের ছাদে, পরে নীচের ছাদে পড়িয়া যায়, এবং সমস্ত গৃহের দেয়াল সেই পতনে খণ্ড খণ্ড হইয়া ফাটিয়া যায়। ইহাই ভ্রাতার মতে দুরদৃষ্টের 'জড় নির্ব্বুদ্ধি-তা'র ফল। প্রথম সংবাদটিও তিনি দেন নাই, দিয়াছেন লায়েল সাহেব। হায়! এ সকল উদারহৃদয় ইংরাজ কোথায় গেল? এখন কোনও কমিশনর কি কালা ডেপুটির প্রতি এরূপ সদাশয়তা প্রকাশ করিবেন? তাঁহার প্রস্তাবমতে চট্টগ্রামে এই দ্বিতীয়বার পার্শন্যাল

এসিস্টেন্ট হইয়া গিয়া গৃহখানির এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পতি পত্নী বড় কাঁদিলাম। প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। এরূপে দশটিহাজার টাকার একটি সম্পত্তি এক রাত্রিতে ধ্বংস হইয়াছিল। লোকে অর্থব্যয় করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে। আমার এমন ভাগ্য যে, অর্থব্যয় করিয়া আমাকে সেই ভগ্ন দেয়াল সকল ভাঙ্গিতে হইল। আবার যে সেরূপ একটা দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিব, আমার সাধ্য ছিল না। একটা একতলা গৃহমাত্র সেই ভিত্তির উপর নির্ম্মাণ করিলাম। উহার সম্মুখের বারান্ডার গোল আকার, এবং পার্শ্বের উভয় কক্ষের বিচিত্র আকার দেখিয়া ইংরাজ কলেক্টর স্ল্যাক সাহেব উহা আমার একটি কবিতা (poem of a house) আখ্যা দিয়াছিলেন।

লায়েল সাহেব তখন ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থানে ওল্ডহ্যাম (Mr. Oldham) কমিশনর হইয়া আসিয়াছেন। কি বিচিত্র নাম! বৃদ্ধ বরাহ! তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্রেই বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি দন্তের দ্বারা বেদ উদ্ধার না করিয়া থাকিলেও পৃথিবীটা যে উদ্ধার করিতে পারেন, এ দম্ভ তাঁহার আছে। বৃহৎ দীর্ঘমূর্ত্তি, জাতিতে আইরিশ, ইংরাজের দ্বারা পুরুষানুক্রমিক পদদলিত হইলেও তিনি অভিমানে ইংরাজের ইংরাজ। প্রথম আলাপ—

তিনি। আপনি পূর্ব্বেও এ আফিসে পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট ছিলেন?

উ। হাঁ।

তিনি। সে সময়ে কার্য্যপ্রণালী কিরূপ ছিল? সালতামামি ইত্যাদি কে মুসাবিদা করিত?

উ। কমিশনর তখন জজও ছিলেন। তাঁহার অবসর বড় কম ছিল। আমি করিতাম।

তিনি। আমি সেরূপ কোনও সাহায্য—এমন কি, আপনার কাছে 'নোট' পর্য্যন্ত চাহি না। যদি কোনও বিষয়ে আপনার মত আমি চাহি, তবে আমি জিজ্ঞাসা করিব।

উ। তবে আপনার আর পার্শন্যাল এসিস্টেন্টের প্রয়োজন কি?

তিনি। তিনি কেবল আফিস সুশৃঙ্খলামতে রাখিবেন।

উ। তাহা ত সেরেস্তাদার ও হেডক্লার্কও পারে।

তারপর অন্যান্য বিষয় আলাপের পর আমি উঠিয়া আসিবার সময়ে তিনি বলিলেন—"যদি সালতামামি মুসাবিদা করিতে চাহেন, তবে আবকারির সালতামামির জন্য তাগিদ আসিয়াছে। আপনি এটি মুসাবিদা করিলে আমি বাধিত হইব। অন্যান্য সালতামামি আমি নিজেই মুসাবিদা করিব।"

আমার চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বের কল্পনা এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। আমি প্রাচীন আদালত চট্টগ্রাম সহরের উত্তরস্থ এক উচ্চপর্ব্বত হইতে আনিয়া কমিশনর ও জজের একটি সম্মিলিত 'কোর্ট' অট্টালিকা মঞ্জুর করাইবার সময়ে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলাম যে, ইহাতেও সুবিধা হইবে না। বিশেষতঃ উপস্থিত অট্টালিকাতে কলেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিসের সমাবেশ হইতেছে না। অতএব অতঃপর 'ফেয়ারী হিলে'র (পরী পর্ব্বতের) উপর সমস্ত আফিসের জন্য একটি সম্মিলিতঅট্টালিকা নির্ম্মিত হইলে সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। সেই 'ফেয়ারী হিলে'র উপর ছয়লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া কলিকাতার সেক্রেটারিয়েটের অনুকরণে এক বৃহৎ অট্টালিকা ইতিমধ্যে নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত আফিস তাহাতে স্থাপিত হইয়াছে। এই অট্টালিকাশীর্ষ পর্ব্বতের প্রায় পাদমূল দিয়া কর্ণফুলী প্রবাহিতা। অদূরে সমুদ্র, পশ্চাতে সৌধশীর্ষ-পর্ব্বত-সজ্জিত নগর ও দূরে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য রাজ্যশোভা। অট্টালিকার পাদমূলে পর্ব্বতশিরে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। গিরিপার্শ্ব কাটিয়া এরূপ রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে যে, অনায়াসে গাড়ী পর্য্যন্ত উপরে উঠিতে পারে। অট্টালিকার যে স্থান হইতে দেখিবে, প্রাকৃতিক শোভায় তোমার নয়ন প্রাণ মুগ্ধ করিবে। কিন্তু পার্শন্যাল এসিস্টেন্টের কক্ষহইতে এই শোভা কিছুই দেখা যায় না। তাহার উভয় পার্শ্বে কেরাণীদিগের কক্ষ। ঠিক যেন

বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত কৃষ্ণবলরামের মধ্যে সুভদ্রার স্থান। সর্ব্বদক্ষিণ কক্ষ হইতে—মরি! মরি! বিশ্বশিল্পীর তুলিতে চিত্রিত-চিত্রের মত কি মনোহর দৃশ্য! এইখানে বহুদূরাগতা প্রবলা পয়স্বিনী কর্ণফুলী নদীর সহিত সাগরসঙ্গম। সঙ্গমের উপরিভাগে শ্যাম মরকত-খণ্ডের মত একটি দ্বীপ নদীগর্ভে ভাসমান এবং সঙ্গমের বাম পার্শ্বে শ্যাম বৃক্ষ-গুল্ম-তৃণ-সমাচ্ছন্ন একটি পর্ব্বত। তাহার উপর আমি প্রথমবার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট থাকিবার সময়ে যে 'স্বাস্থ্যনিবাস' (Sanitarium) মঞ্জুর করাইয়া গিয়াছিলাম, তাহা নির্ম্মিত হইয়া একটি শ্বেতবর্ণ রাজহংসের মত শোভা পাইতেছে। তাহার পশ্চাতে গগনপটে মেঘমালার মত পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের গিরিশ্রেণী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া যত দূর দেখা যায়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শোভা বিস্তার করিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বহুক্ষণ অতৃপ্তনয়নে মাতৃভূমির এই অতুলনীয় দৃশ্যাবলী দেখিয়া, আমার কক্ষে ফিরিয়া, কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, তখনই আমার চক্ষের অবস্থা ভাল নহে, এবং এই কক্ষটিতে আলোকের অভাব বলিয়া, আমি সেই দক্ষিণের কক্ষটিতে আমার সিংহাসন সরাইবার অনুমতি চাহিয়া, কমিশনরের কাছে এক 'নোট' পাঠাইলাম। তিনি তখনই অনুমতি দিলেন, এবং পরদিনই সেই কক্ষে গিয়াছি কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, রবিবার জিনিসপত্র স্থানান্তরিত করিয়া সোমবার যাইব। সোমবার আফিস হইতে গৃহে ফিরিবার সময়ে অপরাহ্নে আমার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! আমি আপনার প্রিয়কক্ষটি দেখিতে আসিয়াছি। আহা! কি সুন্দর 'পিকনিকে'র স্থান! সমস্ত অট্টালিকার মধ্যে এই কক্ষটি শ্রেষ্ঠ। আমি আপনার নির্ব্বাচনীশক্তির প্রশংসা করি।" তখন অপরাহ্ন রবিকরে সাগর-সঙ্গম তরল চঞ্চল সুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছিল। নদীগর্ভস্থ দ্বীপে ও পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে তাহার আভা প্রতিফলিত হইয়া উহারাও সুবর্ণমণ্ডিতবৎ বোধ হইতেছিল। কমিশনর স্থিরনেত্রে আমার কক্ষবারাণ্ডা হইতে সেই অবর্ণনীয়শোভা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার কক্ষদ্বারের সম্মুখে কাঠের ফ্রেমে পর্দ্দা থাকাতে এই দৃশ্য কিছুই দেখা যায় না। আমি বলিলাম, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহার এজলাস এইকক্ষে স্থানান্তরিত করি। তিনি বলিলেন—"না। আমি আপনাকে বেদখল করিতে চাহি না। তবে সময়ে সময়ে এই বারাণ্ডায় বসিয়া, এই অপূর্ব্বশোভা দেখিতে আপনার অনুমতি চাহি।" তিনি হাসিতে হাসিতে বারাণ্ডায় ইষ্টকনির্ম্মিত রেলিঙ্গের উপর বসিয়া সেইশোভা দেখিতে দেখিতে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পরও মধ্যে মধ্যে এরূপ করিতেন। আমার এ কক্ষ দেখিয়া জজ সাহেবও তাঁহার এজলাস, অট্টালিকার তাঁহার অংশের দক্ষিণ কক্ষে সরাইয়া লইয়াছিলেন।

আমি কার্য্যভার লইবার সময়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্বেতমূর্ত্তি আমার টেবিলের উপর ক্ষুদ্র গন্ধমাদনসদৃশ এক 'ফাইল' দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ আবকারির সালতামামি পড়িয়া আছে। সালতামামির মরসুম আসিয়াছে অবধি ভয়ে আমার জ্বর হইয়াছে।" আমি সেই দিনই উহা মুসাবিদা করিয়া দিলাম। কমিশনর পরদিবস উহা ফেরত দিবার সময়ে লিখিলেন —"উৎকৃষ্ট মুসাবিদা (a very good draft)। এখন কষ্টম সালতামামি আরম্ভ করুন।" উহা ফেরত দিবার সময়ও ঐরূপ প্রশংসা করিয়া লিখিলেন—"এখন পোর্ট সালতামামি আরম্ভ করুন।" সমস্ত সালতামামি তিনি নিজে লিখিবেন বলিয়া, এরূপে ক্রমে ক্রমে আমার দ্বারা সমস্তই লেখাইলেন। চট্টগ্রাম ডিভিসন হইতে কাগজ কলমের শ্রাদ্ধকারী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কাছে এই সময়ে চৌদ্দ পনরটি সালতামামি যায়। যাহা হউক, আমি মনে করিলাম যে, অন্ততঃ রাজস্ববিবরণী (Revenue Annual Report) এবং সাধারণ শাসন-বিবরণী (General Administration Report) তিনি নিজে লিখিবেন। কারণ, এ দুটি বড় গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু যেই কলেক্টরেরা রাজস্ব সালতামামি পাঠাইতে লাগিলেন, তিনি তাহার মুসাবিদার ভারও আমার উপর দিলেন। ইহার মুসাবিদা পাইয়া লিখিলেন—"a

most excellent draft (অতিশয় উৎকৃষ্ট মুসাবিদা)। এখন 'সাধারণ সালতামামি'ও লিখিতে আরম্ভ করুন।" এটিই বৎসরের শেষরিপোর্ট। শুধু তাহা নহে, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, সাতদিনের মধ্যে ইহার মুসাবিদা দিতে হইবে। আমি বলিলাম যে, পূর্ব্ববৎসর লায়েল সাহেব স্বয়ং মুসাবিদা করিতে পনরদিন লইয়াছিলেন। আমি বাঙ্গালী তাহা কেমন করিয়া সাতদিনে করিব? যাহা হউক, আমি সাতদিনেই উহা শেষ করিয়া দিলে তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া, এই মুসাবিদার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়া, অমার কাছে এ বৎসর এরূপ সাহায্য পাইলেন বলিয়া বড় ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন যে, পরের বৎসর হইতে সমস্ত সালতামামি তিনি নিজে লিখিবেন।

চাঁদপুরের তখনকার সবডিভিসনাল অফিসার আমার পূর্ব্ববারের পার্শন্যাল এসিস্টেন্টের সময়ে আমার দ্বারাই ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। সিদ্ধবিদ্যা নামধারী এবং নিজেও খোসামুদিতে সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া আমি তাঁহার নাম 'সিদ্ধবিদ্যা' রাখিয়াছিলাম। এরূপ প্রসিদ্ধ তৈল-ব্যবসায়ী বলিয়া তিনি কোনও কুকার্য্য করিতেই সংকোচ করিতেন না। চাঁদপুরে দুটি এমন কার্য্য করিয়াছেন যে, তাহাতে তৈল ভাসিয়া গিয়াছে, এবং জজ কলেক্টর উভয়ে তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া তাঁহার প্রতিকূলে রিপোর্ট করিয়াছেন। কলেক্টর সালতামামিতে পর্য্যন্ত তাঁহার ঘোরতর বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন এবং কমিশনর উহাতে লাল চিহ্ন দিয়া উহা উদ্ধৃত করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি সিদ্ধবিদ্যার কাঁদাকাটায় নাচার হইয়া তাহা করি নাই। কমিশনর আমার মুসাবিদার উক্তরূপ প্রশংসার পর আমাকে রূক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"চাঁদপুরের সবডিভিসনাল অফিসারকে আপনি চিনেন কি?" উত্তর—"হাঁ"। প্রশ্ন—"তিনি আপনার বন্ধু?" উত্তর—"হাঁ"। প্র—"আপনি সে জন্য আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাংশ উদ্ধৃত করেন নাই?" উ—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিবার অভিপ্রায়ে আমি ঐরূপ করি নাই। আমি যত দূর বুঝি, সালতামামি কেবল বার্ষিক কার্য্যবিবরণী মাত্র। ব্যক্তিবিশেষের দোষ গুণ উল্লেখের স্থান উহা নহে। বিশেষতঃ সবডিভিসনাল অফিসারের কাছে আপনি যে সকল কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন, তাহা এখনও আসে নাই। তাহা আসিলে তাঁহার সম্বন্ধে আপনার মত পরিবর্ত্তনও হইতে পারে। না হয়, সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে স্বতন্ত্র রিপোর্ট করিতে হইবে। এই সালতামামির সঙ্গেও কর্ম্মচারীদের দোষগুণ-সম্বলিত এক তালিকা যাইবে। তাহাতেও তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিতে হইবে। এ কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে কলেক্টরের মন্তব্য এস্থানে উদ্ধৃত করা আমি উচিত বিবেচনা করি নাই।" তিনি আর কিছু বলিলেন না। মুসাবিদা ফেরত আসিলে দেখিলাম যে, তিনি লিখিয়াছেন—"এ স্থানে আমার আদেশমত কলেক্টরের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করা উচিত ছিল। যাহা হউক, যখন উহা করা হয় নাই, তখন এ ভাবেই থাকুক।" কেবল 'সিদ্ধবিদ্যা'র অনুকূল ব্যাখ্যা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা তিনি কাটিয়া দিয়াছেন। তাহা তিনি কাটিবেন ও আমাকে তিরস্কার করিবেন আমি জানিতাম। ব্যাখ্যাটি তাঁহাকে 'সিদ্ধবিদ্যা' উদ্ধারার্থ জানান আবশ্যক ছিল। তিনি কোনওরূপ 'নোট' দিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতএব এ স্থানে উহা না লিখিলে আর জানাইবার অবসর আমি পাইতাম না। তিনি মন্তব্যটি কাটিলেন বটে, কিন্তু কথাগুলি জানিলেন। 'সিদ্ধবিদ্যা' কিরূপ কৈফিয়ৎ দিবেন, আমি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। তাহার কৈফিয়ৎ আসিলে কমিশনর আমার মন্তব্যমতে মত প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধবিদ্যা প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া 'মনসার ভাসানে'র কালী নাগের মত কিঞ্চিৎ লাঙ্গুল অর্থাৎ 'সামারি ক্ষমতা' ইত্যাদি হারাইয়া বদলি হইলেন। জানি না, অন্য কোনও পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট এরূপ সাহস এরূপ কমিশনরের কাছে করিতেন কি না।

সালতামামির সঙ্গীয় কর্ম্মচারীদের দোষ-গুণের তালিকার উপর কমিশনর লিখিয়াছিলেন

"লইয়া আইস।" কাগজপত্র সহ আমি কেরানিকে পাঠাইলাম। তিনি তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন যে, তিনি আমাকে চান। আমি কেরানির কাছে এ সম্বন্ধীয় সার্কিউলার ইত্যাদি বুঝিয়া লইয়া, তাঁহার কক্ষে গেলাম এবং বলিলাম যে, কর্ম্মচারীদের নামের পার্শ্বে অঙ্ক দিয়া কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে এবং মন্তব্যের ঘরে তাঁহার মন্তব্য লিখিতে হইবে। তিনি বলিলেন—"আমি আপনার (নোয়াখালির) কলেক্টরকে প্রথম স্থান দিতে চাহি। আপনার মত কি?" আমি বলিলাম—"আমি অবশ্য আমার কলেক্টরের পক্ষপাতী।" তাহার পর—

প্র। আপনি ও আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীর মধ্যে 'সিনিয়ার' কে?

উ। আমি জানি না।

প্র। আশ্চর্য্য! আপনি কি কখনও 'সিভিল লিষ্ট' দেখেন নাই!

উ। না।

প্র। (আরও আশ্চর্য্য ভাবে) কেন?

উ। আমার তৎসম্বন্ধে একটা কুসংস্কার আছে। উহা যে দেখে, তাহার সহজেই মনে হয় যে, তাহার উপরে যে সকল কর্ম্মচারী আছে, তাহাদের স্থান কখন্ শূন্য হইবে, এবং সে 'প্রোমোশন' পাইবে। আমার মতে মনের এ ভাবটি বড় সাধুভাব নহে। আমার প্রোমোশন যখন গবর্ণমেণ্ট দিবেন, তখন পাইব। অতএব এই ভাগ্যগ্রন্থ (Book of fate) দেখিয়া কি ফল?

প্র। (একটুক হাসিয়া) আমি যেরূপ মনে করিয়াছিলাম, আপনি তাহার অপেক্ষাও বড় দার্শনিক। আচ্ছা, আপনি কোন্ বৎসর এ চাকরিতে প্রবেশ করেন, অবশ্য তাহা জানেন।

উ। ১৮৬৮।

প্র। আমি জানি, আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৬৭র লোক। অতএব তাঁহাকে আপনার উপরে স্থান দিতে আপনার কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

হঠকারিতা ও অবিবেচনা (impulsiveness and indiscretion) আমার দুটি চরিত্রগত মহৎ দোষ। উহা আমার জীবনের বহু সন্তাপের ও বিপদের কারণ। এতক্ষণ তিনি বেশ হাসিয়া হাসিয়া আমোদ করিয়া কথা বলিতেছিলেন। যেই এ প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম যে, এ বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারীকে আমার উপরে স্থান দিলেও আমার আপত্তি নাই, অমনি তাঁহার মুখ ম্লান ও গম্ভীর হইল। তিনি একটুক শ্লেষযুক্ত কণ্ঠে বলিলেন—"দেখিতেছি, আপনি আপনার 'সার্ভিসে' উন্নতি সম্বন্ধে বড়ই নির্লিপ্ত।" বুঝিলাম, কথাটা ভাল বলি নাই। তিনি তাহাতে চটিয়াছেন। অতএব এই সুর বদলাইতে হইবে। আমি একটুক হাসিয়া বলিলাম—"কিয়ৎপরিমাণে আমি যথার্থই নির্লিপ্ত বটে। কারণ, আমার 'রায় বাহাদুর' 'খাঁ বাহাদুর' হইবার আকাঙ্ক্ষা নাই। আর উন্নতির আশাই বা কি? আমি ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট আছি, ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিয়াই মরিব। আমার জীবনের একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা আছে। তাহা বড় ক্ষুদ্র। তাহাও আপনি জানিতে চাহিলে আমার বলিবার আপত্তি নাই।" তিনি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি জানিতে পারি কি?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"আপনার গবাক্ষপথে যে সকল পাহাড় দেখা যাইতেছে, আমার আকাঙ্ক্ষা যে, উহার একটিতে একখানি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করি, এবং চাকরি শেষ হইলে গৈরিক ধারণ করিয়া উহাতে বাস করি। স্ত্রী আমার জন্য রন্ধন করিবেন, আমি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া সাহিত্যসেবা করিব।" তিনি এ কথা শুনিয়া, আবার প্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বটে! ইহাই কি আপনার মোক্ষ (summum bonum)?" আমি বলিলাম, উহার অধিক আমার আকাঙ্ক্ষা নাই। প্রশ্ন—"কেন এই মোক্ষলাভ করেন না? উহা ত অতিশয় সহজসাধ্য!" উত্তর—"না। আমি সাত বৎসর যাবৎ একটি পাহাড়ের বন্দোবস্ত চাহিতেছি। কিন্তু পাইতেছি না।" তিনি

এবার সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্বভাব ধারণ করিয়া একটি পাহাড় নির্ব্বাচনকরিতে আমাকে বলিলেন, এবং উহার বন্দোবস্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি এ সংকট হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রস্থান করিলাম।

তিনি আফিস লইয়াও আমাকে বড় জ্বালাতন করিয়াছিলেন। জুন হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত সালতামামির সময় এবং চট্টগ্রামের জ্বরের সময়। আফিসও তখন বড় দুর্ব্বল। যোগ্য লোক বড় কম। তিনি কিছুতেই তাহাদের ছুটি দিবেন না, এবং সামান্য দোষের জন্য জরিমানা করিতে লাগিলেন ও পদচ্যুতির ধমক দিতে লাগিলেন। আমি ইহার প্রতিবাদ করিলে তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, আমি কেরানিদের অযথা প্রশ্রয় দিতেছি। আমি বলিলাম, যে জ্বরে কাঁপিতেছে, তাহাকে ছুটি না দিয়া, আফিসের টেবিলের উপর মাথা ফেলাইয়া, অচেতন অবস্থায় রাখিয়া কি ফল। তিনি এরূপ অবস্থায়ও যদি তাহাদের বেতন দণ্ড করেন, তবে অবশ্য সে বেতন আমি দণ্ড দিব। কারণ, তাহারা আমার অধীনস্থ কর্ম্মচারী এবং প্রায় সকলেই দরিদ্র। আমি চক্ষে দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাদের এরূপ দণ্ডভোগ করিতে দিব? তিনি তাহার পর তাহাদের কাছে মেডিকেল সার্টিফিকেট তলব করিতে লাগিলেন। আমি প্রতিবাদ করিলাম যে, এসিস্টেণ্ট সাৰ্জ্জনকে দুইটাকা করিয়া দুইতিনটা ভিজিট না দিলে তিনি তাহাদের সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া এঃ সাৰ্জ্জনের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন এক সার্কিউলার দেখাইলেন। তখন তিনি তাঁহার উপর ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়া বলিলেন যে, তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে, এবং কেরানিদের বিনা ভিজিটে চিকিৎসা না করিলে তাঁহার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। এঃ সার্জ্জন কাঁদিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহাকে রক্ষা করিলাম। এমন সময়ে একদিন কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার জ্বরও হইয়াছে। অতএব কিছুদিন কমিশনরি আমাকে করিতে হইবে। তাঁহার কাছে এক খণ্ড কাগজও পাঠাইতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছিল এবং তিনি কাঁপিতেছিলেন। "কাঁচাদুগ্ধ কাঁচাপানি, জ্বরের ঔষধ জানি,"—মনসার পুথিতে চাঁদ সদাগরের জ্বরের এই প্রেসকৃপসন আছে। আমিও তাঁহাকে অভয়দিয়া বলিলাম যে, চট্টগ্রামের জ্বর মারাত্মক নহে। তিনি দুই একদিন কেবল সাগু মাত্র খাইয়া লঙ্ঘনদিলে এবং একটুক কুইনাইন খাইলে সারিয়া যাইবে। তিনি বলিলেন—"সুপও খাইব না? তবে যে মরিয়া যাইব।" যাহা হউক, মরিলেন না। কিন্তু এখন হইতে কেরানিদের উপর চোটপাট কমিল। আমাকে বড় অনুনয়করিয়া বলিলেন যে, বোধ হইতেছে—আফিসে কার্য্যের কোনও সুব্যবস্থা (system) নাই,—তাহা ঠিক। আমি যদি একটা ব্যবস্থা করি, তিনি বড় বাধিত হইবেন। তখন আমি নূতন ব্যবস্থা করিয়া আফিস নানাবিভাগে বিভক্ত করিলাম এবং এক মাস এই ব্যবস্থায় সুশৃঙ্খলামতে কার্য্য নির্বাহিত হইলে, তিনি তাহা অনুমোদন করিয়া আমাকে খুব ধন্যবাদ দিলেন।

এরূপে চার মাস কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে মিঃ ওল্ডহ্যাম আমাকে রাখিতে চাহেন কি না, গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অনুকূল উত্তর দিয়াছিলেন। অতএব আমিও এ পদে স্থায়ী হইব বলিয়া নিশ্চিন্ত আছি। একদিন জজ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। আমি এ কাজ পছন্দ করি কি না জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে, আমি পূর্ব্বেও একবার এইপদে ছিলাম। তখন পছন্দ করিয়াছিলাম, এখন করি না। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমি আবার অবিবেচনাবশতঃ বলিলাম যে, তখন পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট কমিশনরের একজন প্রকৃত পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট (ব্যক্তিগত সহায়) ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা (confidential adviser) ছিল, এখন একজন কেরানি মাত্র। শুনিয়া ক্রোধে তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইল। দেশে তখন ইংরাজ মহলে বাঙ্গালী-বিদ্বেষ-বাতাস 'ইলবার্ট

বিলে'র বিভ্রাট হইতে বেগে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"কমিশনরের বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা! কি হাস্যকর কথা! হাঁ, তখন সত্য সত্যই পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টেরা কমিশনর এবং কমিশনরেরা পার্শন্যাল এসিষ্টেন্ট ছিলেন। আমি আশা করি, সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের কথামতে যে কমিশনর চলিবে, সে তাহার পদের অযোগ্য হইবে, এবং তাহার পদ হইতে পদাঘাতে তাড়িত হইবার যোগ্য হইবে।" তিনি কাঁপিতেছিলেন। আমার বোধহয়, তিনি কোনও পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের দ্বারা কিছু শিক্ষা পাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার ক্রোধ দেখিয়া সুর বদলাইয়া বলিলাম—"সে কথা ঠিক; এখন কমিশনরেরা সকলেই যোগ্যলোক। মিঃ ওল্ডহ্যামের মত কমিশনর পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের কেন মত চাহিবেন?" তিনি একটু শ্লেষভাবে বলিলেন—"আমি ভরসাকরি, মিঃ ওল্ডহ্যাম তাঁহার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের মুখাপেক্ষী হইবেন না।" তিনি আমাকে ক্রোধের সহিত—"গুড্‌বাই বাবু!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমার বোধ হইল যে, মিঃ ওল্ডহ্যাম আমার মুখাপেক্ষী হইতেছেন বলিয়া ইংরাজ মহলে কাণাকাণি আরম্ভ হইয়াছে। অতএব পালা প্রায়শেষ।

তাহার দুইএকদিন পরে কমিশনর চট্টগ্রামের 'নওয়াবাদ' সম্পর্কীয় একটি বিষয়ে আমার মত চাহিলেন। আমি বুঝিলাম, আমার শেষ পরীক্ষা উপস্থিত। কেরানিরা সকলে আমাকে ধরিল যে, আমি যেন কোনওমতে গবর্ণমেণ্টের নওয়াবাদ নীতিরবিরুদ্ধে কোনওমত প্রকাশ না করি। তাহা যদি করি, আমাকে নিশ্চয় কমিশনর এ পদে রাখিবেন না। নওয়াবাদ জরিপ তখন চট্টগ্রামের সর্ব্বনাশ করিতেছিল। কেবল এপদে থাকিবার অনুরোধে আমি এই মহাপাতক সম্বন্ধে অসরলমত প্রকাশ করিতে অসম্মত হইলাম এবং তীব্রভাষায় তাহার দোষ দেখাইয়া 'নোট' লিখিলাম। কমিশনর তাহা পড়িয়া লিখিলেন—"এই বিচক্ষণ 'নোট' কেবল প্রজার পক্ষ দেখিয়াছে, গবর্ণমেণ্টপক্ষ মোটেও দেখেনাই। যাহা হউক, উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে পিঃ এঃ যে মতপ্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা অনুমোদন করিলাম।" তাহার সপ্তাহ পরে কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার স্থানে লোক নিযুক্ত হইয়াছে, আমাকে ফেনী ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে, আমি কেরানির কার্য্য অপেক্ষা শাসনকার্য্য ভালবাসি। তিনিও বলিলেন—"তাহা ঠিক। এ কেরানিগিরি আপনার মত প্রতিভাশালী লোকের (gifted man) কার্য্য নহে। আমি ফেনী পরিদর্শনকালে আপনার কার্য্যাবলী দেখিয়া বড় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। আমি কোনও বাঙ্গালী ডেপুটি কলেক্টরকে এরূপ লোকহিতকরকার্য্যে সক্ষম দেখি নাই। আপনি একয়েকমাস মাত্র এখানে আছেন। ইহাতে আপনার কার্য্য সকলই নষ্ট হইতেছে। আপনি যে সকল বৃক্ষাদি রোপণ করিয়াছেন, তাহার ঘেরা স্থানে স্থানে পড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, আমার গাড়ীর গরু 'রিজার্ভ' দীঘিরজলে নামিয়া ঘাস খাইতেছিল, অথচ আপনার স্থলাভিষিক্ত কিছু বলিতেছেন না।" আমি বলিলাম যে, তিনি আমার 'সার্ভিসে'র প্রতি অবিচার করিতেছেন। তাহাতে আমার অপেক্ষা যোগ্যতর কর্ম্মচারী আছেন। ঘেরা যে পড়িয়া গিয়াছে, বোধহয় আমার স্থলাভিষিক্ত দেখেন নাই, এবং কমিশনরের গাড়ীর গরুকে তিনি বোধ হয় 'বিশিষ্ট জন্তু' (privileged animals) মনে করিয়াছেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তাহা নহে। আমার এই দীর্ঘ চাকরিতে বাঙ্গালীর মধ্যে আমি আপনার মত এমন যোগ্যকর্ম্মচারী দেখি নাই।' আমি তাঁহাকে আবার ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিতে তিনি বলিলেন—'নবীনবাবু! আপনি অবশ্য যাইবার সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।"

আমার পরবর্ত্তী আসিলেন, এবং কমিশনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া বলিলেন যে,

কমিশনর তাঁহার কাছে আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার ইচ্ছা, লোকে যেন জানে যে, তাঁহার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের তাঁহার কাছে কোনওরূপ প্রতিপত্তি নাই। এ কথা তাঁহাকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে বলিয়াছেন এবং কোনওরূপ 'নোট' দিতে তাঁহাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছেন।

চার্জ দিয়া, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে তিনি আমাকে আবার লিখিয়া পাঠাইলেন। আমি ঘোরতর বৃষ্টিরমধ্যে তাঁহার শৈলস্থ ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি আজ আমার প্রতি বড় সসম্মান ব্যবহার করিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! আমি জানি, আমি আপনার মত কর্ম্মচারী আর পাইব না, এবং আপনার মত স্পষ্টবাদী দেশীয়লোকের সংস্রবেও আর আসিব না। আমি এতদিন ভারতবর্ষে কাটাইলাম, অথচ ভারতবর্ষের কিছুই জানি না বলিলে চলে। অতএব আপনার সঙ্গে আমি নানাবিষয়ে একটু দীর্ঘ আলাপ করিতে চাহি" তখন তিনি পাটনার কলেক্টর মেটকাফ সাহেবের মত আমার সঙ্গে সামাজিক, ধার্ম্মিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। আমি প্রথমতঃ এরূপ বিষয়ে আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে আলাপকরা আমার নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া অসম্মত হইলাম। তিনি তাঁহার সম্মানের (honour) দোহাইদিয়া বলিলেন, তিনি বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং তাঁহার সঙ্গে আমার ঘোরতর মতভেদ হইলেও তিনি অসন্তুষ্ট না হইয়া, বরং আমাকে অধিক সম্মান করিবেন। তখন আমি তাঁহাকে মেটকাফ সাহেবের মত আমাদের স্ত্রীঅবরোধ, ইংরাজ বাঙ্গালীর মধ্যে সামাজিকব্যবধান ইত্যাদি বিষয়ে সরল-অন্তঃকরণে বুঝাইলাম। তাঁহার তর্কেরস্রোত ক্রমে মন্দ হইয়া আসিল। তিনি শেষে নীরবে গবাক্ষপথে প্রাকৃতিক শোভার দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন। তাহার পর আমি বিদায় চাহিলে, আমাকে বড় সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া বলিলেন—"আমি জানিতাম যে, এ সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব আমি আপনার কাছে জানিতে পারিব। আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম যে, আপনার সঙ্গে এই আলাপ উপস্থিত হইয়াছিল। আমি আজ অনেক বুঝিলাম, অনেক শিখিলাম, এবং অনেক চিন্তা করিবার বিষয় অবগত হইলাম। এই আলাপ আমার চিরদিন মনে থাকিবে এবং চিরদিন তজ্জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।" এ আলাপের সারাংশ 'ভানুমতী'তে দিয়াছি।

এরূপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে এই চারি মাস কাটিয়া গেল। লায়েল সাহেব আমার ভগ্ন গৃহখানির পুনর্নির্ম্মাণের জন্য আমাকে আনিয়াছিলেন। তাহা করিব দূরে থাকুক, নিশ্বাস ফেলিবারও সময় পাই নাই। তথাপি কয়েকটি দেশহিতকর কার্য্যের প্রস্তাব কমিশনরের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলাম। (১) ঝর্ণার জল পুষ্করিণীতে লইয়া, স্থানে স্থানে সহরে রক্ষিত পুষ্করিণী (reserve tank) নির্দ্দেশকরিয়া জ্বর নির্ব্বাণ করা। (২) চাকতাই খালের মুখে একটি নৌকার পুল (Pontoon jetty) নির্ম্মাণকরা। (৩) নগরের বন পরিষ্কার করা। (৪) সীতাকুণ্ড তীর্থটি মোহন্তের করাল গ্রাস হইতে উদ্ধার করা। (৫) চন্দ্রনাথের বক্ষোদেশ হইতে যে মন্দাকিনী নির্ঝরিণী প্রবাহিতা, তাহার জল সীতাকুণ্ডে লইয়া, যাত্রী ও সীতাকুণ্ডবাসীদের জন্য কয়েকটা 'রির্জাভ পুষ্করিণী' করা। (৬) তহশীলদারদের ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া সীতাকুণ্ড, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়াতে তিনটি সবডিভিসন খোলা ইত্যাদি। কিন্তু মিঃ ওল্ডহ্যাম লাল ফিতার শ্রাদ্ধ এবং ত্রিপুরার কলেক্টর গ্রিয়ার সাহেবের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রায় প্রত্যহ ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পশ্চাতের কক্ষে বসিয়া দুইঘণ্টাকাল তিনি গ্রিয়ার সাহেবের উপকারার্থ দীর্ঘপ্রবন্ধ লিখিয়া কাটাইতেন। মিঃ গ্রিয়ার সহ্য করিতে না পরিয়া একবার লিখিলেন যে, তিনি তাঁহার

কার্য্যে এরূপ সর্ব্বদা দোষারোপ করিলে তাঁহার কার্য্যকরা অসাধ্য। এবার ওল্ডহ্যাম আধ-দিস্তাখানিক কাগজে দোষারোপশব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন যে, তিনি দোষারোপ (Censure) করেন নাই। কেবল তাঁহার পরিদর্শনক্ষমতা পরিচালন করিয়াছেন মাত্র। আমার নোটের উপর লিখিলেন যে, আমার জানা উচিত ছিল যে, এ সকল কার্য্য ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট অফিসার নহেন। তিনি ডিঃ অফিসারদের রাজা। যাহা হউক, চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট মিঃ কার্লাইলের কাছে আমার নোট পাঠাইলেন, এবং তিনি একদিন আমার সংগে দীর্ঘ আলাপের পর আমার কোনও কোনও প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

ঢাকা অঞ্চলের একজন দরিদ্র ভদ্রলোক চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশে 'রবার' (rubber) ব্যবসায় করিতে আসিয়াছিলেন। ভাগ্যবান্ লোক। লুসাই যুদ্ধের সময়ে তিনি প্রভূত অর্থসঞ্চয় করেন। 'রবারে'র বিস্তৃতিশক্তি আছে। মানুষের ভাগ্যেরও আছে। রবারবাবু এখন 'রায় বাহাদুর' বাবু। বঙ্গদেশে কেই বা 'রায় বাহাদুর' নহে। শব্দ দুটির অর্থ কি জানি না। কোনও অভিধানেও নাই। তবে অন্যান্য 'রায় বাহাদুরে'র সহিত ইহাঁর কিছু পার্থক্য আছে। ইনি তাদৃশ অদ্ভুত পদার্থ নহেন। ইনি অশিক্ষিত হইলেও বুদ্ধিমান্, ততোধিক হৃদয়বান্। তিনি একদিন আমার সংগে আফিসে সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি কথায় কথায় বলিলাম যে, চট্টগ্রাম তাঁহার সৌভাগ্যক্ষেত্র। অতএব এখানে তাঁহার কিছু কীর্ত্তি রাখিয়া যাওয়া উচিত। নোয়াখালির মত ক্ষুদ্রনগরেও 'টাউনহল' আছে ; চট্টগ্রামে নাই। 'রঙ্গমহল পাহাড়ে' তখনও হস্পিটল হয় নাই। রঙ্গমহল পাহাড়টি ক্রয় করিয়া, তাহাতে একটা 'টাউনহল' তাঁহার নামে প্রস্তুত করিতে আমি প্রস্তাব করি। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লায়েল সাহেবের অনুগ্রহের ফল। তাঁহার বড় আকাঙ্ক্ষা, লায়েল সাহেবের নামে কিছু একটা কীর্ত্তিচিহ্ন স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের রেলওয়ে লায়েল সাহেবের কীর্ত্তি। তাঁহার মত কোনও কমিশনরের কাছে চট্টগ্রাম ঋণী নহে। যদিও তখন রেলওয়ে নির্ম্মিত হয় নাই, লায়েল সাহেবের অমোঘ চেষ্টার ফলে তাহা তখন মঞ্জুর হইয়া কার্য্যারম্ভের আয়োজন হইতেছিল। অতএব আমি এপ্রস্তাব অন্তরের সহিত অনুমোদন করিলাম। স্থির হইল যে, রঙ্গমহল পাহাড় ও তৎশেখরস্থ অট্টালিকা ক্রয়করিয়া, এবং তাহার হলের সহিত উত্তর দিকে কক্ষ যোগ করিয়া একটা বড় হল করা যাইবে এবং তাহার উত্তর দিকে বহির্ভাগে একটা 'রঙ্গমঞ্চ' (stage) যোগ করিয়া দেওয়া যাইবে। অট্টালিকার পূর্ব্বপার্শ্বের কক্ষাবলী বাঙ্গালীদের জন্য ক্লাব ও লাইব্রেরী হইবে। এবং রায় বাহাদুরের ইচ্ছামতে পশ্চিম দিকের কক্ষসারি অতিথি থাকিবার স্থান হইবে। আমি এই কক্ষের নাম তাঁহার নামানুসারে 'মিত্রালয়' স্থির করি। উভয়ে অনুমান করিলাম যে, ইহাতে ২০,০০০, টাকা ব্যয় হইবে। কিন্তু 'রঙ্গমহলে'র স্বত্বাধিকারী উহা বিক্রয় করিবার পাত্র নহেন। অতএব স্থির হইল যে, কলেক্টরের কাছে আবেদন করিয়া, উহা আইনমতে সাধারণের উপকারার্থ ক্রয় করা হইবে। তিনি সমস্ত কার্য্যের ভার আমার উপর দিয়া, ২০,০০০, টাকা আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন, বলিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। কবি বার্ণস্ (Burns) বলিয়াছেন যে, মানুষের ও ইঁদুরের প্রস্তাব সমান অকিঞ্চিৎকর। ইহার পরদিনেই ওল্ডহ্যাম সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে ফেনী ফিরিতে হইবে। আমার পরবর্ত্তী মহাশয় আসিলে, আমি তাঁহাকে এই সমস্ত কথা বলিয়া, এ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণতকরিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়া যাই এবং দেশের আরও দুইএক জন প্রধানব্যক্তিকে বলিয়া যাই। কিন্তু হে তৈল! তোমার কি অপূর্ব্বমহিমা! আজ বাঙ্গালী জাতির তুমিই একমাত্রভরসা! তুমিই 'স্বর্গাপবর্গদে দেবি!' তোমাকে নমস্কার! পরবর্ত্তী মহাশয় এই ২০,০০০, টাকার মধ্যে ২৫০০, টাকা মাত্র লইয়া এক 'ওল্ডহ্যাম ইনস্টিটিউট্'—দাঁত সাবধান!—মিঃ ওল্ডহ্যামগৃহের সম্মুখে নির্ম্মাণ করেন॥

তিন টকারান্ত সুমধুর 'ইনস্‌টিটিউট' শব্দের অর্থ 'ক্লাব'। ওল্ডহ্যাম ইনস্‌টিটিউট্‌ বিকল্পে 'বাঙ্গালী ক্লাব'। তাহার সার্থকতা—কয়েকজন নগণ্য বা জঘন্য লোকের সায়াহ্নিক তাম্রকূট সেবন এবং কদাচিৎ তাস পরিচালন। আমি ইহার নাম 'ওল্ড ড্যামড্‌ ইনস্‌টিটিউট' (Old d—d institute) রাখিয়াছি। উপযুক্ত লোকের উপযুক্ত কীর্ত্তি! ওল্ডহ্যামের কীর্ত্তির-মধ্যে পার্ব্বত্য রাজ্য দুইটির এবং সরল পার্ব্বত্যবাসীদের গ্রীবাচ্ছেদন। তাহা হউক, কিন্তু এই কীর্ত্তির কল্যাণে আমার পরবর্ত্তী ওল্ডহ্যামের পৃষ্ঠপোষকতায় আজ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। রঙ্গপুরের রঙ্গলাল।

ফেনী ফিরিয়া গেলে ওল্ডহ্যাম আমাকে এই পত্রখানি লিখিলেন—

Chittagong 3rd Aug.
1891.

My dear Sir,

I thought your work with me very devoted—I need not say very intelligent—and I am under obligation to you for it. You have I think still to cultivate more soundness and to consider, in matters in which you are much interested the inpulsiveness of your expressions. Your being a local man was to me a distinct embarrassment. Even were your advice such as I ought to follow in every instance, the position of a Commissioner so influenced is not a good one in the eyes of the ignorant. Like Mr. Lyall I hope often to seek your advice as I frequently have done while you were here, though the example of Mr. Louis's now historical conversion on the subject of Noabad is not an encouraging one. His new views, as you are aware, were not altogether accepted.

In the matter of the local settlement I should be glad for my views and attitude to be fully known. As an Irishman, and in India as a santal officer, I am most famillar with land agitation, and the measure which have met it with success, and with those which have failed. I am in favour of light assessments. I am an enemy to permanent alienations by Government (apart from the exceptional cases provided for) and I am entirely opposed to Government giving up any title which belongs to it, that is, aggrandising a few at the expense of the people of India generally, and I am prepared to meet and deal with an agrarian meeting rather than abandon these principles.

Yours sincerely
Sd. W. Oldham.

বলা বাহুল্য, আমার উল্লিখিত নওয়াবাদ 'নোট' উপলক্ষ্য করিয়াই এ মহামূল্য 'প্রিন্‌সিপল' (নীতি সকল) বিবৃত হইয়াছিল। জজ সাহেবের ক্রোধের অর্থও পরিষ্কার!

অতএব আমার দেশহিতৈষিতা ও আমার নওয়াবাদ 'নোট' আমার ফেনী প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ। লাউইস্‌ সাহেবের মতের ন্যায় তাঁহার মতের 'ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন' ঘটাইতে না পারিয়া থাকিলেও, তাঁহাকে এই নোটের দ্বারা লঘুরাজস্বের পক্ষপাতী করিতে পারিয়াছিলাম।

তাঁহার মত প্রকৃতির লোকের এ পরিবর্ত্তনও বড় সহজব্যাপার নহে। কিন্তু ইহাও তিনি কার্য্যে পরিণত করেন নাই। বরং গুরুতর করভারে পার্ব্বত্য রাজ্যগুলিন—যাহা কিছুদিন পূর্ব্বে স্বাধীন ছিল—বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমি এ পত্রের উত্তরে দেশহিতৈষিতার অভিযোগ সম্বন্ধে দোষ স্বীকার (guilty plead) করিয়া সেক্সপিয়ারের 'করাইওলেনাসে'র উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বঙ্কিমবাবুর 'পলাশির যুদ্ধের' সমালোচনার ভাষায় লিখিয়াছিলাম যে, যখন "স্বদেশপ্রেমে আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, আমি রাখিয়াঢাকিয়া বলিতে জানি না।"

ইহার কিছু দিন পরে রেলওয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে তিনি ৮০০্ টাকা বেতনে আমাকে রেলওয়ের জমি লওয়ার ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া লিখিলেন—"But by for the best selection for the post would be Babu Nabin Chandra Sen, the Sub Divisional officer of Feni. His character and qualifications are well known to Mr. Lyall and the Chief Secretary. He is enthusiastic about the Railway, would like the work, and thoroughly knows the ground. The onlly necessity for keeping in a place like Feni where work is light, an officer of his calibre is that he knows well how to manage the complications which arise in Tippera Maharaja's estate, but if appointed Land Acquisation Dy Collector, his advice will still be available in any emergency." বলা বাহুল্য, আমিনের কার্য্যের জন্য ৮০০্ টাকা বেতনযুক্ত একজন ডেপুটি কলেক্টর নিয়োগের প্রস্তাবের সাউণ্ডনেশ্ (বিজ্ঞতা) গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিলেন না।

বহুকাল পরে তিনি আর এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, যদিও আমি একজন প্রতিভাসম্পন্ন লোক (gifted man), আমার পরবর্ত্তীর মত কার্য্যক্ষমতা aptitude for work অর্থাৎ 'ওল্ডহ্যাম ইনস্টিটিউট' নির্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা আমার নাই। 'Verily thou hast said' (চাচা! তুমি ঠিক বলিয়াছ)। উপরোক্ত প্রশংসারাশির ইহা উপযুক্ত পরিশিষ্ট!! তাহার কারণ পরে বলিতেছি।

আবার ফেনী

চাএর পেয়ালায় ঝড়

ফেনী স্কুল কিরূপে আমি মুষ্টিভিক্ষার দ্বারা মালিনীমাসীর 'বেসাতি' নীতি অবলম্বন করিয়া স্থাপন করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই কার্য্যে ফেনীর উকিল, বিশেষতঃ মোক্তারগণ আমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা আমার কার্য্যপ্রণালী সম্যক্ অবগত ছিলেন। এ জন্য আমি চট্টগ্রামে অস্থায়ীভাবে পার্শনাল এসিস্টেণ্ট হইয়া যাইবার সময়ে আমার স্থানাভিষিক্ত সবডিভিসনাল অফিসারকে স্কুলের 'সেক্রেটারি' না করিয়া, উক্ত কার্য্যের ভার আমার একজন অনুগত উকিলের হস্তে রাখিয়া গিয়াছিলাম। উদ্দেশ্য যে তিনি স্কুলটি ঠিক আমার নিয়মমতে পরিচালিত করিবেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, স্কুলটির শোচনীয় অবস্থা। সে সময়ে ফেনীতে একটি মর্কটাকৃতি মুন্সেফ ছিলেন। লোকটি একটি 'চিজ্'। "শৃঙ্গিণাং দশহস্তেন"—চাণক্যঠাকুরের এই মহানীতি স্মরণকরিয়া আমি তাঁহাকে স্কুল হইতে দশ হস্ত ব্যবধানে রাখিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার নিজ প্রকৃতিসম্পন্ন একটি উকিলকে তাঁহার সহযোগী করিয়াছিলেন। আমি ইহাকে ফেনীর 'কূর্ম্মাবতার' বলিতাম। উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধমে। দুই জনে

প্রাণেপ্রাণে মিলিয়া ফেনীর সমস্ত উকিল, বিশেষতঃ সেক্রেটারি মহাশয়কে হাত করিয়াছেন। লোকটি কিছু সহজপ্রকৃতির লোক। শরীর ও উদর যেরূপ স্থূল, তাঁহার বুদ্ধিখানিও তাই। কিঞ্চিৎ মস্তিষ্করোগও আছে। ফলতঃ তিনি একজন 'বুড়া বক্কেশ্বর'বিশেষ। উক্ত জুড়ি উকিলদের বুঝাইয়াছেন যে, তাঁহাদের সাহায্যেই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। আমি মাত্র বি. এ.। সেক্রেটারি মহাশয় বি. এ. বি. এল.। অতএব স্কুলটিতে তাঁহারা আমাকে একাধিপত্য করিতে দিবেন কেন? অদ্বৈতবাদ অপেক্ষা দ্বৈতবাদ সহজ। অতএব আমি ফিরিয়া আসিলেও যেন তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ আধিপত্য থাকে, এরূপ করিবার জন্য তাঁহাদের একটা দল কমিটির সভ্য হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাহাতে 'যুগল রূপ'ও আছেন। তার পর মুন্সেফের পুত্রদের অবৈতনিক গৃহ-শিক্ষকতা করিবার জন্য ৪০্ টাকা বেতনে কৰ্ম্মাবতারের পুত্রকে সহকারী হেডমাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং তদনুরূপে আরও ব্যয়বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এ দিকে স্কুলের সঙ্গে যে প্রাইমারি স্কুলগৃহখানি ছিল, তাহা পুড়িয়া গিয়াছে, এবং লাইব্রেরি হইতে বহু পুস্তক চুরি গিয়াছে। স্কুলের প্রধান দুই শিক্ষক এবং আরও কোনও কোনও শিক্ষক এই দলভুক্ত হওয়াতে স্কুলে পড়াশুনা কিছুই হইতেছে না। আমার প্রচলিত নিয়ম সকল একরূপ রহিত হইয়াছে। মোট কথা, 'কালনিমে মামা'র মত লঙ্কাভাগ করিয়া নহে, একাধিকার করিয়া মুন্সেফ মহাশয় স্কুলটির সৰ্ব্বেসৰ্ব্বা হইয়াছেন। আমি সবডিভিসনাল অফিসারকে সভাপতি করিয়া গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিবামাত্র সেক্রেটারির পদ আমার পুনঃ গ্রহণ করিবার কথা স্থির ছিল। কারণ, শিক্ষাবিভাগের নিয়মাবলীমতে সভাপতির পদ নাই। কিন্তু কালনিমের ইঙ্গিতে সেক্রেটারি কিছুতেই পদ ত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন না। তাঁহার স্ফীতোদর মুন্সেফ এত অভিমানের বাষ্পে পূর্ণ করিয়াছেন যে, তিনি তখন 'ইসফে'র মণ্ডূকের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার উপর আমি যাহা আদেশ করিতেছিলাম, তিনি উহা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। কমিটিতে কিছু প্রস্তাব উপস্থিত করিলে উক্তরূপ দলবৃদ্ধির দরুণ তাহা অগ্রাহ্য হয়। কালনিমে সেখানে নেতা। তাঁহার হাস্যকর ব্যঙ্গপূর্ণ মুখভঙ্গিতে তিনি সকলই উড়াইয়া দেন। তাঁহার দল সমস্ত তাঁহার কোর্টের উকিল। তিনি যাহা বলেন, তাহারা নতশিরে তাহাতে সায় দেয়। দেওয়ানগঞ্জ মুন্সেফি-ধ্বংসের পালাও তাঁহারা এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। অন্য দিকে সবডিভিসনাল অফিসারের বিরুদ্ধে এরূপ দল হইয়াছে দেখিয়া চাঁদাদাতারা চাঁদা বন্ধ করিয়াছে। আমি পরিমিত-ব্যয়িতার দ্বারা যে টাকা এ তিন বৎসরে সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইতেছে। যে সেক্রেটারি মহাশয় আমার নিতান্ত অনুগত ও বিশ্বাসী ছিলেন, এবং প্রায় প্রত্যহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন, এখন তাঁহাকে ডাকিলেও তিনি আসেন না। মুন্সেফের গৃহে মন্ত্রণার জন্য দিন রাত্রি অবিরাম যাতায়াত করিতেছেন। সেখানে একটা বিপ্লব কমিটি (Revolutionary Committce) বসিয়া কখনও বা সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে। সেক্রেটারি মহাশয় মুন্সেফের প্রিয়পাত্র বলিয়া চারি দিকে ঘোষিত হওয়াতে তাঁহার পসার বৃদ্ধি হইতেছে। ফেনীর যাবতীয় উন্নতির কার্য্যে আমার দুইটি প্রধান সহায়—উকিল বসন্তকুমার দত্ত ও দুর্গাচরণ দত্ত। আমি দুজনকে সহোদরাধিক স্নেহ করিতাম। বসন্ত সেক্রেটারি মহাশয়ের আত্মীয়। তাহারা দুজনে নিতান্ত কোনও দিন তাঁহাকে আমার কাছে মুন্সেফ টের না পায়, এরূপ ভাবে আনিলে, আমরা যাহা বলিতাম, তিনি চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিযুক্ত অধোমুখে শুনিতেন। কখনও বা সেক্রেটারি পদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়া যাইতেন। তাহার পর মুন্সেফের শিক্ষামতে বলিতেন, উহা এরূপভাবে ত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে ঘোরতর অপমানের বিষয় হইবে। আমি চুপ করিয়া কমিটি পরিবর্ত্তনের সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিন বৎসর অন্তর নূতন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করিতে হয়। এই দরখাস্তের সময়ে আমি

চুপে চুপে নূতন কমিটি নামাঙ্কিত করিয়া দরখাস্ত করিলাম, এবং ষড়্‌যন্ত্রকারীরা আপত্তি করিলে সমস্ত কথা খুলিয়া ইন্‌স্‌পেক্টর দীননাথ সেন মহাশয়ের কাছে লিখিলাম। এই কৌশল (coup) অবলম্বন করিয়া, আমি ডিরেক্টর কর্ত্তৃক কমিটির মঞ্জুরির অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

এমন সময়ে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নন্দকৃষ্ণ বসু ফেনীতে পরিদর্শনে আসিলেন। তিনি একজন 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র ক্ষণজন্মা শিশিরদাদার চেলা। কাজেই আমার সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতৃভাব। ষড়্‌যন্ত্রকারীরা তাঁহার কাছে, কমিশনরের কাছে, এমন কি, গবর্ণমেণ্টের কাছে পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দরখাস্ত পাঠাইতেছিল। তাঁহার জিজ্ঞাসামতে আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। 'কালনিমে মামা'-প্রমুখ ষড়্‌যন্ত্রকারীরাও তাঁহার কাছে গিয়া 'পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে' ভাবে তাঁহাদের প্রতি আমার অবজ্ঞা ও অত্যাচারের কথা বলিল। সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতে বাহির হইলে নন্দকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে আমাকে সে সকল উপাখ্যান বলিয়া বলিলেন যে, তিনি পরদিন আটটার সময়ে তাঁহাদের তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়াছেন, আমাকেও সেই সময়ে তিনি ডাকাইবেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তাহারা কখনও আসিবে না। তাহারা বাঘের সম্মুখে যাইবে, তথাপি এ সকল মুন্সেফের সৃষ্ট প্রলাপ লইয়া কখনও আমার সম্মুখীন হইবে না। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, দেখা যাইবে।" তাঁহার বিশ্বাস, তিনি জেলার কর্ত্তা। তাঁহার আদেশ তাহারা না মানিয়া পারিবে না। আমি ষড়্‌যন্ত্রকারীদের প্রকৃতি জানিতাম। সে জন্য এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাকে আমি বারম্বার নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না। 'অফিসিয়েল' কার্য্য সম্বন্ধে তিনি একটুক শির উচ্চ করিয়া আমার প্রতি অধীনস্থ কর্ম্মচারী ভাবে ব্যবহার করিতেন।

পরদিন প্রভাত হইতে আমি চাপকান পাগড়ি আঁটিয়া তাঁহার তলবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ৮টা, ৯টা, ১০টা, ১১টা বাজিল, কই—দীঘির অপর পারের ডাকবাঙ্গালায় একটা মাছিও আসিল না। আমি বুঝিলাম, আমার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছে, পর্ব্বটা নিষ্ফল হইয়াছে। ১১টার সময়ে কালনিমে মামার তালপাতার সিপাহী সকল (men in buckram) পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া তাঁহার বাসা হইতে চলিয়া গেল। পতি পত্নী বড় হাসিলাম। সে দিন রবিবার। আহার করিয়া সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে একটুক মধ্যাহ্ন-তন্দ্রায় অভিভূত হইয়াছি, এমন সময়ে আরদালি আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বড় জরুরি কি কাগজ পাঠাইয়াছেন বলিয়া, আমাকে জাগাইয়া, উহা আমার হাতে দিল।

আমি অর্দ্ধভুক্ত-তন্দ্রালস-চক্ষে উহা পড়িতে লাগিলাম। নন্দকৃষ্ণ 'ষ্টেটুটারি সিবিলিয়ান', শোভাবাজার রাজন্যবর্গের আত্মীয় হইলেও শোভাবাজারের 'রাধাকৃষ্ণ' সম্প্রদায়ের লোক নহেন। তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, পণ্ডিত ও বিচক্ষণ লোক। যত বঙ্গচন্দ্র ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন—নোয়াখালি তাঁহাদের একটা খাস স্থান—কেহই নন্দকৃষ্ণের ছায়া স্পর্শ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে এক নন্দকৃষ্ণই কার্য্যক্ষম ছিলেন এবং আপনার সম্মান রক্ষা করিতে জানিতেন। কিন্তু এহেন নন্দকৃষ্ণের পর্য্যন্ত মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তিনি মনে করিয়াছেন যে, 'মর্কটে'র সেনা তাঁহাকে অবমাননা করিয়া আসে নাই, তাহা নহে। তাহারা আমার সঙ্গে সম্মুখীন হইতে হইবে বলিয়া ভয়ে আসে নাই, কালনিমের চক্রে পড়িয়া তাহারা তাঁহার দলে তিনি মুন্সেফ বলিয়া গিয়া থাকিলেও তাহারা আমাকে ভক্তি করে এবং জানে যে, সবডিভিসনাল অফিসারের তুলনায় মুন্সেফেরা না মৎস্য না পাখী। দেখিলাম, নন্দকৃষ্ণ অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত এই আদেশপত্রে আমি কিরূপে ফেনী স্কুল স্থাপন করিয়াছি, তাহার ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার পর আমার অনুপস্থিতিসময়ে কিরূপে ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এবং তাহার ফলে স্কুলের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষ কমিটিকে ও হেডমাষ্টারকে পদচ্যুত করিয়া, স্কুলের ভার সবডিভিসনাল অফিসার-স্বরূপ তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি জানিতাম, এরূপ স্কুল সম্বন্ধে এরূপ আদেশ প্রচার করিতে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেটের কোনও ক্ষমতা নাই। সমস্ত আদেশ অবৈধ হইয়াছে। কিন্তু তিনি যেরূপ ক্ষেপিয়াছেন, তাঁহাকে সেই কথা বলিলে তিনি আরও চটিবেন। আমি সে জন্য তাঁহার আদেশের বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার প্রশংসা করিয়া লিখিলাম যে, কাক মারিবার জন্য কামান দাগিবার প্রয়োজন নাই। এরূপ একটি সামান্য কার্য্যে তাঁহার হস্তক্ষেপ করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি নিজে ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। তথাপি তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, তৎক্ষণাৎ স্কুলের ভার আমার গ্রহণ করা আবশ্যক, তাহা আমি অন্যরূপে করিব। যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই হইল। তিনি এ মৃদু প্রতিবাদটুকু পর্য্যন্ত শুনিলেন না। আমাকে লিখিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার আদেশ পালন করা আমার কর্ত্তব্য। আমি বুঝিলাম যে, আমি আর একটি সঙ্কটে পড়িতেছি। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম, মুন্সেফ তাঁহার কাছে সদলে দেখা করিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তিনি তাহার উত্তরেও কমিটিকে পদচ্যুত করিয়া, আমাকে তৎক্ষণাৎ স্কুলের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। এ সংবাদ ফেনী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কালনিমে সর্পধৃত মণ্ডূকের ন্যায় চীৎকার করিতেছে এবং তাহার গৃহের দিকে আহূত হইয়া সেক্রেটারির বৃহৎ মূর্ত্তি ও ষড়্‌যন্ত্রকারীর দল বিষন্নমুখে ছুটিয়াছে। তখন দেখিলাম যে, আর আদেশ চাপিয়া রাখা যাইতে পারে না। রাখিলে নন্দকৃষ্ণের অবমাননা হয়। অতএব স্কুলগৃহে কমিটির পদচ্যুতির এক নোটিশ দিলাম, এবং স্কুলগৃহখানি পোড়াইবার আশঙ্কা হওয়াতে তাহা রক্ষার জন্য একজন কনষ্টেবল মোতায়েন করিলাম। ফেনী উলট-পালট হইল। নন্দকৃষ্ণ সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বেড়াইতে যাইবার সময়ে তাঁহার আদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়াছি কি না, নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও অবমানিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং অনুকূল উত্তর পাইয়া আর এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না। হেডমাষ্টারকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত করিলে স্কুলের পড়া বন্ধ হইবে। আমি সে জন্য তাহাকে সেই অপরাহ্ণে পদচ্যুত করি নাই। কিন্তু নন্দকৃষ্ণ এরূপ ক্ষেপিয়াছেন যে, তিনি পরদিন স্বয়ং স্কুলে গিয়া, হেডমাষ্টারকে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইয়াছেন, এবং তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, তাঁহার আদেশ পালন না করার জন্য আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। ভদ্রলোক ভয়ে স্কুল হইতে সটান্ দৌড় দিয়াছে দেখিয়া লোকেরা হাসিতেছে। ফেনীব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি ও উপহাসের তরঙ্গ ছুটিয়াছে।

কালনিমের যে আহার নিদ্রা নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি দেওয়ানি আইন ও হাই-কোর্টের নজির হইতে ত্রিকোণমিতি পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিতেছেন. কিন্তু ডেপুটি ও ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট বধের অস্ত্র পাইতেছেন না। অবশেষে 'ইংলিশম্যান' 'পাইও-নিয়ার' প্রভৃতি ভারত-প্রেমিক পত্রিকায় এ দুজনের কুকার্য্য সম্বন্ধে দীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাই-লেন। 'নেটিভ মাজিষ্ট্রেট'—তখন আর কথা কি! এই মহামূল্য তাড়িত-বার্ত্তাসকল উভয় পত্রিকা আগ্রহের সহিত প্রকাশ করিলেন। নন্দকৃষ্ণ আন্দোলনের দৌড় এত দূর দেখিয়া ভয় পাইলেন। আমাকে লিখিলেন, শ্রাদ্ধ গড়াইতেছে (the fun is getting fast and furious)। কিন্তু কই, ফেনীর এই মহাবিপ্লবে বঙ্গেশ্বরের সিংহাসন টলিল না। তখন শাণিত অভিযোগপূর্ণ এবং ঘোরতর অত্যাচারের ব্যাখ্যাব্যঞ্জক এক দীর্ঘ আবেদন কমিশনর ওলডহ্যামের কাছে প্রেরিত হইল। নেটিভ মাজিষ্ট্রেট—তিনি তৎক্ষণাৎ কৈফিয়ৎ চাহিলেন, এবং মাজিষ্ট্রেটকে সতর্ক করিয়া লিখিলেন যে, ব্যাপার বড় গুরুতর। নন্দকৃষ্ণ আরও ভীত হইলেন, এবং নিজে কথাটি না কহিয়া, কমিশনরের আদেশ আমার কাছে কৈফিয়তের জন্য পাঠাইলেন। কার্য্য তাঁহার, কৈফিয়ৎ দিব আমি, ব্যবস্থা মন্দ নহে। আমার আশঙ্কা সত্য

হইল। ব্যাপার বাস্তবিক গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। নেটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা কালা সিবিলিয়ান-দের উপর ইংরাজ সিবিলিয়ান, কি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুনজর নাই। তাঁহাদের কিছু একটা দোষ পাইলেই তিলকে তাল করিয়া 'সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বধ' কাব্য অভিনীত হইবার সম্ভাবনা। নন্দকৃষ্ণ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহার বিপদ্ হইলে দেশের একটি উন্নতির পথে ঘোরতর অন্তরায় উপস্থিত হইবে। অমনি গবর্ণমেণ্ট এবং তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট-ভোজী ইংরাজ কাগজওয়ালারা ধুয়া ধরিবে, নেটিভকে ম্যাজিস্ট্রেট করিলে গোটা ভারতখানি যে ভারতসমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, নোয়াখালির নন্দকৃষ্ণের অবৈধ কার্য্য তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ! আমি গরিব ডেপুটি। এরূপ ছারপোকা দুটা পাঁচটা মারা গেলেও দেশের কিছু আসে যায় না। নন্দকৃষ্ণের আদেশ ও কার্য্য এরূপ অবৈধ যে, উহা সমর্থন করাও অসাধ্য। অতএব স্থির করিলাম যে, নন্দকৃষ্ণকে বাঁচাইয়া এ আগুনে আমি ঝাঁপ দিব। 'যা থাকে কপালে, আর যা করেন কালী!' অনেক বার পরের জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। বার বার আমার যে স্বর্গস্থ পিতৃদেব ও পিতার পিতা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এই নিস্বার্থ আত্মবলিদানেও তাঁহারাই রক্ষা করিবেন। আমি স্কুলের স্থাপন হইতে আমূল বৃত্তান্ত সরলভাবে লিখিয়া, উপসংহারে লিখিলাম যে, আমি নন্দকৃষ্ণের আদেশমতে কোনও কার্য্য করি নাই। আমি স্কুলের স্বত্বাধি-কারী। উপস্থিত কমিটির স্থিতিকাল তিন বৎসর শেষ হওয়াতে আমি নূতন কমিটি গঠিত করিয়া, স্কুলের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। এ কার্য্যের জন্য আমি—একা আমিই দায়ী। এ জন্য স্কুলে যে 'নোটিশ' দিয়াছিলাম, আমি তাহাতে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশের উল্লেখ মাত্র করি নাই। নন্দকৃষ্ণ এই 'রিপোর্ট' পাইয়া, আমাকে শত ধন্যবাদ দিয়া এক 'ডেমি' পত্র লিখিলেন এবং আর একটি কথাও না লিখিয়া, আমার রিপোর্ট কমিশনরের কাছে পাঠাই-লেন। কেবল লিখিলেন যে, সবডিভিসনাল অফিসারের রিপোর্টের পর তাঁহার আর কিছুই বলিবার নাই।

ওল্ডহ্যাম ইতিমধ্যে শুনিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার চট্টগ্রামস্থ কীর্ত্তিধ্বজার নাম Old damned institute রাখিয়াছি। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের নীতিগর্ভ নিয়মাবলীর এক বিজ্ঞ (sound) ব্যাখ্যা লিখিয়া এবং ফেনীর স্কুল-কমিটির রহস্য উদ্ঘাটন জন্য ইংলণ্ডের ইতি-হাসের দীর্ঘ পার্লিয়ামেণ্টের (Long Parliament) গবেষণাপূর্ণ ইতিহাস লিখিয়া, এক দিস্তা কাগজব্যাপী এক দীর্ঘ ও মহামূল্য প্রবন্ধ আমার মস্তকে চট্টগ্রামের 'ফেয়ারি হিল' হইতে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে আমার উপকারার্থ বহুতর আদেশ ও উপদেশও ছিল। নন্দকৃষ্ণ উহা আমার কাছে আসল প্রেরণ করিয়া, এক 'ডেমি' পত্রে লিখিলেন—"এই বিজ্ঞ প্রবন্ধের" (learned essay) কি করিবে লিখিও। উহা পড়িয়া হাসিতে হাসিতে আমার পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইয়াছে।" আমি লিখিলাম যে, এই মহামূল্য প্রবন্ধটিকে আমার ছেঁড়া কাগজের অন্তিম স্থান প্রদান করিলাম।

ওল্ডহ্যাম কেবল এই অদ্ভুত হাস্যোদ্দীপক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদব্যাসকে বিশ্রাম দিলেন না। তিনি আমার জন্য নন্দকৃষ্ণকে অপদস্থ করিতে না পারিয়া, তাঁহার সমস্ত ক্রোধ আমার উপর নানা পথে ঝাড়িতে লাগিলেন। আমার কাছে এক 'ডেমি'ও লিখিলেন যে, তিনি বড় দুঃখিত হইয়াছেন যে, আমি নন্দকৃষ্ণকে 'নাকে দড়ী দিয়া চালাইতেছি' (leading him by the nose)। আমি লিখিলাম যে, নন্দকৃষ্ণ এরূপ দক্ষ লোক যে, তাঁহার নাকে কি কাণে দড়ী দিয়া চালান আমার সাধ্য নাই। তাহার পর আবার এক 'ডেমি'তে আমার 'অনৈতিক' (unconstitutional) কার্য্যের 'নৈতিক' ব্যাখ্যা করিয়া আর এক অস্ত্র ঝাড়িলেন—"I am both disappointed and disgusted to find that you would not show the wisdom required to maintain the school, and I attribute to your unconstitutional efforts to arrogate to yourself alone its entire con-

trol, the recent disturbances, just as I give you the credit for establishing it. If this was your aim, you should have had nothing to do with the grant-in-aid which is given only for a settled constitution with a prospect for stability and continuity and not to one depending on a single individual. Having got the constitution, you should have accomodated yourself to it, and resisted any clique in it in a proper way, instead of attempting to dominate it as you have done, so that it in turn took steps to dominate or dust you. What I am most dissatisfied with is your having misled the Magistrate as you have done, (চিরদিনই পরকে বাঁচাইতে গিয়া নিজে এরূপে মরিয়াছি) and I have now, till peace is restored, served your official connection with the school. I see you claim absolute right as its founder, while you have omitted to discriminate between the popular and the legal sense of that term. Lady Dufferin as Foundress of the Dufferin Fund, and the Maharaja of Burdwan as sole founder and proprietor of the Burdwan College, are in very different legal positions"— বাপ! ফেনী স্কুলটি—যার হেডমাষ্টারের বেতন মবলক ৪০ মুদ্রা মাত্র—কি এক বৃহৎ 'নৈতিক' (constitutional) ব্যাপার! যাহা হউক, এই চাএর পেয়ালার ঝড় আমি চাএর পেয়ালাতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে দিলাম। আমি এই পত্রেরও কোন উত্তর দিলাম না।

ঐ দিকে কালনিমে মামার দলে দুর্গোৎসব উপস্থিত হইয়াছে। মামা দীঘির পারে নৃত্য করিতেছে, এবং বক্রেশ্বর সেক্রেটারির গম্ভীর মুখে মধুর হাসি আরও মধুর হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ, ওল্ডহ্যাম আমাকে ধমক দিয়াছেন যে, আমি ফেনী স্কুলের সহিত আমার সংস্রব রহিত না করিলে তিনি আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে লিখিবেন। এইবার নবীনবাবুর আর রক্ষা নাই! সমস্ত সবডিভিসনের লোক এ সংবাদে ভীত হইয়াছে। কিন্তু কই, ফেনী স্কুলের সহিত আমি সংস্রব ত তথাপি রহিত করিলাম না। তাঁহারা স্কুলের ত্রিসীমার মধ্যেও পদার্পণ করিতে পারিতেছেন না। কালনিমে বলিলেন—"আবার লাগাও" কমিশনরের কাছে আবেদন গেল—আমি তাঁহার আজ্ঞার অবমাননা করিয়াছি। সেক্রেটারিও নাকি একবার সশরীরে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে 'ত্রাহি মাং মধুসূদন' বলিয়া স্তব করিয়া আসিলেন। হেডমাষ্টারের পদচ্যুতির জন্যও তাঁহার কাছে আপিল দাখিল হইল। তিনি এ বারও কৈফিয়ৎ চাহিলেন, এবং নন্দকৃষ্ণ এ বারও কৈফিয়তের জন্য আমার কাছে পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম যে, এ পালা আর বাড়িতে দেওয়া উচিত নহে। অতএব এ বার আমি আমার হাত দেখাইয়া লিখিলাম যে, সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের নিয়মাবলীতে কমিশনরের এ সকল বিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনও সংস্রব আছে আমি দেখিতেছি না। হেডমাষ্টারকে আমি সবডিভিসনাল অফিসাররূপে পদচ্যুত করি নাই। স্কুলের স্বত্বাধিকারিরূপে করিয়াছি। হেডমাষ্টারের আপিল স্কুলের নিয়মাবলীমতে ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে হইতে পারে, কমিশনরের কাছে হইতে পারে না। নন্দকৃষ্ণ এই উত্তর পাইয়া এবং এ বারও ওল্ডহ্যামকে তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতে দিই নাই দেখিয়া, উচ্চ হাসি হাসিয়া লিখিলেন—"হরি! হরি! ওল্ডহ্যাম সাহেবের এত পাণ্ডিত্য, এত ইংলণ্ডের constitution ব্যাখ্যা, তুমি এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিলে।" তাঁহার আশঙ্কা হইল যে, হেমবাবুর বৃত্রাসুরের মত এ বার ওল্ডহ্যাম ক্রোধে আকাশের চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাবলী উৎপাটন করিয়া আমার মাথার উপর ফেলিবে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। শুনিয়াছি, কোনও এক মহারাজার কাছে একজন ব্রাহ্মণ তাহার

পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কিছু ভিক্ষা চাহিলে, তিনি এরূপ অপব্যয় করেন না বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। সে কিছু দিন পরে মহারাজার জন্য একটি নিরুপমা ষোড়শী শিকার সংগ্রহের জন্য ২০০্ টাকা চাহিলে, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ দিলেন, এবং শিকার শীঘ্র আনিতে আদেশ করিলেন। সায়াহ্নে 'বায়ু ভক্ষণে' বাহির হইলে তাঁহার মোসাহেব সেই বামুনটাকে দেখাইয়া বলিল "দেখুন মহারাজ! ঐ বামুনটা তাহার পিতৃশ্রাদ্ধের হাট করিতেছে।" মহারাজ তখন শ্লানমুখে বলিলেন—"আমি তাহাকে টাকাটা সৎকর্ম্মের জন্যই ত দিয়াছিলাম। সে এরূপ অপব্যয় করিলে আমি কি করিব।" ওল্ডহ্যাম সাহেবও তাহাই করিলেন। তিনি এ বার লিখিলেন যে, যখন আমি সবডিভিসনাল অফিসাররূপে হেডমাষ্টারকে বরখাস্ত করি নাই বলিতেছি, এবং তাঁহার ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতেছি, তখন তিনি আর কি করিবেন। চারি দিকে আমার সাহসের, প্রশংসার ও একটা বিদ্রূপের ঢেউ ছুটিল। কালনিমে মামা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তার পর তাঁহারা পদচ্যুত কমিটির পক্ষে ও হেডমাষ্টারের পক্ষে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে আপিল উপস্থিত করিলেন। তিনি বোধ হয়, ওল্ডহ্যামের মত Long Parliamentর ও Constitution Lawতে তেমন পণ্ডিত নহেন। তিনি লিখিলেন যে, এরূপ সাহায্যকৃত স্কুলের স্থায়িত্ব সবডিভিসনাল অফিসারদের চেষ্টার উপর সম্যক্ নির্ভর করে। অতএব সবডিভিসনাল অফিসারের কার্য্যের উপর শিক্ষা-বিভাগের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। এই বলিয়া তিনি নূতন কমিটির আবেদনমতে নূতন সাহায্য মঞ্জুর করিয়া দিলেন। এই 'অজা-যুদ্ধ, ঋষি-শ্রাদ্ধ', এবং ওল্ডহ্যামের প্রাভাতিক 'মেঘডম্বর' এরূপে 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'তে শেষ হইল।

শুনিয়াছিলাম, ইহার পর আমাকে 'talented but eccentric' (প্রতিভাসম্পন্ন, কিন্তু মতিচ্ছন্ন) বলিয়া তিনি সেই বৎসরের সালতামামিতে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। তার পর আমি রাণাঘাটে বদলি হইয়া গেলে প্রেসিডেন্সি কমিশনরকে আমার প্রতি বিষাক্ত করিবার জন্য ফেনীর পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে আমি শোচনীয় অবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছি বলিয়া আমার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। আমি তাহার এরূপ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলাম যে, প্রেসিডেন্সি কমিশনরের আফিসে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার উত্তরে তিনি এই মাত্র লিখিয়াছিলেন, আমি যে কয়েকমাস তাঁহার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট ছিলাম, একথা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহাকে এরূপ অপ্রস্তুত করা আমার উচিত ছিল না। নন্দকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে গিয়া আমি তাঁহার এরূপ বিরাগভাজন না হইলে তাঁহার কৃপায় আমিও ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার আশা করিতে পারিতাম। আজ চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য রাজ্যের শনি ও বঙ্গের বোর্ডের বৃহস্পতি সেই ওল্ডহ্যাম 'আয়ারল্যাণ্ডে'র এক অজ্ঞাত ও অগম্য কোণায় আলুর চাষ করিতেছেন। সে দিন সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, এই মর্ম্মে তিনি তাঁহার এক খোসামুদে খাঁ বাহাদুরকে পত্র লিখিয়াছেন। হা ভারতের অদৃষ্ট! কালনিমে মামাও আমার পরবর্ত্তীর হাতে ঘোরতর অপমানিত হইয়া লোকের কাছে প্রকাশ্য ভাবে বলিতেন—"দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝা যায় না। আমি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে, নবীনবাবুর মত noble man (মহৎ লোক) ভারতবর্ষে নাই।"

রাণাঘাট

ওল্ডহ্যাম আমাকে ভুলিলেন না। তাহার উপর 'সিদ্ধবিদ্যা' তাঁহার ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দিতেছিলেন। সিদ্ধবিদ্যা এ সময়ে চট্টগ্রামে ডেপুটি ছিলেন। তাঁহার বাড়ী নোয়াখালি। কিরূপে প্রথম নোয়াখালি দর্শনসময়ে তাঁহার সেবায় তুষ্ট হইয়া, তিনি কোন এক অপরাধে দণ্ডিত হইতেছিলেন, তাঁহার সে কলঙ্ক ক্ষালনার্থ এক 'অনার সার্টিফিকেট' দিয়া,

তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ডেপুটি কলেক্টর করিয়াছিলাম, সে দিনও কিরূপে তাঁহার চাঁদপুরের কীর্ত্তিকলাপের জন্য ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে এই ওল্ডহ্যামের ক্রোধ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি এখন সেই সকল উপকারের প্রতিদান দিতে লাগিলেন। আমি উপকার করিয়া এক জীবন প্রায় এইরূপ প্রতিদানই পাইয়াছি। বঙ্কিম-বাবু বলেন, পরের জন্য কাঠ কাটিও না। কিন্তু পরের জন্য কাঠ কাটা যাহার প্রকৃতি, সে না কাটিয়া পারে না। খোসামুদিতে সিদ্ধহস্ত বলিয়া ইঁহার নাম আমি সিদ্ধবিদ্যা রাখিয়া-ছিলাম। লেঃ গবর্ণর চট্টগ্রাম আসিলে তিনি ওল্ডহ্যামকে হাত করিলেন। ওল্ডহ্যাম চিফ সেক্রেটারি কটন সাহেবকে ধরিয়া, আমাকে বদলি করাইয়া, সিদ্ধবিদ্যাকে ফেনীতে দিলেন। কটন আমাকে জানিতেন বলিয়া ওল্ডহ্যাম আর বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। কটন আমাকে লিখিলেন—তিনি শীঘ্র আমাকে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বদলি করিবেন। পরের গেজেটে আমি রাণাঘাট সবডিভিসনের ভার পাইলাম। আমি ফেনী হইতে বদলি হইবার জন্য দুই বার ছুটি লইয়া, বাধ্য হইয়া ফেনী ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। একবার স্বয়ং ওল্ডহ্যামই বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহার কারণ, তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে, আমার মত কেহ ফেনী এমন সুন্দর ভাবে শাসন করিতে পারিবে না। আর বদলি হইলাম কোথায়?—রাণাঘাট! একদিন ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট জেফ্রি যে রাণাঘাটকে 'বাঙ্গালীর স্বর্গ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সেই রাণাঘাট। আমি যত বার ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়েতে যাতায়াত করিয়াছি, তত বার রাণাঘাট ষ্টেশন দেখিয়া মনে মনে ভাবিতাম, আমি কি কখনও এই সবডিভিসনের ভার পাইব? প্রায় গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্রগণ ইহার ভার পাইয়া থাকেন; অতএব আমি ইহা দুরাকাঙ্ক্ষা মনে করিতাম। শ্রীভগবানের কি কৃপা! আমি আমার আকাঙ্ক্ষামতে বেহার, ফেনী, রাণাঘাট, তিনটি সবডিভিসন পাইলাম।

বদলির সংবাদ ফেনীতে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। স্বয়ং কালনিমে ও তাঁহার দল পর্য্যন্ত স্থানীয় উচ্ছ্বাসে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। আমি যে কঠোর মূর্ত্তিতে মাদারিপুর শাসন করিয়াছি, যে ললিত-ভৈরব মূর্ত্তিতে বেহার শাসন করিয়াছি, সে মূর্ত্তিতে ফেনী শাসন করি নাই। আমি স্থানোপযোগী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া থাকি। রাজকার্য্যক্ষেত্র আমি একটি রঙ্গমঞ্চের মত মনে করি, এবং যেখানে যেরূপ ভাব আবশ্যক বুঝি, সেখানে সেরূপ ভাবে অভিনয় করি। ফেনী দরিদ্র নিরক্ষর কৃষকের দেশ। এখানে আমি রুদ্ররূপ মোটেও ধারণ করি নাই। ফেনী যেন আমার একটি জমিদারি, আমি উহাকে এ ভাবে শাসন করিয়াছি। স্ত্রীর কাছে প্রায় সমস্ত স্কুলের ছাত্র যাইত। তিনি তাহাদের মাতার মত স্নেহ করিতেন। আমার বাসাও যেন ফেনীর নিকটবর্ত্তী লোকের জমিদারবাড়ী। সকলে স্ত্রীর দরবারে উপস্থিত হইত। তিনি বাড়ী যাইতে সঙ্গে একজন চাকর না দিলেও চলিত। গাড়োয়ানেরা তাহাদের জমিদার-পত্নীর মত বা মাতার মত 'মাঠাকরাণী'কে লইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত। ফেনী-বিভাগের সমস্ত লোক আমাকে একটা কৃষ্ণ বিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছিল। গাছের প্রথম ফল, গাভীর প্রথম দুগ্ধ, নূতন পুষ্করিণীর প্রথম মৎস্য আমার জন্য 'মানস' করিয়া রাখিত। একজন ব্রাহ্মণ পিত্তশূল রোগে মরণাপন্ন হইয়া আসিয়া আমাকে বলিল যে, সে তারকেশ্বরে গিয়া আদিষ্ট হইয়া আসিয়াছে যে, আমার প্রসাদ খাইলে সে রোগমুক্ত হইবে। আমি কিছুতেই সম্মত হইলাম না। ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া পায়ে পড়িতে লাগিল। তখন সামান্য জলখাবার সামগ্রী আনাইয়া, আমি কিঞ্চিৎ খাইয়া তাহাকে খাইতে দিলাম। সে তাহা খাইয়া, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। কিছু কাল পরে সে আসিয়া বলিল যে, গৃহে ফিরিয়া গিয়া তাহার দুই তিন দিন যাবৎ খুব বমি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে সে নীরোগ হইয়াছে। দেখিলাম, তখন তাহার সুন্দর সুস্থ বলিষ্ঠ দেহ। এরূপে ফেনীর লোকেরা আমাকে একপ্রকার দেবত্ব প্রদান করিয়াছিল। কাজেই আমার বদলিতে দেশব্যাপী একটা হাহাকার উঠিল। কত লোক আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন রেলওয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারগণ এক চোটে ২৫০০৲ টাকায় আমার প্রায় সমস্ত জিনিসপত্র কিনিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট ভ্রাতারা বিক্রয় করিতে দিলেন না, বাড়ী লইয়া গেলেন। আমার নিজ কল্পনা-প্রসূত 'টেবিল' ও 'রাইটিং সোফা' লইয়া এখানেও টানাটানি পড়িল। শেষে একজন ইঞ্জিনিয়ার কিছুতেই ছাড়িলেন না। তিনি বলিলেন, আমি যত মূল্য চাহি, তিনি দিবেন। এই টেবিলে আমি আমার 'রৈবতক', কুরুক্ষেত্র, গীতা, চণ্ডী, খ্রীষ্ট লিখিয়াছিলাম। তিনি নিজেও একজন সাহিত্য-প্রিয় লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, বাঙ্গালার কবির এই নিদর্শন তিনি তাঁহার ইংলণ্ডস্থ গৃহে লইয়া সভক্তি রক্ষা করিবেন। আমরা কি সাধে ইঁহাদের গোলাম? অতএব বড় অনিচ্ছায় এই দুটি জিনিস ছাড়িলাম। আমার বাসাবাড়ী কিনিয়া স্থানান্তরিত করিতে বহু ব্যক্তি উমেদার হইলেন। কারণ, গৃহ দীঘির পাড়ে। দীঘি গবর্ণমেণ্টের। সিদ্ধবিদ্যা লিখিলেন যে, ইঁহাদের স্বীকৃত মূল্যে তিনি উহা ক্রয় করিবেন। কিন্তু তিনি এখানেও আমাকে প্রতিদান না দিয়া ছাড়িলেন না। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি উক্ত মূল্যের অর্দ্ধেকের অধিক দিবেন না। কেবল গৃহের বেড়ায় মাত্র তত টাকার কাপড়ের পর্দ্দা আছে বলিলে, তিনি বলিলেন, তিনি আমার মত সৌখিন নহেন। পর্দ্দার কিছুই প্রয়োজন তাঁহার হইবে না। কি করিব? সে রাত্রি প্রভাতে আমরা চলিয়া যাইব। তিনি কার্য্যভার লইয়াছেন। তাঁহার ভয়ে আর কেহ তখন ঘর কিনিতে সাহস করিবে কেন? স্ত্রী চটিয়া, সমস্ত কাপড়ের পর্দ্দা ও ছাদ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, ভৃত্যদের বক্‌সিস করিলেন। ইংরাজি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফেনী আসিয়াছিলাম। নয় বৎসর পরে ইংরাজি ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারির শেষে ফেনী ছাড়িলাম। কেবল সাহিত্য সেবার অবসর জন্য আমি এই অজ্ঞাতবাসে আসিয়াছিলাম, এবং এত দীর্ঘকাল এই নিভৃত স্থানে ছিলাম। প্রাতে যাত্রা করিলে একটা রোদনের রোল উঠিল। অনুমান, পাঁচ শত লোক সমবেত। কেহ পায়ে পড়িয়া, কেহ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে। আমাকে কিছুতে এক পা অগ্রসর হইতে দিতেছে না। প্রায় দুই মাইল যাবৎ আমি এরূপ অবস্থায় কাটাইয়া, অবশেষে তাহাদের ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলাম। দশ মাইল ব্যবধান এক ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিলে একজন স্থানীয় জমিদার ধরিয়া পড়িলেন যে, আমি এখন আর ফেনীর সবডিভিসনাল অফিসার নহি, অতএব এক বেলা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। দেখিলাম, তিনি প্রচুর আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আহারের পর রওনা হইব, এমন সময়ে আমার ফেনীর নাজির উর্দ্ধশ্বাসে এই দশ মাইল পথ ছুটিয়া আসিয়া, আমার ও স্ত্রীর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। অথচ ফেনীর আমলাদের মধ্যে তাহাকেই আমি বেশী শাসন করিতাম। তাহার এই ভক্তিতে আমি বিস্মিত হইলাম। সে ঠিক পাগলের মত হইয়াছে। তাহাকে বহু কষ্টে ছাড়াইয়া রওনা হইলাম। নোয়াখালি হইতে দুই তিন মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের তীরে ষ্টীমারে উঠিলে সেখানে গাড়োয়ানগণ আর এক দৃশ্য অভিনয় করিয়া ষ্টীমারের খালাসিদের পর্য্যন্ত কাঁদাইল। ষ্টীমার খুলিল, তাহারা তীরে দাঁড়াইয়া মাতৃপিতৃহীন শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, লোকের এই সকরুণ ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমরা পতি পত্নী ও শিশু পুত্রটি সমস্ত পথ কাঁদিয়াছিলাম। এখনও রেলপথে ফেনী হইয়া বাড়ী যাইতে পূর্ব্বে টের পাইলে ষ্টেশন লোকারণ্য হইয়া যায়। মানুষ এত সহজে যখন লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে, তখন কেন অভিশাপভাজন হয়, আমি বুঝিতে পারি না।

আসিবার সময়ে নন্দকৃষ্ণের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। তিনি বিবাহ করিতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীবিয়োগের পর তিনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে অস্বীকার করিয়া কয়েক বৎসর বিপত্নীক ভাবে অতিবাহিত করেন। শেষে তাঁহার পিতা উপস্থিত বিবাহ স্থির করিয়া তাঁহাকে ও আমাকে পত্র লেখেন। তাঁহাকে আমরা পতি পত্নী দুই জনে

অনেক করিয়া বুঝাইয়া সম্মত করি। তিনি ২০০৲ টাকার নোট স্ত্রী হইতে লইয়া পাঠাইয়া, বিবাহে সম্মত হইয়া, ফেনী হইতে টেলিগ্রাফ করেন। বিবাহের পর নোয়াখালি ফিরিয়া আমাকে পত্র লেখেন। হতভাগিনী বঙ্গভূমির অদৃষ্ট-আকাশ হইতে এই সমুজ্জ্বল নক্ষত্রটি অকালে খসিয়া পড়িয়াছে। নন্দকৃষ্ণ আজ স্বর্গে। অতএব অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার বন্ধুভাবের নিদর্শনস্বরূপ শেষ পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Noakhali
The 2nd March, 93,

My Dear Nobin Chandra

I and Sailo returned to Noakhali yesterday; and was very sorry to find that you had already left. I have very few friends in this world. I was so wrapped up with my deceased wife that I did not care to make many friends. After the loss I sustained, your loving tenderness, your consoling words, were like the balm of Gilead to my broken heart. You have been to me a brother. Let me hope you will show me the same tenderness as you have all along shown to me.

I had a talk with Mr Cotton about you. Your transfer and Bogola Babu's deputation were all due to Mr. Oldham. I congratulate you that you have at last been able to shake off the yoke of that man.

The marriage went off without any hitch. It was a very quiet affair. I am glad to be able to say that she is all that I ever expected to be and wished for. I shall send you her photo bye and bye, you have the first claim to it, as but for you, I would not have got her.

It is indeed painful to me to bid you farewell. I shall always cherish you and Nirmal in my heart of hearts, and I hope you will reciprocate the feeling.

Yours affectionately

Nandakrishna.

আমার পুত্রপ্রতিম খুড়া অখিলবাবু বরিশালে ওভারসিয়ার ছিলেন। এক দিন সেখানে একটা দুর্গোৎসবের আনন্দে কাটাইয়া, বহু নদ নদীর ও তৎতীরস্থ বঙ্গ-পল্লীগ্রামের বাসন্তী শোভা দেখিতে দেখিতে খুলনা হইয়া কলিকাতায় পেঁাছিলাম। রবিবার প্রাতে অবসর জানিয়া কটন সাহেবকে 'সেলাম' দিতে গেলাম। প্রায় রবিবারে তাঁহার কয়েক জন প্রিয় বাঙ্গালী ঘুঘুর মত তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত। বহু বৎসরের পর কটনের সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। তিনি এবার আমাকে বলিলেন,—"নবীন! বলিতে পার কি, তোমার এত কম বয়স দেখা যাইবার রহস্য কি?" আমি বলিলাম, যদি কোনও রহস্য থাকে, তিনি ত জানেন। কারণ, তিনিও বৃদ্ধ হন নাই। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে পুরা পঞ্চাশের মত দেখায়। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমাকে পুরা ষাট দেখায়। তিনি বড় হাসিলেন। শেষে তাঁহার ঘুঘুদের বলিলেন—"চিন কি? ইনি তোমাদের বিখ্যাত কবি বাবু নবীনচন্দ্র সেন।" তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা আমাকে নামে চিনেন, কিন্তু আমার যে এত বয়স অল্প, তাঁহাদের এ ধারণা ছিল না। তাঁহারা সকলে উঠিয়া খুব একটা হস্তপীড়ন করিলেন। তখন কটন আবার বলিলেন—মূর্ত্তিখানি এই ত

দেখিতেছেন। কিন্তু উহাতে এত আগুন আছে যে, এই কলিকাতা সহরটা পোড়াইতে পারে। ভাল, মিঃ ওল্ডহ্যামের সঙ্গে তোমার ব্যাপারখানা কি হইয়াছিল?" আমি বিবৃত করিতে লাগিলাম, আর তাঁহারা হাসিয়া আকুল হইলেন। কটন বলিলেন—"যাহা হউক, সাবধান! রাণাঘাটে আগুন জ্বালাইও না। রাণাঘাটে বহুতর খ্যাতনামা লোক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। আমি এ জন্য তোমার হস্তে উহার ভার দিয়াছি। রাণাঘাট কলিকাতার কাণের কাছে। উহা একটা খ্যাতনামা সবডিভিসন। উহাতে বহু শিক্ষিত ও ক্ষমতাশালী লোকের বাস। অতএব বড় সাবধানে কার্য্য করিও, এবং কলিকাতায় আসিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

কলিকাতা হইতে রাত্রি ১২টার সময়ে রাণাঘাটে পৌঁছিলাম। আমার কত সাধের রাণাঘাট! একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল। সবডিভিসন-গৃহের একটি কক্ষে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী একখানি খাটিয়া মাত্র আমার অভ্যর্থনার জন্য রাখিয়াছিলেন। ঘরে একটা সামান্য মাটির প্রদীপ পর্য্যন্ত নাই। তিনি নিশ্চিন্তভাবে অন্য কক্ষে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অথচ তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, আমি পত্নী পুত্র লইয়া আসিতেছি। একখানি খাটিয়ায় তিন জন শুইব কিরূপে? পুত্রকে লইয়া স্ত্রী নীচে বিছানা করিয়া শুইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে দেখিলাম, বিস্তীর্ণ কেন্দ্রস্থলে সবডিভিসন-গৃহ। তাহার এক পার্শ্বে লোকাল বোর্ডের আফিস, এবং তাহার সম্মুখে ফৌজদারি ও মুন্সেফি আফিস। গৃহ তিনটির কোন শৃঙ্খলা, কি সৌন্দর্য্য নাই। পূর্ত্তবিভাগে তাহা থাকিবার কথাও নহে। হাতায়ও দেখিবার কিছু নাই। বসতিগৃহের সম্মুখের বারাণ্ডায় রৌদ্র নিবারণের জন্য একটি জাফরির একচালা কিয়দংশে আছে এবং তাহার উপর দুই একটি লতা উঠিয়াছে। তাহার সম্মুখে একটি আমড়াবৃক্ষ। কেবল হাতার 'গেট' হইতে যে রাস্তাটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ উচ্চ ঝাউশ্রেণীই দেখিবার যোগ্য। বোধ হয়, কোনও ইংরাজ সব-ডিভিসনাল অফিসারের দ্বারা রোপিত। তাঁহার হস্ত-চিহ্নস্বরূপ দুই একটা ক্রোটন এখনও গৃহসম্মুখস্থ শূন্য উদ্যানে আছে। গৃহখানির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। স্থানে স্থানে আস্তর খসিয়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে তৈলের ও নিষ্ঠীবনের চিত্র, মেজের স্থানে স্থানে মনুষ্য ও মূষিককৃত বিবর, এবং স্থানে স্থানে কপাট শার্সি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বোধ হইল, কলির আরম্ভ হইতে গৃহের সঙ্গে চূণের সাক্ষাৎ হয় নাই। উহার পূর্ব্বস্মৃতি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলেন, সাত বৎসর যাবৎ গৃহের সংস্কার হয় নাই, এবং সবডিভিসনাল অফিসারেরা সে জন্য দ্বিরুক্তিও করেন নাই। শ্রীবিষ্ণু!—তিনি একবার করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ত্তবিভাগ কর্ণপাত করেন নাই। অথচ রাণাঘাট বঙ্গের খ্যাতনামা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (prize) সবডিভিসন! প্রাণ জুড়াইল।

কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই আমি গৃহের একটি তীব্র শ্লেষাত্মক বর্ণনা পূর্ত্তবিভাগকে উপহার দিলাম। একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্লেষ-বিষে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। লিখিলেন, গৃহের এরূপ শোচনীয় অবস্থা কখনও হইতে পারে না। আমি তাঁহাকে সশরীরে উপস্থিত হইতে 'চ্যালেঞ্জ' (challenge) করিলাম; তিনি আসিলেন। দেখিলাম লোকটি মন্দ নহে। তিনি গৃহের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, দোষ তাঁহার নহে; আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের। ঘরের যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নিজে বড় লজ্জিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কেবল তাহা নহে, আমি যাহা চাহি—এমন কি, যাহা এ সকল গৃহে কখনও হয় না, দেয়ালে আমার পছন্দমতে রং দিতে পর্য্যন্ত আদেশ দিলেন। আমি পরের রবিবার জিনিসপত্র কিনিতে সস্ত্রীক কলিকাতায় চলিলাম। ট্রেনে উঠিয়াছি, এমন সময়ে আমার গাড়ীর গবাক্ষের সম্মুখে তিন বিরাট্ মূর্ত্তি দণ্ডায়মান হইলেন। বাঙ্গালীতে এতাদৃশ বীর অবয়ব আমি

দেখি নাই। তিন জনেরই হাসিভরা প্রসন্ন মুখ। মধ্যস্থ বলিলেন—"আমার নাম যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। আমি 'ধাত্রীশিক্ষা'র গ্রন্থকর্ত্তা। ইনি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার, এবং ইনি দ্বিতীয় পুত্র গিরিজা। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছিলাম। কিন্তু ষ্টেশনে শুনিলাম, আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন। আর এক দিন আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।" তখন কুমার আমার হস্তে একখানি চিত্র, এবং গিরিজা একটি মুদ্রিত অভিনন্দন-কবিতা দিলেন। আর অমনি গাড়ী খুলিল ; আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিবার অবসরও পাইলাম না। যত দূর দেখা গেল, তিনটি সৌম্য মূর্ত্তির দিকে আমি অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া রহিলাম। যদুবাবু একজন বিখ্যাত ডাক্তার। তাঁহার 'ধাত্রীশিক্ষা' 'বঙ্গদর্শনে'র ভবিষ্যদ্‌বাণীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিয়া প্রত্যেক গৃহে গৃহে পঞ্জিকার মত সত্য সত্যই বিরাজ করিতেছে। আমি তাঁহাকে যদিও ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তথাপি বড় ভক্তি করিতাম। তাঁহার 'ধাত্রীশিক্ষা'র কৃপায় আমার দুই সন্তান বিদেশে ধাত্রীহীন স্থানে নির্ব্বিঘ্নে প্রসূত হইয়াছিল। আমার স্ত্রীকে উহা পড়াইয়াছিলাম। শাশুড়ী উহার প্রসবপ্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি নিজে উহার একটা সারাংশ লিখিয়া রাখিয়াছি। উহা এখনও আমার কাছে আছে। কারণ, প্রসবসময়ে গল্প হইতে আসল কথা বাহির করিতে সময় পাওয়া যায় না। যদুবাবুর সুযোগ্য পুত্রেরা প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে একটা সারাংশ লিখিয়া দিলে, সাধারণের বড় উপকার হইবে। ট্রেনের বহু লোকেরা তাঁহাদের চিনিত। তাঁহারা আমার হস্তে কি দিলেন, তাহা দেখিবার জন্য পরের ষ্টেশনে একটি লোক আসিয়া উভয় উপহারই লইয়া গেল। কুমার আমার কাব্যাবলী হইতে কতকগুলি 'দৃশ্য' এমন অপূর্ব্ব কৌশলে আঁকিয়াছিলেন যে, আমি তাঁহার শিল্প-চাতুর্য্যে ও কাব্যরসজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। গিরিজার কবিতাটিও অতিশয় সুন্দর হইয়াছিল। উভয় উপহার হাতে হাতে সমস্ত ট্রেনে বেড়াইয়া ও বহু লোকের প্রশংসা লাভ করিয়া, শেষে শিয়ালদহে ট্রেন পঁহুছিলে আমার হাতে ফিরিয়া আসিল। চিত্র ও কবিতা, উভয়ই তাঁহারা ফ্রেম ও আয়না দিয়া দিয়াছিলেন। দুটিই আমি বড় আদরে রাখিয়াছি। সর্ব্বদা আমার গৃহের প্রাচীরে উহারা শোভা পায়। আমি এ জীবনে বহু অভিনন্দন পাইয়াছি। এই দুইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কবিতা অনেক পাইয়াছি। কিন্তু চিত্র আর কখনও পাই নাই। চিত্রটি এত সুন্দর যে, উহা 'এনগ্রেভ' করিয়া রাখিব আমার ইচ্ছা। ইহার পর ইঁহাদের সঙ্গে বহু বার সাক্ষাৎ হইয়াছে। যদুবাবু বঙ্গদেশকে একটি অতুলনীয় রত্নহীন করিয়া, আমি রাণাঘাটে থাকিতেই স্বর্গারোহণ করেন। কুমার এবং গিরিজাকে আমি আমার পরমবন্ধু ও সহোদরের মত স্নেহ করি। তাহারা এখন ঠিক যেন আমার আপনার পরিবারস্থ লোক। কুমারের বেশ অভিনয়শক্তি আছে। সে 'পলাশির যুদ্ধে'র মোহনলালের অভিনয় করিয়াছে। বঙ্গদেশে বোধ হয়, মোহনলাল সাজিবার এমন বীরদেহ আর কাহারও নাই। তাহার আবৃত্তি-শক্তিও অসামান্য। গিরিজা এখন বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠাভাজন কবি। আমার রাণাঘাট ও কলিকাতার জীবন তাহাদের ও বন্ধুবর রাজচন্দ্র বসুর পরিবার-বর্গের স্নেহ-স্মৃতিতে জড়িত। রাজচন্দ্রবাবু মাদারিপুরে আমার সময়ে পুলিস ইন্‌স্‌-পেক্টর ছিলেন। রাণাঘাটে আসিয়া দেখিলাম, তিনি পেনসন লইয়া বাড়ীতে আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র হতভাগ্য সুশীল রাণাঘাটে একটি বিদ্যালয়ে ও লাইব্রেরিতে তাহার কীর্ত্তি রাখিয়া ও তাহার দেব-চরিত্রে সমস্ত রাণাঘাট কাঁদাইয়া, আমি রাণাঘাটে থাকিতেই চলিয়া যায়। পুত্র-শোক সহিতে না পারিয়া তাহার পিতাও অল্পকালমধ্যে তাহার অনুসরণ করেন। দেবশিশুর মত তাঁহার অবশিষ্ট পুত্রগণ—সরল, সুকুমার, সুধীর, সন্তোষ, সুস্থির—আমার এখনও পুত্রস্থানীয়।

কলিকাতা হইতে জিনিসপত্র, ফুলের ও ক্রোটনের টব আনিয়া নবসংস্কৃত সবডিভিসনাল-গৃহখানি সাজাইলাম। সম্মুখের জাফরিতে আরও কয়েকটি সুন্দর লতা, এবং উদ্যানে পুষ্প

ও ক্রোটন, এবং 'লোকাল বোর্ডে'র পার্শ্বের গর্ত্তটিকে একটা গোলাকার সরোবরে রূপান্তরিত করিয়া, তাহার চারি দিকে নারিকেলের সারি রোপণ করিলাম। মাজিষ্ট্রেট বারনার্ড (Bernard) আসিয়া বলিলেন—"আপনি কয়েক দিনের মধ্যে স্থানটির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন।" সিবিল সার্জ্জন বলিলেন—"আপনি দেখিতে দেখিতে এই জঘন্য স্থানটিকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গে পরিণত করিবেন দেখিতেছি।" অশিষ্টাচারের ও অসন্তোষের প্রতিমূর্ত্তি কমিশনর ওয়েষ্টমেকটও এত দূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের উদ্যান হইতে আমাকে গোলাপের কলম পাঠাইবেন বলিলেন, এবং ইন্‌স্পেকশন-বহিতে পর্য্যন্ত আমার অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে গৃহ ও স্থানসজ্জার প্রশংসা লিখিয়া গেলেন। বন্ধুবর সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী বলিলেন—"গৃহ-সজ্জায় মূল্যবান্ কিছুই নাই। অথচ এমনি আপনার পছন্দ (taste) যে, দেখিতে দেখিতে আপনি এই গৃহ ও স্থানটির কি সুন্দর রূপান্তর ঘটাইলেন! এই গৃহের ও এই স্থানের এই শোভা রাণাঘাটে কেহ কখনও দেখে নাই।" তখন রাণাঘাট সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী এবং সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরীই রাণাঘাট। যে কৃষ্ণ পান্তিকে লক্ষ্য করিয়া রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন—

"পেয়াদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তার নামে মা ডিক্রিজারি!
আর পান বেচ্‌তো যে কৃষ্ণ পান্তি, তারে দিলি জমিদারি!"

প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণ পান্তির উপাখ্যান বঙ্গের কে না শুনিয়াছেন। তিনিই রাণাঘাটের খ্যাতনামা পালচৌধুরী ঘরের সৃষ্টিকর্ত্তা। এ অঞ্চলে সমস্ত তাঁহারই জমিদারি ছিল। শুনিলাম, পালচৌধুরীদের এক ছাগলের বিবাদের মোকদ্দমার নথিতে তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের এক কক্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। তাহাতে এই বিপুল গৃহের দুই শাখা ধ্বংস হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর শাখাও ছায়াবশিষ্ট হইয়া আছে। কোনও মতে অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে তিনি এ গৃহের সম্মান রক্ষা করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘাবয়ব, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সদাশয়, সুন্দর মূর্ত্তি। অবস্থার তাড়নায় তিনি মধ্যে ডেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন। কিন্তু বালক ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটদের হাতে সম্মান রক্ষা করা কঠিন দেখিয়া তিনি চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন চতুর বুদ্ধিমান্ সদালাপী লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যা তিনি আমার সঙ্গে সবডিভিসনগৃহে কাটাইতেন। এখনও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের ধ্বংসশেষ অট্টালিকা আধা রাণাঘাট যুড়িয়া আছে। অন্য শাখার দ্বারকানাথ পালচৌধুরী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি আমাকে একদিন লিখিলেন যে, তাঁহার চলৎশক্তি নাই। অথচ তিনি আমার কাব্যাবলী পড়িয়াছেন, অভিনয় করিয়াছেন, এবং এখন লোকমুখে আমার কার্য্যের ও চরিত্রের অত্যন্ত প্রশংসা শুনিয়া আমাকে দেখিবার জন্য বড় লালায়িত হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। কি প্রকাণ্ড ও সুন্দর রাজপ্রাসাদতুল্য বাড়ী। তিনি কি সুদীর্ঘ, সুন্দর, সুপুরুষ ও সদালাপী লোক! দেখিলাম, তিনি তখন বাতব্যাধিগ্রস্ত। তাঁহার বৃহৎ স্তম্ভসারি-শোভিত উচ্চ বৈঠকখানা দেখাইয়া বলিলেন—"এই বৈঠকখানায় আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' অভিনীত হইয়াছে। আমি তাহাতে কখন ক্লাইব, কখন মোহনলাল সাজিতাম। আজ আপনি রাণাঘাটে আসিয়াছেন, আর আমার এই অবস্থা! আপনি কেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন না? আমি আপনার অভ্যর্থনায় রাণাঘাট কম্পিত করিতাম। আজ রাণাঘাটে আপনাকে কে চিনিবে, আপনার মূল্য কে বুঝিবে? যে রাণাঘাটের নাম শুনিয়াছেন, সে রাণাঘাট আজ কোথায়? এই যে চূর্ণী নদী দেখিতেছেন, ইহাতে বিশ পঁচিশখানি 'ভাওলিয়া' সজ্জিত থাকিত এবং তাহাতে কত আমোদ হইত!" আমিও সে সকল উপাখ্যান শুনিয়া গৃহে ফিরিতে ফিরিতে ভাবিলাম—"আজ সে রাণাঘাট কোথায়?" রাণাঘাটে এখনও পালচৌধুরীদের বাড়ী ভিন্ন দেখিবার আর কিছুই নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্য এখন মহামহিম মহাপ্রতাপান্বিত শ্রীযুক্ত 'ম্যালেরিয়া' চন্দ্র অধিকার

করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে আমরা পিতা পুত্র দুজনেই ম্যালেরিয়া জ্বরগ্রস্ত হইলাম। আমি কোনওরূপে সামলাইলাম। কিন্তু পুত্রের অবস্থা বড় শোচনীয় হইল। একদিন কাচারিতে হস্‌পিটাল এসিস্টেণ্ট তিনটার সময়ে ছুটিয়া গিয়া বলিলেন—"নির্ম্মলের জ্বর বড় বেশী হইয়াছে। ডাক্তার যদুবাবুকে আনিতে এখনই লোক পাঠান।" রাত্রি ১০টার সময়ে ট্রেন। তখন গরিবপুর পদব্রজে লোক পাঠাইলেও ট্রেনের পূর্ব্বে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। কাচারি ফেলিয়া গৃহে গিয়া দেখিলাম, ১৪ বৎসরের শিশু ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ। মাথার চুল ফেলিয়া দিয়া ডাক্তার বরফের পটি দিয়াছেন। তাহার চেহারার এই কয় ঘণ্টায় এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাহাকে চেনা যাইতেছে না। রাণাঘাটে আরও বড় বড় ডাক্তার আছেন। তাঁহাদের ডাকাইলাম। তাঁহারা অবস্থা দেখিয়া বিষণ্ণ ও গম্ভীরভাবে রোগীর শয্যা বেষ্টন করিয়া বসিলেন। তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমরা পাগলের মত হইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। কলিকাতা হইতে প্রত্যেক ট্রেনে টেলিগ্রাফ করিয়া বরফ আনান যাইতেছে। উহাই একমাত্র চিকিৎসা। দেখিতে দেখিতে জ্বর ১০৭ ডিগ্রি হইল। ফেন্যাসিটিং দিলে এক ডিগ্রি নামে। আবার কয়েক মিনিট পরে ১০৭ ডিগ্রিতে উঠে। জ্বর নামিলেই কুইনাইন দেওয়া ডাক্তার যদুবাবুর মত। কিন্তু অন্যান্য ডাক্তারদের মত জ্বর একেবারে বারণ না হইলে কুইনাইন দেওয়া উচিত নহে। ইহা লইয়া ঘোরতর মতভেদ চলিতেছে। যদুবাবু একা তাঁহার মত সমর্থন করিতেছেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে একবার ফেনাসিটিনে জ্বর নামিয়া আধ ঘণ্টাকাল স্থায়ী হইল। আমি যদুবাবুর মতের পক্ষপাতী। তিনি বলিতেন, যদি জ্বরের পূর্ণ 'রেমিসন' না হইয়া রোগীর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে কুইনাইন দেওয়া যাইবে কখন? অথচ কুইনাইন ভিন্ন জ্বরের ঔষধ নাই। তিনি এ সম্বন্ধে একখানি বহিও লিখিয়াছিলেন। অগত্যা সম্পূর্ণ জবাবদিহি আমি নিজে লইলে ডাক্তারেরা ১০ গ্রেন কুইনাইন দিলেন। তাহাতে জ্বর আর এক ডিগ্রি নামিল। যদুবাবুর ব্যবস্থামতে আবার ১০ গ্রেন দিলাম। এরূপে প্রত্যেক ১০ গ্রেনে এক ডিগ্রি নামিতে নামিতে প্রভাত সময়ে ৯৯ ডিগ্রিতে নামিল। রাত্রি ৪টার ট্রেনে যদুবাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেখিবার পূর্ব্বে আরও ২০ গ্রেন কুনাইন দিতে হইবে। তখন ডাক্তারেরা চলিয়া গিয়াছেন। গিরিজা গিয়া তখনই আবার ২০ গ্রেন খাওয়াইয়া দিল। তাহার পর তিনি দেখিয়া বলিলেন—"ডাক্তারেরা ছেলেকে মারিয়া ফেলিত। তুমি জিদ করিয়া কুইনাইন দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছ।" সে দিন শিশু ৯০ গ্রেন কুইনাইন খাইয়াছিল! তার পরদিন একটুক জ্বর হইয়া, আর জ্বর হইল না। কিন্তু তাহার দক্ষিণ কুক্ষিতে যে ফোড়া হইয়াছিল, তাহা কোনও মতে সারিল না। প্রায় ৫ মাস যন্ত্রণা ভোগ ও বহু অর্থব্যয়ে উহা সারিল না। আবার যদুবাবু আসিয়া ঘায়েও কুইনাইন দিয়া সারাইলেন। কুইনাইন তাঁহার মতে সর্ব্বরোগের একমাত্র ঔষধ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্‌"।

আমার হাতার পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া চূর্ণী প্রবাহিতা। গঙ্গা পূর্ব্বে এ পথে প্রবাহিতা ছিলেন। প্রবাদ, 'রাণা' নামক এক ব্যক্তির এখানে এক 'ঘাট' ছিল বলিয়া স্থানটির নাম 'রাণাঘাট'। গঙ্গা যে সরিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও বর্ষার সময়ে বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সরিয়া, তাঁহার এই চূর্ণী বা রেখামাত্র রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়া, বোধ হয় এই ক্ষুদ্র নদীর নাম 'চূর্ণী'। তাহাতে বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে সামান্য একটুক জল থাকে। রাণাঘাটের লোক এই জল পান করে, এবং উহার অত্যন্ত প্রশংসা করে। আমি বঙ্গদেশের (High Lander) (পর্ব্বতবাসী) কখনও নদীর জল খাই নাই। এ জলই কি আমাদের জ্বরের ও অসুস্থতার কারণ? আমার সন্দেহ হইল। আমরা জেলের 'ইনারা'র জল খাইতে লাগিলাম. আর এই হইতে জ্বর হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধার লাভ করিলাম। তথাপি কুইনাইন সর্ব্বদা আমার পকেটে থাকিত। ঘোড়ায় কোথায়ও যাইতেছি, কুইনাইন পকেটে আছে। যদি একটুক

শরীর কেমন কেমন বোধ হইল, অমনি ঘোড়া থামাইয়া বড়ী একটা গিলিয়া ফেলিলাম। এরূপে হাতে-কুইনাইনে রাণাঘাটে দুই বৎসর কাটাইয়াছিলাম।

অতলে

"Ingratitude thou marble hearted fiend!"—Shakespeare.

পূর্ব্বে আমার বিবাহ উপাখ্যানে বলিয়াছি যে, পিতা যদিও এরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন যে, আমার কলিকাতার পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছিলেন না, তথাপি যখন দীনহীনা শাশুড়ী তাঁহার এক হস্তে আমার ভার্য্যাকে ও অন্য হস্তে তাঁহার কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় শিশুপুত্র রজনীকে তুলিয়া দিলেন, পিতা অম্লানমুখে বলিলেন—"আজ হইতে এই মেয়ে ও ছেলে দুইটি আমার হইল,' এবং দুটিকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সে ও তাহার মাতা সেই অবধি পিতার দ্বারা, এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পর হইতে আমার দ্বারা প্রতি-পালিত হয়। তাহার বিবাহচিন্তায় আমার শাশুড়ী কিরূপে অসাবধানে আমার জ্যেষ্ঠ শিশুটিকে মাদারিপুরে পদ্মার গর্ভে ভাসাইয়া দেন, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যখন বেহারে, রজনী তখন কলিকাতায় বি. এ. পড়িতেছিল এবং তাহার চরিত্রদোষে আমার কষ্টো-পার্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছিল। রজনীর চরিত্র আমার স্ত্রীর বিপরীত। সে শান্ত, স্থির, বিনয়ী ও মধুরভাষী। এ সকল যে কেবল ছলনার ও চতুরতার আবরণ মাত্র, তাহা তখন জানিতাম না। সে এক বার বেহারে আসিয়া বলিল যে, কলিকাতার একজন ধনী লোক এই নিয়মে বালকদের বিলাত পাঠাইতেছেন যে, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া উপার্জ্জন করিয়া তাঁহার টাকা পরিশোধ করিবে। আমি বলিলাম যে সে শৈশবে যেরূপ তীক্ষ্মবুদ্ধি ছিল, আমি তাহাকে 'সিবিল সার্ভিসে'র জন্য বিলাত পাঠাইব কল্পনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এণ্ট্রেন্স ও এফ. এ. পরীক্ষার ফলে নিরাশ হইয়া আমি সেই সংকল্প ত্যাগ করিয়াছি। তবে সে অন্যের সাহায্যে যদি যাইতে পারে, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তাহার পরের বার বেহারে সে আসিলে যখন এই কথা উত্থাপিত করিলাম, সে বলিল যে, ঐরূপ সাহায্যের কথা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা প্রকৃত নহে। অতএব সে বিলাত যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছে।

ইহার কিছু দিন পরে তাহার মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী বাড়ী হইতে পত্র লিখিলেন যে, দেশের প্রধান জমিদারের কনিষ্ঠা কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে। এ পরিবারটির প্রতি আমার পুরুষানুক্রমিক অশ্রদ্ধা। তাহার কারণ, তাহাদের অসামাজিকতা ও মনুষ্যত্বহীনতা। আমি তাহাতে অসম্মত হইলাম। তাহার মাতা ও ভগিনী চটিয়া লাল হইলেন। মাতা লিখিলেন যে, এখানে বিবাহ না হইলে তিনি কাশীবাসিনী হইবেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাহার উপর বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন যে, এত বড় জমিদারের কন্যার সঙ্গে তাঁহারা বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তাহাতে আমি অসম্মত হইলাম। আমি যেন মণি মাণিক্য লইয়া তাহাকে বিবাহ দিয়া আসি। আমি তাহাতেও টলিলাম না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে এক বার ষ্টীমারে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা যাইবার সময়ে আমার স্ত্রীর ও শাশুড়ীর তাড়নায় আমি কন্যার পিতা ও মাতার কাছে—ইহাঁরা আমার আত্মীয়—এই বিবাহের প্রস্তাব করিলে, তাঁহারা তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—"যাহার বাড়ী ঘর পর্য্যন্ত নাই, তাহাকে তাঁহারা কিরূপে মেয়ে দিবেন।" শেষে রজনী নিজেও স্ত্রীর কাছে এ বিবাহে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিল, এবং আমার মনসা আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। রজনী এ পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য করে নাই। সে আমার বড় অনুগত ছিল। অতএব তাহার এই আগ্রহে আমি বিস্মিত হইলাম। আমি তখন বলিলাম—"এ বিবাহে যে শুভ হইবে, আমার বিশ্বাস

নাই। আমার হৃদয়ে কিরূপ করাল ছায়া পড়িতেছে। তথাপি যখন রজনীর পর্য্যন্ত আগ্রহ, আমি আর ইহার প্রতিবন্ধক হইব না।" কিন্তু জমিদার মহাশয় সহজপ্রকৃতির লোক নহেন। তিনি আমার কাছে টেলিগ্রাফ করিলেন—"আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, আপনি রজনীর জীবিকার উপায় করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিবেন ও তাহার স্ত্রীকে কখনও বিদেশে লইবেন না, তবে আমি তাহাকে আমার কন্যা বিবাহ দিতে পারি।" এ স্বার্থপরতা ও নীচতায় আমি মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি ধনী, আমি দরিদ্র। তিনি জমিদার, আমি চাকরিদার। আমি তাঁহার জামাতার জীবিকার উপায় করিয়া দিবার ভার লইব, কিন্তু খবরদার! তাহার স্ত্রীকে কখনও আমার কাছে বিদেশে আনিতে পারিব না! যাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সামাজিকতা, শিষ্টাচার ও মনুষ্যত্ব আছে, সে কি কখনও এরূপ প্রস্তাব করিতে পারে? কিন্তু স্ত্রী কুপিতা ফণিনীর মত ফণা তুলিয়া আছেন। কি করিব, আমি এই দাসখতও স্বীকার করিলাম। শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। বিবাহের 'দশ রাত্রি'র মধ্যেই আমার ভবিষ্যৎবাণী ফলিল। জমিদার মহাশয়ের আদর্শ পরিচারক ও পরিচারিকার শিক্ষামতে নববধূ পাগলিনী সাজিয়া, শাশুড়ীকে এক প্রস্থ প্রহার করিয়া, তাঁহার কাশীযাত্রার সাধ মিটাইলেন। তাহার পর জামাতা শ্বশুর মহোদয়ের কাছে পত্র লিখিল যে, সে আমার অনভিমতে বিবাহ করিয়াছে। সে কিরূপে এখন তাঁহার জামাতা হইয়া, তাহার কলিকাতার অধ্যয়নের ব্যয় আমার কাছে চাহিবে? তিনি নির্লজ্জের মত আমাকে দাসখত স্মরণ করাইয়া দিয়া লিখিলেন যে, "রজনী তাঁহার জামাতা হইলেও আমি তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিব। কারণ, আমি মহৎ ব্যক্তি।" আমি লিখিলাম—'জীবিকা নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিবার' অর্থ আমি এই বুঝিয়াছিলাম যে, তাহার শিক্ষা তিনি শেষ করাইয়া দিলে, তাহার কোনওরূপ চাকরির সাহায্য করিব। সোজাসুজি তাঁহার জামাতার শিক্ষার ব্যয় আমাকে বহন করিতে হইবে, এ কথা কেমন করিয়া লিখিবেন, তাই তিনি এরূপ কূটভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখন ঊর্ণনাভ আপনার জালে আপনি পড়িলেন। আর আমার মহত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিলাম যে, তাঁহার মত ধনীর জামাতার পড়ার খরচ দিয়া মহত্ত্ব দেখাইবার ক্ষমতা আমার মত দরিদ্রের নাই। তখন তিনি বড় সঙ্কটে পড়িলেন। আমি রজনীকে মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা করিয়া দিতেছিলাম। তিনি অনেক লেখালেখির পর জামাতার পত্রে ক্ষত-বিক্ষত-হৃদয় হইয়া, অবশেষে মাসিক পনর মুদ্রা সাহায্য মাত্র বহু কষ্টে স্বীকার করিলেন! হায় রূপচাঁদ! তোমার কি মাহাত্ম্য! রজনী এই বদান্যতার উত্তরে লিখিল যে, কলিকাতায় দানা খাইয়া থাকিলেও পনর টাকায় তাহার কুলাইবে না। সে আমাকে লিখিল যে, সেই কারণে এরূপ কৃপা-পাত্রের পনর মুদ্রা সাহায্য সে অস্বীকার করিয়াছে। অতএব আমি পূর্ব্ববৎ টাকা যোগাইতে লাগিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে বেহারে বৌদ্ধদিগের 'নালন্দ' (বর্ত্তমান 'বড়গাঁও') গ্রামে শিবিরে আছি। সন্ধ্যার পর ডাক আসিল। কলিকাতা হইতে আমার পিসতুত ভাই নগেন্দ্র লিখিয়াছে যে, রজনী সেই সপ্তাহের ষ্টীমারে বিলাত পলায়ন করিয়াছে। আমার স্ত্রীর সে সময়ে কৃষ্ণপক্ষ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত তাঁহার জীবনেও শুক্ল কৃষ্ণ দুই পক্ষ আছে। ভাল মানুষের মত কথা কহিতেছেন, ইহার মধ্যে একটুক কথার ব্যতিক্রম হইলে, কি পান হইতে চূণ খসিলে, অমনি তাঁহার ক্রোধের ও মানের কৃষ্ণপক্ষ আরম্ভ হইল, এবং তিনি শয্যা লইলেন। মুসলমানেরা এক রাত্রিতে দুই বার খাইয়া ত্রিশ রোজা করে, তিনি একবারও না খাইয়া তাহা পারেন। একবার বার দিন এরূপ নির্জ্জলা একাদশী করিয়াছিলেন। আমি নগেন্দ্রের পত্র পড়িয়া তাঁহাকে বলিলাম—"এবার মানের পালাটা এখানে শেষ কর। এ দিকে সংবাদ গুরুতর। তোমার ভ্রাতা বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।" মান শোকে পরিণত হইল। তিনি শয্যা হইতে চীৎকার করিয়া তীরবৎ উঠিয়া, শিবিরের গালিচায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া, ভ্রাতার উদ্দেশে বহু ছন্দে বন্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম যে, এ সচীৎকার রোদনে বি. আই. ষ্টীমার থামিবে কি না, আমার বড় গুরুতর

সন্দেহ আছে। উহা ত্যাগ করিয়া এখন একটা কর্ত্তব্য স্থির করা উচিত। দুজনে প্রথমে ভাবিতে লাগিলাম, রজনী টাকা কোথায় পাইল। পরে শুনিলাম, তাহার যে খানিকটা জায়গা ছিল, তাহা তাহার মাতুলের কাছে বন্ধক দিয়া কিছু টাকা লইয়াছিল। আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া কলিকাতার ব্যয় লইয়া, তাহার শ্বশুর হইতেও মাসে মাসে সেই পনর মুদ্রা উশুল করিয়া উহা জমা করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে আমার স্ত্রীর অলঙ্কারের জন্য এক জাল চিঠি আমার পুস্তকবিক্রেতাকে দেখাইয়া দুই শত টাকা লইয়াছিল। এই সকল টাকার দ্বারা তিনি বিলাতে পাড়ি যোগাইয়াছেন। এ সকল কথা তখন জানিতাম না। অতএব দুজনে ভাবিলাম, বুঝি তাহার শ্বশুর টাকা দিয়াছেন ও বিলাতের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, আমার তাহা বড় বিশ্বাস হইল না। এমন সময়ে তাহার শ্বশুরের এক টেলিগ্রাফ আসিল—"নগেন্দ্র (ইনিও তাঁহার জামাতা) টেলিগ্রাফ করিয়াছে যে, রজনী বিলাত যাত্রা করিয়াছে। আমি তাহার খরচ দিব না। আপনি তাহাকে দয়া করিয়া ফিরাইয়া আনুন। আপনার ক্ষমতা আছে।" সকল সন্দেহ ঘুচিল। বুঝিলাম, শ্বশুরের ভরসায় তিনি যান নাই। আশঙ্কা হইল, বুঝি এ বোঝা আমার স্কন্ধে পড়িবে। দেখিলাম, তাহার শ্বশুরের বিশ্বাস, আমি পরামর্শ দিয়া তাহাকে পাঠাইয়াছি। দেখিলাম আমি এমন দীর্ঘবাহু নহি যে, বেহারের বড়গাঁও গ্রামে বসিয়া ষ্টীমারখানি সমুদ্রগর্ভ হইতে ধরিয়া আনিতে পারি। আমি তাঁহাকে টেলিগ্রাফে উত্তর দিলাম যে, আমি তাহার বিলাত যাত্রার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না এবং তাহাকে সমুদ্র হইতে ফিরাইয়া আনাও আমার অসাধ্য। তাহার পরদিন আমার ভাইরাভাইয়ের এক টেলিগ্রাফ আসিল—"তুমি রজনীকে বিলাত পাঠাইয়া বড় অন্যায় করিয়াছ। তাহাকে ফিরাইয়া আন। আমি তাহার খরচ দিব না।" আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। ইনি তাঁহার জীবনে কখনও সিকি পয়সা দিয়া রজনীর সাহায্য করেন নাই। অথচ তিনি আমাকে এই ধমক দিয়া কর্কশ টেলিগ্রাফ করিয়াছেন! আমি তাঁহাকে তীব্র বিদ্রূপাত্মক এক পত্র লিখিলে তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, তিনি ঐ টেলিগ্রাফের কোনও খবরই রাখেন না!

আমার কোনও বন্ধুর শিশুকে তাহার মাতা ভর্ৎসনা করিলে সে বলিত, —"বা বুদ্ধিমান্!" শুনিলাম, জামাতার বিলাত-প্রয়াণ-সংবাদ প্রাপ্তির ও আমার কাছে টেলিগ্রাফ নিষ্ফল হইবার পর গভীরা রজনীতে জমিদার শ্বশুর মহাশয়ের বাসায় চট্টগ্রামের 'বা বুদ্ধিমান্'দের এক সভা বসিয়া গিয়াছিল। যাঁহার বুদ্ধির লাঙ্গুল সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তিনি একজন তান্ত্রিক। তিনি যথাতন্ত্র স্থির করিলেন যে, জামাতার নামে শ্বশুর মহাশয় একটা মিথ্যা চুরির মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া, জামাতাকে ওয়ারেণ্টের দ্বারা সমুদ্রগর্ভে হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনুন। অন্যান্য 'বা বুদ্ধিমান্'গণ সাধু সাধু বলিয়া এই বিজ্ঞ প্রস্তাবে সায় দিলেন। উকিল ঢক্কাদাসবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, শেষে মিথ্যা ফৌজদারি অভিযোগের জন্য শ্বশুর মহাশয় জেলে যাইতে প্রস্তুত আছেন? তাও ত বটে! তখন লাঙ্গুলধারী নং ২, যাঁহার 'মহাফেজি' স্ফীতোদর তাঁহার বেতনের ক্ষুদ্রত্বের ক্ষতিপূরণ করিয়া রাখিয়াছে, তিনি প্রস্তাব করিলেন, কোনও বিধবার ঘড়ী চুরি করিয়া জামাতা বিলাত পলায়ন করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিলে, ফৌজদারির আইন বিধবার প্রতি খাটিবে না। আবার সাধুবাদের ধ্বনি উঠিল। এক বিধবার কাছে তৎক্ষণাৎ দূত গেল, কিন্তু বিধবা এ প্রস্তাবের মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বলিল যে, সে একটি ভদ্রলোকের ছেলের নামে এরূপ একটা মিথ্যা মোকদ্দমা করিতে যাইবে কেন? তাই ত—সে যাইবে কেন? সে ত তাহার ধনপতি শ্বশুর, কি তস্য বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী নহে! উকিল ঢক্কাদাস আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখন শেষ পরামর্শ স্থির হইল যে, যখন শ্বশুর মহাশয় তস্য জামাতার জন্য পনর টাকার বেশী পড়ার খরচ 'হা হতোঽস্মি! হা দগ্ধোঽস্মি!' করিয়াও দিতে পারেন নাই, তখন আমি দরিদ্র যে তাহাকে মাসে ত্রিশ চল্লিশ টাকা দিয়াছি, তাহা

তাঁহাদের দীর্ঘ ও সূক্ষ্মবুদ্ধি-সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব নিশ্চয় আমার ভায়রাভাই ইহার অংশ দিয়াছেন, এবং জামাতার বিলাতের খরচেরও অংশ দিবেন। এই সিদ্ধান্তবলে তাঁহার নামে আমার কাছে ঐ জাল টেলিগ্রাফ তন্ত্রশাস্ত্রমতে প্রেরিত হইয়াছিল। এ সকল পরামর্শ না করিয়া যদি শ্বশুর মহাশয় তিমিঙ্গিল-রূপ ধারণ করিয়া, সমুদ্র সন্তরণ করিয়া, বিলাতের জাহাজখানি সেই 'প্রলয়প্রয়োধিজলে' ধরিয়া রাখিতেন, তবে বরং কাজ হইত। তিনি না পারেন, নিশ্চয় তান্ত্রিকচূড়ামণি পারিতেন। কারণ, তিনি প্রত্যহ 'ত্বরিতানন্দে'র কৃপায় 'কারণসমুদ্রে*' ভাসিয়া শর্ব্বরী অতিবাহিত করিতেন। এ সকল পরামর্শ যে তান্ত্রিকের চক্রের মত বড় গোপনে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ঢক্কাদাস রাস্তায় বহির্গত হইয়া পথের লোককে ও তাহার উভয় পার্শ্বের গৃহবাসীদিগকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া এই গুপ্ত সমাচার বিতরণ করিতে করিতে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। কাহারও কোনও কথা চট্টগ্রামে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইলে উহা গোপনীয় কথা বলিয়া তাঁহাকে বলিলেই হইল। যথাসময়ে ডাকে এ সকল গুপ্ত তত্ত্ব আমার কাছে উপস্থিত হইল। আমি তখনই টেলিগ্রাফ আফিসে পত্র লিখিয়া জাল টেলিগ্রাফটি আবদ্ধ করাইলাম। সংবাদ শুনিয়া চট্টগ্রামের 'বা বুদ্ধিমান্' দল ফৌজদারি মোকদ্দমার আশঙ্কায় হতভম্ব হইলেন।

এ দিকে বি. আই. ষ্টীমার মান্দ্রাজ পৌঁছিল। সেখান হইতে রজনীকান্ত লিখিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর ধনী লোক, তাঁহার বিলাতের খরচ দিবেন, এই আশায়ই তিনি আমার অমতে তাঁহার শ্বশুরের কন্যার শুভ পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। (এতদিনে তাঁহার বিবাহের রহস্য বুঝিলাম)। কিন্তু মান্দ্রাজে তিনি তাঁহার শ্বশুর হইতে যে টেলিগ্রাফ পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শ্বশুর তাঁহার সাহায্য করিবেন না বলিয়া কবুল জবাব দিয়াছেন। তিনি জানেন যে, তাঁহার বিলাতের ব্যয়ভার গ্রহণ করি, এমন অবস্থা আমার নহে। তথাপি টেনিসন 'কোট' করিয়া লিখিয়াছেন যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুন্দুভি তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে। তিনি ফিরিবেন না, বরং ইংলণ্ডে তুষারাবৃত সমাধিতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিবেন। মাসেক পরে ষ্টীমার ইংলণ্ডে পৌঁছিল। তিনি যথাসময়ে সেই সংবাদ তাঁহার শ্বশুরকে ও আমাকে লিখিলেন। শ্বশুর আমাকে এ বারও লিখিলেন যে, এখনও ভাল, আমি রজনীর কাছে পত্র লিখিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনি। তিনি তাহার বিলাতের খরচ দিবেন না। আমি লিখিলাম যে, আমি লিখিলেই যে রজনী ফিরিয়া আসিবে, সে বিশ্বাস আমার নাই। আর ফিরিয়া আসিলেই বা কি হইবে? জাতিও যাইবে, পেটও ভরিবে না। তিনি তখন 'রক্ত-বিস্ফুটিতেক্ষণ' করিয়া আমাকে লিখিলেন যে, আমি ও তিনি তাহার আত্মীয় থাকিতে চট্টগ্রামে তাহার জাতি মারিবে, সাধ্য কার! এ সকল কথা লিখিয়া, ফিরিয়া আসিবার জন্য এক পত্র আমি রজনীকে লিখিয়া, শ্বশুর মহাশয়ের কাছে পাঠাইলাম। অন্যথা তাঁহার বিশ্বাস হয় না। তিনি তাহা পাঠাইলেন। কিন্তু জামাতা 'শ্বশুরমন্দিরং' অপেক্ষা তুষার-সমাধি সঙ্কল্প করিয়া তাহার তীব্র উত্তর দিলেন। এরূপে কয়েক মাস পত্র লেখালেখিতে গেল। শ্বশুর মহাশয়ের পত্রে তখন মহাসহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, আমাকে এক পত্র লিখিয়া, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপে ইংলণ্ডে আছেন, গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি ইঁহাকে তখন বড় ভালমানুষ বলিয়া জানিতাম। আমি তাঁহাকে লিখিলাম, ইংলণ্ডে উপবাসে মরিবে বলিয়া আমি তাহাকে এ পর্যন্ত মাসে মাসে এক শত টাকা পাঠাইয়াছি। ইহা যে একটা চতুরতা, আমি তাহা জানিতাম না। শ্বশুর মহাশয় যেই এই সংবাদ শুনিলেন, অমনি 'মা ভৈঃ' বলিয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, আর ভয় নাই। আমি তাঁহার জামাতাকে মরিতে দিব না; তাহার বিলাত খরচস্বরূপ হিমালয়ভার বহন করিয়া তাহার জীবনোপায় করিয়া

* তান্ত্রিকেরা গাঁজাকে 'ত্বরিতানন্দ' এবং মদকে 'কারণ' বলে।

দিব। পরের খরচে 'বেরিষ্টার' জামাই হইবে, ইহার অপেক্ষা সুবিধার কথা আর কি হইতে পারে। অতএব তিনি এবার তাহাকে দৃঢ়ভাবে লিখিলেন—"আমি তোমার বিলাতের খরচ দিব না। আমি আজ হইতে মনে করিব, **আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে।**" একেবারে প্রবাদের শ্রীহট্টবাসীর প্রতিজ্ঞা—"মৃত্যু চিরা খাইমু, তবু সিল্‌হট্টর পানি ন যাইমু।"

আমি তাই বলিয়া থাকি—যাহার টাকা নাই, সে দরিদ্র; যাহার টাকা আছে, সে মহাপাপিষ্ঠ। আমি রজনীকে শৈশব হইতে মানুষ করিয়াছি। কেমন করিয়া তাহাকে বিলাতে মরিতে দিব? স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করিবে?" আমি মৃণালিনীর মত উত্তর দিলাম—"ডুবিয়া মরিব।" আমার তখন চারি শত টাকা মাত্র বেতন। স্কন্ধে দুই সহোদর ভ্রাতা ও এক খুড়তুত ভ্রাতা ও তাহাদের পরিবার, তদ্ভিন্ন ভগিনী মাসী পিসী ইত্যাদি লইয়া একটা বৃহৎ সংসার। তথাপি শ্রীভগবানের ও স্বর্গীয় পিতার দিকে চাহিয়া এই অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। মাসিক এক শত পঞ্চাশ টাকা যেন উপবাস করিয়াও পাঠাইলাম, কিন্তু ব্যারিষ্টারের 'ইনে' ভর্ত্তির ফিস এক শত পঞ্চাশ পাউন্ড, তখন ১৮০০ টাকা! এ টাকা কোথায় পাইব? শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সে সময়ে বেহার হইতে বদলি হইলাম। সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া এ টাকাও পাঠাইলাম। ভাগলপুরে একখানি তক্তাপোষ মাত্র আমাদের চারি মাস সম্বল ছিল।

আমি জলের তলে আমার আত্মহত্যা ভিন্ন আর কিছুই দেখিয়াছিলাম না। আমার স্ত্রী মৃণালিনীর মত রত্ন দেখিতেছিলেন রাশি রাশি—তাঁহার নিজের সোনার নাক, রূপার চোক, হীরার কাণ, বাপের শূন্য ভিটায় অট্টালিকা, তথায় দোল-দুর্গোৎসব ও তাঁহার বাহু নাড়া, আরও কত কি! এ আকাশদুর্গের আমি একখানি ইট খসাইতে চাহিলেও তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া আমার প্রতি এ আত্মবিসর্জ্জনের জন্য কৃতজ্ঞতা নহে, অগ্নি বর্ষণ করিতেন। এ দিকে তাঁহার ভ্রাতা বিলাতে আমার হৃদয়ের রক্ত শোষণ করিয়া 'নেটিভ প্রিন্স' সাজিয়া লীলা করিতে লাগিলেন। দুই বার দুই পরীক্ষা পাস করিয়াছেন বলিয়া লিখিলেন। স্ত্রী হুলুধ্বনি দিলেন, কাংস্য ঘণ্টা বাজাইলেন। তাহার পর সংবাদ আসিল যে, তিনি নহে, তাঁহার নামধেয় অন্য একজন পাস হওয়াতে তিনি ভুলক্রমে এরূপ সংবাদ দিয়াছিলেন। তখন বিলাতি 'বারে'র পরীক্ষা নামমাত্র ছিল। কেবল বার 'টারম্' ডিনার খাইলেই হইল। তাঁহার দুই বৎসর দশ মাসে ফিরিবার কথা। ছয় বৎসর এরূপে অতিবাহিত হইল। শেষে এখানের পত্নীকে শ্বশুর মহাশয় বিধবা করাতে, সেখানে দ্বিতীয়া এক সধবা পত্নীর যোগাড় করিয়া পত্র পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। আমিও টাকা বন্ধ করিলাম। স্ত্রীর অশ্রু ধারায় বহিতে লাগিল। তাহার পর মিস্ মেনিং ও এক জন মিশনারির দ্বারা পরিচিত মিসেস্ হেমিল্টন-নামিকা একটি খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রাণা রমণীর কৃপায় তাঁহার উদ্দেশ পাইলাম। ছয় বৎসরে সেই নামমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বার' প্রবেশ করিতে ও ফিরিয়া আসিতে ২০০০ টাকা তলব করিলেন। এ দিকে অর্থাভাবে অচিকিৎসায় আমার বাম কর্ণ ও বাম পদ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এবং চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। চিকিৎসা দূরে থাকুক, তাঁহার টাকা যোগাইতে পারিব না বলিয়া ছুটি পর্য্যন্ত লইতে পারি নাই। রুগ্ন কর্ণ, চরণ ও দেহ লইয়া সবডিভিসনের খাটুনি খাটিতেছি। যাহা হউক, এরূপে মরিয়া, না খাইয়া, কোনওরূপে তাঁহার মাসিক খরচ বেতন হইতে যোগাইতেছিলাম। কিন্তু এখন ২০০০ দুই সহস্র টাকা একসঙ্গে কোথায় পাইব? অগত্যা তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের কাছে আবার দরখাস্ত উপস্থিত করিলাম। লিখিলাম, তাঁহার জামাতা পাস হইয়াও দেশে ফিরিতে পারিতেছেন না। আমি ১২০০০ বার হাজার টাকা দিয়াছি। আমার হাতে আর এক পয়সাও নাই। এমন কি, অর্থাভাবে চিররোগগ্রস্ত হইয়াছি। আরম্ভে বিলাতের খরচ তাঁহার কাছে চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কত? অনুমান ১০,০০০ দশ হাজার টাকা, শুনিয়া তিনি

মধ্যমনারায়ণ তৈল মাথায় দিয়াছিলেন। দশ হাজার টাকা! তাই তিনি লিখিয়াছিলেন—
—"তো—বা! আমি ১০,০০০ টাকা দিতে পারিব না। আমার মেয়ে বিধবা হইয়াছে মনে করিব" এবার জামাতা পাস হইয়াছে, ব্যারিস্টার হইয়া বাড়ী আসিতেছে, অতএব কিছু শিষ্টাচার দেখান উচিত মনে করিয়া, কত টাকা আবশ্যক জিজ্ঞাসা করিলেন। যেই শুনিলেন যে ২০০০ টাকা, তিনি আবার কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন—"তোবা! এত টাকা দিতে পারিব না। তার পর এক দিকে কুটুম্বিতা রক্ষার জন্য, অন্য দিকে আমাকে শৃঙ্খলিত করিবার জন্য লিখিলেন—তিনি তাঁহার জামাতাকে সাহায্য করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন না। যদি আমার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া আমি নিজে কর্জ্জ চাহি, তবে তিনি দিতে পারেন। মন্দ কি? আগতপ্রায় জামাতারও মন রক্ষা করা হইল, টাকাটাও নিরাপদ্ হইল, তাহার উপর সুদও পাওয়া যাইবে। মানুষ যে এত দূর মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে, আমি বিশ্বাস করিতাম না। আমি তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সম্মত হইলাম। কিন্তু তিনি সত্য সত্যই আমার বাড়ী ভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক লইয়া, ২০০০ টাকা আমাকে কর্জ্জ দিলেন! তাঁহার জামাতা আমার এই অপমানপূর্ণ ঋণের দ্বারা ফিরিয়া আসিলেন। আর কলিকাতা পেঁছিবা মাত্র সর্ব্বাগ্রে সহৃদয় শ্বশুর মহাশয় আনন্দে অভ্যর্থনা করিয়া টেলিগ্রাফ করিলেন—"তুমি অন্য কোথাও না গিয়া, ঘরের ছেলে একবার আমার ঘরে আইস, এবং আমার ঘরে থাকিয়া চট্টগ্রামে ব্যবসা কর।" পরের টাকাতে জামাতা ব্যারিস্টার হইয়া যখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং আর টাকা দিতে হইবে না, তখন আর 'ধর্ম্ম' নষ্টের ভয় নাই। কাজেই যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ও আধমরা হইয়া জামাতাকে ব্যারিস্টার করিয়া আনিয়াছে, সে পাপিষ্ঠের কাছে না গিয়া—কি জানি, সে যদি টাকা চায়—সোনার চাঁদ আমার, তুমি একবারে "অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুর-মন্দিরে" আইস! কিন্তু জামাতা তাহা পারিলেন না। তাঁহার বিলাতি লীলার ফলে এক উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া এক মাস কলিকাতায় জনৈক বন্ধুর গৃহে পড়িয়া রহিলেন। তাহার পর ছয় বৎসর আমার হৃদয়-শোণিত শোষণের পর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেনী আসিয়া পেঁছিলেন। তাঁহার জননী তাঁহাকে বক্ষে লইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার পতিও আসিলেন। ছয় বৎসরের অবর্ণনীয় দুর্গতি ভুলিয়া দুটা দিন আনন্দে কাটাইলাম।

আমি তাঁহার কাছে যে টাকা পাঠাইয়াছিলাম ও শ্বশুরের নিকট ২০০০ টাকা কর্জ্জ, তাহা ধরিয়া তাঁহার বিলাতখরচ শোধ ১৭০০০ টাকা হইল। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা 'বিধবা' পত্নীর কাছে পত্রে লিখিলেন যে, তিনি আমার সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই টাকা যোগাইতে গিয়া অর্থাভাবে অচিকিৎসায় আমার স্বাস্থ্য গিয়াছে, আমি একপ্রকার দুই অঙ্গহীন হইয়াছি। আমার চট্টগ্রামের অট্টালিকা সংস্কারাভাবে ধরাশায়ী হইয়াছে। অর্থাভাবে উহা পুনঃ প্রস্তুত করিতে পারি পাই। অতএব তাঁহার কুবেরতুল্য ধনবান্ পিতার দ্বারা পত্নী তাঁহাকে এই ঋণ হইতে মুক্ত করুন এবং তিনি ফেনী চলিয়া আসুন। তিনি পত্নী সহ রেঙ্গুনে গিয়া ব্যবসা করিবেন। পতিপ্রাণা 'বিধবা' পত্নীর কঠোর সংসার-জ্ঞান পূর্ণ এক উত্তর আসিল। বলা বাহুল্য যে, এই প্রণয়লিপির মুসাবিদা তাঁহার পিতার। তাহাতে লেখা আছে যে, উক্ত পিতৃদেবের বৈষয়িক অবস্থা তখন বড় শোচনীয়। তিনি এ ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম। আর আমি যেরূপ মহৎ লোক, যে টাকা তাঁহার জামাতাকে দান করিয়াছি, তাহার আর প্রতিদান চাহিব না। নিতান্ত চাহি, তবে উক্ত বিধবা পত্নীর পতি চট্টগ্রামে ব্যবসা করিয়া তাহা শোধ করিলেই হইবে। পত্নীর শুভাগমন, কি বিরহ-বিধুর স্বামীর সহিত সম্মিলন সম্বন্ধে কোনও কথাই পত্রে লেখা নাই। অতএব স্বামী তিন মাস এরূপ প্রণয়লিপিতে কাটাইয়া, এবং আমার কাছে কিঞ্চিৎ আইন শিক্ষা করিয়া—কারণ, বিলাতে কিছুই শিক্ষা করেন নাই—সর্ব্বশেষ ফেনীতে ও কলিকাতায় আরও কিছু লীলা করিয়া,

বিরহ-কাতর হৃদয়ে রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন। কয়েক মাস স্বনামখ্যাত এক ব্যারিষ্টার বন্ধুর আশ্রয়ে ও সাহায্যে ব্যবসা করিয়া, পূজার বন্ধে আমার নয়াপাড়া গ্রামস্থ বাড়ীতে আসিলেন। অমনি শ্বশুর মহাশয়ের দৌলতখানায় আবার 'বা বুদ্ধিমান্'দের সভা বসিল। এবার আমার দুই আত্মীয় এবং আশৈশব বন্ধু চন্দ্রকুমার ও অখিলবাবুও শ্বশুর মহাশয়ের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহাদের এত ভক্তি করিতাম, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ তাঁহাদের হৃদয়ের কোণায় কোথায় আমার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। তাহা সংসারে প্রবেশ করিয়া অবধি ফুটিয়া উঠিতেছিল। আমি এরূপ একটি আত্ম-বিসর্জ্জনের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম। তাহাতে আবার রজনীকান্ত তাহার পত্নীকে তাহার পিতার আকাঙ্ক্ষামতে বিধবা না করিয়া, কৃতকার্য্য হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। তাহার উপর আবার শ্বশুর হইতে ১৭,০০০ টাকাটা আদায় করিয়া আমাকে দিবে,—তাঁহাদের গাত্র-দাহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা শ্বশুর মহোদয়ের সঙ্গে ষড়্যন্ত্র করিলেন যে, আমার প্রতি-কূলে একটা সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করিবেন, এবং কপর্দ্দকও আমাকে না দিয়া, দাঁতে তৃণ লইয়া, রজনীকান্তের বিধবা পত্নীকে আনিয়া সধবা করিতে আমাকে বাধ্য করিবেন। আমি রজনীকে লইয়া দাদা অখিলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার দেবসদৃশ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৈলাসবাবুর মৃত্যু হইয়াছিল। আমি তাহার শিশু পুত্রকে বুকে লইয়া কাঁদিতেছিলাম। আর সেই সময়ে দাদা বলিলেন, তাঁহার টেবিলের উপর একখানি পত্র পাইয়াছেন। পত্র রজনীর শাশুড়ীর। তাহাতে লেখা আছে, তাঁহার কন্যাকে পাঠাইলে 'যদি ভোগ করিয়া দখল না করে' তবে কি হইবে? অর্থাৎ ভোগ করিয়া, জাতি মারিয়া, রজনী যদি পত্নীকে সধবা না করিয়া, পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়, ইহাই 'বা বুদ্ধিমান্'দের আশঙ্কা। আমরা উভয়ে 'ভোগে'র কথায় লজ্জায় মাথা হেট করিলাম। আমি পরে বলিলাম, যদি এরূপ পত্র তাঁহার কাছে আসিয়া থাকে, ভালই হইয়াছে। আমি টাকা চাহি না। তিনি মধ্যস্থ হইয়া রজনীর স্ত্রীকে আনাইয়া দেন। সে তাহাকে লইয়া রেঙ্গুন চলিয়া যাউক। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, কেমন করিয়া পত্রখানি তাঁহার টেবিলের উপর আসিল, তিনি জানেন না। তিনি এরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। যাহা হউক, তিনি চেষ্টা করিয়াও নয়াপাড়ায় সামাজিক গোলযোগ করিতে পারিলেন না। বংশীয়েরা দলাদলি না করিয়া বরং রজনীকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিলেন। এমন কি, প্রাচীন পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র মহাশয় পর্য্যন্ত তাঁহার বাড়ীর নবমীর নিমন্ত্রণে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে চাহিলেন। আমি গোল-যোগের আশঙ্কায় তাহাতে অসম্মত হইলে তিনি শিষ্টাচারের অনুরোধে নবমীর নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর তৃপ্তি হইল না। তিনি সর্ব্বদা নাসিকা বাহির করিয়া, তাঁহার পুত্রের সঙ্গে কে তামাক খাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রের এক চোটে সমাজে উঠিবার এমন একটা সুযোগ আমি নষ্ট করিলাম, তিনি চটিয়া লাল হইলেন ; এবং আমি ফেনী ফিরিয়া গেলে, তিনি আমার পত্নী ও রজনীকান্তকে তৎক্ষণাৎ স্বগ্রামে লইয়া এক 'শনির সিন্নি' দিলেন। দাদা অখিলবাবু সেই শনির স্থান গ্রহণ করিয়া, তাঁহার মাতাকে সেই গ্রামে পাঠাইয়া দিয়া, একটা 'সিন্নি'র দল' সৃষ্টি করিলেন। এই 'সিন্নি'র দ্বারা বিরহ-যন্ত্রণা নিবারিত করিয়া ভ্রাতা আবার রেঙ্গুন চলিয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে রজনী ও ব্যারিষ্টার বন্ধুর পত্নী কলিকাতায় আসিলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ব্যারিষ্টার বন্ধু চট্টগ্রামের লোকের নাম শুনিতে পারেন না, দেশে আসেন না। তাঁহারা উভয়ে আমাকে বলিলেন যে, তিনি আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। আমি লিখিলে তিনি চট্টগ্রামে আসিবেন। আমি তাঁহাকে লিখিলাম—"শুনিয়াছি, তুমি একতারা লইয়া সন্ধ্যার সময়ে ঈশ্বরোপাসনা কর। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে সর্ব্বত্র জন্মক্ষেত্রই কর্ম্মক্ষেত্র। যেখানে

তৃণটিও জন্মিয়াছে, সেখানে তাহার কর্ম্ম আছে। তবে তোমার সম্বন্ধেই কি কেবল ঈশ্বর ভ্রান্ত? তোমার জন্মক্ষেত্রে কি তোমার কোনও কর্ম্ম নাই? তুমি কি তোমার সন্তানদের ইউ-রেসিয়ান-নরকে নিপাতিত করিতে চাহ?" তাঁহার বাঙ্গালীবিদ্বেষ এত দূর যে, তাঁহার পুত্র-কন্যারা বাঙ্গালা কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারে না। তিনি উত্তরে লিখিলেন, আমার পত্রখানি পাইয়া তিনি অনেক চিন্তা করিতেছেন। তাহার কিছু দিন পরে তিনি রজনীকে লইয়া সপরিবারে চট্টগ্রাম আসিলেন। আমি তাঁহাকে ষ্টীমার হইতে নামাইয়া ফেনী ফিরিলাম। আবার সীতাকুণ্ডে গিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র হইলাম। তিনি বলিলেন যে, আমার পত্র সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁহার পরামর্শ করিবার আছে। তিনি তীর্থে তীর্থে—এমন কি, হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত গিয়া, মহাত্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার এ সকল সন্দেহ দূর করিবার জন্য ছুটি লইয়া আসিয়াছেন। আমি মূর্খ কিরূপে এরূপ গুরুতর সন্দেহসকল দূর করিব? তথাপি তিনি ছাড়িলেন না। একটা সমস্ত রাত্রি স্ত্রীদের মাথাকুটা সত্ত্বেও তিনি নিদ্রা গেলেন না। আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। প্রভাতসময়ে দৃঢ়রূপে আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন যে তাঁহার সকল সমস্যার সুন্দর নিষ্পত্তি পাইয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্বশুর মহোদয় সন্ন্যাস রোগে অকস্মাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিয়া-ছেন। তাঁহার দৃঢ়তা তাঁহার পুত্রের নাই। সিন্নির দলও আমাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে নাই। বিধাতার এমনি ন্যায়-বিচার, উহা তাঁহারই ঘাড়ে গিয়া পড়িয়াছে! তাহার উপর উক্ত ব্যারিষ্টার বন্ধু বিলাতি বুটের পদাঘাতে তাঁহার গৃহতল কম্পিত করিয়া বলিলেন যে, এত সাধ্যসাধনার পর তিনি রজনীকে ছাড়িয়া যখন দিলেন না, তিনি কেমন লোক, তাহা বুটধারী ব্যারিষ্টার মহাশয় দেখিবেন! ভয়ানক কথা! তখন তিনি আমার ২০০০ টাকার তমসুকখানি ফেরত দিয়া এবং ভগিনীর রেঙ্গুনে যাত্রার জন্য ২০০০ টাকা দিয়া, ভগিনীকে ছাড়িয়া দিলেন, আর কৃতজ্ঞ ও সহৃদয় ভগিনীপতি বিরহ-বিধুরা 'বিধবা' পত্নীকে লইয়া সোজা কলিকাতা যাত্রা করিলেন। আমার ভার্য্যা কাঁদিয়া 'কল্পতরু'র নগেনের পিসীর মত ফেনী ভাসাইয়া পত্র লিখিলেন—"ওরে আমার তপস্যার ধন! তুই বউ লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলি। অভাগিনী আমাকে তাহার ও তোর চন্দ্রমুখখানিও একবার দেখাইয়া গেলি না।" এ দিকে 'চন্দ্রমুখী বউ' এমনি ভাগ্যবতী যে, তাঁহার স্বামী ষ্টীমার হইতে যে বিষম মস্তিষ্কের জ্বর (brain fever) লইয়া কলিকাতায় নামিলেন, আর সেই জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইলেন না।

রোগের কারণ তাঁহার ব্যভিচার। পরে শুনিলাম, স্কুলে ও কলেজে থাকিতেই, তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল। বিলাত হইতে ফিরিলে দেখিলাম, সেই ব্যভিচার-স্রোত সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। তিনি আমার ও তাঁহার উভয়কে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আসিয়াছেন। তিনি তখন প্রধান দুই মকারের ক্রীতদাস। রেঙ্গুনে গিয়া পানদোষ এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পূজার সময়ে বাড়ীতে আসিয়া ২৪ ঘণ্টা মদের উপর ছিলেন। আমি অনেক বুঝাইলাম। স্ত্রী অনেক কাঁদিলেন, অবশেষে আমার শিশু পুত্রের মাথায় হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এবার চট্টগ্রামে তিন দিন পর্য্যন্ত নিরুদ্দেশ ছিলেন. এবং অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় ষ্টীমারে উঠিয়া কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিলেন। তাহার ফল এই বিষম জ্বর। কিছু দিন কলিকাতায় চিকিৎসা করাইয়া, বৈদ্যনাথ গিয়া কিঞ্চিৎ সারিলে, ভগিনীকে যুগল 'চন্দ্রমুখ' দেখাইবার জন্য ফেনী আসিলেন, এবং ঠিক সেই সময়ে আমি অস্থায়ী পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট নিযুক্ত হওয়াতে আমার সঙ্গে চট্টগ্রামে গেলেন। ডাক্তার কবিরাজ সকলে বলিতে লাগিলেন যে, এ অবস্থায় তাঁহার স্ত্রীকে কাছে রাখা ভাল নহে। আমি তাহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া পড়াইয়া পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। আমার শাশুড়ী ও পত্নী চটিয়া লাল হইলেন। গোপনে আমার ভায়রা-ভাইয়ের লোক একজন পাঠাইয়া তাহাকে আনাইয়া লইলেন এবং রাত্রি ৮টা না হইতে 'বংশ-রক্ষা'র জন্য তাহাকে তাহার স্বামীর কক্ষে

পাঠাইয়া কপাট বন্ধ করিতে লাগিলেন। আমি তাহার জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ফেনী ফিরিলাম। এ দিকে রাসের সময়ে আমার পত্নী, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে আমার বাড়ীতে লইয়া, বংশীয়দের সঙ্গে আহার করাইয়া, ভ্রাতাকে সমাজে তুলিলেন। ভ্রাতা নাচিলেন, গাইলেন এবং আরোগ্য দৃঢ় হইয়াছে কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য সুরাপান করিলেন। ইহার ফল— বিলাতের অত্যাচারে যে যক্ষ্মার বীজোদ্গম হইয়াছিল, তাহা ফুটিয়া উঠিল। এ সকল কথা লিখিতে দারুণ মনোবেদনায় আমার হৃদয়ের শুষ্ক ক্ষতস্থান উত্তেজিত হইয়া শোণিত ছুটিয়া পড়িতেছে। অতএব সংক্ষেপে—তিনি আবার কলিকাতা, আবার বৈদ্যনাথে গিয়া কিঞ্চিৎ সারিলে, মাঘ-মাসের কলিকাতার শীতে 'ফেন্‌সি ফেয়ারে' (Fancy fair) ইয়ার্কি দিয়া, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে সঙ্গিনীর সঙ্গে পদব্রজে গৃহে ফিরিলেন। এবার যে পড়িলেন, আর উঠিলেন না। আমি রাণাঘাট আসিয়া দেখিলাম, তাঁহার শেষ অবস্থা। ডাক্তারের উপদেশমতে সমুদ্রানিল সেবনের জন্য চট্টগ্রামের 'মহেশখালি' ও 'কুতুবদিয়া' নামক দ্বীপে গেলেন, এবং সেখানে মৃতপ্রায় হইয়া, চট্টগ্রাম সহরে আসিয়া লীলা সম্বরণ করিলেন। 'আমার কন্যা বিধবা হইয়াছে'—শ্বশুর মহাশয়ের শ্রীমুখের সাধু ইচ্ছা বুঝি বিধাতা শুনিয়াছিলেন, এবং অদৃষ্টপটে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্বশুর মহাশয়ের পুত্র হইতে পত্নী সহ যে ২০০০্ টাকা পাইয়াছিলেন এবং ব্যবসায়ে যে ১০০০্ টাকা জমাইয়াছিলেন, তাহা ব্যাঙ্কে ছিল। তাঁহার মাতার ভয় হইল যে, পুত্রের মৃত্যুর পর এই টাকা আমার ১৭০০০্ টাকার জন্য আমি গ্রাস করিব। অতএব তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার সঙ্গে যোগ দিয়া, মৃত্যুশয্যায় পুত্রের দ্বারা এক 'উইল' করাইলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি ও তাঁহার মৃত্যুর পর তস্য পুত্রবধূ পুত্রের সম্পত্তির অধিকারিণী হইবেন! আর ট্রষ্টি হইলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা! কিন্তু যে মুহূর্ত্তে হতভাগ্যের মৃত্যু হইল, ট্রষ্টি মহাশয় জাতিভয়ে তাহাকে মৃত কুকুরের মত ফেলিয়া সরিয়া পড়িলেন। বিপত্তিকালে মধুসূদন। তাহাকে পোড়াইল আমার ভ্রাতারা! এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে, ট্রষ্টি মহাশয় আমাকে উইলের মর্ম্ম অবগত করাইলেন এবং পাছে আমি লইয়া যাই, এই ভয়ে আমার হৃদয়ের রক্তে হতভাগা যে ৩০০০্ টাকার পোষাক ইত্যাদি প্রস্তুত করাইয়া বিলাতে 'নেটিভ প্রিন্‌স'-লীলা করিয়াছিল, তাহা ৩০০্ টাকাতে বিক্রয় করিলেন! রেঙ্গুন যাইবার সময়ে অর্থাভাবে আমার নিজের ঘড়ী চেন তাহাকে দিয়াছিলাম, তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাহাও এই সঙ্গে 'বিক্রমপুরে' পাঠাইলেন। একটা হীরার আঙ্গটি সে রেঙ্গুনে হইতে আনিয়া আমার অঙ্গুলে পূজার সময়ে পরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার নিজের অঙ্গুরীয় ছিল না বলিয়া, উহা তাহাকে আমি সম্প্রতি ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, তাহার নিজের ঐরূপ অঙ্গুরীয় একটি হইলে উহা আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে। শুনিলাম, ভায়রাভাই অঙ্গুরীয়টি বিক্রয় করেন নাই ; হাতে রাখিয়াছেন। যখন আমার পত্নী উহা আদর্শ ভ্রাতার নিদর্শনস্বরূপ চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন ভায়রাভাই মহাশয় উহা ভ্রাতার বধূর কাছে পাঠাইয়াছেন বলিয়া লিখিলেন! বধূ 'মালিনীর বাড়ী'র সেই রাসোৎসবের পর আর স্বামীর মুখদর্শন করেন নাই। মৃত্যুশয্যায় স্বামী 'চন্দ্রমুখ' দেখিতে চাহিয়াছিলেন। যেমন পিতা, তেমন কন্যা। জাতিনাশের ভয়ে তিনি আসেন নাই। এক ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণীর মুসলমান প্রণয়ী বলিয়াছিল—"ঠাকুরাণীর সে দিকে নিষ্ঠা আছে। তিনি জাতি নষ্ট হইবে বলিয়া মুসলমানকে মুখচুম্বন করিতে দেন না!" তাহার পর জ্যেষ্ঠা কন্যা কনিষ্ঠা কন্যার পুত্রের জন্য তাহার মাতুলের কিছু নিদর্শন পাঠান উচিত বলিলে, তাঁহার মাতা একখানি পুরাতন ধুতি আমার পুত্রের জন্য রাখিতে দয়া করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা তাহা যথেষ্ট মনে না করিয়া এক সুট পোষাক রাখিয়াছিলেন। শাশুড়ী স্বয়ং কাশী যাইবার সময়ে উহা রাণাঘাটে আনিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে উহারও কাশী-ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। উক্ত ট্রষ্টের টাকা ট্রষ্টি মহাশয় প্রায় ভাঙ্গিয়াছিলেন। যাহা ৪০০্ মাত্র

অবশিষ্ট ব্যাঙ্কে ছিল, তাহা শাশুড়ী জিদ করাতে, তিনি উঠাইয়া আনিয়া স্ত্রী হইতে হ্যাণ্ডনোট লইয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এরূপে আবদ্ধ না হইলে উহাও বিক্রমপুরে যাইত। শাশুড়ীর কাশীপ্রাপ্তির সময়ে তিনি স্ত্রীকে এই ৪০০৲ শত মুদ্রা দান করিয়া যান। কিন্তু এ টাকাও তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া শুনিয়াছি। সেই দ্বিতীয় বার বিধবা কুবের-কন্যা তাহার ২০০৲ টাকা উদ্ধার করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ২০০৲ টাকার জন্য নানা ছলনাপূর্ণ পত্র সময়ে সময়ে লিখিয়া থাকেন। এই সাংঘাতিক অঙ্ক, এরূপে রজনীকান্তের লীলা ও আমার জীবনের শেষ হইল। তিনি আমার হৃদয়ের রক্তে সাহেবী করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি ত মরেন নাই, মরিয়াছি আমি। একজন গরিব ডেপুটির ১৫০০০৲ টাকা এটলাণ্টিকের তলায় গেলে কি থাকে? তাহার উপর দশ বৎসরব্যাপী আমারও ঘোরতর হৃদয়শুষ্ককারী অপমান ও যন্ত্রণা! বহু বিপদে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু এবার ডুবিলাম—অতলে! এই ১৫০০০৲ টাকার মধ্যে তিনি ১০০০৲ টাকার একখানি নোট না কি স্ত্রীকে দিয়াছিলেন। এমনি বিধাতার নির্ব্বন্ধ, তাহাও স্ত্রী হারাইয়াছিলেন! তাঁহার চিহ্নের মধ্যে একখানি বিলাতী রগ (rug) আমার কাছে ছিল। এক দিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে সান্ধ্য সম্মিলনীতে আমি উহা গায়ে দিয়া গিয়াছিলাম। আমি এ সম্মিলনীর উপযোগী বহুমূল্য শাল কোথায় পাইব? মহারাজ-কুমার প্রদ্যোতকুমার কাপড়খানি ধরিয়া দেখিলে বলিলাম—উহার মূল্য ১৫০০০৲ টাকা! উপাখ্যান শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

বন্ধুসমাগম

রাণাঘাট হইতে কলিকাতা রেলে ১৷৷০ ঘণ্টার পথ। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্য ও অসাহিত্য-সেবী অনুগ্রহ করিয়া রাণাঘাটে বেড়াইতে ও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এমন কি, প্রত্যেক রবিবার পূর্ব্বাহ্নের, এবং প্রত্যহ অপরাহ্নের বাষ্পীয় যানের জীমূতগর্জ্জন শুনিলে আমি অতিথি-প্রত্যাশায় ঝাউ-সজ্জিত রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র সুরেশ আমার সহোদরস্থানীয়। এবার কলিকাতায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় হইয়াছিল। তিনি একদিন লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সেই রবিবার তিনি বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সঙ্গে করিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। হীরেন্দ্রবাবু 'সাহিত্যে' কয়েক প্রবন্ধে 'রৈবতকে'র যে দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। সুরেশ লিখিয়াছিলেন যে, তিনি কলিকাতার একজন ধনীর সন্তান; তাঁহার ভ্রাতা 'রেলি ব্রাদারে'র মুচ্ছুদ্দি; তিনি নিজে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী এবং পরম পণ্ডিত। এখন তিনি একজন খ্যাতনামা এটর্নি এবং বাঙ্গলার একজন প্রধান লেখক ও সমালোচক। বলা বাহুল্য তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে আমারও বড় আগ্রহ ছিল। অতএব রবিবার প্রাতে ১০টার ট্রেন হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া, আমরা পতি পত্নী তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলাম। গাড়ী ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম যে, একজন সৌম্য শান্তমূর্ত্তি গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দীর্ঘ স্থূল কলেবর, উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ, মস্তকে খর্ব্ব কেশ, ললাট ও চক্ষু জ্ঞান-প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। বয়স প্রথম যৌবন। সুগোল বদনমণ্ডলে সুন্দর ওষ্ঠের উপর ঈষৎ গুম্ফরেখা, এবং অধরে সুপ্রসন্ন ঈষৎ হাসি। চোখে সোনার সমুজ্জ্বল চশমা। পরিধানে সুকুঞ্চিত ধুতি ও পিরান। দক্ষিণ স্কন্ধোপরে সুকুঞ্চিত চাদর। শান্ত-সমুদ্রবৎ গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই তাঁহাকে পরম পণ্ডিত ও দেব-চরিত্রসম্পন্ন একজন মহাপুরুষ বলিয়া আমার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ও সম্মানের সঞ্চার হইল। সঙ্গে কৈ, সুরেশ ত নাই! তিনি একা আসিয়াছেন। তাঁহাকে কিরূপে গ্রহণ করিব, আমি সে

জন্য কিছু চিন্তিত হইলাম। যাহা হউক, বুঝিলাম—তিনিই হীরেন্দ্রবাবু। আমি তাঁহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গাড়ী হইতে গৃহে লইয়া গেলাম। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন যে, শিয়ালদহে সুরেশের সঙ্গে তাঁহার একত্র হইয়া আসিবার কথা ছিল। কিন্তু ট্রেনের সময় পর্য্যন্ত সুরেশ আসেন নাই। অতএব তিনি একা আসিয়াছেন। তাঁহাদের আহারের জন্য স্ত্রী যথাশক্তি আয়োজন করিয়াছিলেন ও নিজে রন্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই পবিত্র শান্ত স্থির মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহাকে কেমন নিরামিষাহারী বলিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার আহার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ নিয়ম আছে কি?" ঈষৎ হাসিয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—"আমি মাছ মাংস খাই না।" আমি বলিলাম,—"তবে ত আপনি আমার মুণ্ডটি খাইয়াছেন! আমার ত মাছ মাংস ভিন্ন অন্য কোনও আয়োজনই নাই।" তিনি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনি আমার আহারের জন্য ব্যস্ত হইবেন না। আমাকে সামান্য দুটি ডাল ভাত দিলেই হইবে।" আমি ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া গিয়া স্ত্রীকে খবর দিলে—তিনি তখনও রন্ধন করিতেছিলেন—তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"এতগুলি খাবার নষ্ট হইল! আর এত বেলায় তাঁহার জন্য কি নিরামিষ আহারেরই বা আয়োজন করিব?" যাহা হউক, সমস্ত দিন তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপে বড় আনন্দে কাটাইলাম। তাঁহার বৃত্তান্ত 'কুরুক্ষেত্র কাব্যে'র ইতিহাস লিখিতে পরে বলিব। তাঁহার আহার অতি সামান্য। একটি পাখীর আহার বলিলেও চলে। তিনি কেমন করিয়া জীবন ধারণ করেন, ততোধিক এতগুলি কঠোর পরীক্ষা এরূপ কৃতিত্বের সহিত দিয়াছেন, আমার কাছে ইহা একটা অলৌকিক ব্যাপার (miracle) বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার শান্ত আকৃতি, শান্ত প্রকৃতি, দেবচরিত্র ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য, কেবল প্রাচীন ভারতের জগৎপূজ্য ঋষিদের সহিত তুলনীয়। আমাদের পতি পত্নীর হৃদয় শ্রদ্ধায় পূর্ণ করিয়া এই যুবক-ঋষি ৪টার ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। কি শুভ ক্ষণে ইহাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আজ তিনি আমার একটি দেব-ভ্রাতা ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু।

কি উপলক্ষ্যে স্মরণ হয় না, এই সময়ে পত্রের দ্বারা কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে পরস্পর পরিচিত হই। স্মরণ হয়, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি কলিকাতায় ছুটিতে থাকিবার সময়ে কলিকাতার উপনগরস্থ কোনও উদ্যানে 'ন্যাশনাল মেলা' দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার বৎসরেক পূর্ব্বে আমার 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়া কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। একজন সদ্য-পরিচিত বন্ধু মেলার ভিড়ে আমাকে 'পাকড়াও' করিয়া বলিলেন যে, একটি লোক আমার সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহিতেছেন। তিনি আমার হাত ধরিয়া উদ্যানের এক কোণার এক প্রকাণ্ড বৃক্ষতলায় লইয়া গেলেন। দেখিলাম, সেখানে সাদা ঢিলা ইজার চাপকানপরিহিত একটি সুন্দর নব-যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বয়স ১৮।১৯. শান্ত, স্থির। বৃক্ষতলায় যেন একটি স্বর্ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বন্ধু বলিলেন—"ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ।" তাঁহার জ্যেষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। দেখিলাম, সেই রূপ, সেই পোষাক। সহাস্যমুখে করমর্দ্দন কার্য্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি 'নোটবুক' বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর কামিনী-লাঞ্ছন কণ্ঠে, এবং কবিতার মাধুর্য্যে ও স্ফুটোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম। তাহার দুই এক দিন পরে বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার চুঁচুড়ার বাড়ীতে লইয়া গেলে আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি 'ন্যাশনাল মেলা'য় গিয়া একটি অপূর্ব্ব নব-যুবকের গীত ও কবিতা শুনিয়াছি, এবং আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি একদিন একজন প্রতিভাসম্পন্ন কবি ও গায়ক হইবেন।

অক্ষয়বাবু বলিলেন—"কে? রবি ঠাকুর বুঝি? ও ঠাকুরবাড়ীর কাঁচা মিঠা আঁব।" তাহার পর ১৬ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইয়াছে—আজ 'কাঁচামিঠা আঁব' পরিপক্ক 'ফজলী।' তাঁহার গৌরবে সৌরভে বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত। রবিবাবু আজ বাঙ্গলার 'শেলি', 'কিট্‌স্', 'এডগার পো'—কত কিছু বলিয়া পরিচিত। নব্য বঙ্গ তাঁহার সাহিত্যের ও তাঁহার সখের অনুকরণে উন্মত্ত।

এ সময়ে রাণাঘাটে রবিবাবুর যে একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, তাহা আমাদের বন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিলাম—

"হিন্দু মেলায় যখন আপনাকে প্রথম দেখি, তখন আমি অখ্যাত অজ্ঞাত এবং আকারে আয়তনে ও বয়সে নিতান্তই ক্ষুদ্র—তথাপি আমি যে আপনার লক্ষ্যপথে পড়িয়াছিলাম এবং তখনও আপনি যে আমাকে মন খুলিয়া অপর্য্যাপ্ত উৎসাহবাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা আমার পক্ষে বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতা মাত্র—কিন্তু আপনি যে সেই ক্ষুদ্র বালকের সহিত ক্ষণকালের সাক্ষাৎ আজও মনে করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার পর আজ প্রায় মাসখানেক হইল, রাণাঘাটের ষ্টেশনে আপনাকে দেখিয়াছিলাম। আমি মনে মনে আশা করিতেছিলাম যে, আপনি আমার গাড়ীতে উঠিবেন এবং আপনাকে আমার সেই বাল্যপরিচয় স্মরণ করাইয়া দিব, কিন্তু সে দিন আপনি ধরা দিলেন না। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী রবিবারের দিনে সাহিত্য-পরিষদ্ সভায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে আশা করিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সে দিনও আপনার দর্শন লাভ হইল না। সহৃদয়তাগুণে আজ আপনি নিজ হইতে পত্রযোগে ধরা দিয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপনপত্রে আপনার নিম্নে আমার নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে বলিয়া আপনি কেন আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন? যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোট হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে—আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্য্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি, ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।"

স্মরণ হয়, ইহার প্রতিবাদ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম, আমার নিম্নে তাঁহার স্থান হইলে আমি ও বঙ্গ সাহিত্য, উভয়ে নিরাশ হইব। আমার আশা, তাঁহার স্থান আমি অযোগ্যের বহু ঊর্দ্ধে হইবে। মাইকেল 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের, হেমবাবু 'বৃত্রসংহারে'র এবং আমি 'পলাশির যুদ্ধে'র কবি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু রবিবাবু কোনও এক কাব্যবিশেষের কবি বলিয়া কেহ তাঁহার নাম করে না। অথচ তিনি রাশি রাশি পুস্তক লিখিয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান গীতিকবি। শুনিয়াছি, তাঁহার বিশ্বাস, বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উহা সত্য হইলে তাঁহার ও বঙ্গভাষার উভয়ের দুর্ভাগ্য।

ইহার কিছু দিন পরে তিনি তাঁহার জমিদারী কার্য্যে কুষ্টিয়া যাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমার একজন আত্মীয় তাঁহাকে ষ্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, দেখিলাম, সেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব! উজ্জ্বল গৌর বর্ণ; স্ফুটোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ; মস্তকে মধ্যভাগ-বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা; কুঞ্চিত অলক-শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণদর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব্ব ও শমশ্রুশোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণ পক্ষ্মযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল

চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জ্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত স্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খ্রীষ্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও রেশমী চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অসহ্যতা-ব্যঞ্জক। গাড়ী হইতে আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিলাম। আমার তখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের কবিতাটি মনে পড়িল—

"চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি-গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি শুনি, চণ্ডীদাস-গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুঁহু উৎকণ্ঠিত ভেল।"

তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি গান রচনা করিয়াছিলাম। চৌদ্দ বৎসরবয়স্ক আমার পুত্র নির্ম্মল তাহা হারমোণি ফ্লুটের সঙ্গে গাইল। তাহার বড় আনন্দ হইয়াছে। রবিবাবু তাহার গলার প্রশংসা করিলেন, এবং আরও দুই একটি গান গাইতে বলিলেন। সে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান গাইল। তিনি এই হইতে নির্ম্মলকে বড় ভালবাসিতে লাগিলেন। নির্ম্মল তাঁহার গানে নূতন নূতন সুর দিয়া গাইয়াছিল বলিয়া না কি কলিকাতায় গিয়া তাঁহার বন্ধুদের কাছে তাহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। আমরা তখন তাঁহাকে একটি গান গাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া, হারমোণি ফ্লুট তাঁহার সমক্ষে দিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি কোনও যন্ত্রের সঙ্গে গাইতে ভালবাসেন না। কারণ, যন্ত্রে গলার মাধুর্য্য ঢাকিয়া ফেলে। তিনি একটি মাত্র পর্দ্দা কিছু ক্ষণ টিপিয়া, সুরটিমাত্র স্থির করিয়া, যন্ত্র ছাড়িলেন। তাহার পর পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া, একটি নূতন কীর্ত্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন বলিয়া, উহা গাইতে লাগিলেন। আমি এমন সুন্দর গান অতি অল্পই শুনিয়াছি।

গীত

১

এস এস ফিরে এস!
বঁধু হে ফিরে এস!
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
নাথ হে! ফিরে এস!

২

ওহে নিষ্ঠুর ফিরে এস হে!
আমার করুণ-কোমল এস!
আমার সজল-জলদ-স্নিগ্ধ-কান্ত
সুন্দর ফিরে এস!
আমার নিতিসুখ ফিরে এস!
আমার চিরদুখ ফিরে এস!
আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন-ধন
অন্তরে ফিরে এস!

৩

আমার চিরবাঞ্ছিত এস হে!
আমার চিত-সঞ্চিত এস!
ওহে চঞ্চল হে চিরন্তন,
ভুজ-বন্ধনে ফিরে এস!
আমার বক্ষে ফিরিয়া এস!
আমার চক্ষে ফিরিয়া এস!
আমার শয়নে, স্বপনে, বসনে, ভূষণে,
নিখিল ভুবনে এস!

৪

আমার মুখের হাসিতে এস হে!
আমার চোখের সলিলে এস!
আমার আদরে, আমার ছলনে,
আমার অভিমানে ফিরে এস!
আমার সকল স্মরণে এস!
আমার সকল ভরমে এস!
আমার ধরম-করম-সোহাগ-সরম-
জনম-মরণে এস!

একে এই সুললিত রচনা, অপূর্ব্ব কবিত্ব ও প্রেম ভক্তির উচ্ছ্বাস, তাহাতে রবিবাবুর কামিনী-লাঞ্ছিত বংশী-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠ! আমার বোধ হইতে লাগিল, কণ্ঠ একেবারে গৃহ

পূর্ণ করিয়া, গৃহের ছাদ ভিন্ন করিয়া, আকাশ মুখরিত করিতেছে। আবার যেন শিশুর কোমল অস্ফুট কণ্ঠের মত কর্ণে কোমল মধুর স্পর্শ মাত্র অনুভূত হইতেছে। কি মধুর মুখভঙ্গি! গানের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখ ও চক্ষু অভিনয় করিতেছে। গানের করুণ ভক্তিরস যেন তাঁহার অধর হইতে গোমুখী-নিঃসৃত জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মত প্রবাহিত হইতেছে। আমি তখন 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্রে'র কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। গীত শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার কঠোর হৃদয়ও গলিল ; আমার নেত্র ছল ছল করিতে লাগিল। আমি, পৌত্তলিকের এ ভাব দেখিয়া রবিবাবু কি মনে করিবেন ভাবিয়া, অশ্রু সম্বরণ করিয়া, তাঁহাকে এ গানের জন্য অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। তার পর নিজের রচিত আরও দুই একটি গীত গাহিলেন। বঙ্কিমবাবুর 'বন্দে মাতরম্' গাইতে বলিলে, কেবল প্রথম পদটি মাত্র গাইলেন। বলিলেন, গানটি তাঁহার মুখস্থ নাই। তিনি বাঙ্গালী অন্য কাহারও গান যে জানেন, কি বাঙ্গালী অন্য কাহারও কাব্য যে পড়িয়াছেন, তাঁহার কথায় বোধ হইল না। শুনিয়াছি, বঙ্কিমবাবুও শেষ জীবনে অন্য কাহারও বহি পড়িতেন না। আমি কিন্তু ভাল বহি বাহির হইলেই পড়ি। তবে নির্ম্মলের মুখে অন্যের রচিত কোনও কোনও গান শুনিয়া তিনি প্রশংসা করিলেন, কাহার রচনা জিজ্ঞাসা করিলেন। একটা গান গিরীশ ঘোষের রচিত বলিলে,—"শুনিয়াছি, তিনি গান রচনা করিতে পারেন।" —এই পর্য্যন্ত। রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বলিত রবিবাবুর অনেক সুন্দর সুন্দর গান আছে। বিশেষতঃ উপরের কীর্ত্তনটি লক্ষ্য করিয়া রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি অনেক সময়ে ভাবি, আমিও পৌত্তলিক কি না। বিশেষতঃ ভাগবত সম্বন্ধে অন্যান্য ব্রাহ্মগণের হইতে আমার ধারণা স্বতন্ত্র। আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ অঙ্গের allegory (রূপক) মনে করি।" আমি বলিলাম—"উহা রূপক মনে করিয়া যদি আপনার তৃপ্তি হয়, ক্ষতি নাই। আপনি সেই ভাবে দেখুন। কিন্তু আমি যে যাত্রার গানে কৃষ্ণ সাজিয়া আসিলে দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমার সেই কালো পুতুলটি ভাঙ্গিবেন না। আমার জন্য উহা রাখিয়া দিউন।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু সজল হইল। দেখিলাম, আমার প্রাণের এ উচ্ছ্বাস তাঁহার প্রাণও স্পর্শ করিল। তাঁহার চক্ষুও ছল ছল হইয়া উঠিল। গানের পর তাঁহার কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি করিলেন। রবিবাবু একাধারে কবি ও অভিনেতা। তাঁহার আবৃত্তির তুলনা নাই। তাহার পর তাঁহার গান ও কবিতার কথা হইল। নিধুবাবুর গানগুলি ৪।৬ লাইনে একটি সম্পূর্ণ ভাবের ফোয়ারা, এবং তাঁহার গানগুলি বড় দীর্ঘ, এক একটি কবিতাবিশেষ বলিলে তিনি বলিলেন—তাঁহার ছোট ছোট গানও আছে। তাঁহার 'সোনার তরী' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহার আরম্ভ পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীদৃশ্যের একটি ফটো। কিন্তু উহার অর্থ কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা বড় বুঝিলাম না।

দুজনে বহুক্ষণ গল্প করিতে করিতে আহার করিলাম, এবং আহার করিতে করিতে সাহিত্য ও বহু বিষয়ে আলাপ করিলাম। অপরাহ্ণে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে রাণাঘাট দেখাইতে ও বেড়াইতে বাহির হইলাম। 'ভারতী'তে 'রৈবতকে'র সেই অপূর্ব্ব সমালোচনার উল্লেখ করিয়া রবিবাবু বলিলেন—"আমি ও দিদি এ সমালোচনার কিছুই জানিতাম না। উহা বোধ হয় আমাদের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করিবেন না। আপনি উহার লেখিকা বলিয়া যাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছেন, তিনিও নির্দ্দোষী। উহার লেখিকা আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। কোনও কারণবশতঃ আমি তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমি ও দিদি উহার জন্য বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" ইহার কিছু দিন পরে এক কবি-বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন যে, আমি এই কারণে 'কুরুক্ষেত্র' 'ভারতী'কে উপহার দেই নাই

বলিয়া সরলা দেবী বড় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, তিনি বন্ধুর কাছ হইতে একখানি 'কুরুক্ষেত্র' চাহিয়া লইয়াছেন এবং উপরোক্ত সমালোচনা-লেখিকার নামও তাঁহাকে বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া আমার কাছে নাম প্রকাশ করিবেন। সুরেশের বিবাহ-সভায় তিনি কাণে কাণে 'সেই নামটি' বলিলেন। সেই 'মধুর নাম' 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশি'বামাত্র আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া কি বলিতে-ছিলাম। তিনি আমার মুখে হাত দিয়া বলিলেন—"সম্মুখে লেখিকার পুত্র বসিয়া আছেন।" তখন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং আমার কানে কানে বলিলেন—"তিনি বড় অনুনয় করিয়া আপনার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছেন।" আমি যাহাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম। তিনি এক দিন আমার পরম আত্মীয়া ছিলেন, পরে এক পাপিষ্ঠ পৃষ্ঠদংশকের কৃপায় অনাত্মীয়া হইয়াছিলেন। কিন্তু ইনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি স্ত্রী-কবি নহি, আমার প্রতি তাঁহার এ নিষ্কাম বিদ্বেষ কেন—কিছুই বুঝিলাম না।

নগরভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রির আহারে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী মহাশয়কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কিছুক্ষণ রবিবাবুর ও নির্ম্মলের গান হইল। পরে 'টেবিলে' পানাহার বড় আনন্দের সহিত চলিতে লাগিল। রবিবাবুর মার্জ্জিত সোনার চশমা, মার্জ্জিত রুচি, মার্জ্জিত ঈষৎ হাসি। সমস্ত দিন ঠাকুরবাড়ীর ওজনমাপা চাপা কথা, চাপা হাসি ও চাপা শিষ্টাচারে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। আমি আর পারিলাম না। সুরা দেবীও পরিমিত শিষ্টাচারের বন্ধন কিছু শিথিল করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"রবিবাবু! সমস্ত দিন আপনার চাপা কথা ও চাপা হাসিতে বড় জ্বালাতন হয়েছি। আমি আর আমার ওজন ঠিক রাখতে পাচ্ছি না। দোহাই আপনার! আপনি একবার আমাদের মত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া কথা বলুন!" তিনি এবার খুব হাসিলেন। তিনি এ বেলা বড় খাইতেছিলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"আমাকে ক্ষমা করিবেন। বধূঠাকুরাণী সকালে একদিকে আমার প্রতি ৫৩ রকমের ব্যঞ্জনাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে আপনার আলাপেও এরূপ একটা মোহিনী শক্তি (charm) আছে যে, আমি তাহাতে মুগ্ধ হইয়া সকালে অতিরিক্ত আহার করিয়া ফেলিয়াছি। এখন আর বোঝা লইতে পারিতেছি না।" আমি বলিলাম—"এ কেবল শিষ্টাচারের কথা। কলিকাতার 'বৈঠক-খানার বীর'কে (Hero of the Calcutta drawing room) আমি গরীব কি খাওয়াইতে পারি? আর আলাপ—আমি 'বাঙ্গালে'র আলাপে রবিবাবুকে মুগ্ধ করিবার শক্তি থাকিবারই ত কথা!" তখন সুরেন্দ্রবাবুর প্রস্তাবমতে আমরা খুব ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিতে লাগিলাম। আহারান্তে আমি ও সুরেন্দ্রবাবু উভয়ে রবিবাবুকে নিশীথ সময়ে গোয়ালন্দ মেলে তুলিয়া দিয়া, জীবনের একটি দিন বড় আনন্দে কাটাইয়া বাড়ী ফিরিলাম। রবিবাবু তাঁহার জমিদারী কাচারি হইতে লিখিলেন—"এমন কখনই মনে করিবেন না যে, আপনার স্নেহ এবং আদর আমি বিস্মৃত হইয়াছি—বিশেষতঃ অলক্ষ্য হইতে বউঠাকুরাণী মাদৃশ ক্ষুদ্র-শক্তি স্বল্প-ক্ষুধা ক্ষীণ ব্যক্তির প্রতি যে স্নেহপূর্ণ এবং ছত্রিশ ব্যঞ্জনপূর্ণ পরি-হাস ও পরীক্ষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাও ভুলিবার বিষয় নহে। তাঁহাকে জানাইবেন যে, তাঁহার আয়োজনের মধ্যে ব্যঞ্জন অংশ নিঃশেষ করিতে আমি অশক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু স্নেহ-অংশটুকু সম্পূর্ণরূপেই সম্ভোগ করিয়াছিলাম। এবং তাহাও ব্রাহ্মণ-সুলভ লোভ-বশতঃ সঙ্গে বাঁধিয়া আনিয়াছি।" 'সখি! এরূপ না হইলে তোমার নাম প্রিয়ম্বদা হইবে কেন?' এরূপ না হইলে রবিবাবু সর্ব্বজনপ্রিয় হইবেন কেন?

ইহার কিছু দিন পরে 'অমৃত বাজারে'র শিশিরদাদা কলিকাতায় আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। সেই ভারতখ্যাত রাজনীতিকুশল শিশিরবাবুর আজ কি অপূর্ব্ব অবস্থা! তিনি তখন 'অমিয় নিমাইচরিত' লিখিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমতরঙ্গে

তিনি আত্মহারা। অনিবার দুই চক্ষে জলধারা বহিতেছে। কথায় কথায় কাঁদিতেছেন। আমার রাণাঘাট বদলিতে তিনি বড় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম, শ্রীচৈতন্য-দেবের লীলা পড়িয়া এ অঞ্চল দেখিতে আমার বড় আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। তিনি আমার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"করিবেন না কেন? আমরা কি মরা দেবতার পূজা করিয়া থাকি?" তাহার পর এ সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। আমি এ উপলক্ষ্যে রবিবাবুর উপরোক্ত গানটির প্রশংসা করিয়া, গানটি একবার রবিবাবুর মুখে তাঁহাদের শুনিতে বলিলাম। মতি দাদা বলিলেন—"হুঁ! রাশি রাশি পদাবলির গান ফেলিয়া রবি ঠাকুরের গান শুনিতে যাই!" আমি বলিলাম, তাহাতে ত পাপ নাই। রাশি রাশি পদাবলির গান আছে বলিয়া যে এখন আর ভাল গান হইতে পারে না, এমন কথাও ত নাই। তখন শিশির-বাবু বলিলেন—"নবীন! তোমার মুখে মাইকেল, বঙ্কিম, হেম, রবি, সকলেরই প্রশংসা শুনি। অথচ তুমিও একজন তাহাদের সমকক্ষ কবি। তুমি কেমন করিয়া এরূপ বিনয় শিক্ষা এবং হৃদয় এরূপ অভিমানহীন করিলে, তাহা বলিতে পার কি? তোমার পায়ের ধুলা লইতে ইচ্ছা করে।" আমি বলিলাম—"না দাদা! আমি তোমার একটি পায়ের ধুলার তুল্যও নহি। আমি বোধ হয়, সম্পূর্ণরূপে অভিমানের মোহ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই। কিন্তু দাদা! একটি কথা বলিব—মানুষকে ভালবাসিয়া সুখ, না বিদ্বেষ করিয়া সুখ? মানুষকে মানুষ বিদ্বেষ করিয়া, হিংসা করিয়া, নিন্দা করিয়া কি সুখ পায়, আমি বুঝি না। আমার সকলকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। মানুষ অপূর্ণ, কেবল শ্রীভগবান্ মাত্র পূর্ণ। মানুষের দোষ দেখিলে ত ভালবাসা যায় না, গুণ দেখিলেই ভালবাসিতে পারি। আমার কত দোষ আছে। অতএব মানুষের দোষ না দেখিয়া গুণ দেখিতে আমার বড় আনন্দ বোধ হয়।" তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এ সময়ে কলিকাতায় এক দিন অপরাহ্নে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে একটু আন্তরিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আদর অভ্যর্থনার কথা আর কি বলিব। তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলাপ হইল। সর্ব্বশেষ সাপ্তাহিক প্রভুদের অপূর্ব্ব সমালোচনা ও বিজ্ঞাপনের কল্যাণে বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা উঠিল। আমি বলিলাম—"আপনি বঙ্গসাহিত্যের একমেটে সরস্বতীকে বটতলার ধুলা কাদা ও পূতিগন্ধ হইতে উদ্ধার করিয়া, এবং দোমেটে করিয়া, অমল শুভ্র বর্ণে ও বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত করিয়া, শত-শোভাপূর্ণ-সহস্রদলে স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন বঙ্গসাহিত্যে আবার সেই 'কি মজার শনিবার', 'হদ্দ মজার রবিবার' সাহিত্যের দিকে গড়াইতেছে। আপনি কেমন করিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া আছেন?" তিনি চিন্তাযুক্ত বিষণ্নমুখে বলিলেন—"নাতি! 'গড়াইতেছে' কেন, গড়াইয়াছে বল। সত্যই আমরা যে বটতলা হইতে তুলিয়াছিলাম, বঙ্গসাহিত্য আবার সেই বটতলায় গিয়াছে। কিন্তু কি করিব?" আমি বলিলাম—"আপনি এখনও জীবিত, আপনার মানসিক শক্তি ও প্রতিভা এখনও পূর্ণ প্রতিভান্বিত, এবং বঙ্গসাহিত্যে আপনার একাধিপত্য এখনও অপ্রতিহত। আপনি আবার 'বঙ্গদর্শনে'র পতাকা গ্রহণ করুন, আর আমরা আপনাকে বেষ্টন করিয়া সে পতাকার ছায়ায় দাঁড়াই। আপনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যদি আমরা সাহায্য করি, আপনি একখানি ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস 'বঙ্গদর্শনে'র মত খণ্ডশঃ মাসে মাসে লিখিবেন। আপনি নভেল ছাড়িয়া, এই গুরুতর কার্য্যটিতে ব্রতী হন। আপনি ভিন্ন উহা আর কাহারও দ্বারা হইবে না।" তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"তাহা পারি, যদি তোমরাও কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াও। আমি এখন বুঝিতেছি যে, 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিয়া অন্যায় করিয়াছিলাম। তুমি চেষ্টা করিয়া উহা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলে, কিন্তু যাঁহারা উহার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা রাখিতে পারিলেন না। তুমি আর একদিন আসিও। এ

বিষয়ে ভাল করিয়া পরামর্শ করিয়া একটা কর্ত্তব্য স্থির করিব।" তাহার পর বলিলেন—"তুমি দেখিতেছি, 'নভেলে'র উপর বড় নারাজ।" আমি বলিলাম—"আমি ত বরাবর আপনাকে বলিয়াছি, আপনার বিলাতী পীরিতের পিন্ড পিন্ডান্ত আর আমার ভাল লাগে না। কেবল একঘেয়ে সেই ইংরাজী 'নভেলে'র পতি পত্নীর ও উপপত্নীর পীরিত! আপনাকে এত করিয়া বলিলাম যে, যে সকল প্রেম লইয়া আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য রামায়ণ ও মহাভারত,—পিতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বাৎসল্য, প্রজাপ্রেম, সর্ব্বশেষ ঈশ্বরপ্রেম,—এই সকল প্রেমের আদর্শ আঁকিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যান। আপনি ত তাহা শুনিলেন না। ছাই ভস্ম নরনারীপ্রেমের উগ্র ছবি আঁকিয়া আজ আপনি বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক নারীহত্যার—বিশেষতঃ নারীদিগের আত্মহত্যার জন্য দায়ী হইতেছেন।" প্রাচীরে তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অভাগিনী কনিষ্ঠা কন্যার 'অইল পেন্টিং' ছিল। তাঁহার চক্ষু তাহার দিকে পড়িল, এবং সজল হইল। এই কন্যাটিও কুন্দনন্দিনীর হতভাগ্য অনুকরণ করিয়াছিল। তিনি শুকরের গলায় মুক্তার মালা দিয়াছিলেন। তিনি বাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিলেন—"সত্য, নবীন! আমি এখন ভাবিতেছি যে, আমি 'নভেল' লিখিয়া দেশের হিত কি অহিত করিয়াছি। এ জন্য তুমি দেখিয়াছ, আমি আমার শেষ উপন্যাসগুলিতে ধর্ম্মের সুর ধরিয়াছি।" আমি বলিলাম—"ধরিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বের 'নভেলে' যে তীব্র বিষ ঢালিয়াছেন, তাহার প্রত্যাহার যে এরূপে হইবে, আমার বড় বিশ্বাস নাই। পাপের ছবিগুলি যেরূপ চিত্তাকর্ষক ও মাদকতা-পূর্ণ, পুণ্যের ছবি কি সেরূপ হইয়াছে? আপনার উপন্যাসের উচ্চ শিল্প ও ধর্ম্মনীতি সাধারণে, বিশেষতঃ রমণীদের মধ্যে কয় জন বুঝিতে পারে? আমি সে জন্য বলিতেছি, আপনি উপন্যাস ছাড়িয়া ইতিহাসটিতে হাত দিউন।" তিনি নীরব রহিলেন। আমি বিদায় হইবার সময় আবার বলিলেন—"তুমি শীঘ্র আর একবার আসিও। তোমার ঐ জ্বলন্ত উৎসাহে আমার বুড়া হাড়েও বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। আর একবার সকল বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব।" বঙ্গসাহিত্যের সেই সুদিন আর হইল না।

ইহার পর একদিন চাকদহ মিউনিসিপ্যাল আফিসে বসিয়া আছি। ৪টার পূর্ব্বে মিটিং শেষ না হওয়াতে, ৮টার ট্রেন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এমন সময় কলেজ-কারামুক্ত কয়েকজন চাকদহবাসী যুবক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি সময় কাটাইবার উপায়স্বরূপ তাঁহাদের পাইয়া বড় আনন্দিত হইলাম। একজন কলেজি-শিক্ষা বা স্বাস্থ্য-তিতিক্ষা শেষ করিয়াছেন। তিনি একজন সাহিত্যপ্রিয় যোগ্য লোক। আমি বলিলাম—"আমি আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটি পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে গল্প করা যাইবে। রথ দেখা হইবে, কলা বেচাও হইবে।" বেড়াইতে বেড়াইতে সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের তিনি একজন গোঁড়া, এবং তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসকল আদর্শ চরিত্র বলিয়া খুব প্রশংসা করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ চরিত্রটিকে তিনি আদর্শচরিত্র বলেন। তিনি বলিলেন—কেন? সকল চরিত্রই আদর্শ। প্রশ্ন—পুরুষচরিত্রের আদর্শ কে কে? তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন—"পুরুষ-চরিত্র না হয় বাদ দিলাম। বঙ্কিমবাবু পুরুষচরিত্র সৃষ্টি সম্বন্ধে বড় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীচরিত্র সকল কি আদর্শ নহে?" প্রশ্ন—মাতৃচরিত্রের আদর্শ কে? তিনি আবার ভাবিয়া বলিলেন—তাহা কেহ নাই। প্রশ্ন—আচ্ছা, ভগিনী-চরিত্রের আদর্শ? আবার ভাবিয়া উত্তর—তাহাও নাই। প্রশ্ন—কন্যা-চরিত্রের আদর্শ? উত্তর—তাহাও নাই। প্রশ্ন—তবে কোন্ চরিত্রের আদর্শ আছে? তৎক্ষণাৎ উত্তর—কেন, পত্নী-চরিত্রের? প্রশ্ন—কে? আবার তৎক্ষণাৎ উত্তর—কেন? সূর্য্যমুখী। প্রশ্ন—লোকে যেমন ইচ্ছা করে, সীতা সাবিত্রীর মত স্ত্রী হউক; আপনি কি সেরূপ ইচ্ছা করেন যে, সূর্যমুখীর মত রমণী আপনার স্ত্রী হউক? আপনি কি ইচ্ছা করেন, আপনার স্ত্রী অভিমান করিয়া দুপুর রাত্রিতে

গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন? এবার তিনি বড় সঙ্কটে পড়িলেন। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, ভ্রমর।" আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"এবার আরও ভাল। আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, আপনার স্ত্রী একবার মাত্র পদস্খলিত হইলে—সময়ে সময়ে কাহার না হয়—আপনার ভিটাতে ঘুঘু চরাইয়া ছাড়িবেন?" তিনি এবার আমার মুখের দিকে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিলেন। বিস্ময়ান্তে বলিলেন—"তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিন কিছুই নহে?" উত্তর—"কই, আমি ত সে কথা বলি নাই। আপনি বঙ্কিম বাবুর গোঁড়া। আমি তাঁহার উপাসক। আপনার মত আমিও বঙ্কিমবাবুর গদ্য পড়িয়া পদ্য লিখিতে শিখিয়াছি। তিনি আমার গুরুস্থানীয়। বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমবাবু অমর। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে অতি উচ্চ শিল্প ও শিক্ষা আছে। কিন্তু আদর্শ চরিত্র নাই। রামায়ণ মহাভারতের কল্যাণে ভারতের গৃহে গৃহে যে আদর্শ পিতা, আদর্শ পুত্র, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ মাতা, আদর্শ কন্যা, এমন কি, আদর্শ ভৃত্য পর্যন্ত আছে, তাহা জগতে নাই। বঙ্কিমবাবু এ সকল আদর্শ তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়াছেন—গড়িতে পারেন নাই। এ কথা কেবল আপনাকে নহে, তাঁহার প্রত্যেক উপন্যাস উপহার পাইয়া, আমি বারম্বার তাঁহাকে লিখিয়াছি। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলিন ইউরোপীয় উপন্যাস হিসাবে উৎকৃষ্ট উপন্যাস। ভারতীয় সাহিত্যের হিসাবে উৎকৃষ্ট সাহিত্য নহে।" তিনি তাহা স্বীকার করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে বঙ্কিমবাবু লিখিলেন যে, তিনি শান্তিপুরের রাস কখনও দেখেন নাই। অতএব রাস দেখিতে আসিবেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি কিছুদিন রাণাঘাটে আমার সঙ্গে থাকিবেন, এবং যে সকল বিষয়ের প্রস্তাব উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল, তাহাও স্থির করিবেন। আমাদের পতি পত্নীর আনন্দের সীমা রহিল না। রাসের সময় তাঁহার জন্য সমস্ত স্থির করিয়া, তাঁহার প্রতীক্ষায় আছি, পত্র পাইলাম—তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ হইয়াছে, অতএব তিনি আসিতে পারিলেন না। তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে রাণাঘাটে আসিয়া আমার সঙ্গে কিছু বেশী দিন থাকিবেন। কারণ, কলিকাতার হট্টগোলে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল থাকিতেছে না। তাঁহার বিশ্বাস যে, রাণাঘাটের জল বাতাস ভাল না হইলেও, তাঁহার নাতি নাতিনীর স্নেহে ও শুশ্রূষায় সে অভাব পূরিত হইবে। হা ভগবান্! আমাদের এ আশাও পূর্ণ করিলে না! ইহার পরে একদিন আমার প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা লিখিলেন যে সেই দিনই বঙ্কিমবাবুর অস্ত্রচিকিৎসা (operation) হইবে। অবস্থা ভাল নহে। সকলেই বড় চিন্তিত হইয়াছেন। তাহার দুই দিন পরে সংবাদপত্রে মর্ম্মাহত হইয়া দেখিলাম যে, এই শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যের সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছেন। তিনি একবার 'বঙ্গ-দর্শনে' লিখিয়াছিলেন যে, যে দেশে এক শতাব্দীতেও একজন বড়লোক জন্মগ্রহণ করে, সে দেশ ভাগ্যবান্। এ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের উর্ব্বর ও ভাগীরথী-বিধৌত পবিত্র ক্ষেত্রে বহু বড়লোক—ধর্ম্মজগতে রামমোহন ও রামকৃষ্ণ, এবং সাহিত্যজগতে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কাল বড় বিষম পরীক্ষক। তথাপি পূজ্যপাদ রামকৃষ্ণ পরমহংস, দয়ার সাগর, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের জন্মদাতা বিদ্যা-সাগর, ক্ষণজন্মা হতভাগ্য মধুসূদন, এবং প্রতিভার বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অমরত্ব বোধ হয়, মহাকালের অগ্নিপরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইবে। পরমহংসদেব এখনই অবতার ভাবে এক সম্প্রদায় দ্বারা গৃহীত ও পূজিত হইতেছেন। বঙ্গমাতা এই অধোগতির সময়েও রত্নপ্রসবিনী।

'কুরুক্ষেত্র কাব্য'

স্মরণ হয়, এলাহাবাদের 'কন্‌গ্রেস্' দেখিয়া, ফেনী ফিরিয়া আসিয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ 'রৈবতক' রচনা শেষ করিবার ৫ বৎসর পরে 'কুরুক্ষেত্র' রচনা আরম্ভ করি। 'রৈবতক' লিখিতে আমার ৩ বৎসর লাগিয়াছিল। তাহার কারণ, প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে

আমি গুরুতর কিছুই লিখিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু পর্য্যন্ত এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তিনি দুই দিকে দুই সামাদান জ্বালাইয়া, অনেক রাত্রি—সময় সময় রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত জাগিয়া তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কাজে কাজে প্রাতে ৮টা ৯টা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইতেন। আমার কি রকম কু-অভ্যাস, রাত্রি জাগা দূরে থাকুক, আমি অপ-রাহ্নেও কোন লেখাপড়ার কার্য্য করিতে পারি না। এমন কি, ছাত্রজীবনেও আমি বড় বেশী ক্ষণ প্রদীপের আলোকে অধ্যয়ন করিতে পারিতাম না। বলিয়াছি, চট্টগ্রাম স্কুলে পড়িবার সময়েও আমি অপরাহ্নে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘণ্টাখানেক এবং প্রাতঃকালে ঘণ্টাখানেক মাত্র পড়িতাম, এবং সমস্ত সন্ধ্যা পিতার বৈঠকখানার প্রান্তে বসিয়া গান ও খোস গল্প শুনিতাম, এবং আমোদ দেখিতাম। এ অভ্যাস আমার চিরদিনই রহিয়া গিয়াছে। চিরদিন—এমন কি, বড় বড় সবডিভিসনে কার্য্য করিবার সময়েও আমি ১২টার পূর্ব্বে প্রায় আফিসে যাই নাই এবং ৩।৪টার পর আফিসে থাকি নাই। তাহার পর গৃহে আসিয়া জলযোগ করিয়া সংবাদ-পত্রাদি পড়িতাম, এবং সূর্য্যাস্তের সময় হইলেই অশ্বপৃষ্ঠে, গাড়ীতে, কি পদব্রজে বেড়াইতে বাহির হইতাম। সূর্য্যাস্তের পর গৃহে আসিয়া শীতকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গৃহের প্রাঙ্গণে কিম্বা খোলা বারান্দায় অন্ধকারে বসিয়া বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতাম। কিম্বা গৃহে মৃদু আলোকে বসিয়া সঙ্গীত শুনিতাম। অতএব প্রাতঃকাল মাত্র আমার লেখার সময়। এ জন্য আমি উষাসময়ে শয্যাত্যাগ করিয়া মুখ প্রক্ষালনের পর প্রাঙ্গণে উষার শোভা দেখিয়া কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে বেড়াইতাম। তাহার পর প্রভাত হইলে চা, কি কোকো, কি শুধু দুধ রুটি খাইয়া ৯টা পর্য্যন্ত নির্বিষ্টমনে আপন কার্য্য করিতাম। এই তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমাকে প্রত্যহ বহু পত্র লিখিতে হইত, এবং সবডিভিসনের ডাক খুলিয়া 'অফিসিয়াল' চিঠিপত্র ও রিপোর্টাদিও লিখিতে হইত। অবশিষ্ট সময়টুকু মাত্র আমি আমার কবিগিরিতে নিয়োজিত করিতে পারিতাম। ইহার ফলে এই হইত যে, কোনও দিন কিছুই সময় পাইতাম না। এমন কি, মাসের পর মাস, কখনও বা (যেমন 'রঙ্গমতী' লিখিবার সময়) বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিছুই লিখিবার সময় পাই নাই। কারণ, প্রাতঃকাল ভিন্ন অপরাহ্নে, কি প্রদীপালোকে আমি একটি অক্ষরও লিখিতে পারি না। এমনও হইয়াছে যে, একটা লাইন অসম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। বহুদিন পরে আবার যখন লিখিতে বসিয়াছি, পূর্ব্বে কি লিখিতে যাইতেছিলাম, তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। সেই অসম্পূর্ণ লাইন পূর্ণ করিতে পারি নাই। কখনও বা পূর্ব্বকল্পনা ভুলিয়া টানিয়া টুনিয়া উহা কোনও মতে শেষ করিয়াছি। তাহার উপর সমস্ত জীবন চাকরির ও সংসারের উৎপাতে সাংসারিক শান্তি কাহাকে বলে, আমি বড় জানি নাই। তবে শ্রীভগবান্ চিত্তের যে একটুক স্বাভাবিক প্রসন্নতা আমাকে দয়া করিয়া দিয়াছেন, তাহা শত বিপদেও অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া আমি বাঁচিয়া আছি, এবং বন্ধুবর্গ সকলেই আমাকে পরম সুখী মনে করেন। তাহার কারণ, আমি কোন দুঃখকে কখনও আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করিতে দিই নাই। বিপদ্ আসিল, দুঃখ আসিল, তাহার নিবারণের একটা যথাসাধ্য উপায় স্থির করিলাম। তাহার পর শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া প্রসন্নচিত্তে সেই কর্ত্তব্যের পথে চলিলাম। এ সকল কারণে আমার কোনও কাব্য আমি অল্প সময়ে লিখিতে পারি নাই। ছুটিতে আপন বাড়ীতে ছিলাম বলিয়া যৌবনের প্রথম উদ্যমে কেবল 'পলাশির যুদ্ধ'খানি মাত্র তিন মাসে লিখিতে পারিয়াছিলাম। 'রঙ্গমতী' লিখিতে পাঁচ বৎসর লাগিয়াছিল। এক এক বৎসরের পর এক এক সর্গ লিখিবার সময়ও শান্তি পাইয়াছিলাম। তদ্রূপ 'রৈবতক' লিখিতে তিন বৎসর লাগিয়াছিল। এ সময়ে আমি ফেনী সবডিভিসনটি নূতন করিয়া সৃজন করিতে-ছিলাম, এবং দীর্ঘকাল পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম। 'কুরুক্ষেত্র' লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া উহা ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ফেনীতে বঙ্গোপসাগরতীরে শিবিরে শেষ করি। তখন বন্ধুবর ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের

সংগে পত্রের দ্বারা বিশেষ আত্মীয়তা হইয়াছে। অতএব কুরুক্ষেত্রের হস্তলিপি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাঠাইলাম। কুরুক্ষেত্রে দুর্ব্বাসাচরিত্র আরও ফুটাইবার জন্য তাঁহার একটি কৌতুক-মূর্ত্তি শিষ্য উপস্থিত করিয়াছিলাম। কাব্যখানি আগাগোড়া গাম্ভীর্য্যপূর্ণ করিলে একঘেয়ে হইবে আশঙ্কায় একটু হাস্যরসের সঞ্চার করিয়া, আলোক-ছায়ার ক্রীড়া দেখাইতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু ঠাকুরদাস বলিলেন যে, এরূপ (sublime) উচ্চরস বা শান্তিরস-প্রধান কাব্যে হাস্যকর ভাল লাগিবে না। তিনি দোহাই দিয়া এই শিষ্যকে বাদ দিতে লিখিলেন। অতএব শিষ্যকে বিদায় দিলাম। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, জরৎকারুকে বড় কৃষ্ণের শারীরিক রূপের মোহে মুগ্ধ করিয়াছি। তাহার মোহে একটু intellectuality and spirituality (জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতা) মিশাইলে ভাল হইবে। আমি লিখিলাম, কেহ কেহ শ্রীভগবানের রূপে মুগ্ধ হইয়া থাকে। অশিক্ষিতা সরলা ব্রজগোপীরা তাঁহার রূপে মুগ্ধা। তাই বৈষ্ণবদের শ্রীভগবান্ মদনমোহন। আমি সে জন্য জরৎকারুকে যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধা করিয়া থাকি—আর তাহাই করিয়াছি কি? জরৎকারুচরিত্রে কি intellectuality (মানসিকতা) নাই?—তবে এই প্রাচীন আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াছি। তাহার চরিত্রে আধ্যাত্মিকতা ঢালিতে গেলে সুভদ্রা ও শৈলজার সহিত তাহার চরিত্র অভিন্ন হইয়া পার্থক্যহীন হইবে। তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লিখিলেন—"আমি এত দিনে বুঝিলাম, আমরা সমালোচকগণ কত মূর্খ। আমি এমন মোটা কথাটা বুঝিতে পারি নাই।" তাহার পর সুরেশচন্দ্র সমাজপতির দ্বারা 'কুরুক্ষেত্রে'র হস্তলিপি হীরেন্দ্রবাবুর কাছে পাঠাই। তখনও উভয়ে আমার অপরিচিত। হীরেন্দ্রবাবু সাহিত্যে ইতিমধ্যে 'রৈবতকে'র সমালোচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মত জানিতে চাহি। তিনিও সেই শিষ্যকে বাদ দেওয়া অনুমোদন করিয়াছিলেন, এবং আর একখানি বহি ('প্রভাস') লিখিবার আমার সংকল্প না জানিয়া অনেক বিষয়ের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে 'কুরুক্ষেত্র' 'রৈবতকে'র সমান নহে। কারণ, ইহাতে 'গভীর দার্শনিকতা ও ঐতিহাসিক গবেষণা সেই পরিমাণ নাই।' তাঁহার পত্রের আরম্ভটি হীরেন্দ্রবাবুর বিনয়েরই যোগ্য—"একটি প্রবাদ আছে যে, ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠ কবি মলেয়ার নাটক লিখিয়া প্রথমে তাঁহার ধোবীকে শুনাইতেন। সে-ই তাঁহার দোষ-গুণের বিচার করিত। নবীনবাবু কুরুক্ষেত্রের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেখিতে দিয়া অনেকটা ফরাসী কবির অনুকরণ করিয়াছেন।"

যাহা হউক, 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিবার পূর্ব্বে তথাপি দুই জন কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তির একটু মত জানিতে পারিলাম। এ সৌভাগ্য আমার অন্য কোনও কাব্যের পক্ষে ঘটে নাই। সবডিভিসনে বা সদর ষ্টেশনে, যেখানে গিয়াছি, এক যশোহর ভিন্ন আর সাহিত্যপ্রিয় লোকের সাক্ষাৎ আমার ভাগ্যে বড় ঘটে নাই। সর্ব্বত্র কেবল মামলা মোকদ্দমার কথা। সাহিত্যের স পর্য্যন্ত প্রায় কাহারও মুখে শুনি নাই। অতএব সর্ব্বত্র লেখক আমি এবং পাঠক ও সমালোচক আমার পত্নী। 'কুরুক্ষেত্র' পর্য্যন্ত যখন যে সর্গ লিখিয়াছি, উহা শেষ করিয়া তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছি। তিনি পড়িতেন, সমালোচনা করিতেন। আমি নীরবে, এবং সেই সর্গের বিষয়ে নির্মজ্জিতচিত্তে শুনিতাম। মোটের উপর ঠাকুরদাস ও হীরেন্দ্রবাবু 'কুরুক্ষেত্রে'র অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। অতএব 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিতে আমার পুত্রপ্রতিম হতভাগ্য ভাগিনা কামিনীর কাছে পাঠাইলাম। কামিনী বি. এ. পড়িতেছে। সাহিত্যে তাহার বিশেষ অধিকার। কামিনী দেব-শিশু। এই দেবত্ব ব্রাহ্মসমাজের হাড়ি-কাষ্ঠে বলিদান পড়িল। হিন্দুরা পৌত্তলিক, বলিদান দেয় ছাগশিশু। ব্রাহ্মরা অপৌত্তলিক, বলিদান দেন মানবশিশু! কামিনী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভক্ত ছিল। তাঁহার কি এক বক্তৃতা হইবে। সে দারুণ শীতকালের একটা সমস্ত রাত্রি মই ঘাড়ে করিয়া কলিকাতা হইতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত বক্তৃতার বিজ্ঞাপন টাঙ্গাইয়াছে। তাহার অব্যবহিত ফলে তাহার সঙ্কটাপন্ন জ্বর হয় এবং সেই জ্বরে বহুদিন ভুগিয়া, কামিনী আমার হৃদয়ের একটা স্নেহ কক্ষ শূন্য করিয়া, তাহাতে

তাহার দেবত্বের স্মৃতিমাত্র রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। কামিনী 'কুরুক্ষেত্র' পড়িয়া আনন্দে অধীর হইয়া লিখিয়াছিল—"It will be the magnum opus of your life. It has no equal in the Bengali or any Literature." "ইহা আপনার সর্ব্বপ্রধান কাব্য। ইহার তুলনা বাঙ্গালা, কি কোনও সাহিত্যে নাই।" সে ধরিয়া বসিল যে, সে তাহার বন্ধু সান্ন্যাল কোম্পানীর দ্বারা বিলাত হইতে অক্ষর এবং ফুল আনাইয়া এরূপ ভাবে 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিবে যে, বাঙ্গলা মুদ্রাঙ্কণে একটা বিপ্লব উপস্থিত করিবে। অতএব 'কুরুক্ষেত্র' ছাপিতে বিলম্ব হইবে। আমি ইতিমধ্যেই গীতার মত অবসরসময়ে প্রথম 'চন্ডী'র ও পরে মেথু-লিখিত খ্রীষ্টলীলার শিক্ষাভাগের অনুবাদ করিলাম। উহা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্নীকে পড়ানই এই দুই অনুবাদেরও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কোনও ধর্ম্মশিক্ষক এমন সরল সত্য এমন সরল ভাষায় শিক্ষা দেন নাই। 'খ্রীষ্ট' লিখিবার ইহা আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। মনস্বী কৃষ্ণবিহারী সেন তাঁহার Liberal পত্রিকায় খ্রীষ্টের অনুবাদের ও তাহার মুখপত্রখানির অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্য ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন হইতে বুঝাইতেছেন, কিন্তু হিন্দুর পক্ষ হইতে এমন দক্ষতার সহিত আর কেহ বুঝাইতে পারেন নাই। কামিনী ৬ মাস পর্য্যন্ত 'কুরুক্ষেত্র' ফেলিয়া রাখিল। শেষে সে পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলে আর ফেলিয়া না রাখিয়া, উহা আড়ম্বর-শূন্য ভাবে ছাপিতে আমি জিদ করিলাম। লিখিলাম—সে বাঁচিয়া থাকুক, আমি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ তাহার ইচ্ছামত ছাপিব। এ অবস্থায় আমি ফেনী হইতে রাণাঘাট বদলি হইয়া আসিলাম। 'কুরুক্ষেত্রে'র শেষ প্রুফ যে দিন রাণাঘাটে পাইলাম, সেই দিনই কামিনীর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম, এবং অশ্রুজলে শেষ প্রুফ শেষ করিয়া, 'কুরুক্ষেত্রে'র আরম্ভে প্রকাশিত পত্রখানিতে তাহার স্মৃতি 'কুরক্ষেত্রে'র সঙ্গে জড়িত করিয়া দিলাম। হা ভগবান্! তুমি এরূপে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, আমার এই দেবশিশুটি তোমার দেবধামে লইয়া গেলে! তুমি দিয়াছিলে, তুমিই লইলে!

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হইল। সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটু sensation (আন্দোলন) হইল। সর্ব্বাগ্রে আমার দাদা লিখিলেন—"I have gone through the book twice in 3 days. I shall read it several times more and as often as I have time to spare. It is not for me to give an opinion as to its poetical beauties, but I shall say this only that it eminently sustains the reputation of the author of '*Plassey*'. It shows the elevation of the author's moral and spiritual plane as its predecessors showed his intellectual capabilities. Whether the philosophy of the *Gita* will come to men's business and bosom—specially of the men who bask in the sunshine of Western Civilization and science—is not free from doubt, but to me who unfortunately have remained unaffected by western enlightenment, your poem is a treasure which can not be put by. Having passed the prime of life in the pursuit of vain phantoms and while approaching rapidly the goal of all humanity it is a solace to me to find that you have sent me a gospel of grace and goodwill which I desired in my heart of hearts should guide my conduct." এরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ বহু পরিচিত ও অপরিচিত নর-নারীর পত্র আসিতে লাগিল, এবং সংবাদপত্রে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। এমন সময়ে বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাণাঘাটে আসিলেন। তাঁহার সহিত আমার এই প্রথম সাক্ষাতের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' লইয়া তাঁহার সহিত অনেক কথা হইল। তিনি

বলিলেন যে, অনেকের ধারণা যে, আমি বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' হইতে আমার কৃষ্ণচরিত্র লইয়াছি। আমি বলিলাম, বঙ্কিমবাবুর মত পূজনীয় ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমি শ্লাঘার কথা মনে করি। অনেক কবি—সেক্সপিয়ার পর্য্যন্ত, অন্য গ্রন্থ হইতে চরিত্র লইয়া তাঁহাদের জগদ্‌বিখ্যাত কাব্যাবলি রচনা করিয়াছিলেন। অতএব আমি বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র কৃষ্ণ লইয়া কাব্য লিখিয়া থাকিলে তাহাতে আমার বিশেষ নিন্দার কথা হইতে পারে না। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, আমি যখন এরূপ ভাবে কৃষ্ণচরিত্র হৃদয়ঙ্গম করি, তখন বঙ্কিমবাবু তাহার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার পত্রই তাহার প্রমাণ। তখন এই কাব্যের সঙ্গে বঙ্কিমবাবুর সংস্রব বর্ণনা করিয়া আমি সকল কথা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বঙ্কিমবাবুর পত্রগুলি দেখিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলে আমি দেখাইলাম। তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার মত অনেকের এই ভ্রান্ত ধারণা আছে। অতএব সাহিত্যিক সত্যের অনুরোধে এই পত্রগুলি ছাপাইয়া সাধারণের মন হইতে এই ভ্রান্তি দূর করা আবশ্যক। আমি বলিলাম, বঙ্কিমবাবু ভয়ানক অভিমানী। তাঁহার জীবিতসময়ে এই সকল পত্র ছাপা হইলে তিনি আমার মুখদর্শন করিবেন না। কিছুদিন পরে মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অধ্যাপক (Professor) ছিলেন। সে অবধি আমি তাঁহাকে গুরুর মত ভক্তি করি এবং তাঁহার সরল আড়ম্বরহীন দেবচরিত্রের জন্য আমি তাঁহাকে পূজা করি। তিনি আমার মুখে 'রৈবতক' শুনিতে চাহিলেন। 'বাঙ্গালে'র মুখে কবিতা শুনা! তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। 'রৈবতকে'র স্থানে স্থানে তিনি নিজে নির্ব্বাচন করিয়া পড়িতে দিলেন। পড়িলাম। তিনি আমার বাঙ্গলা আবৃত্তির বড় প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, আমার আবৃত্তিতে একটা বিশেষ আন্তরিকতা (feeling) আছে। 'রৈবতকে'র চরিত্রাবলি, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। দেখিলাম, তিনি 'রৈবতকে'র বড়ই পক্ষপাতী। অতএব 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হওয়া মাত্র তাঁহার কাছে 'গীতা', 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' এক এক খণ্ড উপহার পাঠাইলাম। তিনি আমাকে তৎসম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে যে ৪ খানি পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। একটু প্রয়োজন আছে।

(১)

শ্রীহরিঃ শরণম্‌। — নারিকেলডাঙ্গা, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু—

..."অপর দুইখানি গ্রন্থ (রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র) এখনও সমস্ত পাঠ করা হয় নাই; কিয়দংশ মাত্র পড়িয়াছি। কিন্তু যত দূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে দেখিলাম যে, গীতার ভূমিকায় আপনি কথায় যাহা বলিয়াছেন, আপনার উক্ত কাব্যদ্বয়ে কার্য্যে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আপনি উক্ত ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কাব্যে এবং ধর্ম্মগ্রন্থে রূপগত পার্থক্য থাকিলেও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেওয়াই উভয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। গীতোপদিষ্ট সেই চরম মনুষ্যত্বের নাম নিষ্কাম ধর্ম্ম।" এবং আপনার কুরুক্ষেত্রে যে উজ্জ্বল ত্রিমূর্ত্তি অপূর্ব্বভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, "——জ্ঞানবল, আত্মদান। ভক্তির নিষ্কাম সূত্রে সম্মিলিত সমপ্রাণ।" তাহাও সেই শিক্ষা দিতেছে।

আশা করি, ভগবৎকৃপায় আপনার 'মহাভারত' গানের সুগভীর ধ্বনি শুনিয়া, সংসার-কান্তারে পথশ্রান্ত ও বিষয়বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত পথিক অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে ও পরমানন্দে ধামে যাইবার পথের পথিক হইতে উৎসাহিত হইবে।...

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(২)

শ্রীহরিঃ
শরণম্। নারিকেলডাঙ্গা।
৬।১০।৯৪

কল্যাণবরেষু—

আপনার গত ১৪ই সেপ্টেম্বরের পত্র পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইচ্ছা ছিল, 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ সমাপ্ত করিয়া উহার উত্তর লিখিব। কিন্তু শুভ সঙ্কল্প সিদ্ধ হওয়ার পক্ষে অনেক বিঘ্ন সহজেই ঘটিয়া থাকে। এবং আমি কতকগুলি নিত্য (বা অনিত্যই বলুন) কর্ম্মের মধ্যে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, কাম্য কর্ম্ম করিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার পত্রের উত্তর দিতে আর অধিক বিলম্ব করা অনুচিত বিবেচনায় উক্ত গ্রন্থদ্বয় পাঠ সমাপ্তির পূর্ব্বেই এই পত্রখানি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আপনি যে এত ভক্তিপূর্ণ ও বিনীতভাবে আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, ইহা আমার গুণে নহে, ইহা কেবল আপনার হৃদয়ের গুণে। যে হৃদয় সমস্ত জগৎ—

'অনন্তে অন্তের ক্রীড়া চির সম্মিলন'

এই ভাবে দেখে এবং বিচিত্র কল্পনাকৌশলে অপরকে চিত্রিত করিয়া দেখাইতে পারে, সে হৃদয় যে ভক্তি ও বিনয়পূর্ণ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। আপনি আমার একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র এবং আমি আপনাকে 'তুমি' না বলিয়া 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। ইহাতে আপনি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কোন ক্ষোভের কারণ নাই। এরূপ সম্বোধন বর্ত্তমান স্থলে স্নেহের অভাবব্যঞ্জক নহে। আপনি এক সময়ে আমার একজন অতি সুশীল ছাত্র ছিলেন বলিয়া, আপনার প্রতি যে স্নেহ ছিল, তাহার কিছুমাত্র ন্যূনতা হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে আপনি একজন চিন্তাশীল পরমার্থপরায়ণ কবি বলিয়া আপনার প্রতি যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহা সেই স্নেহের সহিত মিলিত হওয়ায়, আপনার প্রতি এমন একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে যে, অন্তরে সামান্য ছাত্রের স্থান অপেক্ষা বিশিষ্ট স্থানে আপনাকে রাখিতে ইচ্ছা হয়। এবং সেই জন্যই আপনাকে সামান্য ছাত্রের ন্যায় সম্বোধন করি নাই।

আপনি আমার এখানে সুযোগমত এক দিন আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আসেন, তাহা হইলে পরম সুখী হইব। 'রৈবতক' এবং 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ করা সমাপ্ত হইলে, সময় পাইলেই আপনাকে পুনরায় লিখিব। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

শ্রীহরিঃ
শরণম্। নারিকেলডাঙ্গা,
২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০১।

কল্যাণবরেষু—

আপনার পত্র ও আপনার প্রদত্ত আপনার কৃত বঙ্গানুবাদ সহ মার্কণ্ডেয় চণ্ডী পাইয়াছি। 'চণ্ডী'খানি সাদরে গ্রহণ করিলাম। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে।

আপনার 'কুরুক্ষেত্র' নিশ্চিন্ত হইয়া পাঠ করিব, এই ভাবিয়া কিছু দিন তুলিয়া রাখিয়া-ছিলাম। কিন্তু মানুষ এ সংসারে নিশ্চিন্ত কখনই হইতে পারে না, এ কথাটা ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম। কথাটা মনে পড়িলে আর বৃথা বিলম্ব না করিয়া, পাঠ আরম্ভ করিয়াছি এবং একাদশ সর্গ পর্য্যন্ত পড়া হইয়াছে। পাঠ করিয়া যে কি আনন্দ লাভ করিতেছি, তাহা এই দুর্ব্বল লেখনী ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

'রৈবতক' পাঠ করা সমাপ্ত হইলে আপনাকে বলিয়াছিলাম, কবিতা শ্রেণীবিভক্ত করিতে হইলে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, বহির্জগৎ-বিষয়ক ও অন্তর্জগৎ-বিষয়ক ও আপনার

কবিতা এই দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত ; আর সেই জন্যই আপনার কাব্যে দুই এক স্থানে, কর্ণে যেটা ভাষার পারিপাট্যের অভাব বলিয়া বোধ হইতে পারে, মনে সেটা বাস্তবিক অভাব বলিয়া বোধ হয় না। বহির্জগতের ভাব মনে প্রতিফলিত করিতে হইলে, ভাষা যতটা অবলম্বনীয়, অন্তর্জগতের ভাব মনে উদ্ভাসিত করিবার জন্য ততটা নহে, বরং শেষোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাষার পারিপাট্য অপেক্ষা সরল স্বাভাবিকতা অধিক উপযোগী এবং আবশ্যক। আমার এই ধারণা 'কুরুক্ষেত্র' পাঠে আরও দৃঢ়তর হইতেছে। এবং এই কাব্যের ভাষার সরল সৌন্দর্য্যে মন অতিশয় আকৃষ্ট হইতেছে। রৈবতকের উদ্যানে কুমারীব্রত-নিরতা ভদ্রার যে প্রেমময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়াছিলাম, কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমর-প্রাঙ্গণের পার্শ্বস্থ শিবিরে নিশাকালে অস্ত্রাহত বীরগণের শুশ্রূষণে ও মর্ম্মাহত কারুর সান্ত্বনায় নিযুক্তা সেই অনন্ত প্রেমের পবিত্র মূর্ত্তির পূর্ণ বিকাশ দর্শনে এই অপূর্ব্ব ছবি যে কবির কল্পনাপ্রসূত, তাঁহাকে ধন্য মনে করিতেছি ও সত্যই যে, 'কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক' আপনার এই কথার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতেছি।

অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যে কৃষ্ণচরিত্রের তো কথাই নাই। নবম সর্গে দ্বাপরে কৃষ্ণলীলার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা চমৎকার হইয়াছে।

অভিমন্যুর চরিত্র আপনার কল্পনার আর একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রে সুভদ্রার অমানুষী কমনীয়তা ও অর্জ্জুনের অলৌকিক বীরত্ব একাধারে মিলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। দশম সর্গে কর্ণচরিত্রে আধিপত্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষার নিকট বীরের সদ্‌গুণের পরাজয় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের চিত্রপটে একখানি বিচিত্র আধ্যাত্মিক যুদ্ধের চিত্রস্বরূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

কাব্যের আখ্যায়িকাভাগেও আশ্চর্য্য রচনাকৌশল দৃষ্ট হয়। মহাভারতের মূল ঘটনা-গুলি যে একদিকে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন সংকল্পের ও অপর দিকে কৃষ্ণদ্বেষী দুর্ব্বাসার কৃষ্ণানুগত ক্ষত্রিয়দিগের নিপাতের জন্য ষড়্‌যন্ত্রের ফল, এইটি দেখাইয়া আপনি প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইয়াছেন। আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া অভিমান করি না, সুতরাং এ কথাটা কত দূর ঠিক, তাহা বলিতে অক্ষম। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান আছে, সুতরাং একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এরূপ অসাধু মন্ত্রণা হইয়াছিল, এ কথাটা ঠিক না হইলেই সুখী হইব।

'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে আপনি আমার মতামত উভয়ই জানিতে চাহিয়াছেন, অতএব অমতের দুইটি কথা এক্ষণে বলিতেছি। প্রথম কথাটা এই যে, কারুর চরিত্রটি এতই সুন্দর হইয়াছে যে, তাহাতে পতিব্রতাধর্ম্মের অভাবের আশঙ্কা হইলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। কারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, বাসুকির সহিত তাঁহার যে অসাধু সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহার প্রতিভূস্বরূপে কারু ঋষি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েন ও পরে পত্নীত্বে গৃহীত হইবেন অভিপ্রায় থাকে, এই কথা বা এইরূপ একটা কোন কথা বলা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই সুন্দর ছবিতে যে মলিনতা পড়িয়াছে, তাহা ঘুচিয়া যায়। দ্বিতীয় অমতের কথাটা এই যে, আপনি নবম সর্গে (১৩৯ পৃঃ) শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে বলাইয়াছেন—

"অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন।"

একথাটি একটু প্রাণে লাগে। আমার মনে হয়, এবং বোধ হয় আপনারও এই মত যে, "রোগ নাশ, রোগার্ত্তের আরোগ্য সাধন, ভবব্যাধি চিকিৎসার বিধি চিরন্তন।"

যদি এই দুইটি কথার সামঞ্জস্য করিয়া দেন, তবে বড় ভাল হয়। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যে অনেক বুঝিবার, অনেক চিন্তা করিবার, অনেক শিক্ষা করিবার বিষয় আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আমার বিবেচনায় সুভদ্রার চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানপ্রদ।

"উপজিল সুধা যথা সমুদ্র মন্থনে,
উপজিল গীতামৃত কুরুক্ষেত্র রণে,"
'কুরুক্ষেত্র' মহাকাব্যে, বঙ্গের 'নবীন' কবি,
মথিয়া কল্পনাসিন্ধু, প্রেমামৃত লভিলা তেমনি।
ক্ষীরাব্ধি মন্থনে সুধা, উঠে যবে পুরাকালে,
দেবে মাত্র দিলা হরি, ধরি রূপ বিশ্ববিমোহিনী।
এ যে প্রেমামৃত হেরি, আর্য্যানার্য্যে সমভাবে,
বিতরিছে কৃষ্ণানুজা, গুণে তিন ভুবনতোষিণী।
পাপ-পরিতাপ-তপ্ত, দুঃখ শোক রোগাক্রান্ত,
এসো জীব, লহ সুধা, পাবে শান্তি পিয়িলে অমনি।

আপনার কাব্যসুধাপানে 'চাপলায় প্রণোদিতঃ' হইয়া অনেক কথা লিখিলাম। ভরসা করি, পাঠ করিয়া হাসিবেন না। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ সমাপ্ত হইলে ইচ্ছা রহিল, আর একবার লিখিব। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

শ্রীহরিঃ শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা,
৯ই পৌষ ১৩০১

কল্যাণবরেষু—

'কুরুক্ষেত্র' পাঠ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আপনার পত্রের উত্তরে একখানি পত্র লিখিয়াছি। বোধ হয়, তাহা পাইয়া থাকিবেন। এই ক্ষণে কাব্যখানি সমস্ত পড়া শেষ হইয়াছে, এবং বলা বাহুল্য যে, পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বপত্রে যাহা বলিয়াছি, তদতিরিক্ত আর আমার অধিক বলিবার কথা নাই। তবে শৈলজার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই; এক্ষণে দেখিতেছি, এই চিত্রটিও অতি অপূর্ব্ব চিত্র; এমন কি, কোন কোন অংশে সুভদ্রার চিত্র অপেক্ষাও সুন্দর। সুভদ্রাকে পুত্রবিয়োগের পূর্ব্বে কখনও কোন দুঃখ অনুভব করিতে হয় নাই; শৈলজা বাল্যকাল হইতে দুঃখিনী ও অনাথিনী। অতএব যদিও উভয়েরই হৃদয় বিশ্বব্যাপী প্রেমের আধার, তথাপি শৈলজার চরিত্র অধিকতর সমুজ্জ্বল আদর্শ বলিতে হইবে। নায়ক নায়িকার প্রেমই অধিকাংশ কাব্যের মূল মন্ত্র, বিশ্বব্যাপী প্রেম আপনার এই কাব্যের মূল মন্ত্র। এই প্রেম একদা সংসারের বন্ধন ও জীবের মুক্তির হেতু। এবং যে কাব্যে এই মন্ত্র শিক্ষা দেয়, তাহাই প্রকৃত মহাকাব্য।

আর একটি কথা বলিবার আছে। দুর্ব্বাসার সম্বন্ধে ২১৪ পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা একটু নরম করিয়া বলিলেই ভাল হইত। ইতি।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তখনও হীরেন্দ্রবাবুর কুরুক্ষেত্রের সমালোচনা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয় নাই। অতএব এই পবিত্র স্নেহাশীর্ব্বাদ পত্র কয়খানি পাইয়া আমি যে কত আনন্দিত ও আশ্বস্ত হইলাম, তাহা আর কি বলিব। পূজনীয় গুরুদাসবাবুর পত্রগুলিন এখানে উদ্ধৃত করিবার আমার দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য—প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অধ্যয়নের সময় হইতে আমি তাঁহাকে এত ভক্তি করি, তাঁহার দেবচরিত্রের জন্য তাঁহাকে এরূপ পূজা করি যে, তাঁহার এই মঙ্গলাশীর্ব্বাদকে আমার জীবনীতে দেবনির্ম্মাল্যবৎ স্থান দেওয়া আমি উচিত মনে করি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের বিচারকের গুরুতর

কার্য্যভার বহন করিয়াও গুরুদাসবাবু কিরূপে বঙ্গসাহিত্যানুশীলন করেন, এবং তাঁহার কিরূপ সর্ব্বতোমুখী শক্তি, তাহা সমস্ত দেশ, বিশেষতঃ বঙ্গভাষাবিদ্বেষী ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী মহাশয়েরা বুঝিবেন। গুরুদাসবাবু যে দুইটি 'অমত' প্রকাশ করিয়াছেন, অন্ততঃ তাহার একটি (কারুর পতিব্রতাধর্ম্মের অভাব) আমার কাব্যত্রয় সম্বন্ধে সাধারণ অভিযোগ। অতএব এখানে এই দুটি অমত সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব। এ সকল পত্র পাওয়ার পর আমি গুরুদাসবাবুকে তদুত্তরে এক পত্র লিখি। প্রথমতঃ একটু তামাসা করিয়া লিখি—কারণ, গুরুদাসবাবুর মত এমন সুরসিক ও রসজ্ঞ বঙ্গদেশে অতি অল্প আছেন—তিনি হাইকোর্টের জজ, আমি ডেপুটি মাজিস্ট্রেট। হাইকোর্টের জজেরা আমাদের উপর 'রুল' জারি করিতে যেরূপ পটু, আমরা ডেপুটিরা কৈফিয়ৎ দিতেও সেরূপ পটু। অতএব তিনি যখন 'রুল' জারি করিয়াছেন, তখন আমাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। কৈফিয়ৎটি সংক্ষেপে এই—জরৎকারুর দোষ, সে দুর্ব্বাসার পত্নী হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমিকা। কিন্তু ব্রজগোপীদের কি স্বামী ছিল না, অথচ তাহারা কি কৃষ্ণ-প্রেমিকা ছিল না? তাহাদের কোন দোষ না হইলে গরিব জরুৎকারুরই বা দোষ হয় কেন? আর দ্বিতীয় 'অমত' সম্বন্ধেও সংক্ষেপে লিখিয়াছিলাম—যদি 'গীতা'র 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' কথা প্রাণে না লাগে, যাহার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তবে 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস' কথাটাই বা প্রাণে লাগিবে কেন? ইহার উত্তরে গুরুদাসবাবু যে পত্রখানি লেখেন, তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীহরিঃ নারিকেলডাঙ্গা
শরণম্। ১৭ পৌষ, ১৩০১।

কল্যাণবরেষু

আপনার গত ২৮এ ডিসেম্বরের ভক্তিপূর্ণ পত্র পাইয়া মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। আপনি কৈফিয়ৎ বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহা সে ভাবে লইতে পারি না; আমার সন্দেভঞ্জনার্থ অনুগ্রহ-লিপি বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। আমি জানি, কবিরা যে রাজ্যে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহারা যে পদে অধিষ্ঠিত, তাহাতে তাঁহারা কাহারো নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। প্রকৃতই আপনি যেরূপ বলিয়াছেন—'কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক'।

আমিও আপনাকে যাহা লিখিয়াছি, তাহা কৈফিয়ৎ তলবের জন্য নহে। আপনি পূর্ব্ব-পত্রে 'কুরুক্ষেত্র' আমার কাছে "কেমন লাগিল" জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই জন্য যেখানে যেমন লাগিয়াছে, সরলভাবে লিখিয়াছি। আর এ সরলতায় যদি কোন গুণগরিমা থাকে, সে আমার নহে, সে আপনার ও আপনার কাব্যের। এ কথা কেবল শিষ্টাচারের মিষ্ট কথা নহে, কথাটা প্রকৃত কথা। গুণ আপনার বলি; কেন না, যদিও আমার ন্যায় একজন লোকের মতামতে আপনার কাব্যের কিছুমাত্র আসে যায় না, তথাপি অসামান্য উদারতা ও বিনয়ের সহিত আপনি গৌরব করিয়া আমার মতামত জানিতে চাহেন, এবং সেই জন্য সাহসী হইয়া আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করি, এবং গুণ আপনার কাব্যের বলি; কেন না, যদি এ কাব্য এরূপ গুণপূর্ণ ও দোষশূন্য না হইত এবং উহাতে যদি এমন কোন গুরুতর দোষ থাকিত, যাহা আপনাকে বলিতে গেলে আপনার মনে কষ্ট হইত, তাহা হইলে ব্যবসায়ী সমালোচক ভিন্ন কোন সামান্য পাঠক পুস্তক সম্বন্ধে অমতের কথা আপনাকে বলিতে পারিত না। আমি যেটুকু অমতের কথা বলিয়াছি, তাহা এত অল্প যে, তদ্বিষয়ে কথাটা ভ্রম না হইয়া ঠিক হইলেও নিশ্চিত বলা যাইতে পারে—

"একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই শেষ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, আমার অমতের কথা দুইটি ব্রজলীলা ও কৃষ্ণাবতারত্বের উপর অনাস্থাব্যঞ্জক বলিয়া আপনি দুইটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তখন আমার সাফাই জন্য দুই একটা কথা

না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ভরসা করি, নিজগুণে অভিযুক্ত ব্যক্তির বাচালতা ক্ষমা করিবেন।

আমার প্রথম কথার সম্বন্ধে আপনি বলিয়াছেন যে, 'ব্রজগোপীদিগের যদি পতিব্রতার অপলাপ না ঘটিয়া থাকে, তবে কারুর ঘটিতে পারে না।' কথাটা অতি গুরুতর, এবং অতি সঙ্কুচিতভাবে আমি ইহার উপর কথা কহিতেছি। স্বয়ং শুকদেবের মুখে ভাগবত শুনিয়াও শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মা পরীক্ষিৎ যে ব্রজলীলার মর্ম্ম স্থানে স্থানে বুঝিতে পারেন নাই এবং সন্দিগ্ধচিত্তে মুনিবরকে প্রশ্ন করিয়াছেন (যথা, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়, ১২ শ্লোকে ও ৩৩ অধ্যায়, ২৭—২৯ শ্লোকে) এই ঘোর কলির কালধর্ম্মাক্রান্ত কলুষিতচিত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি সামান্য মনুষ্য আমি যে সেই ব্রজলীলার তত্ত্ব ও সেই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিব, এমত আশা করি না। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি অবনতমস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু কাব্যের কথা যথাজ্ঞানে বিচার করিয়া স্বীকার করিব। বিশেষ ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণপ্রেম যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাঁহারা যেরূপ তন্ময় ও 'তদর্থ-বিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ' হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণকে দেখিতে যাইতে পান নাই, তাঁহারা যেরূপ কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন, কারুর কৃষ্ণপ্রেম সে ভাবে বর্ণিত বলিয়া বোধ হয় না।

আপনি 'কুরুক্ষেত্রে'র ৯৮ পৃষ্ঠা দেখিতে বলিয়াছেন। তথায় যাহা লিখিত আছে, আমার পূর্ব্বপত্র লিখিবার সময় তাহা উত্তমরূপ স্মরণ ছিল, কিন্তু তাহাতে আমার অল্প বুদ্ধিতে দোষ খণ্ডায় না। পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ নরনারীর মধ্যে কোন একজন বিবাহ অস্বীকার করিলেই যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবে, এমত হইতে পারে না।

ফলকথা, ব্রজলীলা শাস্ত্রোক্ত একটি অলৌকিক ব্যাপার, অলৌকিক শক্তির দ্বারা ইহার লৌকিক দোষভাগ অপসৃত হইত (যথা, ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়, ৩৮ শ্লোকে), যুক্তি ইহার মর্ম্ম ভেদ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রই ইহার একমাত্র প্রমাণ। কারুর পতিসত্ত্বে পতিকে ঘৃণা করিয়া পতিভাবে কৃষ্ণভজনা ব্রজলীলার অংশও নহে, তাহার অনুরূপও নহে, ইহা লৌকিক কবিকল্পনামাত্র ও কামনাপূর্ণ নায়িকার প্রেমভাব ইহাতে বিলক্ষণ লক্ষিত হয়। আর পতিব্রতাধর্ম্মও যে একটা ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতামাত্র ইহাও স্বীকার করিতে পারি না। অতএব আপনার চিত্রিত কারুর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেই যে ব্রজলীলার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হয়, এই গুরুতর অভিযোগটি যে কত দূর সঙ্গত, ইহার বিচার আপনি শাস্ত্রতঃ সুপণ্ডিত, আপনিই করিবেন।

কারু আপনার মানস কন্যা। কারুকে কোন্ রূপে সজ্জিত ও কোন্ গুণে ভূষিত করিলে ভাল দেখাইবে, আপনা অপেক্ষা তাহা আর অন্য কে বুঝিবে? এবং আপনার কাব্য আমা অপেক্ষা শতগুণে অধিক গুণগ্রাহী সহস্র সহস্র পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছে। আমি কেবল আমার নিজের কথা বলিতে পারি। তাহা একবার বলাতেই বোধ হয়, হেয় আত্মাভিমানের প্রচুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। তবে কারু দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক প্রতিভূস্বরূপে গৃহীত হইয়াছিল বলিলে, পুরাণের সহিত অসঙ্গত হয়—আপনি যে বলিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। অন্য কোন পুরাণে কিরূপ আছে, বলিতে পারি না, কিন্তু মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত আস্তীক পর্ব্বে (৩৮—৪৮ অধ্যায়) জরৎকারু উপাখ্যান যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহার সহিত কুরুক্ষেত্রে বর্ণিত কারুর বৃত্তান্তের বিশেষ মিল আছে বলিয়া বোধ হয় না। মহাভারতের জরৎকারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, জরৎকারু মুনির পত্নী, তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের কোন উল্লেখ দেখা যায় না; এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যান, (আস্তীকপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়), আস্তীক তখন গর্ভে, এবং জনমেজয়ের সর্পসত্রকালে আস্তীক বালক

ছিলেন (আস্তীকপর্ব্ব, ৫৬ অধ্যায়)। অতএব দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক কারু কেবল প্রতিভূস্বরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন বলিলে, মহাভারতের সহিত অধিকতর অসঙ্গত না হইয়া, বরং মহাভারতের কোন স্পষ্ট উক্তির সহিত অসঙ্গত হইত না। এবং পুরাণের সহিত অনৈক্যদোষের হ্রাস ভিন্ন বৃদ্ধি হইত না। আমার দ্বিতীয় অমতের কথা অর্থাৎ 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন'। এই কথার প্রতি কিঞ্চিৎ আপত্তি কৃষ্ণাবতারত্বের অস্বীকারব্যঞ্জক বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। এবং অভিযোগ প্রমাণার্থে ভগবদ্‌বাক্য গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোক 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' ইত্যাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য হয়, ইহা আমি অস্বীকার করি নাই এবং এ কথার প্রতি আমার আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু আপনি কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস' বলিয়া তাহার উপর আপনি আরও বলিয়াছেন 'নহে সংশোধন'। এই শেষোক্ত কথাটির প্রতিই আমার আপত্তি এবং সেই জন্যই উপরের উদ্ধৃত কথার সহিত 'রোগনাশ রোগার্ত্তের আরোগ্য সাধন' এই কথার সামঞ্জস্য করিয়া দিলে ভাল হইত বলিয়াছি। বাস্তবিক 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন' আপনার এই কথায় সহজেই এই বুঝায় যে, অধার্ম্মিকের গতি ধ্বংস ও পরিণামে তাহার আর সংশোধন বা মুক্তি নাই। এ কথা ভগবদ্‌বাক্যের বা শাস্ত্রের অনুমত বলিয়া বোধ হয় না। বরং যে সকল দুষ্টেরা ভগবান্ কর্ত্তৃক নিহত হয়, তাহারা নিধনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে মুক্তি বা সদ্‌গতি লাভ করে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ শাস্ত্রে রহিয়াছে। আমার আপত্তি যে কেবল আমার কলুষিত বুদ্ধির ভ্রম, ইহাও স্বীকার করিতে পারি না। বিশুদ্ধ-চেতা কৃষ্ণলীলাতত্ত্ববিশারদ শ্রীধর স্বামী আপনার উদ্ধৃত গীতার শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন, "ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং যথাহুঃ লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে, তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি।" যদি ভগবান্ কর্ত্তৃক দুষ্টের নিগ্রহ, মাতা কর্ত্তৃক অর্ভকের তাড়নের সহিত তুলনীয় হয়, তবে সেই নিগ্রহ বা বিনাশ কখনই সংশোধনের বিরোধী হইতে পারে না, বরং সংশোধননিমিত্ত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র ও যুক্তির অনুমোদিত, এবং তাহা না হইলে পাপীর গতি নাই। অধর্ম্মের ধ্বংস হইবে, কিন্তু সংশোধন নাই, এ কথা পাপপরিতাপতপ্ত প্রাণে যে, কত দূর কঠোর লাগে, তাহা আপনার ভক্তিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় বোধ হয় বুঝিতে পারে না।

আপনি যদি 'অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন' এই স্থলে 'নহে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'তাহে' বা 'ধ্বংসে' বা 'তবে' বা 'পরে' বা এরূপ অন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে আর কোন আপত্তি থাকিত না।

আপনি বলিয়াছেন যে, কৈফিয়ৎ দিতে আপনারা পটু। লোকে বলে, একটু সুযোগ পাইলেই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতে এবং একবার অভিযোগ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আর ছাড়িয়া না দিতে আপনারা অধিকতর পটু। যাহা হউক, আপনার দুইটি অভিযোগ সম্বন্ধে সাফাই স্বরূপে যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম। বিচারে যাহা কর্ত্তব্য করিবেন।

আমার আর একটি বিনীত নিবেদন আছে। যাহা লিখিলাম ও পূর্ব্বপত্রে যাহা লিখিয়াছি, আপনার কাব্যের সমালোচনা বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। আমি সমালোচকের উচ্চাসন-গ্রহণাভিলাষী নহি। বঙ্গভাষায় ও অন্যান্য ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য অনেকগুলি আছে, তাহার দুই একখানি পাঠ করিয়াছি। আপনার কাব্যও তাহার মধ্যে গণনীয়। ভাল কাব্য মাত্রই পাঠ করিলে আনন্দ হয়। কিন্তু যে কারণে 'কুরুক্ষেত্র' আমার এত ভাল লাগিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই যে, বিশ্বব্যাপী প্রেম ও নিরভিমান আত্মবিসর্জ্জনের এমন

সুন্দর ছবি অতি কম দেখিয়াছি, এবং জীবের তাপিত প্রাণে এমন শান্তিবারি সেচন করিতে পারে, এরূপ কাব্য অতি কম পড়িয়াছি। যে দুইটি স্থানে আমার অল্পবুদ্ধিতে এই ভাবের একটু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহারই মাত্র উল্লেখ পূর্ব্বপত্রে করিয়াছি। এই পত্রখানি সমালোচনাবিষয়ক নহে, একপ্রকার কৃষ্ণকথা ও তত্ত্বকথাবিষয়ক বটে, এই জন্য ইহা নিরভিমান ভাবে লিখিব বলিয়া সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু এ সঙ্কল্পসিদ্ধির আশা অধিক নাই, তবে আপনার ন্যায় হরিপরায়ণ সাধু ব্যক্তির নিকট ক্ষমার আশা সম্পূর্ণ রাখি। কিমধিকমিতি।

আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহার উত্তরে আমি সংক্ষেপে লিখিলাম যে, তাঁহার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রের উত্তর দিব, সেই বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' আমি কেন লিখিয়াছি, তাহাদের চরিত্রাবলি কেন এরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছি, জরৎকারুর চরিত্রই বা কেন এরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছি, তাহা আমি কিছুই জানি না। কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি যেরূপ লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি। কোনও সর্গ লিখিতে বসিলে ও যদি কেহ সেই সর্গে কি লিখিব জিজ্ঞাসা করিত, আমি তাহা বলিতে পারিতাম না।

এই উপলক্ষ্যে এখানে এক দিনের ঘটনা বলিব। হীরেন্দ্রবাবু ইহার পরে যে 'কুরুক্ষেত্রে'র সমালোচনা প্রকাশ করেন, তাহাতে বলিয়াছেন যে, আমি 'কুরুক্ষেত্রে'র 'ব্যাধ' সর্গে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান কারণ কর্ণকে যেরূপে কুন্তী-দুর্ব্বাসার কানীন পুত্র বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি, উহা একটা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু এ সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিবার সময়েও আমি জানিতাম না যে, আমি এ কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত করিব। তখনও এরূপ ধারণা আমার ছিল না। সর্গ শেষ হইল, স্ত্রীকে পড়িতে দিলাম, পড়া শেষ হইল। উভয়ে নীরবে ফেনী-দীর্ঘিকার নীল নির্ম্মল সলিলহিল্লোলের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দীঘির উত্তর তীরে আমার গৃহের সম্মুখস্থ গোল বারাণ্ডাটি আমার লিখিবার স্থান। সম্মুখে বিস্তৃত দীর্ঘিকা ও তাহার চারি তীরস্থ মদ্‌রোপিত নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষ-শ্রেণীর শোভা। বহু ক্ষণ দুজনে নীরবে স্তম্ভিতভাবে রহিলাম। বহু ক্ষণ পরে স্ত্রী বলিলেন—"করিলে কি? কর্ণ দুর্ব্বাসার পুত্র, এ কথা ত মহাভারতে নাই।' আমি বলিলাম—"এই সর্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে আমিও তাহা মনে করি নাই। কিন্তু এখন ভাবিতেছি, কর্ণ দুর্ব্বাসার পুত্র বলিয়া মহাভারতে পরিষ্কার না থাকুক, দুর্ব্বাসার অভিচার-মন্ত্র-পুত্র বলিয়া ইঙ্গিতও আছে। মন্ত্রবলে ভীষণ অগ্নিমণ্ডল সূর্য্য মানবীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন, এই আষাঢ়ে গল্প যাঁহারা বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা কর্ণকে দুর্ব্বাসা-কুন্তীর কানীন পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য। আর তাহা হইলে কর্ণ, ভারতের অদ্বিতীয় বীর ও দাতা কর্ণ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াও, কেন পাপিষ্ঠ কাপুরুষের মত দুর্য্যোধনের সকল পাপের প্রশ্রয় দিয়া কৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল, আমরা তাহা বুঝিতে পারি। তাহা হইলে মহাভারতের সমস্ত ঘটনাবলি আমরা এই নূতন আলোকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।"

সর্ব্বশেষ গুরুদাসবাবুকে লিখিলাম যে, কারুচরিত্র কুরুক্ষেত্রেও শেষ হয় নাই। আমার আর একখানি বহি লিখিবার আকাঙ্ক্ষা আছে। যদি শ্রীভগবান্ শক্তি, শান্তি ও আয়ুঃ দেন, এবং তাঁহার কৃপায় 'প্রভাস' লিখিতে পারি, তবে একদিন গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই বিষয়ের বিচার হইবে। সে পর্য্যন্ত তাঁহার Judgment suspend (বিচার স্থগিত) করিতে আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিলাম। ইহার উত্তরে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত শেষ পত্রখানি পাইলাম।

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা
৩ মাঘ ১৩০১

কল্যাণবরেষু—

আপনার প্রীতি ও ভক্তিপূর্ণ পত্রখানি পাঠ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলাম। এত প্রেম ও ভক্তি আপনার হৃদয়ে না থাকিলে কি আপনি 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রে'র রচয়িতা হইতে পারিতেন? আপনি মহাভারতের ইতিহাসভাগ যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আপনার কাব্যপাঠে সুন্দররূপে বুঝিতে পারা যায়, এবং এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও একদিন আপনার সহিত কথা হইয়াছিল। অতএব ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনার কাব্যে আপনি যে গভীর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখাইয়াছেন, তৎপ্রতি যে আমি একেবারে লক্ষ্য করি নাই, এমত মনে করিবেন না। বোধ হয়, আমার পূর্ব্বপত্রেও এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছি। তবে এ সকল কথা যে বাহুল্যরূপে বলি নাই, তাহার কারণ এই যে, চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারা, মলিন হৃদয়কে বিমল করা, এবং তাপিত প্রাণে শান্তিবারি সেচন করা কাব্যের যে প্রধান গুণ, তাহা উক্ত দুইখানি কাব্যে এত অধিক পরিমাণে আছে যে, তাহাতেই মন মোহিত হইয়া যায়, অন্য গুণের আলোচনা করিবার অবসর থাকে না। আপনি 'প্রভাস' নামক আর একখানি কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। বলা বাহুল্য যে, তাহা পাঠ করিবার জন্য উৎসুক ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। আশীর্ব্বাদ করি, যাঁহার লীলা বর্ণনা করিতেছেন, তিনি আপনাকে কায়িক, মানসিক ও বৈষয়িক সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে রাখুন। ইতি। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এখানে গুরুদাসবাবুর 'দুইটি কথা' উদ্ধৃত করিব। প্রথম কথাটা এই যে, "জরৎকারুর চরিত্রটি এত সুন্দর হইয়াছে যে, তাহাতে পতিব্রতাধর্ম্মের অভাবের আশঙ্কা হইলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। জরৎকারু দুর্ব্বাসার পত্নী নহেন, বাসুকির সহিত তাঁহার যে অসাধু সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহার প্রতিভূস্বরূপে জরৎকারু ঋষি কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েন ও পরে পত্নীত্বে গৃহীত হইবেন অভিপ্রায় থাকে, এই কথা বা এইরূপ একটা কোনও কথা বলা যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে মলিনতা পড়িয়াছে, তাহা ঘুচিয়া যায়।" আমার ব্রজগোপীদের দৃষ্টান্তের উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন—ব্রজগোপীরা "যেরূপ তন্ময় ও 'তদর্থবিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামা' হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণকে দেখিতে পান নাই, তাঁহারা যেরূপ কৃষ্ণবিরহে প্রাণত্যাগ করিলেন, জরৎকারুর কৃষ্ণপ্রেম সে ভাবে বর্ণিত বলিয়া বোধ হয় না।" তাহা ত হইবারই কথা নহে। আমি ত আর ঠিক ব্রজগোপীর চিত্র আঁকিতে যাই নাই। 'প্রভাস' পড়িয়া গুরুদাসবাবু বুঝিয়া থাকিবেন যে, গরিব জরৎকারুও 'তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামা'। তবে এটি যখন জরৎকারুচরিত্র সম্বন্ধে সাধারণ অভিযোগ, তখন আমাকে তৎসম্বন্ধে ও গুরুদাসবাবুর প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে দুটি কথা এখানে বলিতে হইল। মহাভারতে ত জরৎকারু অবিবাহিতা নহে, তবে আমি তাহাকে অবিবাহিতা বলিয়া চিত্র করিলে কি মহাভারতের সঙ্গে মিল হইত? মহাভারতে জরৎকারু কেবল বিবাহিত নহে, যে আস্তীক সর্পসত্র, বা পরীক্ষিতের দ্বারা অনার্য্য নাগধ্বংস নিবারণ করে, জরৎকারু সে আস্তীকের মাতা। অতএব জরৎকারুর বিবাহও একটা ঐতিহাসিক সত্য, এবং মহাভারতের কেন্দ্রস্থ ঘটনা। তবে জরৎকারু প্রকৃতপ্রস্তাবে যে দুর্ব্বাসার পত্নী নহে, বিবাহটি একটি ছলনা মাত্র, এবং জরৎকারু প্রকৃতই গুরুদাসবাবুর প্রস্তাবিত সন্ধির প্রতিভূমাত্র, তাহা আমি উভয় দুর্ব্বাসা ও জরৎকারুর মুখে প্রকাশ করিয়াছি।

> "দুর্ব্বাসা আমার নহে পতি,
> আমি পত্নী নহি দুর্ব্বাসার;
> উভয় উভয়ে মাত্র দেখি
> উভয়ের সেতু আকাঙ্ক্ষার।"

অতএব ব্রজগোপীদের কৃষ্ণপ্রেম দূষণীয় না হইলে কারুর কৃষ্ণপ্রেম কোনও মতে দূষণীয় হইতে পারে না। কারণ, ব্রজগোপীদের স্বামী (conventional) ছল-স্বামী নহে, তাহাদের প্রকৃত স্বামী ছিল, এবং ব্রজগোপীরা কৃষ্ণকে লইয়া যাহা করিয়াছিল, কারু তত দূর কিছুই করে নাই। অথচ এই হতভাগিনীর উপর যত চোট। কেবল একজন সবডেপুটি মাত্র একদিন জরৎকারুর অনুকূলে দুটি কথা বলিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"জল-প্লাবনে প্রজাবর্গের কিরূপ ক্লেশ হইয়াছে, তদন্ত জন্য একটুক দূরে যাইতে হইয়াছিল। 'কুরুক্ষেত্র' সঙ্গে লইয়াছিলাম। জানি না, মাথা মুণ্ড কি কাজ করিয়া আসিলাম—কি দেখিলাম। তবে এই পর্য্যন্ত মনে হয় যে, বাহিরে যেরূপ প্লাবন, ভিতরে তাহা অপেক্ষা শতগুণে অধিক প্লাবন অনুভব করিয়াছি। আত্মহারা হইয়া অশ্রুস্রোতে বুক ভাসাইয়াছি। **তোমার কারু,** তোমার শৈলজা, তোমার উত্তরা ও অভিমন্যু, আর তোমার সুভদ্রা ও সুলোচনা কাব্যজগতে অতুলনীয়।" কারুর নামই সর্ব্বপ্রথম, অতএব কারুই সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার কাছে অধিক ভাল লাগিয়াছিল। গুরুদাসবাবুর দ্বিতীয় 'অমত'—

"অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস, নহে সংশোধন।"

আমি ইহা এই অর্থে লিখিয়াছিলাম যে, অধর্ম্মের যখন **শেষ অবস্থা** উপস্থিত হয়, তখন তাহার সংশোধন হইতে পারে না, তাহাকে ধ্বংস করিতে হয়। এই মত আমার নহে—গীতার। গীতাও বলেন, অধর্ম্মের এই শেষ বা চরম অবস্থা হইল

"সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের, করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে জনম গ্রহণ।"

কই, গীতা দুষ্কৃতের সংশোধনের কথা বলেন নাই। তবে গুরুদাসবাবু ঠিক বলিয়াছেন যে, এরূপ অধর্ম্মীদের ধ্বংসেই উদ্ধার। ধ্বংস না করিলে ইহাদের অধর্ম্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী পাপভারে পূর্ণ করিবে। এই পাপভার মোচনের জন্যই শ্রীকৃষ্ণাবতার। কুরুক্ষেত্রই এই পাপভার মোচনের ভীষণ দৃষ্টান্ত। শ্রীকৃষ্ণ কত প্রকারে শান্তিপথে সংশোধনের চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হন। শেষে সংশোধন অসম্ভব হইলে কুরুক্ষেত্রে এ অধর্ম্ম ধ্বংসিত হয়।

এই সময়ে আমি রাণাঘাটে থাকিতেই 'নব্যভারতে' কুরুক্ষেত্রের এক ক্ষুদ্র সমালোচনা বাহির হইল। তাহার আরম্ভেই প্রবন্ধলেখক লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমবাবু ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃষ্ণের জীবনব্রত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন। ...আমরা যখন কুরুক্ষেত্র প্রথম বার পড়িলাম, তখন বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম, কি নবীনচন্দ্র পড়িলাম, তাহা ঠিক থাকিল না। আবার পড়িলাম ; তখন দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা, নবীনচন্দ্রের মাদকতা বা কবিত্বে মিশ্রিত হইয়া আমাদিগের স্বর্গভ্রান্তি উপস্থিত করিয়াছে। এই দুই শক্তি যদি নবীনবাবুর নিজস্ব হইত, তবে বোধ হয়, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাঁহার অনেক পশ্চাতে যাইতেন। কুরুক্ষেত্রের মৌলিক কল্পনায় নবীনবাবু সম্পূর্ণরূপে বঙ্কিমবাবুর নিকট ঋণী।"

তাহার পর প্রবন্ধলেখক শ্রীকৃষ্ণকে এক চোট খুব গালি দিয়াছেন। আমি 'নব্যভারতে'র সম্পাদক মহাশয়কে তখনও চিনিতাম না। অবশ্য জানিতাম, তিনি একজন ব্রাহ্ম, এবং ভ্রাতৃভাবাপন্ন ব্রাহ্মসমাজের সাড়ে তিন দলের বহির্ভাগে তাঁহার নিজের এক স্বতন্ত্র বেদি। তিনি একাই এক দল। আমি তাঁহাকে লিখিলাম—

রাণাঘাট
১০।১০।৯৩

শ্রদ্ধাস্পদ—

'নব্যভারতে' আমার 'কুরুক্ষেত্রে'র সমালোচনার জন্য আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা গ্রহণ করিবেন।

মহাভারত, কি মহাভারতের অধিনায়ক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আপনার ও আমার এক মত হইবে, আমি সে আশা করি না। অতএব সে সম্বন্ধে কিছু বলিব না। কেবল একটা কথা অযাচিত বলিতে আসিলাম। ক্ষমা করিবেন।

বঙ্কিমবাবুর মত দেবপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমার মত ক্ষুদ্র লোকের শ্লাঘার কথা। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' কল্পিত ও সূচিত হয় ১৮৮২ ইংরাজিতে, বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, আমার যতদূর স্মরণ হয়, ১৮৮৪ ইংরাজিতে। ১৮৮২ ইংরাজিতে 'রৈবতক' ও তৎপরবর্ত্তী আরও দুই খণ্ড কাব্যের plot বঙ্কিমবাবু, কালীপ্রসন্নবাবু ও প্রফুল্লবাবু দেখিয়াছিলেন এবং বঙ্কিমবাবু 'রৈবতকে'র প্রথম কয়েক সর্গও দেখিয়া তাহাদের নীচে যে মন্তব্য এবং তিনখানি কাব্যের plot ও তৎসূচিত কৃষ্ণচরিত্র ও ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া যে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমার কাছে আছে। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন যে, রৈবতক লিখিত হইবার প্রায় এক বৎসর পরে যখন উহার অর্দ্ধেক মুদ্রাঙ্কণ হইয়া গিয়াছে, তখন বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' মাসে মাসে বাহির হইতেছিল, এবং ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন কৃষ্ণজীবনের উদ্দেশ্য, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছিল। অতএব স্বয়ং বঙ্কিমবাবু এবং প্রফুল্লবাবু ও ঈশানবাবুই আমার সাক্ষী যে, রৈবতক কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে আমি বঙ্কিমবাবুর কাছে ঋণী নহি। তবে তাঁহার কাছে আমি এ পরিমাণে ঋণী যে, তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত না হইলে 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' শিক্ষিত সমাজে স্থান পাইতে পারিত কি না সন্দেহ।

আর একটি কথা। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কৃষ্ণ, এবং 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্রে'র কৃষ্ণ কি এক? আপনার মত প্রেমিক ভক্ত ও চিন্তাশীল ব্যক্তি যদি এরূপ বলেন, তবে আর কাহাকে কি বলিব? বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম সংস্করণে শ্রীমদ্ভাগবত একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণে যদিও ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ব্রজলীলার ব্যাখ্যার সঙ্গে 'কুরুক্ষেত্রে' কৃষ্ণমুখে তাঁহার বাল্যজীবনের ব্যাখ্যা মাত্র একবার মিলাইয়া দেখিবেন কি?

ইচ্ছা আছে, পূজার বন্ধে আপনার মত পবিত্র প্রেমিক ভক্তের দর্শন লাভ করিয়া জীবন কৃতার্থ করিব। এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, প্রয়োজন হয়, সে সময়ে বলিব।

প্রীতিপ্রার্থী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

কিন্তু 'নব্যভারত'-সম্পাদক ব্রাহ্ম, আমি কর্ম্মদোষে হিন্দু। তিনি ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী; আমি কৃষ্ণভক্ত। অতএব আমার কথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি আমার কাছে বঙ্কিমবাবুর চিঠিগুলি চাহিয়া পাঠাইলেন। আমি লিখিলাম যে, সেই সকল পত্র প্রকাশ করিতে হয়, আমি নিজে যথাসময়ে প্রকাশ করিব, তাঁহার হস্তে দিব না। তখন হীরেন্দ্রবাবু আমার কাছে লিখিলেন যে, যখন আমার উপর 'নব্যভারত' এরূপ প্রকাশ্যভাবে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যে, আমি আমার কৃষ্ণের জন্য বঙ্কিমবাবুর কাছে ঋণী, তখন আর আমার চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে। এখন বঙ্কিমবাবু জীবিত, অতএব এখনই সাহিত্যিক সত্যের অনুরোধে তাঁহার পত্রগুলি ছাপাইয়া দেওয়া উচিত। অন্যথা আমাদের মৃত্যুর পর এ বিষয় লইয়া একটা ঘোরতর গোলযোগ হইবে, এবং 'নব্যভারতে'র অভিযোগই সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। তখন বঙ্কিমবাবুর মূল পত্রগুলি নিতান্ত অনিচ্ছায় আমি হীরেন্দ্রবাবুর কাছে পাঠাইলাম, এবং তিনি নিতান্ত প্রয়োজন মনে করিলে, যাহাতে বঙ্কিমবাবু কোনওরূপে বিরক্ত না হন, ঠিক আমার উপরের উদ্ধৃত পত্রের ভাবে 'নব্যভারতে'র

অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে পারেন, এইরূপ লিখিলাম। তাহার পর 'কুরুক্ষেত্রে'র পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'নব্যভারত ও কুরুক্ষেত্র' প্রবন্ধ 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। কিন্তু তাহাতেও 'নব্যভারতে'র বিশ্বাস হইল না। তিনি আর এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন যে, যতক্ষণ এই সকল পত্রের আসল তিনি না দেখিবেন, এবং বঙ্কিমবাবু উহাদের প্রকৃত বলিয়া স্বীকার না করিবেন, ততক্ষণ তিনি উহাদের প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। 'নব্যভারতী' বিশ্বাস এমনই চিজ! এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য কি, তাহা প্রকাশ করিতে তিনি বঙ্কিমবাবুকে আহ্বান (challenge) করিলেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু ব্রাহ্ম বিশ্বাসের দুর্ভাগ্যবশতঃ 'চিনাবাজারি' ভাষায়, একেবারে "speak টি not" হইয়া রহিলেন। একজন বন্ধু বলিলেন—নিমে দত্ত বলিয়াছিল যে, বড়মানুষের ছেলেগুলি মদ ছাড়িবে, আর আমি আরন্ধ খাইয়া মরিব। সে জন্য 'সুরাপান-নিবারণী' সভার উপর সে ভারি চটা ছিল। তুমি হিন্দুধর্ম্মের ও শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রচার করিবে, আর ব্রাহ্মরাও আরন্ধ খাইয়া মরিবে। অতএব 'নব্যভারত' তোমাকে 'চোর', 'জালিয়াৎ' ও তোমার শ্রীকৃষ্ণকে 'বদমায়েস' বলিবে না কেন? যাহা হউক, গোবিন্দ অধিকারী ইহার পরে গাইয়াছেন—"কি কথা তা জানিনে বাপ! কি কথা।"

স্মরণ হয়, 'নব্যভারত' ইতিপূর্ব্বে একবার প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি রাণাঘাটে গিয়া সমালোচনার জন্য সম্পাদকদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছি। বলা বাহুল্য, এটি ঘোরতর মিথ্যাপবাদ। তবে তাঁহার দ্বারে কখনও যাই নাই, এ কথা ঠিক। সে দিন সুরেশ লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালীর গালি বিষয়গত নহে, ব্যক্তিগত।

এখানে আর একটি কথা বলিব। বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম খণ্ড উপহার পাইয়া আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, তিনি ব্রজলীলা কেন অবিশ্বাস করিয়াছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি একমাত্র কারণ দিয়াছেন যে, যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন কি না, সে বিষয়ে যখন কৃষ্ণের অভিমত চাহিলেন, তখন কৃষ্ণ জরাসন্ধের উপাখ্যান বিবৃত করিবার উপলক্ষ্যে তাঁহার বাল্যজীবনের দুই একটি যাহা প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা বলিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার বৃন্দাবন-বাসের ও ব্রজলীলার কোনও উল্লেখ করেন নাই। এই বলিয়াই বঙ্কিমবাবু তাহা অনৈতিহাসিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি লিখিলাম যে, বঙ্কিমবাবু নিজেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের বাক্‌সিদ্ধি ছিল, অর্থাৎ তিনি নিষ্প্রয়োজনীয় কোনও কথা কখনও বলিতেন না। তবে জরাসন্ধকে বধ না করিলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন না, এ কথা বুঝাইতে গিয়া, কৃষ্ণ কেন ব্রজলীলা বা বৃন্দাবনে বাল্যে যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আবৃত্তি করিবেন? আর বঙ্কিমবাবু মহাভারতের কৃষ্ণই ঐতিহাসিক কৃষ্ণ বলিতেছেন। কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণের কি ভারতের কোনও স্থানে পূজা হয়? সমস্ত ভারতেই ভাগবতের কৃষ্ণের পূজা। ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, সমস্ত ভারতবর্ষ এরূপ সত্যের পূজা না করিয়া একটি অনৈতিহাসিক মিথ্যার এত কাল পূজা করিতেছে? বঙ্কিমবাবু আমার এ পত্রের কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ভূমিকায় ব্রজলীলাকে অনৈতিহাসিক বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন, স্বীকার করিয়া এই পূর্ণ সংস্করণে কৃষ্ণের বাল্যলীলার দীর্ঘ সমালোচনা করিলেন। আমি এবারও তাঁহাকে লিখিলাম যে, এবারও আপনি ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, কৃষ্ণ বড় সুন্দর ছেলে ছিলেন বলিয়া ব্রজগোপীরা তাঁহাকে বড় স্নেহ করিত, এই মাত্র। কৃষ্ণপ্রেম ও গোপীপ্রেম বা রাধাপ্রেম কথাটি মাত্র আপনি ইংরাজিনবিশদের ভয়ে মুখে আনেন নাই। কিন্তু চৈতন্যদেব যে কৃষ্ণপ্রেম, গোপ-গোপীপ্রেম ও রাধাপ্রেম লইয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন, নাচিতেন ও মূর্চ্ছিত হইতেন, তাহা কি একটি মিথ্যা কথা লইয়া? আমার বোধ হয়, আপনি এখনও ব্রজলীলা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। তাহার

কারণ, আপনি চৈতন্যদেবের বিদ্বেষী। আপনি বলিয়াছেন যে, চৈতন্যদেব অর্দ্ধেক বৈষ্ণবধর্ম্ম মাত্র বুঝিয়াছিলেন। বোধ হয়, চৈতন্যদেবের লীলা সম্বন্ধে কোনও বহি আপনি এই বিদ্বেষবশতঃ পড়েন নাই। ক্ষমা করিবেন, এই জন্য বোধ হয়, ব্রজলীলাও আপনি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম পূর্ণ সংস্করণ 'কৃষ্ণচরিত্র' বাঙ্গালী পাঠকদের অনুগ্রহে আমার হাতে নাই। প্রায় কোনও বহিই থাকে না। তাঁহার 'বসুমতী'র উপহার-সংস্করণের 'দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে' লিখিত আছে—'আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এ কথা আমার বক্তব্য। ...বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ।' কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর পরিবর্ত্তিত মত আমার 'রৈবতক' রচনার, স্মরণ হয়, প্রকাশেরও পর বাহির হইয়াছিল। যাহা হউক, হীরেন্দ্রবাবুর সমালোচনার পর এ সম্বন্ধে আমার নিজের আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম ভ্রাতাদের জিজ্ঞাসা করি, বঙ্কিমবাবুর এই পরিবর্ত্তিত মতের কৃষ্ণ, এবং আমার 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্রে'র কৃষ্ণও কি এক? বঙ্কিমবাবু ভাগবত উড়াইয়া দিয়াছেন। ভাগবতের ও মহাভারতের কৃষ্ণই কি 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্রের' কৃষ্ণ নহে? অন্যান্য বিষয়েও বঙ্কিমবাবু তাঁহার ইংরাজী পত্রের লিখিত মত বহু বৎসর পরে পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন—"যিনি বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছিলেন যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন—'বেদে ধর্ম্ম নহে ; ধর্ম্ম লোকহিতে'—আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।"

মোট কথা, হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার সমালোচনায় দেখাইয়াছেন যে, বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণচরিত্র' সূচিত হইবার বহু পূর্ব্বে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত, এবং তাহারও পূর্ব্বে রচিত, এবং বঙ্কিমবাবুর নামে উৎসর্গিত আমার 'রঙ্গমতী'তে কৃষ্ণলীলা নিম্নোদ্ধৃত কবিতায় সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম—

"অন্তর বিগ্রহে, বৎস! ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতি ছত্রে এই বহ্নিশিখা
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেব-চক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথম।
মহাজ্ঞানী, নিবাইতে ক্ষুদ্র বহ্নিচয়
ভস্মি উপরাজ্যগ্রাম, বিচিত্র কৌশলে
জ্বালাইয়া কুরুক্ষেত্রে সেই মহানল।
প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতির শোণিতপ্রবাহে
নিবিল সে মহাবহ্নি, ভারতে প্রথম
কৌরবের এক ছত্র হইল স্থাপন।
এই **মহাঅভিনয়** না হইতে শেষ,
সেই দেব অভিনেতৃ সম্বরিল লীলা
সিন্ধুপ্রান্তে, **গুপ্ত অস্ত্রে আততায়ি-করে।**"

হীরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমিও জিজ্ঞাসা করি, ইহাই কি 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'প্রভাসে'র মূলে তত্ত্ব নহে? 'রঙ্গমতী' যখন রচিত হইতেছিল, তখন বঙ্কিমবাবু কৃষ্ণ সম্বন্ধে 'অন্ধকার'পূর্ণ 'বঙ্গদর্শনী' মত প্রচার করিতেছিলেন। একজন অপরিচিত পত্রলেখক লিখিয়াছিলেন—"স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দেখিয়াছি, কিন্তু অবস্থাবিশেষে মনুষ্য যে মহান্ অভাব হৃদয়ে অনুভব করে, উক্ত গ্রন্থদ্বয় সে অভাব পূর্ণ করে না। উহা দার্শনিকের আদরের ধন ; কিন্তু ভক্তের হৃদয়ের মধুর ঝঙ্কার যেন উহাতে শুনিতে পাই নাই। আপনার 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' ভক্তের হৃদয়ের পুণ্য প্রস্রবণ।" কবি অক্ষয় বড়াল লিখিয়াছিলেন—"'নব্য ভারতে'র সমালোচক 'কুরুক্ষেত্র' সমালোচনে লিখিয়াছেন—'বুঝিলাম না, নবীনচন্দ্র পড়িলাম, কি বঙ্কিমচন্দ্র পড়িলাম।' যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে আপনি বঙ্কিমবাবু অপেক্ষাও প্রতিভাশালী। বঙ্কিমবাবু যাহা দার্শনিকতা ও ঐতিহাসিকতায় শেষ করিয়াছেন, তাহাকে আপনি মূর্ত্তি দিয়াছেন—জীবন

দিয়াছেন।" তবে আমি পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবুর কাছে এরূপে না হউক, অন্যরূপে চির-ঋণী। তিনি অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যবলে 'কৃষ্ণচরিত্র' না লিখিলে আমার এই তিন-খানি কাব্য বঙ্গ-সাহিত্যে দাঁড়াইতে পারিত কি না সন্দেহ। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশ সত্ত্বেও হেম-বাবুর মত লোক 'রৈবতক' পাঠ করিয়া এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহার পর বঙ্গমাতার বরপুত্র, এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় সমালোচক বাবু হীরেন্দ্র নাথ দত্তকৃত 'কুরুক্ষেত্রে' সমালোচনা সাহিত্যে প্রকাশিত হইল। হীরেন্দ্রবাবুর কাছে 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রে'র সমালোচনার জন্য আমি চির উপকৃত। দুঃখের বিষয়, রাজসেবায় আমার নানা স্থানে পরিবর্ত্তনে ও বাঙ্গালীর পাঠ করিতে লইয়া কোনও পুস্তক ফিরাইয়া না দেওয়ার অভ্যাসবশতঃ আমার কাছে তাঁহার সমালোচনা সম্পূর্ণ নাই। যদি কেহ সাহিত্যের এই সমালোচনার সংখ্যাগুলি আমাকে দিতে পারেন, আমি বড়ই কৃতজ্ঞ হইব। 'কলিকাতা রিভিউ'তেও 'কুরুক্ষেত্রে'র এক অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইল। তাহার এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"Babu Nabin Chandra Sen is undoubtedly the poet of the Hindu revival. . . .

He is now writing on Jesus Christ, now translating Gita, now making Bengali version of Markandya Chandi, and one absorbing purpose runs through all the works, namely that of reviving in the minds of his countrymen a respect for Hinduism. He interprets the story of Mahabharat and that of the great war at Kurukshetra as signifying a successful attempt at fusing the contending nations in India into one great nationality on the basis of a Catholic religion and a liberal social—organisation... They (the characters in the poem) are all ideals. The ideality of Krishna, Vyasa and Arjuna has already been explained. But the most charming figures are Shubhadra and her son Abhimanya....

The *Battle of Plassey* is well known. His *Abakash Banjinee* is also a good poem. It shows to full advantage the patriotism and courage with which our young men should be infused. His *Rangamati* is filled with vivid descriptions of nature, and for his power of delineating natural scenes he deserves to take prominent place among the poets of Bengal."

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে (History of Bengali Literature) লিখিয়াছেন—

"But perhaps Nabin Chandra Sen has struck a still deeper chord (than Babu Hem Chandra Banerji) in the hearts of his countrymen. His first great work, *Palashir Juddha,* came like a surprise and joy to his countrymen, and pleased the reading public by its freshness and vigour and its voluptous sweetness. His great epic on Krishna is still in progress, (since completed—*Raibatak, Kurukshetra* and *Provash*) and his last work *Amitabha* on the life and teachings of Buddha, somewhat after the style of Arnold's *Light of Asia,* sustains and enhances

the reputation of the great poet of the Hindu revival of the present day."

বঙ্গের একটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্র নন্দকৃষ্ণ বসু বহু দিন হইল, বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যবশতঃ চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নোয়াখালির মাজিস্ট্রেট থাকিতে 'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

"I have received a copy of your "*Kurukshetra*"—a work which is bound to immortalize you. The question whether Nabin or Hem Chandra is entitled to occupy the throne left vacant by Modhu Sudan, will, I think, now be settled once for all. You are aware, I am not a man much given to adulation. It is my honest opinion that by your present work, you have distanced all competitors.

I do not exaggerate when I say that I have no-where seen in Bengali literature such noble thoughts clothed in such beautiful language. Your style has much improved and chastened and the characters you have delineated have very seldom been surpassed. What a beautiful and happy idea that is to make Subhadra a Florence Nightingale. As for Sulochana, it is a chracter which only a Hindu can conceive or delineate."

কুরুক্ষেত্র এ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা আর এক অচিন্ত্যনীয় সম্মান লাভ করিল। স্বয়ং বৃটিশ-সিংহের ইহার উপর কৃপাকটাক্ষ পড়িল। বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের এক পত্র পাইলাম। তাহার এক অংশও নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The authorities of the British Museum have learnt from the Lieutenant Governor's address at the Asiatic Society that your book entitled *Kurukshetra* is very valuble and are anxious to preserve a copy in the Museum."

অর্থ—"এসিয়াটিক সোসাইটীর অধিবেশনে লেঃ গবর্ণর যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহার দ্বারা 'বৃটিশ মিউজিয়ামে'র কর্ত্তৃপক্ষেরা জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনার 'কুরুক্ষেত্র' পুস্তক অত্যন্ত মূল্যবান্, এবং এ কারণে তাহার এক খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষা করিতে তাঁহারা আগ্রহান্বিত।" জানি না, আর কোন বাঙ্গালা কাব্যের পক্ষে এ সম্মানলাভ ঘটিয়াছে কি না। 'বটতলা' হইতে উঠিয়া বাঙ্গালা ভাষা আমাদের জীবিত সময়ে 'বৃটিশ মিউজিয়ামে' স্থান পাইল, বাঙ্গালা ভাষার অভাবনীয় ও আশাতীত উন্নতির শ্রেষ্ঠতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে আমি এখনও কত ভক্তি উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র পাইয়া থাকি। জনৈক অপরিচিত ব্রাহ্মণের একখানি পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রীশ্রীহরি আড়বালিয়া।

১৩০৮।২৫ কার্ত্তিক শরণং

ওই সর্ব্ব শোক নিবারণ, দাঁড়াইয়া নারায়ণ,
শান্তি প্রস্রবণ।
শান্তির ত্রিদিব বুকে, পুত্রে সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ।
গাব সুখে কৃষ্ণনাম জুড়াব জীবন॥

মহাশয়!

আপনার এ উপদেশেও সর্ব্বতোভাবে শান্তি পাইলাম না। না পাওয়ার কারণ, আমি ঘোর পাতকী। ফলে, যাহা কথঞ্চিৎ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, তাহা আপনার রচিত কুরুক্ষেত্র কাব্যের বলে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ভাষাজ্ঞান আমার নাই যে, ভাষা দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া আপনাকে জানাই। আমি ব্রাহ্মণ না হইয়া যদি অন্য জাতি হইতাম, তাহা হইলে মনের সাধে হরি হরি বলিয়া আপনার চরণতলে গড়াগড়ি দিতে পারিলে, আমার হৃদয়ের জ্বালা অনেক পরিমাণে নির্ব্বাপিত হইত। আমার এমন সঙ্গতি নাই যে, চট্টগ্রামে গিয়া আপনাকে দর্শন করি। যদি মহাশয় কখনও কলিকাতায় আইসেন, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিবেন। আমি কুরুক্ষেত্রকাব্য রচয়িতাকে দেখিয়া মনের জ্বালা নিবারণ করিব।

"মিল মহাশয়"

"Frailty! thy name is woman."

কোনও স্থানে জ্যোৎস্নার পিতার সঙ্গে কাজ করিতাম। জ্যোৎস্নার পিতার মত এমন সদাশয়, সৎসাহসী ও তেজস্বী পুরুষ ও তাহার মাতার মত এমন শান্তি-প্রতিমা ও স্নেহ-ময়ী রমণী আমি বড় দেখি নাই। পিতা দেব, মাতা দেবী। তাঁহাদের দেখিলে আমার স্বর্গীয় পিতা মাতাকে মনে পড়িত। তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণ নন্দনের পারিজাত। তাহারা বঙ্গদেশের মহামূল্য রত্ন। পূজ্যপাদ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, এ পরিবারের গৃহ তাঁহার কাছে স্বর্গ বলিয়া বোধ হইত। একবার বাবু দীনবন্ধু মিত্র পোষ্ট-আফিস পরিদর্শন উপলক্ষ্যে আমার অতিথি হইলেন, এবং জ্যোৎস্নার পিতার গৃহে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিমন্ত্রিত হইলেন। আহারের বিলম্ব দেখিয়া তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহার নবপ্রকাশিত 'লীলাবতী' নাটক পঠিত হউক।

তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কাজেই কিছু অতিরিক্ত রকমের প্রশংসা করিতেন। কিছুক্ষণ সঙ্গীত হইয়াছিল. আমি তাহাতে 'জর্ম্মান সিলভারে'র একটি বড় ফ্লুট বাজাইয়াছিলাম। আমার তখন প্রথম যৌবন। রূপের, গুণের, ফুটোন্মুখ কবি-যশের. বিশেষতঃ চক্ষু দুটির প্রশংসায় আমি একরূপ উৎপীড়িত। সকলে বলিতেন যে, এত বড় চোক কেহ কখন দেখেন নাই। গ্রীষ্মকাল, বড় সুন্দর জ্যোৎস্না, সুরায় সঙ্গীতে সমুজ্জ্বল-তরা। এক বন্ধু গাইলেন—"এমন কালো রূপ নাই সংসারের মধ্যে অন্য।
নাই আর এমন বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন॥"

বন্ধুগণ আমার পিরাণ খুলিয়া, উড়ানিখানি ধড়ার মত পরাইয়া, হাতে ফ্লুট দিয়া, জোর করিয়া ত্রিভঙ্গ করাইয়া দাঁড় করাইলেন। আজ দীনবন্ধুবাবুও বলিলেন, আমি তাঁহার ললিতের আদর্শ। অতএব ললিতের পার্ট আমাকে দিলেন. এবং রসিকচূড়ামণি নিজে নদের-চাঁদের পার্ট গ্রহণ করিলেম। এ ভাবে পুস্তকের পাঠ আরম্ভ হইল। আমি তাঁহাদের পিতৃব্যের তুল্য সম্মান করিতাম, সলজ্জভাবে ললিতের পাঠ আবৃত্তি করিতে লাগিলাম। উহা আমার প্রায় মুখস্থ ছিল। আশৈশব আমার স্মরণ-শক্তি কিছু প্রখরা। কাজেই আমার আবৃত্তির খুব প্রশংসা হইতে লাগিল। পার্শ্বের কক্ষের একটি কপাটের আড়াল হইতে একটি নব-যুবতীর উজ্জ্বল বর্ণাভা অস্ফুট দেখা যাইতেছিল। বোধ হইতেছিল, যেন তিনি এ নূতনভাবে 'লীলাবতী' পাঠ বড় আনন্দের সহিত শুনিতেছিলেন। একজন বন্ধু বলিলেন. তিনি গৃহস্বামীর কন্যা, জ্যোৎস্না। দীনবন্ধুবাবু যে যে অঙ্ক নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার আবৃত্তি এরূপে শেষ হইলে, জ্যোৎস্নার পিতা জ্যোৎস্নার রচিত কয়েকটি কবিতা

আসিয়া দীনবন্ধুবাবুর হাতে দিলেন। তিনি উহা বড় করিয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। বালিকার প্রথম রচনা। তাহাতে দোষ ছিল। তিনি জ্যোৎস্নার লিখিত কবিতা আমার দ্বারা সংশোধিত করাইয়া লইতে তাহার পিতাকে অনুরোধ করিলেন, এবং আমাকেও উহার দোষ গুণ দেখাইয়া দিয়া তাহাকে উৎসাহ দিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর আমরা আহার করিতে গেলাম। আমার জুতা জোড়াটা কিছু কসা ছিল। আহারের পর উহা পরিতে আমার একটু বিলম্ব হইতেছে, আর সকলে বহির্বাটীতে চলিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ একটি নবযুবতী এক কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে বিদ্যুতের মত ছুটিয়া গেল। তাহার উজ্জ্বল বর্ণ-জ্যোৎস্নায় আমার চক্ষে ধাঁধা লাগিল।

"মাধব! অপরূপ পেখনু রামা।
কনকলতা জনু অম্বরে উয়ল
হরিণহীন হিমধামা।"

আমারও সেরূপ দৃষ্টিভ্রম হইল। বুঝিলাম, উহা জ্যোৎস্না। ইহার পর হইতে তাহার রচিত কবিতা সংশোধনের জন্য তাঁহার পিতা আমার কাছে পাঠাইতেন, এবং আমি উহা সংশোধন করিয়া তাঁহার কাছে ফেরত দিতাম। কোনটা বিশেষ ভাল হইলে পত্রিকাবিশেষ পাঠাইতাম, এবং উহা প্রকাশিত হইত। এরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। এক দিন জ্যোৎস্নার পিতার একজন ভৃত্য আমার জন্য কিছু খাবার লইয়া আসিল। সে বলিল—"দিদি ঠাকুরাণী শ্বশুরবাড়ী যাইতেছেন। আপনার জন্য কিছু খাবার পাঠাইয়াছেন।" পরে জানিতে পারিয়াছিলাম, খাবার জ্যোৎস্নার মাতা পাঠাইয়াছেন, কিন্তু তাহার কথার ভাবে জ্যোৎস্না পাঠাইয়াছেন মনে করিয়া, আমি যে তখন অপূর্ব্ব কাগজে একটি মোকদ্দমার মাথামুণ্ড রায় লিখিয়া সুবিচারের মুণ্ডপাত করিতেছিলাম, সে কাগজের এক টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়া পেন্সিলের দ্বারা জ্যোৎস্নাকে ধন্যবাদ দিয়া, কয়েক ছত্র লিখিয়া দিলাম। তিনি তাহার পর আপন বাড়ী চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে কোনও কারণে তাঁহার পিতার সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। তাঁহার মাতা আমার সাক্ষাতে বাহির হইয়া, আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম। কিছুদিন পরে জ্যোৎস্না ফিরিয়া আসিলেন। পিতা মাতা তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। দেখিলাম, জ্যোৎস্না সুতন্বী ও সুন্দরী। বর্ণ বৈশাখী জ্যোৎস্নার মত শান্ত শীতল সমুজ্জ্বল। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে ইউরোপীয়া বলিয়া ভ্রান্তি হইত। নব-যৌবন-সুলভ তেজ ও গর্ব্ব ফাটিয়া পড়িতেছে। তিনি আমার পত্নীর সমবয়স্কা, কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠা। কাজে কাজে তাঁহাদের মধ্যে, দুই পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত আত্মীয়তা হইল। পিতা জ্যোৎস্না ও তাঁহার স্বামীকে, আমাকে ও আমার পত্নীকে জোর করিয়া পাশাপাশি বসাইয়া কত আমোদ করিতেন, কত হাসিতেন ; মাতা কত আনন্দ প্রকাশ করিতেন। হায় দেব! এই হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ ধরাধামে তোমার সেই দেবত্বের ছায়াটিও যদি রাখিয়া যাইতে, আজ তাহাতে বুক পাতিয়া প্রাণ জুড়াইতাম! ইহার দুই তিন মাস পরে আমি সেখান হইতে স্থানান্তরিত হইলাম। পিতা মাতা, জ্যোৎস্না ও তাহার স্বামী, শিশু পুত্র কন্যাগণ পর্য্যন্ত বড়ই কাঁদিলেন তাঁহাদের হৃদয় এত সরল যে, তাঁহারা সকল কথা সহজে বিশ্বাস করেন। তাই পিতাকে লক্ষ্য করিয়া একটি কবিতায় লিখিয়াছিলাম—

সরল হৃদয় তব সহজ বিশ্বাস,
এক পূর্ণ শশধরে,
হৃদয়েতে রাজ্য করে,
উজ্জ্বলি বিমলালোকে হৃদয় আকাশ।
শুভ্র চিত্তপটে আহা!
যাহার যা ইচ্ছা তাহা,
সহজে লিখিতে পারে। কিন্তু সে লেখন
সলিলের লেখা যেন, থাকে না কখন।

মধ্যে একটা অমূলক কথা বিশ্বাস করিয়া দুই পরিবারের মধ্যে তিনি কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটাইয়াছিলেন। দেব-হৃদয় পিতা তাই আজ বিদায়ের সময়ে জ্যোৎস্নাকে আমার ভগিনীটির মত আমার কাছে বসাইয়া দিলেন। সে আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, আমার স্ত্রীর গলা জড়াইয়া, ভগিনীটির মত বড় কাঁদিল। আমরা বিদায় হইলাম।

বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের সঙ্গে দাসত্বের ঘূর্ণিচক্রে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কদাচিৎ জ্যোৎস্না আমাকে পত্র লিখিতেন। তাঁহার কোনও কবিতা পাঠাই-তেন। কোনও ঘটনা উপলক্ষ্যে তিনি একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, এবং উক্ত ঘটনা উপলক্ষ্যে তিনি একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার এক কপি আমার কাছে কিছু দিন পরে উপহার পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন যে, কলিকাতায় সেই মহাসমারোহে তিনি আমাকে এ দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাইবেন আশা করিয়াছিলেন, না দেখিয়া বড় নিরাশ হইয়াছেন। পত্রখানি পড়িয়া তাঁহাদের একবার দেখিতে প্রাণ আকুল হইল। এ সময়ে আমার শরীরও নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। আমি সেই দিনই তিন মাস ছুটির দরখাস্ত করিলাম, এবং তাহা মঞ্জুরীসাপেক্ষ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বেড়াইতে গেলাম। চারি দিক্ হইতে বন্ধুগণের নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, জ্যোৎস্নার পিতা মাতারও নিমন্ত্রণ পাইলাম। বঙ্কিমবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সেই তীর্থক্ষেত্রে কাঁটাল-পাড়ায় গিয়াছি। তিনি আমার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিবার জন্য ন্যাতি সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। বঙ্গের রসিকচূড়ামণি রসিকতার ও মাদকতার উচ্ছ্বাসে বলিলেন যে, জ্যোৎস্নারা তখন যেখানে ছিলেন, সেখানের কোনও বন্ধুর কাছে তিনি শুনিয়াছেন যে, আমি নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে যাইতেছি। কিন্তু আমি যদি যাই তবে সেখানের 'ছোক্‌রারা আমার ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিবে। আমি বিস্মিত হইয়া, আমার অপরাধ কি, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"জ্যোৎস্নাকে লইয়া সেই দেশটা ক্ষেপিয়াছে। ক্ষেপিবারই কথা। কারণ, শুনিয়াছি—তাহার মত রূপবতী ও গুণবতী রমণী বঙ্গদেশে আর নাই। তাহাকে দেখিয়া ছোক্‌রাদের মাথা বিগড়াইয়াছে। কেহ দেশত্যাগী হইতেছে, কেহ সন্ন্যাসী হইতেছে, কেহ পাগল হইতেছে। তাহাকে একটু দেখিবার জন্য কত ছোক্‌রা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তায় ঘুরিতেছে, গেটের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু কেহ তাহার ছায়ার কাছেও দখল পাইতেছে না। তাহাদের বিশ্বাস, তাহার কারণ তুমি,—সে তোমাকে ভালবাসে। কাজেই তোমার উপর তাহাদের বড়ই আক্রোশ।" আমি আরও বিস্মিত হইলাম, এবং তাঁহাকে বলিলাম যে, বহু বৎসর পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার পারিবারিকভাবে দুই তিন মাসের মাত্র পরিচয়। অতএব আমি গরিব 'বাঙ্গালে'র উপর তাহাদের এই আক্রোশের ত কোন কারণই নাই। তিনি বলিলেন—"তাহাই ত বরং তাহাদের বিশেষ ক্ষেপিবার কথা। একটা 'বাঙ্গাল' কোথায় দূরে দেশে বসিয়া কাপ্তানি করিবে, আর তাহারা কাছে থাকিয়া তাহার ছায়াটুকুও দেখিতে পাইবে না, ইহা কি সহ্য হয়?" হাইকোর্টে বেড়াইতে গিয়াছি। দেখিলাম, উক্ত স্থানের কোনও বিশিষ্ট ব্যারিষ্টারও সেই ক্ষেপার দলে। তিনি আমার প্রতি শাণিত অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনি দূরে থাকিলেই বা কি, আর দু দিনের পরিচয় হইলেই বা কি? সে আপনাকে ভালবাসে এবং অন্য কাহাকে (তাহার মধ্যে অবশ্য তিনিও আছেন) গ্রাহ্য করে না। মেডাম পেটি ডিউক আর্লদের পায়ে ঠেলিয়া একজন দরিদ্র গায়ককে বিবাহ করিয়াছে।" আমি তাঁহাকে তখন কিঞ্চিৎ শিষ্টাচার শিক্ষা দিলে, তিনি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অতএব আমি সভয়ে জ্যোৎস্নাদের দেখিতে গেলাম। গাড়ী হাতায় প্রবেশ করিতেছে। জ্যোৎস্না একটা গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়াছে। তাহাকে আমি চিনিতে পারিলাম না; কোনও ইংরাজ মহিলা বলিয়া আমার ভ্রম হইল। গাড়োয়ান ভুলে কোনও ইংরাজের বাড়ী আমাকে আনিয়াছে বলিয়া আমি গাড়ী থামাইলাম। সে বলিল,

সে বাড়ী চিনে। তথাপি আমি সভয়ে গাড়ী হইতে নামিলাম! জ্যোৎস্না ও তাহার মাতা আসিয়া বড় আদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। জ্যোৎস্না তখনই তাঁহার একটি রমণী বন্ধুকে সংবাদ দিয়া যে পত্রখানি লিখিলেন, তাহা আমাকে দেখাইলেন। তাহা স্নেহোচ্ছ্বাসে পূর্ণ। তাহার বন্ধুও তদ্রূপ উত্তর দিয়া, তৎক্ষণাৎ আমাকে দেখিতে আসিলেন। ইঁনি আজ পর্য্যন্ত আমাকে সহোদরের মত স্নেহ করেন।

তাঁহার কাছেও গল্পে গল্পে শুনিলাম, এবং নিজেও দেখিলাম, সত্য সত্যই ছোকরাগুলি ক্ষেপিয়াছে। হায়, বাঙ্গালীর অবরোধ-প্রণালী! কেহ কোনও ভদ্র মহিলাকে দেখিতে পায় না। যদি কেহ একটুক সেই প্রথা শিথিল করিয়া চলে তবে দেশ তাহাকে লইয়া ক্ষেপিয়া উঠে; একটি ভদ্র মহিলার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা উত্তর-ভারতবাসী জানে না। আমার স্ত্রীকে সময়ে সময়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। শশাঙ্ককুমার পর্য্যন্ত আমার স্ত্রীর সহিত, এমন কি, তাহার ভগিনী আমার পুত্রবধূর সহিত প্রথম সাক্ষাতে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা মনে হইলে এখনও হাসি পায়। এই ক্ষেপাদলের একজনের গল্প বলিব। আমি বেলা ১১টার সময়ে জ্যোৎস্নাদের গৃহে পেঁাছিলাম। ইঁনি ৪টার সময়ে উপস্থিত হইলেন। ইহাঁর পরিবারদের সঙ্গে জ্যোৎস্নার পরিবারের খুব আত্মীয়তা। ইঁনি একজন আমার কবিতার পক্ষপাতী বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে রাত্রিতে আরও দুই চারিটি বন্ধুর সহিত আহার করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ের আলাপে বড় আনন্দে সন্ধ্যা কাটাইলাম। আমি দেখিতেছিলাম যে, তিনি আমার প্রতি জ্যোৎস্নার ব্যবহার বরাবর লক্ষ্য করিতেছিলেন। আহারের পর বসিয়া আছি, হঠাৎ তাঁহার উদরে ব্যথা উপস্থিত হইল। তিনি শয্যা লইলেন। সমস্ত পরিবার অস্থির হইলেন। ডাক্তার ডাকিতে বলিলেও তিনি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, এরূপ তাঁহার সময়ে সময়ে হইয়া থাকে, কিছুকাল পরে সারিয়া যায়। তিনি বাড়ী যাইবার জন্য তাঁহাদের গাড়ী চাহিলেন। তাঁহার এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইতে তাঁহারা অসম্মত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, গৃহের এক প্রান্তভাগে, তাঁহার ও আমার স্বতন্ত্র পালঙ্কে শয্যা হইল। মহিলাগণ অপর প্রান্তের কক্ষে থাকেন। মধ্যের কক্ষে জ্যোৎস্নার ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য আত্মীয়গণ থাকেন। ভদ্রলোকটি পালঙ্কে পড়িয়া, থাকিয়া থাকিয়া আহা! উহু! করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তাঁহার বড় কষ্ট বোধ হইতেছে। একবার বলিলেন—"জ্যোৎস্নারা বুঝি শুইতে গিয়াছেন। পরের জন্য পরে তার কত ক্লেশ স্বীকার করিবেন?" আমি বলিলাম—"অনেক রাত্রি হইয়াছে। তাঁহারা ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা এতক্ষণ আপনার সুশ্রূষা করিয়া, এবং আপনাকে নিদ্রিত মনে করিয়া, এইমাত্র শুইতে গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের ডাকিয়া দিব কি?" তিনি মানা করিলেন, এবং বলিলেন, আর তাঁহাদের কষ্ট দিবেন না। বলিলেন—"ইহাঁরা বড় ভাল লোক। তাঁহাদের সঙ্গে আপনার বহু দিনের পরিচয়। জ্যোৎস্নাকে আপনার কিরূপ বোধ হয়? জ্যোৎস্না একজন অদ্বিতীয়া রমণী,—না?" আমি বলিলাম, তাঁহাদের ও আমার পরিবারের মধ্যে বড় অল্প দিনের পরিচয়। আমি তাঁহাদের বিষয় বিশেষ কিছু জানি না। তিনি তাহার পর 'আহা! উহু! মলাম! গেলাম!' করিয়া, হাঁচিয়া কাশিয়া ও মধ্যে মধ্যে নিদ্রার ভাণ করিয়া সমস্ত রাত্রিটা নিদ্রা গেলেন না, এবং অনুগ্রহ করিয়া গরিব আমাকেও নিদ্রাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না। আমার সন্দেহ হইল, তাঁহার পেটের ব্যথাটার ষড়্‌যন্ত্র মাত্র; তিনি আমায় পরীক্ষা করিবার জন্য এই প্রহসন অভিনয় করিতেছেন। চাপা হাসিতে আমার পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন। বলিলেন, বাড়ী চলিয়া যাইবেন। আমি বলিলাম, হিমে গেলে তাঁহার অসুখ বাড়িবে। একটুক অপেক্ষা করুন, তাঁহাদের জাগাইয়া দিই, তাঁহাদের গাড়ী করিয়া

বাড়ী যান। তিনি বলিলেন যে, তিনি ভাল হইয়াছেন, আর তাঁহাদের কষ্ট দিবেন না। তিনি গন্ধমাদনবৎ এক প্রকাণ্ড পাগড়ি তাঁহার চাদরের দ্বারা মস্তকে বাঁধিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া গেলেন। আমি চৌকাঠের উপর বসিয়া সেই মূর্ত্তিখানি দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম। তিনি অদৃশ্য হইয়াছেন, এমন সময়ে জ্যোৎস্না ও তাঁহার জনৈক কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ইনি বি. এ. পড়িতেছিলেন—উঠিয়া আসিয়া রোগী পলাতক দেখিয়া অবাক্ হইলেন। প্রশ্ন—তিনি কোথায়? উত্তর—পলাতক। প্রশ্ন—সে কি? তিনি কখন গেলেন? উত্তর—এইমাত্র। প্রশ্ন—কেমন করিয়া গেলেন? উত্তর—মাথায় এক প্রকাণ্ড পাগড়ি বাঁধিয়া। জ্যোৎস্না হাসিতে লাগিলেন। ভ্রাতা বলিলেন—"দিদি! তোমার ভারি অন্যায়। ভদ্রলোকটির অসুখ, সুখ আমাদের উপর চটিয়া চলিয়া গেল, আর তুমি হাসিতেছ।" আমাকে বলিলেন—"দাদা! তাঁহার সত্য সত্যই অসুখ হইয়াছিল,—না? আমাদের বড় অন্যায় হইয়াছে। আমাদের পালা করিয়া তাঁহার কাছে একজন থাকা উচিত ছিল। থাকি নাই বলিয়া বোধ হয় তিনি চটিয়া গিয়াছেন।" দেব-পিতার, দেবী-মাতার উপযুক্ত দেব-শিশু।

প্রাতে চা সেবন করিয়া ভ্রাতাভগিনীর অধ্যয়ন-কক্ষে গল্প করিতেছি; কাহার কি একখানি পত্রের কথা উঠিলে জ্যোৎস্না দেয়াল হইতে তাঁহার চিঠির ফাইলটি লইয়া সেই চিঠিখানি আমাকে দেখাইলেন। তাঁহার সহিত কাহার কাহার চিঠি-লেখালেখি আছে দেখিবার জন্য, তাঁহার সমস্ত পত্রগুলি উলটাইয়া দেখিলাম এবং তাঁহার রমণী-বন্ধুদের পত্রগুলি বিশেষ করিয়া পড়িলাম। ফাইল দেখা শেষ হইলে ভ্রাতাভগিনী হাসিয়া উঠিলেন, এবং ভ্রাতা বলিলেন—"দিদির ভারি অন্যায়। এত লোকের পত্র রাখিয়াছেন, কিন্তু আপনার একখানি পত্রও রাখেন নাই।" আমি বলিলাম, আমি রাখিবার উপযুক্ত কোনও পত্র ত তাঁহাকে লিখি নাই। এমন সময়ে সেই ভদ্রলোকটি উপস্থিত। ভ্রাতা ভগিনী ও জননী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার রোগের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—ভাল হইয়াছেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া স্থানটি দেখাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন বলিয়া গাড়ী লইয়া আসিয়াছেন। আমি ভাবিলাম, তিনি আর একটা কি মতলব ঠাওরাইয়াছেন। দুজনে নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে সাহিত্য ও নানা বিষয়ে আলাপ করিলাম। তিনি আমার একজন ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেন। দেখিলাম, আমার 'অবকাশরঞ্জিনী' ও 'পলাশির যুদ্ধ' তাঁহার কণ্ঠস্থ। আমি মনে করিলাম, আমি বুঝি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। তাঁহার হৃদয়ে যে বিদ্বেষমেঘ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা বুঝি সরিয়া গিয়াছে। তিনি একজন উচ্চ অঙ্গের শিক্ষিত ও আমার সমবয়স্ক যুবক। তাঁহার প্রতিও আমার শ্রদ্ধা হইল। মনে করিলাম, অগ্নি দেখিলে পতঙ্গ ক্ষেপিয়া উঠে। ইনিও সেরূপ ক্ষেপিয়াছেন।

ফিরিয়া আসিয়া, মধ্যাহ্ন আহারের পর হলে গিয়া দেখিলাম, মেজেতে আমার জন্য বিছানা পাতা হইয়াছে। বুঝিলাম, অন্য কক্ষে আমার সঙ্গে একাকিনী বসিয়া আলাপ করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া জ্যোৎস্না এখানে শয্যা করাইয়াছেন। আমি শয়ন করিলাম। আমার দিবানিদ্রা অভ্যাস আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলাম—আমি-দাসত্ব-জীবীর পক্ষে উহা অসম্ভব। তখন তিনি এক 'ফুটষ্টুল' লইয়া, এবং মা একখানি 'কুসনযুক্ত' চেয়ার লইয়া, আমার শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। আমাকে মেজেতে বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া, স্নেহময়ী সরলা মা আমার গায়ে লাগিবে বলিয়া জ্যোৎস্নাকে ভর্ৎসনা করিলেন। আমার অসুস্থতার জন্য তাঁহারা বড় দুঃখ করিলেন। মা বলিলেন, আমার চেহারা এরূপ মন্দ হইয়াছে, আমাকে তাঁহারা অন্য স্থানে দেখিলে চিনিতে পারিতেন না। এত কাল দেখেন নাই, আমি বড় দূরে থাকি, এ জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করিয়া, জ্যোৎস্নার দ্বারা সময়ে সময়ে পত্র লেখাইয়া আমার খবর লইয়া থাকেন। থাকেন। নিকটে কোনও স্থানে বদলি হইয়া আসিতে তিনি মাতার মত বারম্বার অনুরোধ করিলেন। তিনি উঠিয়া গেলে, জ্যোৎস্না তাঁহার কয়েকটি

রচনা পড়িয়া শুনাইলেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ অমনস্কা। কি যেন কিছু বলিবেন, অথচ বলিতে পারিতেছেন না। শেষে কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আচ্ছা, সত্য সত্য বলুন দেখি, সকালে ফাইলে আপনার কোনও চিঠি নাই দেখিয়া আপনি কি একটুক দুঃখিত হন নাই? আমাকে বড় কৃতঘ্না মনে করেন নাই? আপনার পত্রগুলি আপনি দেখিতে চাহেন কি?" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া গিয়া, একটি কারুকার্য্যখচিত হাতীর দাঁতের ক্ষুদ্র বাক্স আনিলেন, এবং তাহার ভিতর হইতে সাটিনের রুমাল বাঁধা এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া বলিলেন—"আপনার কোন্ চিঠি দেখিতে চাহেন বলুন। মা জলখাবার পাঠাইলে আপনি ভুলক্রমে আমাকে এক টুক্‌রা সামান্য কাগজে পেন্‌সিলের লেখা যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা দেখিবেন কি? উহাই আমার কাছে আপনার প্রথম পত্র। পত্রখানি বহু দিন আমি আমার অঞ্চলে বাঁধিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।" কি সুন্দর স্নেহপূর্ণ ঈষৎ হাসি হাসিয়া পত্রখানি আমাকে দেখাইলেন ও গদগদকণ্ঠে পড়িলেন! তাহার পর চিঠির পর চিঠি দেখাইতে লাগিলেন। তিনি ছলছলনেত্রে বলিলেন—"ফাইলে গাঁথিয়া রাখা দূরের কথা, দেখুন—পত্রের খামগুলি পর্য্যন্ত আমি এমন সাবধানে খুলিয়াছি যে, খামটি কি খামের উপরের অক্ষরটি পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই।" আমার চক্ষু হইতে কি একটা আবরণ পড়িয়া গেল। আমার সমস্ত দেহ ও হৃদয় অমৃতে সিক্ত হইল। আমি আত্মহারা হইলাম। নয়নে কি যেন এক স্বর্গ খুলিয়া গেল। আমি আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি শয্যায় বসিয়া, তাঁহার দুই কর দুই করে লইয়া ঊর্দ্ধমুখে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহার অশ্রুপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলাম—"জ্যোৎস্না! তুমি দেবী। আমি এই দশ বৎসর অদৃশ্য থাকিয়া তোমাকে দেবীর মত পূজা করিয়াছি ও ধ্যান করিয়াছি। আমি জানিতাম, তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু সে ভালবাসা যে আমার ভালবাসার মত গভীর ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ, তাহা জানিতাম না। আমি বড় ভাগ্যবান্। কিন্তু আমি তোমার এ স্বর্গীয় ভালবাসার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তুমি বড় অপাত্রে তোমার এই দুর্লভ ভালবাসা অর্পণ করিয়াছ।" তাহার মুখ আমার মস্তকের উপর হেলিয়া পড়িল। জ্যোৎস্না উচ্ছ্বাসভাবে কেবল একটি কথা বলিলেন—"নবীন! তোমার এই সরলতাই আমি এত ভালবাসি।" দুই জনের অশ্রুধারা পড়িতেছিল, অশ্রুতে অশ্রু মিশিতেছিল। আজ সেই দৃশ্য স্মরণ করিয়া আনন্দাশ্রুতে আমার বক্ষঃ সিক্ত হইতেছে। এই মরুময় জগতে রমণীহৃদয়ই স্বর্গ, রমণীর ভালবাসাই অমৃত। সেই দিন সন্ধ্যায়ও তাঁহাদের উপরোক্ত বন্ধু, আরও কয়েক স্ত্রী ও পুরুষ-বন্ধু নিমন্ত্রিত ছিলেন। বড় আনন্দে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। উপরোক্ত কক্ষে আমি ও জ্যোৎস্নার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদর শয়ন করিলাম। ভ্রাতা তৎনহে, একটি ত্রিদিবের রত্ন। ভাই ভগিনী দুজনের মধ্যে এমন বন্ধুতা ও প্রগাঢ় ভালবাসা বাঙ্গালীর আর কোথাও দেখিয়াছি স্মরণ হয় না। তাহার দিদির জন্য অহঙ্কারে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ। আমরা দুজনে নানা বিষয়ে গল্প করিয়া আরও কিছু রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। জ্যোৎস্নাদের বিশ্বাস, আমি একজন 'ফুলবাবু'। তাঁহারা আমার ভৃত্য হইতে চাবি লইয়া জনে জনে আমার ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখিতেন। গরিব আমার শরীরের কাছেও বাবুয়ানার গন্ধ নাই। আমার বড় simple life, তথাপি লোকের সর্ব্বত্র এ বিশ্বাস কেন জানি না। তাঁহারা ট্রাঙ্ক খুঁজিয়া পাইলেন—একখানি রকমোয়ারি 'রেপার'। চট্টগ্রামে তাহা কেহ কিনিয়াছিল না। আমি কিনিলে উহা সেখানেও ফেশন হইয়া গিয়াছিল। এই রেপারখানি তাঁহারা ভাই-ভগিনীরা কাড়াকাড়ি করিয়া গায়ে দিতেন। কলিকাতায় গিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখি, স্ত্রীর জন্য একটা নূতন রকমের কাঁচলি ও একখানি সাটিনের রুমালে বাঁধা আমার ফটোর জন্য জ্যোৎস্নার এক পত্র ও বার টাকা। তিনি ফটোর জন্য আমাকে বড় জিদ করিয়া-ছিলেন। আমি নানা কারণ দেখাইয়া, বিশেষতঃ অসুস্থ বলিয়া ফটো তুলিতে অসম্মত

হইয়াছিলাম। এ পত্রের দ্বারা বাধ্য হইয়া জীবনে প্রথম ফটো লইলাম। টাকা ফেরত পাঠাইলাম। এখন এ প্রৌঢ় বয়সে সেই ফটো দেখিয়া অনেকে বলেন যে, রবি ঠাকুরের ফটো। রবিবাবুর পক্ষে উহা blasphemy (দেবনিন্দা)। ছুটি শেষ হইলে আমার কার্য্যস্থানে চলিয়া গেলাম।

ইহার কিছুদিন পরে তাঁহাদের উক্ত অকস্মাৎ ব্যথাগ্রস্ত বন্ধু হইতে আমি এক অপূর্ব্ব পত্র পাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বাইরন ও মিলের প্রেমের মধ্যে আমি কাহার প্রেমের অধিকতর প্রশংসা করি। বাইরন যাহাকে ভালবাসিতেন, তাহার নামে কবিতা লিখিয়া সমস্ত পৃথিবীর লোককে তাহা জানাইতেন। আর মিল মিসেস টেইলারকে যে ভালবাসিয়াছিলেন, তাহার স্বামীর জীবিতসময়ে ৭ বৎসর তাহা গোপন রাখিয়াছিলেন। আমি পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত হইলাম, এবং তাহা জ্যোৎস্নার কাছে পাঠাইয়া দিয়া, রোগী মহাশয়কে উত্তর লিখিলাম যে, আমি বাইরন কি মিল, তাহারও প্রেমের খবর রাখি না, অতএব তাহাদের প্রেমের তুলনার সমালোচনা করিতেও অক্ষম। তিনি কেন আমার কাছে উহা চাহিয়াছেন, তাহাও আমি বুঝিতে অক্ষম। আমি এই হইতে তাঁহর নাম 'মিষ্টার মিল' রাখিয়াছিলাম, এবং জ্যোৎস্নার পরিবারের মধ্যেও তিনি এই নামে এই হইতে অভিহিত হইতেন। জ্যোৎস্না লিখিলেন—"লোকটির মাথা খারাপ হইয়াছে। অতএব আপনি তাঁহার পত্রখানি গ্রাহ্য করিবেন না। মিল মহাশয় আপনার উত্তর পাইয়া বড় লজ্জিত হইয়াছেন। উহা তাঁহার পৃষ্ঠে বেত্রাঘাতের মত পড়িয়াছে। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে তিনি এখন আপনার কবিতার নামও শুনিতে পারেন না। তিনি অকস্মাৎ হেমবাবুর 'বৃত্র সংহারে'র বড় পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমি উহার নাম 'বেত্রপ্রহার' রাখিয়াছি বলিয়া আমার সঙ্গে 'মিল মহাশয়ে'র সর্ব্বদাই সাহিত্যিক কলহ হয়।

ইহার কিছু দিন পরে আমি ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত ও মৃতপ্রায় পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আবার ছুটি লইয়া আসি। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে একবার এবং পুরী বদলি হইয়া যাইবার সময়ে আর একবার নিমন্ত্রিত হইয়া জ্যোৎস্নাদের দেখিতে যাই। উভয় বার এক এক দিন মাত্র তাঁহাদের গৃহে বড় আদরে ও আনন্দে কাটাইয়া আসি। পুরী বিদায় দিতে তাঁহারা বড় কাঁদিলেন। একটি শিশু ভ্রাতা স্কুল হইতে আসিয়া বারান্দার একটা পিলারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। জ্যোৎস্না আমাকে ডাকিয়া দেখাইলেন। তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দাদা! তুমি আজ চলিয়া যাইবে কেন?" শিশুর এ সরল স্নেহে কি স্বর্গ! আমি তাহাকে বুকে লইয়া বড় কাঁদিলাম। আমার পত্নীর তখন আসন্ন প্রথম প্রসবের সময়। তাঁহাকে তাঁহারা রাখিতে কত চেষ্টা করিলেন! সে সকল কথা স্মরণ হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। উহা জন্মান্তরীণ স্বর্গের স্মৃতির ন্যায় আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে, এবং রোগে, শোকে, তাপে হৃদয়ে শান্তি বর্ষণ করে।

পুরী আসিবার কিছু দিন পরে কোনও মাসিক পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় আমার ও হেমবাবুর কবিতার দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাহাতে হেমবাবুকে স্বর্গে ও আমাকে এরূপ কদর্য্যভাবে গালি দিয়া নরকে প্রেরণ করা হয় যে, স্বয়ং হেমবাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার ভাই ঈশানকে বলেন—"ওহে! এ পাজিটা কে, যে ভদ্রলোককে এরূপ গালি দিতেছে? তোমরা কেহ ইহার প্রতিবাদ কর না কেন? বোধ হয়, লোকটার নবীনের প্রতি কোনওরূপ malice (বিদ্বেষ) আছে।" লোকটা কে, আমার আর বুঝিবার বাকী রহিল না। তাহার ত বিদ্বেষ আছেই, তাহা ছাড়া আমি ঐ সময়ে কোনও কারণে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের বিশেষ 'ভ্রাতৃপ্রেমে'র পাত্র হইয়াছিলাম। তিনি তখন একজন নামজাদা ব্রাহ্ম। ঈশান আমার কাছে হেমবাবুর মুখের কথা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়া, এই গালাগালির প্রতিবাদ করিতে অনুমতি চাহিলেন। দেখিলাম, লোকটা কে এবং এ গালাগালির কারণ কি, তাহা কলিকাতা অঞ্চলে সেই

ঠেঙ্গ ভাঙ্গার দলের দ্বারা প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। সে জনরব সত্য কি না, ঈশান জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে এই বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত, ঘৃণিত ও ব্যক্তিগত গালির প্রতিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া লিখিলাম যে, এইরূপ সমালোচনার একমাত্র প্রতিবাদ আছে, তাহা কার্য্যগত, এবং উহা তাঁহার কি আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবান্ বুঝি তাহা শুনিয়াছিলেন। তিনি এই নরাধমের জন্য তাহাই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সকল প্রবন্ধ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নার পত্রের সংখ্যা কমিতেছিল, ও স্নেহের উচ্ছ্বাসে ভাটা পড়িতেছিল। আমার কাছে তিনি যত পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার একবার দেখিবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া চাহিয়া পাঠাইলেন। তিনি সময়ে সময়ে বলিতেন যে, তাঁহার ও আমার পত্রগুলি ছাপিলে একটি সুন্দর উপন্যাস হইবে। আমি মনে করিলাম, তিনি বুঝি সে জন্য পত্রগুলি দেখিতে চাহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহার ফটোগ্রাফ ফেরত চাহিলেন। তাহার পর আমার ফটোগ্রাফ ও আমার বহি, তাঁহাকে যাহা উপহার দিয়াছিলাম, তাহা ফেরত আসিল। অথচ আমার হাতের উপহার-লেখা বহির যে পৃষ্ঠায় ছিল, তাহা কাটিয়া রাখিয়াছেন, আমার পত্রগুলিও ফেরত আসিল না। তাহার পর তাঁহার পত্র বন্ধ হইল! এ কি বিচিত্র লীলা, কিছুই বুঝিলাম না। তাহার পর ২৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, আমি তাঁহার আর পত্র পাই নাই। তাঁহার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

উক্ত প্রবন্ধাবলির পর 'ঠেঙ্গ ভাঙ্গার দল' হইতে আরও কত বিচিত্র উপন্যাস, অপন্যাস, ছাই, পাঁশ বাহির হইয়াছিল। মিল মহাশয় এক দিকে আমার প্রতি শাণিত শরজালসকল নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অন্য দিকে সরলা জ্যোৎস্নার ও তাঁহার সরল পরিবারবর্গের মন পৃষ্ঠ-দংশনের দ্বারা আমার প্রতি বিষাক্ত করিতেছিলেন। উপরোক্ত লীলা তাঁহারই এ চুকলির ফল। ছেলেবেলা শুনিতাম, আমাদের বাজিকরগণ বাজির আরম্ভে গাইত—

"বাবু! আমরা ভোজের বাজি খেলিয়া ফিরি।
আত্মারাম সরকারের মুখে মারি খেঙ্গরার বাড়ি।"

শুধু তিনটি কদাকার পুতুল বাহির করিয়া চুকলিখোর আত্মারাম সরকার ও তাহার হতভাগ্য মাতা পিতা বলিয়া বাজিকরেরা সকলকে দেখাইত। তাহাদের বিকৃত রূপ দেখিয়া সকলে হাসিত। তাহার পর উক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া বাজিকরেরা তিন জনের মস্তকে সম্মার্জ্জনী প্রহার করিয়া খেলা আরম্ভ করিত। আমি তখন ভাবিতাম যে, এই হতভাগ্য আত্মারাম সরকারটি কে, এবং ইহাদের কাছে সে কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার দেশব্যাপী এই ঘোরতর নিগ্রহ। পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় পড়িয়াছিলাম স্মরণ হয় যে, আত্মারাম সরকারও 'মিল মহাশয়ে'র মত প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে, ভোজের বাজিটা কিছুই নহে, কেবল হস্ত-কৌশল মাত্র, এবং বাজিকরেরা ঘোরতর প্রবঞ্চক। এই জন্য দেশব্যাপী বাজিকর তাহাকে 'চুকলিখোর' উপাধি দিয়া, তাহার এই পৃষ্ঠদংশন অপরাধের এরূপ অকথ্য প্রতিশোধ লইয়া থাকে। শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; তাঁহার ও তাঁহার পিতা মাতার সম্মার্জ্জনী-ভোগ সমান ভাবে চলিতেছে। মনে করিতাম, বাজিকরেরা কি হিংস্রক! কিন্তু আমি এ জীবনে চুকলিখোরদের কৃপায় এত দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়াছি, এত গভীর মনস্তাপ পাইয়াছি, এত সুখ শান্তি হারাইয়াছি যে, আমার এখন বিশ্বাস হইয়াছে যে, বাজিকরেরা চুকলিখোর আত্মারাম সরকারের উপযুক্ত দণ্ডই বিধান করিয়া থাকে। ন্যায়বান্ শ্রীভগবান চুকলিখোর 'মিল মহাশয়ের' তদপেক্ষাও গুরুতর দণ্ড বিধান করিয়াছেন। আমি রাণাঘাট হইতে একবার সস্ত্রীক কলিকাতায় গিয়া কোনও এক বন্ধুর গৃহে ছিলাম। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন যে, পার্শ্বের গৃহের একটি রমণী বরাবর আমাদের কথা বলিয়া থাকে, এবং আমাকে ও আমার স্ত্রীকে দেখিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। স্ত্রী ছাদে উঠিয়া, তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া, বিস্মিতা হইয়া আসিয়া বলিলেন যে, সে আর

কেহ নহে, এই মিল মহাশয়ের পত্নী! বন্ধু আমাকে গোপনে বলিলেন যে, হতভাগিনী গৃহত্যাগ করিয়া, আসিয়া একজন ডাক্তারের 'রক্ষিতা' হইয়া আছে। তাহার স্বামী মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আসিয়া, তাহার গৃহের রোয়াকে বসিয়া, রোয়াকের ইষ্টক অশ্রুজলে ভাসাইয়া থাকে। আরও কিছু দিন পরে শুনিলাম, রমণী প্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন! হায় ভগবন্! মানুষ তোমার অলঙ্ঘনীয় সূক্ষ্ম দণ্ডনীতি কি বুঝিবে?

এরূপে একটি অমূলক ঈর্ষার ফলে আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখস্বপ্নটি ভগ্ন হইল। আমি জ্যোৎস্নার সমস্ত পত্র ফিরাইয়া দিয়াছিলাম। কেবল পুরী যাইতে বিদায় হইয়া আসিয়া যে গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্রখানি পাইয়াছিলাম, তাহা ভুলক্রমে আমার কাছে ছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"জীবনসর্ব্বস্ব আমার!

আমার ক্ষমতা নাই, কি লিখিব? ক্ষত হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির, অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইয়া নয়ন দৃষ্টিহীন হইয়াছে, হৃদয়-রক্ত নয়নপথ দিয়া ঝরিতেছে। আমি মরিলাম না কেন? ইহার সানুকূল উত্তর কে দিতে পারে? বলিয়া দেও, আমি সেই উপায় অবলম্বন করি। মানুষ সকল সহ্য করিতে পারে, আমি কিছুই পারি না। পাষাণ গলিয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে। আমি পাষাণময়ী মূর্ত্তিবিশেষ ছিলাম—সেই পাষাণ দ্রব হইয়াছে, ভাঙ্গিয়াছে, কি লিখিব? যেই তুমি লিখিয়াছিলে, তোমার পুরী যাইবার আদেশ আসিয়াছে, সেই দিন হইতে আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরিয়াছি। তুমি আসিলে—চলিয়া গেলে,—আমার সকলই ফুরাইল। সন্ধ্যার সময়ে তুমি গাড়ী হইতে নামিলে—আমি তখন সেইখানে দাঁড়াইয়া —আমার ইচ্ছা হইল, আমি মরি। তুমি বিদায় লইতে আসিয়াছ।

আবার সেই রাত্রি! যখন তুমি ট্রেন miss হইবে বলিয়া চঞ্চল হইয়াছিলে, তখনও মৃত্যুকে ডাকিলাম। অভাগিনীর আরাধনা ঈশ্বর শুনিলেন না। মৃত্যুও শুনিল না। তুমি গাড়ীতে উঠিলে, আমি আত্মহারা হইলাম, কম্পিত দেহভার বহন করিতে পারিতেছিলাম না। পা অচল হইল, শরীর অচল হইল, কাঁপিতেছিলাম, পড়িয়া যাইতে যাইতে টেবিল ধরিলাম। আলো আমার হাত হইতে পড়িয়া নিবিয়া গেল, আমিও আশ্রয় পাইয়া দাঁড়াইলাম। অন্ধকারে আর কেহ আমাকে দেখিল না। আমি ছুটিয়া অন্য বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। ভ্রাতা চীৎকার করিয়া ডাকিল, আমি উত্তর দিতে পারিলাম না ; কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। আর এ সকল লিখিয়া কি ফল? পুনর্ব্বার গাড়ীর শব্দ শুনিলাম, আমার হৃদয়ের আঘাতের সঙ্গে তাহা মিশিয়া গেল। আমি চঞ্চল হইলাম। তোমার নিকট যাইতে পারিলাম না। আমার তখন ভ্রম হইতেছিল—ভয় শেষ মুহূর্ত্ত। তোমাকে দেখিলাম—কি দেখিলাম। তাহা বলিতে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষু কর্ণ দিয়া তাড়িৎপ্রবাহ ছুটিতেছে, কি লিখিব? তোমার সিক্ত মুখ আমার নয়নের নিকট ভাসিতেছে। আবার যখন দেখিব, তখন সেই দৃশ্য ভুলিব। নতুবা সেই মুখ মনে করিয়া মরিব। যেরূপ অবস্থা, মৃত্যু নিকট—মরিলে দুঃখ নাই। আর এই নিরাশময় জীবনভার বহন করিতে পারিব না। আশা নিবিয়া গিয়াছে, উৎসাহ ভাসিয়া গিয়াছে সমুদয় অন্ধকার। অবস্থা শোচনীয়। সত্য সত্যই অশ্রুজলে চক্ষু ক্লান্ত হইয়াছে, তুমি এ মুহূর্ত্তে আমাকে দেখিলে জানিতে পারিতে, এই কয় দিনে আমার জীবনের অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে কি না! আমার কোন কথা মনে আসিল না। তরঙ্গে তরঙ্গে সকলই ডুবিয়া গেল। যখন কিছু বলিব ভাবিতাম, তোমার মুখ দেখিলে সমুদয় ভুলিয়া যাইতাম। আজ তোমাকে লিখিতে লিখিতে সকলই ভুলিয়াছি। কেন অশ্রু, তুমি লিখিতে দিতেছ না? আমি আর পারি না। কাগজ ভিজিয়া যাইবে। তুমি ব্যথিত হইবে। আমার অন্তঃকরণ ফাটিয়া যাইতেছে। আমি আর লিখিতে পারিব না।

তুমি নিরাপদে সুস্থশরীরে পুরী পৌঁছিয়াছ শুনিলে কিছু স্থির হইব। সেই আশার পথ চাহিয়া আছি। অদ্য পত্র না লিখিলে তুমি দুঃখিত হইবে। সেই জন্য বিদীর্ণহৃদয়ে

লিখিলাম। তোমাকে কবে দেখিব বলিয়া দেও, সেই আমার মোহমন্ত্র হইবে। তাহা মনে করিয়া যদি মন ভাসাইতে পারি ও বাঁচি। তোমার মৃতপ্রায়—"

পত্রের স্থানের স্থানে শব্দ অশ্রুজলে ভাসিয়া গিয়াছে। হে কবিগুরু! তুমি যথার্থই বলিয়াছ—"দুর্ব্বলতা! তোমারই নাম রমণী।" পত্রকে বলিয়া রাখিয়াছি, এই পত্রখানি যেন আমার চিতানলে সমর্পিত হয়।

আমি এ জীবনে দুইটি রমণীরত্নের ভালবাসা পাইয়াছিলাম। এই ভালবাসার নাম আন্তরিক বন্ধুতা,—নিষ্কাম, অনাবিল, পুণ্যময়, প্রেমময়। একজন আজ স্বর্গে, আর একজন আজ স্বপ্নে! পাপিষ্ঠদের কল্যাণে আমি আজ তাঁহার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিতে পারিতেছি না। কেন এমন হয়? এক দিন ইনি কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'স্ত্রীর প্রেম কি নিষ্কাম বলিব?' না, তাহা ত নহেই। এই জন্যই ত ভাগবতকার রাধাকৃষ্ণের আদর্শ আমাদের নয়নের সমক্ষে ধরিয়াছেন। এই আকুলতা, গভীরতা ও নিষ্কামতা পতি-পত্নীর প্রেমে সম্ভবে না। অথচ পতি-পত্নীর অধিক ভগবান্‌কে প্রেম করিতে না পারিলে মানুষ তাঁহাকে পাইবে কেন? হায় ভগবান্‌! তবে নিষ্কাম বা আসক্তিহীন প্রেম কি, তাহা শিক্ষা দিবার, তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই কি মানুষকে এরূপ আগুনে পোড়াইয়া থাক? হে মঙ্গলময়! তোমার দুর্জ্ঞেয় মঙ্গল-নীতি কে বুঝিবে? এরূপ অনলে দাহিত ও পবিত্রিত না হইলে আমি রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, ও প্রভাস লিখিতে, এবং শৈলজা ও জরৎকারুর চিত্র আঁকিতে পারিতাম না!—

"এই প্রেম মানবের স্বর্গের সোপান ;
এই প্রেমে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ভগবান।
আসক্তির করালতা, ছায়া কামনার,
নাহি যার প্রেমে ; সেই উপাস্য আমার।"

কুরুক্ষেত্র।

রাণাঘাটের কার্য্যাবলী

রাণাঘাটের ভার পাইবার সপ্তাহমধ্যে চাকদহের এলাকায় এক শাস্ত্রসিদ্ধ নৈশ ডাকাতি হইয়া গেল। গভীর রাত্রিতে মশাল জ্বালাইয়া, গৃহদ্বার ভগ্ন করিয়া, এবং গৃহবাসীকে নিগ্রহ করিয়া, সম্পত্তি অপহরণ করিয়া ডাকাতেরা চলিয়া গিয়াছে। দেশ অস্ত্রহীন, বীর্য্যহীন ; এমন কি মনুষ্যত্বহীন। প্রতিবাসীরা 'জগদম্বা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম' নীতি অবলম্বন করিয়া, গৃহিণীর অঞ্চল ধারণ করিয়া 'দুর্গা! দুর্গা!' করিয়া কোনও মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে—'আঁটা ঘরে সিঁদ মেরেছে, কোন্‌ ডাকাতের এ ডাকাতি?' কিন্তু 'যৌবনের জেলখানাতে রাখব তারে দিবারাতি' বলিয়া পুলিসের দারোগা সাহেব প্রেম বিতরণ করিতে গেলেও তাঁহারা ধরা দিবার পাত্র নহেন। এখনকার স্থানীয় পুলিস-তদন্তের ফল যাহা হইয়া থাকে, তাহা হইল, অর্থাৎ ডাকাতেরা অনুগ্রহ করিয়া ধরা দিল না। বলা বাহুল্য, যাহার বাড়ী ডাকাতি হইয়াছে, তাহার ঘাড়ে পড়িয়া কয়েক বেলা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করা ব্যতীত তাঁহারা তাহাদের ধরিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। চোর ডাকাত ধরিয়া তাঁহারা বৃথা সময় নষ্ট করিবেন কেন? তাহারা ত আর ঘুষ দিতে পারে না। তাহার উপর আর এক লীলাময় আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছেন। এক নামজাদা ম্যাজিস্ট্রেট মিশনারি হইয়া রাণাঘাটে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার লীলার কথা পরে বলিব। তিনি বলিলেন যে, তিনি জানেন যে, তিনি কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে বনগাঁয়ে বদমায়েসের আড্ডা ছিল। অতএব তাহাদিগকে ধর, মার, কাট! আমি বলিলাম, এখন সে দিন নাই। এখন এ নীতি অবলম্বন করিলে ডাকাত ধরা ত পড়িবেই না, আমি মারা পড়িব। তিনি বলিলেন, সেই দিন এখনও আছে। কেবল আমরা কাপুরুষ বলিয়া, বীররসে ভাসিয়া সেই 'মহাগীত' গাইতে পারি না। তাহার পর আরও একটি ডাকাতি, এবং ম্যাজিস্ট্রেট-

মিশনারি সাহেবের হাতার কাছে এক সিঁদচুরির হইল। তিনি সিঁদ দেখিয়া বিজ্ঞতার সহিত বলিলেন যে, তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, উহা বনগাঁয়ের বদমায়েসদের রচনা। আমি এখনও সেই অজ্ঞাত বদমায়েসদের বাল-বাচ্চা সহিত জেলে ফেলি নাই বলিয়া তিনি আমার অকর্ম্মণ্যতার জন্য নদীয়ার মাজিস্ট্রেট মিঃ বার্ণাডের (Bernard) কাছে পুষ্পচন্দন প্রেরণ করিলেন। বার্ণার্ড পত্র পাইয়া আসিলেন, তাঁহার গৃহে এক বেলা আহার করিয়া, আমার কৈফিয়ত শুনিয়া চলিয়া গেলেন। বনগাঁয়ের বদমায়েসেরা খ্রীষ্টপ্রেমের উদারতা বুঝিল না।

যাহা হউক, উপর্য্যুপরি চুরি-ডাকাতিতে আমি বড় চিন্তিত হইলাম। আমি দেখিলাম যে, মশালের কাপড় এবং সিঁদ কাটার লক্ষণ বাঙগালা দেশের নহে। শুনিলাম, কাকিনারা প্রভৃতি স্থানে বহু সহস্র হিন্দুস্থানী কুলি কলকারখানার কাজে আছে। তাহাদের উপর কোনওরূপ তত্ত্বাবধারণ নাই। ঘটনাও যাহা হইয়াছে, তাহা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট। আমার সন্দেহ হইল, এই সকল কীর্ত্তি সেই হিন্দুস্থানী কুলিদের। আমি তখন নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটের হাত দিয়া, আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটের কাছে এই কুলিদিগের গতি লক্ষ্য করিতে, পুলিস মোতায়েন করিতে ও তাহাদের রাত্রিতে দুইবার খবর লইতে রিপোর্ট করিলাম। এ দিকে প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেশনে গজেন্দ্রগামী শিকারলোলুপ 'রেলওয়ে পুলিস' কনষ্টেবল প্রভুদের আরামের ব্যাঘাত না করিয়া—অনেক সময় চোর-ডাকাতদের তাঁহাদের সঙ্গে সরিকি কারবার—আমাদের সাধারণ পুলিসের কনষ্টেবল, অপুলিস পরিচ্ছদে রাত্রির প্রত্যেক ট্রেণ লক্ষ্য করিবার জন্য নিয়োজিত করিলাম। কুলি দুই এক দল রাত্রির ট্রেনে আসিয়া, রেলওয়ে পুলিসের, কি অন্য গোয়েন্দার কাছে খবর পাইয়া, আমাকে নিতান্ত 'কমবক্ত' স্থির করিয়া ফিরিয়া গেল। ইহার পর আমি যে দুই বৎসর রাণাঘাটে ছিলাম, আর বনগাঁয়ের বদ-মায়েসেরা আমাকে মাজিস্ট্রেট-মিশনারি সাহেবের বিরাগভাজন করে নাই।

রাণাঘাটের ফৌজদারি কার্য্য একে লঘু, তাহাতে আমার old parliamentary hand (পাকা পৌরাণিক হাত) কিঞ্চিৎ মাত্র দেখাইবা মাত্রই আরও কমিয়া গেল। এখানে আমার পঞ্চায়েতি-প্রথা পরিচালন করিতে গিয়া আবার বিপদে পড়িলাম। বেহারের সবরেজিষ্ট্রার কাজি সাহেবের মুরুব্বি সেই ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল এখন নদীয়ার জজ। তিনি আমাকে ভুলেন নাই। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া যেই তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি, তিনি আরক্ত চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া বলিলেন—"বাবু! আমি তোমাকে চিনি। তুমি গরীব কাজি—র সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে এবং আমার অবমাননা করিয়াছিলে। তুমি যদি ভাল চাহ, তবে যত শীঘ্র পার, রাণাঘাট হইতে দৌড়িয়া পালাও।" আমার আর এক বন্ধু তাঁহার কোনও অবিচার সম্বন্ধে তাঁহার কাছে বলিলে তিনি বলিয়াছিলেন—Moulvi! it is not a question of Justice, but purely my khushi (মৌলবী! উহা বিচারের কথা নহে, আমার খুসি মাত্র)। এই দীর্ঘ দাসত্বে প্রতিযোগী পরীক্ষার কল্যাণে অনেক নিকৃষ্ট ইংরাজকে দেখিয়াছি, কিন্তু একটি ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে, তাহাকে মুখের উপর এরূপ অপমান করিতে পারে, এমন পশু যে ইংরাজ জাতিতে আছে, তাহা জানিতাম না। আমি বার্ণার্ড সাহেবকে এ কথা বলিলে তিনি প্রথম বিশ্বাস করিলেন না। পরে বলিলেন যে, আমি 'খুসি বাহাদুরের'র অধীনস্থ কর্ম্মচারী নহি, তিনি আমার কি করিতে পারেন। আমি এই অভয়বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম। তখন 'খুসিরাম' রাণাঘাটে ছুটিয়া আসিয়া আফিস পরিদর্শন করিলেন। পূর্ব্বে আমাদের পরিদর্শনের ক্ষমতা জজদের ছিল না। কিন্তু লাট ইলিয়ট—আমি ইহাকে 'ইডিয়ট' বলিতাম—দেখিলেন, যখন রাম, শ্যাম, যদু, মধু, সকলেই ডেপুটিদের উপর কর্ত্তাগিরি করিতে পারে, তখন আর 'খুসিরামে'রা বাদ যান কেন? খুসিরাম আর কিছু না পাইয়া, আমার পঞ্চায়েত প্রণালীকে তীব্র আক্রমণ

করিয়া আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন না কেন, কৈফিয়ত তলব করিলেন। প্রায় বার বৎসর যাবৎ মাদারিপুর হইতে আমি এই পঞ্চায়েত প্রণালীর জন্য প্রত্যেক মাজিস্ট্রেট ও কমিশনরের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়া আসিয়াছি। একটি স্ত্রীলোকের 'এস্তেহার' লওয়ার ছলনায় প্রথম কনষ্টেবল, তার পর জমাদার, তার পর ,দারোগা তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া সর্ব্বশেষ মাজিস্ট্রেটের কাছে উপস্থিত করিলে তিনিও যখন 'এস্তেহার' লইতে চাহিলেন, তখন সে বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আমি তিন বার এস্তেহার দিয়াছি, আর পারি না।" আমি ভাবিতেছিলাম, আমিও আর কৈফিয়ত দিতে পারি না বলিয়া জবাব দিব। ফেনীতে অন্যান্য মাজিস্ট্রেটের পর নন্দকৃষ্ণও কৈফিয়ত লইয়া এই প্রণালীর মোকদ্দমা আপোষ করিবার ও কমাইবার একটা অমোঘ উপায় দেখিয়া, উহা নোয়াখালি সদরেও পরিচালিত করেন।

আমি যখন ছুটি লইয়া, চট্টগ্রাম গিয়া, ওল্ডহ্যামের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনিও ছুটিতে যাইতেছিলেন এবং বিধাতার এমন সূক্ষ্ম নীতি যে, তাঁহার দ্বারা উৎপীড়িত কুমিল্লার মাজিস্ট্রেট মিঃ গ্রিয়ার অস্থায়ী ভাবে তাঁহার স্থানে কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। ওল্ডহ্যামের সঙ্গে সাক্ষাৎসময়ে মিঃ গ্রিয়ার বোধ হইল, ইচ্ছা করিয়া উপস্থিত ছিলেন। কারণ, তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই বলিলেন যে, আমাকে দেখিবার তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল। কারণ, আমার ফেনীর কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা তিনি কুমিল্লায় বসিয়া শুনিয়াছেন। তিনি এরূপ খবর লইতেন যে, আমি আমার পেয়াদা ও চৌকিদারদের সুন্দর 'ইউনিফরম পোষাক' দিয়াছি শুনিয়া তিনি আমার কাছে পত্র লিখিয়া নমুনা লইয়া গিয়াছিলেন, এবং ত্রিপুরা জেলায় তাহা প্রচলিত করিয়াছিলেন। আমি কিরূপে মোকদ্দমার সংখ্যা এত কমাইয়াছি তিনি তাহার রহস্য (secret) কি, বিশেষ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, এমন বাঁধাবাঁধি রহস্য কিছু নাই, আমি স্থানোপযোগী নীতি অবলম্বন করিয়া থাকি। তবে পঞ্চায়েতের দ্বারা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার তদন্তপ্রণালী আমার একটি প্রধান রহস্য। তিনি উহা জানিতে চাহিলে আমি সমস্ত তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি শুনিয়া বড় প্রীত হইলেন, এবং ওল্ডহ্যামের দিকে চাহিয়া বলিলেন যে, তিনি উহা একটা উৎকৃষ্ট প্রণালী (an excellent plan) মনে করেন। দাম্ভিক-চূড়ামণি ওল্ডহ্যাম একটুক ঈষৎ বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিলেন—"মিঃ গ্রিয়ার! নবীনবাবু একজন বিখ্যাত কবি। তিনি সকল বিষয়ে কবির মত ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু তুমি জান, আমি একজন সারগ্রাহী লোক (matter of fact man)।" গ্রিয়ার আমার ফেনীর কার্য্য সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিয়া ও অনেক প্রশংসা করিয়া, আমাকে বড় সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন, এবং বলিলেন, আমি ফেনী ফিরিয়া গেলে তিনি একবার আমার সৃষ্ট ও লোকপ্রশংসিত ফেনী দেখিতে যাইবেন। তাহার পর কুমিল্লায় ফিরিয়া তিনি সেখানে আমার পঞ্চায়েত প্রণালী প্রচলিত করেন। নন্দকৃষ্ণ ও তিনি, উভয়ে সেই বৎসরের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে (General Administrative Report) উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া লেখেন। ওল্ডহ্যাম এই সকল প্রশংসোক্তি তাঁহার বিভাগীয় বিজ্ঞাপনীতে উদ্ধৃত করিয়া, তাহার উপর এই বিজ্ঞ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, তিনি উহাতে 'আন্তরিক গুণ, কি বাহ্যিক মূল্য (Internal merit or External value) কিছুই দেখেন না।' বাঙ্গালার শাসনদণ্ড তখন অস্থায়ী ভাবে বিচক্ষণ এঃ পিঃ ম্যাকডনেলের (A. P. Macdonell) হস্তে ছিল। ইলিয়ট ৬ মাসের ছুটিতে তাঁহার ঐতিহাসিক "no conviction, no promotion" (না শাস্তি, না উন্নতি) নীতির জন্য হাইকোর্টের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বিলাত গিয়াছিলেন। চতুর ম্যাকডনেল বিভাগীয় বিজ্ঞাপনী হইতে এই অংশ আমূল উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন—"বা! এ কেমন কথা! দুই জন মাজিস্ট্রেট পরীক্ষা করিয়া এই প্রণালীর

উপকারিতার কথা লিখিতেছেন। আর কমিশনর কেবল বাহাদুরি করিয়া তাহা উড়াইয়া দিতেছেন। লেঃ গবর্ণরও উহা সমস্ত বঙ্গরাজ্যে পরীক্ষাধীন প্রচলনের আদেশ দিতেছেন।" সেই সপ্তাহের কলিকাতা গেজেটে এই মন্তব্য প্রকাশিত হইল, আর আমি বগল বাজাইয়া, উহাই আমার কৈফিয়ৎ-স্বরূপ 'খুসিরামে'র বা 'ঘাসিরামে'র মস্তকে সজোরে নিক্ষেপ করিলাম। তিনি পপাত হইলেন। ইহার পর তিনি আর আমাকে 'দস্তরুচিকৌমুদী' প্রদর্শন করেন নাই। বার্ণার্ড সাহেব হাসিয়া আকুল। এই পঞ্চায়েতী তদন্তের প্রথার ও আমার অন্যান্য কৌশলের ফলে মোকদ্দমার সংখ্যা এত কমিল, এবং গুরুতর মোকদ্দমা এরূপ লুপ্ত হইল, যে কিছুদিন পরে আমি কলিকাতায় বেড়াইতে গেলে আমার বন্ধু শ্যামাধব রায়, শিয়ালদহের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট আমাকে বলিলেন—"তোমার কি দৈবিক শক্তি আছে? শুনিলাম যে, রাণাঘাট সবডিভিসনে রামাশঙ্কর সেন ও রামচরণ বসুর মত দক্ষ কর্ম্মচারী সমস্ত দিন রাত্রি খাটিয়াছে, তুমি সেখানে ১২টার পূর্ব্বে কাচারি যাও না এবং ৩টার পরও থাক না? তুমি কাজ কেমন করিয়া সামলাইতেছ?" আমি বলিলাম—"আমার দৈবিক, কি ভৌতিক, কোনও শক্তি নাই, তবে তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা সত্য।" তিনি বলিলেন—"তবে বুঝি তুমি ফৌজদারী দরখাস্ত-সকল পাওয়া মাত্রই ডিস্‌মিস্ কর;" আমি বলিলাম—"সকল দূরের কথা, আমি একখানিও ডিস্‌মিস্ করি না।" তিনি তাঁহার আয়ত চক্ষু আরও বিস্তৃত করিয়া, আমার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, এবং বলিলেন—"তবে ব্যাপারখানা কি? আমি ত এখানে খাটিয়া খাটিয়া মলেম। আমাকে তোমার কার্য্য প্রণালী শিখিতে হইবে।"

রাণাঘাট সবডিভিসন প্রমীলার পুরী। ইহার, বিশেষতঃ শান্তিপুরের মহিষমর্দ্দিনী-রাই রাণাঘাট ফৌজদারী কোর্ট রক্ষা করিতেছেন। দুই একটি গল্প বলিব। শান্তিপুরের এক বিধবা ব্রাহ্মণীর দুই কন্যা। বিধবা পুত্রহীনা বিধায় কনিষ্ঠার স্বামীকে গৃহ-জামাতা করিয়া রাখিয়াছেন। বিধবার কিছু সম্পত্তি আছে। এই জামাতার সঙ্গে সম্প্রতি তাঁহার কিঞ্চিৎ মনান্তর ঘটিয়াছে। জ্যেষ্ঠ জামাতা বুঝিয়াছেন যে, এই তাঁহার কণ্টকোদ্ধার করিবার সুযোগ। তিনি আসিয়া সেই অনলে ঘৃতাহুতি দিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষ পুলিসকে হাত করিয়া, ব্রাহ্মণীর দ্বারা কনিষ্ঠ জামাতার বিরুদ্ধে এক গুরুতর চুরির অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, কৃষ্ণনগর হইতে উকিল আনিয়াছেন। শাশুড়ী সাক্ষীর বাক্সে, নব যুবক কনিষ্ঠ জামাতা আসামীর বাক্সে, এবং জ্যেষ্ঠ জামাতা তাঁহার বৃহন্নলা সারথী উকিল মহাশয়ের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। শান্তিপুর ভাঙ্গিয়া লোক তামাসা দেখিতে আসিয়াছে। এমন হুজুগে লোক বুঝি আর ভূভারতে কোথায়ও নাই। মোকদ্দমা ধরিয়াই অবস্থা কি, আমি বুঝিলাম। মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে কনিষ্ঠ জামাতার, অপ্রমাণ হইলে শাশুড়ীর শ্রীঘর-বাস নিশ্চয়। উভয় ফলে জ্যেষ্ঠ জামাতার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তাঁহার স্থূল দেহ, তিনি সম্ভ্রান্তভাবে উড়ানির দ্বারা আজানুকণ্ঠ আবৃত করিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখে শিকারার্থ অপেক্ষা করিতেছেন। আমি প্রথম তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম। অবশেষে তাঁহার স্বার্থ-ছায়া যে এই মোকদ্দমার পৃষ্ঠদেশে বিদ্যমান, এবং তাহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তাহাও বুঝাইলাম। তিনি ও তাঁহার উকিল মহাশয় মধুর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"তোবা! তাঁহার কিছুমাত্র স্বার্থ নাই। তাঁহার শাশুড়ীর উপর ঘোরতর উৎপীড়ন হইয়াছে বলিয়া, এবং তাঁহার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া তিনি কেবল তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন মাত্র। এই মোকদ্দমায় তিনি নিতান্ত দুঃখিত। কারণ, উভয় পক্ষ তাঁহার পরম আত্মীয়।" তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া ঠাকুরাণীটিকে ভজাইতে লাগিলাম। তাঁহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে, আসামীকে এত দিন পুত্রবৎ পালন করিয়া এখন এরূপে জবাই করা মাতৃধর্ম্ম হইবে না। তিনি টিয়া পাখীর মত এক বুলি শিখিয়া আসিয়াছেন—"দোহাই আপনার! ও

আমাকে বড় কষ্ট দিয়াছে। আমি বড় কষ্টে তোমার কাছে এসেছি।' বারম্বার এই কথা বলিতেছেন ও চক্ষু মুছিতেছেন। তখন আমি আসামীকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার পায়ে পড়িতে বলিলাম। সে ছুটিয়া আসিয়া, সাক্ষীর বাক্সস্থিতা তাঁহার শ্রীচরণ দুখানির উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু তিনি বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া আছেন, আর বলিতেছেন—"আমি আর ওর মুখ দেখবো না," এবং এক এক বার জ্যেষ্ঠ জামাতার দিকে কটাক্ষ করিতেছেন। তাহার অর্থ—কেমন, অভিনয় ঠিক হইতেছে ত? আমি বলিলাম—"দোহাই ঠাকুরাণী! একবার হতভাগা সন্তানটির দিকে একটুক আড় চোকেও না হয় দেখ। তার পর মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছা হয়, চালাইও, তাহার গলা কাটিতে হয়, কাটিও। তুমি ত দানবদলনী খড়্গ-পাণি হইয়াই দাঁড়াইয়াছ, এবং দানবও চরণে পড়িয়া আছে।" তিনি তখন একটুক আড় চোকে দেখিলেন। আমি বলিলাম—আর একটুক মুখ ফিরাইয়া দেখ! তখন মুখ আর একটুক ফিরাইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন—"না, আমি ওর মুখ দেখবো না।" আমি আবার বলিলাম—"আমার বিশেষ অনুরোধ ঠাকুরাণি! একটি বার ভাল করে ওর দিকে দেখ। আমি হাকিম, আমার এ সামান্য কথাটি রাখবে না?" তখন তিনি পূর্ণমাত্রায় মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে দেখিলেন। কোর্ট শুদ্ধ লোক হাসিয়া উঠিল। এবার তিনিও আর না হাসিয়া পারিলেন না। আমি তখন বলিলাম—"হরি হরি বল সবে পালা হলো সায়।" তখন জ্যেষ্ঠ জামাতাকে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধরিয়া, ধমকাইয়া, উভয় পক্ষকে 'বোধিদ্রুম'-মূলে প্রেরণ করিলাম। কিছুক্ষণ সেখানে কাঁদাকাটা হইল। কনিষ্ঠা কন্যাও গাড়ীতে বসিয়া ছিল। আমার উপদেশমতে সেও মায়ের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর ব্রাহ্মণী হাসিতে হাসিতে দরখাস্ত-হস্তিনী হইয়া বলিলেন, তিনি তাঁহার জামাতার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবেন না, এবং উহা আমি তৎক্ষণাৎ ডিস্‌মিস্ করিলে, তিনি আমাকে অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়া, কনিষ্ঠা কন্যা ও উভয় জামাতাকে এক গাড়ীতে লইয়া, সকলে হাসিতে হাসিতে শ্রীপাট শান্তিপুরের দিকে যাত্রা করিলেন। কাচারিতে ও হাতায় একটা আনন্দের হাসি উঠিল। স্বয়ং বিবাদীর উকিল মহাশয় বলিলেন—"রাণাঘাটের কোর্টের অনেক গল্প শুনিয়াছিলাম। আজ চক্ষে দেখিয়া গেলাম। এরূপ অফিসার পাওয়া রাণাঘাটের পরম সৌভাগ্যের কথা। এই মোকদ্দমা অন্য কোর্টে হইলে একটি পরিবারের সর্ব্বনাশ হইত!"

আর এক মোকদ্দমা, সেও শান্তিপুরের। এক বিবাহে বরযাত্রী হইয়া, কলিকাতা হইতে একজন খ্যাতনামা বিলাতফেরত ডাক্তার আসিয়াছেন। একে বিবাহের বরযাত্রী, তাহাতে স্থান শান্তিপুর, কাল 'দুরন্ত বসন্ত', সময় জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী! মধুর দক্ষিণানিলে সাধের তরণী জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা সুরধুনীর সুনীল সলিলহিল্লোলে নাচিতেছে। অন্তরে সুরধুনীর হিল্লোলে বসন্তবাহার খুলিয়াছে, এবং বাহিরেও নানা যন্ত্রে ও কণ্ঠে বসন্তবাহার বাজিতেছে। সম্মুখে ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনীর গৃহ জ্যোৎস্নালোকে হাসিপূর্ণ মুখে আহ্বান করিতেছে। ইনি এখন একটি স্থানীয় জমিদারের রক্ষিতা। ডাক্তার সাহেবের প্রেমের পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া কলিকাতা হইতে উড়িয়া আসিয়াছেন। এ অবস্থায় মুনি-ঋষিরাও মাথাটা স্থির রাখিতে পারিতেন না। বিলাত-ফেরত ডাক্তারের মুণ্ডটা ঘুরিবে, তাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? তিনি দলে বলে শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলেন। 'হৃদয়ের দ্বার' খুলিয়াছে, কিন্তু কাষ্ঠের কপাট প্রথম প্রেমালাপে, পরে সিংহনাদে খুলিল না। রসিকশেখর দীনবন্ধু মিত্র মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও সুহৃৎশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমবাবুকে বলিয়াছিলেন—"ফোড়া পায় ধরিয়াছে, আর ভাবনা নাই।" এখানেও প্রেম পায়ে ধরিল। পদাঘাতে কপাট ভগ্ন হইল। শান্তিপুরে স্থান, একটি টিকটিকি নড়িলেও সেখানে একটা তোলপাড় হয়। সমবেত তেঁতরের দল করতালি দিল। রস জমাট হইয়া উঠিল, আর এমন সময়ে বিরসের ধ্বনি উঠিল।

সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে,
গজমুক্তা থাকে গুপ্ত শুক্তির সদনে ;
হীরকের ছটা বদ্ধ খনির ভিতর ;
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর,;
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া ;
হায় বিধি! এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?

এত সাধেও কুবিধি বাদ সাধিলেন। প্রণয়িনীর গুপ্ত দূতীর দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া—সর্ব্বনাশ! পুলিস উপস্থিত! So sweet was never so fatal! হায়! এমন মধু এমন বিষে পরিণত হইল!

"পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।'
কোথায়—"বিকচ নলিনে, জাহ্নবী পুলিনে,
বহুত পিয়াসা রে।'

আর কোথায় পুলিসের মোকদ্দমা! আমার আবাসগৃহ হইতে দেখিলাম, কাচারির চারি দিকে একটা শান্তিপুরী রাসের সমারোহ! ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম, এক দিকে শান্তিপুরের প্রধান 'ব্যবসায়িনী' ও অন্য দিকে কলিকাতার একজন প্রধান 'নিদান-ব্যবসায়ী' ডাক্তার ও 'বিধান-ব্যবসায়ী' ব্যারিষ্টার উপস্থিত। ব্যবসায়ের ত্র্যহস্পর্শ! আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া, ব্যবসায়িনীকে স-মোক্তার আমার গৃহের আফিস-কক্ষে ডাকিলাম। তাঁহার রূপে কক্ষ আলোকিত হইল, বর্ণজ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিয়া গেল। তাঁহার সুগঠিত, সুগোল, ঈষৎ স্থূল দেহ। যৌবনে ভাঁটা ধরিয়াছে, কিন্তু স্রোত ফিরে নাই। সুগোল বদন চন্দ্রমণ্ডলের সঙ্গে তুলনীয়। চক্ষু আবেশময়। পরিচ্ছদ হাল ফেসানের চরম,—সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং।' আমি শুনিয়াছিলাম, তিনি জনৈক খ্যাতনামা সুবর্ণবণিক্ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কন্যা। হতভাগিনীর পিতা একদিন রাণাঘাটের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি সাটিনের রুমালে গ্রীবা বেষ্টন করিয়া, আমাকে নমস্কার করিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলে, আমি তাঁহাকে একটি বেঞ্চে বসিতে বলিলাম। তিনি অধোমুখে বসিলেন। আমি তাঁহাকে মধুর সস্নেহকণ্ঠে বলিলাম যে, তাঁহার পিতা একদিন এই কক্ষে তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া বসিয়াছিলেন এবং যে কোর্টে তিনি আজ এ ভাবে উপস্থিত হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার পিতা উহাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ভাগ্যে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। এখন এই স্থানে, এই কোর্টে তাঁহার কি এরূপ ভাবে উপস্থিত হওয়া উচিত? বিশেষতঃ এই ডাক্তারও একদিন তাঁহার প্রণয়ভাগী ছিলেন। তিনি তাঁহার অন্ন বহু বর্ষ খাইয়াছেন। আমার করুণ সস্নেহ কণ্ঠ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল, তাঁহার চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—তিনি কি করিবেন, তাঁহার রক্ষক এই মোকদ্দমা চালাইতেছেন। তিনি এরূপ স্নেহকরুণ কণ্ঠ কখনও শুনেন নাই। আমি যাহা বলিব, তিনি তাহাই করিবেন। কিন্তু তাঁহার রক্ষকের আদেশ ছাড়া মোকদ্দমা ছাড়িবার যে তাঁহার ক্ষমতা নাই, আমি তাহা সহজেই বুঝিতে পারি। আমি উক্ত জমিদারকে চিনিতাম। আমি তাঁহার একটুক প্রশংসা করিয়া বলিলাম যে, তোমরা এখনই একখানি গাড়ী ছুটাইয়া তাঁহার কাছে বলিয়া পাঠাও যে, আমি তাঁহার সম্মানের অনুরোধে এ মোকদ্দমা ছাড়িতে বলিতেছি। অন্যথা ইহাতে তাঁহাকে বিবাদীর পক্ষে নিশ্চয় সাক্ষী মানিবে, এবং জেরাতে তাঁহাকে ঘোরতর অপমানিত করিবে। এখন রমণী আর ডাক্তারের হাতে নহেন। অতএব তাঁহার ঈর্ষারও কোন কারণ নাই। রমণী এ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া উঠিয়া গেলেন। প্রথম অঙ্ক শেষ হইল।

কাচারিতে গিয়া দ্বিতীয় অঙ্ক খুলিলাম। ডাক্তার ও তস্য ব্যারিষ্টারকে বুঝাইলাম, এরূপ একটা ঘৃণিত মোকদ্দমায় বেশ্যার প্রতিযোগী হইয়া ডাক্তার মহাশয়ের আসামীর বাক্সে দণ্ডায়মান হওয়া কি সম্মানের কথা হইবে? বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার সাহেব সচশমা তীরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া এবং ব্যারিষ্টারি তন্ত্রমতে বুটাবদ্ধ চরণ একখানি চেয়ারের উপর তুলিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া বলিলেন—"ইওর ওয়ারসিপ! মোকদ্দমাটা কিছুই নহে। সম্পূর্ণ অমূলক। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি উহা আপনাকে দেখাইতে পারিব।" আমি বলিলাম—"তাহা হউক,

এই পাঁচ মিনিটও ত তাঁহাকে একটি বেশ্যার মোকদ্দমায় আসামীর বাক্স শোভিত করিতে হইবে?" কিন্তু ব্যারিষ্টার মহাশয়েরাও শিকারীবিশেষ। একবার শিকার তাঁহাদের জালে পড়িলে আর তাহাকে ছাড়িবেন না। তাঁহার বিশ্বাস যে, এক গুলিতে তিনি এ মোকদ্দমা উড়াইয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু আমি দেখিলাম, হাইকোর্টের সমস্ত ব্যারিষ্টার-বীরেরা একত্র হইয়া তোপ দাগিলেও ইহার কিছুই হইবে না। তখন ট্রেজারির কার্য্যের ভাণ করিয়া আমি ট্রেজারির কার্য্য-কক্ষে গিয়া বসিলাম। ক্রমে ৩৷৷টা বাজিল, ট্রেজারির কার্য্য আর শেষ হয় না। ব্যারিষ্টার মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া গিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, তিনি ৪টার ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিতে চাহেন। অতএব মোকদ্দমাটি সেই দিন হইবে কি না, তিনি জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। ট্রেজারির কাজ শেষ করিয়া সময় পাইব কি না, বলিতে পারি না। তিনি যাইতে পারেন, আমি মোকদ্দমা মুলতুবি করিয়া, পরে দিন স্থির করিয়া দিব। তিনি ধন্যবাদ দিয়া, হ্যাট মাথায় দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখনই তৃতীয় অঙ্ক খুলিলাম। বাদিনীর মোক্তারকে ডাকাইলাম। সে বলিল যে, রক্ষকবাবুর বাড়ী হইতে লোক ফিরিয়া আসিয়াছে। তিনি সম্যক্ ভার আমার উপর দিয়াছেন। তাহার পর ডাক্তার মহাশয়কে ডাকিয়া আর একবার বুঝাইলাম। তিনি বলিলেন, বাদিনী মোকদ্দমার খরচ ১০০্ টাকা চাহিতেছে। আমি বলিলাম—তাঁহার অবস্থায় আমি পড়িলে উহা দিয়া এই আপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতাম। তাহার পর সস্মিতমুখে বাদিনী আসিয়া দরখাস্ত দিল যে, বিবাদী তাহার পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া তাহার গৃহে গিয়াছিলেন। তাহার প্রহরীর ভুলে এ গোলযোগ হইয়াছে। বাদিনী এখন জানিতে পারিয়াছেন, তিনি কোনও অপরাধের কার্য্য করিতে গিয়াছিলেন না। অতএব ভুলবশতঃ নালিশ হইয়াছে। বাদিনী মোকদ্দমা চালাইবেন না। পুলিস আমার ইঙ্গিতে কেবল ৪৪৮ ধারামতে চালান দিয়াছিল। মোকদ্দমা আপোষ হইয়া গেল। একটি ভদ্রলোকের এরূপে সম্মান রক্ষা হইল বলিয়া সমবেত জনতা আনন্দ প্রকাশ করিল। আর ভদ্রলোকটির কৃতজ্ঞতায় চক্ষু সজল হইল। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম, এখন তিনি আর বিবাদী নহেন। অতএব তিনি আমার গৃহে গিয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে আমি বড় সুখী হইব।

তাঁহাকে তখনই গৃহে লইয়া গিয়া জলযোগ করাইলাম। দেখিলাম, তিনি একজন সরলহৃদয় সদাশয় হতভাগ্য লোক। প্রলোভনের পীঠভূমি ইংলণ্ডে তিনি ফাঁদে পড়িয়া এক ইংরাজ মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইংরাজনীরা কৃষ্ণচর্ম্ম ভারতবাসীকে দেখিলেই 'নেটিভ প্রিন্স' (Native Prince) মনে করে, এবং পতঙ্গের মত অনলে ঝাঁপ দেয়। কারণ, সেখানে বিবাহ একরূপ বিপত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার পত্নী কলিকাতায় আসিয়া দেখিল, তিনি ত নেটিভ প্রিন্স নহেন, 'ঘৃণিত নিগার' এবং গোলামের জাতি! তখন দাম্পত্য-প্রেম-বন্ধন প্রথম শিথিল হইল। তাহার পর হাইকোর্টের দ্বারা তাহা ছিন্ন করাইয়া, এবং মোটা মাসিক বৃত্তি দণ্ড করাইয়া, বিলাতের পাখী বিলাতে উড়িয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার জীবন এরূপ নরকে পরিণত হইয়াছে। তিনি গলদশ্রুলোচনে বলিলেন যে, তিনি সন্তান দুটিকে রাখিয়া যাইতে তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা হইলে পাছে তাহার বৃত্তির অঙ্কের লাঘব হয়, সে জন্য সেই প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই। আমি তাঁহাকে আবার দার-পরিগ্রহ করিতে বলিলাম। কারণ, তিনি তখনও যুবক ও মাসিক ১০০০্ টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন। তিনি বলিলেন, তিনি যদি হিন্দুর ঘরের একটি নিরক্ষর সরলা বালিকা পান, তবে বিবাহ করিবেন। অন্যথা ব্রাহ্ম, কি খ্রীষ্টান-বালার ছায়াও স্পর্শ করিবেন না। তিনি আমাকে বড় আগ্রহের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। তাহার পরের বার কলি-কাতায় গেলে প্রতিশ্রুতিমতে তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার গৃহে

ফরাস বিছানা ভিন্ন কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, সমস্ত বিলাতি উপকরণ বিক্রয় এবং বন্ধুদের বিতরণ করিয়াছেন। আহার করিলাম কলাপাতে। এই প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্তেও তাঁহার পাপের মোচন হইল না। কিছু দিন পরে শুনিলাম, তিনি মৃত্যুর কোমল অঙ্কে তাঁহার এই দারুণ ব্যথা জুড়াইয়াছেন।

একদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া—আমি ঊষার সময়ে উঠি—স্নানকক্ষের দিকে পশ্চাতের বারাণ্ডা দিয়া যাইতেছি, সম্মুখে এক অবগুণ্ঠনবতী পদ্মাসনা ও অধোমুখিনী হইয়া বসিয়া আছে। সেই অবগুণ্ঠন ও পরিধেয় শাড়ীর মধ্য হইতে অতুলনীয় রূপ ও যৌবন ঊষালোকে ফুটিয়া পড়িতেছে। অবগুণ্ঠনবতী তুমি কে? উত্তর—"আমি বড় হতভাগিনী।" তুমি কেন এখানে এরূপ সময়ে আসিয়া বসিয়া আছ? উত্তর—"আমি বড় দুঃখে আপনার কাছে আসিয়াছি।" তুমি কোথা হইতে আসিলে? উত্তর—"অনেক দূর হইতে আসিয়াছি।" তাহার কণ্ঠস্বর কি মধুর! আমার স্মরণ হইল, এক ব্রাহ্মণ কিছু দিন হইল রাণাঘাটের এক মোক্তার তাহার স্ত্রীকে বাহির করিয়া লইয়াছে বলিয়া নালিস করিয়াছিল। আমি রমণীর নামে সাক্ষিস্বরূপ ওয়ারেণ্ট দিয়াছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি অমুক চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী?" উত্তর—"আমি বড় হতভাগিনী, দুঃখিনী।" আমি সক্রোধকণ্ঠে বলিলাম—"বটে! সে মোক্তার হতভাগা বুঝি তোমাকে এরূপ ভাবে এখানে আসিয়া বসিয়া থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে। আচ্ছা, আমি এখন তাহাকে শিক্ষা দিতেছি।" তখন রমণী বসনান্তর হইতে হাত দুখানি—কি সুন্দর ক্ষুদ্র চম্পক-কলি-সজ্জিত কনক পুষ্পপাত্রের মত ক্ষুদ্র কর!—বাহির করিয়া আমার পা দুখানি ধরিতেছিল, আমি সরিয়া পড়িলাম, এবং ভৃত্যকে ডাকিয়া, তাহাকে সম্মুখের বারাণ্ডায় লইতে বলিলাম। ইতিমধ্যে স্ত্রী ও সমস্ত গৃহের লোক জাগিয়া উঠিয়া এই অপূর্ব্ব ঊষা-সমাগম দেখিতে লাগিলেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া সম্মুখের বারাণ্ডায় গিয়া দেখি, ডাক্তারের সঙ্গে বাবু সুরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী বেড়াইতে আসিয়াছেন। রমণী দীর্ঘ সুগোল সুভঙ্গি দেহের লীলাতরঙ্গ দেখাইয়া, সিঁড়ির উপর অবগুণ্ঠনে বসিয়া আছে। সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"প্রভাতে এ ব্যাপারখানা কি?" আমি বলিলাম—"ঊষাদেবী।" সে শুনিয়া মস্তক নত করিয়া হাসিল। তাহার উপাখ্যান শুনিয়া ডাক্তারবাবু বলিলেন যে, তাহার স্বামী রাণাঘাটের হোটেলে আছে। সে ঘরে ঘরে তাহার ঊষাহরণের গীত হোমরের মত গাইয়া বেড়াইতেছে। তখন তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। ভগবানের কি ইচ্ছা, জানি না। প্রায় দেখিতে পাই, এরূপ রূপসী রমণীকে তিনি কদাকার গর্দ্দভের হস্তে, এরূপ মুক্তার মালা বানরের গলায় দিয়া থাকেন। তাই ভারতচন্দ্র দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

মধুর চকোর সুখ চাতকে না পায়, হায় বিধি! পাকা আম দাঁড়কাকে খায়!

তাহার স্বামী একটি খর্ব্বাকৃতি, শীর্ণকায়, কোটরস্থ চক্ষু, গোবর-বর্ণ এবং নিরক্ষর মূর্খ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সে দেখিয়াই দাঁত বাহির করিয়া বলিল, ঠাকুরাণীটি তাহারই হারাণ ধন। তাহার কথা শুনিয়া ও মুখভঙ্গি দেখিয়া সকলেই উচ্চ হাস্য করিলাম। ঠাকুরাণীটিও মাথা আরও হেঁট করিয়া সে হাসিতে যোগ দিলেন। তাঁহার সূক্ষ্ম বসনের অবগুণ্ঠন হইতে সে হাসি যেন শরতের শুভ্র মেঘাবৃত অস্ফুট জ্যোৎস্না! তখন আমরা তিন জনে মিলিয়া মিশিয়া তাহাকে একটা যোগশাস্ত্র বুঝাইলাম; কিন্তু কিছুতেই সে তাহার স্বামীর সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। তাহার এক কথা—তাহার স্বামী তাহাকে বড় যন্ত্রণা দেয়। যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। সে আর যাইবে না। তখন আমি ঠাকুরকে বলিলাম যে, আমি কি করিব, জোর করিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠান আমার ক্ষমতায় নাই। তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলে রমণী বলিল—"আমার সঙ্গে আপনার একজন লোক দেন। না হয়, পথে আমাকে বেইজ্জত করিবে, ধরিয়া মারিবে।" আমি

ঠাকুরটিকে সাবধান করিয়া দিয়া, একজন আর্দ্দালিকে রমণীর সঙ্গে দিলাম। তখন দম্পতি-যুগল চলিয়া গেল। কাচারির সময়ে দেখি, হাতা লোকাকীর্ণ। আর্দ্দালি বলিল—"সেই চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী নালিস করিতে আসিয়াছে। এমন সুন্দরী অল্প দেখা যায়, তাই রাণাঘাট ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছে।" আমি এজলাসে গিয়া অধিষ্ঠিত হইবা মাত্র—সাক্ষীর বাক্সে এ কি মূর্ত্তি! রূপে কাচারিকক্ষ আলোকিত হইয়াছে। তাহার এখন আর অবগুণ্ঠন নাই। তাহার বিমুক্ত দীর্ঘ কবরী তরঙ্গ খেলিয়া বিপুল শ্রোণীদেশ পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে দুই চারি গুচ্ছ মন্মথের স্বপ্নশয্যাস্বরূপ উন্নত উরসে পড়িয়া কি শোভাই বিকাশ করিতেছে! তাহার কি সুন্দর দীঘল মুখ, কি সুন্দর চক্ষু, নাসিকা ও ওষ্ঠাধর! মদিরাক্ত চক্ষু দুটির কি ঢুলু ঢুলু মদালস অরুণ আভা! গোলাপ-রাগ-রঞ্জিত ঈষৎ ভিন্ন অধরোষ্ঠের অন্তরালে কুন্দকুসুম-শ্রেণীনিঃসৃত কি কৌমুদী আভা! পরিধান একখানি সূক্ষ্ম শাটী, বাম স্কন্ধে একখানি গামছা, সুবর্ণ-প্রভা সুতনু তৈলাক্ত। রমণী যেন স্নান করিতে যাইতেছে। হস্তে একখানি দরখাস্ত। নালিস,—তাহার স্বামী তাহাকে গোয়ালার দ্বারা মারপিট করিয়াছে। স্বামী মহাশয় মোক্তারদের পশ্চাৎ হইতে রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! এমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি আমি মারিতে পারি,?" সমস্ত লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিল না কেবল রমণী। সে মদিরার প্রভাবে যেন কি ভাবে বিভোর হইয়া স্থিরনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার স্বামীর মোকদ্দমার মত তাহার নালিসেরও প্রমাণ তলব দিয়া সেই মোকদ্দমার দিনে উহারও দিন দিলাম! রমণী চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে তীর্থযাত্রীর মত লোক ছুটিল।

পরদিন রবিবার। অপরাহ্ণে আমার আফিস-কক্ষে লিখিবার 'সোফা'র উপর অর্দ্ধশায়িত হইয়া সংবাদপত্র পড়িতেছি, এমন সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সেই কৌতুকমূর্ত্তি দ্বারে দণ্ডায়-মান হইল। কি ঠাকুর! কি চাও; করযোড়ে উত্তর—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আজ রবিবার। সে মোক্তারটি এখানে নাই। আপনি যদি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া দুটি কথা বলেন, আমি তাহাকে লইয়া যাইতে পারি। আপনার কথায় সে নরম হইয়াছে, এবং বাড়ী ফিরিয়া যাইতে একরূপ সম্মত হইয়াছে। আপনি আর একটিবার দুটি কথা বলিলে সে যাইবে।" সে কোথায়? উত্তর—"এক বেশ্যালয়ে!" আমি আর্দ্দালিকে তাহার সঙ্গে দিলাম। ঠাকুরাণীটি আসিলেন। এবার তাঁহার মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি নহে। ললাট পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন। তিনি কপাট ধরিয়া দাঁড়াইলেন। এক পালা বুঝাইলাম। তাহা নিষ্ফল হইল। তিনি বলিলেন—আমার স্বামী মানুষই নহে। সে গোয়ালাদের সঙ্গে আমাকে অবৈধ কার্য্য করিতে, ঘরে বসিয়া বেশ্যাবৃত্তি করিতে বলে। তাহা যদি করিতে হয়, তবে ঘরে বসিয়া করিব কেন? আমার যেখানে খুসী যাইব।" আমি একটু বিদ্রূপাত্মক ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলাম, বাহিরে যে বৃত্তি করিতে তিনি দাঁড়াইয়াছেন, তাহা ঘরে বসিয়া করিতে পারিলে বরং সুবিধারই কথা। তখন আমি করুণ-গম্ভীর কণ্ঠে আর এক পালা বুঝাইয়া বলিলাম—"আমি স্বীকার করি, তুমি পরমা সুন্দরী। তুমি বাজারে গিয়া পড়িলে, খুব একটা পসার হইবে। অনেক বসন্তের কোকিল জুটিবে। কিন্তু তুমি এখনই প্রায় যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়াছ। দুই দিন পরে বসন্তের কোকিল সকল উড়িয়া যাইবে এবং রূপের উদ্যানও শুকাইয়া যাইবে। তখন তোমার কি উপায় হইবে, একবার ভাবিয়াছ কি? এ সময়ে একটি 'হাতের পাঁচ' স্বামী থাকিলে বরং সুবিধার কথা।" তখন সে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"আপনি কি তবে সত্য সত্যই আমাকে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে বলেন?" তাহার মুখের, কথার ও চাহনির ভঙ্গিতে বোধ হইল, যেন ঔষধ তাহাকে ধরিয়াছে। তখন আমি আরও গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম—"আমি এক শ বার বলি। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, তুমি কি সুখ শান্তি ছাড়িয়া, কি নরকে ঝাঁপ

দিতেছ। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না যে, দু দিন পরে তুমি কি দুর্গতি ভোগ করিবে।" তখন সে আবার আমার দিকে স্থিরনয়নে চাহিয়া বলিল—"বাড়ী লইয়া আমাকে মারিলে ও অপমান করিলে আপনি যদি আমার খবর লইবেন বলেন, তবে আমি যাইব।" আমি বলিলাম —"তুমি লেখাপড়া জান?" উত্তর—"জানি, অতি সামান্য। আপনার কাছে পত্র লিখিলে আপনি আমার নালিশ শুনিবেন?" আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম—"শুনিব।" রমণী স্থির-নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আমার বাড়ীর কাছে অমুক গ্রামে শীতের সময়ে আপনার তাঁবু পড়িয়া থাকে। আপনি সেখানে গেলে আমার খবর লইবেন। আমি কেবল আপনার আদেশে এখন স্বামীর কাছে আবার যাইতেছি।" আমি তাহাও প্রতিজ্ঞা করিলাম এবং ঠাকুরটিকে খুব ধমকাইয়া, তাহাকে মারিতে কি অপমান করিতে নিষেধ করিলাম। তাহার সেই এক মহাযুক্তি—"ধর্ম্মাবতার! এমন সুন্দরী স্ত্রীকে কি কেহ মারিতে পারে?" আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"ঠিক কথা।" তখন রমণী আমার দিকে সকৃতজ্ঞ ভাবে চাহিয়া বিদায় হইল, এবং তাহার স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল। রাণাঘাটে একটা গল্পের ঝড় বহিল।

সপ্তাহ পরে শিবির হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম যে, ঠাকুরাণীটি মোক্তারের ইজার চাপকান সামলা পরিয়া যেমন রাণাঘাট ষ্টেশনে ট্রেনে উঠিতেছিল, অমনি তাহার স্বামী কয়েক জন গোয়ালা লইয়া গিয়া, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বাড়ী লইয়া গিয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেশনে একটা শুম্ভ-নিশুম্ভ পালা অভিনীত হইয়াছে। পরদিন কাচারিতে যাইবার সময়ে দেখি, আবার চারি দিকে লোকারণ্য। এজলাসে উঠিবামাত্র ঠাকুরাণীটি আবার দরখাস্তহস্তে বাক্সে উপস্থিত! তাহার দু নয়নে অশ্রুধারা বহিতেছে। সে কাঁদিতে কাঁদিতে এজাহার দিল যে, আমার আদেশমতে সে বাড়ী ফিরিয়া গেলে, তাহার স্বামী তাহার গোয়ালা গাঁজা-খোর ইয়ারদের আনিয়া, তাহাকে খুব এক প্রস্থ মারপিট করে। শেষে তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া, গোয়ালারা কেহ তাহার বুকের উপর উঠিয়া বসে ও কেহ তাহাকে ধরে এবং তাহার স্বামী তাহার সমস্ত চুল কাটিয়া দেয়। সে মাথার কাপড় ফেলিয়া তাহার মস্তক দেখাইল। তাহার সেই দীর্ঘ চাঁচর চিকুর নিষ্ঠুরভাবে কাটা এবং তাহার সর্ব্বশরীরে প্রহারের চিহ্ন। আমি তখন তাহার স্বামীকে বলিলাম—"ঠাকুর! এ কর্ম্ম তোমার।" সে নিরুত্তর রহিল। বলা বাহুল্য, পরে মোকদ্দমার দিন স্বামী স্ত্রী আর কেহই উপস্থিত হইল না। শুনিলাম, হতভাগিনী বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

কথায় কথায় আর একটি শোচনীয় কাহিনী স্মরণ হইল। এক দিন ডাকে রমণীর হস্তাক্ষরে লিখিত একখানি পত্র পাইলাম। তাহার মর্ম্ম—তিনি রাণাঘাটের কোন উচ্চ কর্ম্ম-চারীর কন্যা। তিনি আমার কাব্যাবলী পাঠ করিয়া আমাকে দেখিবার জন্য বড়ই আকুল হইয়াছিলেন। আমি রাণাঘাটে আসিয়া এক দিন তাহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া-ছিলাম। তিনি সেই দিন হইতে আমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রামবাসিনী একটি স্ত্রীলোকের ঠিকানায় পত্র লিখিলে তিনি উত্তর পাইবেন। তিনি এক মাস আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকিবেন। যদি কোন সানুকূল উত্তর না পান, তবে তাঁহার অদৃষ্টে যাহা থাকে, তিনি তাহাই করিবেন। পত্রখানি বঙ্কিমী বাঙ্গালায় লিখিত, এবং চারি পৃষ্ঠা রমণীর প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত। তিনি স্বাক্ষর করিয়াছেন—"আপনার অভাগিনী কুন্দ"। বঙ্কিমবাবু শেষ জীবনে একদিন যথার্থই বলিয়াছিলেন—"নবীন! উপন্যাস লিখিয়া আমি দেশের হিত, কি অহিত করিয়াছি, ভাবিতেছি।" পত্রখানি পড়িয়া বিস্মিত ও চিন্তিত হইলাম। আমি আমার একজন বন্ধুকে পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি উহার অনুসন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়া, নিকটস্থ গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকটির অন্বেষণ করাইয়া জানিলেন যে, এই নামের একটি স্ত্রীলোক আছে, কিন্তু সে এ বিষয় কিছুই জানে না বলিয়াছে। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শান্তিপুরের কোনও তে'তর আমার জন্য এই

ফাঁদ পাতিয়াছে। কিন্তু পত্রে এরূপ একটা প্রকৃত রমণীহৃদয়ের উচ্ছ্বাস ছিল যে, আমার তাহা বড় বিশ্বাস হইল না। তাহার ঠিক এক মাস পরে তিনি একদিন প্রভাতে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, পত্রখানি প্রকৃত। পূর্ব্বরাত্রিতে একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর একটি বিধবা কন্যা পলায়ন করিয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোকটি সে বাড়ীর চাকরাণী ছিল। তিনি তখন এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য সেই স্ত্রীলোকটির কাছে আবার লোক পাঠাইলেন। সে তাহাকে বলিল—"তুমি কেন বারম্বার এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তোমাকে কি কেহ পাঠাইয়াছে?" তখন লোকটি আমার নাম করিলে সে বলিল—"কেন প্রথম বার এ কথা বল নাই? সে পত্র সত্য। সে উত্তরের জন্য এক মাস অপেক্ষা করিয়া, কাল রাত্রিতে একটি প্রতিবাসীর সঙ্গে কলিকাতায় পলায়ন করিয়াছে। আমি এখন তাহার আর কোনও খবর রাখি না।" শান্তিপুরে এরূপ ঘটনা প্রায় মধ্যে মধ্যে হইত। আমি স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলীকে লইয়া সন্ধ্যার পর বসিয়া গল্প করিতেছি, একটি লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিতেছে—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার স্ত্রীকে অমুক বাহির করিয়া লইয়াছে।' একবার স্বামীর কাতরতা সহ্য করিতে না পারিয়া, ভদ্রলোকেরা সেই স্ত্রীলোকটিকে ডাকাইতে অনুরোধ করিলেন। সে নিকটস্থ এক বাড়ীতে আছে বলিয়া তাহার স্বামী বলিল। তখন রাত্রি অনুমান ৯টা। আমি একজন কনষ্টেবল স্বামীর সঙ্গে দিলাম। কিছুক্ষণ পরে ঝন-ঝন-ঝনাৎ মলের শব্দে নীরব ভাগীরথীসৈকত মুখরিত করিয়া, এক যুবতী রমণী আসিয়া আমাদের সমক্ষে একটি বীরা রমণীর মত দাঁড়াইল এবং গ্রীবা উচ্চ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি আমাকে ডাকিয়াছেন?' আমি বলিলাম—"তোমার স্বামী নালিস করিয়াছে, তাই ডাকাইয়াছি।' উত্তর—"কোথাকার পোড়ারমুখ আমার স্বামী।' আর স্বামী মজকুর—সেও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দোসর—উপর্য্যুপরি বলিতে লাগিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার স্ত্রী!" সকলে এই দাম্পত্য প্রেমের অভিনয়ে হাসিতে লাগিলেন। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে অনেক যোগশাস্ত্র বুঝাইলাম। কিন্তু 'চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' সে একবার তাহাকে স্বামী বলিয়া স্বীকার পর্য্যন্ত করিল না। সে কাছে গেলে, সে ভুজঙ্গিনীর মত ফণা ধরিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। শেষে নাচার হইয়া আমরা স্বামীকে নালিস করিতে বলিলাম, এবং রমণীকে যাইতে বলিলাম। সে তীব্রদৃষ্টিতে আমাকে চাহিয়া বলিল—"কোথায় যাইব। এ পোড়ারমুখো পথে আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিবে। তোমার কনষ্টেবল আমাকে যেখান হইতে আনিয়াছে, সেখানে রাখিয়া আসিতে বল।" এ যেন প্রমীলার সখী 'বামী'। আমিও রামচন্দ্রের মত সভয়ে তাহার আদেশ পালন করিলাম। পর দিন স্বামী আসিয়া বলিল যে, নালিস আর কি করিবে, সে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

আর একটি অদ্ভুত মোকদ্দমা রাণাঘাটে পাইয়াছিলাম। এক দিন সন্ধ্যার পর শান্তিপুরের সবইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া বলিল যে, আমার রাণাঘাটে যাইবার বহু পূর্ব্বে এক জুয়াচোর দীর্ঘ নামধারী 'পরমহংস' সাজিয়া আসিয়া, রূপাকে সোনা বানাইতে পারে, এবং দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরোগ্য করিতে পারে বলিয়া শান্তিপুরের মত স্থানের বহু লোককেও ঠকাইয়া পলায়ন করে। প্রবঞ্চিতদের মধ্যে একজন,'পরমহংসের ভৃত্যকে সে দিন শান্তিপুরের ষ্টীমারে দেখিয়া থানায় সংবাদ দেওয়াতে সবইন্‌স্‌পেক্টর তাহাকে ধৃত করিয়া, আমার আদেশের জন্য আসিয়াছে। কারণ, প্রবঞ্চনার মোকদ্দমা পুলিসের গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। আমি তৎক্ষণাৎ তদন্তের আদেশ দিয়া, উক্ত ভৃত্যটির নামে ওয়ারেণ্ট দিলাম। পুলিস তাহাকে চালান দিল। 'পরমহংস'টি কে, সে কিছুতেই বলিল না। তাহার একমাত্র জবাব, সে এই ঘটনার কিছুই জানে না। 'না-হক' লোকেরা তাহার প্রতিকূলে সাক্ষী দিতেছে। লোকটি হিন্দুস্থানী। বিচারের দিন এক পাল বেশ্যা এক ব্যারিষ্টার লইয়া কলিকাতা হইতে উপস্থিত। আমি তখন বুঝিলাম, একটা জুয়াচোরের আড্ডায় আমার

হাত পড়িয়াছে। সাক্ষীদের দ্বারা প্রকাশিত হইল যে, 'পরমহংস'টি একটি অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক। সে রোগ ভাল করিতে পারে বলিয়া প্রকাশ্যভাবে বহু মুদ্রিত বিজ্ঞাপন ছড়াইয়াছিল, এবং অপ্রকাশ্যভাবে দুই এক জনের রূপা সোনা করিয়া দিয়াছিল। সে পণ্ডিতের সঙ্গে সংস্কৃতে শাস্ত্রালাপ, এবং মৌলবিদের সঙ্গে আরবি ভাষায় আলাপ করিত ও কোরান আবৃত্তি করিত। এক দিন বহু লোকে বেষ্টিত হইয়া 'পরমহংস' ঠাকুর বকমধ্যে বা বোকা-মধ্যে হংসবৎ বিরাজ করিতেছেন, এমন সময়ে এক প্রকাণ্ড বজরা আসিয়া লাগিল। একটি রমণী বহুমূল্য আভরণে সজ্জিতা ও বহু দাস-দাসী-বেষ্টিতা হইয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল—"বাবা! আপনি আমাকে উৎকট রোগ হইতে আরোগ্য করিয়া ও আমার স্বামীকে লক্ষপতি করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন পর্যন্ত আমি আপনার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি। কি সৌভাগ্য, এত দিনে আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। আপনি সম্প্রতি শান্তিপুরে আসিয়াছেন, লোকমুখে শুনিয়া আপনার শ্রীচরণ দর্শন ও সেবা করিতে আসিয়াছি।" সে বিনাইয়া বিনাইয়া নানা ছাঁদে তাহার কত গুণ কীর্ত্তন করিল। বাবাজি দর্শকগণের দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, রমণী চন্দননগরের একজন ভাগ্যবান্ সুবর্ণবণিকের পত্নী। সে একজন রাজরাণী হইয়াও তাঁহার জন্য এত দূর আসিয়াছে বলিয়া তাহার ভক্তির প্রশংসা করিলেন, এবং পরে সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। এ কথা শান্তিপুরে দাবানলবৎ প্রচার হইল, এবং ইহার পর পতঙ্গের মত শান্তিপুরবাসী লক্ষপতি হইবার জন্য বাবাজির জালে পড়িতে লাগিল। যাহা হউক, ভৃত্যটিও বহু লোক হইতে কাপড় ইত্যাদি লইয়া, মূল্য না দিয়া, পরমহংসের সঙ্গে গা-ঢাকা দিয়াছিল। দুই অভিযোগে আমি তাহাকে চারিটি বৎসর শ্রীঘরবাসের আদেশ দিলে, সে স্তম্ভিত হইল! সে মনে করিয়াছিল যে, যখন ব্যারিষ্টার আনিয়াছে, সে নিশ্চয় খালাস পাইবে। আমি তৎক্ষণাৎ এজলাস হইতে উঠিয়া, ট্রেজারিকক্ষে গিয়া কোর্ট সবইন্‌স্পেক্টরকে বলিলাম যে, এই ব্যক্তি হইতে কথা বাহির করিবার এই সময়। তিনি আমার তালিমমতে তাহাকে সেই স্তম্ভিত অবস্থায় বলিলেন—"আরে পাগল, তুই কেবল পরের জন্য মারা গেলি! তুই কিরূপে ধরা পড়লি, তাহা জানিস্? তুই ত সেই জুয়াচোর পরমহংসকে বাঁচাইলি, কিন্তু তোর উপপত্নীকে হাত করিবার জন্য সেই পরমহংসই হাকিমের কাছে ফয়ছল্লা চিঠি দিয়া তোকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিয়াছে।" বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িল। সে বলিল—"কি! সে বদমায়েস এরূপে আমাকে ধরাইয়া দিয়াছে। আচ্ছা, আমি এখন সকল কথা খুলিয়া বলিব।" আমি তাকে লইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে গেলাম, এবং দিস্তাখানিক কাগজে তিন ঘণ্টা কাল তাহার একরার লিখিলাম। সে এক অদ্ভুত উপন্যাস। সেই পরমহংসের আসল নাম কেদারনাথ বিশ্বাস। হাওড়ার এলাকায় সালখিয়ার এক জঙ্গলে সে এক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহে বাস করে। তাহার সহচরগণ কলিকাতার রাজাবাগানে তাহাদের উপপত্নী লইয়া থাকে। তাহারা কয়েক বৎসর যাবৎ ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, হাওড়া, হুগলি, বর্দ্ধমান, রাজসাহী, পাবনা, মালদহ প্রভৃতি জেলায় বহু স্থানে এরূপ পরমহংস-গিরি করিয়া বেড়াইয়াছে। সে প্রবঞ্চিতদের নাম, ধাম এবং প্রবঞ্চনার বিষয় ও কাহিনী সবিস্তার বলিল। আমি এই কাহিনী হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া উক্ত জেলার মাজিস্ট্রেটদের কাছে পাঠাইলাম, এবং শান্তিপুরের সেই সবইন্‌স্পেক্টরকে এক ওয়ারেণ্ট ও পত্রসহ হাওড়ার মাজিস্ট্রেটের কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠাইলাম। লোকটি বড়ই চতুর। সে সালখিয়া থানায় গিয়া, এই সকল ঘটনা আমার উপদেশমতে গোপন করিয়া, সেখানের পুলিসের সঙ্গে প্রভাতে গল্পে গল্পে কেদারনাথের কথা তুলিলে, দারোগা সাহেব চমকিত হইলেন এবং বলিলেন—"কেন মহাশয়! কেদারনাথ একজন সম্ভ্রান্ত লোক। সে কলিকাতায় এক হাউসের মুচ্ছুদ্দি। কলিকাতা তাহার ভাল লাগে না বলিয়া, সে সালখিয়া আসিয়া বাড়ী করিয়াছে এবং এখানে

ইটের কারবার করে।" সবইন্‌স্‌পেক্টর বলিল যে, কোনও গুরুতর মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য লওয়ার বড় প্রয়োজন। কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে এই লোকটি সেই কেদার-নাথ কি না, তাহা জানা আবশ্যক। অতএব সালখিয়ার দারোগা যদি একবার তাহাকে দেখাইতে পারেন, বড় ভাল হয়। তিনি বলিলেন—"তার আর ভাবনা কি? এখনি চলুন, দেখাইতেছি।" তিনি তাম্রকূট-যন্ত্রটির সেবা করিতে করিতে কেদারনাথের বাড়ীর সম্মুখে যাইয়া বলিলেন,—"ভায়া হে! বাড়ী আছ? কই, আমাকে যে ইট দিবে বলিয়াছিলে?' কোন্ 'আবা' হইতে দিবে? একবার এ দিকে আইস।" কেদারনাথও আর এক যন্ত্র সেবন করিতে করিতে যেই বাহির হইলেন, অমনি শান্তিপুরের যে লোকটি তাহাকে সনাক্ত করিতে গিয়াছিল, সে শান্তিপুরের দারোগার কাণে কাণে বলিল যে, এই সেই পরমহংস। দারোগা আর কথাটি না কহিয়া, বিদ্যুদ্‌বেগে তাহার পকেট হইতে 'হাতকড়ি' বাহির করিয়া, কেদার-নাথের হস্ত এই আভরণে সজ্জিত করিয়া চাবি দিল। কেদারনাথ ও তাহার বন্ধু সাল-খিয়ার দারোগা—বলা বাহুল্য, ব্যবসায়ে উভয়ের বখরা আছে—বজ্রাহত হইয়া কষায়িত লোচনে শান্তিপুরের দারোগার দিকে চাহিলেন। কেদারনাথ বলিল—"তুমি কে?" উত্তর—"আমি তোমার বাবা! আমি শান্তিপুরের পুলিস সবইন্‌স্‌পেক্টর।" প্রশ্ন—"তুমি কেন আমার এ অপমান করিলে?" উত্তর—"কেন বাবা, এমন অলঙ্কারটি পরাইয়া দিলাম, তাহাতেও রাগ। শান্তিপুরে যে খেলা খেলিয়াছিলে তাহা কি ভুলিয়াছ?" সে বলিল—"আমি শান্তিপুর কখনও যাই নাই।" উত্তর—"সে কথা যাদু! পরে বুঝা যাইবে। এখন শুভ যাত্রা কর।" প্রশ্ন—"আমাকে গ্রেপ্তার করিবার তোমার কি অধিকার?" উত্তর—"তুমি তবে নিমন্ত্রণ-পত্রটি নিতান্ত না দেখিয়া ছাড়িবে না। তবে দেখ।" এই বলিয়া, সে পকেট হইতে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া দেখাইল। সবইন্‌স্‌পেক্টর তাহাকে কনষ্টেবলের হাতে দিয়া, তাহার গৃহান্বেষণে ছুটিল। তাহাকে দেখিয়া একটি স্ত্রীলোক একটা বোচ্‌কা গবাক্ষপথে জঙ্গলে ফেলিয়া দিল। সবইন্‌স্‌পেক্টর উহা খুলিলে, উহাতে পরমহংসের দাড়ি, গোঁপ, পরিচ্ছদ, এবং এক রাশি বিজ্ঞাপন পাওয়া গেল।

পরমহংস রাণাঘাটে উপস্থিত হইলেন। যেই আমার বারান্দায় পদার্পণ করিলেন, আমার হিন্দুস্থানী 'দাই' (চাকরাণী) বলিয়া উঠিল—"আরে"! ইয়ে ত কৈলাস পুরী।" কৈলাস পুরী নামে এক জুয়াচোর সন্ন্যাসী চট্টগ্রামে গিয়া আমার দুই জন আত্মীয়ের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। দাই তাহাকে দেখিয়াছিল। আমি তখন বুঝিলাম যে, পরমহংসের কর্ম্মক্ষেত্র চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি কি সত্যই কৈলাস পুরী?" সে কি ভাবিল। আমার একজন আত্মীয় এখনও তাহার ভক্ত। বোধ হয় মনে করিল, সেই পরিচয় দিলে, আমার আত্মীয়ের খাতিরে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব। আবার কি ভাবিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"না, আমি কৈলাস পুরী নহি।" তার পর সে সংস্কৃত আরবি বলা সকলই অস্বীকার করিল। বিচারের দিন আবার যুগল ব্যবসাজীবী বেশ্যা ও ব্যারিষ্টার উপস্থিত হইল। বেশ্যাদের মধ্যে যে নায়িকা, সাক্ষীরা বলিল—সে-ই সুবর্ণ-বণিক্‌পত্নী সাজিয়া, বজরা ভাসাইয়া শান্তিপুর আসিয়াছিল, এবং দারোগা বলিল, সেই রমণীই বাবাজির সাজ-সজ্জার বোচ্‌কা জঙ্গলে ফেলিয়া দিয়াছিল। সে তাহার উপপত্নী। তাহার হাতের লেখা কতকগুলি প্রণয়লিপিও বোচ্‌কার মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। আমি আরও রহস্য উদ্ধার করিবার জন্য রমণীর কাছে ইহার সাহায্যকারী অপরাধিনী বলিয়া জামিন তলব করিলাম, এবং তাহা দিতে না পারাতে, তাহাকে হাজতের হুকুম দিয়া, পরম-হংসকে আমার আফিস-কক্ষে লইয়া, আমার কবিত্ব ঢালিয়া বুঝাইলাম যে, পত্রগুলি পড়িয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, রমণীটি তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসে। তাহার এত প্রেমের প্রতিদানে কি জেল? এরূপ অবস্থায় একটি পশুও তাহার প্রণয়ভাগিনীর জন্য প্রাণ দিতে

চাহে। সে কি পশুরও অধম? আমার ভাষার উচ্ছ্বাসে সে কাঁদিতে লাগিল। তাহার ভৃত্যদলের ও অন্যান্য লোকের নাম জানে না বলিয়া সে গোপন করিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি দেখিতেছ, শান্তিরামের কাছে মনসা আটকায় না। সে তোমাকে সালখিয়ার বনের গুপ্ত নিবাস হইতে শিকার করিয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আর সাক্ষীদের নাম গোপন করিয়া ফল নাই। তুমি যদি তাহাদিগের নাম-ধাম বল ও তাহাদের ধরাইয়া দেও, তবে তোমার প্রণয়িনীকে আমি বাঁচাইতে চেষ্টা করিব, এবং তোমারও দণ্ডের বিষয় বিবেচনা করিব।" আবার রমণীর প্রেমের কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলাম। সে আবার খুব কাঁদিল। অনেক ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমি তবে সকল খুলিয়া বলিব।" আমি কলম লইয়া তাহার স্বীকারোক্তি লিখিতে বসিলাম। সে চুপ করিয়া রহিল। আবার কিছুক্ষণ অধোমুখে ভাবিল। পরে বলিল—"আজ নহে। আমি সকল কথা স্মরণ করিয়া কাল বলিব।" আমি বুঝিলাম সে সময় পাইলে, তাহার প্রেমের উচ্ছ্বাস নিবিয়া গেলে, শক্ত হইয়া বসিবে। আর কিছুই বলিবে না। ফলে তাহাই হইল। পরদিন কিছুই বলিল না। তাহার সাফাই এক পাল বেশ্যার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম। তাহারা তাহার চরিত্রের সার্টিফিকেট দিল। আমি তাহাকেও চারি বৎসরের জন্য তাহার ভৃত্যের সহবাসে প্রেরণ করিলাম। সে নদীয়া জেলে গেলে, এই অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিয়া, জজ ম্যাজিস্ট্রেটেরা পর্য্যন্ত তাহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাহার পরমহংসলীলা এইরূপে শেষ হইল। এই চারি বৎসর কৈলাস পুরীও চট্টগ্রাম হইতে তিরোহিত হইয়াছিল। এখন শুনিতেছি, সে আবার দেখা দিয়াছে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য জেলার ম্যাজিস্ট্রেটেরা কিছুই করিলেন না। তাঁহাদের জেলার প্রবঞ্চনাজাল বাহির হইলে একজন বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইবে। তাঁহারা এরূপ মহাপাতক করিবেন কেন?

মিউনিসিপ্যালিটি

১। শান্তিপুর

এক রাণাঘাট সবডিভিসনে চারিটি মিউনিসিপ্যালিটি—রাণাঘাট, শান্তিপুর, উলা ও চাকদহ। রাণাঘাটের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রবাবু। অপর তিনটির অধিকারী সবডিভিসনাল অফিসার। আমার চেয়ারম্যানি গেজেট হইবার পূর্ব্বেই মিঃ বার্ণার্ড আমাকে লিখিলেন যে, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা বড় শোচনীয়। অতএব তৎক্ষণাৎ শান্তিপুর যাইয়া, উহার সম্যক্ অবস্থা অবগত হইয়া, রিপোর্ট করিতে আমাকে আদেশ করিলেন। আমিও চৈতন্যদেবের লীলাভূমি শান্তিপুর দেখিতে বড় লালায়িত। রাণাঘাটের ভার গ্রহণ করিয়াই আমি শান্তিপুর দেখিতে গেলাম। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী-তীরস্থিত শান্তিপুর বড় সুন্দর স্থান। বহু ভদ্রলোকের বাস, ইহার জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ হাজার। পূর্ব্বে শান্তিপুর সবডিভিসনের রাজধানী ছিল। এখনও পূর্ব্বতন সবডিভিসন গৃহের গঙ্গাতীরস্থ সুন্দর অট্টালিকা বিদ্যমান। তাহাতে এখন পুলিস ষ্টেসন বিরাজ করিতেছে। এই গৃহের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা। অতএব এই গৃহের শোভার কথা কি বলিব? কি স্থান-মাহাত্ম্যে, কি আহারাদির সুবিধায়, রাণাঘাট হইতে শান্তিপুর সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। রসজ্ঞ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই কারণে, বিশেষতঃ শান্তিপুরবাসিনীদের রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার রাজধানী কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া, অনেক সময় শান্তিপুরে কাটাইতেন। তাঁহার ও শান্তিপুর-রসিকাদের মধ্যে যে সকল রসিকতার বিনিময় হইত, তাহার অনেক গল্প এখনও প্রবাদের মত প্রচলিত। শান্তিপুর হইতে

এখন গঙ্গা সরিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুরবাসিনীর রসিকতাও ইংরাজ-সভ্যতার গুণে সরিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নদী সরিয়া এখনও উভয়ের খাল বর্ত্তমান। কেবল রাণাঘাট রেলওয়ে ষ্টেসন্ বলিয়া, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানহীন কোনও অরসিক রাজধানীটি শান্তিপুর হইতে রাণাঘাটে তুলিয়া লইয়াছিলেন। শান্তিপুরের এখন কিছুই নাই। যে 'মতির জুড়ি' বঙ্গদেশে ছিল না, সেই মতি রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষে শান্তিপুরের স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই 'শান্তিপুরী ডুরে শাড়ী সরমের অরি" এখন বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। শান্তিপুরের তন্তু সকল ম্যাঞ্চেষ্টারের কলের আগুনে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছে। বিখ্যাত তন্তুবায়-সকল লুপ্ত ও তাহাদের বংশধরগণ অন্নাভাবে চাষ বা চাকরি অবলম্বন করিয়াছে। আমি অনুসন্ধানে জানিলাম, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন তন্তুবায় মাত্র এখন অনশনে কোনও মতে পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় রক্ষা করিতেছে। আর সেই 'শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদে ভেসে যায়'—সেই প্রেমের বন্যা, যাহাতে প্রাণ জুড়াইতে আমি রাণাঘাট বদলিতে আনন্দিত হইয়া শান্তিপুর আসিয়াছিলাম, সে প্রেমের বন্যা কোথায়? সেই সীতানাথ অদ্বৈতের সন্তানেরা আজ কেহ মিউনিসিপ্যাল কমিশনর, কেহ অনারারি মাজিষ্ট্রেট, কেহ বা শান্তিপুরের খ্যাতনামা বদমায়েস,! দাদা শিশিরবাবুর অনুরোধে একদিন তাঁহার গুরুদেব প্রভুপাদ রাধিকাপ্রসন্ন গোস্বামীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ইনি কদাচিৎ শান্তিপুরে থাকেন, এবং তখন কাহারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি আসন হইতে ঘোরতর বিপন্নবৎ উঠিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলে—"আমাকে প্রণাম! আমাকে প্রণাম!" —বলিয়া গৃহের এক কোণায় গিয়া মুখ লুকাইয়া রহিলেন। কিছুতেই তাঁহার পদধূলি দিবেন না। তাঁহার ইচ্ছা, যেন তিনি মাটির ভিতর প্রবেশ করেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। বোধ হইল, যেন সত্য সত্যই চৈতন্যদেবের পার্ষদ কাহাকেও দেখিতেছি। তাঁহার গৌর বর্ণ, স্থূল নধর ভক্তিপূর্ণ দেহ, গোলাকার বদনমণ্ডলে প্রেমে ছল ছল আয়ত লোচন। তিনি যেন একটি আট বছরের শিশু, আর সত্য সত্যই 'তৃণাদপি সুনীচ' ও অভিমানহীন। আমি বলিলাম—"প্রভু! দাদা শিশিরবাবুর আদেশমতে আমি আপনার দর্শন লাভ করিবার জন্য এত দিন লালায়িত ছিলাম। কিন্তু শান্তিপুরে আপনি থাকেন না বলিয়া, আমি সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারি নাই। আজ এখানে আছেন শুনিয়া আমি বড় সাধ করিয়া আসিয়াছি। আপনি কি দয়া করিয়া আমার সঙ্গে দুটি কথাও বলিবেন না?" "আমি আপনার মত লোকের সঙ্গে কি কথা বলিব?"—বলিয়া অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর কোনও কথাই কহিলেন না। আমি তখন নিরাশ হইয়া, অদ্বৈত গোস্বামীর স্থাপিত বিগ্রহ দেখিতে গেলাম। যিনি সঙ্গে গিয়াছিলেন, তিনি মিউনিসিপ্যাল গোস্বামী। এ দিকের কোনও খবর রাখেন না। পশ্চাৎ হইতে কে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন যে, এই বিগ্রহই শ্রীঅদ্বৈত গোস্বামীর স্থাপিত। ফিরিয়া দেখিলাম, প্রভু রাধিকাপ্রসন্ন। তখন তিনি নিতান্ত সলজ্জভাবে বিগ্রহের সমস্ত ইতিহাস আমাকে বলিলেন। আমার শান্তিপুরদর্শন সফল হইল। আমি একজন প্রকৃত গোস্বামী দেখিলাম। পরে ইঁহার সারল্য সম্বন্ধে এক গল্প শুনিলাম। তিনি কাহাকে চাপল্যবশতঃ, কি বড় বিরক্ত হইয়া এক চড় মারিয়াছিলেন। সে তাঁহার নামে নালিশ করিয়াছে। মোকদ্দমা বিচারার্থে শান্তিপুরের বেঞ্চে প্রেরিত হইয়াছে। প্রভু রাধিকাপ্রসন্ন বেঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বালকের মত বলিলেন—"দোহাই আপনাদের! আমি বড় অন্যায় করিয়াছি। আর কখনও এমন পাপ করিব না। মারিতে হয়, আমার স্ত্রীকে মারিব, অন্য কাহাকেও মারিব না।" বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটেরা হাসিয়া উঠিলেন, এবং বাদীকে ভর্ৎসনা করিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে বাধ্য করিলেন।

যে শান্তিপুরে প্রেমের বন্যা বহিত, এখন সেখানে দলাদলির বন্যা। আর বন্যা

বেয়াদপির। মতি রায় শান্তিপুর এরূপ কঠোর ভাবে শাসন করিয়াছিলেন কেন, তাহা শান্তিপুরে পা দিয়াই বুঝা যায়। সেখানে এখন সকলেই প্রধান, কেহ কাহাকে গ্রাহ্য করে না। সব তিতু মিরের 'গুলি খা ডালা'র দল। আমি সবডিভিসনের একাধীশ্বর। আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছি। একজন বালক ইচ্ছা করিয়া আমার গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল। তাহার বিশ্বাস যে, সে কি একটা গৌরবের কার্য্য করিল। পশ্চাতে পেয়াদা ছিল। সে গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া তাহার গ্রীবা ধরিয়া লইয়া আসিল। আমি পদাতিককে বারণ করিতেছিলাম। ভর্ৎসনা করিয়া, বালকের গ্রীবা মুক্ত করিয়া দিয়া, তাহার নাম ধাম সকলই জিজ্ঞাসা করিলাম। সে একটি তাঁতির ছেলে। আমি তাহাকে বলিলাম—"বা! দিব্যি ছেলে। আমার গা ঘেঁষিয়া যাওয়া তোমার বড় সাধ? আচ্ছা, তুমি আইস। তোমার যত বার ইচ্ছা, গা ঘেঁষিয়া যাও।" পথে বহু লোক জড় হইল। সকলে হাসিতে লাগিল। আমি বালকের গায় হাত বুলাইয়া, বেশ আদর করিয়া, তাহাকে বিদায় দিলাম। এই গল্প বিদ্যুদ্‌বেগে শান্তিপুরময় প্রচারিত হইল। আর আমাকে স্বাধীনচেতা গা-ঘেঁষারা আপ্যায়িত করে নাই। বরং ইহার পর হইতে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই নমস্কার করিত। এই স্বাধীনচেতাদের আদর্শ ও দলপতি একজন হাইকোর্টের উকিল। কমিশনরদের মধ্যে তাঁহার এক দল আছে। তাঁহারা শান্তিপুরে His Majesty's Opposition (রাজকর্ম্মচারীদের প্রতিপক্ষ)। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে কেবল বাবু রামচরণ বসু শান্তিপুরে পুণ্যকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা সরিয়া যাওয়াতে শান্তিপুরে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সে জন্য 'চোরপুকুর' নামক এক পুষ্করিণী কাটাইয়া, তাহার তীরে সুন্দর এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে মিউনিসিপ্যাল আফিস এবং চারি দিকে মনোহর উদ্যান স্থাপিত করিয়াছেন। স্থানটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। যদিও এরূপ একটি সুন্দর অট্টালিকা মিউনিসিপ্যাল আফিসের জন্য আবশ্যক ছিল না, পুষ্করিণীটি বড় একটি পুণ্য কার্য্য হইয়াছিল। এখন প্রতিবাসীরা বহু দূর পর্য্যন্ত তাহারই নির্ম্মল জল পান করেন। এমন পুণ্য ব্রতেও এরূপ ঘোরতর দলাদলির বিদ্বেষ উঠিয়াছিল যে, একবার স্বয়ং লেপ্টেনাণ্ট গভর্ণরকে পর্য্যন্ত শান্তিপুরে যাইতে হইয়াছিল। উকিল মহাশয়ের দল পরাজিত হইয়া, রামচরণবাবু আলিপুর বদলি হইয়া গেলে, এক পাটি জুতা 'বাঁকী' করিয়া তাঁহার কাছে ও অন্য পাটি তাঁহার ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। এ জন্য শান্তিপুরের নাম miscalled city of peace বা অশান্তিপুর।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তীর সময় পর্য্যন্তও দলাদলি পূর্ণবেগে চলিতেছিল। তাহার ফলে ট্যাক্স-দারোগা ৪,০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করিয়া, আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীঘরবাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং শান্তিপুরে দলাদলির আগুন দাবানলবৎ জ্বলিতেছিল। কারণ, মিউনিসিপ্যাল কমিশনরদের মধ্যেও কেহ কেহ এই অপহৃত অর্থের অংশী ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটি দেউলিয়া হইয়াছে। ভাণ্ডার শূন্য, কার্য্য বন্ধ, কর্ম্মচারীদের মধ্যে বেতনাভাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। তাহার উপর উকিল মহাশয়ের সাধ হইয়াছে যে, তিনি চেয়ারম্যান হইয়া স্বায়ত্ত শাসনের চরম 'দিল্লীকা লাড্ডু' শান্তিপুরকে ভোজন করাইবেন। আমি সমস্ত অবস্থা খুলিয়া মাজিষ্ট্রেটকে লিখিলাম—'যা শত্রু পরে পরে'। এরূপ একটা উৎপাত আমাদের ঘাড়ের উপর না রাখিয়া, উকিল মহাশয়কে একবার 'চেয়ারম্যান' করিয়া দেওয়া ভাল। এ দিল্লীকা লাড্ডু তিনি নিজের উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে যে 'পস্তানি পস্তাইবেন' তাহাতে এই দলাদলি নিবৃত্তি হইবে। তখন সকলে সাধিয়া আবার সবডিভিসনাল অফিসারকে চেয়ারম্যান করিবে, এবং কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে চলিবে—তিনি লিখিলেন—"আমি জানি যে, শান্তিপুর আপনার রাণাঘাট-শাসনের ঘোরতর অপ্রীতিকর অংশ। কিন্তু তাহা বলিয়া আমি আপনাকে উহা হইতে অব্যাহতি দিতে পারি

না। অতএব কি প্রণালীতে উহা পরিচালিত করিলে এই শোচনীয় অবস্থা হইতে মিউনিসিপ্যালিটি উদ্ধার লাভ করিবে, আপনি তাহা স্থির করিয়া রিপোর্ট করিবেন।" আমি তখন একটি কার্য্য-প্রণালী বহু চিন্তার পর উদ্ভাবন করিয়া, তাঁহার কাছে দীর্ঘ রিপোর্ট করিলাম। তিনি তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া লিখিলেন যে, এই প্রণালী আমি যদি শান্তিপুরের কমিশনরদের দ্বারা গ্রহণ করাইতে পারি, তবে তাঁহার বিশ্বাস যে, শান্তিপুরের এত কাল পরে একটা সুদিন (red-letter day) আসিবে। তাঁহার এরূপ লিখিবার কারণ এই যে, আমার প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী একটি তূণবিশেষ। ইহাতে মিউ-নিসিপ্যালিটির সংস্কারের জন্য শাণিত শরজাল ছিল। তাই শান্তিপুরের মত স্থানের কমিশনরগণ এই সকল শর নীরবে পিঠ পাতিয়া লইবেন কি না, তাঁহার বিশেষ সন্দেহ ছিল। যাহা হউক, এই তূণ পৃষ্ঠে বাঁধিয়া আমি প্রথম সভায় উপস্থিত হইলাম। আমি প্রথম একটি 'গৌরচন্দ্রিকা' পাতিলাম। বলিলাম, আমি হিন্দু, কাজেই পৌত্তলিক। শ্রীভগবান্ 'অবাঙ্‌মনসগোচর'। তাই হিন্দুরা তাঁহার শক্তির রূপ কল্পনা করিয়া প্রতিমা নির্ম্মাণ করে, এবং তাঁহার পূজা করে। শান্তিপুরের জনসংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার। আমি মিউনিসিপ্যালিটিকে তাহাদের একটি প্রতিমা মনে করিব, এবং তাহার পূজা করিব। যাহাতে তাহাদের হিত হয়, আমি তাহাই প্রস্তাব করিব। কমিশনরেরা গ্রহণ করেন, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। না করেন, তাহা নিতান্ত গুরুতর না হইলে, সেখানেই শেষ হইবে। এই গৌরচন্দ্রিকা গাইয়া আমি সেই সংস্কার-প্রণালী (Reorganization scheme) পাঠ করিলাম। উহা তাঁহাদের মস্তকে যেন একটি বিরাট্ বোমের মত পতিত হইল। তাঁহারা প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, শান্তিপুরের মত স্থানে আমি প্রথম অধিবেশনে এরূপ একটা বিপ্লব উপস্থিত করিব। সকলে বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তার পর সামলাইয়া, জনে জনে বলিলেন যে, আমি একজন বিখ্যাত কবি ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বলিয়া তাঁহারা আমাকে বড় ভক্তি করেন। আমার শাসনকার্য্যের মুখপাত যাহা দেখিয়াছেন, তাহার খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, আমি এখনও শান্তিপুর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। অতএব তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধ, আমি কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া যেন মিউনিসিপ্যালিটির সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। ২০ জন কুলি আছে। ইহাদের বেতন বৎসরে ২,৫০০্ টাকা। ইহাদের কার্য্যের মধ্যে তাহারা কমিশনরদের বাড়ীতে চাকরের মত কার্য্য করে। আমি তাহাদের একেবারে উড়াইয়া দিয়াছি—কি সর্ব্বনাশের কথা! তাঁহারা একবাক্যে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, এখনই মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তাঘাটের এই দুরবস্থা। ইহাদের উঠাইয়া দিলে শান্তিপুরে লোকের বাস করা অসাধ্য হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ইহারা কি কাজ করে? উত্তর—কাঁচা রাস্তা মেরামত করে। প্রশ্ন—গত বৎসর কাঁচা রাস্তা মেরামতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে? উত্তর—দুই কি আড়াই হাজার টাকা হইবে। আমি তখন পূর্ব্ব-বৎসরের বজেট দেখাইয়া বলিলাম যে, মোটে বজেটে কাঁচা রাস্তা মেরামতের ৩০০্ টাকা মাত্র ছিল। দুই আড়াই হাজার টাকা কিরূপে ব্যয়িত হইল? তাঁহাদের মধ্যে একটা ঘোরতর আন্দোলন উঠিল, ঠিক যেন ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়িয়াছে। তাঁহারা ব্যয়ের হিসাব তলব করিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ৩০০্ টাকাও ব্যয়িত হয় নাই। তখন তাঁহারা কিছু অপ্রতিভ হইয়া সুর বদলাইলেন। বলিলেন, তাহা হউক। ইহাদের বরখাস্ত করিলে এই কাজই বা কিরূপে চলিবে? শান্তিপুরে সকল সময়ে লোক পাওয়া যায় না। আমি উহার অবস্থা জানি না। তাহাতেই এরূপ অন্যায় প্রস্তাব করিতেছি। আমি বলিলাম যে, জবাবদিহি আমার। আমি যেরূপে পারি, এই ৩০০্ টাকায় কাজ চালাইব। আমার প্রতি তাঁহাদের অসন্তোষের তাপমান যন্ত্র ১০০ ডিগ্রি উঠিল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে বিল-সরকারদের

নির্দ্দিষ্ট বেতন উঠাইয়া দিয়া, আমি তাহাদের কমিশনের ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাতেও মিউনিসিপ্যালিটির বৎসর প্রায় ১,৫০০ টাকা ব্যয় লাঘব হইবে। ঐটি আরও সর্ব্বনেশে কথা! ইহারা কমিশনরদের কেহ বাড়ীর গোমস্তা, কেহ আত্মীয়। এবার তাঁহাদের মুখে ক্রোধে আর কথা সরিল না। তাপমান যন্ত্র ১০৫ ডিগ্রি উঠিল। তাঁহারা বলিলেন, কমিশনে সরকার শান্তিপুরে পাওয়া যাইবে না। আমি বলিলাম, তাহারও জবাবদিহি আমার। না পাই, অন্য স্থান হইতে আমদানি করিব। তাঁহারা ক্রোধের অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলেন। তৃতীয় প্রস্তাব,—পাকা রাস্তার কার্য্য ও অন্য কার্য্য কণ্ট্রাক্টার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে। এখন পরোক্ষে উহা কোনও কোনও কমিশনরের দ্বারা বা তাঁহাদের লোকের দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, এবং যেখানে তাহা না হয়, কার্য্যের শেষ সার্টিফিকেট দেওয়ার সময়ে দু পয়সা পাওয়া যায়। একজন খ্যাতনামা পেন্সনপ্রাপ্ত একর্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও কমিশনর ছিলেন। আমি প্রস্তাব করিয়াছি, এরূপ কার্য্য তাঁহার তত্ত্বাবধারণে হইবে। এই দলের মধ্যে তিনি লোকটি একটুক খাঁটি। আমার এই সংস্কারপ্রণালী তিনিই যাহা একটুক তখন, এবং পরে অন্তরের সহিত অনুমোদন করিয়াছিলেন। হরি! হরি! এই উপরি পাওনাটিও গেল! তাহা হইলে দর্জ্জিবংশীয়েরা কেন 'ভোট' ভিক্ষা করিয়া কমিশনর হইবে? চতুর্থ প্রস্তাব সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক। এক জন হেড কেরানি আছেন। তিনি 'পলাশির যুদ্ধে'র পূর্ব্বে পেন্সন প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়াছেন। বহু কাল ৪০ টাকা বেতনে মিউনিসিপ্যাল আফিসের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার বয়স এখন অশীতিরও উর্দ্ধে, এবং হস্ত-কম্পনের জন্য আপনার নামটি পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারেন না। তিনি শান্তিপুরবাসী এবং তাঁহার সুকতলার জোর আছে। আর আমি কি না প্রস্তাব করিয়াছি, এহেন শুকদেবের বা মুখদেবের আসনটি শূন্য করিয়া, কেবল ১৫ টাকা বেতনের দ্বিতীয় কেরানিটির দ্বারা আফিস চালাইব। এবার তাঁহারা হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অসম্ভব! অসম্ভব! এরূপ প্রস্তাব কেবল আমার অপরিণামদর্শিতার ফল। কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি কি কাজ করেন, তখন দেখা গেল যে, কিছুক্ষণ টানাপাখা-সঞ্জাত চোরপুকুরের শীতল বাতাস ভক্ষণ করা ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন না। তাঁহাকে আমার সাক্ষাতে দুই লাইন লিখিতে বলিলে তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। আমি দেখাইলাম, বরাবর দ্বিতীয় কেরানিই সমস্ত কাজ করিতেছে। আর না, যাহাদের স্বার্থে আঘাত পড়িয়াছিল, তাহারা এবার আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। তাপমান যন্ত্র ১২০ ডিগ্রিতে উঠিল। উত্তাপে গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল। আমাকে এবার উকিল মহাশয় প্রমুখ প্রায় সকলে গালি দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, এরূপভাবে মিউনিসিপ্যালিটি চলিবে না। তাঁহাদের সুনামে কলঙ্ক হইবে। অতএব এ সকল প্রস্তাব তাঁহারা কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। আমি তাহার জন্য অপ্রস্তুত ছিলাম না। আমি তূণ হইতে আমার শেষ বাণ নিক্ষেপ করিলাম। যদিও মিউনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক আয় ২০,০০০ টাকা, তাহার ফণ্ডে ট্রেজারিতে মাত্র ২০ টাকা জমা আছে। তাহার দেনা ১১,০০০ টাকা, এবং কর্ম্মচারিগণ ৬ মাসের বেতন পায় নাই। আমি আমার ঘর হইতে টাকা দিয়া ত মিউনিসিপ্যালিটি চালাইতে পারি না। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই বার চৌদ্দ হাজার টাকা তাঁহাদের ঘর হইতে না দেন, কিম্বা আমার প্রস্তাবাবলি গ্রহণ না করেন, আমি চেয়ারম্যানি ত্যাগ করিয়া তখনই মাজিষ্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম করিব। টেলিগ্রাম লিখিতে ফরম চাহিলাম। তাঁহাদের চোক কপালে উঠিল। তাঁহারা ট্যাক্স-দারোগাকে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন; বলিলেন—"সে কি! ফণ্ডে কেবল কুড়ি টাকা! ১১,০০০ টাকা দেনা! ৬ মাসের বেতন বাকী!" সে বলিল—সকলই ঠিক। তাঁহারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। আমি টেলিগ্রাম লিখিতে লাগিলাম। তখন তাঁহারা চুপে চুপে পরামর্শ করিয়া,

কেহ কেহ করযোড় করিয়া বলিলেন—"তবে আপনি ৬ মাস এই প্রণালীতে কার্য্য চলে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখুন।' আমি সম্মত হইলাম, এবং তদনুসারে মন্তব্য লিখিলাম ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাম করিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ Congratulate করিয়া টেলিগ্রাফ করিলেন। পালা শেষ হইল। কমিশনরগণ বিষন্নমুখে গৃহে ফিরিলেন, এবং তাহার পর উকিল মহাশয় আমাকে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' সংবাদপত্রে খুব একচোট গালি দিয়া গাত্রজ্বালা নিবারণ করিলেন। লিখিলেন—"বাঙ্গলার বিখ্যাত কবিটি রাণাঘাটে একেবারে অযোগ্য (total failure) হইয়াছে। সে এমনি হৃদয়হীন যে, শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়াই বহু লোকের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছে।" হায় বাঙ্গালী! ইহাই তোমার স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বার্থ-সাধন!

কিছুদিন শান্তিপুর এই আন্দোলনে 'ডুবু ডুবু' হইয়া স্থির হইল, এবং আমার সংস্কৃত প্রণালী কলের মত চলিতেছে দেখিয়া বিপক্ষেরাও তখন সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সাধারণ লোকেরা জয়জয়কার করিতে লাগিল। প্রায় ৫,০০০৲ টাকা বাৎসরিক ব্যয় কমাইয়া ফেলিয়াছিলাম, এবং আমার প্রচলিত নূতন প্রণালী অনুসারে মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সও কলে আদায় হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেনা পরিশোধ হইল, এবং কর্ম্মচারীরা বেতন মাসে মাসে আমার আগে পাইতে লাগিল। এ দিকে রাস্তাঘাটও দেখিতে দেখিতে রূপান্তর হইল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা রাণাঘাট হইতে আহার করিয়া, মাসে একবার মাত্র শান্তিপুর যাইতেন ও মিটিংএর পর চলিয়া আসিতেন। আমি সেখানে প্রথম ভাগীরথীর সৈকতে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান-বাটিকায়, এবং পরে মিউনিসিপ্যাল আফিসের এক কক্ষে আমার থাকিবার স্থান করিলাম। মাসে দুই তিন বার যাইতাম, এবং এক কি দুই দিন থাকিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরিয়া সমস্ত কার্য্যাবলী নিজের চক্ষে দেখিয়া আসিতাম। তাহা ছাড়া এরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যে, সকাল বেলার ডাকে প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটির ওভারসিয়ার ও ট্যাক্স-দারোগা হইতে দুই রিপোর্ট আসিত। তাহাতে পূর্ব্বদিন কি কার্য্য কোথায় হইল, কত ট্যাক্স উশুল হইল, আমি রাণাঘাটে বসিয়া জানিতে পারিতাম। এই সকল রিপোর্টের পার্শ্বে আদেশ লিখিয়া, আবার উহা ফেরত পাঠাইতাম। তাহা ছাড়া ডাকে ও লোকের দ্বারা নানারূপ আদেশ বর্ষণ করিতাম। শয়ন করিতে যাইতেছি, কি শয়ন করিয়াছি, কোনও বিশেষ কথা মনে পড়িল। তখনই আলো জ্বালিয়া ভাইস চেয়ারম্যানের কাছে পত্র লিখিলাম। পদাতিক, কি কনষ্টেবল একজন ছুটিয়া গিয়া, তাঁহাকে নিদ্রা হইতে তুলিয়া পত্রের উত্তর আনিল। এ জন্য শান্তিপুরের লোকেরা বলিত যে, আমি ঘুমাইলেও শান্তিপুর স্বপ্নে দেখি। তাহা বড় অত্যুক্তি নহে।

প্রথম দিন মিটিংএ গঙ্গার চরস্থ বাটী হইতে পাল্কীতে যাইতেছি। গঙ্গা যাইতে এই বাটীর পার্শ্ব দিয়া একটি মাত্র রাস্তা আছে, তাহাতেও বিষম কাদা। এই কাদা ভাঙ্গিয়া পুর-বাসিনীরা জল আনিতে যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে চতুরা একজন অবগুণ্ঠন হইতে আমাকে ডাকিয়া বলিল—"ওগো! আমাদের এই কষ্ট দেখিয়া যাও।" উপরোক্ত মিটিংএর শেষে আমি সেই কথা বলিলে রমণী তাঁহাদের যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন, কমিশনরগণ তাহা অনুমোদন করিলেন, এবং বলিলেন যে, এখানে ত বরং রাস্তা আছে, অন্যান্য স্থানের স্ত্রীলোকেরা শান্তিপুরের নীচে যে একটি খাল আছে, তাহার হাঁটুজল হাঁটিয়া পার হইয়া, স্নান-পানাদির জল আনিয়া থাকে। আমি তৎক্ষণাৎ ওভারসিয়ারকে ভর্ৎসনা করিয়া আদেশ দিলাম। সেই দিন ও রাত্রির মধ্যে উক্ত রাস্তাতে বালি ঢালিয়া দেওয়া হইল, এবং খালের উপর স্থানে স্থানে বাঁশের পুল নির্ম্মিত হইল। পরদিন প্রাতে শান্তিপুরের সীমন্তিনীরা ও তাঁহাদের সীমন্তমণিরা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। মিটিংএর সেই দৃঢ়তায় ও এই কার্য্যের দ্রুততায় শান্তিপুরে আমার বেশ একটুক প্রতিপত্তি হইল, এবং উহা আমার ভবিষ্যৎ কার্য্যে বড় সাহায্য করিল।

আমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম যে, আমি শান্তিপুরের কোনও দলে যোগ দিব না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করিব। তাহা হইলে শান্তিপুরের চিরপ্রসিদ্ধ দলাদলি ভাঙ্গিবে। আমি উভয় দলের সহিত সমান ভাবে ব্যবহার করিতাম। মিটিংএর কোনও প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া, তাহার ভাল-মন্দ বুঝাইয়া দিয়া, আমি চুপ করিয়া থাকিতাম। আমার নিজের মত কিছুই প্রকাশ করিতাম না। অধিকাংশের সিদ্ধান্ত দ্বিরুক্তি না করিয়া গ্রহণ করিতাম। মিটিংএর পর আমি আমার আফিসকক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র দুই দলের লোক একে একে আমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। উভয় পক্ষ বলিতেন—"আমরা আপনার পক্ষে। আপনি শান্তিপুরে যেরূপ ভাল কার্য্য করিতেছেন, এমন কেহ করেন নাই। আপনার যাহা নিজের মত, আমরা বুঝিতে পারি না। আপনি যদি আগে একটুক আমাদিগকে জানান, তবে অন্য পক্ষের কি সাধ্য যে, তাহা অগ্রাহ্য করায়। তাহাদের অপেক্ষা আমাদের ভোট বেশী।" আমি উভয় পক্ষকে বলিতাম—"আমি জানি, আপনারা সকলেই যোগ্য লোক, এবং আমার পক্ষে আছেন। তবে শান্তিপুরে আপনাদের বাসস্থান। আপনারা যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করিবেন, আমার তাহাতে মতামত কি? আমি বসন্তের কোকিল, দু দিন পরে উড়িয়া যাইব। আপনারাই আপনাদের কর্ম্মের ফলভোগী হইবেন।" এরূপে কোনও দল আমাকে হস্তগত করিবার সুবিধা পাইলেন না। দেখিতে দেখিতে দল ভাঙ্গিয়া গেল।

একমাত্র অন্তরায় রহিলেন সেই উকিল মহাশয়। তিনি ও যদুবাবুর পুত্র কুমার এক দিন ঘটনাক্রমে ট্রেনে এক কক্ষে যাইতেছিলেন। তিনি আমার অজস্র নিন্দা করিতেছেন শুনিয়া কুমার ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল—"তুমি কে, যে একজন সমস্ত বঙ্গের পূজনীয় ব্যক্তির এরূপ অযথা নিন্দা করিতেছ? নবীনবাবু এখানে থাকিলে তুমি লেজ গুটাইয়া, দাঁত বাহির করিয়া বসিয়া থাকিতে।" তিনিও ক্ষেপিয়া বলিলেন—"তুমি কে? মুখ সামলাইয়া কথা বলিও।" তিনিও বলবান্ পুরুষ। কুমার তখন আস্তিন গুটাইয়া, তাহার বীরদেহ প্রসারিত করিয়া বলিল—"আয়! বেটা আয়! এখনই এক লাথিতে তোকে গাড়ীর জানালা দিয়া পৃথিবী দর্শন করাই। পড়িবি ত নবীনবাবুর এলাকায়!" উকিল মহাশয় কুমার ভায়ার কৈলাসপর্ব্বতবৎ কিল ও উত্থিত গন্ধমাদনবৎ শ্রীচরণ দেখিয়া, নীরব হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তথাপি ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন— উকিল কিল খাইতে দড়। কিন্তু লাথি সম্বন্ধে তাহা বলেন নাই। যাহা হউক, ইহার পর তিনি একবার কি ঘটনা উপলক্ষ্যে রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে চেয়ারম্যান করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার ও বার্ণার্ড সাহেবের পত্রগুলি তাঁহাকে দেখাইলাম। তখন তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। তাহার পর আমি যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছি ও কি কি কার্য্য আমি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সকলই তাঁহাকে বুঝাইলাম। তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমি বড়ই ভ্রান্ত হইয়াছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনার কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছে না। আমি এত দিনে বুঝিলাম যে, শান্তিপুরের ভাগ্য এমন কার্য্যকুশল ও হিতৈষী ব্যক্তির হস্তে পূর্ব্বে আর ন্যস্ত হয় নাই। আমার আশা হইয়াছে যে, শান্তি-পুরের বড় শুভ দিন উপস্থিত। আপনি যে সকল কার্য্য প্রস্তাব করিতেছেন, তাহা যদি করিয়া যাইতে পারেন, তবে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবেন। এখন হইতে আমি আপনার পৃষ্ঠপোষক ও গুণানুরাগী হইব।" বাস্তবিক তাহাই হইলেন। শান্তিপুর এই রূপে শান্তিপুরে পরিণত হইলে, মাজিষ্ট্রেট কমিশনর আমাকে খুব বাহবা দিলেন। এখন সমস্ত কমিশনর একপ্রাণে আমার সকল কার্য্যের অনুমোদন ও সাহায্য করিতে লাগিলেন। আমি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরস্থ রাস্তাটি (Strand road) অংশতঃ নির্ম্মাণ ও সমস্ত পাকা করিলাম। পূর্ব্বে খানিকটা কদর্য্য কাঁচা রাস্তা মাত্র ছিল। হস্পিটালটি একটি জঘন্য জীর্ণ ভাড়াটে গৃহে ছিল। গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর স্থানে একটি সুন্দর অট্টালিকা তাহার জন্য নির্ম্মাণ

করিলাম। হাই স্কুলটির আয়তন বৃদ্ধি করিলাম, এবং গঙ্গা সরিয়া যাওয়াতে যে জলকষ্ট দেখা দিতেছিল, তাহা নিবারণ করিবার জন্য স্থানে স্থানে নূতন 'ইন্দারা' খনন করাইলাম, এবং পুরাতন 'ইন্দরা' সকল সংস্কৃত করিয়া জল উঠাইবার সুবন্দোবস্ত করিলাম।

মধ্যে একবার নূতন 'নির্ব্বাচন' বা 'ইলেকশন' হইয়াছিল। দলাদলির কর্ত্তাগিরি করিয়া যাঁহারা আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এই শান্তির দিনে তাঁহাদের আসন টলিল। উকিল মহাশয়ের আসনও চঞ্চল হইল। তিনি ও দু এক জন সম্মানভাজন ব্যক্তি আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি এই ইলেকশন্-কম্পে তাঁহাদের আসন রক্ষা করিয়া দিলাম। একজন কমিশনরকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার বিপক্ষ দল এক জীবন্ত জালজীবীকে তাঁহার প্রতি-যোগী দন্ডায়মান করিয়া দিয়াছিল। সেই 'ওয়ার্ডে' জালজীবীর সংখ্যা এত অধিক যে তাহার নির্ব্বাচন সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শান্তিপুরে একটা রগড়ের তুফান ছুটিয়াছে। পথে ঘাটে এই গল্প ও ইহার প্রহসন। কমিশনরগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। আমি গেলে আমাকে তাঁহাদের এই অপমানকাহিনী নানা ছন্দে বিনাইয়া বলিলেন—"পূর্ব্বপুরুষের সম্মান বিসর্জ্জন দিয়া 'ওস্তাগর' (দর্জ্জির) সঙ্গে কমিটিতে বসিতেছি। এখন জীবন্ত জেলের সঙ্গে কেমন করিয়া বসি? আপনিই বা তাহার সঙ্গে কেমন করিয়া বসিবেন, এবং আপনার শিষ্টাচারমতে একটি জেলেকে কেমন করিয়া 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিবেন?" আমি বলিলাম—"আমার ডেপুটিগিরি 'হুজমি গুলি'! যখন বিদেশীয় ধোপা-নাপিতের বংশধরগণকে সেলাম করিতে পারিতেছি,তখন আপনার দেশীয় একটি জেলেকে 'আপনি' বলিতে আমার দম আটকাইবে না।" দেখিলাম, ভদ্রলোকদের বড়ই সঙ্কট উপস্থিত। কমিশনরিটা ছাড়িতেও ইচ্ছা নাই, অথচ জালজীবীর সাহচর্য্যই বা কিরূপে করেন? তাঁহারা আমাকে বড়ই অনুনয় করিয়া বলিলেন এই বিপদে আমি বিপদ্‌ভঞ্জন না হইলে তাঁহাদের সম্মান রক্ষার উপায় নাই। পরদিন 'নোটিস' ইত্যাদি উল্টাইয়া দেখিলাম যে, কোনওরূপ দোষ ধরিয়া তাহার নির্ব্বাচন রহিত করিবার পথ নাই। বিপক্ষদল তাহার জাল এরূপ কৌশলে ফেলিয়াছেন যে তাহাতে চুণাপুটিরও এড়াইবার জো নাই। তখন নিজে অশ্বারোহণে সেই অঞ্চলে পরিদর্শনে গিয়া, জেলেপাড়ার সম্মুখের বাসা দেখিতে দেখিতে তাহাকে ডাকাইলাম। দেখিলাম, সত্যই জীবন্ত পরাশর-প্রণয়িনীর বংশধর! সে আমাকে গলবস্ত্র হইয়া নমস্কার করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাপু! তুমি না কি মিউনিসিপ্যাল কমিশনর হইবার দরখাস্ত করিয়াছ?" সে করযোড়ে বলিল—"কর্ত্তা! মুই উমি লোক, জেলে মানুষ। মোর কি কমিশনি সাজে? তবে বাবুরা ধরিয়া বাঁধিয়া মোরে বলে, তুই কমিশনি হ। মোর কি এই কাজ?" আমি বলিলাম—"তাহা ত নহেই। তুমি 'কমিশনি' করিলে তোমার যে ব্যবসা বন্ধ করিতে হইবে। তাহা পারিবে ত?" সে হাঁ করিয়া বলিল—"হুজুর! তাহা হইলে মুই খাইব কি? মোর ছেলেপুলে ত সব মারা যাইবে। কর্ত্তা! মুই এ কাজ পারিব না। মোরে ছাড়িয়া দেও। দোহাই তোমার।" আমি বলিলাম—"তুমি বড় বুদ্ধিমান্ লোক। তুমি কেন এই উৎপাতে পড়িবে? তুমি আমার সঙ্গে আইস।" আমি ধীরে ধীরে ঘোড়া চালাইয়া, তাহার সঙ্গে তাহার ব্যবসা সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ করিতে করিতে তাহাকে মিউনিসিপ্যাল আফিসে আনিলাম, এবং তাহার কমিশনর হইবার ইচ্ছা নাই বলিয়া এক দরখাস্ত আদায় করিয়া, তাহার 'নমিনেশন' বা নামকরণ রহিত করিলাম এবং তাহার খুব প্রশংসা করিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। কমিশনরগণ এই সংবাদ শুনিয়া দলে দলে আসিলেন, এবং আনন্দের হাসিতে মিউনিসিপ্যাল আফিস পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

২। উলা

'উলোর পাগল' এবং 'গুপ্তিপাড়ার বানর'—বঙ্গদেশের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ। শৈশবে পিতার বৈঠকখানা পুজার পূর্ব্বে উলো গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইত। 'উলোর পাগল' ও

'গুপ্তিপাড়ার বানর' সম্বন্ধে কত হাস্যকর উপাখ্যান শুনিতাম ও তাহাদের মধ্যে কত রসিকতার লড়াই শুনিয়া হাসিতাম। তাহাদের কেহ কেহ আমাকে বড় আদর করিত। আমিও তাহাদের বড় ভালবাসিতাম। প্রত্যেক বৎসর পূজার পূর্ব্বে তাহাদের প্রতীক্ষায় থাকিতাম। অতএব রাণাঘাটে আসিয়া উলা দেখিতে গেলাম। আজ সেই উলার কি অবস্থা! মনে করিয়াছিলাম, কোথায় একটা পাগলাগারদ দেখিব ; দেখিলাম একটি মহাশ্মশান! উলার আর এক নাম বীরনগর। মিউনিসিপ্যালিটির নাম বোধ হয়, উক্ত প্রবাদ স্মরণ করিয়া স্থানবাসীরা 'বীরনগর মিউনিসিপ্যালিটি' রাখিয়াছে। বীরনগর—এই নামের সার্থকতা কি, তাহা জানি না। উলাবাসীরা বলিলেন যে, একটি রমণী ডাকাতের হস্তে বড় বীরত্ব দেখাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল বলিয়া উহার নাম বীরনগর হইয়াছে। কিন্তু এখন সেই বীরনগরের মহাবীর 'ম্যালেরিয়া'। সেই উলা ম্যালেরিয়ার রণভূমি। উলার জনসংখ্যা এক সময়ে ৩০,০০০ সহস্রেরও অধিক ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আজ উলার জনসংখ্যা ৩,৫০০ মাত্র। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও শিবালয় জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত উলা আজ একটি মহাবন। বনের অন্তরালে এখানে সেখানে খণ্ড খণ্ড বসতির স্থান। মিউনিসিপ্যালিটি না থাকিলে রাস্তাগুলিও বনদেবী গ্রাস করিতেন। উহাদের তাঁহার গ্রাস হইতে রক্ষা করাই একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য। রাস্তার জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য বজেটে ৩০০ৎ কি ৪০০ৎ টাকা ধরা হইয়াছে দেখিয়া কমিশনর ওয়েস্টমেকট (Westmacott) আমার উপর খড়্গহস্ত হইলেন। কৈফিয়তের উপর তীব্র কৈফিয়ত আমার এই অপব্যয় সম্বন্ধে তলব করিয়া, শেষে স্বয়ং উলায় 'উড়িলেন'। এরূপ অপব্যয়ের জন্য আমাকে আবার তিরস্কার করিলে, আমি তাঁহাকে অশ্বারোহণে উলা দেখাইতে লইলাম। দেখিতে দেখিতে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। ফিরিয়া, মিউনিসিপ্যাল আফিসে বসিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণকে বলিলেন—"আপনাদের কাছে আমি দোষ স্বীকার (apologise) করিতেছি। আমি জানিতাম, উলা বাঙ্গলার একটি খ্যাতনামা স্থান। ইহার যে এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমি এখন স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিলাম, একটা কুলির সৈন্য রাখিলেও ইহার জঙ্গল হইতে রাস্তাঘাট রক্ষা করা অসাধ্য।"

কেবল বনদেবীর কৃপা নহে। উলায় সম্পূর্ণরূপে পানীয় জলাভাব। উলাবাসীরা প্রকাণ্ড তামার কলসীতে গাড়ী করিয়া চারি পাঁচ মাইল ব্যবধান চূর্ণী হইতে জল লইয়া পান করেন। এরূপ ব্যয় কেবল অর্থবান্ লোকেই নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অধিকাংশ লোক উলার বিষাক্ত জল পান করেন। কোনও ভদ্রলোক উলায় গেলে উলাবাসীরা তাঁহাকে ডাবের জল খাইতে দিয়া থাকেন। আমাকেও তাহা খাইতে দিতেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা ম্যালেরিয়ার ভয়ে কখনও উলাতে রাত্রিবাস করিতেন না। আহার করিয়া, উলায় গিয়া, মিটিংএর পর রাণাঘাটে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু আমি উলায় মধ্যে মধ্যে থাকিতাম। শিষ্টাচার সম্বন্ধে উলা শান্তিপুরের বিপরীত। শান্তিপুরের অশিষ্টাচার প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যার পর জামাতা আসিলেও শাশুড়ী তাহাকে স্থানান্তরে যাইতে উপদেশ দেন বলিয়া জনশ্রুতি। উলার কমিশনরগণ ভদ্রতার আদর্শ। তাঁহারা আমায় এরূপ যত্ন করিতেন যে, উলায় গেলে আমি যেন কোন আত্মীয়ের বাড়ী গিয়াছি মনে করিতাম। তাঁহাদের বাড়ী বাড়ী হইতে আমার জন্য নানারূপ আহার্য্য আসিত, এবং তাঁহারা পরম আত্মীয়ের মত আমাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া, আব্দার করিয়া, আমার বাড়ীর এই জিনিসটা খাইতে হইবে বলিয়া জিদ করিয়া আহার করাইতেন। ইহাঁদের মধ্যে 'ভাইস চেয়ারম্যান' বাবু বারাণসী বসুর আদর আমি ভুলিতে পারি নাই। তিনি এমনি সুপুরুষ, তাঁহার মূর্ত্তিখানি এমনি স্নেহ ও শিষ্টাচারমণ্ডিত যে, তাঁহাকে দেখিলেই আমার প্রাণে একটা আনন্দ উপস্থিত হইত। আমি তাঁহাকে বড় শ্রদ্ধা করিতাম। মিউনিসিপ্যাল আফিস একখানি কুঁড়িয়া ঘর। গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বলিয়া

ভ্রম হয়। কমিশনরগণ এই কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য একটি অট্টালিকার জন্য ইট কাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন, কিন্তু ওয়েষ্টমেকট তাহার নির্ম্মাণব্যয় অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বড় সঙ্কটে পড়িয়াছেন। ওয়েষ্টমেকট বলেন, যেখানে অর্থাভাবে মিউনিসিপ্যালিটির উপযোগী কোনও কার্য্য হইতে পারে না—এমন কি, পানীয় জলের পর্য্যন্ত অভাব, সেখানে একটা অট্টালিকা প্রস্তুত করা অর্থের গুরুতর অপব্যয় মাত্র। কথাটাও অমূলক নহে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহার প্রতিবাদ করিতে আর সাহস করেন নাই। সেই ইট কাঠ পড়িয়া রহিয়াছে। ওয়েষ্টমেকট তাহা বিক্রয় করিতে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। কিন্তু যে উলাতে এত পুরাতন অট্টালিকা পড়িয়া আছে, যাহার ইট কাঠ বিনামূল্যে পাওয়া যায়, সেখানে উচিত মূল্যে এ সকল কে কিনিবে। কমিশনরগণ আমাকে তাঁহাদের এই কলঙ্ক-ভঞ্জন ব্রতে ব্রতী হইতে বিশেষ অনুনয় করিলেন। কিন্তু জলকষ্ট নিবারণ আমার মতে প্রধান আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। তাহার কোনও উপায় আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা নানারূপ মত প্রকাশ করিলেন, কিন্তু একটাও একবাক্যে অনুমোদন করিলেন না। মিউনিসিপ্যাল আফিসের অনতিদূরে একটি খুব বড় পুষ্করিণী রাস্তার পার্শ্বে উলায় প্রবেশস্থানে আমি দেখিয়াছিলাম। উহা একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘিকা বলিলেও চলে। তাহাতে নরনারী অবগাহন করেন, এবং বহু লোক তাহার জলও পান করেন। সংস্কারপূর্ব্বক আমি উহা 'রিজার্ভ' করিতে প্রস্তাব করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, উহা অসম্ভব। উহা উলার জমিদার বাবুদের পুষ্করিণী, এবং উহার ১৩ জন অংশীদার। তাঁহারা উহা কোনও মতে 'রিজার্ভ' করিতে দিবেন না। আমি একদিন গোপনে বারাণসীবাবুকে বলিলাম যে, আমি উহা 'রিজার্ভ' করিয়া, তাহার উত্তর পাড়ে নূতন মিউনিসিপ্যাল আফিস নির্ম্মাণ করিব। শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, আমি যদি এই প্রস্তাব কার্য্যে পরণত করিতে পারি, তবে উলাতে আমার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে। তিনিও একজন জমিদার, এবং উলাতে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি। উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলাম যে, আইনমতে মূল্য দিয়া উহা গ্রহণ করিতে হইলে ১০,০০০৲ টাকা আবশ্যক। উলার মোট আয় ন্যূনাধিক ৩,০০০৲ টাকা মাত্র। তিনি বলিলেন যে, চেষ্টা করিলে অধিকাংশ অংশীদারদের তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত করাইতে পারিবেন, কিন্তু তিন চারি জন—যাঁহাদের অংশ বেশী, কখনও সম্মত হইবেন না। যাহা হউক, ক্ষুদ্র অংশীদারগণকে গোপনে সম্মত করাইবার ভার আমি তাঁহার হস্তে দিলাম। বহু পরিশ্রমে তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। বলা বাহুল্য যে, ইহাঁদিগকে আমারও অনেক 'হিতোপদেশ' পড়াইতে হইয়াছিল। কিন্তু প্রধান দুই জন উহা পড়িবার পাত্রই নহেন। ইহাঁদের অবস্থা খুব ভাল এবং দুই জনেই উলার প্রধান জমিদার। এমন কি, বারাণসীবাবু ইহাঁদের কাছে এ কথা উত্থাপিত করিতেও সাহস করেন না। তিনি বলেন, এই কাতল মাছ দুটা জাল ভেদ করিয়া ছুটিলে, যাহাদের জালে ফেলিয়াছি, তাহারাও ছুটিবে। সাধু যাহার সঙ্কল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়। এমন সময়ে ঈশ্বর আমাদের সহায় হইলেন। এই সময়ে দ্বিতীয় জমিদার মহাশয় এক ফৌজদারি মোকদ্দমায় পড়িলেন। তিনি একজন চতুরচূড়ামণি। কিন্তু আমরা 'ধর্ম্মাবতার'গণ ঊর্ণনাভ। দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আমাদের জাল। উহাতে অর্থী, প্রত্যর্থী, কি সাক্ষিভাবে শিকার একবার পড়িলে, আমরা তাহাকে এরূপ জালে জড়িত করিতে পারি যে, তাহাকে 'ত্রাহি মাং মধুসূদন' বলিয়া ডাকিতে হয়। স্মরণ হয়, ইনি সাক্ষিস্বরূপে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চারি দিকে আমি এরূপ ঘনঘটা সৃষ্টি করিলাম যে, তিনি ভাবিলেন —বজ্রটা তাঁহারই মস্তকে পড়িবে। এই সময়ে আমার ইঙ্গিতমতে বারাণসীবাবু তাঁহার সমক্ষে বঁড়শি ফেলিলেন, এবং তিনি উহা গিলিলেন। তখন বারাণসীবাবু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে একেবারে রাণাঘাটে উপস্থিত হইলেন, এবং জমিদার মহাশয় আপনি তাঁহার অংশ মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করিতে স্বীকার করিয়া, আমাকে প্রস্তাবিত কার্য্যটি করিতে বিশেষ

অনুরোধ করিলেন। আমি তখনই তাঁহার কাছ হইতে একখানি দান-পত্র লিখাইয়া লইলাম। তাহার পর অন্যান্য অংশীদারগণ হইতেও সেইরূপ পত্র স্বাক্ষরিত করিয়া লইলাম। এই চতুরচূড়ামণি জালে পড়িয়াছেন দেখিয়া, তাঁহারা আর দ্বিরুক্তি করিলেন না।

রাণাঘাটে এ কার্য্য সমাধা করিয়া এবং চতুরচূড়ামণিকে এখন যজ্ঞেশ্বর করিয়া আমি উলায় উপস্থিত হইলাম। প্রথম দুই একটি স্ত্রীলোক অংশীদার সম্বন্ধে যাহা কিছু গোল-যোগ ছিল, তাহা মিটাইয়া, আমি সন্ধ্যার সময়ে প্রধান জমিদার মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি 'নবীন তপস্বিনী'র জীবন্ত জলধর। সেই মূর্ত্তি, সেই রূপ, সেই গুণ, সেই চাতুর্য্য, সেই

"মালতী, মালতী, মালতী, ফুল,
মজালে, মজালে, মজালে, কুল।"

হইতে 'যমেরই ভুল' পর্য্যন্ত সকলই যেন দেদীপ্যমান। বুদ্ধি, ভাষাও সেই ধরণের। কোনও কথার সরল সহজ উত্তর দেওয়া তাঁহার অভ্যাস নাই। আমি জানিতাম যে, তাঁহার কাছে যদি প্রথমেই গিয়া বলি যে, অন্যান্য অংশীদারেরা পুষ্করিণীটি মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করিয়াছেন, কেবল তাঁহার অংশ তিনি দান করিলেই হয়, তিনি প্রাণান্তেও সম্মত হইবার পাত্র নহেন। কারণ, তাহা হইলে এই সৎকার্য্যের জন্য বাহাবা, তিনি থাকিতে ক্ষুদ্র অংশীদারগণ পাইবেন। তাহা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। অতএব এই তর্কটি নেপোলিয়ানের 'লাইফ গার্ড' সৈন্যের মত আমার শেষাস্ত্র করিতে হইবে। আমি উলায় প্রথম গিয়া ইহাঁর ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের বাড়ীতে একবার শিষ্টাচার রক্ষার জন্য মাত্র গিয়াছিলাম। আর যাই নাই। তাঁহার রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। প্রথম উভয় পক্ষে শিষ্টাচারের শ্রাদ্ধ শেষ হইলে, আমি প্রথমতঃ তাঁহার উচ্চ বংশের, তাঁহাদের কীর্ত্তির ও বঙ্গদেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার, তাহার পর তাঁহার নিজের রূপের, গুণের প্রতিপত্তির ও দানশীলতার কবিত্বপূর্ণ গৌরচন্দ্রিকা গাইয়া, শেষ প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলাম। তিনি প্রথম চমকিয়া উঠিলেন, পরে আত্ম-সংবরণ করিয়া উহার খুব প্রশংসা করিলেন। উলার জলকষ্ট নিবারণের জন্য এই চেষ্টার ও আমার অন্যান্য কার্য্যের জন্য খুব ধন্যবাদ দিলেন। পরে আপত্তি আরম্ভ করিলেন। পুষ্করিণীর জল ভাল নহে, উহা নগরের এক প্রান্তে, সংস্কারে মিউনিসিপ্যালিটির সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় হইবে, 'রিজার্ভ' করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে, করিলেও লোকের স্নানের অসহনীয় কষ্ট হইবে,— ইত্যাদি কত প্রকারের আপত্তিই উত্থাপিত করিলেন। একে একে সকল আপত্তি খণ্ডন করিলে, তিনি বারাণসীবাবুর দোহাই দিতে লাগিলেন। আমি স্থানীয় লোক নহি, এই সকল আপত্তির গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছি না, বারাণসীবাবু সব জানেন। বারাণসীবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমার ষোল আনা পৃষ্ঠপোষকতা করিলে জমিদার মহাশয় মনে করিবেন যে, তিনিই আমাকে এই কার্য্যে লাগাইয়া দিয়াছেন। তাহা হইলে জমিদার মহাশয় আমার প্রস্তাবে কোনও মতে সম্মত হইবেন না। তাহা ছাড়া তাঁহার প্রকোপে পড়িয়া বারাণসীবাবুর উলায় থাকা কঠিন হইয়া পড়িবে। অতএব তিনিও এক এক বার জমিদার মহাশয়ের বিজ্ঞতাপূর্ণ কথায় সায় দিতেছিলেন, এবং বলিতেছিলেন যে, তিনি নিজেও এ সকল কথা আমাকে বুঝাইয়াছেন, কিন্তু উলার জলকষ্ট নিবারণের অন্য উপায় নাই বলিয়া আমি এই কার্জটিতে উলার মঙ্গলার্থ কৃতসংকল্প হইয়াছি। জমিদার মহাশয়ের এই সকল আপত্তি খণ্ডিত হইলে, তিনি সর্ব্বশেষ বলিলেন যে, এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পুষ্করিণীটি মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির অপলাপ করা হইবে। সন্ধ্যা হইতে এরূপে 'নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ' করিতে করিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল। সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল। আমি তখন বুঝিলাম, আর 'বিশেষণে সবিশেষ কহি'য়া, কার্য্যোদ্ধার হইবে না। তখন আমি উঠিয়া, আমার দীর্ঘ দেহ আরও দীর্ঘ করিয়া, 'ঘোরারাবী

মহারৌদ্রীরূপে বলিলাম—"আচ্ছা, বেশ! আপনি তবে উলাবাসীদিগকে কেমন করিয়া ম্যালেরিয়াদুষ্ট বিষাক্ত জল পান করাইয়া আপনার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি রক্ষা করেন, তাহা আমি দেখিব। আপনি কালই সপ্তাহমধ্যে পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া, উহা পানোপযোগী করিতে নোটিশ পাইবেন।" তিনি একটুক বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিলেন, পুষ্করিণীর তিনি একা মালিক নহেন। সকল অংশীদারগণের উপরই নোটিশ দিতে হইবে। আমি তখন আরও ক্রোধ-কর্কশকণ্ঠে বলিলাম যে, অন্য অংশীদারগণের ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না। তাঁহারা সকলেই সহৃদয় লোক। তাঁহারা কথাটি মাত্র না কহিয়া এই হিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহাদের অংশ পূর্ব্বেই দান করিয়াছেন। আমার সোলার হ্যাট মস্তকে স্থাপন করিয়া আমি ক্রোধাবেগে চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—"কি! সকল অংশীদারগণ তাঁহাদের অংশ পূর্ব্বেই দান করিয়াছেন!" তিনি তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি! সত্য সত্যই আপনাদের অংশ আপনারা দান করিয়াছেন?" তাঁহারা সকলেই একে একে অনুকূল উত্তর দিলে, তিনি বলিলেন—"বটে! তোমরা সকলে উদারতা দেখাইয়া, কেবল আমাকে এইরূপে ইঁহার বিরাগভাজন করিলে!" তিনি উঠিয়া আসিয়া আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—"আপনি আমার প্রতি রাগ করিবেন না। আমি ইহাঁদেরই জন্য এত ক্ষণ এত তর্ক করিতেছিলাম। অন্যথা এরূপ একটি দেশহিতকর কার্য্যে আমার কোনও আপত্তি নাই। আমিও আমার অংশ মিউনিসিপ্যালিটিকে দান করিলাম।" তখন তাঁহার বৈঠকখানায় একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। সেখানে উলার বহু ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া নীরবে এই অভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। আমি সোলার হ্যাট ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, আনন্দে তাঁহার সহিত কোলাকুলি করিলাম. এবং তখনই একখানি দানপত্র চেয়ারম্যানের নামে লিখাইয়া লইয়া, তাঁহার এবং তাহার পরে অন্যান্য অংশীদারগণের আবার নূতন করাইয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইলাম। এরূপে পালা শেষ হইলে আমি দাঁড়াইয়া আনন্দে অধীর হইয়া সকলকে বলিলাম—"আপনারা একবার হরি হরি বলুন!" তখন আবার উভয় পক্ষের মধ্যে এক পালা শিষ্টাচারের বিনিময় হইল। তাঁহারা আমার এবং আমি তাঁহাদের খুব গুণানুবাদ করিলাম। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী উভয় পক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তখন রাত্রি অনুমান ১টা। আমি বিদায় চাহিলে সেই জমিদার মহাশয় বলিলেন,—"আমি জানিতাম, 'পলাশির যুদ্ধে'র কবি একজন বিচক্ষণ লোক। কিন্তু তিনি যে এরূপ চতুর, তাহা জানিতাম না। এখন বলিতে কি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এরূপ দানে কখনও সম্মত হইব না। বঙ্গদেশে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, যে আমাকে সম্মত করাইতে পারিত।" গৃহের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলে বারাণসীবাবু গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—"আজ আপনি উলার কি উপকারই করিয়া গেলেন! আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে মাথায় তুলিয়া রাখি। আপনি আজ কি অসাধারণ ক্ষমতাই দেখাইয়াছেন!" পরদিন প্রাতেই 'মিটিং' ডাকিয়া সেই দানপত্র গ্রহণ করিলাম, এবং পুষ্করিণী সংস্কারের ও তাহার তীরে মিউনিসিপ্যাল আফিস নির্ম্মাণের জন্য টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলাম। প্রাতেই উভয় কার্য্যের এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। গৃহের জন্য বেশী টাকা চাহিলে পাছে ওয়েষ্টমেকট গোলযোগ করেন, এই জন্য তাহার এষ্টিমেট যত দূর সম্ভব, কম ধরিয়াছিলাম। বারাণসীবাবু বলিয়াছিলেন যে, পুষ্করিণীর কার্য্য কণ্ট্রাক্টর দ্বারা না করাইয়া তিনি নিজে করাইলে, তাহা হইতে কিছু টাকা বাঁচাইয়া গৃহকার্য্যে দিতে পারিবেন। আমি কর্ত্তাদের কাছে লিখিলাম যে, পুষ্করিণীটির মূল্য অনূন ১০,০০০৲ টাকা হইবে। উহার সংস্কারের দ্বারা প্রায় অর্দ্ধ উলাবাসীর জলকষ্ট নিবারিত হইবে, এবং যখন পুরাতন ইট কাঠ বিক্রয় হইতেছে না, উহা তখন এইরূপে নষ্ট হইতে না দিয়া, তাহার তীরে আফিস নির্ম্মাণ করিলে পুষ্করিণীটি সহজে 'রিজার্ভ' করা যাইতে পারিবে। আফিসের চৌকিদার পুষ্করিণীরও রক্ষক হইতে পারিবে। এবার আর

ওয়েষ্টমেকট কোনও আপত্তি করিলেন না। বরং তিনি ও মাজিষ্ট্রেট আমাকে খুব লম্বা-চৌড়া ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। বিদ্যুৎবেগে কার্য্য চলিল, এবং দেখিতে দেখিতে পুষ্করিণীর সংস্কৃতি, এবং তাহার উত্তর পাড়ে একটি সুন্দর আফিস অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। এক গুলিতে দুই পাখী মারা পড়িল। উলার আংশিক জলাভাব নিবারিত হইল, এবং কমিশনরদের বহুদিনের বাঞ্ছিত আফিস অট্টালিকাও নির্ম্মিত হইল। অট্টালিকা প্রতিষ্ঠার সময়ে বারাণসীবাবু আমার পত্নী পুত্রকেও নিমন্ত্রণ করিয়া লইলেন। বর্ষাকালে স্থানটির রমণীয় শোভা হইয়া থাকে। একটি বিস্তৃত সরোবর, তাহার তীরে সুন্দর অট্টালিকা, চারি দিকে সুন্দর পুরাতন বৃক্ষপূর্ণ ও নূতন রোপিত পুষ্পোদ্যান। অদূরে গঙ্গার পূর্ব্বখাতের নিদর্শনস্বরূপ একটি বৃহৎ বিল। বর্ষায় উহা একটি বিস্তৃত ঝিলের (Lake) শোভা ধারণ করে। মুকুন্দরামের সময়ে ভাগীরথী উলার পার্শ্বে প্রবাহিতা ছিলেন এবং প্রবাদ—তাঁহার শ্রীমন্ত উলায় চণ্ডী-পূজা করিয়াছিলেন।

"উলা বাহিয়া যায় কাছিমার কাছে।
মহেশপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥"

৩। চাকদহ

চাকদহবাসীরা গম্ভীরভাবে বলেন—"তাঁহাদের গ্রামের নাম 'চক্রদহ'। গঙ্গা সরিয়া গিয়া চক্রাকারে এক দহ রাখিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম 'চক্রদহ' ওরফে 'চাকদহ' ইহাই চাকদহ নামের পুরাণ বা উপপুরাণ। গঙ্গার দহ ছিল কি না, তাহা মা গঙ্গাই জানেন। এখন চাকদহ তাঁহার সতিনী মা কালীর ম্যালেরিয়াদহ। ম্যালেরিয়াতে এ অঞ্চলও ধ্বংসপ্রায়। ধ্বংসাবশেষ গ্রামগুলির রক্ষার জন্য 'চক্রদহে'র নিকটবর্ত্তী গ্রামচক্র একত্র করিয়া, গ্রামবাসী ভদ্রমণ্ডলী বহু চেষ্টা করিয়া, একটা চক্র-মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবতারা এরূপে তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইঁহারা দেবতাদের পাল্টা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন 'তিলবিমা।' ম্যালেরিয়ার প্রতাপে এ সকল গ্রামের উত্তমাংশ যমালয়ে না দেশদেশান্তরে উড়িয়া গিয়াছে। চাকদহ উভয় ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের ও ম্যালেরিয়ার ষ্টেশন। ম্যালেরিয়া অধিকাংশ চাকদহবাসীকে তাহার ট্রেনে পুরিয়া যমনগরে লইয়া গিয়াছে। যাহা বাকি ছিল, তাহাও প্রায় ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে কলিকাতা ও অন্যান্য নগরে লইয়া গিয়াছে। যাহারা অন্যত্র যাইতে অক্ষম, তাহারা কোনও মতে ম্যালেরিয়ার সহিত একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া ভদ্রাসনে মৃতবৎ পড়িয়া আছে। চক্রদহ এখন মহাবনে ও ব্যাঘ্রদেহে পরিণত হইয়াছে। ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীনাথবাবু বলিতেন, তাঁহাদের মিউনিসিপ্যালিটির পোষা একটা 'ঘড়ঘড়ে বাঘ' আছে। মিউনিসিপ্যাল রাস্তায় রাত্রিযোগে মধ্যে মধ্যে তাহার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি এরূপ দরিদ্র যে, 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' হইতে কিছু মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স আদায় করা যাইতে পারে কি না, চেষ্টা করিতে আমি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলাম। 'বীরনগরে' না থাকিলেও ম্যালেরিয়ার এই রণক্ষেত্রে একটি প্রকৃত বীর তখন ছিল। তিনি একজন স্থানীয় ডাক্তার। তিনি একজন প্রকৃত ম্যালেরিয়াজয়ী মহাবীর। এই জীবিত শবরাশির মধ্যে তাঁহার বীর অবয়ব, দৃঢ় স্বাস্থ্য, অশ্রান্ত স্ফূর্ত্তি, উদ্যম ও উৎসাহ দেখিলে আমার মনে আনন্দ হইত। গোঁড়পাড়া পূর্ব্বে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল। এখন তাহা মহাবন। একদিন ডাক্তারবাবু কাণ্ডারী হইয়া অশ্বারোহণে আমাকে এই ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান দেখাইতে লইয়া গেলেন। একটি একটি বন পার হইয়া মরুভূমির মধ্যে বৃক্ষপল্লবছায়াসম্পন্ন সরোবরের মত এক একটি বসতিস্থান দেখিলাম। তাহাতে কয়েক ঘর কৃষকের বসতি মাত্র। এই মহাবনটির এক সিংহ জমিদার। তাহা না হইলে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে কেন? তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি গ্রামটির অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। 'সিংহীর বাড়ী', 'সিংহির পুকুর', 'সিংহির জঙ্গল' ইত্যাদি এখনও

বনাভ্যন্তরে ধ্বংসপ্রায় হইয়া আছে। বর্ত্তমান সিংহি মহাশয় মহাপুরুষ। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এখন 'পেন্‌সন'রূপ পরলোক প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতার কোনও উপলোক শোভিত করিতেছেন। শুনিলাম, তিনি জমিদারির হিসাবপত্র দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে চাকদহ রেলওয়ে ষ্টেশনের 'ওয়েটিং রুম' পর্য্যন্ত পদার্পণ করেন। ম্যালেরিয়ার ভয়ে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিপূর্ণ গ্রামে কখনও যান না। এক স্থানে হাইকোর্টের একজন উকিলের একটি সুন্দর চকমিলান বাড়ী দেখিলাম। প্রাচীরের চূণ এখনও মলিন হয় নাই। আমি আগ্রহসহকারে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলাম। ডাক্তারবাবু নিষেধ করিয়া বলিলেন, উঠানে এরূপ বন যে, সেখানে হাইকোর্টের উকিল মহাশয়ের স্থান এখন ব্যাঘ্র মহাশয় গ্রহণ করিয়া, মক্কেল অন্বেষণে আছেন। উকিল মহাশয় দশ বৎসর যাবৎ ম্যালেরিয়ার ভয়ে একবার পৈতৃক বাসস্থান দেখিতেও আসেন নাই। এরূপ স্থানে আমার এরূপ একটি বাড়ী থাকিলে, আমি প্রত্যেক শনিবার কলিকাতার কোলাহল ও পূতিগন্ধপূর্ণ ইষ্টক-কাষ্ঠের সৃষ্টি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, এখানে আসিয়া প্রাণ জুড়াইতাম। যেখানে যাইতেছিলাম, লোকেরা বলিতেছিল—"কর্ত্তা! কি দেখিতে আসিয়াছেন? বিধাতা আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, ম্যালেরিয়াতে দেশ উৎসন্ন হইয়াছে।" আমি বলিলাম—"কেবল বিধাতা নহে, কলিকাতাও তোমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। যাহাকে বিধাতা ছাড়িয়াছেন, তাহাকে কলিকাতা টানিয়াছেন।" হায়! আমরা এত দূর মনুষ্যত্বে পতিত হইয়াছি, এবং আমাদের জাতীয় জীবনে এরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে যে, আমরা আমাদের দেশের এই সর্ব্বনাশ চক্ষের উপর দেখিয়াও দেখিতেছি না। পূর্ব্বে কাহারও অবস্থা ভাল হইলে, সে কিসে পাঁচ জন আশ্রিত নিরন্নকে অন্ন দিবে, কিসে গ্রামে পুষ্করিণী খনন ও পথ ঘাট নির্ম্মাণ করিবে, তাহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য হইত। এখন কাহারও হাতে দু পয়সা সংস্থান হইলে, সে কিরূপে কলিকাতায়, কি কোনও নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া, কপি সালগম খাইবে ও বরফ সেবন করিবে, তাহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য হয়। এ কারণে এক দিকে শুধু কলিকাতার নহে, সর্ব্বত্র নগরের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। অন্য দিকে প্রাচীন প্রতিষ্ঠাপন্ন গ্রামসকল ম্যালেরিয়ার রঙ্গভূমি হইয়া মহাবনে পরিণত হইতেছে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকেরা স্থানান্তরে চলিয়া গেলে গ্রাম রক্ষাকরিবে কে? কাজেই তাহাদের স্থান ম্যালেরিয়া গ্রহণ করিতেছে।

রাণাঘাট হইতে একদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় গিয়াছি। তিনিও একজন ডেপুটিসিংহ। তিনি কলিকাতায় একটি গোয়ালটুলিরূপ নরকে বাস করিতেছেন। উহা একটি উত্তর-গোগৃহ-বিশেষ। তিনি গৃহে ছিলেন না। তাঁহার সিংহিনীর সাধ, তিনি কলিকাতায় বাড়ী করিবেন। ডেপুটির পৈতৃক বাসস্থান বড় দূর নহে, বারাকপুরের নিকট। তিনি একজন দরিদ্রের সন্তান, মাতুলালয়ে পালিত। সিংহিনীর কলিকাতাবাসের আকাঙ্ক্ষা কেন হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"গ্রামে বড় কষ্ট। একে ত ম্যালেরিয়া, তাহাতে ভাল ডাক্তার কবিরাজ পাওয়া যায় না, ভাল খাবারও পাওয়া যায় না।" আমি বলিলাম, বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া কলিকাতায় বাড়ী ক্রয় করা অপেক্ষা, এই সকল উপদ্রব ও অভাব হইতে উদ্ধার পাইবার আমি বড় সহজ উপায় বলিয়া দিতে পারি। তিনি বড় আগ্রহের সহিত উহা কি জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, কলসি ও দড়ী। গলায় কলসি বাঁধিয়া, তাঁহারা দুটি গঙ্গায় আত্মসমর্পণ করিলে ম্যালেরিয়ার ভয়ও থাকিবে না, ডাক্তার কবিরাজ ও খাদ্যের ভাবনাও ভাবিতে হইবে না। ঠাকুরাণীটি আমার এরূপ সৃষ্টিছাড়া 'গ্রাম্যতা' দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। আমি তখন বুঝাইয়া বলিলাম—"কলিকাতায় বাড়ী করা, আর গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। উভয়ের পরিণাম বিলোপ। যে কলিকাতায় গবর্ণর জেনেরেলকে কেহ চেনে না, সে কলিকাতায় তোমার স্বামী 'চৌকিদারী কাজে পটু

মফস্বলে যিনি ডেপুটির আসিয়া থাকা, আর গলায় দড়ী দিয়া মরা, একই কথা। অন্য দিকে তোমরা গ্রামে থাকিবে বলিয়া যদি বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, তুমি কলিকাতার বাড়ীর মূল্যে গ্রামে বিস্তৃত উদ্যান-সরোবর-সম্বলিত একটি রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে, এবং সেই সরোবরের স্বচ্ছ নির্ম্মল সলিলের দ্বারা ও অবশিষ্ট অর্থে গ্রামখানির অন্য অভাব দূর করিয়া, তুমি যে উহাকে কেবল ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে, তাহা নহে ; উহাকে একটি ক্ষুদ্র স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবে। কলিকাতার মাসিক ব্যয়ে তুমি কত নিরন্ন আত্মীয় স্বজন ও গ্রামবাসীকে অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া পূজিতা হইবে। তোমরা প্রত্যেক বার গ্রামে যাইবার পূর্ব্বে তোমাদের প্রত্যাশায় কত লোক পথ চাহিয়া থাকিবে, এবং যখন যাইবে ও যত দিন থাকিবে, গ্রামে একটা দুর্গোৎসব হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এত ধর্ম্ম, এত পুণ্য, এত প্রতিষ্ঠা, এত সুখ ছাড়িয়া, কলিকাতার গোয়ালটুলিতে অধিষ্ঠিতা হইয়া, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের কপি সালগম ও বরফ খাওয়াই কি মোক্ষ?" এ সময়ে তাঁহার ডেপুটি মহাশয় কলিকাতার অন্যান্য 'গোগৃহে' জীর্ণ গৃহান্বেষণের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আমার এই উগ্র উপদেশ শুনিলেন, এবং আমাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"ভাই! তোর পায়ের ধূলা দে। আমি ইহাঁর তাড়নায় আজ কয়েক দিন কলিকাতার গলি ঘুঁজি ঘুরিয়া ঘুরিয়া আধমরা হইয়াছি। পনর ষোল হাজার টাকাতেও কোথায় একটা জীর্ণ গৃহ পাইলাম না। তুমি যদি ইহাঁর কলিকাতা-রোগটা ছাড়াইতে পার, তবে প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিবে।" কিন্তু এ রোগ ম্যালেরিয়া হইতেও মারাত্মক। আমার চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। কিছু দিন পরে দেখিলাম, উভয় পার্শ্বে শত পায়খানা-শ্রেণী-সজ্জিত এক গলিতে তিনি এক দৌলতখানা ১৪,০০০ চৌদ্দ হাজার টাকাতে ক্রয় করিয়া, তাহার সংস্কারে আরও অর্থব্যয় করিতেছেন! আর আমি তাঁহার বন্ধু আজ পেন্‌সন লইয়া, বঙ্গদেশের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে একটি পল্লীগ্রামের শান্তিছায়ায় একটি মৃন্ময় কুটীরে বসিয়া এই 'ম্যালেরিয়া-মাহাত্ম্য' ও 'কলিকাতা-কলঙ্ক' রচনা করিতেছি!

কলিকাতার চারি দিকের পল্লীগ্রামে হাহাকার উঠিয়াছে—ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন হইল। হইবে না কেন? এক দিকে রেলওয়ে জলনির্গমের পথ বন্ধ করিয়া যমালয়ের পথ সুগম করিয়া দিতেছে। তাহার উপর এই 'কলিকাতা-রোগ'। গ্রাম লোকশূন্য, স্থান জঙ্গলময়, জলাশয় শুষ্ক বা পঙ্কিল। অতএব ম্যালেরিয়ার অপরাধ কি? শুধু তাহাই নহে। যাহাদের ম্যালেরিয়া ভুলিয়াছে বা কলিকাতা-রোগ যাহাদের অবস্থার অতীত, তাহাদেরই বা অবস্থা কি? কাঁচড়াপাড়ার অনতিদূরে জাগুলি ও সুবর্ণপুর রাণাঘাটের এলাকায় দুটি স্বনামপ্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু ভদ্রলোকের বাস। শিবিরে পৌঁছিয়া আমি গ্রাম দেখিতে গেলাম। একটি মাত্র জলাশয়। তাহা পানায় পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে পাড়ের নিকটে কলসিমাত্র ভুবিতে পারে, এই মত ছিদ্র দেখা যাইতেছে, এবং উহাতে কলসি ডুবাইয়া গ্রামবাসিনীরা জল লইয়া যাইতেছে। আবার সে জলের মাহাত্ম্যই বা কি? চারি পাড়ে জঙ্গল, এবং উহা গ্রামের সাধারণ পায়খানা। বর্ষার সময়ে এই জঙ্গল ও পাড় ধৌত হইয়া পুষ্করিণীর জল কলুষিত করে। আর এই জলই গ্রামবাসীরা পান করে। ম্যালেরিয়ার অপরাধ কি? আমাকে দেখিয়া গ্রামের ভদ্রলোক ও কৃষক পালে পালে আসিল। সকলে জলাশয়টি দেখাইয়া বলিল—"আমাদের জলকষ্ট একবার চক্ষে দেখিয়া লউন! এ জলাশয়টি লোকাল বোর্ডের টাকায় পরিষ্কার করাইয়া দিলে এই দুটি গ্রামের লোক জল খাইয়া বাঁচিবে।" আমি কৃষকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—"তোমরা যদি এক বেলা সকলে মিলিয়া এই পুষ্করিণীটি পরিষ্কার কর, তাহা হইলে ত আর তোমাদের জলকষ্ট থাকে না।" উত্তর—"কর্ত্তা! আমরা উমি লোক। আমরা কি এ কার্য্য করিতে পারি?" আমি বলিলাম—"ইহার জন্য ত নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য আবশ্যক করে না। পুষ্করিণী পরিষ্কার করিতে ত ন্যায়শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।" তাহারা চুপ করিয়া রহিল। সাধারণের

হিতের জন্য, তাহাদের আপনার ও আপনার পরিবারের জীবনের জন্য তাহারা এক বেলা যে বিনা পয়সায় খাটিবে, এই গুরুতর স্বার্থত্যাগ তাহাদের দ্বারা হইবার নহে। দেশের অধঃপতন ঘটিয়াছে। কিছু দূর গেলে একটি সুন্দর চকমিলান বাড়ী দেখিলাম। সেখান হইতে একটি ভদ্রলোক অকস্মাৎ বাহির হইয়া আমাকে নমস্কার করিলে সঙ্গীরা বলিলেন, তিনি গৃহস্বামী। আমার বোধ হইল, তিনি আকাশ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটা মহাজঙ্গল। তাহার মধ্য দিয়া একটি সরু পথ। তিনি এই পথ দিয়া নির্গত হইতে আমি তাঁহাকে দেখিতেই পাই নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি কি আকাশ দিয়া আসিলেন? আপনার বাড়ীর সম্মুখে ত এই জঙ্গল। এ বাড়ী আমার হইলে আমি এখনই দা হস্তে এই বন কাটিয়া খাণ্ডবদাহন করিতাম।" তাহার কৈফিয়ৎও ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া তাঁহাদের এই দুরবস্থা ঘটাইয়াছে। জঙ্গল একবার কাটিলে উহা ম্যালেরিয়ার দোষে আবার গজায়। আমার বোধ হয়, ইহার পর এই সকল স্থানে ভূমিকম্প হইলে, কি কোনও কুলরমণী কুলত্যাগ করিলেও ইহাঁরা ম্যালেরিয়ার দোষ দিবেন। আমি বলিলাম—"ম্যালেরিয়া আপনাদের নামে 'ডিফামেশনে'র নালিশ করিতে পারে। সে কি বলিতে পারে না, 'দেখুন মহাশয়,! ইহাঁরা আমার জন্য সকল আয়োজন করিয়া এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া, আমার এরূপ বাপান্ত করিতেছেন।' আপনাদের গ্রামের জলাশয়ের—এমন কি, নিজের বাড়ীর পর্য্যন্ত এই অবস্থা। অতএব ম্যালেরিয়ার অপরাধ কি?" আমার বিশ্বাস যে, এই ম্যালেরিয়া ও কলিকাতা-রোগে আর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার পঞ্চাশ মাইল মধ্যবর্ত্তী গ্রামসকল সুন্দরবনে পরিণত করিবে। কেবল শান্তিপুরবাসীরা মাত্র মাথা স্থির করিয়া আছে। তদ্ভিন্ন রাণাঘাট অঞ্চলের সমস্ত প্রাচীন গণ্ডগ্রাম এই উভয় রোগে প্রায় জনহীন অরণ্য হইয়া উঠিয়াছে। চাকদহ মিউনিসিপ্যালিটি কতকগুলির কঙ্কালসমষ্টি মাত্র। ইহার আয় অতি অল্প। কিছুই নাই; আছে কেবল কয়েকটি রাস্তা, এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চাতে একটি মিউনিসিপ্যাল আফিস-অট্টালিকা। ইহার চারি দিকে কতকগুলি দুর্গন্ধ জল ও জঙ্গলপূর্ণ গর্ত্ত ছিল। সেগুলি ভরাইবার জন্য 'পরিদর্শক প্রভুরা' আদেশের পর আদেশ দিতেছেন। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটি তাহা ভরাইবার টাকা কোথায় পাইবে? আমি সেগুলিকে একত্র করিয়া, একটি 'বিনা সুতার হার' গাঁথিয়া, উহাদের একটি ক্ষুদ্র 'ঝিলে' (lakc) পরিণত করিলাম, এবং একটি জীর্ণ কুঁড়িয়া হইতে ডিস্পেনসারিটি সরাইয়া, মিউনিসিপ্যাল আফিসের এক কক্ষে আনিলাম। তাহার অপর পার্শ্বের কক্ষ আমার বাসোপযোগী করিয়া লইলাম। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা এই ম্যালেরিয়াভীতিপূর্ণ স্থানে কদাচ রাত্রিবাস করিতেন না। কিন্তু আমি সময়ে সময়ে তাহা করিয়া যথাসাধ্য স্থানটির উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলাম। তবে অর্থাভাবে দুই বৎসর সময়ে বেশী কিছু করিতে পারি নাই।

রাণাঘাটের মেলা

১। শান্তিপুরের রাস

ভারতচন্দ্রের প্রেমিকা বিদ্যা তাঁহার প্রেমিক সুন্দরকে বলিয়াছেন—

"নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥"

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার সময়ে এই এই ভক্তির কার্য্য করিয়া, কার্ত্তিক মাসে—

"ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশের রাস॥"

কালে কত কীর্ত্তি লুপ্ত হয়। বোধ হয়, শান্তিপুরের এহেন রসের 'খেঁড়ু'ও লুপ্ত হইয়াছে। কই, খেঁড়ুর নামমাত্রও শুনি নাই। শুনিয়াছি, তাহা আমার আগমনের পূর্ব্বে

মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ সময়ে সময়ে গাইতেন। 'চোর পুকুর' সংস্কারের সময়ে তাহা বিশেষরূপে গীত হইয়াছিল। উহা পুষ্করিণীটির নামের উপযোগী গীত। কিন্তু আমার অদৃষ্ট ভাল। আমাকে তাহা শুনিতে হয় নাই। শান্তিপুরের খেঁড়ু শুনি নাই, শান্তিপুরের রাস দেখিয়াছি। উহা বঙ্গদেশ-বিখ্যাত। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে শান্তিপুর-সীমন্তিনীদের অন্তঃপুর-কপাট ও হৃদয়-কপাট, উভয়ই রাসের সময় খুলিয়া যাইত; তাঁহারা পালে পালে রাসদর্শনোপলক্ষ্যে নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাসপৌর্ণমাসীর শিশিরম্লান কৌমুদীকে তাঁহাদের উচ্ছ্বসিত রূপজ্যোৎস্নায় ও হাসির ঝলকে সমুজ্জ্বল করিতেন, এবং 'রসে'র ছড়াছড়ি হইত। 'খেঁড়ু'র সঙ্গে বোধ হয়, সে 'রস'ও লুপ্ত হইয়াছে, কিম্বা তাহা অনুভব করিবার আমার অবসর ও সুযোগ ঘটে নাই। যাহা হউক, 'এ দেশের রাস' এখনও আছে এবং উহা লক্ষ্য করিয়া যদি বিদ্যারূপসী বঙ্গদেশের রাসের এরূপ গুণানুবাদ করিয়া থাকেন, তবে তাহা নিতান্ত অত্যুক্তি হয় নাই। সচরাচর রাসের অর্থ—কৃষ্ণ একক, কিম্বা তাঁহার প্রেমবিহ্বলা রাধা সহ কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান, আর জোড়া জোড়া গোপীগণ হাতাহাতি করিয়া, তাঁহদের বেড়িয়া, এক কাষ্ঠ-চক্রে ঘুরিতেছেন। কল্পনার চশমায় দেখিলে বলিতে হয়, নাচিতেছেন। কোনও ব্রাহ্ম প্রচারক তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, উহা বর্ত্তমান ব্রজভূমি ইউরোপের 'বল' বলিয়া গম্ভীর ভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্মের এরূপ নিগূঢ় অর্থ না বুঝিলে মানুষ ব্রাহ্মই বা হইবে কেন, এবং তাহা প্রচার না করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের সার্থকতাই বা কি? তবে গীতার এক স্থানে পড়িয়াছি স্মরণ হয়,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

কিন্তু প্রচারক মহাশয় হয় ত বলিবেন, এই 'যন্ত্রই' ব্রাহ্মধর্ম্ম। ঈশ্বর চশমাযোগে মুদ্রিত নয়নদৃষ্ট হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, জাত ও অজাত-শ্মশ্রু বালক ও প্রচারকদের এই যন্ত্রে ঘুরাইয়া বেড়ান।

যাহা হউক, শান্তিপুরে এরূপ রাস হয় না। কেবল এক বাড়ীতে হইয়া থাকে, তাহাকে তাই 'চাকফেরা' গোস্বামীর বাড়ী বলে। অন্যান্য স্থানে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি সজ্জিত খাটে স্থায়ী দেবালয়ে বহু সমারোহে পূজিত হইয়া থাকেন, এবং তৃতীয় দিবস নানাবিধ পৌরাণিক ও নৌতিনিক পুতুলের শ্রেণী সহ নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়া থাকেন। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত নগরটি আনন্দে মাতিয়া উঠে। গোস্বামীদের বাড়ীতে বহু শিষ্যের সমাগম হইয়া থাকে, এবং দুই রাত্রি খুব নৃত্যগীত হইয়া থাকে। তৃতীয় দিবস ঐ নগর-পরিভ্রমণ বা 'ভাঙ্গা রাস' দেখিতে বহু দূর হইতে লক্ষ দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে, এবং এ সময়ে ওলাদেবীর যে রাস হয়, তাহা সমস্ত বঙ্গদেশ ছড়াইয়া পড়ে। অতএব বহু দর্শক 'এ দেশের রাসের' রস ভোগ করিয়া, যমালয়ের রসভোগ করিতে যাত্রা করেন। শুনিলাম, যাত্রিগণ শান্তিপুরের খালের কলুষিত জল পান করে, এবং পথ ঘাট সমস্ত কলুষিত ও নগর দুর্গন্ধে পূর্ণ করিয়া শান্তিপুরে বহুদিন যাবৎ সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করিয়া যাইয়া থাকে। শুনিলাম, ওলাদেবী আয়ানরূপে গ্রহণ করিয়া এরূপে রাধাকৃষ্ণের ও তাঁহার সেবকগণের প্রত্যেক বৎসর রসভঙ্গ করিয়া থাকেন। যাহাতে তাঁহার শুভাগমন না হইতে পারে, শারদীয় পূজার পর হইতে আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলাম। শৌচকার্য্যের জন্য, নগর পরিষ্কারের জন্য এবং রোগীদের শুশ্রূষার জন্য যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিলাম, এবং খালের জল স্পর্শ পর্য্যন্ত যাহাতে যাত্রীরা করিতে না পায়, পুলিসের পাহারা নিয়োজিত করিলাম। আদেশ প্রচার করিলাম যে, যাত্রিগণ গঙ্গায় ভিন্ন অবগাহন, এবং গঙ্গার জল ভিন্ন পান করিতে পারিবে না। সপ্তাহকাল ঘোরতর পরিশ্রমের ফলে প্রথমতঃ এই হইল যে, যাত্রিগণ যেখানে সেখানে শৌচকার্য্য করিতে ও খালের জল পান করিতে ও তাহাতে অবগাহন করিতে না পারিয়া, আমাকে অভিধানবহির্ভূত ভাষায় আপ্যায়িত করিতে লাগিল। রাসের তিন দিন,

বিশেষতঃ ভাঙ্গা রাসের দিন আমি প্রায় সমস্ত দিন অশ্বপৃষ্ঠে কাটাইয়াছিলাম। শুনিলাম, পূর্ব্বে পূর্ব্বে বৎসর অপরাহ্ন হইতে যথারুচি এক এক বাড়ীর রাসের 'মিসিল' বাহির হইত, এবং উহা চলিয়া গেলে, তাহার বহুক্ষণ পরে অন্য বাড়ীর 'মিসিল' বাহির হইত। এ কারণে কোনওরূপ পুলিসের বন্দোবস্ত অসম্ভব হইত। কোন্ বাড়ীর রাসের পর কোন্ বাড়ীর রাস বাহির হইবে, তাহার এক চিরপ্রচলিত পদ্ধতি আছে। উহার ব্যতিক্রম হইলে ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া থাকে। কারণ, এই প্রচলিত প্রথানুসারে প্রথম বাড়ীর রাস বাহির হইবার পূর্ব্বে যদি দ্বিতীয় বাড়ীর রাস বাহির হয়, তবে প্রথম বাড়ীর গোস্বামী উহা তাঁহার ঘোরতর অপমান মনে করেন। অথচ অনেক সময়ে দ্বিতীয় বাড়ীর, কি তাহার পরের বাড়ীর গোস্বামীকে ক্লেশ দিবার জন্য প্রথম বাড়ীর রাস বহু বিলম্বে বাহির করা হয়। আমি এ সম্বন্ধেও নূতন ব্যবস্থা করিলাম। প্রত্যেক বাড়ীর রাস কোন্ সময়ে বাহির করিতে হইবে, তাহার সময় নিরূপণ করিয়া দিলাম এবং এ আদেশ পালন করাইবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে পুলিস নিয়োজিত করিলাম। 'প্রসেশন রোডে'র পার্শ্বে এক স্থানে আমার শিবির স্থাপন করিলাম। কলিকাতা হইতে আমার কোনও কোনও বন্ধু সপরিবারে রাস দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা এই শিবিরে ছিলেন। সমস্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনর, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও শান্তিপুরের প্রধান ভদ্রলোকদিগকে লইয়া আমি শিবিরের সম্মুখে এক দরবারে যথাসময়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, 'বার' দিয়া বীরসিংহ রায়ের মত বসিলাম। প্রথমতঃ বড় গোস্বামীর বাড়ীর রাস এই পর্য্যন্ত আসিলে আমি উঠিয়া গিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলাম, এবং যাহাতে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাঁহাদের 'সঙ' বা পুতুলসজ্জা দেখিতে পান, তজ্জন্য একটুক অপেক্ষা করিতে অনুনয় করিয়া বলিলাম। তাঁহারা জানিতেন না যে, উহা আমার একটা কৌশল। আমার বিনয়ে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি কোন্ পুতুলের নিগূঢ় অর্থ কি, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এবং তাঁহাদের শিল্পের ও কল্পনার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আনন্দে অধীর হইয়া সকলেরই আরও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। কোথায় পৌরাণিক ইন্দ্রের সভা, রাবণের সীতাহরণ, লব কুশের রামায়ণ গীত ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং কোথায় বর্ত্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক বিভ্রাটের প্রহসন। আমি তাহাদের কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতেছি। এ দিকে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বাড়ীর রাস যথানিয়মে আসিয়া, যখন আমার আদেশমতে সুদীর্ঘ শৃঙ্খলে গ্রথিত হইয়াছে বলিয়া পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার আমার কর্ণে বলিলেন, তখন আমি ইহাঁদিগকে খুব আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিলাম। এখন শৃঙ্খলে গাঁথা মিসিলসকল ক্রমে ক্রমে আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল এবং প্রত্যেককে আমি একটুক থামাইয়া, প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলাম। পূর্ব্ববৎসর পুলিসকে নানা স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। এই মিসিলের শৃঙ্খলের সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের শৃঙ্খলও চলিতে লাগিল। একাদিক্রমে এই দীর্ঘ রাসের শ্রেণী দেখিতে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য হইল। এখন সকলেই আমার কৌশল ও উহার সার্থকতা বুঝিলেন, এবং একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। শেষ রাস আমার শিবির পার হইয়া গেলে, আমি আবার অশ্বপৃষ্ঠে কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হইয়াছে কি না, এবং ইহার পর কোনও বিশৃঙ্খলা হইতেছে কি না, তাহা দেখিবার জন্য জ্যোৎস্নালোকে বহির্গত হইলাম। এখন যাত্রী ও দর্শকদলে আমার জয়জয়কার ধ্বনি উঠিয়াছে। আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানে লোক উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে যে, শান্তিপুরে রাসের এমন সুবন্দোবস্ত কখনও হয় নাই, এবং এমন সুখে কখনও শান্তিপুরে রাস কেহ দেখে নাই। ওলাউঠা, কি কোনও রোগ দেখা মাত্র দেয় নাই, এবং সমস্ত নগর রাসের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ পরিষ্কার। নগরবাসিগণ ইহার জন্য সর্ব্বত্র আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাইতে লাগিলেন। অর্দ্ধরাত্রিতে যখন চন্দ্র শিবিরের মস্তকোপরে শর্ব্বরীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, আমি ধীরে ধীরে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় জ্যোৎস্না-প্রোদ্ভাসিত সৈকতের উদ্যান-

বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার একটি ব্যারিষ্টার বন্ধুর মিসেস, মিস্ ও বাবাগণ রাস দেখিতে আসিয়াছিল। রাস কি, তাহা বুঝা দূরে থাকুক—হায়! কপাল! তাহারা বাঙ্গালা পর্যন্ত জানে না, ছেলেমেয়েগুলি এই দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে। আমি অশ্ব হইতে নামিবামাত্র আমার গলা জড়াইয়া কত কথাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একজন সর্ব্বশেষ জিজ্ঞাসা করিল—"আঙ্কল! (কাকা) এই যে এত লোক আসিয়াছে, ইহারা সকলে কি তোমার হুকুমের অধীন?" আমি বলিলাম —"হাঁ।" সে তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"ওঃ মাই! তুমি আমার 'পাপা' হইতে অনেক বড়লোক।" সকলেই বড় হাসিলাম। সুন্দরের রসহীন কাঞ্চীপুরের বিস্ময়কর বিদ্যার দেশের রাস ফুরাইল। এরূপে শান্তিপুরের রাস দুই বৎসর আমার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কমিশনরগণ বলিয়াছিলেন, নিয়মিত ব্যয়ে আমি আমার প্রণালীমতে রাস নির্ব্বাহিত করিতে পারিব না। তাহা করিয়া, বরং মিউনিসিপ্যাল রাস্তার পার্শ্বে যে দোকান বসিয়াছিল এবং যাহার ভাড়া পূর্ব্বে সংশিষ্ট ভূম্যাধিকারী কমিশনরগণ লইতেন, তাহা মিউনিসিপ্যালিটিকে দেওয়াইয়া আমি আরও কিছু আয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলাম।

শান্তিপুরে হইয়া থাকে 'কালার রাস', আর শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম ও লীলাভূমি নবদ্বীপে হইয়া থাকে 'কালীর রাস'। নবদ্বীপের জগাই-মাধাই-এর সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক পণ্ডিতমণ্ডলীর উৎপীড়নে মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে তাঁহার স্বদেশীয়েরা ক্রমে হত্যা করিয়াছিল। মানুষ হিংস্র ও অধম। এরূপ অন্ধকার খনিতে মণির আবির্ভাবই শ্রীভগবানের নীতি। পণ্ডিতপুঙ্গবেরা শচীর দুলালকে সন্ন্যাসী করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার প্রেমধর্ম্মের প্রতিবাদ করিবার জন্য দোলপূর্ণিমার বাসন্তী রাত্রিতে সাত আট হাত দীর্ঘ বিরাট্ কালী প্রস্তুত করিয়া পূজা করেন। ইহার নাম রাখিয়াছেন 'রাস-কালী'। আমাকে একজন নবদ্বীপবাসী শান্তিপুরের রাসের সময়ে নবদ্বীপের 'রাস' দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম যে, 'রাসকালী' বা 'রাসকেলিটি' (rascality) দেখিতে আমার প্রবৃত্তি নাই।

২। কুলিয়ার মেলা

কার্ত্তিক-পূর্ণিমাতে শান্তিপুরের রাস, এবং পৌষের কৃষ্ণা একাদশীতে কুলিয়ার মেলা। কখনও বা একদিন এক রাত্রি, আর কখনও বা তিথি দুই দিন পড়িলে এই মেলা দুই দিন দুই রাত্রি হইয়া থাকে। কুলিয়া মেলার স্থান কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনুমান দুই মাইল ব্যবধান হইবে। মেলায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার যাত্রীর সমারোহ হইয়া থাকে এবং সমস্ত দিন রাত্রি কলিকাতা ও কাঁচড়াপাড়ায় স্পেশাল ট্রেণ যাতায়াত করিতে থাকে। এই দুই মাইল পথও ঘোড়ার, কি গরুর গাড়ীতে যাইবার ব্যবস্থা ছিল না। আমি প্রথমতঃ এই পথটি সংস্কার করিয়া গাড়ীর উপযোগী করিলাম। মেলাস্থানটি ক্ষুদ্র বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন কানন। তাহার এক প্রান্তে চৈতন্যদেবের খ্যাতনামা ভক্ত 'গোপাল চাপলে'র সমাধি। তাহারই পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে গৌর-নিতাইয়ের দুইটি সুন্দর কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তি স্থাপিত। তাহারই নিকটে শুষ্ক যমুনার গর্ভে একটি ক্ষুদ্র বাঁওড়। পূর্ব্বপূর্ব্ববৎসর ত্রিশ চল্লিশ সহস্র যাত্রী ইহাতে তাঁহাদের তৈলাক্ত দেহ প্রক্ষালন করিতেন এবং তাহারই জল পান করিতেন, এবং মেলাস্থলে ও তাহার চারি পার্শ্বে শৌচকার্য্য করিতেন। মেলার অধিকারী গোস্বামীরা বিদেশবাসী। তাঁহারা কেবল মেলার দিনই যাত্রিগণ হইতে ট্যাক্স আদায় করিতে আসেন, এবং মেলার পরদিনই অদৃশ্য হন। সমস্ত বৎসর এই স্থানটির, কি ইহার বিগ্রহের সঙ্গে আর তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকে না। কাজেই মেলাস্থল পরিষ্কার রাখিবার কোনওরূপ বন্দোবস্ত হয় নাই। অতএব স্থানটি কি নরকে পরিণত হয়, তাহা সহজে

অনুমেয়। এ জন্য এই মেলাটিও ওলাউঠার একটা উর্ব্বর ক্ষেত্র। আমি গোস্বামী মহাশয়-দিগকে ফৌজদারি আফিস হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র দিয়া মেলার পূর্ব্বে রাণাঘাটে উপস্থিত করাইলাম, এবং বহু চেষ্টায় তাঁহাদের নিকট হইতে সামান্য অর্থ আদায় করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। বাঁওড়টি পানীয় জলের জন্য 'রিজার্ভ' করিলাম, এবং তাহার অদূরে অন্য একটি পুষ্করিণী স্নানের ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য নিয়োজিত করিলাম। তাহার পাড়ে দুটি স্থানে নর-নারীর স্নানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, এবং রমণীদের স্নানের স্থান ঘিরিয়া দিলাম। ঘাটে বহু কলসি রাখিয়া দিলাম, যেন জল তুলিয়া স্নান ও বাসন প্রক্ষালন কার্য্য পারের উপর করিতে কোনওরূপ ক্লেশ না হয়, এবং বাঁওড়ে ও এই পুষ্করিণীতে উপযুক্ত পুলিস প্রহরী রাখিলাম। মেলার উদ্যান একটি প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে স্থিত। উদ্যানটির চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিৎ দূরে নিশান পুতিয়া দিয়া, তাহার অভ্যন্তরে শৌচকার্য্য নিষেধ করিয়া দিলাম, এবং রোগীর চিকিৎসার জন্য দূরে—মাঠে একটি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া, ঔষধ সহ একজন ডাক্তার রাখিলাম।

মেলার দিনে প্রভাতের পূর্ব্বে হইতে ট্রেনের পর ট্রেনে ও নানা দিক্ হইতে যাত্রীর সমাগম আরম্ভ হইল। কাঁচড়াপাড়া হইতে পথসংস্কার করিয়া দেওয়াতে ঘোড়ারগাড়ী যাতায়াত করিতেছে। দেখিতে দেখিতে স্থানটি যাত্রীতে পূর্ণ হইল। অদূরে আমার শিবির। আমি প্রাতে শিবির হইতে ধীরে ধীরে ঘোড়ায় মেলাতে আমার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ চলিতেছে দেখিতে যাইতেছি। সম্মুখে এক দল রমণী যাত্রী স্নান করিয়া যাইতেছে। একটি বুড়ী আমার প্রতি পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিতেছে। তাহার অভিযোগ এই যে—"কোথা হইতে এক আঁটকুড়োর বেটা হাকিম আসিয়াছে। তাহার জন্য যে যেখানে ইচ্ছা, সেখানে শৌচকার্য্য করিতে পারিতেছে না, বাঁওড়ে স্নান করিতে পারিতেছে না। যে দিকে যায়, সে দিকে পুলিসে 'হুড়ো' দিতেছে।" আর এক সঙ্গিনী বলিলেন—"অন্যায় কি করিয়াছে? অন্যান্য বৎসর এমন সময়েই দুর্গন্ধে তিষ্ঠান যাইত না। বাঁওড়ের জলের উপর এক রাশি ময়লা ও তেল ভাসিত, এবং সেই ময়লা জল খাইতে হইত। আর এ বৎসর সমস্ত স্থানটি ও বাঁওড়টি কেমন পরিষ্কার! এ দিকে কেমন সুন্দর স্নানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে! অন্যান্য বৎসর এই পুকুরটা পর্য্যন্ত নরক হইয়া থাকিত।" আমি দেখিলাম, আমার সম্বন্ধে অভিযোগ ও সমর্থন, উভয়ই একসঙ্গেই হইল। আমি ধীরে ধীরে তাহাদের পার্শ্ব দিয়া ঘোড়া চালাইয়া যাইতেছি দেখিয়া বুড়ী বলিল—"এই সেই হাকিম না কি? কি সর্ব্বনাশ! ও আমার কথা শুনে নাই ত?" বুড়ী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল। আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলাম—"না বাছা! আমি কিছুই শুনি নাই।" আর অবগুণ্ঠনে স্ত্রীমণ্ডলী হাসিতে লাগিল। আমি তখন ঘোড়া ছুটাইয়া মেলাক্ষেত্রে আসিয়া নামিলাম। পদব্রজে ভিড়ের মধ্য দিয়া বাঁওড়ের তীরে উপস্থিত হইয়া দেখি, সেখানে এক দৃশ্য। এক প্রৌঢ়া প্রহরীদের সঙ্গে একটা গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহার জিদ, সে বাঁওড়ে স্নান করিবে প্রহরিরা তাহা দিবে না। সে কোমরে তাহার অঞ্চল জড়াইয়া, মহিষমর্দ্দিনী সাজিয়া, এক এক বার জলের দিকে ছুটিতেছে! "আঁটকুড়ির বেটারা! আমাকে কেমন স্নান করিতে দিবে না দেখি" —বলিয়া তাহাদের গায়ের উপর ছুটিয়া পড়িতেছে। আর তাহারা দুই হাত বিস্তার করিয়া, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া "দোহাই হাকিমের! দোহাই হাকিমের!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। তাহাদের উপর কড়া আদেশ আছে যে, তাহারা কোনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতে পারিবে না। মুখে নিষেধ করিবে মাত্র। "রেখে দে পোড়ারমুখোরা! তোদের হাকিম! আমি ঢের হাকিম দেখেছি!"—বলিয়া রমণী একবার কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া, আবার চৌকিদারদের উপর বাঘিনীর মত ছুটিয়া পড়িতেছে। আবার তাহারা নিরুপায় হইয়া "দোহাই ধর্ম্মাবতারের! দোহাই হাকিমের" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। শত শত নর-নারী জল লইতে আসিয়া,

দাঁড়াইয়া এই অভিনয় দেখিতেছে, এবং রমণীকে তিরস্কার করিতেছে। সে তাহাদের উপরও গালি বর্ষণ করিতেছে এবং বলিতেছে যে, সে প্রত্যেক বৎসর মেলাতে আসিয়া এই ঘাটে স্নান করিয়া থাকে, এ বারও করিবে। কোথাকার হাকিম এবং পোড়ারমুখো মিন্সেরা তাহাকে বারণ করে, সে দেখিবে। আমি জনতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতেছিলাম। দেখিলাম, মহিষমর্দ্দিনীর দ্বারা পুলিস প্রহরীরা মর্দ্দিত হইয়া হয়রান হইয়া পড়িল। সে বার বার তাহাদের আক্রমণ করিতেছে, এবং বার বার তাহারা আমার দোহাই মাত্র দিয়া তাহাকে বারণ করিতেছে। কিছু ক্ষণ এই তামাসা দেখিয়া, আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—"ধর! মাগীকে ধর!" প্রহরীরা আমাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"ওই হাকিম আসিয়াছে। মাগি! দাঁড়া!" যেই তাহারা তাহাকে ধরিতে গেল, সে লোকের পায়ের ভিতর দিয়া হামাগুড়ি দিয়া দৌড় মারিল। সমস্ত নর-নারী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং বলিল—"বাবা! এমন মেয়েমানুষ দেখি নাই। এতগুলি পুলিসকে মাগী এত ক্ষণ হেস্তনেস্ত ক'রে, এখন যেন বাঘ দেখে পালায়েছে।" প্রহরীরা তাহাকে ধরিতে ছুটিয়া যাইতেছিল, আমি নিষেধ করিলাম। আমি যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করিলাম, এই পুষ্করিণী কেবল পানের জন্য রাখাতে তাহাদের কি কোনও কষ্ট হইতেছে? তাহারা একবাক্যে বলিল—"কিছুই না। বরং বড় ভাল হইয়াছে। এমন সুবন্দোবস্ত কুলিয়াতে কখনও হয় নাই। অন্যান্য বৎসর এই প্রাতঃকালেই এই পুষ্করিণীর জল অপেয় হইত, এবং যাত্রীদের বড়ই কষ্ট হইত।" কেবল একজন তৈলাক্ত গোস্বামী ঠাকুর বলিলেন—"বাবা! ঘাটে স্নান করিতে না দেও, যদি কোণটায় আমাকে একটুক স্নান করিতে দেও।" আমি বলিলাম—চৈতন্য ভাগবতে—কই, গোস্বামীদের জন্য এরূপ স্বতন্ত্র কোনও ব্যবস্থা ত নাই।

আমার সকল বন্দোবস্ত কলের মত চলিতেছে দেখিয়া আমি মধ্যাহ্নে শিবিরে ফিরিলাম। অপরাহ্নে দেখিলাম, মেলাক্ষেত্রে শত শত চাদর ও সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া যাত্রিগণ হরিনাম করিতেছে। হরিনামের ধ্বনিতে স্থানটি পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে সৌখীন হরিভক্তের দলও আসিয়াছেন, এবং সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া তাহার সম্মুখে কলিকাতার দোকানদারদের মত 'সাইন বোর্ড' উড়াইয়াছেন। কোনটায় লেখা আছে,—'বউ-বাজারের হরিবোলার দল' কোনটায় 'বাগবাজারের হরিভক্তপ্রদায়িনী সভা' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহারা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাদের কীর্ত্তন শুনিতে অনুরোধ করিলেন। দু চার মিনিট দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের হরিভক্তির বা ইয়ার্কির অভিনয় দেখিয়া, জ্বালাতন হইয়া সন্ধ্যার সময় শিবিরে ফিরিলাম। শান্তিপুরের কীর্ত্তন শুনিতে চাহিলে আমাকে গোস্বামীরা বলিলেন, মাঘ কি কোন মাসে বঙ্গদেশের বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়ারা অদ্বৈত প্রভুর স্থাপিত বিগ্রহের সম্মুখে এক মাস কীর্ত্তন করিয়া থাকে, তাঁহারা সে সময়ে আমাকে কীর্ত্তন শুনাইবেন। আমাকে সংবাদ দিয়া মিউনিসিপ্যাল গোস্বামী যথাসময়ে কীর্ত্তনে আমার অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। শুনিলাম, তখন বঙ্গের সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'কীর্ত্তনীয়া'রা গান করিতেছিল। কিন্তু শুনিয়া আমার হৃদয় প্রেম ও ভক্তিতে আর্দ্র না হইয়া, বরং যৎকিঞ্চিৎ প্রেমভক্তি যাহা ছিল, তাহাও শুকাইয়া উঠিল। গায়কের শরীরের ধারে কাছেও ভক্তি নাই। সে কেবল তাহার ওস্তাদি বাহির করিতেছে। আমি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল থাকিয়া উঠিয়া আসিলাম। পোড়া বাঙ্গালা দেশে কিছু একটা ভাল জিনিস দেখা দিলে তাহা দেখিতে দেখিতে 'হুজুকে' পরিণত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের যে কীর্ত্তনে কেবল 'নদে শান্তিপুর' নহে, উৎকল পর্য্যন্ত প্রেমে ভাসিয়া গিয়াছিল, সেই কীর্ত্তন শেষে নেড়া-নেড়ীর কীর্ত্তনে পরিণত হইয়া প্রায় ৪০০ চারি শত বৎসর একরূপ লুপ্ত হইয়াছিল। আবার ইদানীং সেই কীর্ত্তনের পুনরায় বঙ্গদেশে উত্থিত হইয়া দেখিতে দেখিতে তাহা ইতিমধ্যেই একটা হুজুকে [illegible]ছে। অনেক স্থানে উহা বদমায়েসির আবরণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুলিয়ার

মেলায়ও তাহার অভাব ছিল না। অতএব বড় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে শিবিরে ফিরিয়াছিলাম।

তবে স্থানে স্থানে দরিদ্র যাত্রিগণের ভক্তিপ্রণোদিত কীর্ত্তন কাণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু পুলিসের উৎপাতে আমি উহা শুনিতে পারি নাই। আমাকে দেখিলেই পুলিস-পোষাকধারীরা যে 'সরে দাঁড়া! সরে দাঁড়া! হাকিম।' বলিয়া লোক ঠেলিতে আরম্ভ করিত, অমনি গায়কেরা ভয়ে কীর্ত্তন বন্ধ করিত। অতএব সন্ধ্যার পরে আমি সামান্য বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়া এবং আলোয়ানে মুখ ঢাকিয়া প্রচ্ছন্নবেশে মেলায় প্রবেশ করিলাম। আমার দুই উদ্দেশ্য,—এরূপে গুপ্তভাবে পুলিস নিয়োজিত কার্য্য করিতেছে কি না, তাহা দেখিব, এবং যেখানে ইচ্ছা, সেখানে দাঁড়াইয়া নির্ব্বিঘ্নে কীর্ত্তন শুনিব। মরি! মরি! মেলার এখন কি অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে। সমস্ত আম্রকাননটি শত শত দীপালোকে প্রদীপ্ত, ঘন ঘন হরিনামধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। ত্রিশ চল্লিশ সহস্র লোক—সকলেরই মুখে হরিনাম! এ বার কয়েক স্থানে গোপনে যাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিয়া, শেষে একজন গোস্বামীর সামিয়ানার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সেখানে যাত্রীর বড় ভিড়। আমি সেই ভিড়ে প্রবেশ করিয়া কি দৃশ্যই দেখিলাম! একজন দীর্ঘ স্থূল শ্যাম-কলেবর গোস্বামী একখানি ভাগবতসম্মুখে বসিয়াছেন। তাঁহার চারি দিকে চারি জন বৈরাগী হাঁটু পাতিয়া খোল বাজাইতেছে এবং মুখে কেবল 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া বোল আওড়াইতেছে। খোলেও যেন ঠিক হরে কৃষ্ণ বলিতেছে। গোস্বামী থাকিয়া থাকিয়া ভাবে মাথা নাড়িতেছেন। বাদ্য শেষ হইলে তিনি নামকীর্ত্তন ধরিলেন। নানারূপ পদ যোগ করিয়া কেবল 'শান্তিপুরের সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র' পদটি অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল গাইলেন। তিনি একবার নমস্কার করিতে-ছেন, একবার জানু পাতিয়া বসিতেছেন, একবার উন্মাদের মত উঠিয়া, দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া কি মধুর কণ্ঠে 'আহা! আহা!' করিতেছেন। সেই পৌষের দারুণ শীতে তাঁহার স্বেদধারা অশ্রুর সহিত কপোল বাহিয়া পড়িতেছে। সমবেত ভক্তগণ গড়াগড়ি দিতেছে, এবং চারি দিকে সহস্র দর্শকমণ্ডলী নীরবে এই পবিত্র দৃশ্য দেখিতেছে। এত দিন পরে আমি প্রকৃত কীর্ত্তন শুনিলাম, প্রকৃত কীর্ত্তনের দৃশ্য দেখিলাম। চৈতন্যদেব কিরূপ কীর্ত্তনে পাষাণ দ্রব করিতেন, তাহা বুঝিলাম। আমি আপনি আত্ম-হারা হইয়া এই কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে আমার মস্তক হইতে আলোয়ান পড়িয়া গিয়াছিল। এক হতভাগা কনষ্টেবল আমাকে চিনিয়া, ছুটিয়া আসিয়া, 'তফাৎ! তফাৎ।' করিয়া উঠিল, আর আমারও কীর্ত্তন শুনা ফুরাইল। শুনিলাম, ইনি একজন খড়দহের গোস্বামী, নিত্যানন্দ প্রভুর সন্তান। করিশুণ্ডেই গজমুক্তা ফলে। বুঝিলাম, প্রভুপাদ নিত্যানন্দের রক্তের মাহাত্ম্য এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। সমস্ত রাত্রি এই অর্দ্ধ লক্ষ লোকের হরি-নামের ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হইতেছিল। যাত্রিগণ সমস্ত দিন ও রাত্রি উপবাস করিয়া হরিনাম গাইয়া কাটাইল। ইহাকে কুলিয়ার 'হরিবাসর' বলে। এই ভক্তির উচ্ছ্বাসে মহা-পাপিষ্ঠেরও হৃদয় আর্দ্র হয়। ইহাই তীর্থদর্শনের ফল।

পরদিন প্রাতে মন্দিরের মালপো ভোগের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। গোস্বামীরা আপনার আপনার শিষ্যদের বলিদানের ছাগলের মত লইয়া গিয়া, মালপো ও পয়সা আদায় করিতে-ছেন। একটি গরিব শিষ্যকে মালপোর মালসা হস্তে দুই গোস্বামী টানাটানি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে এবং উভয়ে তাহাকে ও পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন দিতেছে, অর্থাৎ প্রহার করিতেছে। বহু যাত্রী হাহাকার করিতেছে ও ভর্ৎসনা করিতেছে। এরূপ গোস্বামীদের গো শব্দের অর্থ গরু। শিষ্যেরা নিতান্ত গরু না হইলে আর এরূপ নরপিশাচকে গোস্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবে কেন? অথচ ব্রাহ্মণদের ন্যায় এই গোস্বামীদেরও চরম অবনতি

ঘটিয়াছে। আমি দুই প্রভুকে দুই কনষ্টেবলের প্রেমালিঙ্গনে অর্পণ করিলাম, এবং বিচারার্থ আমার শিবিরে যথাসময়ে উপস্থিত করিতে আদেশ দিলাম। মেলাক্ষেত্রে এই খবর যেন তারশূন্য টেলিগ্রাফে প্রচারিত হইল। তখন পালে পালে গোস্বামীরা আসিয়া আমাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন ভক্তিভাজন লোক আমার ভর্ৎসনা শুনিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মের দুর্গতির কথা বলিতে বলিতে অশ্রুপাত করিলেন, এবং তাঁহাদের মুখ রক্ষার জন্য পাপিষ্ঠ দুটিকে ছাড়িয়া দিতে আমার দুই হাত জড়াইয়া ধরিলেন। আমি তখন তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু তাঁহাদিগকে মেলাক্ষেত্রের বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিলাম। মেলাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র আমার সুবন্দোবস্তের জন্য সকলে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন হইতে কুলিয়ার হরিবাসরের মেলা ভাঙ্গিতে লাগিল।

এই মেলায় আমি খ্যাতনামা কেশবচন্দ্র সেনের জননী দেবীর দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাঁহার দীর্ঘ তেজস্বিনী দেবীমূর্ত্তি দেখিয়াই বুঝিলাম যে, এমন মাতা না হইলে এমন পুত্র হয় না। এই মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে ভরিয়া গেল। আমি তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া বলিলাম—"মা! কেশববাবু আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, এবং কৃষ্ণবিহারী আমার সহপাঠী ছিলেন। আমি আপনার পুত্র। আপনি আমার শিবিরে চলুন।" সঙ্গে আমার স্ত্রী নাই। বিশেষতঃ তিনি মন্দিরের নিকট থাকিতে চাহেন বলিয়া, আমাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া, যাইতে অসম্মত হইলেন। শুনিলাম, তিনি বৎসর বৎসর আসিয়া মন্দিরের ছায়াতে 'হরিবাসর' কাটাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের নববিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের মাতা বৈষ্ণবদের পৌত্তলিক মেলায় আসিয়াছেন—অপূর্ব্ব সমাচার! কেশববাবু অজাতশ্মশ্রু যুবকদের পালে পালে 'নিরাকারিক' করিয়াছেন, আর তাঁহার আপনার বৃদ্ধা জননী 'সাকারিক বা পৌত্তলিক!' প্রতাপবাবুর রচিত কেশববাবুর জীবনীতে তাঁহার মাতার অঙ্কে মস্তক রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণের বর্ণনা পাঠে অশ্রুপাত করিয়া, সেইখানে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম —"মাতা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্কে শিশু ব্রাহ্মধর্ম্মের নির্ব্বাণ।" দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্মরা এ কথা বুঝিতেছেন না। বেদান্তমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়া ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যথা আজ অর্দ্ধেক শিক্ষিত হিন্দু খ্রীষ্টান হইত। কেশববাবু তদানীন্তন খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাবল্যে বেদান্তমূল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন করিয়া, উহা খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের স্রোতে এরূপ বেগে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার 'যিসাস ক্রাইষ্ট ইউরোপ অ্যান্ড এসিয়া' বক্তৃতার পর তাঁহার খ্রীষ্টান হইবার বড় বাকী নাই বলিয়া মিশনারিরা আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। তাহার পর রামকৃষ্ণ পরমহংসের আকর্ষণে পড়িয়া কেশববাবু নিজের ভ্রম বুঝেন এবং রামকৃষ্ণের ধর্ম্মই 'নব বিধান' নাম দিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। একবারে তাঁহার ভ্রম স্বীকার করিলে, ২০ বৎসর যাবৎ তিনি যাহাদের হিন্দুসমাজচ্যুত করিয়া বিজাতীয় পথে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে লাঞ্ছনার একশেষ করিবে, এবং কার্য্যও পণ্ড হইবে বুঝিয়া, তিনি ধীরে ধীরে ব্রাহ্মধর্ম্মে হরি, শিব, লক্ষ্মী সরস্বতীকে আধ্যাত্মিক ভাবে প্রবেশ করাইতেছিলেন। তিনি টাউনহলের এক বক্তৃতায় প্রকাশ্যভাবে বলেন—"আমরা পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা (spirit) গ্রহণ করিব, এবং মূর্ত্তি (form) অস্বীকার করিব।" তিনি আর কিছু দিন বাঁচিয়া থাকিলে আমার ভরসা ছিল যে, মূর্ত্তিগুলি যে ধর্ম্ম-শিক্ষার অক্ষর, এবং তাহাদেরও প্রয়োজন আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্কে নির্ব্বাণ প্রদান করিয়া এবং 'প্রকৃত-ধর্ম্ম' সংস্থাপন করিয়া, হিন্দুদের গৃহে ভারত-পূজিত কেশবের যুগাবতার বলিয়া গৃহীত ও পূজিত হইতেন। ভারতের দুরদৃষ্ট, ভারতের ক্ষণজন্মা পুরুষেরা প্রায় সকলেই তাঁহাদের জীবনের কার্য্যের আরম্ভে তিরোহিত হইয়াছেন।

৩। ঘোষপাড়ার মেলা

ঘোষপাড়া কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে কুলিয়ার অপর দিকে অনুমান, দুই মাইল ব্যবধান। উৎকৃষ্ট পাকা বাঁধা প্রশস্ত পথ। ঘোষপাড়া 'কর্ত্তাভজা' সম্প্রদায়ের পীঠস্থান। প্রবাদ এইরূপ, যে সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব নীলাচল হইতে তিরোহিত হন, ঠিক সেই সময়ে উলার কোনও পানের বরজে একটি সুন্দর অজ্ঞাতকুলশীল শিশু পাওয়া যায়। বারুই তাহাকে প্রতিপালন করে। অষ্টম বৎসর বয়সে শিশু পলায়ন করিয়া, বিক্রমপুরে গিয়া, দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করে। তাহার পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তিনিই বাবা আউলচাঁদ বলিয়া খ্যাত হন। তাঁহার বাইশ জন শিষ্য হয়—কর্ত্তাভজার প্রবাদমতে—'এক গাভী তার বাইশ বাছুর'। ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল তাহাদের মধ্যে প্রধান। আউলচাঁদের তিরোধানের পর রামশরণ পাল 'কর্ত্তা' বলিয়া আউলচাঁদের সম্প্রদায়ের দ্বারা গৃহীত হন। ঘোষপাড়ায় তাঁহার ও তাঁহার পত্নী 'সতী মাই'র সমাধি আছে। তাই ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজা-দের তীর্থস্থান। রামশরণ পালের পুত্র রামদুলাল পাল কতকগুলি সাঙ্কেতিক সঙ্গীত রচনা করিয়া যান। অদীক্ষিত লোক তাহার কিছু অর্থ বুঝিতে পারে না। উহা কর্ত্তাভজাদের একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র বা বেদ। এখন রামশরণ পালের দুই বংশধর আছেন, দুইটিই মহামূর্খ। তথাপি ইঁহারা উভয়েই বর্ত্তমান 'কর্ত্তা'। তাঁহারা সেই সমাধি-বাড়ীতেই বাস করেন। বাড়ীর সম্মুখে একটি সুন্দর বিস্তৃত আম্রকানন। তাহারই পার্শ্বে তদপেক্ষা আধুনিক একটি লিচুবন। এই আম্রকাননে দোল-পূর্ণিমার সময় তিন দিনব্যাপী মেলা মিলিয়া থাকে। আম্রকাননের অপর দিকে একটি সামান্য পুষ্করিণী। নাম 'হিমসাগর'। উহা কর্ত্তাভজা-দের গঙ্গা। তাহাতে মেলার সময়ে অনুমান দুই তিন হাত পরিমাণ জল মাত্র থাকে। এই জলে ত্রিশ চল্লিশ হাজার যাত্রী অবগাহন করে এবং সেই জলই পান করে। অতএব ঘোষ-পাড়ার মেলাও ওলাদেবীর একটি লীলাভূমি। মেলার পূর্ব্বে শীতের সময়ে আমি কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটস্থ ভাগীরথী-সৈকতে শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম, এবং সে সময়ে এই মেলাক্ষেত্র দেখিয়া গিয়াছিলাম। অতএব মেলার পূর্ব্বে কর্ত্তাযুগলকে তলব দিয়া, তাহাদের গলা টিপিয়া, বহু কষ্টে ৫০০্ টাকা আদায় করিয়া, পানীয় জলের জন্য একটি সুন্দর 'ইন্দারা' কাটাইতে আরম্ভ করিলাম। গঙ্গা প্রায় দুই মাইল সরিয়া যাওয়াতে শুধু মেলায় নহে, গ্রামটিতেও অত্যন্ত জল-কষ্ট হইয়াছে। মেলার প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে গিয়া, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত নূতন ভাবে করিলাম। দোলের পূর্ব্বদিন প্রভাতের বহু পূর্ব্বে হইতে যাত্রিসমাগম আরম্ভ হইল। কলিকাতা হইতে ঘন ঘন 'স্পেশিয়াল' আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেলাভূমি পূর্ণ হইতে লাগিল। আমি হিমসাগরে স্নান বন্ধ করিয়া দিয়া, তাহার তীরে নর-নারীর স্নানের স্বতন্ত্র স্থান নিয়োজিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এখানেও যাত্রিগণ পুষ্করিণীতে নামিয়া স্নান করিবার জন্য পুলিসের সঙ্গে মারামারি আরম্ভ করিল। তাহা নিবারণ করিলে, কেহ কেহ বলিল যে, হিমসাগরে স্নান করিতে 'মানস' করিয়াছে। স্নান করিতে না পারিলে ধর্ম্মে পতিত হইবে। আমি তাহাদিগকে স্নান করিতে দিলাম, এবং অবশিষ্ট যাত্রীদের জন্য হিমসাগরের জল মাথায় মাত্র দিলে যথেষ্ট হইবে বলিয়া 'কর্ত্তা'দের ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর কাছে ব্যবস্থা লইলাম। তথাপি যাহা জল ছিল, তাহা কর্দ্দমাক্ত হইল। তখন যাত্রিগণ আপনারা পানীয় জলের জন্য 'ইন্দারা'য় পালে পালে ছুটিতে লাগিল। আমি তাহাদের জলের সুগমের জন্য ভগীরথ নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম। তিনি ইন্দারা হইতে গঙ্গা আনিয়া ইহাঁদের কলসির মুখে উপস্থিত করিয়া দিতেছিলেন। আমি ইন্দারার পার্শ্বে একটা 'হাওজ্' (ক্ষুদ্র জলাধার) প্রস্তুত করাইয়াছিলাম, এবং গোয়ালা নিয়োজিত হইয়া, উহা দিন রাত্রি জলপূর্ণ করিয়া রাখিতেছিল। তাহার মুখে কলের জল-স্তম্ভের মুখের মত কয়েকটি 'ট্যাপ' ছিল। তাহার মুখে কলসি বসাইয়া যাত্রীরা যথেচ্ছা জল লইয়া যাইতেছিল। জলের এই নূতন বন্দো-

বস্তে মেলাক্ষেত্রে একটি আনন্দের কোলাহল উঠিল। তাহার পর আরও একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। যাত্রিগণকে তিন দিন এই আম্রকাননে রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। যাত্রী যে যেখানে আসন লইয়াছে, সে সেখানেই রন্ধন করে, এবং সেখানেই গর্ত্ত করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর ভাতের মণ্ড ফেলিত। উহা তিন দিনে পচিয়া, মেলাস্থান দুর্গন্ধে পূর্ণ করিয়া, ওলাদেবীকে আহ্বান করিয়া আনিত। আমি এ বৎসর আদেশ প্রচার করিয়াছিলাম যে, তাহারা ভাতের মণ্ড হাঁড়িতে ফেলিবে, এবং সেই মণ্ড তৎক্ষণাৎ আমার নিয়োজিত কুলিয়া উঠাইয়া লইয়া, মেলার বহু দূরে এক গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিবে। ইহাতে মেলাক্ষেত্র তিন দিন যাবৎ চমৎকার পরিষ্কার ও পবিত্র ছিল। এতদ্ভিন্ন শৌচাদির স্থানের ও রোগীর জন্য ডাক্তার ও অস্থায়ী হস্‌পিটলের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। এই সকল বন্দোবস্তের ফলে এ বৎসর ওলাদেবী মেলাক্ষেত্রে দর্শন দিলেন না। অতএব কি ডাক্তার, কি হাঁসপাতাল, কেহই ব্যবহারে আসে নাই।

মেলার প্রথম দিবস সমস্ত অপরাহ্ণ মেলার স্থান পর্য্যটন করিয়া, আমার সমস্ত ব্যবস্থা কলের মত চলিতেছে দেখিয়া, শিবিরে ফিরিয়া আসি। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা যদি কখনও মেলায় পদার্পণ করিতেন, ওলাদেবীর ভয়ে তাঁহারা বহু দূরে শিবির স্থাপন করিতেন। আমি লিচু-বাগানের প্রান্তে এবং মেলার সীমাস্থানে তাঁবু ফেলিয়াছি। সন্ধ্যার সময়ে কয়েকজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিদায় দিয়া, কিঞ্চিৎ রাত্রি হইলে ধড়াচূড়া ছাড়িয়া, রাত্রির ব্যবস্থা কিরূপ চলিতেছে, গোপনে দেখিবার জন্য সাধারণ বাঙ্গালী বেশে মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছি—সম্মুখে ও কে? দোলপৌর্ণমাসীর দিগন্তপ্রোদ্ভাসী জ্যোৎস্নায় চারি দিকের বিস্তীর্ণ মাঠ ও গ্রাম্য দৃশ্য হাসিতেছে। সম্মুখে মেলাক্ষেত্রে বৃক্ষছায়ায় জোনাকির মত অনন্ত উননের ও দীপের আলো জ্বলিতেছে। লোককোলাহল, এবং স্থানে স্থানে সংকীর্ত্তনের রোল উঠিতেছে। বাসন্তী পূর্ণিমার ফুল্ল জ্যোৎস্নায় মেলাপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ও কে? এ কি রমণী, না স্বয়ং বাসন্তী পূর্ণিমা মূর্ত্তিমতী হইয়া ভূতলে অবতীর্ণা! রমণী আধুনিক বেশে সজ্জিতা। শুভ্র সুন্দর শাড়ীর অভ্যন্তরে সাটিনের জ্যাকেট। দীর্ঘ দেহলতা যৌবনসুলভ কুসুমস্তবকের লীলায় শোভিতা। নিটোল দীঘল মুখ, আয়ত লোচন, ক্ষুদ্র অধরোষ্ঠ, সুনাসা। দেহাবয়ব কোনও দক্ষ শিল্পকর অমল সুবর্ণে গড়িয়াছে। বিপুল কবরীন্যস্ত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি, তদুপরি শুভ্র সুন্দর-পাড়যুক্ত বসনপ্রান্তের শোভা। রমণীর সুন্দর ঈষৎ হাসি জ্যোৎস্নায় মিশিয়া যাইতেছে। রমণী একাকিনী মেলাপ্রান্তে আমার শিবির-সম্মুখে অদূরে নিরেট জ্যোৎস্নার প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া, একটি বালককে পুষ্পোনিভ দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া, আমার শিবির দেখাইয়া বলিতেছে—"ওই হাকিমের ডেরা। উহার পেছনে চাকরেরা আছে। ঘুরিয়া ঐ দিক্ দিয়া যা।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে?"

উ। আমি যে হই!

প্র। তুমি কি যাত্রী?

উ। হাঁ, আমি যাত্রী।

প্র। তুমি এখানে একাকিনী দাঁড়াইয়া কি করিতেছ?

উ। ঐ ছেলেটি হাকিমের জন্য দুধ লইয়া আসিয়াছে। কাহাকেও খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাই তাহাকে পথ দেখাইয়া দিতেছিলাম।

প্র। তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

উ। যেখানে থাকুক!

প্র। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?

উ। তাহাতে আপনার প্রয়োজন?

প্র। আমি তোমার পরিচয় চাহি।

উ। আত্মপরিচয় দেওয়া আমাদের কুলধর্ম্ম নহে। নারীজাতির আবার পরিচয়ই বা কি?

ঈষৎ হাসিতে অধরোষ্ঠের গোলাপী শোভা জ্যোৎস্নালোকে সমুজ্জ্বল করিয়া রমণী এ উত্তর দিল। আমি বুঝিলাম, এ বঙ্কিমবাবুর বিমলাই বটে।

প্র। তোমার পরিচয় না দিলে আমি তোমাকে ছাড়িব না।

উ। আপনার কি জোর করিয়া স্ত্রীলোকের পরিচয় লইবার অধিকার আছে?

প্র। যদি থাকে?

উ। তবে থাকুক। আমি চলিলাম।

আমি আমার হাতের 'রাইডিং কেন' বা ঘোড়া চালাইবার ক্ষুদ্র সুন্দর ছড়িটি উঠাইয়া বলিলাম—"সাবধান! তুমি আর এক পা এগোবে কি, আমি ওই কনষ্টেবলকে তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে হুকুম দিব।"

যুবতী ছদ্ম গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া, একটুক বক্র হাসি হাসিয়া, নম্রভাবে বলিল—"আপনি কি মনে করেন, আমি আপনাকে চিনি না। আমি আপনার সমস্ত বহি পড়েছি। আপনাকে একবার দেখতে আমার বহু দিনের সাধ ছিল। আপনি এই মেলায় এসেছেন শুনে, তাই আপনাকে একবার দেখতে এই মেলায় এসেছি। আপনি যতক্ষণ আপনার বন্ধুদের সঙ্গে ব'সে তাঁবুর বারান্দায় গল্প কচ্ছিলেন, আমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়াইয়া প্রাণ ভরিয়া আপনাকে দেখেছি।"

আমি বিস্মিত হইলাম। তাঁহার এখনকার ভাব ও ভাষায় আমার বোধ হইল যে, তিনি কোনও পুরমহিলা এবং একটি শিক্ষিতা রমণী। আমার তাঁবুতে আসিতে আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। আমার পরিবার সঙ্গে আছে কি না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সেই রাত্রির ট্রেনে আসিবেন বলিলে তিনি তাঁবুতে থাকিতে অসম্মতা হইলেন। বলিলেন, এরূপ অবস্থায় তিনি কেমন করিয়া আসিবেন। পরিবার থাকিলে তিনি আনন্দের সহিত কবি-পত্নীরও সাক্ষাৎ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতেন। আমি বলিলাম, তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি একটু অপেক্ষা করিলেই স্ত্রী আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি বলিলেন, লোকে দেখিলে কি বলিবে? আমি বলিলাম যে, তাঁবুর পশ্চাৎ দিকে এক কক্ষ আছে। কেহ আসিলে তিনি সেই কক্ষে অপেক্ষা করিতে পারিবেন। ইচ্ছা হয়, সেই কক্ষের পার্শ্বের দ্বার দিয়া মেলায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। কেহ দেখিবে না। তিনি—"আপনার ভৃত্যেরা?"—আমি—"তাহারা তাঁবুর পশ্চাতে থাকে।" তিনি অধোমুখে কি ভাবিলেন। এই ভাবই বা কি সুন্দর! মাথা তুলিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তবে চলুন।" উভয়ে শিবিরে আসিলাম। উজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি বড় সসম্ভ্রমে কিছু দূরে একখানি চেয়ারে বসিলেন। কিছুক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ হইল। দেখিলাম, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা। তিনি জলের মত মাইকেলের, হেমবাবুর ও আমার কবিতা এবং বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের স্থানে স্থানে আওড়াইলেন, এবং সমালোচনা করিলেন। কিছু জলযোগ করিতে আমি বিশেষ অনুরোধ করিলেও বড় শিষ্টাচারের সহিত তাহা অস্বীকার করিলেন। এখন আর সেই বিমলার ভাব নাই। তিনি লজ্জাশীলা, মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী, কুলরমণী। কিন্তু আমি আবার যেই তাঁহার পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিলাম, তিনি আবার সেই প্রখরা, বাক্‌চতুরা, রসিকামূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

আমি। আপনি কি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন?

তিনি। হাঁ, কলিকাতা হইতে।

আমি। আপনি কলিকাতায় [illegible] থাকেন?

তিনি। ৭৪ নং চিৎপুর রোড। এখন পরিচয় পেলেন।

আমি। সেখানে আপনি কি করেন?

তিনি। আপনি একজন বিখ্যাত কবি ও বিচক্ষণ হাকিম, আপনার কি বিশ্বাস হয়?

আমি। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

তিনি। আপনার বিশ্বাস হয়েছে ত আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি?

আমি। আপনি যখন বলছেন, তখন আমি অবিশ্বাস করবো কেন?

তিনি। তবে বিশ্বাস করুন, আমি এ জীবনে কলিকাতায় যাই নাই।

আমি অপ্রস্তুত হইয়া নীরব হইলাম ও তাঁহাকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি কে, তাহা জানিবার জন্য আমি নিতান্ত লালায়িত হইয়াছি। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সেই দীঘল নিটোল মুখ, সেই দীর্ঘ দেহ ও চতুর ভাব দেখিয়া আমার এক সন্দেহ হইল যে, বেশান্তরে সুসজ্জিতা তিনি সেই চক্রবর্ত্তীর কুলত্যাগিনী পত্নী নহেন ত? তিনি অধোবদনে বসিয়া কি ভাবিতেছিলন। আমি বলিলাম—"তুমি কি সেই চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী? তুমি কি রাণাঘাট থেকে এসেছ?"

তিনি মস্তক তুলিয়া, এবার খুব হাসিয়া, মরালবৎ গ্রীবাভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"হাঁ গো হাঁ! আমি সেই চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী। এই দেখুন দেখি, আপনি আমাকে চিনেও এত ক্ষণ চিনলেন না? কবি হউক, আর হাকিম হউক, পুরুষ মানুষ কিছুই নহে।"

আমি—"বটে!" বলিয়া চুপ করিয়া আবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এমন সময়ে বাহিরে 'নবীন! নবীন!' ডাক পড়িল। রমণী চকিতা হংসিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। 'হুজুর' নহে, 'ধর্ম্মাবতার' নহে, একবারে সোজাসুজি 'নবীন'—এ বাপু আবার কে? রমণীকে পশ্চাতের কক্ষে রাখিয়া, আমি বাহির হইয়া দেখি—বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রৈলোক্য দাদা! "আমি বসে ভাবছি মালতী, এসে উপস্থিত বিদ্যাভূষণ!" করমর্দ্দন ও কোলাকুলির পর দাদাকে শিবিরে আনিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি বসিবেন না, মেলা দেখিতে যাইবেন। তাঁহার জন্য বিশুদ্ধ বামুনের ভাজা বিশুদ্ধ লুচি ও তরকারি বিশুদ্ধ বামুনের দ্বারা আনাইয়া রাখিতে হইবে। তিনি ফিরিয়া আসিয়া, তাহা খাইয়া চলিয়া যাইবেন।

আমি। ব্যাপারখানা কি দাদা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বরূপ ঘোষপাড়ায় অবতীর্ণ কেন?

তিনি। আরে রাখ্! তোর কবিগিরি রাখ্! এখন এ কর্‌বি কি না বল?

আমি। ময়রার, লুচির, তরকারির, বাহকের বিশুদ্ধতা আমি কিরূপে পরীক্ষা কর্‌বো? এ যে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ পরীক্ষা হ'তেও কঠিন পরীক্ষা।

তিনি। ছোক্‌রা এখন হাকিমি কচ্ছিস্? আর এই সামান্য কাজটুকু পার্‌বি না! বল্ বল্, সব তৈয়ের রাখ্‌বি?

আমি। আচ্ছা, হুকুম তামিল করবো। কিন্তু ব্যাপারখানা কি? তুমি মেলা দেখতে যাবে, আমি মেলার কর্ত্তা সঙ্গে গেলে তুমি যেরূপ দেখতে পাবে, একা গেলে কি তা পাবে?

তিনি। তোর আর কর্ত্তাগিরি কর্ত্তে হবে না। আমি বছর বছর এ মেলায় আসি। তোর আর আমার "গাইড' হ'তে হবে না।

আমি। সে কি? তুমি কি দাদা, তবে কর্ত্তাভজা?

"তোর সে কথায় প্রয়োজন কি?"—বলিয়া তিনি ছুটিলেন। আমি তদপেক্ষা বেগে পশ্চাৎকক্ষে ছুটিয়া গিয়া দেখি, সুন্দরী চিকের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, আমাদের রসালাপ শুনিয়া হাসিতেছেন। আবার আমার পীড়াপীড়িতে সম্মুখের কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"আমি পূর্ব্বেই আপনাকে বলেছিলাম যে, আমার এখানে আসা উচিত হবে না। লোকটি আমাকে

দেখে নাই ত?" আমি বলিলাম, তাহার সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বলিলেন, এরূপ অবস্থায় তিনি আর আমার স্ত্রীর সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিবেন না। এই ভদ্রলোক এখনই ফিরিয়া আসিতে পারে। বিশেষতঃ ট্রেনের সময়ও অতীত হইয়াছে। আপনার স্ত্রী বোধ হয় আসিলেন না। অতএব তিনি যাইতে প্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"আপনার মনে বোধ হয়, আমার সম্বন্ধে একটা ঘৃণিত বিশ্বাস হয়েছে। হইবারই কথা। তবে এ কথা বিশ্বাস করুন যে, আমি কোনও চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী নহি। আমি রাণাঘাটে কখনও যাই নাই। আপনি শত চেষ্টা করিলেও আমার পরিচয় পাবেন না। আপনি পুলিস লাগিয়ে দিয়ে আমার পরিচয় পেতে চেষ্টা করবেন না, আপনার কাছে আমার এ ভিক্ষা। আপনি কুলিয়ার মেলায় তাঁবু ফেলে থাকেন কি?" উত্তর—হাঁ। "তবে আগামী কুলিয়ার মেলায় আমি আপনার সঙ্গে ও আপনার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। আপনি তাহার পূর্ব্বে আমার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করিবেন না। আর আমার মত ক্ষুদ্র রমণীর পরিচয় আপনার জানিবারই বা প্রয়োজন কি? আমার মত কত শত সহস্র রমণী আপনার কবিত্বের ও প্রতিভার পূজা করে। একবার আপনাকে দেখতে আমার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল। ঈশ্বর আমার সেই সাধ পূর্ণ করলেন। এ সন্ধ্যাটি আমার জীবনের একটি বড় সুখের ও গৌরবের সন্ধ্যা। আমি মনে মনে যেরূপ কল্পনা করেছিলাম, তাহার অধিক দেখলাম। আমি চিরদিন আপনার পূজা কর্‌বো। আপনি দয়া ক'রে যে অপরিচিতাকে আজ এত স্নেহ করলেন যদি তাহাকে স্মরণ রাখেন, আমি আমাকে বড় ভাগ্যবতী মনে কর্‌বো। এখন বিদায় হই। আমাকে একখানি গাড়ী ডেকে দিতে আপনার আর্দ্দালিকে আদেশ করুন।" আমি বাহিরে গিয়া আর্দ্দালিকে ডাকিলাম। সে বড় চতুর লোক। তাহাকে রমণীর কথা বলিয়া বলিলাম—"আমি এমন অদ্ভুত মেয়েমানুষ কখনও কল্পনা করি নাই। কোনওরূপে তাহার পরিচয় পাইতে পারিলাম না।" সে বলিল—"হুজুর! আমি এখনই তাহার পরিচয় লইয়া আসিব।" আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে, রমণী অঞ্চলে গ্রীবা বেষ্টিত করিয়া ভক্তিভরে আমার চরণে পড়িয়া প্রণাম করিল। তাহার ও আমার উভয়ের চক্ষু ছলছল করিতেছিল। আমার বোধ হইল, যেন একটি অপ্সরা আসিয়া, এই আত্মীয়তায় আমার হৃদয় বিহ্বল করিয়া চলিয়া গেল। আমি তাঁবুর বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার মুখ ফিরাইয়া আমাকে দেখিতে দেখিতে মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে আর্দ্দালি ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হুজুর! এমন মেয়েমানুষ আমার বাপেও দেখে নাই।" তাহার উপাখ্যান—"মেলায় প্রবেশ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী কে'? আমি বলিলাম, 'নেড়ি'! নেড়ি কি? তাহার 'স্বোয়ামি' তাহার চুল কাটিয়া দিয়াছিল। বলিল, তোমার বাবু আমাকে সেই 'নেড়ী' মনে করেছেন। এই দেখ ব'লে চুলের খোঁপা খুলে দিল। এক রাশি চুল হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত গড়ায়ে পড়লো। কি চুল! তখন আমাকে একটা টাকা দিয়া গাড়ী আন্‌তে বল্‌লো। আমি বললাম—মা ঠাকুরাণ! বাবু টাকা নিতে নিষেধ করেছেন। তখন মাগী বলে কি না—'তুমি চ'লে যাও। তোমার বাবুর কাছে আমি ভিক্ষা কর্‌তে আসি নাই।' তখন অগত্যা টাকা নিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, গাড়ী কোথায় যেতে ঠিক কর্‌বো? মাগী বল্লে—'কোথাও না। শুধু গাড়ী আন্‌বে, এই মাত্র। কোথায় যেতে হবে, আমি ব'লে দেব।' লাচার হয়ে গাড়ী আন্‌লাম। আমার শিক্ষামতে কোচমান জিজ্ঞাসা করলো—'মা ঠাকুরাণ! গাড়ী কোথা যাবে?' মাগী বল্লে—'উত্তরমুখো।' আমাকে বিদায় দিল। আমি বল্‌লাম—'মা ঠাকুরাণ! আপনি একা কিরূপে যাবেন? বাবু আপনাকে বাড়ী পঁহুছাইয়া দিতে আদেশ দিয়েছেন।' উত্তর —'বটে! তবে বাবুর কাছে চল।' আমি বল্‌লাম—'আচ্ছা মা ঠাকুরাণ! আমি যাচ্ছি, আপনি যান।' তখন গাড়ীতে উঠ্‌লো। আমি চুপে চুপে পেছনে গিয়া বসলাম। ও মা! গাড়ী দু পা না যেতে, থামায়ে, গাড়ী থেকে নেমে আমাকে দেখে,

একেবারে রাগে গরগর ক'রে বল্‌লে—'বটে! তুমি আমার সঙ্গে চালাকি খেল্‌ছ? তোমার যিনি মুনিব, যিনি এ সবডিভিসনের হাকিম, তিনি আমার পরিচয় নিতে পারেন নাই। আর তুমি চাকর, তুমি মনে করেছ যে, তুমি ফাঁকি দিয়ে আমার পরিচয় নেবে। তুমি গাড়ী চ'ড়ে যাও। আমি নিজে গাড়ী আন্‌তে পারি—যাব, এবং কাল তোমার এ কীর্ত্তির কথা তাঁহাকে পত্রে লিখবো।' আমি তখন ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌লাম। মাগী যেন স্বয়ং সিংহবাহিনী! আমি চলে এলাম। যত দূর আমাকে দেখা গেল, মাগী আমার দিকে স্থিরনয়নে চেয়ে রইল। তার পর গাড়ীতে উঠ্‌লো। দেখলাম, গাড়ী ষ্টেশনের রাস্তার দিকে ছুট্‌লো। বাপ! এমন মেয়েমানুষ দেখি নি। এই ২০ বৎসর রাণাঘাটের চাকরিতে ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখেছি. এমনটা দেখি নি। মাগী দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি তেজ, তেমনি চতুরা। রাসে যেরূপ শান্তিপুরের মাগীরা মেলা দেখ্‌তে পালে পালে বাহির হ'য়ে থাকে, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকেরাও সেরূপ এই মেলা দেখতে রাত্তিরে গোপনে আসে। এ তাহাদের কেউ হবে! কাল গাড়োয়ানের কাছে খবর পাওয়া যাবে। আমি তাকে ব'লে দিয়েছি। সে বেটা ভারি চালাক।" এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের দাদা আসিলেন। বিশুদ্ধ বামুনের ভাজা বিশুদ্ধ লুচি তরকারি বিশুদ্ধ বামুনের দ্বারা আনীত কি না, আগে আমার হলপান জবানবন্দি লইলেন। তাহার পর বিশুদ্ধ মতে অর্থাৎ শিবিরের শতরঞ্চির উপর বসিয়া খাইলেন, এবং চলিয়া গেলেন। আমার সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। এক দিকে স্ত্রী আসিলেন না কেন, এক ভাবনা হইল। অন্য দিকে এই রমণী-দর্শন একটা আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত আমার মস্তক বিলোড়িত করিতেছিল। পরের বৎসরের কুলিয়ার মেলার পূর্ব্বে আমি রাণাঘাট ছাড়ি, অতএব তাহার সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই। এখনও এত বৎসর পরে তাহার পরিচয় ও দর্শনের জন্য আমার হৃদয় আগ্রহপূর্ণ। যদি এ জীবনী প্রকাশিত হয়, এবং তিনি আমি উভয়ে সে সময়ে জীবিত থাকি, তবে তিনি দয়া করিয়া যদি আমাকে পরিচয় দেন, এবং আর এক বার সাক্ষাৎ দেন, আমি বড় সুখী হইব। সেই সন্ধ্যাটি আমার স্মৃতিতে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

রমণী চলিয়া গেলে আমি আবার সেই বাঙ্গালী পরিচ্ছদে আবৃতবদনে মেলাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম। হিন্দু তীর্থে যাহারা যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আনে, তাহাদিগকে পাণ্ডা বলে। ইহাদের উপদ্রবে হিন্দু তীর্থগুলি একপ্রকার দস্যুপুরীতে পরিণত হইয়াছে। কর্ত্তাভজাদের পাণ্ডার নাম 'মহাশয়'। এই মহাশয়েরা এক এক বৃক্ষতলায় চাঁদোয়ার মত কাপড় টাঙ্গাইয়া, এবং কাপড়ের ঘেরা দিয়া যাত্রিদল লইয়া উপবিষ্ট। এক স্থানে একজন মহাশয় তাঁহার যাত্রিগণকে কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম বুঝাইতেছেন। ইহারা বোধ হয় নূতন শিকার। আমি সেই বস্ত্রের ঘেরার ভিতরে অজ্ঞাতভাবে প্রবেশ করিয়া, যাত্রীদের পশ্চাতে বসিয়া. তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলাম। তিনি বলিতেছেন—"মানুষ ঈশ্বরকে দেখিতে পারে না, বুঝিতে পারে না। মানুষ মানুষের অধিক কিছুই ধারণা করিতেও পারে না। অতএব সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে মানুষ মানুষভাবে কল্পনা করিয়া পূজা করে। খ্রীষ্টানদের যিশু খ্রীষ্ট মানুষ। মুসলমানদের মহম্মদও মানুষ। হিন্দুদের দেবদেবী সকলই মানুষের আকৃতি মাত্র। যদি তাহাই হইল, তবে মানুষের একটা কল্পিত আকৃতির পূজা না করিয়া, একটি প্রকৃত পূজনীয় মানুষেরই পূজা করি না কেন? সেই পূজনীয় মানুষই আমাদের 'কর্ত্তা'। বাবা আউল-চাঁদের শিষ্য রামশরণ পালই আমাদের সেই 'কর্ত্তা'। এরূপ একজন কর্ত্তাকে আমরা দেবতার মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি বলিয়া, আমাদের সম্প্রদায়ের নাম কর্ত্তাভজা।" সে তাহার পর বলিতে লাগিল—"হিন্দুরা বলে, একমাত্র ঈশ্বর সত্য, আর সকলই মিথ্যা। যদি ঈশ্বর সত্য হইলেন, তিনি মিথ্যা সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার সৃষ্ট সৃষ্টি মিথ্যা হইতে পারে না। অতএব আমাদের মতে ঈশ্বর সত্য, তাঁহার সৃষ্টিও সত্য। সৃষ্টিতে যাহা কিছু

সকলই সত্য। সকল ধর্ম্ম, সকল আচারই সত্য। আমরা এ জন্য কাহারও ধর্ম্মের উপর জাতিগত কি কুলগত আচারের উপর হস্তক্ষেপ করি না। সকল কর্ত্তাভজারা আপন আপন ধর্ম্ম ও আচারমতে চলিতে পারে, কেবল আমাদের কর্ত্তাকে মানিলেই হইল। কেবল আমাদের এই তীর্থস্থানে ভেদজ্ঞান না থাকিলেই হইল। এখানে আমরা সকলে এক কর্ত্তার উপাসক।"

আমি সমস্ত দিন দেখিয়াছি যে, কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে শত শত ভক্ত দুই মাইল পথ লঙ্ঘন করিয়া ঘোষপাড়ার মেলাক্ষেত্রে আসিতেছে, এবং হিম-সাগরে স্নান করিয়া, ভক্তিতে অধীর হইয়া, রামশরণ পালের ও তাহার স্ত্রী 'সতী মাই'র সমাধি দর্শন করিতেছে। আমি দেখিয়াছি যে, শত শত নর নারী 'সতী মাই'র সমাধি-সমীপস্থ 'দাড়িম্বতলা'য় বৈষ্ণবদের মত দশাপ্রাপ্ত হইয়া, অচৈতন্য অবস্থায় দিন রাত্রি ধরনা দিয়া পড়িয়া আছে। কেহ বা অপদেবতাশ্রিত লোকের মত মাথা ঘুরাইতেছে ও কেহ উন্মাদের মত নৃত্য করিতেছে। এই দাড়িম্বতলার দৃশ্য দেখিলে পাষাণের হৃদয়েও ভক্তির সঞ্চার হয়। দেখিয়াছি, মূর্খ কর্ত্তা দু জন দুই 'গদি'তে বসিয়া আছেন, এবং সহস্র সহস্র যাত্রী তাহাদের ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া এবং প্রণামি দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর এই 'মহাশয়'টির ওই সরল ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সেই ভক্তি দৃঢ়তর হইল। আমার বোধ হইল, 'কর্ত্তাভজা' রূপান্তরে হিন্দুদের 'গুরুপূজা' মাত্র। তাহাদের ধর্ম্ম বেদান্তের মায়াবাদের প্রতিবাদ। যে রামশরণ পাল বেদ-বেদান্ত-প্লাবিত দেশে এরূপ একটা নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিয়া, এত লোকের পূজার্হ হইয়াছিলেন, তিনি কিছু সামান্য মানুষ ছিলেন না। যথার্থই কাল্পনিক মূর্ত্তির পূজা না করিয়া, এরূপ পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করিলে ক্ষতি কি? এখন যে harmony of scripture বা ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বলিয়া একটা কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে, এই রামশরণ পালই তাহা সর্ব্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম্মের মূল এক এবং এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অধঃপতিত দেশে তিনিই তাহা প্রথম প্রচার করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্ম, সকল আচার সত্য—এমন উদার মত এক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্মসংস্থাপক প্রচার করেন নাই। অতএব রামশরণ পাল, আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি এত দিনে কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম কি, বুঝিলাম এবং ভক্তিহৃদয়ে আমার শিবিরে ফিরিলাম।

আমার কোনও বন্ধুর কন্যা সেই রাত্রি ১০টার ট্রেনে মেলা দেখিতে রাণাঘাটে আসেন। সেই জন্য আমার পরিবারবর্গ রাত্রির ট্রেনে ঘোষপাড়ায় আসিতে পারেন নাই। পরদিন প্রাতের ট্রেনে অনুমান ১০টার সময়ে মেলায় পঁহুছিলেন। তাহার পর আর এক আরব্য উপাখ্যান। পত্নীর 'গ্ল্যাডষ্টোন ব্যাগ' পাওয়া যাইতেছে না। তাহাতে চারি পাঁচ শত টাকার গহনা আছে। তাহার উপর সোনায় সোহাগা—ব্যাগটিও খোলা! পত্নীর মতে ইহার জন্য পৃথিবী সুদ্ধ সকলেই দায়ী! তাঁহার নিজের দোষ?—তাহা অসম্ভব। তিনি 'শুদ্ধম-পাপবিদ্ধং'। ঈশ্বরে দোষ সম্ভব, তাঁহার দোষ অসম্ভব। ইহা তাঁহার জীবনের একটা axiom। প্রথম দোষ রামশরণ পালের—পোড়ারমুখো সে, একটা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া এই মেলা করিল কেন? তাহার পর দোষ আমার—আমি মেলায় আসিলাম কেন? আমি না আসিলে ত আর তিনি আসিতেন না। তাহার পর দোষ সঙ্গীয় লোক ও ভৃত্যদের—তাহারা 'ব্যাগ' ফেলিয়া আসিল কেন? তিনি হলপ করিয়া বলিতে পারেন যে, ব্যাগ তিনি স্বহস্তে ট্রেন হইতে নামাইয়াছেন। এইরূপে দোষ বিতরণ ও অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। এ দিকে ভৃত্য একজন আমার পত্র লইয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে ছুটিল, এবং যথাসময়ে সংবাদ আসিল যে, ষ্টেশনে ব্যাগ নাই। আমি অশ্বপৃষ্ঠে তীরবেগে ছুটিলাম। কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে পঁহুছিলে, ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন, তিনি শিয়ালদহে আমার উপদেশমতে

টেলিগ্রাফ করিয়া জানিয়াছেন যে, 'ব্যাগ' গাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে। তখন আবার টেলিগ্রাফ করিয়া জানিলাম যে, 'ব্যাগ' খোলা, তাহাতে সকল অলঙ্কারই আছে। আমি ৪টার ট্রেনে সন্ধ্যার পর শিয়ালদহে পৌঁছিলাম। শুনিলাম, তাঁহারা ৪টার প্রতি-ট্রেনে ব্যাগ কাঁচড়াপাড়ায় পাঠাইয়াছেন। কি বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত! তবে নাটক নহে, প্রহসন মাত্র। আবার টেলিগ্রাফ। জানিলাম, সন্ধ্যার সময়ে sealed bag (মোহরযুক্ত ব্যাগ) কাঁচড়াপাড়া পঁহুছিয়াছে। এসিস্টেণ্ট ষ্টেশন-মাষ্টার সাহেব বড় সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পান-কার্য্যে আরও কিছু টাকা খোয়াইয়া, আবার পরের ট্রেনে ফিরিয়া, রাত্রি ১১টার সময়ে কাঁচড়াপাড়া পঁহুছিয়া, সমোহর ব্যাগ খুলিলাম। বড় দুঃখ-দুর্গতির উপার্জ্জন। দেখিলাম, সব অলঙ্কারগুলি আছে। সমস্ত দিনের অনাহারে, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে শিবিরে পঁহুছিলাম। দেখিলাম, স্ত্রী এখনও সেইরূপ অগ্নি-বৃষ্টির সহিত দোষ বিতরণে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা, তিনি 'ব্যাগ' কাঁচড়া-পাড়ায় নামাইয়াছিলেন। এরূপ কথা যখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে, তখন তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। উহা একটা অকাট্য সত্য। যাহা হউক, এতক্ষণ বাষ্প উদ্গিরণের পর সালঙ্কার ব্যাগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মেজাজ কিছু শীতল হইল, এবং শিবিরে বেশ একটা আনন্দোৎসব হইল। মেলায় আমার প্রভুত্ব, শিবিরে এই অভিনয়, সর্ব্বশেষ আমার ক্ষিপ্রকারিতা ও কলিকাতা-প্রয়াণক্লেশে বন্ধুকন্যার হৃদয় সহানুভূতিতে অমৃত-সিক্ত হইয়াছিল। সে আমার কোলে বসিয়া, কি আদর দেখাইয়া এক পাত্রে জিদ করিয়া আহার করিল। সন্ধ্যার পর মেলা দর্শন করিয়া আসিয়া, লিচুবাগানে আমার গলা জড়াইয়া বহু ক্ষণ বেড়াইল এবং বর্ত্তমান সভ্যযুগের স্ত্রীদিগের স্বামীর প্রতি ব্যবহারের কথা লইয়া কত সহৃদয়তার কথাই বলিল। সে বলিল, এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সে বিবাহ করিতেছে না, পাছে সেও এই যুগস্রোতে ভাসিয়া যায়। সে ভাসিয়া যায় নাই। নীলাকাশে ক্ষণপ্রভা বিকাশের ন্যায় কয়েক দিনের জন্য মাত্র আদর্শ পত্নীত্ব দেখাইয়া, এই প্রতিভাশালিনী বালিকা তাহার স্বধামে চলিয়া গিয়াছে। ঘোষপাড়ার মেলার দ্বিতীয় দিনটাও এরূপে ঘটনাপূর্ণভাবে শেষ হইল।

তৃতীয় দিবস যাত্রীর ভিড় আরও অধিক হইল। প্রাতে কয়েক জন ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রায় গ্রাজুয়েট, সুশিক্ষিত ও পদস্থ। তাঁহারা সকলেই কর্ত্তাভজা। আমি মেলায় যে সকল নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছি, এবং একটা ইঁদারা কাটাইয়া যেরূপ পানীয় জলের সুব্যবস্থা করিয়াছি, তাঁহারা তজ্জন্য আমাকে ধন্য-বাদ দিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, প্রায় প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কখনও আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের কাছে আসেন নাই, কি আত্মপ্রকাশ করেন নাই। আমি ঘোষপাড়ার এত হিতৈষী বলিয়া তাঁহারা আমার কাছে আসিয়াছেন ও পরিচয় দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণবণিক্ সকল জাতিই আছেন। ঘোষ-পাড়ায় জাতিভেদ নাই। তাঁহারা সকলেই এক রন্ধনশালা হইতে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং এ জন্যই বৎসর বৎসর আসেন। তান্ত্রিকদের 'চক্রে' যেরূপ জাতিভেদ নাই, সকলেই এক স্থানে একত্রে প্রসাদ গ্রহণ করে, বুঝিলাম—ইহাঁরাও সেরূপ করেন। ঘোষপাড়ায় যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ কোনওরূপ স্পর্শদোষ মানেন না। ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজাদের শ্রীক্ষেত্র। 'হিমসাগর' পুষ্করিণীটির সংস্কার জন্য তাঁহারা আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। এত টাকা কোথায় পাইব, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন যে, মেলাক্ষেত্রে এমন একটি সুবর্ণবণিক্ মহিলা আছেন, তিনি একাই এ কার্য্যের জন্য ২০,০০০্ বিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু কর্ত্তাদের অনুমতি ভিন্ন তিনি এ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন না। তাঁহার অসাক্ষাতে যদি কর্ত্তাদের ডাকাইয়া আমি অনুমতি লইতে পারি তবে আজই তিনি এ টাকা দিবেন। আমার

অনুরোধমতে তাঁহারা আমাকে রামদুলাল পাল-রচিত তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংগীত হারমোনি ফ্লুটের সঙ্গে শুনাইলেন। একটি অক্ষর বুঝিলাম না। শব্দ বাঙ্গালা, কিন্তু পদের কোনও অর্থ বুঝা যায় না। তাহা বুঝিবার কি একটা সংকেত আছে। কর্ত্তাভজা না হইলে অন্যের কাছে সে সঙ্কেত প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে heresy (মহাপাতক)। উহা তাঁহাদের Free Masonary। তবে এই মাত্র বলিলেন যে, এ সকল সঙ্গীত চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্ম-মূলক। রাগিণীও কেমন একঘেয়ে, কিছুক্ষণ শুনিলে আর শুনিতে ইচ্ছা করে না। তাঁহারা আবার আমার এক রাশি প্রশংসা করিয়া, এবং 'হিমসাগর' কাটাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি তখনই কর্ত্তা দুটিকে ডাকাইলাম। একজন এক খণ্ড সরল যষ্টিবিশেষ, আর একজন ঠিক একটি কুর্ম্মাবতার। তাঁহারা কিছুতেই অনুমতি দিলেন না। বলিলেন, আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা প্রকৃত কথা নহে। তাঁহাদের অনুমতি-মতে কেহ কখনও এত টাকা দিবে না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য যে, টাকাটা তাঁহাদের হাতে দিতে হইবে। কিন্তু কর্ত্তাভজারা জানে যে, তাঁহারা দুইজনই এমন কীর্ত্তিমান্ পুরুষ যে, তাঁহাদের হস্তে দিলে টাকাটার অধিকাংশ তাঁহারা স্বয়ং উদরস্থ করিবেন। ঘোরতর ভর্ৎসনা করিয়া আমি এই কৃপাপাত্র দুটিকে বিদায় দিলাম। তিন পুরুষও হয় নাই। ইতিমধ্যেই রামশরণ পালের সন্তানদের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে।

অপরাহ্নে মেলাক্ষেত্রে খুব কীর্ত্তনের রোল উঠিয়াছে। একটি কীর্ত্তনের দল শিবিরে ডাকিয়া আনিতে আর্দ্দালিকে পাঠাইলে, সে আসিয়া বলিল—"হুজুর! কেহ আসিতে চাহে না। হাকিমের নাম শুনিলে সকলে পলাইয়া যায়।" হাকিমদের জন্য কি সার্টিফিকেট! শুনিলাম, একটি শিশু বড় সুন্দর কীর্ত্তন করিতেছে। আমি বুঝিলাম, আমার দূত পাঠাইলে সেও পলায়ন করিবে। অতএব অন্য একটি লোককে তাহাকে আনিতে পাঠাইলাম। সে তাহাদিগকে তখনই লইয়া আসিল। শিশুটি গাইতেছে, সঙ্গে তাহার পিতা একটা গোপযন্ত্র বাজাইতেছে ও তাহার মাতা মন্দিরা বাজাইতেছে। শিশুটির বয়স অনুমান ৮ বৎসর, শ্যামবর্ণ, গোপালবেশে সজ্জিত। পরিধানে ধড়া, মাথায় চূড়া। তাহার ক্ষুদ্র মুখ-খানিতে কি এক স্নেহমণ্ডিত লাবণ্য আছে যে, তাহাকে দেখিলে আদর করিতে ইচ্ছা করে। সে কি সুন্দর কীর্ত্তন গাইতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে আমার শিবিরসমক্ষে দুই তিন সহস্র লোক সমবেত হইয়া, নীরবে তাহার কীর্ত্তন শুনিতে ও নৃত্য দেখিতে লাগিল। সে একবার গর্জ্জন করিয়া, ভ্রূকুটি ভঙ্গি করিয়া গাইতেছে; একবার বসন্ত-কুসুম গন্ধলুব্ধ ভ্রমরের মত গুণ গুণ অস্ফুট রবে গাহিতেছে। এক এক বার তাহার পিতার কোলে, তাহার মাতার কোলে গিয়া মুখ লুকাইয়া বসিতেছে। আমি এমন সুন্দর, এমন ভাবময়, এবং এমন বিশুদ্ধ স্বরভঙ্গিপূর্ণ কীর্ত্তন আর কখনও শুনি নাই। শিবিরস্থ রমণীগণ মুগ্ধা ও স্নেহে বিগলিতা। তাহাকে শিবিরে লইতে আমাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সে প্রথম যাইতে চাহিল না। তাহার পর তাহার মা বলিল—"গোপাল! সেখানে তোর মা আছেন, খাবার দিবেন।" আমার অনুমতি-মতে তাহার মা তাহাকে লইয়া শিবিরে প্রবেশ করিল। আমার স্ত্রী—এমন কি, সেই বন্ধু ব্রাহ্ম ব্যারিষ্টার-বালিকা পর্য্যন্ত তাহাকে লইয়া ক্ষেপিয়া গেলেন। সে স্ত্রীকে কি মধুরকণ্ঠে বলিতে লাগিল—"মা! কই খাবার দেও!" স্ত্রী তাহাকে কতরূপ খাদ্য দিলেন, এবং তিনি ও বন্ধু-বালিকা তাহাকে কত বুকে লইলেন, কত আদর করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাহাকে কোনও মতে ছাড়িবেন না। আবার আমার মনে হইল, ব্রজলীলা তবে অবিশ্বাস করি কেন? গোপালবেশে সজ্জিত একটি সামান্য শিশুকে লইয়া ইহাঁরা যাহা করিতেছেন, স্বয়ং গোপাল ইহাঁদের সম্মুখে আসিলে, ইহাঁরা কি মা যশোদার ও ব্রজবালাদের অভিনয় আজ করিতেন না? আমার বোধ হইল যেন আমি সত্য সত্যই আমার নয়নসমক্ষে ব্রজলীলার অভিনয় দেখিতেছি।

একটি অন্ধ এক কোণায় বসিয়া বালকের সংকীর্ত্তন শুনিতেছিল। একটি লোক বলিল যে, সেই অন্ধটি পূর্ব্বরাত্রিতে সতী মাইর সমাধিতে বড় সুন্দর গান করিতেছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি গাইতে পার?" সে বলিল—"কর্ত্তা! আমি অন্ধ, আমি কি গান করিব? বিশেষতঃ বৈরাগীদের এ গোপযন্ত্রের সঙ্গে আমরা গান করিতে পারি না।" তখন মেলা হইতে একটি সংকীর্ত্তনের দল খোল লইয়া আসিল। অন্ধ গাইতে লাগিল—"হিমসাগরে স্নান করিয়ে দাড়িম্বতলায় চল।" তাহার কি মধুর কণ্ঠ! কি ভক্তিপূর্ণ ভাব! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কি কর্ত্তাভজা?" সে উত্তর করিল—"ধর্ম্মাবতার্, না। আমি একটি লোকের সঙ্গে নবদ্বীপে দোল দেখিতে যাইতেছিলাম। পথে আমার সঙ্গী বলিল যে, নবদ্বীপের দোল অনেক বার দেখিয়াছি; এবার চল, কর্ত্তাভজাদের মেলা দেখিয়া যাই। তাই এখানে আসি। কাল সন্ধ্যার পর যখন সতী মাইর সমাধিতে বাবুরা কীর্ত্তন করিতেছিলেন, আমাকেও গাইতে বলিলেন। তাঁহারা কর্ত্তাভজা, অতএব এই গানটি রচনা করিয়া গাইয়াছিলাম।" তখন আমি তাহার রচিত আরও দুই একটি গান শুনিতে চাহিলে, সে গাইতে লাগিল। কি সুন্দর রচনা ও কি সরল ভক্তির উচ্ছ্বাস। প্রত্যেক গানের শেষে 'অন্ধ দুঃখী বলে' বলিয়া কি করুণ ভণিতা আছে। প্রায় ৩০০০ যাত্রী ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া চিত্রিতবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। সকলেরই চক্ষু ছল-ছল করিতেছিল। শিবিরস্থ রমণীরা—এমন কি, ব্রাহ্ম-ব্যারিষ্টার-বালিকা পর্য্যন্ত অশ্রু-বিসর্জন করিতেছিল। লোকটি বলিল, তাহার বাড়ী পাবনা জেলায়। সে জন্মান্ধ। তাহার মধ্যম বয়স। অনেক গীত রচনা করিয়াছে। যে যখন আসিয়া ধরে, তখনই একটি গীত রচনা করিয়া দিয়া থাকে। তাহার গীত লেখা আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে অতিশয় করুণকণ্ঠে বলিল—"কর্ত্তা! আমি জন্মান্ধ। লেখাপড়া জানি না। কে লিখিয়া রাখিবে? তবে অন্য কেহ যদি লিখিয়া রাখিয়া থাকে, বলিতে পারি না।" আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে আমার সহোদরের যত্ন করিয়া রাখিব, এবং তোমার সমস্ত গান লেখাইয়া লইয়া ছাপাইয়া দিব। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তোমার কীর্ত্তন শুনিয়া আমার প্রাণ জুড়াইব। তোমার সকল অভাব আমি পূরণ করিব।" সে বলিল—"কর্ত্তার অন্ধের প্রতি এই দয়া! আপনার আশ্রয়ে থাকিতে পারিলে তদপেক্ষা এ অন্ধের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা কি হইতে পারে? তবে আমি এখন থাকিতে পারিতেছি না। আমি কিছু দিন পরে শান্তিপুর একবার আসিব। সে সময়ে আমি কর্ত্তার সঙ্গে কিছু দিন থাকিয়া যাইব।" তাহা আর হয় নাই। বলিয়াছি, এই মেলার অব্যবহিত পরে আমি রাণাঘাট হইতে বদলি হই।

এরূপে মেলার তৃতীয় দিন শেষ হইল। এই অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা আমি যেন ইহলোকে ছিলাম না। আমি এমন মধুর প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন আর কখনও শুনি নাই। সমস্ত রাত্রি যেন স্বপ্নেও আমি সেই কীর্ত্তন শুনিতেছিলাম। পরদিন পরিবারবর্গকে রাণাঘাট পাঠাইয়া, মেলা ভাঙ্গার পর আমি কি কারণে কলিকাতা যাইতেছি, কাঁচড়াপাড়ায় গাড়ীতে উঠিয়া দেখি—গাড়ীর কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া সচশমা রবিঠাকুর! উভয়ে উভয়কে এরূপ আচম্বিত দেখিয়া উভয়ে বিস্মিত। তিনি বলিলেন—"আপনি কোথা হইতে?" আমি বলিলাম—"আপনি কোথা হইতে?" তিনি বলিলেন, তিনি তাঁহার জমিদারি হইতে। আমি বলিলাম, আমি আমার জমিদারি হইতে।

তিনি। জমিদারিটি আবার কি?

আমি। ঘোষপাড়ার কর্ত্তাভজাদের মেলার অধ্যক্ষগিরি।

তিনি। কর্ত্তাভজাদের মেলা! শুনিয়াছি, উহা বড় জঘন্য ব্যাপার।

আমি। অক্ষয়কুমার দত্তের 'উপাসক সম্প্রদায়' পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাস হইয়া-

ছিল। কিন্তু তিন দিন মেলার কর্ত্তাগিরি করিলাম, কই—স্ব-ঘ-ন্যা, তিন অক্ষরের একটিও দেখিলাম না। ব্রাহ্ম অক্ষয়কুমার দত্ত হিন্দুধর্ম্মের প্রতি মিশনারির অধিক বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন। আমিও যাহা দেখিয়াছিলাম ও শুনিয়াছিলাম, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলাম। এই বর্ণনায় তাঁহারও যেন চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"আমার একটি প্রার্থনা। আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, যদি তাহা একটুক ক্লেশ স্বীকার করিয়া, 'সাধনা'র জন্য লিখিয়া দেন, তবে আমার মত অনেকেরই একটা বিষম ভ্রম ঘুচিবে। আমি বলিলাম—"সে কার্য্য আপনার। আপনার মত আমার রচনাশক্তি নাই। বিশেষতঃ ভ্রম অন্যের ঘুচিলেও ঘুচিতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মদের নহে। ব্রাহ্মরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অপেক্ষাও গোঁড়া। তাহারা অন্য ধর্ম্মমতকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে জানে না। সে উদারতা 'ভ্রাতা'দের নাই। অন্য ধর্ম্ম তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করাও তাহারা অধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহা না হইলে অক্ষয়-কুমার দত্তের মত এমন মনীষী ব্যক্তি কেন ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের এরূপ নিন্দা করিবেন? আমার একজন বালসুহৃদ্ ব্রাহ্ম প্রচারকের সঙ্গে ২০ বৎসর পরে একবার সাক্ষাৎ হইলে দেখিলাম, যদিও সে ধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরিত্যক্ত পৈতৃক হিন্দুধর্ম্মটা কি, তাহা সে একবার জানিতেও চেষ্টা করে নাই। এমন কি, সে গীতাখানি পর্য্যন্ত পড়ে নাই। অথচ সে হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের একজন ঘোরতর বিদ্বেষী।"

ইহার পর তিনি আমার 'কুরুক্ষেত্রে'র কথা তুলিয়া বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি 'কুরুক্ষেত্র' পড়িয়াছেন, এবং আমি অনুমতি দিলে তিনি 'সাধনা'য় উহার সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করেন। আমার অনুমতির প্রয়োজন কি? তিনি বলিলেন, সকল বিষয়ে তাঁহার ও আমার যে একমত হইবে, এমন হইতে পারে না। অতএব কোনও বিষয়ে মতান্তর হইলে তিনি ভয় করেন, আমি পাছে বিরক্ত হই। তাই আমার অনুমতি চাহেন। আমি বলিলাম— "রবিবাবু! যেখানে সাহিত্য উপজীবিকা,—যেখানে একখানি ভাল বহি লিখিতে পারিলে লেখক বড়মানুষ হয়, সেখানে লেখকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষ সম্ভব। আমাদের সাহিত্যসেবা উপজীবিকা নহে, (purely a work of love), অতএব আমাদের মধ্যে বিদ্বেষের ত কোনও কারণ নাই। বিদ্বেষ-দুষ্ট সমালোচনারও মূল্য নাই। উহা ঘৃণার বিষয়। সরলভাবে সমালোচনা করিয়া যে আমার দোষ দেখাইয়া দেয়, আমি তাহার কাছে বরং কৃতজ্ঞ হই। এক একখানি বহি বাহির হইলে অনেক বন্ধু ও পাঠক এরূপ সমালোচনাপূর্ণ পত্র আমাকে লিখিয়া থাকেন। আমি তাহা যত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখি, এবং উক্ত পুস্তকের অন্য সংস্করণ ছাপিবার সময়ে আমি তাঁহাদের প্রদর্শিত দোষ সকল খুব স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি। যেটি আমার কাছেও প্রকৃত দোষ বলিয়া বোধ হয়, আমি উহা পরিবর্ত্তন করিয়া থাকি। আপনিও যদি সরলভাবে আমার দোষ দেখাইয়া দেন, আমি বিরক্ত না হইয়া, আপনার কাছে ঋণী হইব। যদি আমরা পরস্পর পরস্পরের দোষ দেখাইয়া না দিয়া, কেবল মন যোগাইবার জন্য অযথা প্রশংসা ও তোষামোদ করি, তবে আমাদের বন্ধুতার সার্থকতা কি?" তিনি বলিলেন, সকলের এরূপ সহিষ্ণুতা ও উদারতা নাই। এমন কি, তাঁহারও নাই। বড় আনন্দালাপে যথাসময়ে শিয়ালদহে পঁহুছিলাম এবং কর্ত্তাভজাদের মেলাদর্শনপর্ব্ব শেষ করিলাম।

সাহিত্য-তীর্থ-দর্শন

রাণাঘাট থানার অধীন বেলঘড়িয়া গ্রামে শিবিরে থাকিতে শুনিলাম, তাহার নিকটেই বঙ্গের ব্রাহ্মণেতিহাসে বিখ্যাত ফুলিয়া গ্রাম। ফুলিয়ার মুখটিরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। প্রচলিত কবিতায়—

"মুখটি কুলীন বড়, বন্দ্যঘটি সাদা,
সভার মধ্যে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা।"

ব্রাহ্মণদের গৌরবে গৌরবান্বিত সেই তীর্থভূমি ফুলিয়া দর্শন করিতে আমি অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলাম। কিন্তু গ্রামে পেঁৗছিয়াই আমার মনে হইল।

"এই সে পলাশি ক্ষেত্র! এই সে প্রাঙ্গণ।"

স্থানটি দেখিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আদি-ভূমি ফুলিয়ায় এখন ব্রাহ্মণের গন্ধমাত্র নাই। উহার অধিকাংশ বন ও মুসলমানের বাসস্থান। যেখানে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রালাপ হইত, আজ সেখানে শিবাগর্জ্জন। সরস্বতী দেবীর স্থান এখন চামুণ্ডা ম্যালেরিয়াদেবী গ্রহণ করিয়াছেন। হায়! বঙ্গদেশের কি বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! কেবল মুখটিদের পিতৃভূমি বলিয়া নহে, 'ফুলিয়ার কীর্ত্তিবাস'ই বাঙ্গালা রামায়ণের 'কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস'। বাঙ্গালা রামায়ণ যাঁহাকে অমর করিয়াছে, যে রামায়ণ বাঙ্গালীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম্ম ও কাব্যগ্রন্থ, যাঁহার অমৃত পান করিয়া এই চারি শত বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের নর-নারী মানুষ হইয়াছে, যাহার অমৃতের স্থান বাঙ্গালার উগ্র 'নভেল'-বিষ গ্রহণ করাতে আজ সেই বঙ্গদেশের নর-নারীর অধঃপতন ঘটাইতেছে, সেই রামায়ণের ও তাহার প্রণেতার জন্মস্থান এই ফুলিয়া! ব্রাহ্মণবংশের সঙ্গে কৃত্তিবাসের বংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালা রামায়ণের ও তাহার রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ভদ্রাসন-বাটীর এখন চিহ্নমাত্র নাই। এখনও প্রবাদ এই দীর্ঘকাল পরেও সেই স্থানটির নির্দ্দেশ বিস্মৃতির তামস গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখনও যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কৃত্তিবাসের বাড়ীর স্থান দেখাইয়া দিবে। উহা এখন একজন দরিদ্র মুসলমান প্রজার বাঁশবন। তাহার কিঞ্চিৎ বাহিরে গঙ্গাতীরে একটা মাটির ঢিপি আছে। লোকেরা এই ঢিপিটাকে কৃত্তিবাসের দোলমণ্ড বলিয়া এখনও দেখাইয়া দিয়া থাকে। কৃষকেরা তাহার চারি দিক্ চষিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ঢিপিটি দেবপ্রসাদ স্বরূপ ভক্তিভরে রক্ষা করিয়াছে। দরিদ্র কৃত্তিবাসের ভদ্রাসন বাড়ীর ও দোলমণ্ডের এই ধ্বংসাবশিষ্ট দেখিয়া আমি ভাগীরথীর দিকে চাহিয়া কাঁদিয়াছিলাম। হায়! মা বীণাপাণি! সর্ব্বত্রই কি এইরূপ! সর্ব্বত্রই কি তুমি তোমার দরিদ্র পুত্রদের চিহ্নমাত্র রাখ নাই! এই দুইটি স্থান ক্রয় করিয়া এবং চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য আমি সহোদরসম বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ও 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক কার্য্যকুশল যোগেন্দ্রনাথ [চন্দ্র] বসু মহাশয়ের কাছে পত্র লিখিলাম। স্মরণ হয়, কৃত্তি-বাসের বাড়ীর স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে রাম-সীতার মূর্ত্তি স্থাপন করিতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়ে এই প্রস্তাব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং 'বঙ্গবাসী' লীলাময়ী ভাষায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে-ছিলেন। তাহার পর আমি রাণাঘাট ছাড়িয়া আসি। কার্য্য কি হইয়াছে জানি না।

কৃত্তিবাসের গৃহের অদূরে আর একটি তীর্থস্থান আছে। উহার নাম 'হরিদাসের পাট'। প্রবাদ—২২ বাজারে হরিদাস বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া, অচেতন অবস্থায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গায় ভাসিয়া এই স্থানে লাগিয়াছিলেন। স্থানটি গঙ্গার তীরে। তাহার পর এখানে আশ্রম করিয়া বহু বৎসর তপস্যা করেন এবং দিনে লক্ষ্যবার হরিনাম করেন। সাহিত্যসেবীদের অপেক্ষা ধর্ম্মসেবীদের অদৃষ্ট ভাল। হইবারই কথা। সাহিত্যানুরাগীদের অপেক্ষা ধর্ম্মানুরাগীরা কৃতজ্ঞ। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে তাঁহার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু 'হরিদাসের পাট' আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদের একটি পীঠস্থান। তাহাতে ভিখারী বৈরাগীরা একটা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। পার্শ্বে বৈরাগীদের একটা 'আখড়া' কুটীর। তাহাতে বৈরাগীরা বাস করে এবং নিত্য হরিদাসের নাম কীর্ত্তন ও বিগ্রহের পূজা করে। প্রতি বৎসর এই পীঠস্থানে বৈরাগীদের

একটা বৃহৎ মেলাও হইয়া থাকে। আমি এই পীঠস্থানও দর্শন করিলাম, এবং হরিদাসের সেই আদর্শ হরিভক্তি স্মরণ করিয়া, তাঁহার আশ্রমে অশ্রুবর্ষণ করিলাম। হরিদাস যেরূপ দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার পীঠস্থানও তদ্রূপ দরিদ্র ভিক্ষাজীবী বৈরাগীদের কীর্ত্তি। যাহা কিছু আছে, সকলই দরিদ্র। কোনও ধনবানের কৃপাকটাক্ষ এ স্থানের উপর পড়ে নাই। বাঙ্গালার ধনবানেরা এমন অমানুষ নহেন যে, কখনও পড়িবে! দরিদ্রের তপস্যার স্থানটি দরিদ্ররাই এত কাল রক্ষা করিয়াছে। দরিদ্র না হইলে দরিদ্রের দুঃখ, দরিদ্রের গৌরব কে বুঝিবে? খ্রীষ্ট এই জন্যই ত বলিয়াছিলেন—"উষ্ট্র সূচিরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহাও সম্ভব, তথাপি ধনী স্বর্গে যাইতে পারিবে না।" ঘোষপাড়ার রামশরণ পালও একজন দরিদ্র বৈরাগী ছিলেন মাত্র। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম মুষ্টিমেয় লোকে গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। অথচ তাঁহার জন্মস্থান তাঁহার দরিদ্র ভক্তেরা কি তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছে! আর কৃত্তিবাস?—কত কোটি কোটি লোক, কত শত সহস্র ধনী নর-নারী কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণ পড়িয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে। আর তাঁহার জন্ম ও কর্ম্মস্থানের এই দুরবস্থা!

ঘোষপাড়ার মেলার পূর্ব্বে আমি একবার কাঁচাড়াপাড়া আসিয়া, গঙ্গার চরে শিবিরে ছিলাম। আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই কাঁচড়াপাড়া, কি তৎসমীপবর্ত্তী ত্রিবেণী হইতে চট্টগ্রাম গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব এই উভয় স্থানের বৈদ্যদের 'কুলজি'তে তাহার কোনও উল্লেখ আছে কি না, আমার বংশের কোনও শাখা এখনও এখানে আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বড় আগ্রহ সহকারে এখানেও শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম। কিন্তু কি দেখিলাম! যে কাঁচড়াপাড়ায় বৈদ্যদের একটি আদি ও গণ্ডস্থান ছিল, ফুলিয়া যেরূপ ব্রাহ্মণ-শূন্য, কাঁচড়াপাড়াও সেরূপ প্রায় বৈদ্যশূন্য হইয়াছে। অনেক জনশূন্য বাড়ী পড়িয়া আছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এই গ্রামের পূর্ব্বশ্রী কিছুই নাই। কেবল পূর্ব্বস্মৃতিটুকুমাত্র আছে। অনেক অনুসন্ধানে একজন প্রাচীন বৈদ্য মাত্র পাইলাম। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ। তাঁহার শরীর ধনুর মত বাঁকিয়া গিয়াছে। তিনি যেন হামাগুড়ি দিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন, এবং আমাকে কাঁচড়াপাড়ার শোককাহিনী শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, ম্যালেরিয়ায় ও দরিদ্রতায় স্থানীয় বৈদ্যবংশ নিঃশেষ হইয়াছে। যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বাস করিতেছেন। তিনি মাত্র 'sad historian of the pensive plain' এই শোকপূর্ণ স্থানের বিষণ্ণ ঐতিহাসিক আছেন। তাঁহার সেই শোককাহিনী শুনিয়া আমার হৃদয় বিষাদে ডুবিয়া গেল। তাহার পর গঙ্গা পার হইয়া ত্রিবেণী দর্শন করিতে গেলাম। অন্য পারে পৌঁছিয়া শুনিলাম, ত্রিবেণী গ্রাম এখন গঙ্গা হইতে বহু দূরে। যাতায়াতেরও কোন সুবিধা নাই। শুনিলাম, সেখানেও এখন অল্পসংখ্যক বৈদ্য পরিবার মাত্র আছেন।

আর একদিন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মস্থান দেখিয়া গেলাম। তাহাও কাঁচড়াপাড়ায়। যিনি এক দিন সাহঙ্কার শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত চরাচর।
যাঁহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥"

আজ সেই 'প্রভাকরে'র ঈশ্বর গুপ্তের জন্মস্থানে তাঁহার প্রভা দূরের কথা, চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার ভদ্রাসন বাটী একখানি সামান্য একতালা ঘর। যে 'প্রভাকরে'র কবিতায় ত্রিশ বৎসর বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়াছিল, যে স্থানে তাহা রচিত হইত, সে স্থানে এখন মাটির হাঁড়ি কলসি নির্ম্মিত হইতেছে। একজন কুম্ভকার উক্ত ভদ্রাসন বাটীর এখন অধিকারী। হাস্য-রস-রসিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হো হো হাসিতে যে স্থান মুখরিত হইত, সে স্থানে এখন হাঁড়ি কলসি নির্ম্মাণের পটাপট শব্দ হইতেছে। অথচ তাঁহার বংশ লুপ্ত হয় নাই। শুনিলাম, তাঁহার ভ্রাতার সন্তানেরা আছেন, তবে তাঁহারা পৈতৃক ভদ্রাসন বাটী পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া এখন

কলিকাতাবাসী! সকল কবিরা, সকল মহাপুরুষেরাই কি এরূপ সহৃদয় বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন? বাটীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র উদ্যান। তাহাতে কয়েকটি আম্রবৃক্ষ এখনও আছে। শুনিলাম, এই উদ্যানে একটি ক্ষুদ্র পাকা দোতালা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বৈঠকখানা-বাড়ী ছিল। তিনি এখানেই দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন, এবং 'প্রভাকরে'র প্রবন্ধাবলী লিখিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ মুগ্ধ করিতেন। আমার পিতা তাঁহার কবিতার বড়ই অনুরাগী ছিলেন; এবং তাঁহার চট্টগ্রাম ভ্রমণ সময়ে আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার বেশ একটুক বন্ধুতা হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে সময়ে সময়ে পত্র লেখালেখি হইত। পিতা অবসর পাইলেই 'প্রভাকর' পড়িতেন, এবং তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণকে পড়িয়া শুনাইতেন। পিতা সুকণ্ঠ, সুগায়ক ও সুন্দর ছিলেন। তাঁহার মুখে 'প্রভাকর' পাঠ যে একবার শুনিয়াছে, সে আর তাহা ভুলিতে পারিবে না। পিতার মুখে পুথি শুনিবার জন্য নর-নারী সমবেত হইত, এবং আত্মহারা হইয়া শুনিত। এরূপে পিতার মুখে 'প্রভাকর' ও পুথি পাঠ, এবং ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রশংসা সর্ব্বদা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে যে কবিতানুরাগ সঞ্চারিত হয়, শৈশবেই গুপ্তজার কবিতার অনুকরণে আমি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ জন্য আমি গুপ্তজার কাছে শিষ্যবৎ ঋণী। এই জন্য বড় আগ্রহে তাঁহার ও 'প্রভাকরে'র জন্মস্থান দেখিতে আসিয়াছিলাম। এই বাগানটিও তাঁহার বংশধরেরা বিক্রয় করিয়াছেন! হা ভগবান্! তোমার মনুষ্য-সৃষ্টিতে কি সত্য সত্যই গোবরে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে? শুনিলাম, ঈশ্বরচন্দ্রের কলিকাতায় অবস্থিতিকালেও,—তিনি কোথায় থাকিতেন, তাহা কেহ জানেন না।—কালীপূজার সময়ে আপনার বাড়ীতে আসিয়া খুব আড়ম্বরের সহিত সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কারিণীর পূজা করিতেন। মা! তোর অভয় করে সৃষ্টি, তোর বরদ করে স্থিতি, এবং তোর অসি-করে সংহার। কিন্তু কেবল দরিদ্র কবিরা কি মা! তোর অভয় বরদ করের ছায়া হইতে বঞ্চিত? তোর অভয়-বরদ করেও কি মা! তুই তাহাদিগকে দরিদ্রতা ও দেশের এরূপ অহৃদয়তা হইতে রক্ষা করিতে পারিস্ না? স্ববংশীয়েরা নিপাত হইয়াছে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্বগ্রামবাসীরা, কি স্বদেশীয়েরা কি তাঁহার এই সামান্য জন্মস্থান ও উদ্যানটুকু তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ রক্ষা করিতে পারেন না। অথচ উভয়ের মূল্য অতি সামান্য। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে এবং উদ্যানে দাঁড়াইয়া, দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার ঋণের প্রতিদানে,—কি ঋণের কি প্রতিদান!—বর্ষণ করিয়া বিষণ্ণহৃদয়ে শিবিরে ফিরিলাম।

তাহার পরদিন হালিসহরে কবি ও সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেনের জন্মস্থান দর্শন করিতে যাই। কাঁচড়াপাড়া ও হালিসহর পাশাপাশি গ্রাম বলিলেও চলে। গঙ্গা হইতে কয়েক পা গিয়াই রামপ্রসাদের জন্মস্থান দেখিয়া, এই মহতীর্থস্থানকে আভূতল প্রণত হইয়া নমস্কার করিলাম, এবং তাঁহার ধূলো ললাটে মাখিলাম। আমার সঙ্গিগণ বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। দরিদ্র রামপ্রসাদের ক্ষুদ্র ভদ্রাসন বাড়ীর তিনটি অতি ক্ষুদ্র ভিটা ও তৎসম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর শুষ্ক গর্ভ এখনও বর্ত্তমান। তাহার এক পার্শ্বে বঙ্গদেশখ্যাত রামপ্রসাদের 'পঞ্চমুণ্ডী' সিদ্ধাসন। এইখানে শবসাধন করিয়া রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ। এখনও সেই পবিত্র আসনের উপর পঞ্চবটীর দুই তিনটি বৃক্ষ পবিত্র ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। আর—বলিতে ঘৃণায় লজ্জায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়—এই পবিত্র পীঠস্থান রামপ্রসাদের পশুবৎ হৃদয়হীন গ্রামবাসীরা এক প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করিয়াছেন! আমার বোধ হইতেছিল, আমি রামপ্রসাদের ক্ষুদ্র তিনখানি কুড়িয়া ঘর দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, সেই সিদ্ধাসন রামপ্রসাদ পূজার পুষ্পপাত্রে, চন্দনে, দুর্ব্বায়, তাঁহার ভক্তিসঙ্গীত গাইতে গাইতে সজ্জিত করিয়া, তৈলাক্তকলেবরে টলিতে টলিতে গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন, এবং অপর দিক্ হইতে বাঙ্গালীর আদর্শ আজু গোস্বামী সুরাপায়ী মাতাল বলিয়া বিদ্রূপ করাতে রামপ্রসাদ ভক্তির উচ্ছ্বাসে সমস্ত ভাগীরথীর তীর ও হালিসহর গ্রাম মুখরিত করিয়া গাহিতেছেন—

"ওরে! সুরাপান করি না রে ভাই, সুধা খাই জয়কালী ব'লে।
আজ আমার মন মেতেছে কালী নামে, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥

আমার চক্ষে দর দর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে,—লিখিবার সময়েও আমি সেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ইতিমধ্যে হালিসহরের বহু ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারা সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। একজন বলিলেন,—"আপনি আসিয়াছেন শুনিয়া আমরা বঙ্গদেশের বিখ্যাত কবিকে দেখিতে আসিয়াছি।" আমি গলদশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"আপনারা যাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সে আপনাদের এই দরিদ্র-গ্রামবাসীর একটি চরণ-ধূলার যোগ্য নহে। অথচ তাহার জন্মস্থানটির এই অবস্থা। হালিসহর যেরূপ গণ্ডগ্রাম এবং উন্নত অবস্থাপন্ন, প্রত্যেক ঘর এক টাকা করিয়া চাঁদা তুলিয়া দিলেও রামপ্রসাদের তিনখানি ক্ষুদ্র কুড়িয়া ঘর নির্ম্মিত ও এই ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি খনিত হইতে পারে, এবং এই 'পঞ্চমুণ্ডী' পীঠস্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইয়া, তাহাতে 'প্রসাদমাতা' নামে একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপিত ও নিত্য পূজিত হইতে পারে। বৎসর বৎসর কালীপূজার দিন একটা মেলা হইলে, তীর্থস্থানের মত এই স্থানটুকু কত লোক দর্শন করিতে আসিবে। তাহারা কালীকে যে দর্শনী দিবে, তাহার দ্বারাই এই স্থানটি একটি পবিত্র তীর্থের মত রক্ষিত হইতে পারে।" তাঁহারা বলিলেন,— "হালিসহর যদি আজ রাণাঘাট সবডিভিসনের অন্তর্গত হইত, কিংবা আপনি বারাসতের সবডিভিসনাল অফিসার হইতেন, তবে এ কাজ সহজে হইতে পারিত। আমরা গ্রামবাসীরা এখন বৎসর বৎসর কালীপূজার দিন এখানে কালীপূজা করিয়া, রামপ্রসাদের 'কালীকীর্ত্তন' গান করিয়া থাকি। আমরা আপনার এই আক্ষেপের কথা গ্রামের সকলকে বলিব, এবং আপনার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।" তাঁহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া এবং আমার রাণাঘাট শাসনের বহু প্রশংসা করিয়া, আমাকে বড় সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। আমি গঙ্গা পার হইয়া পর্ত্তুগিস গৌরবের সমাধি ব্যাণ্ডেলে এক বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া গেলাম। হুগলির আরও কয়েক জন শিক্ষিত ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত ছিলেন। যদিও হুগলি হালিসহরের অপর দিকে, তথাপি তাঁহারা কখনও রামপ্রসাদের জন্মস্থান দেখেন নাই বলিয়া লজ্জার সহিত স্বীকার করিলেন। আমার মুখে তাহার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনিয়া বড় দুঃখ করিলেন, এবং বলিলেন— শীঘ্র স্থানটি দেখিয়া তাঁহারাও আমার প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবেন। হালিসহর-বাসীরা, কি তাঁহারা কিছু করিয়াছেন কি না, জানি না। ব্যাণ্ডেল যাইতে গঙ্গার তীরে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম যে, হুগলির জনৈক খ্যাতনামা উকিল তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তখন আমার 'কীর্ত্তিনাশা'র নিম্নলিখিত কবিতাটি মনে পড়িল—

"কীর্ত্তিনাশা মানবের ভীষণ শিক্ষক!
ইষ্টক উপরে করি ইষ্টক স্থাপন,
[illegible] বাসনা যাহার,—
লিখিতে বাসনা যার রজতের ধারে
কালগর্ভে অমরতা,—আসি একবার
রাজবল্লভের এই কীর্ত্তির শ্মশানে।
দেখুক তোমার নীরে স্তম্ভিত নয়নে,
তাহার অদৃষ্টলিপি ; ভাবী সমাচার
তব মৃদু কলকলে শুনুক শ্রবণে।"

ভাবিলাম, ইহাঁর অট্টালিকা দেখিতে কোনও শৃগাল কুকুরও কখন আসিবে না, আর দরিদ্র রামপ্রসাদের মাটির ক্ষুদ্র ভিটা দেখিতে আমার মত কত তীর্থযাত্রী অনন্তকাল আসিবে। ভাবিলাম, ইহাঁর অট্টালিকার যখন চিহ্নও থাকিবে না, তাঁহার মানব-শোণিত-শোষী উকিলি কীর্ত্তি তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে যখন বিলুপ্ত হইবে, তখনও রামপ্রসাদের এই

মাটির ভিটা থাকিবে, কি ভিটার স্থান থাকিবে, হয় ত তাহাতে দেবালয় নির্ম্মিত হইয়া স্থানটি সত্য সত্যই তীর্থস্থানে পরিণত হইবে এবং রামপ্রসাদের নাম দেবনামবৎ ও তাঁহার ভক্তিসংগীত দৈব প্রসাদবৎ বঙ্গদেশের নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া, তাহাদের হৃদয়ে শান্তি ও পবিত্রতা বর্ষণ করিবে। যদি এই উকিলপুঙ্গব এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে তাহার অতিরিক্ত ইট কাঠে রামপ্রসাদের জন্মস্থানে একটি সামান্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, একটি মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তিও স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে রামপ্রসাদের কৃপা-প্রসাদে তিনি এই উকিলি গতি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া হয় ত সদ্গতি প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহার অট্টালিকার অপেক্ষা এই ক্ষুদ্র মন্দির তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া, তাঁহার নাম একটি পুণ্য-স্মৃতিসংযুক্ত করিয়া দিত। রামপ্রসাদ আমার গ্রামবাসী হইলে আমি একক এ স্থানটি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতাম।

বঙ্গদেশে, বিশেষ হুজুগের পীঠভূমি কলিকাতায় 'শোকসভা'র 'স্মৃতি-সভা'র বিকল্পে 'স্মরণ-সভা'র ধূম পড়িয়া গিয়াছে। 'সাহিত্য-পরিষৎ', 'সাহিত্য-সভা' ও 'সাহিত্য-সম্মিলনী'র ত ছড়াছড়ি। সে দিন দেখিলাম, কলিকাতার রঙ্গালয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বার্ষিক 'স্মৃতিসভা' হইয়া গিয়াছে। যখন কাজের মধ্যে বাঙ্গালীর একমাত্র কার্য্য বক্তৃতা, তখন 'শ্রুতিসভা' বলিলে বোধ হয় অধিক সঙ্গত হয়। যদি এরূপে সভার ও বক্তৃতার দ্বারা ইহাঁদের শ্রাদ্ধ না করিয়া, এই সকল সভা ও বক্তৃতাকারীরা ইহাঁদের ও বঙ্গের প্রাচীন কবিদিগের জন্মস্থানগুলি রক্ষা করিয়া, তথায় বৎসর বৎসর সাহিত্যসেবীরা সমবেত হইয়া একটা দেবপূজার উৎসবের মত উৎসব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হয়, এবং সম্মিলনের কার্য্যও হয়, বঙ্গসাহিত্যেরও গৌরব ও উন্নতি সাধিত হয়। বৈষ্ণব কবি জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির জন্মস্থান দরিদ্র বৈরাগীরা এরূপ তীর্থস্থানে পরিণত করিয়া, তাহাতে বৎসর বৎসর উৎসব করে। আমরা ইংরাজী সভ্যতার ও শিক্ষার কল্যাণে এই 'স্বদেশী' পুণ্যপথটিও হারাইয়া, এখন হৃদয়হীন ও হাস্যকর 'শোকসভা'র ও 'স্মৃতিসভা'র ছড়াছড়ি করিতেছি। মধুসূদনের দেশীয় যশোহরবাসীরা তাঁহার জন্মস্থানে পূর্ব্বপ্রথামতে বার্ষিক উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের, তদীয় 'বঙ্গদর্শনে'র ও উপন্যাসাবলীর জন্মস্থান তাঁহার নৈহাটিস্থ বৈঠকখানা-বাড়ীটি রক্ষা করিয়া, তাহাতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিকৃতি স্থাপিত করিয়া 'শোকসভা' বা 'স্মৃতিসভাটা' সেখানে করিলে বোধ হয়, উহা স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ও বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে অধিক তৃপ্তিকর হইবে। নৈহাটি গঙ্গাতীরে, এবং কলিকাতা হইতে ঘণ্টাখানেকের পথ। বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীও রেলওয়ে ষ্টেশন-সংলগ্ন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামে। রেলসংলগ্ন কি না, জানি না। না হইলেও বীরসিংহ অঞ্চলের লোকেরা তাঁহার জন্মস্থানে সহজে একটা বাৎসরিক উৎসব করিতে পারেন। 'সাহিত্য-পরিষৎ' বঙ্গ-সাহিত্যের এই তীর্থস্থানগুলির সংরক্ষণে হস্তক্ষেপ করিবেন কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য তাঁহাদের আর কিছু নাই। বৎসর বৎসর বঙ্গের এই অমর বরপুত্রদের পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া, তাঁহাদের চরণতলে যাহার যথাসাধ্য প্রণামী দিলে, এই অর্থের দ্বারা এই তীর্থগুলি রক্ষিত হইতে পারিবে। বঙ্গসাহিত্য-সেবীদের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সম্মিলনের ও বঙ্গসাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্র আর কি হইতে পারে? বৈরাগীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাহিত্যসেবীরা ভারতচন্দ্রের, মুকুন্দরামের, রামপ্রসাদের, কৃত্তিবাসের, কাশীদাসের, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগরের, মধুসূদনের, দীনবন্ধুর, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান সংরক্ষণ-ব্রতে ব্রতী হইলে কেবল বঙ্গসাহিত্য গৌরবান্বিত হইবে এমন নহে, আমরাও মানুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব।

ম্যাজিষ্ট্রেট-মিশনারি

"The force of nature could no further go.
To make a third she joined the other two."

মাজিষ্ট্রেট দেখিয়াছি—ভীষণং ভীষণানাং। মিশনারি দেখিয়াছি—মধুরং মধুরাণাং॥

কিন্তু মাজিষ্ট্রেট-মিশনারি কি কেহ দেখিয়াছ? এক ভৃত্যকে মুনিব মধুসিংহের বাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। সে নাম ভুলিয়া গিয়াছে। এই মাত্র মনে আছে যে, নামটির প্রথম ভাগ মিষ্ট, দ্বিতীয় ভাগ ভীষণ। সে লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, 'গুড় ব্যাঘ্রে'র বাড়ী কোথায়? মাজিষ্ট্রেট-মিশনারিও এক প্রকার 'গুড়-ব্যাঘ্র'। জন্মপত্রিকায় আমার বন্ধুর স্থানে শনি। এ জীবনে আমার যত দুর্গতি, যত বিপদ্ ঘটিয়াছে, সকলই সুবন্ধু-কৃত। যেখানে গিয়াছি, সেখানেই বন্ধু একজন 'আত্মারাম সরকার' সাজিয়া পৃষ্ঠদংশনের দ্বারা আমার সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। যে কয়েক দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, সে সকলের নায়ক কালাচাঁদ,—ঢোড়া সাপ! রাণাঘাটে যাঁহার দন্তে পড়িয়াছিলাম, তিনি গোরাচাঁদ—জাতিসর্প। রাণাঘাটে পেঁছিয়াই শুনিলাম যে, একজন ভূতপূর্ব্ব নামজাদা দুর্দ্দান্ত মাজিষ্ট্রেট-মিশনারি হইয়া রাণাঘাটে আসিতেছেন। তিনি যেখানে যেখানে মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাঁহার প্রচণ্ড শাসনের ফলে সেই সকল স্থানের মাটি পর্য্যন্ত এখনও তাঁহার নামে ভয়ে কম্পিত হয়। তাহার পর পুলিসের কর্ত্তাগিরি করিয়া তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তিনি সেখানে গিয়া পুলিসের কর্ত্তা হন। কিন্তু ভারতের 'নবাব'দিগের সেখানে নিশ্বাস বহিবে কেন? এখানের মুগুর, সেখানের কুকুর। এখানের লীলা, সেখানে প্রহসন হইয়া পড়ে। কাজেই বিলাতের জল বাতাস ভারতের দুরন্ত মাজিষ্ট্রেটকে মিশনারি করিয়া যেখানের মাল, আবার সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছে! সত্য কি মিথ্যা জানি না, গল্প উঠিয়াছে যে, কে একজন নিঃসন্তান ধনী মরিবার সময়ে তাঁহার বিপুল অর্থ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই প্রভু তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন যে, মিশনারিরা যে ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছে, তাহাতে কোনও ফল হইতেছে না। তিনি একজন ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ লোক, অতএব তিনি নূতন ভাবে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারত উদ্ধার করিবেন। মুমূর্ষু তাহাতে লক্ষ টাকা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে, এবং তিনি সেই অর্থ লইয়া মাজিষ্ট্রেট-মিশনারি সাজিয়া আসিতেছেন, এবং পাল চৌধুরীদের বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন! অপূর্ব্ব সংবাদ। সেই দুর্দ্দান্ত মাজিষ্ট্রেট-মিশনারি, আর তাঁহার প্রচারের স্থান রাণাঘাটে! কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি তাঁহার অধীনে ডেপুটিগিরি আরম্ভ করিয়াছি। তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিতেন। তিনি প্রেসিডেন্সি কমিশনর থাকিতে আমাকে একবার রাণাঘাটে আনিতে আশা দিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার দুর্ব্বাসা-প্রকৃতি স্মরণ করিয়া আমার মনে ঘোরতর আশঙ্কা হইল। ধর্ম্ম-প্রচারার্থ এই শুভাগমনসংবাদ দিলেন কে,—না যিনি উক্ত প্রভুর সর্ব্বজন-অভিশপ্ত এবং সর্ব্বজনভীতিপ্রদ গোয়েন্দা বা চুক্‌লিখোর ছিলেন, তিনি। যেমন দেবতা, তেমন বাহন। বুঝিলাম, প্রভু যেমন মিশনারি, ইনি তাঁহার উপযুক্ত 'সুসমাচার'-(gospel) বাহক! ইনি আমাকে এক পত্রও দেখাইলেন। প্রভু লিখিয়াছেন—আমি রাণাঘাটের সবডিভিসনাল অফিসার শুনিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তথাপি আমার আশঙ্কা কেমন আরও বৃদ্ধি হইল।

আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি রাণাঘাটে অবতীর্ণ হইয়া, বারবনিতাদের ভূতপূর্ব্ব প্রমোদ-ভবন একটা বাগান-বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি এখন প্রৌঢ়, কিন্তু এখনও তাঁহার সেই উগ্র মাজিষ্ট্রেট-মূর্ত্তি। তাহাতে মিশনারির গন্ধ মাত্র নাই। তিনি আসিয়াই আমাকে পত্র লিখিলেন যে, নিকটস্থ উদ্যান হইতে ভোঁদড় (weasel) আসিয়া তাঁহার মুর্গি হত্যা করিয়াছে, অতএব এই খুনের প্রতিবিধান করিতে হইবে। আমি মহা-বিপদে পড়িলাম। সেই ভোঁদড়ের নামে সমন ওয়ারেণ্ট কিছুই চলে না। সে যে নিকটস্থ উদ্যানে তাহার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের এই 'নব-বিধানে'র এরূপে বিঘ্ন

করিতেছে, তাহারও প্রমাণাভাব। পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টারকে ডাকিলাম। তিনি বলিলেন —অজ্ঞাত ভোঁদড় শাসন বা মুর্গি 'মার্ডার' (murder) তাঁহার শ্রবণীয় অপরাধ (cagnizable crime) নহে। তখন পার্শ্বস্থ উদ্যান-স্বামীকে ডাকিলেন। তিনি not guilty (নির্দ্দোষী) বলিয়া কবুল জবাব দিয়া বলিলেন—"মহাশয়, খোঁড়া আসিয়াই সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার কাছেও এক পত্র লিখিয়াছে। আমি ভোঁদড় বেটাকে কোথায় খুঁজিয়া পাইব? সেই অজ্ঞাতনামা ভোঁদড়ের কর্ম্মের জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না।" অথচ কিছু না করিলে, তখনই খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার-কার্য্যটার আরম্ভ আমার উপরেই হইবে। অতএব উদ্যান-স্বামীকে অনুনয় করিয়া তাঁহার উদ্যানের জঙ্গল পরিষ্কার করিতে আদেশ দিলাম, এবং প্রভুর কাছে মুর্গি-হত্যার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম। আবার পরদিন প্রাতে পত্র আসিল —"খবরদার! আবার আজ রাত্রিতে ভোঁদড় আমার মুর্গি মারিয়াছে।" এবার আমি সঙ্কল্প করিলাম যে, ভোঁদড়কুল নির্ম্মূল করিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের 'প্রতিনিধি বলিদানে'র (vicarious sacrifice) একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগৎকে দেখাইব। তাঁহাকে লিখিলাম যে, আমি উক্ত-রূপ আদেশ পুলিসকে দিয়াছি। তিনি পুলিসের মহাপ্রভু ছিলেন। তিনি জানেন যে, পুলিসে আদেশ প্রেরণ করা ইংরাজ-রাজ্যের চরম সাধন। পুলিসের ভয়েই হউক, আর যে কারণেই হউক, ভোঁদড়-পর্ব্ব এখানে শেষ হইল। তাহার পর বনগাঁয়ের বদমায়েস-পর্ব্ব আরম্ভ হইল। তাহা পূর্ব্বে আখ্যায়িত করিয়াছি। একা মাজিষ্ট্রেট, কি একা কমিশনরই আমার ডেপুটি-লীলা শেষ করিতে পারে। আর আমার গৃহদ্বারে একাধারে মাজিষ্ট্রেট কমিশনর ও লেঃ গবর্ণরের এরূপ সম্মিলিত ত্রিমূর্ত্তি স্থাপিত হইল। পৌত্তলিক আমার হিন্দুর ধর্ম্মেও এরূপ সম্মিলিত ত্রিমূর্ত্তি নাই। সম্মিলিত দুই মূর্ত্তির অধিক এই পৌত্তলিকদের কল্পনা উঠে নাই। অতএব আমার অবস্থা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার হুকুম তামিলের জন্য আমার একটা স্বতন্ত্র দপ্তর খুলিতে হইল। তিনি কখন লেখেন রাণাঘাটের ইন্দারার কাছে কতগুলি লোক বসিয়া আছে। অবশ্য তাহাদের উদ্দেশ্য—উহার জল নষ্ট করিবে। আমি তাহার কি প্রতিবিধান করিলাম, তিনি তাহার কৈফিয়ৎ চাহেন। কখনও দোকানদারগণ দোকানঘরের সম্মুখে তাহাদের চিরপ্রথা অনুসারে ড্রেনের উপর তক্তা দিয়া দোকান পাতিয়াছে বলিয়া আমার কৈফিয়ৎ তলব হইল। একবার রাণাঘাটে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইল। ম্যালেরিয়াদেবীর উপর ওলাদেবী এরূপে সময়ে সময়ে তাঁহার পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমি তাহা নিবারণের জন্য অশেষ চেষ্টা করিলাম। প্রায় দেড় মাস চলিয়া গেল, কিছুই হইল না। তাহার পর পুলিস-রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, বহু দূরে নদীয়ার এলাকায় প্রথম ওলাউঠা আরম্ভ হইয়া, উহা যেন চূর্ণীর স্রোতের সঙ্গে ক্রমে পরবর্ত্তী গ্রামসমূহে ও রাণাঘাটে ভাসিয়া আসিয়াছে। আরও দেখিলাম, যত দূর স্থান ব্যাপিয়া চূর্ণীর জল ব্যবহৃত হইতেছে, তত দূর স্থান ব্যাপিয়াই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব। তখন আমি চূর্ণীর তীরে পুলিসের পাহারা বসাইয়া দিয়া তাহার জলস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিলাম। রাণাঘাটের লোক ক্ষেপিয়া উঠিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহাদের প্রতিনিধি হইয়া আমার কাছে আসিলেন, এবং চূর্ণীর জল-ব্যবহার বন্ধ করাতে লোকের ভয়ানক কষ্ট হইয়াছে বলিলেন। তিনি বলিলেন, কেবল ওলাউঠা-দূষিত কাপড় প্রক্ষালন বন্ধ করিলে জল-দোষ দূর হইবে। কিন্তু কোন্ কাপড় এরূপ দূষিত, এবং কোন্ কাপড় নহে, তাহা পুলিস কিরূপে জানিবে? তাহা ছাড়া রমণীগণ আপনার বসনের মধ্যে কাপড় লুকাইয়া লইয়া গিয়া, নদীতে প্রক্ষালন করিয়া, সমস্ত নদীর জল বিষাক্ত করে। পুলিস তাহা নিবারণ করিতে গিয়া কোনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিলে একটা খণ্ড প্রলয় হইবে। তিনি তথাপি আমার বন্ধুতার ও বিশ্বাসের প্রতিকূলে লোক-তাড়নায় প্রভুর কাছে আমার বিপক্ষে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। আমার কৈফিয়ৎ তলব হইল, এবং তাহা

প্রদত্ত হইল। তিনি তথাপি মাজিষ্ট্রেট কলিন (Collin) সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিয়া আনাইয়া লইলেন। আমি গাড়ী করিয়া তাঁহাকে আমার সমস্ত বন্দোবস্ত দেখাইলাম ও সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন—"মানুষের যাহা সাধ্য, আপনি সকলই করিয়াছেন। তথাপি ইনি এ গোলযোগ করিতেছেন কেন?" ইনি 'সার্ভিসে' থাকিতে তাঁহার সঙ্গে কলিনের পরিচয় ছিল কি না, আমি মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তিনি কি এখনও সেইরূপই আছেন?" আমি বলিলাম—"ঠিক সেরূপ, কেবল অফিসিয়াল দায়িত্বশূন্য।" কলিন আর তাঁহার গৃহে না গিয়া, ১০টার ট্রেনে কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। প্রভু তাহার পর ওয়েষ্টমেকটকে টেলিগ্রাম করাইয়া আনাইয়া লইলেন। মিউনিসিপ্যাল কমিটি বসিল, আমার ও রাণাঘাটের চেয়ারম্যান সুরেন্দ্রবাবুর কৈফিয়ৎ তলব হইল। আমরা বলিলাম যে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা ওলা-দেবীর সহিত যেরূপ যুদ্ধ সম্ভব, আমরা তাহা দুই জনে পরামর্শ করিয়া করিয়াছি। সুরেন্দ্রবাবুও এখন চূর্ণীর জল বন্ধের উপকারিত্ব অনুভব করিয়াছেন। কারণ, সেই হইতে ওলাউঠা দিন দিন কমিতেছে। প্রভু কিছু ফাঁক পাইলেন না। তখন তিনি দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"মিঃ ওয়েষ্টমেকট! ইহাঁরা দুজন আমার পুত্রের ঘোরতর অপমান করিয়াছেন। আমার পুত্র এক রোগীর চিকিৎসা করিতেছিল। ইহাঁরা তাহাকে কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাদের নিয়োজিত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের হাতে দিয়াছেন। তোমার কাছে আমি ইহার প্রতিবিধান চাহি।" আমরা বলিলাম—আমরা ইহার কিছুই জানি না। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একজন নিযুক্ত করিয়াছি মাত্র কারণ, অনেকে ওলাউঠায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষপাতী। যাহার খুসি, সে তাহাকে ডাকাইয়া চিকিৎসা করাইতেছে। তখন গরিব 'হৈমবতী' বেচারিকে তলব হইল। মিশনারি প্রভু তাহাকে দেখিয়া গিলিয়া ফেলিতে চাহিলেন। সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল যে, সাহেবের পুত্র যে সেই রোগীর চিকিৎসা করিতেছিলেন, তাহা রোগী, কি সাহেবের পুত্র, কেহই তাহাকে জানান নাই। পুত্র পিতার মত ক্রোধের ও জিদের অবতার নহেন। তিনিও তাহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, ওয়েষ্টমেকট—"তবে আর কার্য্য নাই" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া একেবারে রেলওয়ে ষ্টেশনে গেলেন। আমাকে ট্রেনে উঠিয়া বলিলেন যে, তিনি প্রভুর অধীনে কার্য্য করিয়াছেন। তিনি বড় ভয়ানক লোক (terrible man)। অতএব আমাকে খুব সতর্ক করিয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাহার দুই চার দিন পরে আমি শিবিরে যাইতেছি, প্রভুও কোথায় যাইতেছিলেন। ষ্টেশনে আমাকে দেখিয়া তিনি একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। আমাকে বলিলেন—"তুমি এখনও চূর্ণীর জল বন্ধ রাখিয়াছ?" আমি বলিলাম —"ওলাউঠা জল-বন্ধের পর হইতে কমিয়া দুই তিন দিন যাবৎ অদৃশ্য হইয়াছে। অতএব আরও দুই চার দিন বুঝিয়া আমি নদীর জল ব্যবহার করিতে দিব।" ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কাঁপিতে কাঁপিতে ট্রেনে উঠিয়া বলিলেন—"তুমি রাণাঘাটের লোকের উপর যে অত্যাচার করিতেছ, আমি লেঃ গবর্ণর সার চার্লস্ ইলিয়টকে জানাইব।"

রাণাঘাটে আসিয়া, অন্য এক বাড়ী ভাড়া করিয়া, তিনি এক 'হস্পিটাল' খুলিলেন। তাঁহার পুত্র তাহার ডাক্তার। তাঁহার কন্যা ও তিনি ধর্ম্মপ্রচারার্থ তেলী মালীর বাড়ী পবিত্র করিতে লাগিলেন। কারণ, ভদ্রসমাজকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার আশা নাই। সময়ে সময়ে কন্যা একাকিনী যাইতেন। আমার আর এক উৎপাত বাড়িল। কোথাও ইহাঁর সহিত কোনও তেলী মালীর ব্যবহারে পান হইতে চূণ খসিলে প্রভু রাণাঘাটে একটা আগুন জ্বালাইবেন। সত্য সত্যই এক বাড়ী হইতে তাঁহাকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। যাহা হউক, এ অবধি প্রথমতঃ কন্যার, পরে তাঁহার নিজের প্রচারকতা বন্ধ হইল। আমারও নিশ্বাস পড়িল। হস্পিটালের কার্য্য চলিল। লোকে বলিতে লাগিল যে, তাঁহার পুত্রের হাত পাকাইবার জন্য তিনি এই ফিকির

বাহির করিয়াছেন। বাঙ্গালী হুজুগ-প্রিয় জাতি। বিলাত হইতে সাহেব আসিয়া, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করিতেছে শুনিয়া, বহু দূর হইতে পর্য্যন্ত প্রথমতঃ শত শত রোগী আসিতে লাগিল। 'তোমরা শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ, কিন্তু ভবরোগের চিকিৎসার কি করিতেছ?'—এরূপ বহুবিধ মহামূল্য প্রশ্নাবলী প্রেস্‌ক্রিপশনের পৃষ্ঠে বড় অক্ষরে ছাপা আছে, এবং উহা এক চোঙ্গাতে দেওয়া হইয়া থাকে। শেষে প্রচারকার্য্যটা এই চোঙ্গার দ্বারা চলিতে লাগিল। ইহাতে আর এক উৎপাত সৃষ্টি হইল। চূর্ণীর ফেরিঘাটের জন্য ফেরিওয়ালাকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে বৎসর ৫০০০্ টাকা দক্ষিণা দিতে হয়। যত লোক হাট বাজার এবং মোকদ্দমা ও অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষ্যে রাণাঘাট আসিত, কি স্থানান্তরে যাইত, তাহারা ভবরোগের ঔষধির এক এক শিশি, কি চোঙ্গা পকেটে করিয়া আসিয়া, সাহেবের ডাক্তারখানায় যাইতেছে বলিয়া, বিনা পয়সায় পার হইতে চাহিত। যাহারা সত্য সত্যই ছাপা প্রেস্‌ক্রিপশন দেখাইত, ফেরিওয়ালা প্রভুর ভয়ে তাহাদের ছাড়িয়া দিত। তাহার প্রভুর ক্ষতি হইতে লাগিল, এবং সে আমার কাছে বার বার নালিশ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও রক্ষা নাই। পরে ফাঁকা শিশি পকেটে, কি হাতে লইয়া বহু লোক এরূপ ফাঁকি খেলিতে লাগিল। ঘাটওয়ালা তাহাদের বিনা পয়সায় ছাড়িতে আপত্তি করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে দুষ্ট কেহ কেহ গিয়া সাহেবকে বলিল যে, তাহারা ফেরিওয়ালার উৎপীড়নে ভব-রোগের ঔষধির জন্য আসিতে পারিতেছে না। সে মুক্তির পথে মহাকণ্টক হইয়াছে, এবং ভবরোগের রোগীদের কাছে 'ডবল টোল' আদায় করিতেছে। তাহারা গাইল—

> "সাহেব, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
> তুমি পারের কর্ত্তা, বোলে কর্ত্তা ডাকি হে তোমারে॥
> কড়ি নাহি যার, তুমি কর তারে পার,
> আমি দিনভিখারী, নাহিক কড়ি, দেখ চোঙ্গা ঝেড়ে।"

বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িয়া হু-হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। প্রভু তৎক্ষণাৎ অশ্ব-পৃষ্ঠে আসিয়া প্রথম ফেরিওয়ালার উপর, তাহার পর পুলিসের উপর, সর্ব্বশেষ আমার গৃহের সম্মুখে আসিয়া আমার উপর প্রজ্বলিত হুতাশন বর্ষণ করিলেন। আমাকে আবার ধমকাইলেন—"তোমার নাকের উপর ফেরিওয়ালা জোর করিয়া, টোলের অতিরিক্ত পয়সা লইয়া, লোকের উপর এরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, আর তুমি কিছুই করিতেছ না। অথচ তুমি আমারই কাছে কাজ শিক্ষা করিয়াছিলে। হুঁ হুঁ, তুমি নিশ্চিত জানিও এই কথা আমার বন্ধু সার চার্লস্ ইলিয়ট শুনিবেন।" অশ্বে কষাঘাত করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ফেরিওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া, আমার বারান্দায় কাতলা মাছের মত ধপাস্ করিয়া পড়িয়া, কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই হুজুর! খোঁড়া সাহেব আমার সর্ব্বনাশ করিল। আমাকে রক্ষা কর। ফেরি এস্তাফা লইয়া গরিব আমার পরিবারকে বাঁচাও। সমস্ত লোক এখন চোঙ্গা, কি শিশি হাতে করিয়া বিনা পয়সায় পার হইতে চাহে।" তাহার এই ভব-রোগের চিকিৎসার জন্য আমি তাহাকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে দরখাস্ত করিতে বলিলাম। সে চলিয়া গেলে পুলিস সবইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! আমার উপায় কি? খোঁড়া আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আমাকে যে ধমকান ধমকাইয়াছে, আমার পিলে উল্টাইয়া দিয়াছে।" আমি 'পিলে'টি আবার সোজা করিয়া দিয়া বলিলাম, ধমকটা এত্তেলার মত আমার কাছে লিখিয়া পাঠাইলে আমি তদন্তের আদেশ দিব। কারণ, অপহরণ (extortion) পুলিস-শ্রবণযোগ্য অপরাধ নহে। তিনি বলিলেন—"খোঁড়া তাহাও নিষেধ করিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে—সে নিজে মাজিষ্ট্রেটের কাছে লিখিবে।" আমি তখন প্রভু আমার কাছে ঐরূপ বলিয়াছেন বলিয়া তদন্তের আদেশ দিলাম। তাহার পরদিনই মাজিষ্ট্রেট এ সম্বন্ধে এক রিপোর্ট চাহিলেন। বলা বাহুল্য, প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাছে আমার জন্য পুষ্প-চন্দন পাঠাইয়াছেন।

তখন তিনি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনি প্রভুর কিরূপ আত্মীয় ছিলেন। প্রভু দেমাক করিয়া আমাকে ধমকাইয়া বলিতেন যে, ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা এক শয্যা প্রস্তুত থাকে। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে উত্তরে পুলিসকে তদন্তের আদেশ দিয়াছি বলিয়া লিখিলাম এবং ফেরিওয়ালা যে, খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে বিনা পয়সায় পার করিয়া দিতে চাহে না, বরং ঘাট এস্তাফা দিতে চাহে, তাহাও লিখিলাম। বলা বাহুল্য, পুলিস ভয়ে ফেরিওয়ালাকে চালান দিল। আট জন সাক্ষীর জবানবন্দি করিলাম, কেহ তাহার প্রতিকূলে একটা কথাও কহিল না। নূতন সাক্ষী পাঠাইতে পুলিসের উপর এক কড়া হুকুম পাঠাইলাম। সবইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া বলিল যে, সাহেবের কাছে যাহারা ডবল টোল লওয়ার কথা বলিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে চেনেন না। অতএব সবইন্‌স্‌পেক্টর কেমন করিয়া তাহাদের উদ্দেশ করিবে। সে গ্রামকে গ্রাম জবানবন্দি করিয়াছে, কেহ ফেরিওয়ালার বিপক্ষে কিছুই বলে না। তথাপি আমার আদেশমতে পুলিস ঐরূপ রিপোর্ট করিয়া, যাহারা সাহেবের ভবরোগের ঔষধ সেবন করিয়াছে, এমন আট জন সাক্ষী পাঠাইল। তাহারা বরং বিবাদীকে সার্টিফিকেট দিল। আমি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিলাম। প্রভু তখনই বোধ হয়, আমার প্রতিকূলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পত্র লিখিয়াছিলেন। কারণ, পরদিনের ডাকে এই মোকদ্দমার নথি তলবের আদেশ আসিল। উহা প্রেরিত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট কথাটি না কহিয়া উহা তৎক্ষণাৎ ফেরত পাঠাইলেন। ভবরোগ চিকিৎসার পালা এখানে সাঙ্গ হইল।

কিন্তু 'ম্যাজিস্ট্রেটি-মিশনে'র কার্য্য ফুরাইল না। শুনিয়াছিলাম, সার চার্লস্‌ ইলিয়ট আদর করিয়া এই পথে যাতায়াতের সময়ে প্রভুর এই কীর্ত্তি পার্ষদগণকে দেখাইতেন। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট থাকিবার সময়ে যাহারা তাঁহার 'গোয়েন্দা' ছিল, এখন মিশন-কার্য্যে তাহারা সকলে যোগ দিয়াছে, এবং গোপনে যাতায়াত করে বলিয়া রাণাঘাটে জনরব উঠিল। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন যে, প্রভুও গবর্ণমেণ্টের গোয়েন্দা। রাণাঘাট বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থল বলিয়া, তিনি অলক্ষ্যভাবে কার্য্য করিবার জন্য এখানে আসন পাতিয়াছেন। তিনি দুর্ম্মুখ, 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' তাঁহার সীতা। অবশ্য এ সকল কথা দেবনিন্দা বা ধর্ম্মযাজকের নিন্দা ; এ সকল বঙ্গদেশের 'ফ্যারিসি' ও 'স্যাডুসি'দের কার্য্য। তাহা সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, রাণাঘাটেও তাঁহার একটি গুপ্তচর ছিল। সে লোকটি রাণাঘাটের সর্ব্বজন-ঘৃণিত। সে তাঁহার দ্বারা এ পদে বরিত হইয়া, তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। এ লোকটি কবিকঙ্কণের 'ভাঁড়ু দত্ত'। শুনিয়াছি, সে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্গে বরাবর সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া খুব তৈলমর্দ্দন করিত, এবং তাঁহার সঙ্গে তাহার পরম আত্মীয়তার এই প্রমাণ দিয়া বেশ দু-পয়সা রোজগার করিত। প্রথম দিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া 'ভাঁড়ু দত্ত' যখন তৈলমর্দ্দন অতিরিক্ত রকম করিয়া গেল, আমার মনে কেমন সন্দেহ হইল। আমি সুরেন্দ্রবাবুকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! আপনি কি এক দিনেই লোকটাকে চিনিয়া ফেলিলেন?" তিনি তখন আমাকে তাহার উপাখ্যান বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন। অথচ লোকটি রাণাঘাটের একটি ভদ্রপরিবারের লোক ; বৃদ্ধ এবং দুরবস্থাগ্রস্ত। কর্ম্মে অক্ষম হইলেও সুরেন্দ্রবাবু দয়া করিয়া তাহাকে কোনও মতে মিউনিসিপ্যাল আফিসের একটা চাকরিতে রাখিয়াছেন। 'ভাঁড়ু' বুঝিল যে, আমার কাছে তাহার ভাঁড়ুগিরির সুবিধা হইবে না। সেই সময়ে প্রভু রাণাঘাটে উদিত হইলেন। তাহার গোয়েন্দা-প্রিয়তা দেশ-প্রচলিত। সে তখনই সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। সে প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে তাঁহার দরবারে যাইত, এবং রাণাঘাটের সকল নরনারীর সুনামের শ্রাদ্ধ করিয়া আসিত। বলা বাহুল্য, আমার প্রতি তাহার বিশেষ সুনজর। তাহার চুকলিতে অন্য পরে কি কথা, স্বয়ং সুরেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি এক এক দিন মিশনারি প্রভুর দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আসিয়া বলিতেন—"মহাশয়! আর পারিলাম না। এ বেটাকে তাড়াইতে হইল। সে মিউনিসিপ্যাল আফিসের কথা খোঁড়ার কাছে

চুকলি কাটিয়া, আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে।" কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু বড় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। আবার 'ভাঁড়ু' গিয়া তাঁহার কাছে কাঁদাকাটা করিলে, বিশেষতঃ চাকরি লইলে সে সপরিবার তাঁহার স্কন্ধে পড়িবে বলিলে, তিনি তাহাকে গালি দিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। আমাকে হাত করিবার জন্য সে সময়ে সময়ে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতার, এবং সেখানে তৎকর্ত্তৃক আমার গুণানুবাদের কথা এরূপ ভাবে বলিত—"দেখ, ভাল নহে। আমাকে হাতে না রাখিলে তুমি বিপদে পড়িবে।" আমার পূর্ব্ববর্ত্তী চাকদহ মিউনিসিপ্যাল আফিসে তাহার এক অকর্ম্মণ্য পুত্রকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। আমি তাহাকে বিদায় দিয়াছি। ভাঁড়ুর আক্রোশ আমার উপর চরম সীমায় উঠিয়াছে। এমন সময়ে আবার রাণাঘাটের কমিশনরগণ তাহাকেও তাড়াইবার জন্য দলবদ্ধ হইয়া তাহার বেতন কমাইলেন। ইহাতে অবশ্য সুরেন্দ্রবাবুর ইঙ্গিত ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তখন 'ভাঁড়ু' জব্দ হইয়া তাহার চুকলি-ব্যবসায় ছাড়িয়া দিবে। 'কুকুরের পুচ্ছ কভু সোজা হয় না।' সে বরং প্রভুকে বুঝাইয়া দিল, সে কেবল তাঁহাকে সকল খবর দেয় বলিয়া, তাহার অন্ন মারা যাইতেছে। অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া প্রভু আমাকে তৎক্ষণাৎ তলব দিলেন। আমি গেলে, গর্জ্জন করিয়া 'ভাঁড়ু'র বেতন সম্বন্ধে কি করিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি রাণাঘাটের চেয়ারম্যান নহি, আমি তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না। আমার কিছু করিবার ক্ষমতাও নাই। "ক্ষমতা নাই!"—বলিয়া চীৎকার করিয়া, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন—"অথচ তুমি আমার কাছে কাজ শিখিয়াছিলে। আমি তোমার জন্য লজ্জিত হইলাম। তোমার হাতে পেনেল কোড আছে, তোমার ক্ষমতা নাই! I want সুবিচার (আমি সুবিচার চাহি)। গরীব 'ভাঁড়ু' কার্য্যের অক্ষম হইয়া থাকে, তাহারা তাহাকে পদচ্যুত করুক দেখি। তাহার বেতন ৫্ টাকা কমাইবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। তুমি না দেখ, আমি দেখিব—তাহারা কেমন করিয়া এমন 'অবিচার' করে।" আমি আর কথাটি না কহিয়া চলিয়া আসিলাম। সুরেন্দ্রবাবুকে ডাকিয়া সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন —"বেটার কিছুতেই শিক্ষা হইল না। চাকরিটি গেলে উপবাসে মরিবে। খোঁড়া আমাকে ডাকিয়া লইয়াও খুব ধমকাইয়াছে।" আমি কিছু না লিখিয়া, ভাঁড়ুর বেতন-কর্ত্তনের মন্তব্য উপর দিকে প্রেরণ করিলাম। এবার প্রভু নিজে মাজিস্ট্রেট গেরেটের ও ওয়েষ্টমেকটের কাছে গিয়া দরবার করিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা অস্ত্র চালাইবার কোনও ফাঁক পাইলেন না। 'ভাঁড়ু'র মাহিয়ানা ৫্ টাকা কমিয়া গেল। তাহার উপর ভাঁড়ু রাণাঘাটের লোকের উপহাসে ক্ষেপিয়া উঠিল।

কিছু দিন পরে ভাঁড়ু তাহার প্রতিহিংসার সুযোগ পাইল। যিনি অগ্রণী হইয়া তাহার বেতন কমাইয়াছিলেন, তিনি কলিকাতার গ্রাহাম (Graham) কোম্পানির চাকর। রাণাঘাটেও তিনি এক কেরোসিনের (depot) দোকান করিয়াছেন। সম্প্রতি রাণাঘাট ষ্টেশনে গ্রাহাম কোম্পানি একটা tank (বড় গর্ত্ত) করিয়া, তাহাতে কেরোসিন তৈল রাখিবার এবং পাইপের দ্বারা তাঁহার দোকানে তৈল যোগাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এরূপ প্রস্তাব অন্য ষ্টেশনেও হইয়াছে। 'ভাঁড়ু' বুঝিল, এই তাহার মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত। সে প্রভুকে যাইয়া বলিল —"এবার হুজুর! রাণাঘাটের সর্ব্বনাশ! সহরের মধ্যস্থলে কেরোসিনের 'ডিপো' খুলিয়াছে এবং ষ্টেশনে 'ট্যাঙ্ক' করিতেছে। ডিপোতে আগুন লাগিলে আমাদের গরিবদের বাড়ী-ঘর ত থাকিবেই না, রাণাঘাট শুদ্ধ উড়িয়া যাইবে। হুজুর রক্ষা না করিলে আর এবার রাণাঘাটের রক্ষা নাই। সহরময় হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।" যেই বলা, অমনি প্রভু ধনুর্ব্বাণ হস্তে ডনকুইকসটের মত সেই ডিপোর সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। আমি বেলঘাড়িয়া শিবিরে বসিয়া আছি। সেখানে আমার মস্তকে পত্ররূপী এক অস্ত্র পতিত হইল। তাহাতে বিদ্রূপাত্মক ভাষায় লেখা আছে—"এ কি শুনিতেছি! রাণাঘাটের মর্ম্মস্থলে এক কেরোসিনের 'ডিপো' স্থাপিত হইয়াছে, এবং তাহাতে তৈল যোগাইবার জন্য রেলওয়ে

ষ্টেশনে এক 'ট্যাঙ্ক' হইতেছে। ব্যাপারখানি কি, আমি তৎক্ষণাৎ জানিতে চাহি।" আমি লিখিলাম, আমি তৎসম্বন্ধে কিছুই জানি না। রাণাঘাটে ফিরিয়া, তদন্ত করিয়া তাঁহাকে জানাইব। ইদানীং তাঁহার ও আমার সম্বন্ধটা আরও কিছু ঘোরালরূপ ধারণ করিয়াছিল। তিনি এখন বাইবেল ছাড়িয়া, পূর্ণমাত্রায় পেনেল কোডের মিশনারি সাজিয়াছেন, এবং পদে পদে লোকের গ্রীবাচ্ছেদ করিতে আমার উপর পীড়াপীড়ি করিতেছেন। আর তাঁহার মন যোগাইয়া কার্য্য করা আমার পক্ষে অসাধ্য বুঝিয়া, আমি এখন আর তাঁহার কথার কর্ণপাত করিতেছি না। যাহ হউক, রাণাঘাটে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম যে, সেই 'ভাঁড়ু দত্তের' মহা-শত্রু মিউনিসিপ্যাল কমিশনর দুই বৎসর পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যালিটির অনুমতি লইয়া এবং তাঁহাদের অনুমোদনমতে 'ডিপো'-গৃহ প্রস্তুত করিয়া কেরোসিনের ব্যবসা করিতেছে। ষ্টেসনে কোনও 'ট্যাঙ্কে'র নাম-গন্ধ নাই। ষ্টেশন-মাষ্টার বলিলেন যে, তিনি তাহার কোনও খবরই রাখেন না। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন যে, তাঁহার উপরও 'ডিপো' উঠাইয়া দেওয়ার জন্য মহাচোটপাট হইতেছে। তিনি ভয়ে প্রভুর পত্রের উত্তর, কি তাঁহাকে নিজে দেখা দেন নাই। অবস্থা বড় বিষম হইয়া উঠিয়াছে। তবে তাঁহার সার চার্লস ইলিয়টের ভয় নাই। আমি বুঝিলাম, আমি আর রাণাঘাটে থাকিতে পারিতেছি না। অতএব একবার শেষ পরীক্ষার জন্য নিজে তাঁহার কাছে উপরোক্ত কথা বলিতে গেলাম। আমি বলিলাম যে, মিউনিসি-প্যালিটির অনুমতিমতে স্থাপিত উহা দু বৎসরের পুরাতন 'ডিপো'। আমি রাণাঘাটে আসিবার পূর্ব্বে স্থাপিত। আর ষ্টেশনে কই 'ট্যাঙ্কে'র কোনও চিহ্নমাত্র নাই। আমার বোধ হইল, তাঁহার ক্রোধের পিণ্ডটা বোমের মত বিরাট শব্দে ফাটিয়া গেল। তিনি তীরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া, অগ্নিবৃষ্টি করিয়া বলিলেন—"আমি জানি, তুমি কিছুই করিবে না। আমি জানি, রাণাঘাটে দুই বৎসর যাবৎ মাজিষ্ট্রেট নাই, মিউনিসিপ্যালিটি নাই, পুলিস নাই। লোক যাহা খুসি, তাহাই করিতেছে। অথচ তুমি আমার শিষ্য। আমি জানি, গেরেট ও ওয়েষ্টমেকট কিছুই করিবে না। আমি এবার স্বয়ং সার চালর্স ইলিয়টের কাছে যাইব, এবং ইহার একটা চূড়ান্ত করিয়া আসিব। গুডবাই!" আমিও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আমার প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বোধ হইতেছিল যে, তিনি আমাকে আক্রমণ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মটা হস্তদ্বারা প্রচার করিবেন। তিনি ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন, আমি স্থির অবিচলভাবে তাঁহার এই ব্রহ্মাস্ত্র বুক পাতিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলাম, এবং তখনই রাণাঘাট-পালা শেষ করিলাম। তখনই এই মিশনারির অত্যাচারে ক্রমে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। চিফ সেক্রেটারি কটন সাহেবকে পত্র লিখিলাম যে, আমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একমাত্র পুত্রকেও ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য কলিকাতায় রাখিয়াছি। তিনি পূর্ব্বে একবার আমাকে আলিপুর লইতে চাহিয়াছিলেন, আমি নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহা অস্বীকার করিয়াছিলাম। তিনি যদি এখন দয়া করিয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান, তবে আমি বড় উপকৃত হইব। বুধবার এই পত্র লিখিলাম। রবিবার প্রাতে প্রেসিডেন্সি কমিশনরের পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট আমাকে সংবাদ দিলেন, আমি আলিপুর বদলি হইয়াছি। পত্নীর কলিকাতাবাস বহুদিনের সাধ। তিনি আমাকে জোর করিয়া সেই প্রাতের গাড়ীতে কটন সাহেবকে ধন্যবাদ দিতে পাঠাইলেন। কটনের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র প্রভুর সঙ্গে আমার কি গোলযোগ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন —রাণাঘাট বাঙ্গালীদের একমাত্র prize station (পুরস্কারের স্থান)। অতএব তিনি সেখানে প্রভুর ইচ্ছামতে ইংরাজ না দিয়া, একজন বাঙ্গালী সিবিলিয়ান দিয়াছেন। তিনি প্রভুর মন যোগাইয়া থাকিতে পারিবেন ত? আমি বলিলাম—পারিবেন, যদি তিনি রাণা-ঘাটের শাসনভার প্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—Nabin, you forget that he is a Missionary (নবীন! তুমি ভুলিতেছ যে, তিনি একজন মিশনারি)। আমি বলিলাম—and you forget that he was a Magistrate (আর

আপনি ভুলিতেছেন যে, তিনি একজন ভূতপূর্ব্ব মাজিস্ট্রেট)। তিনি এবার উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তিনি তোমার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি সার চালর্স ইলিয়টের মন তোমার সম্বন্ধে বিষাক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাণাঘাটে রামশঙ্কর, রামচরণ দিন রাত্রি খাটিয়াছে, আর তুমি ১২টার সময়ে কাচারি যাও, এবং ৩টার মধ্যে চলিয়া আইস। এক তক্তপোষের উপর শুইয়া, তুমি সমস্ত দিন কেবল তামাক খাও আর কবিতা লেখ।"—আমি বলিলাম—"আমি যে ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কাচারিতে থাকি, তাহা সত্য। আপনি স্বয়ং, কি সার চার্লস ইলিয়ট গিয়া দেখুন, আমার কোনও কার্য্য পড়িয়া আছে কি না। আর অন্য অভিযোগের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সত্য। আমার গৃহের এক মাইলের মধ্যেও তক্তপোষ নাই। আমি এ জীবনে তামাক খাই নাই। অবশ্য সময়ে সময়ে কবিতা লেখার কোমল অভিযোগ (soft impeachment) আমি স্বীকার করি।" তিনি বিষন্নমুখে বলিলেন—"তিনি তোমার সম্বন্ধে সার চালর্স ইলিয়টকে যেরূপ কুসংস্কারাপন্ন (prejudiced) করিয়াছেন, আমার আশঙ্কা, তোমার 'প্রোমশনের' বিঘ্ন হইবে।" আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম—"আপনি কি আমাকে এরূপ অবিচার হইতে রক্ষা করিবেন না?" তিনি করুণকণ্ঠে বলিলেন—"আমি চেষ্টা করিব। কিন্তু সার চালর্স ইলিয়ট কি প্রকৃতির লোক তুমি জান, এবং তিনি একজন উহাঁর পরম বন্ধু।" আমি মেঘাচ্ছন্নহৃদয়ে বিদায় হইয়া রাণাঘাটে আসিলাম।

পরের বুধবারের গেজেটে আমার আলিপুর বদলি প্রকাশিত হইল। ইদানীং প্রভু গেরেটকে হাত করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে আমার সঙ্গে খুব সদ্ব্যবহার করিতেন, এবং আমার প্রত্যেক কার্য্যের অনুমোদন ও প্রশংসা করিতেন। কিন্তু এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে আসিয়া নোয়াখালির মানিনীর মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আফিস পরিদর্শন করিয়া, আমার কাছে এক তীব্র মন্তব্য পাঠাইয়া, এক রাশি কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি বুঝিলাম যে, রাণাঘাট পালার শেষ অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। আমি তাঁহার প্রত্যেক কথা খণ্ডন করিয়া উত্তর দিয়াছি। উহা পূর্ব্বদিন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। বুধবার গেজেট দেখিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাঁহার ও প্রভুর ঘটিত সমস্ত কথা আমি মিঃ কটনের কাছে লিখিয়া বদলি হইয়াছি। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে লিখিয়াছেন যে, তিনি পরদিন প্রাতের ট্রেনে আমার কৈফিয়ৎ পরীক্ষা করিতে রাণাঘাট আসিবেন। আমি যথাশাস্ত্র ষ্টেশনে গিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলাম। তিনি গাড়ী হইতে নামিয়াই গম্ভীরমুখে বলিলেন—"আপনার এই অকস্মাৎ বদলিতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইহার কারণ কি, তাহা আপনি কি কিছু জানেন?" আমি বলিলাম—"আমার নিজের ও আমার পুত্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া, আমি কলিকাতায় বদলি প্রার্থনা করিয়া, কটন সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলাম। আমি যদি আর কিছু লিখিয়া থাকি, তিনি কটন সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।" তিনি বলিলেন যে, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিলেন। আমার গাড়ীতে এবার কিঞ্চিৎ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া উঠিয়া, আমার সঙ্গে যাইবার সময়ে পথে প্রভুর সঙ্গে আমার মনোবাদের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, তিনি প্রায় সকলই জানেন। আমি যখন রাণাঘাট ছাড়িয়া যাইতেছি, তখন আর সে সকল কথা বলিতে চাহি না। তিনি বলিলেন, তিনি আমাকে বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং বড় জিদ করিতে লাগিলেন। আমি তখন 'ভাঁড়ু দত্তে'র নাম চাপিয়া রাখিয়া, তাহার শেষ পালার কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি নামটিও জিদ করিয়া শুনিয়া লইলেন, এবং কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন—"আমি যে কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছি, ভরসা করি—আপনি তজ্জন্য আমার প্রতি কোনরূপ অন্যায় ধারণা মনে স্থান দেন নাই। আইন সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ আপনার কৈফিয়তের দ্বারা আমার নিজের অনেক ভ্রম-ধারণা সংশোধিত হইয়াছে, এবং আমি বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।" আমি বলিলাম—"আমি

কিছুই মনে করি নাই।" আইন বিষয়ে মতভেদ না হইলে ইংরাজ-রাজ্যে এরূপ আপিলের উপর আপিল থাকিবে কেন? তিনি কাচারিতে বসিয়া বহুক্ষণ নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ বাঙ্গালী সিবিলিয়ানদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। কৈফিয়ৎ পরীক্ষা করা দূরে থাকুক, তৎসম্বন্ধে আর একটি কথাও কহিলেন না। তিনি লোকাল বোর্ড আফিসে বসিয়া আহার করিতে ও দিন কাটাইতে আমার অনুমতি চাহিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম যে, প্রভুর আশ্রমে না গিয়া তিনি কেন এখানে আহার ও বিশ্রাম করিবেন। তাহাতে তাঁহার বড় কষ্ট হইবে। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া বলিলেন যে, তিনি কোনও একটা মালগাড়ীর 'গার্ডরুমে' চলিয়া যাইবেন। ষ্টেশনে গিয়া শুনিলাম যে, তখন কোনও মালের গাড়ী যাইবে না। তিনি 'ওয়েটিং রুমে' থাকিতে চাহিলেন। আমি জিদ করাতে নিতান্ত অনিচ্ছায় শেষে প্রভুর ঘরে গেলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি বদলি হইয়াছি। তিনি যদি এখন প্রভুর ক্রোধের 'থারমমিটার'টা নামাইয়া দেন, তবে আমি বড় উপকৃত হইব। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি চেষ্টা করিবেন। আমি ৪টার সময়ে তাঁহাকে বিদায় দিতে সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আবার ষ্টেশনে গেলাম। তিনি সুরেন্দ্রবাবুকে বিদায় দিয়া, আমাকে গাড়ীর কাছে লইয়া বলিলেন—"আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আপনি এ সকগ কথা ভুলিয়া যান, এবং আমরা বন্ধুভাবে বিদায় হই (let us part as friends)। আমি আপনার মত কার্য্যক্ষম কর্ম্মচারী আর পাইব না। আমি আশা করি, আপনি আপনার নূতন কার্য্যক্ষেত্র আলিপুরেও এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তাঁহার অধীনে যে এত দিন সুখে কার্য্য করিয়াছি, এবং তিনি এত কাল যে প্রভুর প্রকোপ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ও আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, তাহার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। হাতে হাত থাকিতে ট্রেন খুলিল। আমি দুই এক পা ট্রেনের সঙ্গে গিয়া তাঁহার কাছে বিদায় গ্রহণ করিলাম। যত দূর দেখা গেল, তিনি ললাটে হস্ত দিয়া "গুড বাই! গুড বাই!" করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু দূরে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতেছিলেন। আমি ফিরিয়া গেলে বলিলেন—"বেটা খুব নরম হইয়াছে। খোঁড়াকে জব্দ করিয়া, অন্য কোনও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এরূপ গৌরবে রাণাঘাট হইতে যাইতে পারিত না। আপনি চলিলেন। খোঁড়ার সমস্ত আক্রোশ আমার উপর পড়িবে। আমাকেও রাণাঘাট হইতে পলাইতে হইবে।"

এ দিকে অমার বদলির গেজেটে রাণাঘাট সবডিভিসন ব্যাপিয়া তোলপাড় পড়িয়াছে। শান্তিপুর, উলা ও চাকদহের মিউনিসিপ্যাল কমিশনর ও অনারারি মাজিষ্ট্রেটগণ দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া, এই অকস্মাৎ বদলির কারণ কি জানিতে চাহিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন। সেই হাইকোর্টের উকিল মহাশয় পর্য্যন্ত আসিলেন, এবং শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে আমার গুণকীর্ত্তন করিয়া, আমার নির্ম্মিত শান্তিপুর চিকিৎসালয়ে আমার প্রতিকৃতি রাখিতে প্রস্তাব করিলেন। উহা একবাক্যে গৃহীত হইল। আমি তাঁহাকে আমার স্থানে চেয়ারম্যান করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন—"সাধারণ ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, 'অফিসিয়াল চেয়ারম্যান' কেহও আপনার স্থান পূরণ করিতে পারিবে না। আপনি বড় অসময়ে আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। আর একটি বৎসর থাকিয়া, আপনার প্রস্তাবিত খালটি কাটিয়া, শান্তিপুরের জলকষ্ট দূর করিয়া গেলে, আমরা সন্তোষের সহিত আপনাকে বিদায় দিতাম। এ কার্য্যটি আর হইবে না। এ কার্য্যকৌশল ও শক্তি আর কাহারও নাই।" শান্তিপুর 'ষ্ট্রাণ্ডে'র নীচে যে খাল আছে, আমি উহা কাটাইয়া, গঙ্গার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এ কার্য্যটি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় নাই। উলার কমিশনরগণও আমার নির্ম্মিত আফিস-গৃহে আমার প্রতিকৃতি রাখিতে প্রস্তাব করিলেন। এই দুই স্থানেই আমার 'ব্রোমাইড' ছবি আছে। সে দিন মাত্র শুনিলাম যে,

বর্ত্তমান কীর্ত্তিমান্ সর্বডিভিসনাল অফিসার উলার আফিস হইতে উহা সরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং তাহাতে কমিশনরগণের সহিত, বিশেষতঃ বারাণসীবাবুর সহিত তাঁহার হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ইংরেজ ও বাঙ্গালীতে প্রভেদ এই। পূর্ব্ববর্ত্তীর কার্য্যপ্রণালী ও কীর্ত্তি পরবর্ত্তী ইংরেজ অফিসার রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, এবং বঙ্গচন্দ্র উহা ধ্বংস করিয়া, আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে চাহে। চাকদহের কমিশনরগণও সেই ঝিলটিকে আমার নামে নামাঙ্কিত করেন।

আমার পরবর্ত্তী আসিলেন। আমি তখন রাণাঘাটের ম্যালেরিয়া দেবীর চরণে শেষ উপহার দিতেছিলাম। জ্বরে পড়িয়া আছি। তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি তাঁহার জন্য লিখিত মন্তব্য নিয়মমতে রাখিয়া যাইতে অক্ষম। অতএব প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহাকে জ্বরশয্যা হইতে সমস্ত সর্বডিভিসনের অবস্থা এবং আমার কার্য্যপ্রণালী বুঝাইলাম। তিনি বলিলেন, তিনি ঠিক আমার প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন। সর্ব্বশেষ রাণাঘাট শাসনের বিঘ্ন (difficulty) কি, জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, বিঘ্ন একমাত্র মহাপ্রভু। আমি তাঁহাকে প্রজার গ্রীবা কাটিতে না দিয়া, আপনার গ্রীবা দিয়াছি। পরবর্ত্তী কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন, তাহা তাঁহাকে স্থির করিতে হইবে। পরদিন প্রাতের ট্রেনে দুই বৎসর মাত্র অবস্থিতির পর বড় অনিচ্ছায় এই মিশনারি প্রভুর উৎপীড়নে রাণাঘাট ছাড়িলাম। ষ্টেশন রাণাঘাটের ও উলার ভদ্রমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন। সুরেন্দ্র-বাবু ত সঙ্গে কলিকাতায় চলিলেন। পথে চাকদহের কমিশনর ও অনরারি মাজিষ্ট্রেটগণ আমার গলায় ফুলের মালা ও হাতে ফুলের তোড়া দিয়া, বরের মত সাজাইয়া দিলেন। তাঁহারাও আমার কক্ষে কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত গিয়া, আমাকে অশ্রুপূর্ণনয়নে বিদায় দিলেন। সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহারা বলিলেন যে, রাণাঘাট সর্বডিভিসনকে এরূপ কাঁদাইয়া ইতিপূর্ব্বে আর কেহ যাইতে পারেন নাই। ইহাঁদের বিদায় দিয়া, ডাকের চিঠিপত্র খুলিতে গিয়া দেখি যে, শান্তিপুরের এক নামজাদা ডাক্তার হইতে একখানি পত্র সহ একটি ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার আসিয়াছে। ইনি রাণাঘাটের ভূতপূর্ব্ব সর্বডিভিসনাল অফিসার একজনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমার সহিত কখনও সাক্ষাৎ করেন নাই। শান্তি-পুরে শুনিতাম, তিনি আমার কার্য্যপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করিতেন, কখন কখন প্রশংসা করিতেন। রামচরণবাবুর সেই জুতা-উপহার স্মরণ করিয়া ভাবিলাম, আমার জন্যও কিছু পুষ্প-চন্দন আসিয়াছে পত্রখানি বড় শঙ্কিতহৃদয়ে খুলিলাম। তাহাতে লেখা আছে যে, তিনি একজন স্বাধীনচেতা লোক, কখনও কোন সর্বডিভিসনাল অফিসারের খোসামুদি তিনি করেন নাই। বরং একজনকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন। তিনি দুই বৎসর যাবৎ আমার কার্য্যাবলী দূরে থাকিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন ও সময়ে সময়ে আমি শুনিয়া থাকিব, আমার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আজ শান্তিপুরের আবালবৃদ্ধবনিতার অশ্রুজলে তাঁহার হৃদয়ও দ্রব হইয়াছে। অতএব তিনিও অশ্রুপূর্ণনয়নে আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। তিনি আমার কার্য্যবলীর অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া, শেষে খালটি কাটিয়া গেলাম না বলিয়া বড় দুঃখ করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু পত্র শুনিয়া বলিলেন—"যখন এ লোকটি পর্য্যন্ত আপনার এত প্রশংসা করিয়াছে, তখন আর আপনাকে মন্দ বলিবার লোক রাণাঘাট সর্বডিভিসনে নাই।" তাহার পর পুস্তকখানি খুলিয়া দেখিলাম, যে সর্বডিভিসনাল অফিসারের সঙ্গে তাঁহার মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল, এ তাঁহারই সম্বন্ধে এক তীব্র বিদ্রূপাত্মক কবিতা। দেখিলাম, লোকটির বেশ রসিকতা আছে, এবং লিখিবার শক্তিও আছে। এই কবিতাপ্রচারে ক্ষেপিয়া, উক্ত সর্বডিভিসনাল অফিসার এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া, ইহাঁর নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করেন, এবং তাহাতে অপদস্থ ও 'ডিগ্রেড' হইয়া রাণাঘাট হইতে বদলি হন। সেই অবধি এই লোকটি রাণাঘাট সর্বডিভিসনাল অফিসারের পক্ষে একপ্রকার 'জুজু'-ভীতিসঞ্চারক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিতাটি পড়িয়া হাসিতে হাসিতে কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত

আমার জীবন

পঞ্চম ভাগ

কলিকাতা ॥ আলিপুর বা আমলাপুর

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথম কটন, পরে আলিপুরের কলেক্টর কলিনের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। কলিন আমাকে খুব সমাদরে গ্রহণ করিলেন; কারণ, বলিয়াছি—তিনি নদীয়ায় অস্থায়ী কলেক্টর থাকিবার সময়ে আমার প্রতি বড় সুপ্রসন্ন ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ আমাকে ফৌজদারির কার্য্যভার দিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, আমি অনুমান বিশ বৎসর সবডিভিসনে ফৌজদারির কার্য্য করিয়া, উক্ত কার্য্যের প্রতি আমার মনে অপ্রীতির সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষতঃ আমি একেই চিরদিন 'খালাসে হাকিম' বলিয়া পরিচিত, তাহাতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জেলের ও বেত্রাঘাতের প্রতি আমার অধিকতর অপ্রীতি হইয়াছে। উপর হইতে নিতান্ত তাড়া না খাইলে, পাশবিক দণ্ড বেত্রাঘাত আমার কলমে কখনও আসে না। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি নদীয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, আমি মিউনিসিপ্যাল কার্য্যের অনুরাগী। ২৪ পরগণায় বহু মিউনিসিপ্যালিটি। উহাদের কার্য্য ভাল চলিতেছে না, অতএব উক্ত কার্য্য এবং তৌজি মেনুয়াল প্রচলনের ভার আমার হস্তে দিবেন। উহা জেলার মাজিষ্ট্রেটের হাতে ছিল। আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটকে ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত খাটিতে হয়। তাঁহার তিলার্দ্ধ সময় নাই। কাজেই ফৌজদারির হেড কেরাণীবাবু সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটির 'একমেবাদ্বিতীয়' কর্ত্তা। তিনি এ প্রভুত্ব সহজে ছাড়িবেন কেন? তিনি মিউনিসিপ্যালিটির ভার মাজিষ্ট্রেটের ত্যাগ করা সম্বন্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তিনি কলিনের প্রিয়পাত্রও ছিলেন। কাজেই উক্ত ভার আর আমার স্কন্ধে পড়িল না। ভার পড়িল তৌজি, রোডসেস্ এবং বাঁধ (Embankment)। দেখিলাম, আলিপুর দিল্লীকা লাড্ডুবিশেষ। কোথায় মনে করিয়াছিলাম বাঙ্গালার সর্ব্ব-প্রধান জেলার এবং কলিকাতার উপনগর আলিপুরের কাচারি রাজপ্রাসাদতুল্য হইবে, আর দেখিলাম, কতকগুলি জঘন্য গুদাম। ভাড়াটিয়া গাড়ীওয়ালাদের কাছে উহা 'স্কুলকাচারি' বলিয়া পরিচিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কলেক্টরের নাজির মহাশয়ের কাছে শুনিলাম যে, ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে এইটি সিভিল মিলিটারি সার্ভিসের অপূর্ব্ব বাঙ্গালা শিখিবার জন্য স্কুল ছিল। তাই 'স্কুলকাচারি' বলিয়া পরিচিত। সবডিভিসনগৃহের গোছলখানার মত একটি আলো-বাতাস-বর্জ্জিত, সেঁতসেঁতে, পূতিগন্ধযুক্ত ক্ষুদ্র কক্ষ আমার যুগপৎ এজলাস ও আফিস হইল। ডিপার্টমেণ্টগুলির অবস্থাও তাই। আমি যে আলিপুরের 'পিঁজারাপোল' নাম দিয়াছিলাম, তাহা ঠিক হইয়াছিল। জৈনদিগের বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্য গরুর গোশালার নাম 'পিঁজারাপোল'। আলিপুর বৃদ্ধ, বাতব্যাধিগ্রস্ত, সেলামপটু এবং তোষামোদ-ব্যবসায়ী ডেপুটিগণের গোলোক। আফিসগুলির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল, উহা প্রকৃতই গোশালা। আমলাগণ দু একজন ছাড়া প্রায়ই গোজাতীয়। তাঁহারা প্রায়ই ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার ও হেড কেরাণীবাবুদের পাচক, কি শ্যালক-সম্প্রদায়ভুক্ত জীবতত্ত্ব অধ্যয়নের উপযুক্ত পদার্থবিশেষ। কিন্তু এ দিকে জেলার সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহাদের আত্মাভিমান গগনস্পর্শী। আমি আলিপুর পৌঁছিয়াই দেখিলাম, এই 'মান বা অভিমান-তরঙ্গে' আলিপুর টলটলায়মান। প্রথম বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তিনি আমার চেহারায় তাঁহার মত বার্দ্ধক্যের কোনও চিহ্ন নাই দেখিয়া, একপ্রকার মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর অত্যন্ত ম্লানমুখে যাহা বলিলেন, বুঝিলাম—আলিপুর আমলাপুর—আমলার রাজ্য। তিনি বলিলেন, আমার মত তেজস্বী লোক এখানে আসিয়া ভুল করিয়াছি। তাহার পর আমার কলেজ-সহপাঠী পুলিস-মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার খাস-কামরায় লইয়া গিয়া এক দীর্ঘ উপন্যাস শুনাইলেন। নাজিরকে তিনি কি এক আদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে 'প্লিজ' কথা ছিল না। 'সন্তুষ্ট হইয়া নাজির এই কার্য্য করিবেন' না লিখিয়া, শুধু 'নাজির

এই কার্য্য করিবেন' লিখিয়াছিলেন। তাহাতে নাজিরের অভিমানে ঘোরতর আঘাত লাগিয়াছে। সে সেই হুকুমের নীচে তাহার অঙ্গদের সিংহাসন হইতে লিখিয়াছে—"আলিপুরের আমলারা এরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইতে অভ্যস্ত নহে। আমি এই আদেশ গ্রহণ করিব না।" বন্ধুবর অবশ্য মুসলমান ও একজন ক্ষুদ্র নবাব। জাষ্টিস্ নরম্যান ও লর্ড মেওর সময় হইতে এই সকল পদ মুসলমানদের একচেটিয়া হইয়াছে। নাজিরের উক্ত উত্তরে তাঁহার মুণ্ডটা ঘুরিয়া গিয়াছে। আলিপুরের ডেপুটি-মহল এই অকথ্য অবমাননায় স্তব্ধ। বন্ধু কলেক্টরের কাছে এই অপমানের জন্য নালিশ করিয়াছেন। এ দিকে আমলাগণ দলবদ্ধ হইয়া কলেক্টরের কাছে উপস্থিত। তাঁহাদের অগ্রণী সেই হেড কেরাণী। তাঁহারা বলেন, আলিপুর বঙ্গের (premier) প্রধান ডিষ্ট্রিক্ট। তাহার আমলাগণ বিশেষ সম্মানভাজন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট 'প্লিজ' না লেখাতে তাহাদের সম্মান একবারে কালীঘাটের কাটা গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। কলেক্টর প্রথম লিখিলেন—"নাজিরকে সস্পেন্ড করা গেল।" প্রিয় হেড কেরাণী কাঁদা-কাটা করিলে ঐ হুকুম কাটিয়া লিখিলেন—"নাজিরকে জরিমানা করা গেল।" প্রিয়বর তাহাতেও কাঁদিতে লাগিলে, এই হুকুমও কাটিয়া লিখিলেন—"নাজিরকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল।" আলিপুরে আমলা-মহলে একটা আনন্দের করতালি উঠিল। ডেপুটি-মহল এই অপমানে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বসিয়া আছেন। এই অসময়ে আমি এই রসময় আলিপুরে কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। ইহারই জন্য পূর্ণচন্দ্র আমলারাজ্যের কথা বলিয়াছিলেন। বন্ধু পুলিস-মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, তিনি আমাকে খাস-কামরায় লইয়া 'বিনাইয়া নানা ছাঁদে' এই অপমানের পালা গাহিলেন। আমি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম, আলিপুরের পিঁজরাপোলে কি এমন শান্তমস্তিষ্ক ডেপুটি কেহই ছিলেন না যে, এই মানের শ্রাদ্ধটা এত দূর গড়াইল! এ ছাই কলেক্টরের কাছে রিপোর্ট না করিয়া, শুধু হুকুমটার আগে একটা 'প্লিজ' লিখিয়া, উহা নাজিরের কাছে আবার পাঠাইলে কি ক্ষতি ছিল? তাহাতে বরং নাজিরই অপ্রতিভ হইত। আমার সেই বিবরে সিংহাসনস্থ হইবামাত্র সেই হেড কেরাণী ও নাজির, দুই জনেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিতান্ত গৌরবের সহিত হেড কেরাণী আমাকে কলেক্টরের সেই ত্রিখণ্ড আদেশ হাসিতে হাসিতে দেখাইলেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন—"দুটি দিন পূর্ব্বে আপনি আলিপুরে আসিলে এই ঢলাঢলিটা হইত না। আপনি আজ আসিয়াই যেরূপ আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন, ইহা আপনার নামের উপযুক্ত। বিশেষতঃ আপনি আমাদিগকে দু কথা গালি দিলেও আমরা সহিতে পারিব। কিন্তু আর সকল ডেপুটিরা কে? আমাদের অপেক্ষা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ যে, তাহাদের হাত-নাড়া আমরা সহিব!"

ইহার দু চারি দিন পরে মৌলবি বন্ধু আবার আর এক 'মানভঙ্গে'র তরঙ্গ তুলিলেন। তিনি এজলাসে বসিয়া কি এক মোকদ্দমা বিচারের সময়ে এক মোক্তারকে কি গালি দিয়াছিলেন। মোক্তারেরা দল বাঁধিয়া মাজিষ্ট্রেটের কাছে নালিশ উপস্থিত করিল। বন্ধু আমার কাছে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। আমি বলিলাম যে, আমি উহা এখনই থামাইয়া দিব। আমি মোক্তারদের প্রধান কয়েক জনকে ডাকিলাম, এবং বুঝাইয়া বলিলাম যে, আমরা এক স্থানে সকলেই কার্য্য করিতেছি। কোথায় পরস্পরকে সহিয়া সুখে থাকিব, না বরাবর এই মানের পালা অভিনয় করিব। ইহাতে মাহাত্ম্যই বা কি, সুখই বা কি? তাঁহারা বলিলেন—"আলিপুরে এক আসিয়াছিলেন বঙ্কিমবাবু, তাহার পর আসিয়াছেন আপনি। বঙ্কিমবাবু আপনার মত এরূপ কোমলমিষ্টভাষী ছিলেন না। তিনি বড় চিড়চিড়ে মেজাজের লোক ছিলেন। কথায় কথায় চটিয়া রুক্ষ কথা বলিতেন। কিন্তু কাচারি হইতে বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে যাহাকে অপমান করিয়াছেন, তাহাকে ডাকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন—'বাপু হে! বুড় মানুষ, সমস্ত দিন খাটি। এ অবস্থায় একটা দেবতারও মেজাজ ঠিক রাখা

অসাধ্য। অতএব তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা আর মনে করিও না।' আমরা সকলই ভুলিয়া যাইতাম। এরূপ ঘটনা কখনও হয় নাই।" আমি বলিলাম—"আমিও ত সময়ে সময়ে আপনাদের ভর্ৎসনা করি। কই, আপনারা আমার নামে ত কখনও এরূপ নালিশ করেন নাই।" তাঁহারা বলিলেন—"নালিশ করিব কি, বরং আপনার ভর্ৎসনা ও ঠাট্টা শুনিবার জন্য, আপনি দেখিয়া থাকিবেন, আমরা অবসর সময়ে সকলে আপনার এজলাসে বসিয়া থাকি।" এক দিন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমি তখন আলিপুরে আসিয়াছি মাত্র। একটা ফৌজদারি মোকদ্দমার বিচারসময়ে এক মোক্তার বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে একটু ব্যঙ্গ করাতে সে চটিয়া তাহার বোচ্‌কা বিড়ি বাঁধিয়া আমার এজলাস হইতে চলিয়া গেল। লোকটি কে, কিরূপ শ্রেণীর মোক্তার, আমার বেঞ্চ-ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করিলে, সে এবং উপস্থিত অন্য মোক্তারেরা—তাঁহারা যেন তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন—বলিলেন—"তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর মোক্তার। তবে বড় চিড়চিড়ে লোক। ধর্ম্মাবতার! আপনি কিছু মনে করিবেন না।" "অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং মম শিরসি মা লিখ মা লিখ।"—বলিয়া আমি হাসিয়া উঠিলাম। বলিলাম—"ঠাট্টা বুঝিবার জন্য আলিপুরের মোক্তারদের অস্ত্র-চিকিৎসা আবশ্যক হইবে আমি মনে করি নাই।" আমি কাজ করিতে লাগিলাম। একজন মোক্তার উঠিয়া গেলেন, এবং মুহূর্ত্ত পরে সেই মোক্তার তাঁহার সঙ্গে আসিয়া আমাকে কর-যোড়ে বলিলেন—"আমি বড় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যখন বিরক্ত হন, দুটো গালি দিবেন, কিন্তু এরূপ মিষ্ট বিদ্রূপ করিবেন না। বড় গায়ে লাগে।" কোর্ট সুদ্ধ সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। আর একজন মোক্তার উঠিয়া বলিলেন—"না, ধর্ম্মবতার! উনি অন্যায় বলিয়াছেন। আমরা বঙ্কিমবাবুর পর এরূপ বাক্‌চাতুরি ও মিষ্ট বিদ্রূপ শুনি নাই। উহা আমাদের একটা বিশেষ আনন্দের কারণ হইতেছে। আপনি ইহাঁর কথায় আমাদের এই সুখ হইতে বঞ্চিত করিবেন না। আমরা এ জন্য দলে দলে অবসরসময়ে আপনার এজলাসে আসিয়া বসিয়া থাকি।" বাস্তবিকই আমি আমার সমস্ত দাসত্ব-জীবন বা ডেপুটি-জীবন এজলাসে বসিয়া অভিনয় করিয়াছি মাত্র। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া, এবং উহা শুনিয়া কোর্টের শুষ্ক কার্য্য বড় আমোদে কাটাইয়াছি। ইহাঁরা যেরূপ বলিলেন, অন্য স্থানের মোক্তারেরাও সেইরূপ বলিয়াছেন। এমন কি, শুনিয়াছি—অনেক দর্শক ও শ্রোতা কেবল এরূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুনিবার জন্য আমার কোর্টে আসিতেন। মোক্তারগণ আমাকে উপরের দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"আপনার কোর্টে মোকদ্দমা চালান আমরা একটা গৌরব ও আনন্দের কার্য্য মনে করি। আপনি আমাদিগকে গালি দিলেও সহিব। কিন্তু ইহাঁদের কাছে সহিব কেন?" যাহা হউক, আমি বলিলাম যে, এরূপ গোলযোগ আমি আলিপুরে থাকিতে আর হইবে না। বন্ধুবর আমার শিক্ষামতে সেই দিনই কোর্টে সেই অপমানিত মোক্তারকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি কি আমার কথায় অপমান মনে করিয়াছ? সারাদিন পুলিস-কোর্টের খাটুনিতে মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। কখনও কিছু বলিলে ইচ্ছা করিয়া বলি না। অতএব তুমি কিছু মনে করিও না।" তখন সমস্ত মোক্তার উঠিয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! ইহার পর আমরা কখনও আপনার কোনও কথায় চটিব না।" তাঁহারা তখনই কলেক্টরের কাছে নালিশ প্রত্যাহার করিলেন, এবং তাহার পর বন্ধু, আমলা ও মোক্তারেরা আমার কোর্টে আসিয়া, আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলেন। সকলে বলিলেন যে, আলিপুরে হাকিম ও আমলা মোক্তারদের মধ্যে যে বিদ্বেষ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এত দিনে নিবিয়া গেল। বাস্তবিকই আমার দুই বৎসরকাল আলিপুরে অবস্থানকালে আর এরূপ উৎপাত হয় নাই। সকলে বড় আনন্দে ছিলাম।

এই সকল উপন্যাসের দ্বারা আলিপুরের আমলা মোক্তারের অভিমান বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমলাদের মধ্যে যোগ্য লোক প্রায়ই ছিল না। আর

ডেপ্‌ুটি কলেক্টর মহাশয়েরা প্রায় সকলেই পিঁজরাপোলের উপযোগী। প্রায় সকলেই জীবন-শ্‌ন্য মাংসপিন্ডবিশেষ। কলিকাতার কোনও অজ্ঞাত গলিতে তাঁহাদের দৌলতখানা। তাঁহাদেরই ন্যায় বাতগ্রস্ত ও আসন্ন-পেন্‌সন্‌ ঘোটক ও কায়া-ত্যাগশীল শকট তাঁহাদের সম্বল। প্রাতে সকালে সকালে দ্‌র্ম্মূল্যে শাক ভাত খাইয়া তাঁহারা আলিপ্‌রের পাড়ী যোগাইতে আরম্ভ করেন। হটর হটর করিয়া তাঁহাদের রথ চলিতেছে এবং জ্যামিতির নানা রেখায় ও চক্রে ম্‌ন্ডটি দোলাইতে দোলাইতে অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় ধর্ম্মাবতারগণ কাচারি যাইতেছেন। কদাচিৎ নক্ষত্রবেগে চালিত শ্বেতাঙ্গদিগের গাড়ীর গম্ভীর রবে ও বজ্রসম অশ্বপদাঘাতধ্বনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষ্‌র্‌ন্মীলন করিয়া প্রভ্‌রা এ দিক্‌ সে দিক্‌ দেখি-তেছেন। এ দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পার্শ্ববাথা উপস্থিত হইত। এর্‌প ভাবে এক ঘণ্টা নিদ্রিতম্‌ন্ড ও দেহ দোলাইয়া ধর্ম্মাবতারগণ আফিসে অবতীর্ণ হইতেন। তাহার পর ঘন ঘন তাম্রক্‌ট ও টানা পাখার বাতাস সেবন করিয়া, কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতেন। কাহারও মস্তক ব্‌কের উপর পড়িয়া আছে, কাহারও বা হাস্যকর ভঙ্গিতে কাষ্ঠাসনের শীর্ষভাগে পড়িয়া আছে। এক একবার কোনও আমলা আসিয়া সেই দিবানিদ্রা পদশব্দে ভঙ্গ করিতেছে ও কাগজ দস্তখত মাত্র করাইয়া লইতেছে। কার্য্যভার তাহাদেরই উপর। এর্‌প অবস্থায় 'প্রিমিয়ার' (প্রধান) জেলার কার্য্য চলিতেছে। অথচ আলিপ্‌র লেঃ গবর্ণরের প্রাসাদ-ছায়ায় অবস্থিত। প্রদীপের তলেই অন্ধকার। কাজে কাজে কোনও ডিপার্টমেণ্টেরই কার্য্যের নিয়ম বা শ্‌ঙ্খলা কিছ্‌ই নাই। আমলা মহাশয়ের বিদ্যা, ব্‌দ্ধি ও ইচ্ছামাত্রই কার্য্যপরিচালক। তাঁহাদেরও বেতনের পরিমাণ অন্‌সারে দিবসের কিয়দংশ নিদ্রার নিয়ম আছে। আমার এক বদ্‌ অভ্যাস যে, আমি কোনও কার্য্যই একটা নিয়ম না করিয়া করিতে পারি না। সর্বাডিভিসনে আমার প্‌র্ব্ববর্ত্তীরা প্রভাত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খাটিয়া কাজ সামলাইতে পারেন নাই, আমি কেমন করিয়া তিন চার ঘণ্টা মাত্র কাজ করিয়া, তাহা সহজে শেষ করিতাম, তাহার নিগ্‌ঢ় তত্ত্ব অনেক মাজিষ্ট্রেট আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। নিগ্‌ঢ় তত্ত্ব একটি এই যে, আমি সকল কার্য্যের একটি নিয়ম করিয়া লইয়া থাকি। কিন্তু এখানে নিয়ম করিতে গেলে প্রথম রোডসেসের হেড কেরাণী মহাশয় একট্‌ক বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"এ আলিপ্‌র; অন্য জেলা নহে। আমি যে ভাবে কার্য্য করিতেছি, তাহা বড় বড় হাকিমদের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেহ ম্‌র্খ ছিলেন না।" অথচ তাঁহার বিদ্যাব্‌দ্ধি এর্‌প যে, দ্‌ই লাইন চিঠিও তিনি শ্‌দ্ধর্‌পে ম্‌সাবিদা করিতে পারেন না। উহা আগাগোড়া আমাকে কাটিতে হয়। তিনি লম্বা লম্বা বিচিত্র ভাষায় অনাবশ্যক নোট লিখিয়া তাঁহার বিদ্যা দেখাইতে চাহেন। আমি উহা পরিত্যক্ত কাগজের ট্‌ক্‌রিতে নিক্ষেপ করি। তিনি চটিয়া লাল। আমার ম্‌খের উপর ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন, এবং আলিপ্‌রের আমলাদিগকে তাঁহার এই অপমানের কথা বলিয়া, আমাকে সকলের অপ্রিয় করিয়া তুলিতে লাগিলেন। যখন দেখিলাম যে, তিনি কিছ্‌তেই আমার আদেশমতে কার্য্য করিবেন না, তখন আমি যে কার্য্যপ্রণালী প্রচলিত করিতে চাহি, তাহা লিখিয়া কলেক্টরের কাছে পাঠাইলাম, এবং তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া উহা মঞ্জ্‌র করিলেন। হেড কেরাণী মহাশয়ের সকল পাপ ক্ষালনের মন্ত্র ছিল 'Previous practice'—'প্‌র্ব্ব-প্রচলিত নিয়ম'। কলেক্টর একেবারে তাহার আম্‌ল রহিত করিয়াছেন, এবং তাহার উপর আমাকে ধন্যবাদ দিয়া, আমার ন্‌তন নিয়মাবলীই মঞ্জ্‌র করিয়াছেন,—এ যে চ্‌ড়ামণি মহাশয়ের ভাষায়—"বেদের অকথ্য অবমাননা ও সর্ব্বনাশ!" কলেক্টরের হ্‌ক্‌মের নীচে আমি লিখিয়া দিয়াছি যে, হেড কেরাণী যদি এখনও এই নিয়মমতে কার্য্য না করেন, তবে আমি তাঁহার পদচ্যুতির জন্য রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইব। তখন তিনি ব্‌ঝিলেন যে, এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডটা আর বেশী দিন আলিপ্‌রের রোডসেস্‌ আফিসের এ বিপ্লবে টিকিবে না। কিন্তু

কি করিবেন, তিনি মুখে ভঙ্গ দিয়া নিদ্রা অবলম্বন করিলেন। এ দিকে নূতন নিয়মাবলীতে কাজ কলে চলিতে লাগিল। আগে তাঁহাকে লইয়া আমার প্রায় দুই ঘণ্টা সময় নষ্ট করিতে হইত। এখন রোডসেস কার্য্যে আমার আধ ঘণ্টাও লাগে না।

এই পালা আমাকে বাঁধ বিভাগেও (Embankment Department) অভিনয় করিতে হইল। সেখানে দেখিলাম ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে বাঁধের মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছে। তাহার আগাগোড়া কিছুই নাই। আমলা মহাশয় একটা হুকুম লিখিয়া আনেন, এবং ডেপুটি মহাশয় দস্তখত করেন। যুগের পর যুগ এই নিয়ম চলিয়াছে। অথচ আমলা মহাশয়কে কোনও মোকদ্দমার ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কবুল জবাব দেন—তাঁহার হাতে এত কার্য্য যে, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। আন্দাজে হুকুম লিখিয়া আনেন মাত্র। এ কার্য্যটি যে কি, কখন কোনও ডেপুটি কলেক্টর উল্টাইয়া দেখেন নাই। তিনিও দেখিবার সময় পান নাই। অথচ ইহার কিছু একটা নিয়ম করিতে চাহিলেই তিনি মহামন্ত্র 'প্রিভিয়স প্রাকটিস' উচ্চারণ করিয়া তাহার ঘোরতর প্রতিবন্ধকতা করেন। আমি প্রত্যেক মোকদ্দমার এক Precis (মন্তব্য) প্রস্তুত করিলাম ; এবং এই বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধেও একটা নূতন নিয়মাবলী লিখিয়া, কলেক্টরের কাছে পাঠাইলাম। কলেক্টর এ বিভাগের এই অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহাকে উহা বিদিত করার জন্য আমাকে এবার অশেষ ধন্যবাদ দিয়া, আমার নিয়মাবলী মঞ্জুর করিলেন। দেখিতে দেখিতে পুরাতন আবর্জ্জনা পরিষ্কার হইয়া, এই কার্য্যও কলের মত চলিল।

তাহার পর 'তৌজি মেনুয়েল'। সে এক উৎকট ব্যাপার। লেঃ গবর্ণর ইলিয়ট ও আমাদের কলেক্টর মিঃ কলিন তিন মাস যাবৎ তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া এই তৌজি মেনুয়েল প্রসব করিয়াছেন। তৌজি সম্বন্ধে আবহমান প্রচলিত প্রণালী উঠাইয়া দিয়া, এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। পূর্ব্বে রাজস্বের ও রোডসেসের স্বতন্ত্র তৌজি ছিল। তাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন, উভয়ের এক তৌজি হইবে। তাহার উপর এত ডালপালা ছড়াইয়াছেন যে, 'তৌজি মেনুয়েল' রাজস্ব বিভাগে এক ক্ষুদ্র বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। পরীক্ষাধীন এই সম্মিলিত তৌজি-প্রণালী আলিপুর ও আরও দুই একটি স্থানে প্রচলিত করিবার আদেশ হইয়াছে। কলিন আমাকে এই ইতিহাস বলিয়া বলিলেন যে, বড় কঠিন বলিয়াই এই কার্য্যের জন্য তিনি আমাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন। আমি প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ কেবল সবডিভিসন অফিসারি করিয়াছি, অতএব কলেক্টরির কার্য্য একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছি। 'তৌজি মেনুয়েল' পাঠ করিতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলাম। কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রত্যেক পদে ব্যাসকূট বাহির হইতে লাগিল। আলিপুরে তৌজিনবিস একজন কর্ম্মক্ষম ও বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। প্রথম কাচারিতে প্রায় দুই ঘণ্টা প্রত্যহ আমরা দুই জনে মাথা ঘামাইয়া এই সকল কূটের একটা সিদ্ধান্ত করিতাম। কিন্তু জ্বালার উপর জ্বালা হইল—প্রত্যহ অন্য স্থানের কলেক্টর কমিশনর 'তৌজি মেনুয়েলে'র এ স্থানের অর্থ কি, ঐ স্থানের 'রুল'মতে কিরূপে কার্য্য চলিবে, এ স্থানের সঙ্গে ঐ স্থান কিরূপে সঙ্গত ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কারণ, মিঃ কলিন তৌজি মেনুয়েলের যমজ প্রণেতা বা দ্বিতীয় মনু। তিনি এ সকল পত্র আমার কাছে পাঠাইতেন এবং লিখিতেন—"বাবু এন. সি. সেন! আপনি ইহার একটা উত্তর দিতে পারেন কি?" মেনুয়েলের মনু তিনি, উত্তর দিব আমি! যাহা হউক, আমি ও আমার তৌজিনবিস উপযুক্ত টীকাকার। আমরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলাম। এক স্থানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। পাটনার কমিশনর উহা বুঝিতে পারেন নাই। দেখিলাম, উহা কোনও মতে খাটে না। এবার আমরা উভয়ে নাচার হইয়া কবুল জবাব দিলাম—"হেবে না অবধড়!" কলিন আমাকে ডাকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে কি, উহা খাটে না?" আমি বলিলাম—"না। বোধ হয়,

ছাপার কোনও ভুল হইয়া থাকিবে।" তিনি নিজে অনেক চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন যে, এ দৃষ্টান্তটি সার চালর্স ইলিয়টের স্বকৃত। কিছুক্ষণ ভাবিয়া, আমি আর একটি দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করিয়া দিতে পারি কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, তাহা অনায়াসে পারি। তাহাই করিলাম, এবং তিনি পূর্ব্বদৃষ্টান্ত ছাপার ভুল বলিয়া, পাটনার কমিশনরকে উত্তর দিয়া, নূতন দৃষ্টান্তটি পাঠাইয়া দিলেন, এবং উহা সর্ব্বত্র প্রচারের জন্য বোর্ডে পাঠাইলেন। ইলিয়ট চলিয়া গিয়াছেন। সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি বঙ্গের বিধাতাপুরুষ হইয়া আসিয়াছেন। সকল ডেপুটিরা সেলাম দিতে ছুটিয়াছেন। লাট-বেলাট দর্শনে আমি বড় অপটু, এবং তাহাতে আমার বড় অপ্রীতি। অথচ 'বেলভিডিয়ারে'র ছায়াতলে থাকিয়া, একমাত্র আমি 'প্রণামি' না দিলে, উহা লক্ষ্যের বিষয় হইবে বলিয়া আমার বন্ধুগণ বলিতে লাগিলেন। অতএব আমি একদিন 'বেলভিডিয়ার'মন্দিরে বঙ্গের রজত-গিরিনিভ দেবাদিদেবকে দর্শন করিতে গেলাম। প্রথমতঃ আমাদের জন্য সিবিলিয়ান শাস্ত্রানুসারে যে বাঁধা আলাপ আছে, কত দিন চাকরি, আলিপুরে কত দিন, আর কোথায় চাকরি করিয়াছি, তাহাই হইল। আমার ২৮ বৎসর চাকরি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন —"আপনার বয়স কত? আমি মনে করিয়াছিলাম, পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বৎসর।" আমি বলিলাম, সাত আট বৎসর বয়সে ত আর ডেপুটি কলেক্টর হওয়ার সম্ভাবনা নাই। আমার অমৃত ভায়ার কলু অনারারি মাজিষ্ট্রেট মধু বলিয়াছিল—"যেখানে যাই, সেখানে জাতের খোঁটা। এখন হইতে মধুসূদন ব্রহ্মানন্দ হইব।" আমি মনে করিলাম, আমিও এখন হইতে গোঁপে চুলে খড়ি মাখাইব। যেখানে সেখানে বয়সের খোঁটা! তারপর আমি তৌজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শুনিয়া তিনি বিস্ফারিতনয়নে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নূতন তৌজি মেনুয়েল সম্বন্ধে আপনার মত কি?" আমি বলিলাম—"স্বয়ং সার চালর্স ইলিয়ট ও আমার কলেক্টর মিঃ কলিন যাহার প্রণেতা, আমি 'অল্পবিষয়া মতি' কর্ম্মচারী তৎসম্বন্ধে কি মত প্রকাশ করিতে পারি।" তিনি বলিলেন—"উহা লইয়া চারি দিকে হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে। কেহ তাহার মাথা মুণ্ড (head or tail) ঠিক করিতে পারিতেছে না। আপনি উহার প্রচলনকার্য্য কিরূপ করিতেছেন?" আমি বলিলাম—"কই, আমি ত এ পর্য্যন্ত এমন খট্‌কা কিছু পাই নাই। বিশেষতঃ মিঃ কলিন আমার কলেক্টর।" তিনি হাসিয়া বলিলেন —"আপনি কিছু খট্‌কা পান নাই? 'তৌজি মেনুয়েল' সহজে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছেন? তাহা হইলে আপনার একটা প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত।" যাহা হউক, তৌজি-বিভ্রাটও ক্রমে কলের মত চলিতে লাগিল। কিন্তু যে সময়ের মধ্যে 'কিস্তওয়ার রিটার্ণ' দেওয়ার নির্দ্দেশ ছিল, সেই সময়ে উহা দেওয়া অসাধ্য হইল। কলিন মহা চটিলেন। বলিলেন আমি দয়া করিয়া আমলাদের খাটাইতেছি না। গরিবের ছেলেরা একবার প্রাতে আসিয়া ৯টা পর্য্যন্ত খাটে, তাহার পর রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত। ইহার উপর আমি ব্রাহ্ম ভায়াদের মত একটা '২৪ ঘণ্টাব্যাপী সঙ্গত' কিরূপে চালাইব? আমি কবুল জবাব দিলাম, আমি তাহা পারিব না। কলিন একটুক শান্ত হইলেন। আগের কিস্তে কত রাজস্ব উশুল হইয়াছে, তাহার ঠিক অঙ্ক কেহ দিতে পারিত না। দশ বিশ টাকা বেশি-কম হইত এবং ইহার জন্য ইংরাজ টলিত না। এখন এই ইলিয়টি খেয়ালে এক পয়সা বেশি-কম হইতে পারে না। পাশাপাশি ঘরে অঙ্ক বসাইতে যদি ভুলক্রমে রোডসেসের দু পয়সা রাজস্বের ঘরে, কি রাজস্বের দু আনা রোডসেসের ঘরে পড়িল, তবেই সর্ব্বনাশ। এই ভুল ধরিতে ১৫।২০ দিন যাবৎ সমস্ত চালান আবার তৌজির সঙ্গে মিলাইয়া, এই বৃটিশ-রাজ্যধ্বংসী ভুল বাহির করিতে হইবে। এই ভুলের জন্য 'রিটার্ণ' পাঠাইতে প্রত্যেক কিস্তে বিশ পঁচিশ দিন দেরি হইতে লাগিল। কলিন বড় চটিলে, আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম যে, এ রিটার্ণ দুই মাস, কি দুই বৎসর পরে গেলেও বৃটিশরাজ্যের ত কোন বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা

দেখিতেছি না, এই সকল বৃহৎ ও মহামূল্য রিটার্ণ আমি জানি, কমিশনরের আফিসে গেলে, কমিশনর দূরে থাকুক, পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টও একবার চোক বুলাইয়া দেখে না। একজন ২০্ টাকার কেরাণী তাহা পরীক্ষা করে এবং যে জেলার তৌজিনবিসের সঙ্গে তাহার সম্ভাব নাই, তাহার 'রিটার্ণে'র উপর 'টি'র মাথা কাটা যায় নাই, 'আই'য়ের উপর শূন্য পড়ে নাই, ঐ কলমের সঙ্গে ঐ কলমের এক পয়সা অমিল হইতেছে, ইত্যাদি গুরুতর তত্ত্বসম্বলিত এক রিজলিউশন লিখিয়া, পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টের ও কমিশনরের দস্তখত করিয়া, উক্ত তৌজিনবিসের উপকারার্থ পাঠান। তাহাতে কি লেখা থাকে, তাহাও কমিশনর, কি তাঁহার এসিস্টেণ্ট অনেক সময়ে জানেন না। অতএব এই 'রিটার্ণ' দুই দিন পরে গেলে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কি ক্ষতি? তিনি হাসিতে লাগিলেন। তার পর একদিন দেখিলাম, 'বোর্ড' লিখিয়াছেন—সময়মতে কোনও জেলাই 'রিটার্ণ' দিতে পারিতেছে না। আমাদের 'রিটার্ণ' বরং সর্ব্বাগ্রে গিয়াছে। অতএব 'রিটার্ণ' প্রেরণের সময় 'বোর্ড' দেড় মাস পিছাইয়া দিয়াছেন। কলিন আমাকে ডাকিয়া লইয়া, হাসিতে হাসিতে চিঠিখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"আরও দেড় মাস পরে রিটার্ণ গেলে বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে না।"

ইহার পর ডায়মণ্ড হারবারের সবডিভিসনাল অফিসার দশ দিনের ছুটি লইলে, কলিন সাহেব আমাকে বলিলেন যে, আলিপুরের ডেপুটিদের মধ্যে কাহারই সবডিভিসন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নাই। অতএব আমাকে যাইতে হইবে। আমি কলিকাতার কাষ্ঠ ইষ্টকের সৃষ্টিতে, এবং ধূম্র ধূলি পূতিগন্ধপূর্ণ বাতাসে আধমরা হইয়াছিলাম। আমি আনন্দের সহিত এই পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিলাম। ডায়মণ্ড হারবার প্রকৃতই স্থানমাহাত্ম্যে এক খণ্ড ডায়মণ্ড বা হীরক-বিশেষ। হীরক বন্দর উহার উপযুক্ত নাম। আদৃষ্টি-সীমা-বিস্তৃতা ও তরঙ্গায়িতা ভাগীরথীর তীরে একখানি সুন্দর গৃহ সবডিভিসনাল অফিসারের আবাস। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র সুরধুনীর স্নিগ্ধ সলিলকণাবাহী সমীরণে শরীরে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। ভাগীরথীর অপর তীরস্থিত মেদিনীপুর জেলার বৃক্ষশ্রেণী আকাশপটে একটি মনোহর কানন-চিত্রের মত শোভা পাইতেছে। স্মরণ হয়, সেই স্থানে রূপনারায়ণ, কি আর একটি বিস্তৃত নদ বা নদী ভাগীরথীর বিশাল বক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কি সুন্দর দৃশ্য! দশটি দিন আমি অতৃপ্ত নয়নে আপ্রভাত-অর্দ্ধরজনী এই শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিয়া এবং নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া, নব জীবন লাভ করিলাম। গঙ্গা হইতে একটা ক্ষুদ্র খাল (Creek) উঠিয়াছে। তাহার উভয় তীরে ডায়মণ্ড হারবার। মুন্সেফের আফিস ও বাজার অন্য তীরে। পার হইবার জন্য খেয়াঘাট ও তাহার শ্রুতিপ্রসিদ্ধ তরী। তাহাতে উঠিলেই, 'হরি! পার কর আমায়!' বলিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতে হয়। দুই চারি দিনে একবার উহা ডুবিয়া যায়। তার পর ভাগীরথীর জল-বায়ুতে পাপক্ষালন হইলেও তদ্দ্বারা ক্ষুধার ত নিবৃত্তি হয় না। অথচ ডায়মণ্ড হারবারে উহাই একমাত্র আহার্য্য বা পানীয় বলিলেও চলে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার পর মৎস্য ও তরকারিতে পরিপূর্ণ একটা ট্রেন কলিকাতায় রওনা হইয়া, পাঁচটার সময়ে সেখানে পৌঁছে। কিন্তু ডায়মণ্ড হারবারের মগরাহাটের হংসডিম্ব ও শুষ্ক মৎস্যই ভরসা। সাহেবদের তোষামোদী ও তস্য বংশধর কলিকাতাবাসী ডেপুটিরা ডায়মণ্ড হারবার একচেটিয়া করিয়াছেন। কলিকাতা অঞ্চলবাসীদের মিতব্যয়িতা প্রবাদমধ্যে পরিগণিত। ইহারা সত্য সত্যই বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকাই ইহাদের এক মাত্র ধ্যান। স্থানটির উন্নতির ভাবনা ইহাদের মস্তিষ্কে কখনও প্রবেশ করে নাই। আমি সকলকে বলিতাম, আমি স্থায়ী সবডিভিসনাল অফিসার হইলে দেখিতে দেখিতে খালের উপর সেতু নির্ম্মাণ করাইতাম, এবং রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে একটি কনষ্টেবল মোতায়েন করিয়া, আগে স্থানীয় বাজারের জন্য মাছ তরকারি রাখিয়া, পরে বেপারিদের অবশিষ্ট কলিকাতায় লইতে দিতাম। ফলতঃ দশটি দিন বড়ই আহারের

কষ্ট পাইয়াছিলাম। এ কারণে, এবং আমার দশ দিনের মাত্র কার্য্যে ও বিচারে স্থানীয় লোকেরা এত প্রীত হইলেন যে, তাঁহারা দল বাঁধিয়া আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা আমাকে এখানে স্থায়িরূপে রাখিবার জন্য আবেদন করিবেন। কেহ কেহ মিঃ কলিনের সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখা করিতে গিয়া এরূপ প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আমি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইলাম। কারণ, একে আমি বিশ বৎসর যাবৎ সবডিভিসনে সবডিভিসনে ঘুরিয়াছি, স্ত্রী পুত্র কলিকাতা ছাড়িতে নারাজ। তাহাতে স্থায়ী ডেপুটিবাবুও আমার একজন বন্ধু। যাহা হউক, বড় আনন্দে দশ দিন কাটাইয়া, ফিরিবার পর আবার কলিন আমাকে ডায়মণ্ড হারবারে প্রেরণ করিলেন। তাহার কারণ, দুই জন স্থানীয় জমিদারের মধ্যে একটা জমি লইয়া ঘোরতর বিবাদ বহু দিবস যাবৎ চলিতেছে এবং তাহা লইয়া ১৪৫ ও ১০৭ ধারা মতে দখলের ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রায় ১৫০ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। সবডিভিসনাল অফিসার লিখিয়াছেন যে, একজন সহকারী ডেপুটি না পাইলে তিনি কাজ চালাইতে পারিতেছেন না। কলিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি রাণাঘাটে আপনার কৃতিত্ব দেখিয়া আসিয়াছি। এই উৎপাত নিবারণের জন্য কিছু দিনের জন্য আপনাকে আবার ডায়মণ্ড হারবার যাইতে হইতেছে। আমি এ সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া আপনার ফাইলে দিয়াছি। আপনি কয়েক দিনের জন্য মগরাহাটে শিবির স্থাপন করিয়া, এই বিবাদ মিটাইয়া, কিম্বা এই সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া আসিবেন। আপনাকে অনুমান, মাস তিনেক থাকিতে হইবে। অবশ্য আপনি যখন ইচ্ছা, কলিকাতায় আসিতে পারিবেন।" আমি বড় চিন্তিত হইলাম। কোথায় সেই ম্যালেরিয়ার রাজ্যে গিয়া তিন মাস তাঁবুতে থাকিব! বর্ষাও আগতপ্রায়। যাহা হউক, এ ভাবের আদেশের প্রতিবাদ করাও উচিত নহে, করিলেও কোন ফল হইবে না। ওয়েষ্টমেকট আমার নাম শুনিয়াই ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। কলিন জিদ করিয়া আমাকে এই কার্য্যে পাঠাইতেছেন। অতএব ওয়েষ্টমেকটকে আর একবার আমার হাত দেখাইতে করকণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। আমি মগরাহাটে গেলাম। বৃহৎ হাট, কিন্তু তাঁবু ফেলিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই। এক স্থানে কোনও মতে উহা দাঁড় করাইলাম। সকলে বলিলেন—"কবি কি সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন, এবং দুই এক দিনের মধ্যে স্থানটি স্বর্গতুল্য করিয়াছেন।" এমন কি, ডেপুটি ও মুন্সেফবাবুরা পর্য্যন্ত একদিন ডায়মণ্ড হারবার হইতে এই উপন্যাস শুনিয়া বেড়াইতে আসিয়া আহার করিয়া গেলেন। আমি বিবাদটা বেশ তলাইয়া দেখিলাম। বুঝিলাম, এই এক রাশি ছাই-ভস্ম মোকদ্দমার বিচার করিতে গেলে উহা আমার বাস্তবিকই তিন মাসের খোরাক। একবার বিরোধীয় স্থানটি খুব ভাল করিয়া দেখিলাম। তাহার পর আমার পুরাতন 'পার্লিয়ামেণ্টারি' হাত চালাইলাম। উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া, খুব সম্মান ও সমাদর দেখাইয়া যোগশাস্ত্র বুঝাইলাম। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন—"আপনি বঙ্গদেশের গৌরব। আপনি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন,, আমরা মানিয়া লইব।" আমি মনে করিলাম, যদি এই বিগ্রহ মিটাইতে পারি, তবে যথার্থই 'বঙ্গদেশের গৌরব' হইব। একটুক চিন্তা করিয়া আমি এমন কৌশল করিলাম যে, উভয়ে আনন্দের সহিত আমার নিষ্পত্তি গ্রহণ করিলেন। তখনই উভয়ের দরখাস্ত লইয়া, সমস্ত মোকদ্দমা খারিজ করিয়া, কলিন বাহাদুরকে তখনই ট্রেনে একজন পেয়াদা পাঠাইয়া লিখিলাম যে, তিন মাসের কার্য্য আমি তিন দিনে নিষ্পন্ন করিয়াছি। তিনি আমাকে লম্বাচোড়া ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়া লিখিলেন যে, যে পর্য্যন্ত আমার নিষ্পত্তিমতে প্রজার সঙ্গে পাট্টা কবুলিয়ৎ উভয় পক্ষের লেখাপড়া হইয়া রেজিষ্টারী না হয়, সে পর্য্যন্ত আমাকে মগরায় থাকিয়া, এই বিবাদের অঙ্কুর পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিতে হইবে। আমিও তাই চাহি। কোনও কাজ নাই। প্রত্যহ দশটার ট্রেনে কলিকাতা হইতে আসিতাম, আবার চারটার ট্রেনে ফিরিয়া যাইতাম। সমস্ত দিন তাঁবুর খোলা বাতাসে বসিয়া সংবাদপত্রের

প্রবন্ধাদি লিখিতাম ও গল্প করিতাম। তিন দিনে আমি বহুবৎসরব্যাপী এই জটিল বিবাদ মিটাইয়াছি শুনিয়া আমার সবডিভিসনাল অফিসার বন্ধু পর্য্যন্ত বিস্মিত। তিনিও আমাকে বহু ধন্যবাদ দিয়া লিখিলেন—'সার্ভিসে' আমার এত বড় নাম কেন, তিনি এত দিনে বুঝিলেন। তাঁহারা আমার শিষ্যের উপযুক্ত।" যাহা হউক, আমি আরও সপ্তাহকাল মগরাহাটের বায়ু ভক্ষণ করিয়া, এবং পাট্টা কবুলিয়ৎ লেখা ও রেজিষ্টারি শেষ করিয়া আলিপুরে ফিরিলাম। এই সকল কারণেই কলিন স্বয়ং কটন সাহেবের কাছে গিয়া, ওয়েষ্টমেকটের গ্রাস হইতে আমার 'প্রোমোশন' উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কেরোসিনের আগুন

আমি রাণাঘাট ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম। কিন্তু সেই কেরোসিনের আগুন নিবিল না। আমার স্থানে যে 'কালা সিবিলিয়ান' গিয়াছিলেন, তিনি একজন বাঙ্গালী ধুতি-চাদর-পরা ডেপুটির কাপুরুষতা অবলম্বন করিবেন কেন? তিনি গরুড় সাজিলেন, এবং মাজিষ্ট্রেট-মিশনারি বিগ্রহ তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। শুনিলাম, তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়ে এই মহাবিগ্রহের মন্দিরে যাতায়াত ও তাঁহার চরণে তৈল মর্দ্দন করিতেছেন। তাহার ফলে তৎক্ষণাৎ সেই কেরোসিন ডিপোর স্বত্বাধিকারীর নামে উহা বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদারির কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারামতে নোটিস জারি হইল। 'ভাঁড়ু দত্ত' বগল-বাদ্য করিয়া রাণাঘাটে নৃত্য করিতে লাগিল। এ দিকে সেই 'ডিপো'র স্বত্বাধিকারী কেরোসিন ব্যবসায়ী গ্রাহাম কোম্পানির কর্ম্মচারী ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া, হাই-কোর্টে ঐ নোটিসের বিরুদ্ধে মোসন উপস্থিত করিলেন। হাইকোর্ট হইতে ঐ নোটিসের বিরুদ্ধে মোসন উপস্থিত করিলেন। হাইকোর্ট হইতে নোটিস 'রুল' জারি হইল। কেরোসিনের আগুন কলিকাতার সংবাদ পত্রে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।. বিগ্রহ, তস্য বাহন, ও নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট—জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলভদ্র—কালা পাহাড়ের এই আগুনে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কালা পাহাড়ও বুঝি, এমন কেরোসিনের আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছিল না। অমৃত পদার্থটি অর্থাৎ সিভিল সার্ভিসের 'প্রেষ্টিজ' (প্রভুত্ব) এই অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য কমিশনর অষ্টমেকট ছুটিলেন। সকলে চূর্ণীতে ঝাঁপ দিলেন। রাণাঘাটে একটি মহতী কিষ্কিন্ধ্যা-সভা বসিল। চারিটি মস্তক বহু কণ্ডুয়নের পর 'রুলে'র কৈফিয়ৎ লেখা হইল। কিন্তু বাইবেল ত রুলের কৈফিয়ৎ নাই। তদ্ভিন্ন বাইবেল বলে, "ঈশ্বরের নামে শপথ করিও না।" কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজ-রাজ্যের ধর্ম্মাধিকরণে ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য না দিলে কোন কথাই প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয় না। খ্রীষ্টধর্ম্ম ধ্বংসই খ্রীষ্টধর্ম্মালম্বীদের ধর্ম্মাধিকরণের মূল মন্ত্র! নথিতে কোনও প্রমাণ দূরে থাকুক, কোনও পুলিস-রিপোর্ট, কি নালিশ পর্য্যন্ত নাই যে, এই 'ডিপো'টা সাধারণের পক্ষে আশঙ্কাজনক। কি সর্ব্বনাশ! অতএব বাইবেল এই কেরোসিনের আগুনে পোড়াইয়া, 'অষ্টমেকট' স্বয়ং সাক্ষী সাজিয়া এবং শপথ করিয়া হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের কাছে গোপনে এক 'এফিডেভিট' বা সাক্ষ্যপত্র এই মর্ম্মে দাখিল করিলেন যে, কেরোসিন ডিপোটি রাণাঘাটবাসীর পক্ষে একটা ঘোরতর আশঙ্কাজনক পদার্থ। রুলের শুনানির দিন এই মহামূল্য দলিলখানি খ্যাতনামা জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ দেখিলেন। রাণাঘাটের ত্রিমূর্ত্তির অদৃষ্ট মন্দ যে, এই মোকদ্দমা তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল। তিনি একে কৃষ্ণাঙ্গ, তাহাতে স্বাধীনচেতা, বিচার-ক্ষেত্রে দৃঢ় অটল। খ্রীষ্টধর্ম্মে ত 'বাপতাইজ' হন নাই, সিবিল সার্ভিসের 'প্রেস্টিজ'-রক্ষা-ধর্ম্মেও তাঁহাকে 'বাপতাইজ' করা অসম্ভব। নথিতে এই 'এফিডেভিট' কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 'ডেপুটি লিগাল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার' বলিলেন, তিনি তাহার কোন খবরই রাখেন না। তিনি উহা খ্রীষ্টধর্ম্মের একটা 'মিরাকেল' বা অলৌকিক কার্য্য বলিলেও

'হিদেন' চন্দ্রমাধব বিশ্বাস করিতেন না। তখন রেজিষ্ট্রারকে ডাক পড়িল। তিনি কম্পিত-কলেবরে কোর্টের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া কবুল জবাব দিলেন। "জগদম্বা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" তিনি বলিলেন যে, অষ্টমেকট উহা গোপনে দাখিল করিয়া, নথিভুক্ত করিয়া রাখিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অষ্টমেকট একজন ডিভিসনাল কমিশনর, সিবিল সার্ভিসের পুরাতন কর্ম্মচারী, রেজিস্ট্রার যুবক। কাজেই তিনি উহা বৈধ কার্য্য বলিয়া, কমিশনরের এই গুপ্ত পাপের প্রতিবন্ধকতা করেন নাই। তখন কেরোসিনের আগুন গিয়া 'অষ্টমেকটে'র ঘাড়ে পড়িল। তাঁহার নামে এই অবৈধ কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিবার জন্য 'রুল' জারি হইল। হাইকোর্টে ও কলিকাতার সংবাদপত্রে একটা হাসির তুফান ছুটল! নিরূপিত দিবসে চক্ষুদানের পাঁঠার মত ক্ষুদ্রাকৃতি অষ্টমেকট দৃষ্টিহীন চক্ষে ডবল চশমা চড়াইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কোর্টে উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন—"দোহাই তোমাদের, বাবা! ঘাট হয়েছে। আর এমন করবো না।" জষ্টিস চন্দ্রমাধবের এজলাস কৃষ্ণ-গাউনধানী ব্যারিষ্টার এবং শকট-চক্র-শীর্ষ উকিল ও বহুপরিচ্ছদ-সজ্জিত দর্শকে পূর্ণ হইয়াছিল। চারি দিকে বিদ্রূপাত্মক চাপা হাসি। আর বিদ্রূপের পাত্র কে, স্বয়ং অষ্টমেকট, যাহার নামে ডেপুটি ও কেরাণীদের বক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং পৃথিবীটিও যাঁহার অভিমান ও বদ মেজাজে'র ভার-বহনে অক্ষম! তাঁহার ফাঁসি হইলেও বোধ হয়, এরূপ কষ্ট তাঁহার হইত না। হাইকোর্ট কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিলেন। তাঁহার মহামূল্য 'এফিডেভিট' অবিশ্বাস করিয়া, এবং প্রভুর চেলা রাণাঘাটের ও নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটের বিচারে সন্দিহান হইয়া, কেরোসিন-ডিপোর মোকদ্দমার বিচারভার হুগলির মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পণ করিলেন। অষ্টমেকট মুমূর্ষু অবস্থায় হাইকোর্ট হইতে কোনওরূপে ডবল চশমার সাহায্যে নামিয়া রাণাঘাট ছুটিলেন। কিন্তু 'বাইবেলে' চন্দ্রমাধব-বধের কোনও বিধান পাওয়া গেল না। হুগলির মাজিষ্ট্রেট গিক সাহেবকে বশীকরণের কোন মন্ত্রও 'বাইবেলে' নাই। সকল চেষ্টা নিষ্ফল হইল। মিঃ গিক নিজে সিবিলিয়ান হইয়াও সিবিল সার্ভিসের মাহাত্ম্য, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মের এই অধ্যায় কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন না। তিনি রাণাঘাটে আসিয়া, কেরোসিন-'ডিপো' দেখিয়াই রাণাঘাটের কালা সিবিলিয়ান সবডিভিসনাল অফিসারের এই ঐতিহাসিক নোটিশ রহিত করিয়া দিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, 'ডিপো' রাণাঘাটবাসীর কোনওরূপ আশঙ্কার কারণ হইতে পারে না। কি ভয়ানক কথা! একজন মাজিষ্ট্রেট-মিশনারির জিদ, শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ দুই মাজিষ্ট্রেটের অফিসিয়াল পৃষ্ঠপোষকতা ও একজন কমিশনরের শপথোক্তি, সকলই মিথ্যা হইল! আশ্চর্য্য যে, বঙ্গদেশটা তখনই বঙ্গোপসাগরের অতলে ডুবিয়া গেল না!

কেরোসিনের আগুন এইরূপে রাণাঘাটে নিবিল। কিন্তু তাহার সহিত প্রভুদের মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই কেরোসিনের আগুন আমার কপালে আসিয়া পড়িল। শুনিলাম, রাণাঘাটের কালা সিবিলিয়ান তাঁহার বাহক ত্রিমূর্ত্তিকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহাদের এই অকথ্য পরাভব ও অপমানের মূল কারণ আমি। আমি বড় ক্ষমতাশালী লোক, সংবাদপত্রে যে কেরোসিনের আগুন জ্বলিয়াছিল, উহা আমারই কার্য্য, ঐ সকল প্রবন্ধ আমারই লেখা, হাইকোর্টে মোকদ্দমা আমি চালাইয়াছি, জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ আমার মত পূর্ব্ববঙ্গ-বাসী ও আমার বন্ধু। তখন—

> "কোতোয়াল, যেন কাল, খাড়া ঢাল ঝাঁকে।
> ধরি বাণ, খরসান, হান্ হান্ ডাকে॥"

তিন মহারথীই—বিশেষতঃ অষ্টমেকট তখন আমাকে নিপাত করিতে ছুটিলেন। একদিন প্রাতে চিফ সেক্রেটারি কটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, তিনি ম্লান ও গম্ভীরমুখে বলিলেন—"নবীন! ওয়েষ্টমেকট তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত মন্দ মন্তব্য লিখিয়াছে। তোমার

বড় বিপদের কথা!" আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি বলিলাম, আমি কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, তিনি আমার প্রতিকূলে এরূপ মন্তব্য লিখিয়াছেন। কটন্ তখন আমাকে একটা বাক্স দেখাইয়া, উহা হইতে উপরের 'ফাইল'টা বাহির করিয়া লইতে বলিলেন। আমি উহা উঠাইয়া দিলে তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের সাল-তামামির ষ্টেটমেণ্ট খুলিয়া আমাকে দেখাইলেন। ওয়েষ্টমেকট আমার প্রতি এক ত্রিশূল ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে লিখিয়াছেন, আমি (১) কার্য্য হইতে পাশ কাটাইয়াছি, (২) শিবিরে ফৌজদারি মোকদ্দমা মোটে লই নাই, এবং (৩) সাক্ষীদিগকে বহুদিন জবান-বন্দি না করিয়া ঘুরাইয়াছি। শেষে চুম্বক পাথরের মত ইহার উপর চুম্বক বসাইয়াছেন—(Bad) মন্দ। আমি বলিলাম, প্রথম ও তৃতীয় কথা একেবারে মিথ্যা। যদি কটন সাহেব একবার রাণাঘাট পরিদর্শন করিতে যান, কিম্বা একটা ষ্টেটমেণ্ট তলব করেন, তিনি দেখিবেন যে, আমি রাণাঘাট ত্যাগ করিবার সময়ে কোন কার্য্যই বাকী রাখিয়া আসি নাই। ফাইলে সামান্য কয়েকটি মোকদ্দমা ছিল মাত্র। আর সাক্ষীকে আমি প্রায়ই প্রথম দিনই বিদায় দিয়াছি। তবে শিবিরে মোকদ্দমা লই নাই, তাহা সত্য। কারণ, শিবিরে মোকদ্দমা লইলে অর্থী প্রত্যর্থী ও সাক্ষীদের এবং আমলা মোক্তারদের অত্যন্ত কষ্ট হয়। আমার আন্দোলনের ফলে এই কারণে সার ষ্টুয়ার্ট বেলি আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা সপ্তাহের অর্দ্ধেক সময়ে শিবিরে থাকিয়া মফঃস্বলের কার্য্য করিবে, এবং অপর অর্দ্ধেক সময়ে যথাসাধ্য মহকুমায় থাকিয়া ফৌজদারি কার্য্য করিবে। যে যত অল্প মোকদ্দমা শিবিরে লইবে, তাহার ততই কার্য্যকারিতা স্বীকৃত হইবে। আমার জ্ঞাতসারে কোনও সব-ডিভিসনাল অফিসার এ আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। অথচ কেবল রাণাঘাট নহে, ফেনীতেও নয় বৎসর কাল আমি এই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব কোথায় এই কার্য্য-দক্ষতার জন্য আমি পুরস্কৃত হইব, না আমি অপরাধী হইলাম। কটন বলিলেন—কেবল ইহা নহে। মহাপ্রভু স্বয়ং লেঃ গবর্ণরের কাছে আমার প্রতিকূলে যথাসাধ্য বলিয়া, তাঁহার মন আমার প্রতি এরূপ বিষাক্ত করিয়াছেন যে, কটন সাহেব আশঙ্কা করেন যে, এবার আমার 'প্রোমোশন' মারা যাইবে। আমি বলিলাম, আমি ওয়েষ্টমেকটের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করিতে পারি কি? তিনি বলিলেন, এই মন্তব্য যে নিতান্ত গোপনীয় (most confidential), তাহা আমি জানি। তিনি আমাকে অনুগ্রহ করেন বলিয়া উহা আমাকে দেখাইয়াছেন। অতএব আমি উহার প্রতিবাদ করিব কি প্রকারে? আমি বলিলাম, তবে কি তিনি আমাকে চিরদিন অনুগ্রহ করিয়া, এবং আমার কার্য্যের বিষয় সম্পূর্ণ জানিয়া শুনিয়া, আমাকে এরূপে অবিচারে মারা যাইতে দিবেন। তিনি বলিলেন, তিনি যত দূর পারেন, আমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু মিশনারি প্রভু সার চার্লস্ ইলিয়টের মন আমার প্রতি যেরূপ বিষাক্ত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইবেন বড় আশা নাই। ফলে তাহাই হইল। ওয়েষ্টমেকটের মন্তব্যের কটন ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া লিখিলেন যে, তিনি নিজেই আমাকে বহুদিন হইতে প্রভিন্সিয়াল শাসন-বিভাগে একজন নিতান্ত দক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া জানেন। এমন কি, এরূপ যোগ্য কর্ম্মচারী, এবং সবডিভিসন শাসনে এরূপ সিদ্ধহস্ত লোক সার্ভিসে অতি অল্প আছে বলিলেও হয়। তবে আমার দোষ, আমি বড় স্বাধীনচেতা। আমি উপরিস্থের মন যোগাইয়া কার্য্য করিতে জানি না। এজন্য সময়ে সময়ে উপরিস্থ কর্ম্মচারীর এরূপ বিরাগভাজন হইয়া থাকি। কিন্তু তজ্জন্য আমার প্রোমোশন বন্ধ করা উচিত হইবে না। "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" ইলিয়ট তাহা শুনিবার লোক নহেন, শুনিলেনও না। আমাকে ডিঙ্গাইয়া, আমার নীচের দুই জনকে প্রোমোশন দিলেন। তাঁহাদের একজন আলিপুরেই ছিলেন। তিনি নিজে বিস্মিত হইয়া আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমার সৌভাগ্যবশতঃ ওয়েষ্টমেকট আমেরিকার 'রেটেল' সর্প (rattle snake) বিশেষ। ভয়ানক বিষাক্ত বলিয়া, রেটেল সর্প হইতে জীবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বর তাহার গতিতে ঝনঝনির মত একরূপ শব্দ দিয়াছেন যে, সেই জন্যই তাহার নাম 'রেটেল সর্প'। 'রেটেল' অর্থ শিশুদের ঝুনঝুনি। তদ্রূপ ওয়েষ্টমেকটকেও ঈশ্বর বিষের অধিকারী করিয়া, জীবদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সেই বিষ প্রয়োগের উপযুক্ত শক্তি তাহাকে দেন নাই। তাহার দংশনের দোষেই অনেকে তাহার দন্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সে কেবল 'অত্যন্ত গোপনীয়' সালতামামির ষ্টেটমেন্টে এরূপ মন্তব্য লিখিয়া চুপ করিয়া থাকিলে আমার আর রক্ষার উপায় ছিল না। কিন্তু সে তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, ঐরূপ মন্তব্য তাহার সালতামামিতেও লিখিয়াছে, এবং বেঙ্গল আফিসের কোন কেরাণী জ্ঞাত কি অজ্ঞাতসারে গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক মন্তব্যমধ্যে উক্ত ত্রিশূল উদ্ধৃত করিয়া, কলিকাতা গেজেটে ছাপিয়া দিয়াছে। আমি তখন ছুটিয়া কটন সাহেবের কাছে গিয়া বলিলাম যে, এখন ত আর ওয়েষ্টমেকটের মন্তব্য 'অত্যন্ত গোপনীয়' মূল্যবান্ রাজকীয় দলিল (State document) নহে। তাঁহার হাঁড়ি এখন হাটের মাঝে ভাঙ্গিয়াছে। অতএব কটন অনুমতি দিলে আমি এখন প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার ত্রিশূল বায়ব্যাস্ত্রে উড়াইয়া দিতে পারি। কটন উক্ত মন্তব্য 'কলিকাতা গেজেটে' প্রকাশিত হইয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। গেজেট দেখিয়া বলিলেন, উহা বেঙ্গল আফিসের ভুলেই ছাপা হইয়াছে। "যাহা হউক, যখন ছাপা হইয়াছে"—তিনি ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তখন তুমি ইহার প্রতিবাদ করিতে পার, কিন্তু উহাতে আগুন ঢালিও না, খুব সংযত ভাষায় প্রতিবাদ করিও।" তাঁহার হাসিতে বোধ হইল যে, ইলিয়ট তাঁহার এরূপ তীব্র মন্তব্যের সম্মান না করিয়া, আমার প্রোমোশন রহিত করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি অন্তরে আঘাত পাইয়াছিলেন, এবং এই মন্তব্য ছাপা সম্বন্ধে তিনি নিতান্ত অনভিজ্ঞ নাও থাকিতে পারেন। বোধ হয়, ওয়েষ্টমেকট ও ইলিয়টকে অপ্রতিভ করিবার জন্য তিনি উহা ছাপা সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করেন নাই। আমি বলিলাম, প্রতিবাদ লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইব। তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই। আমি ইচ্ছা করিলে যে সংযত ভাষায় বিচক্ষণ প্রতিবাদ লিখিতে পারি, তাহা তিনি জানেন। তবে আমার প্রকৃতিতে অগ্নির আধিক্য বলিয়া সাবধান করিয়া দিলেন মাত্র।

আমি তখন রাণাঘাট হইতে অঙ্ক আনাইয়া দেখাইলাম যে, ওয়েষ্টমেকটের প্রথম ও তৃতীয় অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, এবং দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে লিখিলাম যে, সবডিভিসনাল অফিসারের মধ্যে একা আমিই সম্পূর্ণরূপে সার ষ্টুয়ার্ট বেলির আদেশ পালন করিতে পারিয়াছি। অতএব এই কার্য্যকারিতার জন্য দণ্ডিত না হইয়া পুরস্কৃত হইবার যোগ্য। প্রতিবাদ ছাপিয়া কটন সাহেবের হাতে দিলে তিনি উহা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রাখিলেন। তাঁহার ভাবে বোধ হইল, তিনি বুঝিলেন—এবার ইলিয়ট, ওয়েষ্টমেকট ও খঞ্জপাদ মিশনারি প্রভুকে চিনিবেন। ইলিয়ট একগুঁয়ে হইলেও ও মত সত্যের অপলাপ করিয়া লোকের অনিষ্ট করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন না। আবার তিন মাস পরে প্রোমোশনের সময় আসিয়াছে। আলিপুরের কলেক্টর মিঃ কলিন (Collin) তিন মাসের জন্য নদীয়ার কলেক্টর হইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে আমার রাণাঘাটের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার প্রতি তাঁহার সুনজর পড়িয়াছিল। তিনি মিশনারি প্রভুর আমার প্রতি খ্রীষ্টধর্ম্ম-কথাও জানিতেন। সেই জন্য আলিপুরে মিঃ কলিনের কৃত 'তৌজি মেনুয়েল' পরিচালনের ভার আমার উপর দিয়াছিলেন। উহাতে সমস্ত দেশ তোলপাড় হইতেছিল। স্বয়ং সার চার্লস্ ইলিয়ট ও তিনি এই 'তৌজি মেনুয়েল' প্রণেতা। ইহার কথা পরে লিখিব। এই কার্য্য উপলক্ষ্যেও তিনি আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে এ সময়ে একদিন কথায় কথায় এই 'কেরোসিন-ডিপো'র উপাখ্যান এবং আমার পোড়া কপালে যে পোড়া কেরোসিনের আগুন তখনও জ্বলিতেছিল, তাহা বলিয়া আমার প্রোমোশনের জন্য

দুটি কথা মিঃ কটনকে বলিতে বলিলাম। তিনি উপাখ্যান শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বোধ হইল, তিনিও ওয়েস্টমেকটের প্রতি বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। শুনিয়াছি, এই হতভাগ্যের আপন পরিবারবর্গও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট নহে। তিনি বলিলেন, তিনি সেই রাত্রিতে কটনের বাড়ী আহার করিবেন, এবং সে সময়ে আমার কথা বলিবেন। সেই রাত্রি প্রায় এগারটার সময়ে তিনি আলিপুর হইতে আর্দ্দালির দ্বারা এক পত্র পাঠাইয়াছেন। আগ্রহের সহিত খুলিলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, কটনের সঙ্গে আমার সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হইয়াছে। তিনি বড় সুখী হইয়াছেন যে, সেই গেজেটেই আমি প্রোমোশন পাইব। আমি পরদিনই আলিপুর হইতে আসিবার সময়ে আমাদের ছোট চিত্রগুপ্ত বেঙ্গল আফিসের হেড এসিস্টেন্ট মহাশয়ের কাছে গিয়া খবর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, মুখে আর কি বলিব, কত বড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, আপনি স্বচক্ষে ফাইল দেখিলে বুঝিবেন। আপনি বাহাদুর! ওয়েস্টমেকটের মত দুষ্ট লোককে এমন জব্দ হইতে আমি আর দেখি নাই। ফাইল আনাইয়া আমাকে দিলে খুলিয়া দেখিলাম, কটন বাহাদুর পুর্ব্ববার প্রোমোশনের সময়ে উক্তরূপ প্রতিবাদ করিলে, ইলিয়ট তাহার নীচে কথাটি মাত্র না বলিয়া কেবল লিখিয়াছেন—"না, নীচের দুজনকে প্রোমোশন দাও।" এবারও কটনের অনুকূল মন্তব্যের নীচে ইলিয়ট লিখিয়াছিলেন—"নবীনের নীচের ব্যক্তিকে প্রোমোশন দাও।" কটন তাহার নীচে লিখিয়াছেন—"নবীন প্রতিবাদ করিয়াছে। তাহার প্রতিবাদ সঙ্গীয় ফাইলে আছে। উহা দেখুন।" ইলিয়ট তাহার নীচে লিখিয়াছেন—"আচ্ছা। নবীনকেই প্রোমোশন দাও।" ছোট চিত্রগুপ্ত হাসিয়া বলিলেন—"দেখলেন তামাসা! কাল গেজেটেই প্রোমোশন পাইবেন।" তখনই কটন বাহাদুরের কাছে গিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলে, তিনি তাঁহার অভ্যস্ত কৌতুক-কণ্ঠে বলিলেন—"আস্তে! এখনও বড় ভরসা করিও না। তোমার বন্ধুরা এই রাত্রির মধ্যে একটা বিপ্লব ঘটাইতে পারে।" তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তাহারা বড় ক্ষমতাশালী লোক। একজন সার চার্লস্ ইলিয়টের বিশেষ বন্ধু। অতএব এখন হইতে বড় সাবধানে কার্য্য করিও। আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি যে, তোমার সম্বন্ধে কলিনের এত উচ্চ মত।"

তাঁহার আশঙ্কা অমূলক হইল না। ওয়েস্টমেকট এবারও নিষ্ফল-মনোরথ হইয়া আমার উপর আরও খড়্গহস্ত হইলেন। কলিন থাকিতে তিনি নীরব রহিলেন। যেই কলিন তিন মাস ছুটি লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার স্থানে মিঃ ভিনসেণ্ট (Vincent) আসিলেন, অমনি মেকট তাঁহাকে লিখিলেন যে, আলিপুরে কার্য্য অল্প বলিয়া ডেপুটি কলেক্টরেরা চেষ্টা করিয়া আলিপুরে বদলি হইয়া আসে। তিনি শুনিয়াছেন যে, আমার কোনও কাজ নাই। অতএব কোন্ ডেপুটির হাতে কি কার্য্য আছে, তাহার এক রিপোর্ট চাহিয়াছেন। মিঃ ভিনসেণ্টও লোক ভাল। তিনি আমাকে ডাকিয়া এই পত্র দেখাইয়া, আমার প্রতি মেকটের বিশেষ কৃপার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমূল বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলে, তিনি খুব হাসিলেন। যাহা হউক, কার্য্য ভাগের রিপোর্ট গেল। তাহার উপর মেকটের আদেশ আসিল যে, আমার হাতে কোনও কাজ নাই বলিলে চলে। অতএব সম্প্রতি স্থানান্তরিত জইণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারি কার্য্যভার আমার স্কন্ধে চাপাইতে আদেশ করিয়াছেন। কলেক্টর বলিলেন, আমার হাতে তিনটি বড় ডিপার্টমেণ্ট রহিয়াছে— তৌজি, রোডসেস্ ও বাঁধ। তাহার মধ্যে নূতন 'তৌজি মেনুয়েল' নিবন্ধন প্রথমটি বড়ই উৎকট কার্য্য। তাহার উপর জইণ্টের ফৌজদারি ফাইলও আমাকে দিলে আমি কার্য্য কিরূপে চালাইব, তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি বলিলাম, তিনি প্রতিবাদ করিলেও মেকট আমাকে ছাড়িবে না। অতএব এ কার্য্যও আমার স্কন্ধে পড়িল। তবে ফৌজদারি কার্য্যে আমি সিদ্ধহস্ত। বড় বড় সবডিভিসনের কার্য্য ২০ বৎসর যাবৎ করিয়া আমার

হাত পাকিয়া গিয়াছে, এবং ফৌজদারি কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আমি কার্য্যের একটুক নিয়ম ও শৃঙ্খলা করিয়া লইয়া, এ কার্য্যও অনায়াসে চালাইতেছিলাম। বোধ হয়, ডেপুটিদের মধ্যে কেহ মেকটের গোয়েন্দা ছিলেন। সার্ভিসে এরূপ নরাধমের অভাব নাই। ইহারা সহ-কর্ম্মচারীদের পৃষ্ঠদংশন করিয়া আপনার উন্নতির পথ পরিষ্কার করে। মেকট আবার কিছুদিন পরে লিখিলেন যে, তিনি অবগত হইয়াছেন, এখনও যথেষ্ট কার্য্য আমার হস্তে নাই। আমি বারটার সময়ে আফিসে গিয়া চারিটার সময়ে চলিয়া আসি। তাহা ঠিক। উহা আমার চির নিয়ম। অতএব এখন হইতে কলেক্টর মফঃস্বলে যাইবার সময়ে তাঁহার কার্য্যভার আমার হাতে দিয়া যাইতে আদেশ দিয়াছেন। মিঃ ভিনসেণ্ট আমাকে এই পত্রও দেখাইলেন, এবং কিরূপে আমি এত কার্য্য চালাইব, তাহা ভাবিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, জেলার ভার আমার হাতে দিলে আমার 'সিনিয়ার' ডেপুটিদেরও অপমান করা হইবে। তিনি বলিলেন, সিনিয়ারদের মধ্যে ফৌজদারি কার্য্যাভিজ্ঞ এমন কেহ নাই যে, তিনি জেলার ভার তাঁহার হাতে দিতে পারেন। অতএব মেকটের এ আদেশ না আসিলেও ফৌজদারি মোকদ্দমা আমার হাত হইতে উঠাইয়া লইয়া, তাঁহার মফঃস্বল যাইবার সময়ে জেলার ভার আমার হাতে রাখিয়া যাইতে তিনি নিজেও সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমি উহাও যেরূপে পারি চালাইব। তিনি তজ্জন্য যেন চিন্তা না করেন। তিনি মফঃস্বল চলিয়া গেলে, আমি আবার আমার স্কন্ধের কার্য্যের নূতন নিয়ম করিলাম। আফিসে গিয়া সবডিভিসনের মত আমি প্রথমতঃ চিঠি ও রিপোর্টের কার্য্য করিতাম। তজ্জন্য প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্ট হইতে বাক্স আসিয়া আমার আফিসে পেঁছিবার পূর্ব্বে সজ্জিত থাকিবে। এ কাজ শেষ করিয়া আমি ফৌজদারীতে হাত দিতাম। তাহার পর অন্যান্য কলেক্টরি ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য বারটা হইতে চারিটার মধ্যে শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম। অবশ্য কার্য্য ক্ষিপ্রতার সহিত করিতে হইত। এমন কি, আমার পূর্ব্ব অভ্যাসমতে এক সময়ে দুই তিনটি কাজ করিতাম। এবার মেকট নাচার হইলেন। তিনি ত আর সমস্ত আলিপুরের কার্য্য আমার ঘাড়ে চাপাইতে পারেন না। বিশেষতঃ এ সময়ে মিঃ কলিন ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার রিপোর্টমতে তৎক্ষণাৎ একজন জইণ্ট আসিলেন, এবং আমি উপরোক্ত দুই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কারণ, সাদা জইণ্ট থাকিতে কালা ডেপুটির উপর জেলার কার্য্যভার দিলে সিভিল সার্ভিসের কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিত। ইহার পর মেকট আর হাত দেখাইলেন না। কেবল বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী লিখিবার সময়ে প্রত্যেক বৎসর রাণাঘাটের কেরোসিনের আগুনে তাঁহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইত, এবং তিনি আমার প্রতিকূলে ঘোরতর মন্তব্য লিখিয়া সে জ্বালা নিবাইতে চেষ্টা করিতেন—

"এ ভীষণ জ্বালা যদি পারি নিবাইতে।"

চণ্ডী, খ্রীষ্ট ও অমিতাভ

'রৈবতকে'র মত 'কুরুক্ষেত্র' শেষ করিয়াও উহা কিরূপে গৃহীত হয়, দেখিবার অপেক্ষায় 'প্রভাসে' হাত দিলাম না। এই অবসর সময়ে চণ্ডীর অনুবাদ ও বাইবেলের 'মেথু গস্‌পেলে'র অনুবাদ রচনা ও প্রকাশ করি। আমার উদ্দেশ্য, সমস্ত অবতারদের লীলা একবার ধ্যান করিয়া বুঝিতে, এবং যেরূপ নিজে বুঝি, তাহা বুঝাইয়া পরস্পর ধর্ম্মদ্বেষ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব। এই পরস্পর ধর্ম্মদ্বেষবশতঃ পৃথিবীতে, বিশেষতঃ ইউরোপ-খণ্ডে ধর্ম্মের নামে যত ঘোরতর অধর্ম্মের কার্য্য হইয়াছে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় নাই। ব্রাহ্মদের 'লিবারেল' পত্রিকায় মনস্বী কৃষ্ণবিহারী সেন 'খ্রীষ্টে'র অনুবাদের ও ভূমিকার একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মের সামঞ্জস্য (Harmony of Scriptures) ব্রাহ্মরা অনেক দিন হইতে

প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুপক্ষ হইতে উহা আমার দ্বারা এই ভূমিকায় বিচক্ষণতার সহিত প্রথম প্রদর্শিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের শিক্ষার মত এমন সরল শিক্ষা এক স্থানে বোধ হয় অন্য কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে নাই। উহা শিশুরা পর্য্যন্ত বুঝিতে ও শিখিতে পারে। 'খ্রীষ্ট' রচনা করিবার ইহাই আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্মের জন্মস্থান এসিয়া। খ্রীষ্টও এসিয়ার লোক। কেবল তাহা নহে, তাঁহার চিত্র ও চরিত্র দেখ, দেখিবে—তিনি একজন কোপীনধারী হিন্দু সন্ন্যাসী। তিনি ত্রিশ বৎসর কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন, তাহা কেহই জানে না। ইতিহাস বলে, সেই সময়ে মিশরের রাজধানী আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে ভারতীয় সমস্ত গ্রন্থ এবং ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ছিলেন। বাইবেলে দেখি যে, খ্রীষ্ট বাল্যে এই মিশরে গিয়াছিলেন। ইতিহাস আরও বলে যে, সে সময়ে জেরিউজেলামের নিকট বৌদ্ধ সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় ছিল। একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীই প্রচার করেন যে, খ্রীষ্ট আসিয়াছেন, এবং ভারতবর্ষের দিক্ হইতে জ্ঞানী লোকেরা গিয়া প্রচার করেন তিনি আসিয়াছেন, এবং ভারতীয় ধর্ম্মমতে তাঁহার পূজা করেন। অতএব খ্রীষ্ট কি এই ত্রিশ বৎসর ভারতীয় শিক্ষক ও সন্ন্যাসীদের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছিলেন? এই ত্রিশ বৎসর অরণ্যে শিক্ষা ও সাধনার নাম কি বাইবেলোক্ত খ্রীষ্টের 'চল্লিশ দিনের অরণ্যভ্রমণ'?

ইহার পর 'অমিতাভ' লিখিতে আরম্ভ করি। 'অমিতাভ' শ্রীবুদ্ধদেবের এক নাম। ফেনীতে 'অমিতাভে'র দুই তিন সর্গ মাত্র লিখিত হইয়াছিল। ফেনী ক্ষুদ্র সবডিভিসন। ক্ষুদ্র বলিয়া আমার সাহিত্য-সেবার সুবিধার জন্য উহা বাছিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে প্রাতঃকালে একটু লিখিবার সময় পাইতাম। রাণাঘাট সবডিভিসন একে কলিকাতার কাণের কাছে, তাহাতে উহা বহু শিক্ষিত লোকের বাসস্থান, তাহার উপর তিনটা মিউনিসিপ্যালিটির ভার আমার স্কন্ধে। কাজেই সকাল বেলাটাও প্রায় অন্য কাজে কাটিয়া যাইত। অতি কষ্টে পাঁচ সাত দিন পরে দুই চারি লাইন লিখিয়া কাব্যখানি শেষ করিয়া আনিলাম। বলিয়াছি, বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্ম্মের লীলাভূমি বেহার দর্শন করিয়া, এবং সেখানে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমি বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমায় অভিভূত হইয়াছিলাম। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মত বেহারে 'অমিতাভে'র বীজও আমার হৃদয়ে রোপিত হয়। উহা ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া এত কাল পরে এই কাব্যবৃক্ষে পরিণত হইতে চলিল। বেহারেই বৌদ্ধধর্ম্মের বহু গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। তাহার পরও অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্র, এমন কি—এডুইন আর্ণল্ডের 'লাইট অফ এসিয়া'য় (Light of Asia) পর্য্যন্ত বুদ্ধ-চরিত্র অতিরঞ্জিত, অতিমানুষিক ভাবে চিত্রিত। তাহাতে ঠিক রক্ত-মাংসের বুদ্ধ দেখিতে পাই না। অথচ অবতারেরা মানুষ ছিলেন, মনুষ্য-দেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষের মত কার্য্য করিয়া, মানুষের শিক্ষাদানই অবতারত্বের একমাত্র সার্থকতা। অতি-মানুষিকের কার্য্য মানুষে করিতে পারিবে কেন, এবং অতিমানুষিক শিক্ষাই বা মানুষ গ্রহণ করিতে পারিবে কেন? অতএব আমরা যে ভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপর দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সে ভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু অন্তিম সময়ে তাঁহার মুখে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের সারাংশের ব্যাখ্যা দিতে আসিলাম, তখন বড়ই সংকটে পড়িলাম। বৌদ্ধধর্ম্মের ব্যাখ্যা যাহা পড়িয়াছি, একটাও আমার মনোমত হইল না। এডুইন আর্ণল্ডের ব্যাখ্যাতেও যেন বেদান্তের ছায়া পড়িয়াছে। বুদ্ধদেব কোনওরূপ (Power Divine) ঐশ্বরিক শক্তি মানিতেন কি না, সন্দেহের কথা। অতএব এই সর্গ লিখিতে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। এক এক বার খানিকটা লিখিতাম, আবার উহা ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। এরূপে বহু বার লিখিলাম ও ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। তার একদিন শান্তিপুর হইতে প্রাতঃকালে ফিরিয়া, অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আসিয়া লিখিতে বসিলাম। সম্মুখে আমার নিজের কল্পিত রাইটিং টেবিলের উপর বুদ্ধদেবের ছবি ছিল। এইরূপ রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের ছবি—রাধা আত্মহারা, তন্মনা হইয়া, আপনাকে কৃষ্ণ মনে করিয়া, কৃষ্ণের

বাঁশী বাজাইতেছেন, এবং চৈতন্যদেবের ছবিও আমার টেবিলের উপর সর্ব্বদা থাকে। ছবিখানি লক্ষ্য করিয়া নিমীলিতনেত্রে ও অবনতমস্তকে আমি বুদ্ধদেবের ধ্যান করিয়া বলিলাম—"তোমার ধর্ম্ম তুমি লেখাইয়া দাও। আজ যাহা লিখিব, আমি আর ছিঁড়িব না।" তাহাই হইল। সেই দিনই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা ও 'অমিতাভ' শেষ করিলাম। তথাপি উহা ঠিক হইল কি না জানিবার জন্য তিব্বত-ভ্রমণকারী আমার আত্মীয় বাবু শরৎচন্দ্র দাসের কাছে পাঠাইলাম। তিনি ব্যাখ্যাটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ সংক্ষেপ ও সরল ব্যাখ্যা আর কোথাও দেখেন নাই, বুদ্ধদেব যেন আমার হৃদয়ে বসিয়া উহা লেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর আনন্দের সহিত 'অমিতাভ' রাণাঘাট হইতেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ছাপিতে পাঠাইলাম।

ইতিমধ্যে 'বঙ্গবাসী'র সহ-সম্পাদক রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। পূজার্হ রামমোহন রায়ের মত 'বঙ্গবাসী'ও আর একবার দেশ রক্ষা করিয়াছে। আমরা যেরূপ ইংরাজী সভ্যতার স্রোতে বিজাতীয় (Denational) পথে ভাসিয়া যাইতেছিলাম, 'বঙ্গবাসী' চাবুক পিটাইয়া তাহার গতি কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করিয়াছে। সমাজসংস্কারের যেমন প্রয়োজন, যাহাতে সংস্কারের শ্রাদ্ধটা গড়াইতে না পারে, তাহার জন্য একটা চাবুক প্রয়োজন। 'বঙ্গবাসী' সেই চাবুকের কাজ করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া দেশের যে সকল বরপুত্র আমাদের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির সংস্কারের জন্য যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহাদের এরূপ অপাঠ্য ভাষায় গালি দেওয়া নিতান্ত ঘৃণার কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি। সকল রকম অন্ধ গোঁড়ামিই মন্দ। 'বঙ্গবাসী' দেশের নিম্নশ্রেণীর অন্ধ বিশ্বাসের প্রশ্রয় দিয়া যে পেশাদারি হিন্দুধর্ম্মের একঘেয়ে রাগিণী ধরিয়াছে, তাহাতে এখন দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে। সহ-সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহারা তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছেন, তথাপি সংস্কারের শ্রাদ্ধ যাহাতে না গড়ায়, তজ্জন্য তাঁহাদের এরূপ সুর রাখা আবশ্যক হইয়াছে। তবে এখন হইতে যদি 'বঙ্গবাসী' কাহাকেও কোথায় গালি দিয়াছে দেখি, তবে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিয়া পত্র লিখিলে তিনি অনুগৃহীত হইবেন। মোট কথা, এখন হইতে কর্কশ গালাগালির সুর ফিরাইবেন। বোধ হয় তাহার পর মধ্যে কিছু দিন ফিরিয়াওছিল। এই সকল কথার পর তিনি আমাকে তাঁহাদের 'জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম, খন্ড কবিতা লেখা আমি অনেক দিন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছি। এ সবডিভিসনের বোঝা বহিয়া এখন বুদ্ধদেবের জীবনী লইয়া একখানি কাব্য লিখিতেছি। অতএব খন্ড কবিতা লিখিবার সময়ও আমার নাই। সেই কাব্যখানি 'জন্মভূমিতে' ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে তিনি আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম, সে কি কথা! বুদ্ধদেবের নাম শুনিলেও তাঁহাদের হিন্দু-য়ানির অম্ল উদ্গিরিত হয়। তাঁহারা কেমন করিয়া বুদ্ধদেবের লীলা ছাপিবেন। তিনি বলিলেন, তাঁহারা উহা আগ্রহের সহিত ছাপিবেন। অন্যধর্ম্মবিদ্বেষী এই গোঁড়া হিন্দুদের কাছে বুদ্ধের লীলা ও ধর্ম্ম কেমন লাগে, তাহা বুঝিবার জন্য আমার কুতূহল হইল। আমি বলিলাম, সম্পূর্ণ কাব্যখানি দিতে পারিব না ; কয়েক সর্গ পাঠাইব। এইরূপে কয়েক সর্গ তাঁহাদের পাঠাইয়াছিলাম। এক এক সর্গ পাইয়া সম্পাদক লিখিতেন যে, সর্গটি পঁহুছিবা মাত্র 'বঙ্গবাসী' আফিসে একটা sensation হইত। একজন পড়িতেন, এবং অবশিষ্টেরা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেন। বুদ্ধদেবের লীলা যে এমন অদ্ভুত, এবং তাঁহার শিক্ষা যে এমন উচ্চ, তাঁহারা জানিতেন না। ভিমরুলের বাসায় ঢিল পড়িল। লক্ষ্মীছাড়া 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এমন সুন্দর কবিতা দিতেছি, অথচ তাঁহাদের অনেকে আমার বন্ধু হইলেও তাঁহাদের কিছু দিতেছি না বলিয়া অন্যান্য মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা রাশি রাশি অনুযোগ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের কাছে লিখিলাম যে, ঘোরতর পরধর্ম্মবিদ্বেষী গোঁড়া

বঙ্গবাসী যে 'বুদ্ধলীলা আগ্রহের সহিত ছাপিতেছেন, ইহা কি একটা বিশেষ সন্তোষের কথা নহে?

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিপুর বদলি হইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তাহার কিছুদিন পরে 'অমিতাভ' প্রকাশিত হইল। কলিকাতায় থাকাতে 'অমিতাভ' কিরূপ গৃহীত হইল, তাহা জানিবার জন্য বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না। কলিকাতায় যেখানে যাই, সেখানেই 'কুরুক্ষেত্রে'র ও 'অমিতাভে'র প্রশংসা শুনিতে লাগিলাম। কোনও কোনও সংবাদপত্র 'অমিতাভে'র মুখপত্রের বড় সুখ্যাতি করিলেন। বলিলেন, উহা অমূল্য। এত কাল সকলের বিশ্বাস ছিল যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী. এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন, আমি এ সকল ভ্রম-সিদ্ধান্ত দূর করিয়া ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে একটা যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি যে, বুদ্ধ নিজে হিন্দু ছিলেন, হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু যোগশাস্ত্রমতে যোগসাধনা করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ সম্প্রসারিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। কেবল বুদ্ধ নিজে ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। তাহার কারণ, ঈশ্বরকে ধর্ম্মের ভিত্তি করিতে গেলে, মানুষ ঈশ্বরে মানুষের প্রকৃতি আরোপ করিয়া যাগযজ্ঞে এবং জীবরক্তে তাঁহার পূজা করাই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। আর কে বলিল —বুদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত? ভারতের বৈষ্ণবধর্ম্ম রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেখাইয়াছেন, বৈষ্ণবদের প্রধান তীর্থ—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘমণ্ডলের মূর্ত্তিই শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র। এখনও জগন্নাথ বুদ্ধাবতার বলিয়া পরিচিত। বৌদ্ধদের যাবতীয় তীর্থই আজ হিন্দুতীর্থ, এবং বুদ্ধ-মূর্ত্তিই কি গয়ায়, কি পুষ্করে, হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি। 'অমিতাভে'র উপসংহারে আমি বলিয়াছি যে, শ্রীভগবানের মহম্মদ অবতার দর্শন করা আমার ভাগ্যে হইবে না। আমার আর কেবল তাঁহার কাঙ্গাল গৌরমূর্ত্তি মাত্র দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। রাজা বিনয়কৃষ্ণপ্রমুখ অনেক হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত লোক আমাকে মহম্মদের লীলা লিখিতেও বিশেষ অনুরোধ করিলেন। মহম্মদের লীলা লিখিতে অনেক আরবীয় স্থানের ও ব্যক্তির নাম লিখিতে হইবে। উহা বাঙ্গালা কবিতায় ভাল শুনাইবে না। এ জন্য আমি তাঁহার লীলা লিখিবার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়াছিলাম। তাঁহারা বলিলেন, যখন আমি দর্শন-প্রধান কঠিন বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপ সরল সুমধুর কবিতায় লিখিতে পারিয়াছি, মহম্মদীয় ধর্ম্মও লিখিতে পারিব। সকল ধর্ম্মের মূলের অভিন্নতা প্রতিপাদন করাই আমার এই সকল অবতার-লীলা লিখিবার উদ্দেশ্য।

একদিন আলিপুর কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দমায় নিবিষ্ট আছি, এমন সময় ডাকে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, তিনি একজন নিতান্ত ঘৃণিতচরিত্রের ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক ছিলেন। 'রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের চরণছায়া পাইয়া তিনি উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমার 'রৈবতক',' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'অমিতাভ' তিনি তাঁহার ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। 'অমিতাভ' পাঠ শেষ করিয়াই পত্র লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমি বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখের কথা প্রতিপালন করিবার জন্য আবার কবে আসিবেন—"পূর্ণ কাল; পূর্ণ ব্রহ্ম আসিবে কখন?" কিন্তু তিনি যে আসিয়াছিলেন, তাহা কি আমি টের পাই নাই? তিনি ত্রেতার 'রাম'নাম এবং দ্বাপরে 'কৃষ্ণ'নাম একত্র করিয়া 'রামকৃষ্ণ' নামে আবার আসিয়াছিলেন। অতএব আমাকে এই 'রামকৃষ্ণে'র লীলাও লিখিতে হইবে। এই কয়টি কথায় আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। তাঁহার পত্রের ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। আমি যে নরকতুল্য কোর্টে বসিয়াছিলাম, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আমার অশ্রু দেখিয়া সমবেত আমলা, উকিল ও মোক্তারগণ মনে করিলেন, আমি কোনও শোকসংবাদ পাইয়াছি!

আমি তখন সাশ্রু হাসিয়া, পত্রখানি তাঁহাদের পড়িয়া শুনাইলাম। দেখিলাম, পত্র তাঁহাদেরও হৃদয় স্পর্শ করিল। কিছুক্ষণ উহার লিখিত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের দুই এক জনের সহিত আলোচনা হইল। সমস্ত কোর্ট নীরবে ভক্তিভাবে শুনিল, এবং সেই নরককেও কেমন একটি পবিত্র গাম্ভীর্য্যের ছায়া আসিয়া পড়িল। উকিল মোক্তারগণ বলিলেন যে, ইহার পর আর ফৌজদারি মোকদ্দমা করিতে তাঁহাদের মন যাইতেছে না। অতএব মোকদ্দমার তারিখ ফেলিয়া দিয়া, সেই কোর্টে বসিয়া উক্ত পত্রখানির উত্তর দিলাম, এবং অবশিষ্ট সময় কেমন এক বিহ্বল অবস্থায় কাটাইলাম। বহু পূর্ব্ব হইতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আমি একজন অযোগ্য ভক্ত ছিলাম। কিন্তু তাঁহার নাম ইতিপূর্ব্বে এমন আমার প্রাণে লাগে নাই।

ইহার পরে 'অমিতাভ' সমালোচিত হইতে আরম্ভ হইল। সুকবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় লিখিলেন—

গরিবপুর

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

"এ কয় দিন আপনার 'অমিতাভে'র অমৃতে ডুবিয়া আছি। গিরিশ ঘোষের 'বুদ্ধদেব-চরিত' অভিনয় দেখিয়াছিলাম—আর আপনার 'অমিতাভে'র অমৃত পান করিলাম।

যেমন ভাগীরথী তীর তরুচ্ছায়া, নীলানন্ত প্রতিবিম্ব প্রভৃতি শত সহস্র শোভা বুকে করিয়া সমুদ্র অনুসারিণী, আপনার কাব্যতরঙ্গিণীও সেইরূপ শোভাময়ী, গাম্ভীর্য্যময়ী, আবেগময়ী হইয়াও অনন্ত অনুসারিণী। সেই অনন্তের ছায়া আপনার কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়। এই শক্তি আর কোনও কবিরই দেখিতে পাই না। বুঝি আর কোন কবিরই সে শক্তি নাই। কি যেন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পাঠককে মোহিত করে—অথচ গন্তব্য পথে লইয়া যায়। বুঝিলাম, 'পলাশী' ও 'কুরুক্ষেত্রে'র কবির শক্তি অনন্ত। 'অমিতাভ' আপনার পূর্ব্বসঞ্চিত যশঃ প্রবর্দ্ধিত করিবে। 'পলাশী'র কনিষ্ঠ বলিয়া অনুরূপ আদরে গৃহীত হইবে।"

খ্যাতনামা 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় এই সমালোচনা বাহির হইল—

Amitava.—A poem on the life and religion of Lord Buddha by Babu Nabin Chandra Sen. One result of the spiritual revival of Bengal that has been gathering force during the last decade and half, is the spiritualising of the national literature. This is most apparent on the stage; religious and mythological dramas have been, during the past few years, the order of the day. But the men of letters, in whom that revival has been focussed and who lent it the higest potency, are Babus Bankim Chandra Chatterjee and Nabin Chandra Sen. Nabin Babu, with his characteristic genius, set himself to expound in exquisite poetry the life and teachings of the world-*avatars.* His *Khrista* (Life of Christ) and *Raibatak* and *Kurukshetra* (Life of Krishna) are well known to the Bengali reading public. To these he has now added the Life of Buddha (*Amitava*) which, we are happy to read, concludes with a pious promise that the poet would next take upon himself the noble task of composing a poem on the life and teachings of Sri Gauranga. *Amitava* fully sustains the author's reputation as the premier poet of Bengal after Madhusudan. In relating the incidents of Lord Buddha's life the poet has mainly followed the

Buddhist canonical writers, also made use of by Sir Edwin Arnold in his *Light of the East*,—with this characteristic difference that our poet has, so far as possible, kept in the back-ground the supernatural element in that life. Buddha is represented as an *Avatar* of *Narayana* who, incarnating as a man, strove like men to attain to blissful Nirvana. In the concluding chapter, the poet has given us a profound exposition of the teachings of Gautama Buddha which differs, in some material particulars, from the exposition of the author of the *Light of the East*. In a matter of this kind we cannot pretend to speak with authority; but, we read in the preface that Sri Sarat Chander Dass, the well-known Buddhist Scholar, endorses our poet's exposition. Pathos is our author's *forte*, as the reader of *Kurukshetra* well knows; and, the pathos, exquisite in its heart-rending intensity, that is poured into the asceticism of Gopa, Buddha's consort; and the meeting after the Lord's enlightenment, of the members of Buddha's family with him, is not surpassed by anything in Bengali literature. The poem is characterised by the poet's usual command over the resources of language and versification.

অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও লিখিলেন—

"I have looked through it (*Amitava*) with the greatest pleasure, and am certain it will sustain and enhance the high reputation which you have already won in the Literature of Bengal."

সিংহল ও শ্যামরাজ্য হইতে পর্য্যন্ত 'অমিতাভ' সম্বন্ধে দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় পত্র পাইয়াছিলাম। সিংহলের পত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

শ্রীঃ

নমঃ সর্ব্বলোকার্চ্চিতায় সম্বুদ্ধায় ॥

শ্রীমতো নবীনচন্দ্রসেনাখ্যস্য পণ্ডিতমহাশয়স্য প্রচুরাশীর্ব্বাদপূর্ব্বকং কৃপাবিজ্ঞেন নিবেদনমিদম্ ॥

মৎপরমমিত্রশিরোমণে!

শ্রীমদ্ভির্ম্মৎপ্রহিতং 'অমিতাভ'নামকং নূতনং বঙ্গকাব্যপুস্তকং লব্ধম্। তত্তু ভবদীয়স্য সুমনঃসৌরভপ্রতন্যমানস্য নৈসর্গিক এব গুণবিশেষ ইতি মাং প্রতিভাতি। যত্তত্র কৃতৌ ভগবতঃ শাক্যমুনেঃ পরিশুদ্ধগম্ভীরোত্তুঙ্গনির্ম্মলচর্য্যাবিশিষ্টগুণসমুদয়সমুদ্যোতনং মধুরকোমলপদাবলিনিবন্ধৈর্বঙ্গভাষাময়পদ্যবিসরৈঃ সসুব্বর্সিতং [সমুদ্‌বর্ণিতং], তদপ্যতিশয়কর্ম্মরসায়নং ভক্তিপাবনং পারক্যং সদর্থবহুলং প্রাঞ্জলমাহ্লাদজনকং শাক্যমুনিভক্তাবাবলম্বানাং [ভক্ত্যবলম্বনানাং] ভারতবাসিনাং সহৃদয়ানাং হৃদয়াধিক্যপ্রমোদবর্দ্ধনং প্রশস্তপুস্তকমিতি সর্ব্বেষাং মনীষিণাং প্রতিগম্যতে ॥

তদবলোক্যাহমপি প্রসন্নঃ সন্ তদর্থং মম তুষ্টিমেব প্রাভৃতং কৃত্বা ভবতে সংপ্রদদামি। স চ খলু ভবদীয়ঃ পরিশ্রমঃ সকলৈঃ কার্য্যবিদ্ভিঃ প্রাশংস্য এব। এতেন ভবদীয়কীর্ত্তিলতা পুনঃ পুনঃ প্রায়ঃ পল্লবয়ত্যেব দেশদেশান্তরীয়েষু বিদ্বদ্‌বৃন্দেষু। অপি চ তত্র পুস্তকে যত্র যত্র স্থানেষ্বপি দাক্ষিণাত্যানাং বৌদ্ধধর্ম্মপুস্তকৈঃ কাচিৎ কাচিৎ বিসদৃশতাপি ভূয়ো দৃশ্যতে, তাশ্চ পুনর্ম্মুদ্রণে পরিশোধনীয়াঃ। অপি চ ভবদীয়ে তদ্‌গ্রন্থসংজ্ঞাপনেপি যস্য

শরচ্চন্দ্রদাসমহাশয়স্য নামসংকীর্ত্তনং কৃতং, স তু মমাতীবপ্রিয়সহায়ঃ। তেষাং তু বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তকপ্রচারসভায়াম্ অহমপি ধর্ম্মলেখনসম্পাদকপ্রধানসামাজিকোঽস্মি। ইয়ন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম-পুস্তকপ্রচারসভা সংপ্রতি ভারতবাসিনাং মনুষ্যাণাং হিতায় সুখায় চ বর্ত্ততে। শ্রুত এব সা সভা চিরকালং প্রবর্ত্ততাদিতি মম প্রার্থনা। মৎকৃতয়া রত্নমালাখ্যয়া টীকয়া সমলঙ্কৃতং ভক্তিশতকং নাম প্রশস্তবৌদ্ধস্তোত্রপুস্তকং ভবতো ধর্ম্মপ্রাভৃতং কৃত্বা অনেন সার্দ্ধং প্রেষয়ামি, তদ্ভবদ্ভিঃ কৃপয়া প্রতিগ্রাহ্যম্। মম কৃপা ভবৎস্বপি সততং ভবতাদিতি। শম্॥

১৮১৮ শালীয়শকাব্দে
তুলাসংক্রান্তৌ দ্ব্যবিংশতিমে,
শনিবারে লঙ্কায়াং শৈল
বিম্বারামবিহারাৎ প্রহিতম্।

ভবদীয়াদৃষ্টসহায়স্য
শ্রীশীলস্কন্ধস্থবিরস্য
C. A. Seelakkhandha.

এমন কি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ আমার কাছে নির্ব্বাণ ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমি বড়ই সঙ্কটে পড়িলাম। তাঁহারা কিছুতে বিশ্বাস করিবেন না যে, আমি মূর্খ, বৌদ্ধধর্ম্মের কিছুই জানি না। কেবল শ্রীবুদ্ধদেবের কৃপায় মাত্র আমি 'অমিতাভ' লিখিতে সক্ষম হইয়াছি। এখনও বাড়ী গেলে চট্টগ্রামের বৌদ্ধ 'রাওলি'তে (ভিক্ষুতে) আমার গৃহ পূর্ণ হইয়া যায়। শ্রীবুদ্ধদেবের কি লীলা! আজ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বৌদ্ধ-ক্ষেত্র ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুনে বসিয়া এত বৎসর পরে এই পবিত্র উপাখ্যান লিখিতেছি। এখানেও বহু ভিক্ষু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া থাকেন।

কলিকাতার চতুর্বর্গ

১।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,—চতুর্বর্গের মধ্যে কলিকাতায় অর্থ ও কাম, অন্য দুটিকে বিসর্জ্জন দিলে, পাওয়া যায় শুনিয়াছিলাম। কেহ ধর্ম্ম, কি মোক্ষ কলিকাতায় লাভ করিয়াছেন শুনি নাই। অবশ্য উভয়ের প্রচারক ও শিক্ষক কলিকাতার গলিতে গলিতে আছেন। তাঁতীর ছেলে হলা এখন 'হলহলানন্দ স্বামী' হইয়া কলিকাতা ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা জানিতাম। অতএব কলিকাতায় এই চতুর্বর্গ লাভের আশা আমার ছিল না। যে দিন বন্ধুর পত্রে জানিলাম, আমি কলিকাতার উপনগর আলিপুরে বদলি হইয়াছি, আমি ভাবিতে লাগিলাম, শ্রীভগবান্ আমাকে কলিকাতায় কেন লইতেছেন। দয়াময় এরূপে আমাকে মাজিস্ট্রেট-মিশনারি প্রভুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিলেন, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু কলিকাতায় আমার মত তৃণের কোনও কার্য্য আছে কি? দেখিলাম, কলিকাতায় আমার একপ্রকারের চতুর্বর্গ আছে, উহা সাধিত না হওয়া অবশ্য সেই সর্ব্বার্থ-সাধকের ইচ্ছা। সেই চতুর্বর্গ—এক, জলকষ্ট নিবারণ; দুই—শিবিরে বিচারকার্য্য নিবারণ: তিন,—শিক্ষাপ্রণালী সংস্কার; চারি—তীর্থরক্ষা। মনে মনে স্থির করিলাম, কলিকাতায় পঁহুছিয়া এই চারিটি কার্য্যে সেই সিদ্ধিদাতার নাম করিয়া হাত দিব। হ্যারিসন রোডের একটি গৃহে একটুক বসিবার স্থান করিয়া, এক শুক্রবার সন্ধ্যার সময়ে খ্যাতনামা, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহা-শয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তখন 'বেঙ্গলী' সাপ্তাহিক। উহা শনিবারে বাহির হইত। সুরেন্দ্রবাবু সে জন্য শুক্রবার রাত্রিতে বারাকপুরের বাড়ীতে না গিয়া কলিকাতায় থাকিতেন। ইতিপূর্ব্বে যদিও পত্রের দ্বারা 'বেঙ্গলী'র বহু প্রবন্ধ-লেখক স্বরূপ পরিচিত ছিলাম, কিন্তু কখনও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে দেখি নাই। আমার কার্ড পাইবা মাত্র

সুরেন্দ্রবাবু উঠিয়া আসিয়া বড় সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। দেখিলাম, একটি তেজস্বী বীরমূর্ত্তি। বর্ণ গৌর, দেহযষ্টি বলিষ্ঠ ও মুখাকৃতি দীর্ঘ, মস্তকে ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, স্থূল যুগ্ম ভ্রূ, তাহার নিম্নে সমুজ্জ্বল চক্ষু, বদনমণ্ডল ঘনকৃষ্ণ বিরলশুভ্র গুম্ফ ও শ্মশ্রু-মণ্ডিত। জ্যোতিষ্মান্ চক্ষু অদম্য তেজ ও সাহস, এবং স্থূল অধরোষ্ঠ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। সুরেন্দ্রবাবু সুশ্রী, সুরূপ, সুপুরুষ। সহস্র লোকের মধ্যেও তাঁহাকে দেখিলে তোমার নয়ন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, এবং দর্শনমাত্র বুঝিবে, তিনি একজন ক্ষণজন্মা অসামান্য পুরুষ, দুঃখিনী বঙ্গমাতার একটি দুর্লভ রত্ন। বঙ্গমাতা কেন, সুরেন্দ্রবাবুর তুলনা সমগ্র ভারতবর্ষেও বিরল। তাঁহার মুখভঙ্গি ও বীরাবয়ব দেখিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, তিনি কিরূপে সর্ব্বশক্তিমান্ ইংরাজ রাজপুরুষদের সমবেত শক্তি ও ষড়্যন্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াও মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, এবং সেই নীচ ও ঘৃণিত ষড়্যন্ত্র পদদলিত করিয়া, সেই শক্তিকে তাঁহার প্রতিভা ও বাগ্মিতায় প্রকম্পিত করিয়া, সমগ্র ভারতবর্ষ দ্বারা পূজিত হইতেছেন। 'মাণিকের ছটা কি কাপড়ে পায় বন্ধ?'—না. ইংরাজের ষড়্যন্ত্রজাল ভেদ করিয়া আজ মাণিকের ছটা সমস্ত ভারত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে বলে—বীরত্ব কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে? সুরেন্দ্র সমাজক্ষেত্রে যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা যুদ্ধক্ষেত্রেও বিরল।

বাতবিক্ষুব্ধ, তরঙ্গোদ্বেলিত সিন্ধুতলে শান্তির নীরবতা। যে সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা-বাতে ও রাজনৈতিক তরঙ্গে দেশ ও ইংরাজরাজ্য আন্দোলিত, তাঁহার গৃহখানি বা কার্য্য-ক্ষেত্র 'বেঙ্গলী আফিস' সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন। উহা দেখিলে—'ভারত উদ্ধার, মূল্য চার আনা' চটিখানিতে তাঁহার 'ভারত-সভা'র যে বিদ্রূপাত্মক বর্ণনা আছে, উহা প্রকৃত বলিয়াই মনে হয়। জানবাজার অঞ্চলে একটি প্রশস্ত একতল কক্ষ। তাহার দেয়াল মলিন, এবং যুগব্যাপী বহু কলঙ্ক-চিহ্নে কলঙ্কিত। কোনও কালে যদি তাহাতে চূণ পড়িয়া থাকে, প্রাচীরচতুষ্টয় তাহা বহুদিন বিস্মৃত হইয়াছে। মধ্যস্থলে সংবাদপত্র ও বহুবিধ আবর্জ্জনা-ভারে প্রপীড়িত একখানি সামান্য পালিশশূন্য ও মসীরঞ্জিত 'টেবিল'। তাহার সম্মুখে একখানি ময়লা জীর্ণ চেয়ার-পঞ্জর ও তাহাতে স্বয়ং সুরেন্দ্রবাবু আসীন। টেবিলের বাম পার্শ্বে একখানি কাষ্ঠের বেঞ্চ, এবং অপর দুদিকে তিন চারিখানি পুরাতন ময়লা চেয়ার কোনটা হস্তহীন, কোনটা বা খঞ্জপদ। সমস্তই তালিযুক্ত। এই কক্ষটিই স্বনামখ্যাত সুরেন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় তীর্থক্ষেত্র—Editorial sanctum। উহাতেই ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর অন্য স্থানের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎলাভ করেন। কক্ষ ও কক্ষস্থ উপকরণাদি দেখিয়া আমার হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইল। একদিন আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম যে, আমার ইচ্ছা হয়, আমি আপনার কক্ষটি সাজাইয়া দি। তিনি বড় করুণ-কণ্ঠে বলিলেন—"নবনীবাবু! আমি যে বড় গরীব। আমার কিছুই নাই। এত খাটিয়া খুটিয়াও বেশী কিছুই করিতে পারি নাই। আপনার কাছে বলিতে কি, আমার মোট ত্রিশটি হাজার টাকা মাত্র আছে।" আমি বহু বার পরিচয় পাইয়াছি যে, যে সুরেন্দ্র কুটিল রাজনৈতিক বলিয়া খ্যাত, সে সুরেন্দ্র বালকের মত সরল। ষ্টার থিয়েটারের অমৃত বরাবর সুরেন্দ্রকে বিদ্রূপ করেন বলিয়া, আমি তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা কলহ করিতাম। তিনি আমাকে বলিতেন, আমি সুরেন্দ্রবাবুকে চিনি নাই। আমি তাঁহাকে বলিতাম, তিনি তাঁহাকে চিনেন নাই। আমি ইঁহাদের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করিয়া, দেশের একটি সুসন্তানের এরূপ ক্লেশকর বিদ্রূপ নিবারণ জন্য একদিন সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলাম—"এক দিন ষ্টার থিয়েটার দেখিতে চলুন।" সুরেন্দ্র বালকের মত সরলভাবে বলিলেন—"নবীনবাবু! আমি আনন্দের সহিত যাইব। আমার স্ত্রীও বড় থিয়েটার দেখিতে ভালবাসেন। কিন্তু শুনি, অমৃত বোস আমাকে বড় ঘৃণা করে, এবং আমাকে বড় গালি দিয়া ষ্টেজে আমার অভিনয় করায়। আমার জীবন বড় নিরানন্দ। কেবল ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার মত দিন

রাত খাটি। আমার আমোদের মধ্যে, ৪টার সময় যখন বারাকপুরে ফিরিয়া যাই (সেখানে তাঁহার বাড়ী), তখন আমার শিশু পুত্রটিকে একটি টাট্টুর উপর চড়াইয়া, তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে এক লাঠি লইয়া আমি টাট্টুটিকে তাড়াই।" এ সারল্য মানুষের, না দেবতার?

যাহা হউক, আমি একখানি জীর্ণ ছারপোকাযুক্ত চেয়ারে বসিলে, সুরেন্দ্রবাবু প্রথমতঃ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভে আনন্দ ও শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! দেওঘরের ডেপুটি মাজিস্ট্রেট 'হার্ড' বেটাকে এবার জব্দ করিয়াছি। সে একটি লোককে বেআইনী বেত মারিয়াছে। সে সম্বন্ধে আমি কাউন্সিলে প্রশ্ন পাঠাইলে, তদন্ত সাপেক্ষে আমাকে এ সপ্তাহে প্রশ্নটি স্থগিত রাখিতে কটন লিখিয়াছিলেন। আমি তাহাতে অসম্মত হইয়াছি। কাল প্রশ্ন কাউন্সিলে উঠিবে।" আমি বলিলাম—"আপনি কেন এরূপ অন্যায় জিদ করিলেন?" চারি দিকে তাঁহার যে পারিষদ ও স্তাবকগণ বসিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রোধে হৈ-চৈ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"কেন মহাশয়! কি অন্যায় হইয়াছে? প্রশ্নটি স্থগিত থাকিলে ত কেহ টের পাইত না। এখন সকলে জানিবে এবং সাহেব বেটারা জব্দ হইবে।" আমি একটুক বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলিলাম—"ঠিক কথা। প্রশ্নটি কাল কাউন্সিলে উঠিলে 'হার্ডে'র ফাঁসি হইবে, এবং আগামী সপ্তাহের মেলে সমস্ত ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।" এই বিদ্রূপে তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠিলে, সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়া থামাইলেন। আমি বলিতে লাগিলাম—"একে ত ইনি অবিবেকী ও হঠকারী (indiscreet and impulsive), তাহাতে আপনারা কোথায় আগুন নিবাইবেন, না আরও উহা উস্কাইয়া দেন। আমার চরিত্রেও এই দুইটি গুরুতর দোষ আছে। তজ্জন্য আমি এক জীবন ভুগিতেছি। তবে তাহাতে আমার নিজের অনিষ্ট হয় মাত্র, কিন্তু ইহাঁর এ দুই দোষে সময়ে সময়ে সমস্ত দেশের অনিষ্ট হয়।" আমি সুরেন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—"আপনি জানেন, মেসিডনের অধিপতি ফিলিপের একটি ভৃত্য ছিল। সে প্রত্যহ প্রভাতে ফিলিপের শয়ন-কক্ষদ্বারে আঘাত করিয়া বলিত—'ফিলিপ, তোমারও মৃত্যু আছে'—(Philip! thou art mortal)। আমিও যত দিন কলিকাতায় থাকিব, আপনি অনুমতি দিলে আপনার কক্ষদ্বারে প্রত্যহ আঘাত করিয়া বলিব—"সুরেন্দ্রবাবু, আপনি বড় indiscreet and impulsive", সুরেন্দ্রবাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! আমি এ কার্য্যের জন্য আপনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ থাকিব। আমি জানি যে, আমি বড় indiscreet and impulsive"। আমি বলিলাম—"তাহার বিশেষ কারণও আছে। স্থিরচিত্তে কোনও বিষয়ের চিন্তা করিবার জন্য আপনার পাঁচটি মিনিট সময়ও নাই।" তিনি বলিলেন—"নবীনবাবু! আপনার এ কথাও ঠিক। আমার খাটনির কথা শুনিলে আপনি আশ্চর্য্য হইবেন। আমি প্রাতে উঠিয়া একটুক চা খাইয়া, দৈনিক পত্রগুলি দেখিয়া ও দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়া, স্নান করি এবং তাড়াতাড়ি চারিটি ভাত মুখে গুঁজিয়া দিয়া কলিকাতায় ছুটি, এবং ১০টার ট্রেনে এখানে পঁহুছিয়া, আবার ঘণ্টাখানিক রাশি রাশি পত্রাদির উত্তর দিই, এবং আবার প্রবন্ধ লিখি। ১২টায় কলেজে যাই, সেখানে ২॥ ঘণ্টা পড়াইতে হয়। তাহার পর এ মিটিং সে মিটিং, এ কার্য্যে ও সে কার্য্যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, চারিটার ট্রেনে বারাকপুরে ফিরি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিবারবর্গ, কি দর্শকদের সঙ্গে কাটাইয়া, একটুক বিশ্রাম করিয়া আহার করি। তাহার পর রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত সংবাদপত্রাদি পাঠ করি ও নানা কার্য্য করি। আমার লোহার মত শরীর, আমার কখনও পীড়া হয় না। তাই আমি এ খাটনি খাটিতে পারি। আমার বিশ্বাস, এমন খাটনি এই ভারতবর্ষে কাহারও নাই। কাজেই আমি কোনও বিষয়ের চিন্তা করিবার সময় পাই না।"

আমি বলিলাম—"তাহার ফলে আপনি দেশের প্রকৃত অভাব কি, তাহা বুঝিতে পারেন

না। কোথায় কোন্ হার্ড কোন্ হতভাগাকে দুটা বেশী বেত মারিয়াছে, তাহা লইয়া তোলপাড় করেন। ইহারই নাম 'পলিটিক্যাল এজিটেশন'। এ দিকে বাঙ্গালীর ঘরে অন্ন নাই, পুকুরে জল নাই। এই চৈত্র বৈশাখ মাসের রৌদ্রে আমি দেখিয়া আসিয়াছি, সমস্ত রাণাঘাটব্যাপী লোক জলের জন্য হাহাকার করিতেছে। পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। পুরাতন পুষ্করিণী ও ইন্দারা সকলই সংস্কারাভাবে বুজিয়া গিয়াছে। সংস্কার করিবার শক্তিও এই দুর্ম্মূল্যের দিনে গ্রামবাসী কাহারও নাই। যাহার অবস্থা একটুক ভাল হইয়াছে বা হইতেছে, সে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, এবং কলিকাতায়, কি অন্য নগরে গিয়া বাড়ী করিতেছে। গ্রাম সকল শ্রীহীন জলহীন হইয়া ম্যালেরিয়ার রঙ্গ-ভূমি হইয়াছে। স্বনামপরিচিত উলা, সিমলা, মালিপোতা, চাকদহ, গোঁড়পাড়া, জাগুলি, সুবর্ণপুর শ্মশানে পরিণত হইতেছে। যুবতী কুলবধূরা পর্য্যন্ত কলসি লইয়া দুপুর রৌদ্রে চার পাঁচ মাইল হাঁটিয়া, নিকটস্থ কোনও 'বাঁওড়' হইতে জল আনিতেছে। তাহাও এত দূষিত যে, কলিকাতার পশুরাও তাহা পান করিবে না। এক এক স্থানে জলকষ্ট দেখিয়া আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই। বারাকপুর হইতে রেলে কলিকাতায় আসেন, কলিকাতা হইতে রেলে বারাকপুরে ফিরিয়া যান। দেশের অবস্থা কলিকাতাবাসী আপনারা কিছুই জানেন না। ন্যাশনাল কংগ্রেস, স্বায়ত্ত শাসন ইত্যাদি 'দিল্লীকা লাড্ডু' শিকায় তুলিয়া রাখুন। এখন কিসে দেশের লোকেরা এক মুঠো ভাত ও এক ঘটি পানীয় জল পাইবে, তাহার চেষ্টা করুন।"

আমার করুণ বিলাপে সুরেন্দ্রবাবুর চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকদের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"কই, আপনারা ত এরূপ জলকষ্টের কথা আমাকে কখনও বলেন নাই।" আমি আবার বিদ্রূপ করিয়া বলিলাম—"তাহা বলিবেন কেন? হার্ড সাহেবের বেত মারার প্রশ্ন কাউন্সিলে উঠিলেই যে ভারত উদ্ধার হইবে।" এ বার এই তীব্র বিদ্রূপ তাঁহারা নীরবে সহিলেন। বরং এক জন বলিলেন যে, আমি রাণাঘাটের যেরূপ জলকষ্টের কথা বলিলাম, ডায়মন্ডহারবারেও সেই অবস্থা। বলা বাহুল্য, তিনি ডায়মন্ড হারবারের লোক। সুরেন্দ্রবাবু আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! আমি আপনার হাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। এখন হইতে আপনি আমাকে যেরূপে চালাইবেন, আমি সেরূপ চলিব।" আমি সেখানে বসিয়াই জলকষ্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন লিখিয়া দিলাম। উহা কাউন্সিলে উঠিল। এ দিকে সমস্ত সংবাদপত্রে আগুন জ্বালাইলাম। আমি যখন যে কাজে হাত দিতাম, আলিপুরে বসিয়া সমস্ত দিন তৎ-সম্বন্ধে প্রবন্ধ চারি দিকে ছড়াইতাম। আলেকজেণ্ডার মেকেঞ্জির সিংহাসন টলিল। অনেক লেখালেখির পর প্রতি বৎসর জলকষ্ট নিবারণের জন্য যথেষ্ট টাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বাজেটে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিতে, এবং প্রত্যেক গ্রামের পানীয় ও অপানীয় পুষ্করিণীর এক রেজেষ্ট্রারি প্রস্তুত করিয়া, উক্ত অর্থের দ্বারা অবস্থানুক্রমে গ্রামে গ্রামে জলাভাব দূর করিবার জন্য তিনি আদেশ প্রচার করিলেন। তদবধি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বজেটে যে গণ্ডূষ-পরিমাণ জলের টাকা রাখা হয়, তাহাও পূর্ব্বে হইত না। এত বৎসর পরে আজ জলকষ্টের যে আন্দোলন উঠিয়াছে, ইহার নামমাত্রও তখন ছিল না।

২। শিবির-ক্লেশ

সঙ্গে সঙ্গে সর্বডিভিসনের 'ধর্ম্মাবতার'দের জ্যৈষ্ঠের খরায়, শ্রাবণের ধারায় এবং মাঘের শীতে মফঃস্বল ভ্রমণে অর্থী, প্রত্যর্থী, আমলা ও উকিল মোক্তারদের যে অকথ্য দুর্গতি হয়, তাহা নিবারণ সম্বন্ধেও হস্তক্ষেপ করিলাম। সার ষ্টুয়ার্ট বেলি আমার পূর্ব্বে আন্দোলনের ফলে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, সর্বডিভিসনাল অফিসারগণ অর্দ্ধ সপ্তাহ

মফঃস্বলে থাকিবেন, এবং ফৌজদারি মোকদ্দমা শিবিরে না লইয়া, সপ্তাহার্দ্ধ সদরে থাকিয়া তাহার বিচার করিবেন। কাউন্সিলে ও কাগজে আন্দোলন তুলিলাম যে, এই আদেশ প্রতি-পালিত হইতেছে না। কেবল আমি মাত্র সে আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি, এবং তজ্জন্য মিশনারি-ওয়েষ্টমেকটি বিদ্বেষে ঘোরতর দণ্ডিত হইয়াছি। শ্বেত কৃষ্ণ প্রভুরা লোককে উৎপীড়িত করিবার, এবং ভাত্তা ভক্ষণ করিবার এমন সুবিধা ছাড়িবেন কেন? তাঁহারা ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন যে, এরূপ আদেশ পালন করা অসাধ্য। কিন্তু আমি যেরূপে তাহা অতি সহজে বড় বড় সবডিভিসনে পালন করিয়াছি, তাহা সংবাদ পত্রে দেখাইলে লাট মেকেঞ্জি তাঁহাদের সমবেত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, উক্ত আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য আবার তীব্র আদেশ প্রচার করিলেন। ওয়েষ্টমেকটের বুঝিবার বাকী রহিল না যে, এই কার্য্যও আমার। তাহার পর হইতে তিনি আলিপুরের মাজিষ্ট্রেটের কাছে আমার জন্য পূর্ব্বলিখিত স্নেহপূর্ণ সুপারিস সকল পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু মেকেঞ্জি পীড়িত হইয়া, বঙ্গ-সিংহাসন অকালে শূন্য করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং তাঁহার স্থলে পোড়া কাষ্ঠ (Woodburn) নিয়োজিত হওয়া অবধি উক্ত আদেশ প্রভুরা চাপা দিয়াছেন। পুলিশ ও বিচার-বিভাগ স্বতন্ত্র করিবার জন্য ভারতে বিলাতে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু দেশীয় রাজনৈতিকদের এমন সহজ নিবারণ-সাধ্য একটি গুরুতর দেশব্যাপী দুর্গতির প্রতি চক্ষু পড়ে না। তাহা পড়িবে কেন? তাঁহারা এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, কর্জ্জন-ফ্রেজারি পুলিশ সংস্কারের ন্যায় পুলিশ ও বিচারবিভাগের স্বাতন্ত্র্যও আর একটি অজাযুদ্ধ মাত্র হইবে। যখন জজ, মাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশের বড় প্রভুরা তিন জনই গৌরাঙ্গ, তখন প্রোমোশন-সর্ব্বস্ব ডেপুটিগুলিকে মাজিষ্ট্রেটের গোয়াল হইতে জজের গোয়ালে লইয়া গেলে 'যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে' মাত্র হইবে। এখন একমাত্র পুলিশ প্রভুর খাতিরে মাজিষ্ট্রেটেরা ডেপুটিদের গলা টিপেন। তখন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেট উভয়ের খাতিরে জজ গ্রীবানিষ্পীড়নটা দ্বিগুণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত বার্ষিক গুপ্ত রিপোর্টের উপর ডেপুটিদের প্রোমোশন নির্ভর করিবে, তাহারা জজের অধীনে থাকুক, আর মাজিষ্ট্রেটের অধীনেই থাকুক, কোথায়ও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না। কোনও মাজিষ্ট্রেট কোনও ডেপুটির বিরুদ্ধে বাৎসরিক রিপোর্টে, কি 'মাই ডিয়ার কনস্টম' ডেমি আফিসিয়াল পত্রে কিছু লিখিলে, তাহার নকল ডেপুটি বেচারিকে দিয়া, তাহাকে যদি প্রতিবাদ করিবার অবসর দেওয়া হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট গৌরাঙ্গ মাজিষ্ট্রেটের 'প্রেষ্টিজে'র (প্রতিপত্তির) দিকে না চাহিয়া যদি ধর্ম্মতঃ বিচার করিয়া, তাহার প্রোমোশনের বিঘ্ন না ঘটান, তবেই তাহারা সাহস ও স্বাধীনতার সহিত কার্য্য করিতে পারিবে: তাহাদের কেবল জজের অধীনস্থ করিয়া 'দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন' করিয়া কোনও ফলই হইবে না। তাহাদের জন্য এখানে যে ঘাস আর জল, সেখানেও সেই ঘাস আর জল মাত্র হইবে। অধিক কথা কি, এখন সবজজ মুন্সেফেরা কি শ্বেতাঙ্গ-সম্বলিত মোকদ্দমায় স্বাধীনভাবে বিচার করিতে পারেন? আমার সঙ্গে চট্টগ্রামের একজন 'লোগ্রিজাতীয় 'টি প্লেণ্টারে'র মোকদ্দমা হইয়াছিল। আমার পক্ষে পরিষ্কার মোকদ্দমা। তথাপি সবজজ মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি তাহাকে এজলাসে চেয়ার দিয়া, জজের মত সম্মান করিয়া বসাইতেন, এবং তাহার কত খোসামুদিই করিতেন! শেষে অনেক ফিকির করিয়া, অনেক চুল-ছেঁড়া-ছিঁড়ি করিয়া ও আমার সততার ও চরিত্রের প্রতি দোষারূপ পর্য্যন্ত করিয়া তাহাকে ১০০৲ এক শত টাকা পরিমাণ অবৈধরূপে ডিক্রি দিলেন, এবং তাহাকে দীর্ঘ সার্টিফিকেট দিয়া, অবশিষ্ট দাবি অগ্রাহ্য করিলেন। ঐ হুকুম দিয়াও তাঁহার হৃৎকম্প অবস্থায় আমার উকিলকে ও একজন বন্ধুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"লোকটি জজ সাহেবের পরম বন্ধু। তাহার মেয়েরা জজ সাহেবের সঙ্গে বেড়ায়। আমি তাহার প্রায় সমস্ত দাবি অগ্রাহ্য করিলাম।

না জানি, জজ সাহেব আমার কি সর্ব্বনাশই করেন। আপনারা আপিলটা খুব ভাল করিয়া চালাইবেন।" যে পর্য্যন্ত আপিল নিষ্পত্তি না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাঁহার আর শান্তি ছিল না। তিনি বরাবর আপিলের খবর লইতেন। ইহার পর তিনি যখন শুনিলেন, জজ সাহেব সেই ১০০৲ এক শত টাকার দাবিও ডিস্‌মিস্‌ করিয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁহার মুখ চূণ হইয়া গেল। অতএব চা-করের স্থল মাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রহণ করিলে ডেপুটিদের কি অবস্থা হইবে, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। অথচ কি ফৌজদারি, কি দেওয়ানি, বিচার-বিভ্রাটের প্রধান কারণ 'গুপ্ত রিপোর্ট'ও 'গুপ্ত হত্যা'। ইহার প্রতিকূলে, এবং অন্যান্য সহজসাধ্য বিচার-ক্লেশ নিবারণের জন্য আমাদের রাজনৈতিকেরা অস্ত্র না ধরিয়া, পুলিস ও বিচার-বিভাগের স্বাতন্ত্র্যরূপ আর এক দিল্লীকা লাড্ডুর জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। এই জন্যই রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা হইতেছে, এবং উহাও এরূপ নিষ্ফল হইতেছে।

৩। স্কুলপাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা-বিভ্রাট

বিশ বৎসর কাল সবডিভিসনাল অফিসারের কার্য্যে আমি গ্রাম্য বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, ইদানীং বালকের শিক্ষাদান নহে, পাঠ্য পুস্তকের স্বত্বাধিকারীদের ও তস্য পৃষ্ঠপোষক শিক্ষা-বিভাগের দিগ্‌গজ কর্ম্মচারিবিশেষের স্বার্থসাধনই শিক্ষাবিভাগের একমাত্র উদ্দেশ্য। সাত আট বৎসরের শিশুর পাঠ্য হয় নাই, ভূভারতে এমন জিনিসই নাই। দর্শন, বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব এবং পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতাদের প্রেততত্ত্ব, সকলই ইহাদের পাঠ্য। শিশুর বয়সের সংখ্যা অপেক্ষা পুস্তকের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। কাহারও কাহারও সমস্ত পুস্তক বহন করাও অসাধ্য হইয়াছে। ইহাতে আবার গভীর তত্ত্ব সকলও আছে। এক বিদ্যালয়ের একটি বালক পড়িতে লাগিল—"মানুষ দ্বিপদ। সে দুই পায়ে হাঁটিয়া চলে।" বল দেখি, এমন নিগূঢ় তত্ত্ব পুস্তকে না পড়িলে কি বালকদের আর শিখিবার উপায় আছে? আমি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, বল দেখি, যাহারা তোমাদের জন্য এরূপ অপূর্ব্ব বহি লিখিয়াছে, সেই গ্রন্থকারগণ কয়পদ?" শিশু গ্রন্থকার শব্দ শুনিয়া ভাবিল, কোনও জন্তুবিশেষ হইবে। সে উত্তর করিল—"তাহারা চতুষ্পদ!!" আমি বলিলাম—"ঠিক্‌।" শিক্ষকগণ হাসিয়া উঠিলেন। আমি প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এরূপ এক রাশি বহি পড়াইয়া কি ফল?" তিনি বলিলেন—"শিশুদের মুণ্ডপাত!" তাঁহার কাছে শুনিলাম, প্রত্যেক বহির পশ্চাতে এক এক জন শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারীর ছায়া আছে। কর্ম্মচারীরা তাহাদের শালা ভগ্নীপতিদের দ্বারা, কি তাহাদের নামে এই সকল পুস্তক সংকলন করাইয়াছেন, এবং তাঁহাদের নিজের বা আশ্রিতের প্রেসে ছাপাইয়াছেন। পরের পুস্তক হইতে অধিকাংশ স্থলে এ সকল 'পাঠ্য' বা অপাঠ্য পুস্তক সঙ্কলিত বা চুরিকৃত। দেখিলাম, আমার কাব্যাবলী হইতেও অনেক অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, অথচ আমি তাহার কিছুই জানি না। সঙ্কলনকারীর নামও কখন শ্রবণ করি নাই। আমি হেমবাবুর কাছে এই চুরি নিবারণ জন্য প্রস্তাব করিলাম যে, কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিব যে, আমাদের অনুমতি ভিন্ন যাহারা এরূপ তস্করতা করিবে, আমরা তাহাদের নামে ফৌজদারি অভিযোগ উপস্থিত করিব। জীবিত কবিদের মধ্যে এই তস্করদের শিকার তখন আমরা দুজন। 'রবি' তখনও উদিত হন নাই। হেমবাবু লিখিলেন যে, তাঁহার কাব্যাবলী অতি অল্পই বিক্রয় হয়, অতএব এই তস্কর-বৃত্তির দ্বারা তিনি বিশেষ ক্ষতিভাজন নহেন। আমাকে ঐরূপ বিজ্ঞাপন দিয়া এই ঘৃণিত ব্যবসায় বন্ধ করিতে পরামর্শ দিলেন। আমি তদনুসারে কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিলাম। তাহাতে চারি দিক্‌ হইতে সকরুণ পত্র সকল আসিতে লাগিল।

কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষা-বিভাগের দক্ষিণহস্ত-রক্ষিত একজন 'খ্যাতনামা' স্কুলপাঠ্য-সঙ্কলনকারী লিখিলেন—"আপনার শিক্ষক জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় আমার স্বগ্রাম-বাসী। তিনি আমাকে একবার বলিয়াছিলেন যে, আপনি আপনার পুস্তক হইতে কবিতা উদ্ধৃত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। আমি তদনুসারে পঁচিশ বৎসর যাবৎ আপনার কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন আমার ৫০০০ পাঁচ হাজার বহি যন্ত্রস্থ। দোহাই আপনার! এ যাত্রায় আমাকে অনুমতি দেন। আমি আর এমন কর্ম্ম করিব না।" আমি উত্তরে লিখিলাম—"আপনি একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন যে, আমার অনুমতি না লইয়া, আমার কবিতা আপনি যদৃচ্ছ পঁচিশ বৎসর কাল উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং শুনিয়াছি, এই সঙ্কলিত পাঠ্যপুস্তকের দ্বারা আপনি একজন বড়মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু যাহাদের মস্তিষ্ক চুরি করিয়া আপনি শিক্ষাবিভাগের কৃপায় এরূপ ধনী হইয়াছেন তাহাদের কি একটি সিকি পয়সাও দিতে আপনার কর্ত্তব্য বোধ হয় নাই? এত দিন পরেও আমার অনুমতি চাহিতে আপনি আমাকে কিছু দেওয়া উচিত বিবেচনা করেন নাই। অতএব এরূপ কৃপা-পাত্রকে অনুমতি না দিয়া কি করিব?" ইহার পর হইতে দেখিলাম যে, তিনি আমার কবিতা বাদ দিয়াছেন। অথচ তাঁহার পুস্তক পূর্ব্ববৎ সমানভাবে বিদ্যালয়ে চলিতেছে। লাভের মধ্যে পূর্ব্বে বালকেরা আমাকে যাহা একটুক কবি বলিয়া জানিত, এখন তাহাদের কাছে আমার নাম লুপ্ত। শুনিলাম, এরূপ পুস্তক কোনও গুণবিশেষের জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্য হয় না। হয় কেবল পুস্তক-সঙ্কলনকারী নিজে শিক্ষা-বিভাগের কোনও ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারী কিম্বা তস্য শালক বা আত্মীয় বলিয়া। শুনিলাম বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক টেক্সট্‌বুক কমিটির ত্রিমূর্ত্তির একচেটিয়া ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উক্ত কমিটির সভাপতি পুণ্যশ্লোক জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একটি কীট পতঙ্গের মনেও ক্লেশ দিতে চাহেন না। এই ত্রিমূর্ত্তি তাঁহার আত্মীয়। ইহারা তাঁহার সদাশয়তার ফলে কলিকাতায় বাড়ীর উপর বাড়ী, তালার উপর তালা এই ঘৃণিত ব্যবসায়ের দ্বারা শিশু-রক্তমাংসে নির্ম্মাণ করিতেছে। আমার 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই আমি অকস্মাৎ পূর্ব্ববঙ্গের ইন্‌স্‌পেক্টর মিঃ মার্টিন হইতে এক টেলিগ্রাম পাই যে, আমার 'পলাশির যুদ্ধ' পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। আমি তখন ছাত্রবৃত্তি কাহাকে বলে, তাহার পাঠ্যনির্ব্বাচনের অর্থ কি, তাহাও জানিতাম না। আমি তখন মাত্র প্রথম বার চট্টগ্রাম কমিশনরের পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইয়াছি। আমার সেরেস্তাদার মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের লোক, তাঁহাকে টেলিগ্রাম দেখাইলে, তিনি আমাকে বলিলেন, আমি ইহাতে আট দশ হাজার টাকা পাইব। আমি তখন ইংরাজী windfall শব্দটির অর্থ বুঝিলাম। সময় সময় বুঝি এরূপে বাতাসে মানুষের সৌভাগ্য আনিয়া দেয়। অন্ততঃ বিদ্যুতে দুই দুই বার আমাকে এরূপ সৌভাগ্য আনিয়া দিয়াছে। দুই বার এরূপে 'পলাশির যুদ্ধ' স্কুলে পাঠ্য হইল। কিন্তু তাহার পর চুপ। কয়েক বৎসর পরে পূর্ব্ববঙ্গের তদানীন্তন ইন্‌স্‌পেক্টর বাবু দীননাথ সেন ফেনী স্কুল পরিদর্শনে আসিলে আমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, দুই বার আমার পুস্তক স্কুলপাঠ্য হওয়ায় টেক্সট্‌বুক কমিটি নিয়ম করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা এক পাঠ্যতালিকা প্রচারিত হইবে, এবং ইন্‌স্‌পেক্টরগণ সেই তালিকাভুক্ত পুস্তকই কেবল স্কুলপাঠ্য করিতে পারিবেন। তিনি বলিলেন—এ কৌশল সেই ত্রিমূর্ত্তির। তাহার ফলে পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কোনও লেখকের, কি সঙ্কলনকারীর পুস্তক আর স্কুলপাঠ্যতালিকাভুক্ত হইতেছে না। পশ্চিম-বাঙ্গালারও ঐ ত্রিমূর্ত্তির নিজের, কি শালা, ভগ্নীপতি বা উচ্ছিষ্টভোজীর পুস্তক ভিন্ন অন্য কাহারও পুস্তক তালিকায় স্থান পায় না। দীননাথবাবু বলিলেন, তিনি 'পলাশির যুদ্ধ' তালিকাভুক্ত করিতে বহুবার রিপোর্ট করিয়াছেন, কিন্তু কোনও উত্তর পর্য্যন্ত পান নাই। আরও শুনিলাম যে, সঙ্কলিত

খণ্ড কবিতা ভিন্ন কোনও কাব্য স্কুলপাঠ্য তালিকায় উঠে না। কারণ, ত্রিমূর্ত্তিদের নিজের, কি শালাদের কাব্য প্রণয়ন করিবার শক্তি নাই। তখন আমার করকণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। এই ঘৃণিত চাতুরী ভেদ করিবার জন্য আমার 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কয়েক পৃষ্ঠা বদলাইয়া এক পত্র সহ টেক্সট্‌বুক কমিটির কাছে পাঠাইলাম। যে সকল পৃষ্ঠায় রাজনীতির, কি আদিরসের গন্ধ ছিল, তাহা বদলাইলাম, এবং পত্রে লিখিলাম—আমাদের খণ্ড কবিতা যাহারা উদ্ধৃত করে, তাহাদের সঙ্কলিত পুস্তক পাঠ্য হইতেছে, অথচ কাব্যকার আমাদের মূল গ্রন্থ পাঠ্য হয় না। এরূপ তস্করতার প্রশ্রয় দিয়া 'টেক্সট্‌বুক কমিটি' এক দিকে গ্রন্থকারদের ক্ষতি ও অন্য দিকে প্রকৃত সাহিত্যের অবনতি ঘটাইতেছেন। যদি কেবল খণ্ড কাব্য স্কুল-পাঠ্য করা তাঁহাদের শিক্ষানীতি হইয়া থাকে, তবে আমার 'অবকাশরঞ্জিনী'ও খণ্ড কবিতা-গ্রন্থ। উহা হইতে বহু কবিতা সঙ্কলনকারীরা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব উহা পাঠ্য করিলেও উক্ত নীতির অবমাননার সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য, ইহার কোনও উত্তর পাইলাম না।

রাণাঘাটে 'ত্রিমূর্ত্তি'র আদি বা বিরাট মূর্ত্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে রাণাঘাটে আসিয়াছিলেন। 'পলাশির যুদ্ধ' তাঁহাদের তালিকায় স্থান পায় না কেন জিজ্ঞসা করিলে তিনি বলিলেন—"আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' বাঙ্গালার classic (আদর্শ গ্রন্থ)। উহা কি বালকের পাঠোপযোগী হইতে পারে?" কলিকাতায় বদলি হইয়া, অন্য দুই মূর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে একজন বলিলেন—"ভায়া হে! তোমার বহিতে স্থানে স্থানে Political hit (রাজনৈতিক ঠেস) আছে।" আর একজন বলিলেন—"আপনার বহির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বালকদের পড়িবার বহি আর কি হইতে পারে? তবে স্থানে স্থানে আদিরস আছে। তাই যা আপত্তি।" কিন্তু গুরুদাসবাবু আসল কথা খুলিয়া বলিলেন—"আপনি 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'কে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? উহার দ্বারা কি আপনি কমিটির অপমান করিয়াছিলেন না? অতএব কমিটি আপনার প্রতি ত সদয় হইবার কথা নহে। যাহা হউক, 'পলাশির যুদ্ধ'খানি আর একবার 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র কাছে পাঠাইয়া দিবেন।" কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম, 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র নীচাশয়তা ও স্বার্থপরতার কলঙ্কে নগর পরিপূর্ণ। কোনও গ্রন্থকার বহি লইয়া গেলে ত্রিমূর্ত্তিরা নাকি এ পর্য্যন্ত বলিতেন—"ছি! কি বিশ্রী কাগজে ছাপা! অমুকের দোকান হইতে কাগজ না কিনিয়া, অমুক প্রেসে না ছাপাইলে কি তাহা স্কুলপাঠ্য হইবার যোগ্য হইতে পারে?" রাশি রাশি তাঁহাদের নিজের সনামা ও বেনামা বহি স্কুলপাঠ্য হইতেছে। উহা নির্ব্বাচিত হইবার সময়ে, যাঁহার পুস্তক, তিনি কমিটির বাহিরে যান, আর অন্য দুই মূর্ত্তি জোর করিয়া তাহা পাশ করান! নিমে দত্ত বলিয়াছিল—"বলরাম দাদার চোকে কাপড় বাঁধিয়া, জগন্নাথ সুভদ্রা দিদির সঙ্গে বিহার করেন।" ফলতঃ শ্রাদ্ধ এত দূর গড়াইয়াছে যে, ত্রিশ বত্রিশ জন স্কুলপাঠ্য পুস্তকলেখক 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র কলঙ্কপূর্ণ এক আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমি কলিকাতায় আসিয়া এই শিশুরক্ত-শোষণ, এবং তাহাদের দরিদ্র অভিভাবকদের কৃচ্ছ্রসাধ্য-মুষ্ট্যন্নাপহরণরূপ মহাপাতক নিবারণ ব্রতেও হস্তক্ষেপ করিলাম। সুরেন্দ্রবাবু ও আনন্দমোহন বসুর দ্বারা কাউন্সিলে প্রশ্নের দ্বারা ও দৈনিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রবন্ধের দ্বারা 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র ও শিক্ষা বিভাগের এই কুকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিতে লাগিলাম। লেঃ গবর্ণর মেকেঞ্জির চক্ষু খুলিয়া গেল, তিনি আমাদের চেষ্টার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র শ্রীমতী রাধিকা ও তাঁহার পদপল্লবধারী কৃষ্ণ নষ্টচন্দ্র ও তস্য বাহন গজেন্দ্র বা গরুড়েন্দ্রের কমিটি-মেম্বারদের অন্তর্দাহে, অন্য দিকে ঘৃণাযুক্ত উপহাসের হাসিতে কলিকাতা তোলপাড় হইল। একদিন

জাষ্টিস গুরুদাসবাবু আমাকে বলিলেন যে, 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র বিরাট পুরুষ তাঁহার কাছে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, আমি তাঁহার মত ভ্রাতার বন্ধু হইয়াও তাহার বুকখানি বহির প্রতিকূলে প্রশ্ন করাইয়া, তাহার বিধবা পত্নীর মুখের গ্রাসটি নষ্ট করিতেছি। আমি বিস্মিত হইলাম। কারণ, আমি চিরদিন কার্য্যের প্রতিকূলে প্রতিবাদ করি, কিন্তু কোনও ব্যক্তির প্রতিকূলে অস্ত্র ধরি না। গুরুদাসবাবু যে প্রশ্নের কথা বলিলেন, আমি বলিলাম, আমি সেই প্রশ্নের বিষয় কিছুই অবগত নহি। তিনি ইচ্ছা করিলে সুরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহার অনুরোধমতে আমি সুরেন্দ্রবাবুর কাছে গেলে, তিনি বলিলেন, উক্ত প্রশ্ন একজন ব্রাহ্ম তাঁহাকে দিয়াছিলেন এবং এবার 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র আসল মহা-পাপীটি ধরা পড়িয়াছে। বিষয়টি এই, আমি এক প্রশ্ন করিয়াছিলাম— কোনও বহি স্থায়িরূপে স্কুলপাঠ্য করা গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করেন কি না? তাহার উত্তরে সেই প্রধান ব্যক্তি, যিনি শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বশক্তিমান্ পুরুষ, এবং ডিরেক্টরের দক্ষিণ হস্ত, গবর্ণমেণ্টের দ্বারা উত্তর দিয়াছিলেন যে, সকল পুস্তকই সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করা হয়। তখন আমরা সমস্ত স্কুলপাঠ্য পুস্তকের তালিকা চাহি, এবং কোন্‌টি কত কাল আছে, কোন প্রেসে ছাপা হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহি। এই তালিকায় উক্ত মহাপুরুষ মহাসংকটে পড়িলেন। প্রায় সমস্ত বহিই তাঁহার প্রেসে ছাপা। কেবল তাহা নহে, তাঁহার ভ্রাতার এক বহি 'কায়েমি' পাঠ্য। এখন উহা যদি 'কায়েমি' বলিয়া দেখান হয়, তবে তাহার পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে ভোগ-দখলের 'মৌরসি'স্বত্ব উঠিয়া যায়। অতএব তিনি এই বহিখানির পার্শ্বে ক্ষুদ্র অক্ষরে parmanent 'কায়েমি' শব্দটি লিখিয়া দিয়াছেন। আমি উহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু এক দিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ আমার নীতি নহে, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা-প্রণালী সংস্কার সম্বন্ধে আমি যে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিলাম, এই মহাপুরুষ তাহাতে ভয়ে ভয়ে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি দেখাইতেছিলেন। অতএব আমি আর এ বিষয়ে কিছু গোলযোগ করি নাই। কিন্তু ব্রাহ্ম ভায়া আসিয়া উহা ধরাইয়া দিয়াছেন। এই প্রশ্ন পাইয়া মেকেঞ্জি চটিয়া লাল হইয়াছেন। কারণ, কোনও পুস্তক 'কায়েমি' নাই বলিয়া তিনি কাউন্সিলে পূর্ব্বে উত্তর দিয়াছেন। এখন তিনি এই তালিকার দ্বার মিথ্যুক প্রমাণিত হইয়াছেন। তিনি শিক্ষা-বিভাগে আগুন জ্বালাইয়াছেন। কেন কাউন্সিলে ডিরেক্টর এই মিথ্যা উত্তর, তাহার পর এই জুয়াচুরিপূর্ণ তালিকা পাঠাইয়াছেন, তাহার জন্য ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। ডিরেক্টর তাঁহার দক্ষিণ হস্ত কাটিতে অসি তুলিয়াছেন। তাই দক্ষিণ হস্তের বিধবা ভ্রাতৃবধূর মুখের গ্রাস বিপন্ন। আমি তখন দক্ষিণ হস্ত মহাশয়কে লিখিলাম যে, এ কার্য্য আমার নহে, উহা কোনও স্কুলপাঠ্য-লেখক ব্রাহ্ম ভায়ার ভ্রাতৃপ্রেম। তিনি আমাকে দীর্ঘ ধন্যবাদ দিয়া এ পত্রের উত্তর দিলেন, এবং লিখিলেন যে, এই মারাত্মক প্রশ্ন আমার নহে শুনিয়া, তাঁহার বুক হইতে একখানি পাথর নামিয়া গেল। যাহা হউক, প্রশ্নটি না জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আমি গুরুদাসবাবুর প্রবর্ত্তনায় সুরেন্দ্রবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহার পরদিন কাউন্সিলের অধিবেশন। তিনি বলিলেন, প্রশ্ন প্রত্যাহারের সময় নাই। অতএব প্রশ্ন কাউন্সিলে উঠিলে, এবং গবর্ণমেণ্ট উক্ত parmanent 'কায়েমি' শব্দটি ভুল বলিয়া স্বীকার করিলেন। বিধবার মুখের গ্রাস পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে খসিয়া পড়িল। কিন্তু ইতিমধ্যেই বিধবা বা 'দক্ষিণহস্ত মহাশয়' প্রায় লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। অতএব বিধবাটি কুম্ভকর্ণ কিংবা 'দক্ষিণ হস্তে'র তুল্য বৃহৎ ক্ষুধাগ্রস্ত না হইলে, তাঁহার গ্রাসের বড় অভাব হইবার কথা নহে।

এ সময়ে আবার কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা পড়িল। আমার 'পলাশির যুদ্ধে'র এ সময়ে একটা নূতন সংস্করণ হইতেছিল। আমি এই সুযোগে যে যে স্থানে রাজনৈতিক গন্ধ, কি আদিরসের ছায়া ছিল, তাহা বাদ দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ছাপিয়া,

তাহার বিশ কপি 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র কাছে পাঠাইলাম। এবার ত্রিমূর্ত্তি বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। কমিটিতে তিন জনে তুমুল বিতণ্ডা তুলিলেন। তাঁহারা কোনও মতে এই অপাঠ্য বহি স্কুলপাঠ্যতালিকাভুক্ত হইতে দিবেন না। তাহা হইলে একদিকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক আসিয়া তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্যে প্রবেশ লাভ করিবে, অন্য দিকে মৌলিক কাব্য পাঠ্য হইলে, তাহা ত তাঁহাদের, কি তাঁহাদের শালাসম্বন্ধীর লিখিবার সাধ্য নাই। কাজেই এ সুখের ব্যবসাটা, যাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে শিশুরক্ত ও মাংসে তাঁহাদের কোঠাবালাখানা হইয়াছে, তাহা একেবারে মারা যাইবে। কিন্তু এবার গুরুদাসবাবু দৃঢ় হইয়া রহিলেন, এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেন। কাজেই কমিটির শিশুশোণিত-শোষী ত্রিবিক্রম পরাভূত, এবং তাঁহাদের শিশুরক্তপোষিত দলপতি ধরাশায়ী হইলেন। কমিটির সভাতলে যেন ধবলগিরির শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। হাসিতে হাসিতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমার ১০নং গোমেস লেনের বাড়ীতে আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিলেন। কমিটির বিরাট পুরুষ মহাদেব, তাঁহার দুই সহচর নন্দি ও ভৃঙ্গি। নন্দিকে তাঁহার কাব্যে রবিবাবু 'হিংটিংছট্' উপাধি দিয়া, এবং তাহার বামনরূপ বর্ণনা করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। নন্দি ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। এই পরাজয়ে মর্ম্মাহত হইয়া পরদিবস প্রাতে আমার মস্তকে পত্ররূপী এক শূল নিক্ষেপ করিলেন। বোধ হয়, রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। এই বহুমূল্য পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম। কারণ, ইহাতে আমার ঘোরতর ভবিষ্যৎ বিপদের অঙ্কুর নিহিত ছিল।

৫ নং———————
২৩এ অগ্রহায়ণ—১৩০৩

নবীন,

টেক্সট্‌বুক কমিটির সংস্রবে আমি তোমার 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রতিকূলে মত দিয়াছিলাম। তোমার পুস্তকে বালকদিগের অনুপযোগী অনেক কথা দেখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে কেবল সেই গোরার গানের কথা তোমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম। আরও আপত্তিজনক কথা আছে, ইহাও তোমাকে বলিয়াছিলাম—কি কি তাহা বলি নাই। তুমি যখন স্কুল-সংস্করণ প্রস্তুত কর, তখন আমাকে দেখাইয়াও লও নাই। তোমার স্কুল-সংস্করণে অনেক আপত্তিজনক কথা আছে। তথাপি কমিটিতে যখন স্কুল-সংস্করণ পেশ হয়, তখন আমি এই মাত্র বলিয়াছিলাম যে, ইহাও আমার অনুমোদিত নহে। তবে অপর সকলে যদি অনুমোদন করেন, তাহা হইলে আমি প্রতিকূলতা করিব না। স্কুল-সংস্করণ সেই জন্য বিনা আপত্তিতে অনুমোদিতও হইয়াছিল। আরও এক কথা। আমি তোমার 'পলাশির যুদ্ধ' বুঝিতে পারি না। 'পলাশির যুদ্ধে' মুসলমান বাঙ্গালা হারাইল। হিন্দুর তাহাতে উচ্ছ্বাস কিসের ও কেন? মোহনলালই বা দুঃখ করে কেন? মুসলমানের চাকর বলিয়া? তুমি হিন্দু, সেটা কি তোমার গায়ে সয়? আর মোহনলালের মুখে ওরূপ আক্ষেপোক্তি দিয়া তুমি কি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি disloyalty দেখাও নাই? বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের disloyaltyর ভাব তোমার পুস্তকের আরও কয়েক স্থানে স্পষ্টতঃ না থাকুক, একটুক প্রচ্ছন্নভাবে আছে। এ কথাটা কিন্তু আমি কমিটিকে জানাই নাই।*

পলাশির যুদ্ধ সম্বন্ধে হিন্দুর মনে ভাবের তরঙ্গ কেন উঠে বুঝিতে পারি না। জনকতক হিন্দু বাঙ্গালাটা ইংরাজকে ধরিয়া দিয়াছিল বলিয়া কি? যদি তাহাই হয়, তুমি কি সত্য সত্যই বিশ্বাস কর যে, পলাশিতে ইংরাজ হারিলে বাঙ্গালায় বা ভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইত? যদি সেই বিশ্বাসেই পলাশির যুদ্ধ লিখিয়া থাক, তাহা হইলে অভিপ্রায়টা

---

* কি উদারতা!

যে একেবারেই ফুটাইতে পার নাই, ইহা বলিতে হইতেছে। আরও অনেক রকমে পলাশির যুদ্ধ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু বুঝিতে পারি নাই।

এ সব কথা ছাড়িয়া দিলেও যাহা লিখিয়াছ, শুদ্ধ তাহা দেখিলেও মনে হয় যে, পলাশির যুদ্ধ বালকের পাঠ্য হওয়া উচিত নয়।* ঐ সব রাজনীতিক মন্ত্রণা, ষড়্‌যন্ত্র ইত্যাদি সরল সাদাপ্রাণ শিশুকে বুঝিতে দেওয়া ভাল কি? আর বুঝিতে বলিলেই কি সে তাহা বুঝিতে পারিবে? ও সব বুড়া ছেলেদের দিলে সাজে, কচি ছেলে, যাহারা সলা, মন্ত্রণা, ষড়্‌যন্ত্রের নাম পর্যন্ত শুনে নাই, তাহাদের কচি সাদা মনে ঐ সব পাপের কথা ঢালিয়া দিয়া যন্ত্রণা দেওয়া কেন? ইতি।

শ্রী————

আমি ইহার এই উত্তর দিলাম।

দাদা মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। আমি ইহার কি উত্তর দিব?

'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইয়াছে আজ বিশ বৎসর। বঙ্গের শিক্ষিত আবালবৃদ্ধ সকলেই বোধ হয় উহা পড়িয়াছেন, এবং উহা ইতিপূর্বেও দুই বার পূর্ণাবয়বে পাঠ্য পুস্তক হইয়াছিল। অতএব এখনও যে উহার সম্বন্ধে, বিশেষতঃ আপনার অভিপ্রায়ানুসারে প্রকাশিত বিদ্যালয়ের পাঠ্য সংস্করণ সম্বন্ধেও, আপনার এতগুলিন ভুল ধারণা রহিয়াছে, উহা কাব্য ও কাব্যকার উভয়েরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

যাহা হউক, 'পরিষদে'র গত অধিবেশনে শিক্ষা-সমিতির আবেদনপত্র যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, বোধ হয়, 'পলাশির যুদ্ধ' আর বিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবে না।

ভরসা করি, আপনার অসুখ সারিয়াছে এবং এখন আপনি সুস্থ শরীরে সুখে আছেন। কলিকাতার সাহিত্যসেবীদের মধ্যে আপনার অপেক্ষা আমার পুরাতন পরিচিত আর কেহ নাই। সেই প্রীতি হইতে যেন বঞ্চিত না হই।

প্রীতিপ্রার্থী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

এই মহাপুরুষই 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরে তাহার রচয়িতার সঙ্গে জেষ্টিস গুরুদাসবাবুকে ধরিয়া পরিচিত হইয়া, তাহার কত গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। স্বার্থে আঘাত লাগিলে মানুষ বৃদ্ধ বয়সেও এরূপ অন্ধ হয়! আমি পত্রখানি গুরুদাসবাবুর কাছে পাঠাইলাম। সাহিত্যপরিষদের শিক্ষাসমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে আমি এই স্কুলপাঠ্য 'একচেটিয়া ব্যবসায়ে' ও শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে হাত দিয়াছি বলিয়া এই মহাপুরুষ আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছিলেন। তিনি গুরুদাসবাবুর বন্ধু। গুরুদাসবাবুকে আমি দেবতার ভক্তি করি। গুরুদাসবাবুর অনুরোধে আমি তাহা নীরবে সহিতেছিলাম। অতএব এই অপূর্ব পত্রখানি আমি গুরুদাসবাবুর কাছে পাঠাইলাম, এবং লিখিলাম যে, আমি ইহাঁর সমস্ত কুকীর্ত্তি উদ্ভেদ করিয়া এই পত্র সমস্ত সংবাদপত্রে ছাপিয়া দিব। গুরুদাসবাবু হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার সময়ে আমার গৃহে আসিলেন, এবং আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বন্ধুর মাথা খারাপ হইয়াছে। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ, আমি যেন

* কেবল তাঁহার সরস ও সরেস 'নূতন কাঠ'—যাহাতে দারোগার মোকদ্দমার কেচ্ছা আছে, তাহাই পাঠ্য।

পত্রখানি না ছাপাই। আমি বুঝিলাম, 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র এই ত্রিমূর্ত্তির কলঙ্কে একে ত দেশে কান পাতিবার জো নাই, তাহাতে যদি আমি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে তাহা লিখিয়া হাটের মাঝে এই হাঁড়ি ভাঙ্গি, তবে উক্ত কমিটির সভাপতিস্বরূপ গুরুদাসবাবুও কতক পরিমাণে সেই কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী হইবেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি উক্ত সভাপতিত্ব ছাড়িয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন। আমি বলিলাম,—আমি বামন মহাশয়ের ব্যবহার যে হাসিয়া উড়াইয়া দিই, তাহা তিনি দেখিয়াছেন। আমিও মনে করি যে, স্বার্থের আঘাতে তিনি ক্ষেপিয়াছেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা যে, লোকটি যেরূপে পারে, আমার ঘোরতর অনিষ্ট করিবে। লোকে বলে, কবিরা ভবিষ্যদ্‌বেত্তা। এরূপে অনেক বার ভবিষ্যৎ-ছায়া আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। গুরুদাসবাবু বলিলেন যে, তিনি তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন, এবং আমার কাছে বামনের দ্বারা ক্ষমা চাহিয়া পত্র লেখাইবেন। তাহার দুই এক দিন পরে আমি এই সরলতাপূর্ণ পত্র পাইলাম।

৫ নং——————
৪ঠা পৌষ ১৩০৩

ভাই নবীন,

আমি কখনও কাহারও সহিত কলহ করি নাই। কখন কাহারও সম্বন্ধে মনে অসদ্ভাব পোষণ করি নাই। ওরূপ করা আমি পাপ মনে করি। ওরূপ করিতে আমি পারিয়া উঠি না। যাঁহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিয়াছি, আমার সাক্ষাতে তিনি আমাকে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছেন, মনঃকষ্ট দিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব একটুক পরিবর্ত্তিতও হয় নাই। দুই দিনের জন্য আসিয়া মনোমালিন্য কেন? মরিয়া গেলে মানও যাইবে, অপমানও যাইবে। তবে অপমানিত হইলাম বলিয়া রাগ করি কেন? আর আমি যদি প্রকৃত মানী হই, তবে আমার অপমানই বা করে কে? তুমি আমার কাছে আগেও যেমন ছিলে, এখনও তেমনি আছ। যতদিন বাঁচিব, ততদিন থাকিবে। আর আমার ইচ্ছা, তোমার কাছে আমি আগেও যেমন ছিলাম, চিরকাল যেন তেমনি থাকি। তোমার বয়স ও জ্ঞান যেমন বৃদ্ধি হইতেছে, তুমি তেমন ঠাণ্ডা হইতেছ না দেখিয়া তোমার দাদা বলিয়া তোমাকে এই কথা বলিলাম।*

আমি এখনও কাশিতে ভুগিতেছি। আমার শরীর বড় দুর্ব্বল। কোনও মতে আপিসে যাইতেছি। বোধ হয়, শীঘ্র একটু লম্বা ছুটি লইব। ইতি

শ্রী——————.

পত্রখানি পড়িয়া পাঠকদের মনের ভাব কি হইবে জানি না। আমি বড়ই হাসিলাম। লোকটার প্রতি আমার Pity (দয়া) হইল। যদিও সাহিত্য সম্বন্ধে জানিতাম যে, তিনি 'বঙ্কিম'-সূর্য্যের প্রতিভায় প্রতিভাত চন্দ্র মাত্র, সন্ধ্যার সময়ে বঙ্কিমবাবুর বাড়ী প্রত্যহই জুটিতেন, এবং বঙ্কিমবাবু যে সন্ধ্যায় যে বিষয়ে আলাপ ও ব্যাখ্যা করিতেন, তিনি তাহা বিনাইয়া, ফেনাইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, তথাপি লোকটির গদ্য-ভাষার উপর বেশ অধিকার আছে বলিয়া আমি শ্রদ্ধা করিতাম। ইহার যে এতই অধঃপতন হইবে, স্বপ্নেও জানিতাম না। পরে তাহা দেখাইব। যাহা হউক, গুরুদাসবাবুকে এ পত্রও দেখাইলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি যেরূপ তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের সভায় ঠাট্টা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছেন, এই পত্রই যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করুন। ইহা লইয়া আমার অনুরোধে আর নাড়া-চাড়া করিবেন না।" করিলাম না।

কিন্তু এ সময়ে আবার কানা চোখে কুটা পড়িল এবং তাহার যন্ত্রণা অসীম হইল।

* ব্রাহ্মণীর ঐ মাত্র দোষ, কাণে কম শুনে।

'পলাশির যুদ্ধ' স্কুল-পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়া মাত্র ডিরেক্টর মার্টিন (Martin) উহা আবার পূর্ব্ব-কেন্দ্রের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য করিলেন। শিক্ষা-বিভাগের ও 'টেক্সট্‌বুক কমিটি'র বিরাটদেবের ঘোরতর বিপক্ষতায় তিনি তাঁহার কেন্দ্রে তাহা স্কুলপাঠ্য করিতে দেন নাই। সেখানে তাঁহার দলের জনৈকের এক অপূর্ব্ব সঙ্কলন (Compilation) পাঠ্য হইয়াছে। মার্টিন সাহেবের সঙ্গে আমার তখন পর্য্যন্ত পরিচয় হয় নাই। তিনি বারম্বার 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রতি এই অযাচিত অনুগ্রহ দেখাইয়াছেন, এবং আমিও তখন কলিকাতায় আছি। অতএব এবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতজ্ঞতা না দেখাইলে নিতান্ত অশিষ্টতা হয় বলিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বড় আদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আমার কৃতজ্ঞতা তাঁহার প্রাপ্য নহে, উহা একটি মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য—ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর ঁবিদ্যাধর দাস। মার্টিন বলিলেন যে, ইনিই 'পলাশির যুদ্ধে'র প্রতি তাঁহার প্রথম দৃষ্টি আকর্ষিত করেন, এবং তাঁহার অনুরোধে তিনি উহা দুই বার পূর্ব্ববাঙ্গালায় সম্পূর্ণ আকারে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য করেন। আমি বিস্মিত হইলাম। কারণ, বিদ্যাধর দাস মহাশয়কে আমি চিনিতামও না। তিনি কেবল ঢাকা কলেজের একজন সাহিত্যানুরাগী খ্যাতাপন্ন ছাত্র ও ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর বলিয়া শুনিয়াছিলাম। 'পলাশির যুদ্ধে'র জন্য এত দূর করা তাঁহার পক্ষে কেবল নিষ্কাম সাহিত্যানুরাগ মাত্র। 'পলাশির যুদ্ধে'র অনুকূলে এই নিঃস্বার্থ দেবতা ও অন্য দিকে 'স্কুলবুক কমিটি'র একচেটিয়া ব্যবসায়ী ঘোরতর স্বার্থপর ও বিদ্বেষপর ত্রিমূর্ত্তি! মানবচরিত্রের কি বিপরীত সমাবেশ! আমি মার্টিন সাহেবকে বলিলাম, ঁবিদ্যাধর দাস আমার সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত। তিনি বলিলেন, তাহাতে তিনি বিস্মিত হইলেন না। কারণ, বিদ্যাধরের মত নিঃস্বার্থ ও যোগ্য কর্ম্মচারী তিনি দেখেন নাই। পূর্ব্ববাঙ্গালার দুরদৃষ্ট! ইহাঁর অকালে মৃত্যু না হইলে তিনিও বিরাট পুরুষের স্থান গ্রহণ করিতেন, এবং তাহাতে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে কলঙ্কিত ও ঘৃণিত না করিয়া গৌরবান্বিত করিতেন। আমি মার্টিন সাহেবের গৃহ হইতে বাড়ী ফিরিবার সময়ে উপরোক্ত বিষয়ে নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া আলোচনা করিলাম, এবং স্বর্গীয় বিদ্যাধর দাস মহাশয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার দিলাম। কলিকাতার স্কুলপাঠ্য-লেখকদের মধ্যে একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া ত্রিমূর্ত্তির পরাভবে আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"ত্রিমূর্ত্তি ও তাঁহাদের শালা ভগিনীপতি ভিন্ন স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাপাইয়া তিন বৎসর ত্রিমূর্ত্তির দ্বারে ধন্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলে এবং তাহাতে কৃপা হইলে উহা পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। তাহার পর আর তিন বৎসর তাঁহাদের আদিদেবের পদলেহন করিতে পারিলে, তবে উহা কদাচিৎ স্কুলপাঠ্য হয়। আর আপনার 'পলাশির যুদ্ধে'র যেই স্কুলপাঠ্য সংস্করণ ছাপা হইল, অমনি উহা স্কুলপাঠ্য-তালিকায় উঠিল, আর অমনিই উহা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য হইল! আপনি বাহাদুর। ত্রিমূর্ত্তির এমন পরাভব আর কখনও হয় নাই।" অতএব এই 'রাজদ্রোহপূর্ণ' পুস্তক পাঠ্য হওয়াতে স্বয়ং ত্রিমূর্ত্তির কি গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনুমেয়!

কিন্তু ত্রিমূর্ত্তির ত্র্যহস্পর্শজনিত স্কুলবুক কমিটির পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল। আমি কাউন্সিলের প্রশ্নে ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে যে গোলাগুলি তাহার প্রতি বর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহাতে ত্রিমূর্ত্তির দুর্গ 'স্কুলবুক কমিটি', এবং তাহাদের একচেটিয়া ব্যবসা ভাঙ্গিয়া পড়িল। গবর্ণমেণ্ট এই কুকীর্ত্তি বুঝিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে 'স্কুলবুক কমিটি' উঠিয়া গেল। তবে পাপ করিল এই তিন জন—তাহারা এই শিশু-রক্তের দ্বারা যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের ত আর অর্থের ভাবনা নাই—কিন্তু ক্ষতি হইল দেশের। দেশীয়দের হাতে এই ক্ষমতাটুকু ছিল, এবং ইহার দ্বারা অনেক দরিদ্র স্কুলপাঠ্যলেখক প্রতিপালিত হইতে পারিত, এবং বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বহু উপকার সাধিত হইতে

পারিত। এখন এই ক্ষমতা একমাত্র শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের হাতে এবং তাঁহার প্রতি-পালিত ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক-লেখক কোম্পানীর হাতে ও তাহার পদলেহনকারীদের হাতে গিয়াছে। এই তিন স্বার্থপর ব্যক্তির পাপের আজ সমস্ত বাঙ্গালী প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

সাহিত্য-পরিষৎ ও শিক্ষাপ্রণালী

হীরেন্দ্রবাবু যখন রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান, তিনি আমাকে শোভা-বাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীস্থিত সাহিত্য-পরিষদে (তখন উহার নাম বোধ হয় Bengal Literary Academy ছিল) যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। আমি বলিলাম, সংবাদপত্রে উহার যেরূপ কার্য্যবিবরণ দেখিতেছি, উহা একটা ছাত্রদের ছেলেমি (School-boys' Debating Club) মাত্র। বিশেষতঃ আমি এক জীবন সভা-সমিতির ত্রিসীমার মধ্যে কখনও যাই নাই। সভায়, এবং তাহার বাক্যবাগীশ বাঙ্গালীর বাক্য-প্রবাহে দেশ হাবুডুবু খাইতেছে। যেখানে কিছু কার্য্য হয়, সেখানে আমার যোগ দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু এরূপ কার্য্যকরী সভা সমিতি বড় দেখিতে পাই না। অতএব আমার ক্ষুদ্র শক্তির আয়ত্তে যদি কোনও ক্ষুদ্র কাজ পাই, তাহাই করি, এবং তাহাতে আমার বড় আনন্দ। সভা-শ্রাদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে এখন ইংরাজের অনুকরণে 'শোক-সভা' পর্য্যন্ত আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর জন্য 'শোক-সভা' হইবে, রবিবাবু শোক-প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহার সভা-পতিত্ব করিতে আমি আহূত হইয়াছিলাম। আমি উহা অস্বীকার করিয়া লিখিলাম যে, সভা করিয়া কিরূপে শোক করা যায়, আমি হিন্দু তাহা বুঝি না। সভা করিয়া শোক! অশ্রু রাখিবার জন্য কত গামলার বন্দোবস্ত হইয়াছে, একজনকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। এ সকল কথা শুনিয়া রবিবাবু স্বয়ং লিখিলেন যে, আমার সভাপতিত্বের ছায়ায় তিনি তাঁহার শোক-প্রবন্ধ উক্ত সভায় পাঠ করিতে চাহেন। আমার স্মরণ হইল, বঙ্কিমবাবু মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে 'রবির ছায়া' নামক এক প্রবন্ধ 'প্রচারে' প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে রবিবাবু ও তাঁহার মধ্যে বড় সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল না। অতএব শোক-সভাতে শোকটা রবিবাবু করিবেন, আমার কেমন কেমন লাগিল। আমি রবিবাবুকে লিখিলাম যে, আমি বনের জোনাকি, পাতার আড়ালে ও অন্ধকারে আমার মিটমিটে আলোটুকু জ্বলে। তিনি আমাকে জোর করিয়া টানিয়া, কলিকাতার গ্যাসলাইট ও বৈদ্যুতিক লাইটের মধ্যে লইলে উহাও নিবিয়া যাইবে। যাহা হউক, শোক-সভা হইল, রবিবাবু বিনাইয়া বিনাইয়া দীর্ঘ শোক করিয়া যখন অশ্রু মুছিয়া বসিলেন, শুনিলাম— অমনি শ্রোতৃমণ্ডলী চারি দিক্ হইতে বলিতে লাগিল—"রবি ঠাকুর! একটা গান কর।" শোকের এই বিচিত্র পরিণতি দেখিয়া সভাপতি মাননীয় গুরুদাসবাবু বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন যে, রবিবাবুর গলা আজ ভাল নাই, তিনি গাইতে পারিবেন না। কিন্তু তথাপি 'শোক-সভা' সম্বন্ধে আমার উপরোক্ত মতের প্রতিবাদ করিয়া, রবিবাবুর 'সাধনা'তে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। বোধ হয়, উহা শোক-সভার শোকান্ত পরিণতির পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছিল। ইংরাজী প্রবাদে বলে, অনেকে গির্জায় উপাসনার জন্য নহে, সঙ্গীতের জন্যই যাইয়া থাকে। বোধ হয়, পরিচ্ছদের ঘটা দেখিবার ও দেখাইবার জন্য বলিলে আরও সঙ্গত হয়। তদ্রূপ আমাদের শোক-সভায়ও অধিকাংশ দর্শক পান চিবাইতে চিবাইতে এবং অমৃতবাবুর শেষ প্রহসনের আড়খেমটা গান গাইতে গাইতে, 'রবি ঠাকুরে'র রমণীদুর্লভ কণ্ঠের গান শুনিতে, কিম্বা হুজুগ দেখিতে উপস্থিত হইয়া থাকে। আমাদের শোক কালো ফিতায় দেখাইবার জিনিস নহে। আমাদের শোক বড় নিভৃত ও পবিত্র। উহা সভা করিয়া একটা তামাসার জিনিস করা আমি মহাপাতক মনে করি। অবস্থা যেরূপ

দাঁড়াইতেছে, বোধ হয় আর কিছু দিন পরে পিতা মাতার শ্রাদ্ধ করিতে হইলেও এক সভা হইবে, এবং তাহাতে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রতিজ্ঞা গৃহীত হইয়া, উহা সংবাদপত্রে প্রেরিত হইবে।

যাহা হউক, আমার আপত্তি শুনিয়া হীরেন্দ্রবাবু আর কিছু বলিলেন না। আমি কলিকাতা বদলি হইয়া গেলে হীরেন্দ্রবাবু আবার বলিলেন যে, রাজা বিনয়কৃষ্ণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, এবং কখন্ আপনার সুবিধা হইবে, জানিতে চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম, আমি কলিকাতায় নবাগত, আমারই তাঁহার সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ করা উচিত। এক রবিবার প্রাতে হীরেন্দ্র আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার শোভাবাজারস্থ পুরাতন প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তিনি আমাকে সসম্মান অভ্যর্থনা করিয়া 'পরিষদে' যোগদান করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। সভা সমিতি সম্বন্ধে আমার মত তাঁহাকে আমি সরলভাবে খুলিয়া বলিলাম। তবে সাহিত্য-পরিষদের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া, উহাকে Dcbating Club হইতে যদি কার্য্যকরী সভা করেন, বলিলাম—তবে আমি তাহাতে যোগ দিতে পারি। সভার আরও কয়েকজন সভ্য বোধ হয় আমার প্রতীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা আমার কথা নীরবে শুনিতেছিলেন। সকলেই যেন বড় প্রীত ও উত্তেজিত হইলেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন যে, সভার সম্যক্ ভার তিনি আমার হস্তে প্রদান করিলেন। আমি যেরূপভাবে উহা চালাইতে চাহি, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হইবেন। আমি চিন্তা করিয়া ও হীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা নূতন প্রণালী স্থির করিলাম, এবং সভার দ্বারা অনুমোদিত করাইয়া ক্রমে ক্রমে সভাকে বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষদে পরিণত করিলাম। পূর্ব্বে উহাতে কিরূপ ছেলেমি প্রবেশ করিয়াছিল, এবং কিরূপে উহার কার্য্য চলিতেছিল, দুটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিব। সভায় একবার গাম্ভীর্য্যের সহিত প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল যে, সভায় যে সভ্য ইংরাজী কথা বলিবে, তাহার এক পয়সা জরিমানা হইবে! আর একবার এক সভ্য অন্য একজনের লিখিত একটি প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপাইবার জন্য সম্পাদক মহাশয়ের কাছে সুপারিস পাঠাইয়াছিলেন। যদিও পত্রিকায় তখন বহু হাস্যকর বিষয় মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণকে আপ্যায়িত করিত—কারণ, তখন পত্রিকার অন্য পাঠক কেহই ছিল না, তথাপি বিজ্ঞ সম্পাদক উহা মুদ্রিত করিলেন না। তজ্জন্য সুপারিসকারী সভ্য মহাশয় তাঁহার উপর এক তীক্ষ্ন পত্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সম্পাদক মহাশয়ও রবিবাবুর সেই 'হিং টিং ছট্'। তাঁহার ও তস্য বাহন গজেন্দ্রের তখন পরিষদে একাধিপত্য। আমি প্রথম দিন সভায় গজেন্দ্রের গর্জ্জন শুনিয়া, লোকটি কে জিজ্ঞাসা করিলে বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন—"লোকটি দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি। প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে।" গজেন্দ্র তাহার বাহকের এই অপমানে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছে। সে রাজা বিনয়কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া আমার বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল, এবং গর্জ্জনে আমার ক্ষুদ্র গৃহের ছাদের বিঘ্ন ঘটাইবার সম্ভাবনা করিল—"তিনি (সম্পাদক) একজন সদাশিব! তাঁহার এই অকথ্য অপমান! অতএব সভামধ্যে এক বৃহৎ 'রিজলিউশন' দ্বারা তাঁহার নষ্ট মান উদ্ধার করিতে হইবে এবং তাঁহার অপমানকারীকে তিরস্কৃত করিতে হইবে।" তাহার ইচ্ছা, সে সভামধ্যে সেই মহাপাতকীর কর্ণমর্দ্দন করিয়া দিবে। আমি তাহাকে অনেক বুঝাইয়া, তাহার ক্রোধের উপশম করিলাম, এবং বলিলাম যে, ইহার নিষ্পত্তির ভার আমি গ্রহণ করিলাম। ইহার জন্য এই ক্ষুদ্র পৃথিবীটাকে তাহার দন্তের দ্বারা বিদারিত করিতে হইবে না। তাহার পর আমি সুপারিসকারী সভ্যকে অনেক বলিয়া কহিয়া, তাঁহার দ্বারা একখানি মানভঞ্জন-পত্র লেখাইলাম, আর পৃথিবীটা সে যাত্রা রক্ষা পাইল। সেই গঠন ও কার্য্য প্রণালীর উপর পরিষৎ এখনও দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু আমার একটি প্রস্তাব এখনও

কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এবং পরিষৎও তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, পরিষৎ-পত্রিকার তিন ভাগ হইবে। প্রথম ভাগে প্রাচীন কাব্য, দ্বিতীয় ভাগে সাময়িক প্রবন্ধ, এবং তৃতীয় ভাগে ভারতীয় সাময়িক সাহিত্যের অনুবাদ থাকিবে। বিলাতের কোনও একটা অজ্ঞাত স্থান হইতেও কোনও একটা সামান্য পুস্তক, কি প্রবন্ধ বাহির হইলে, আমরা তাহা সাগ্রহে পাঠ করি, এবং পৃথিবীর সমস্ত স্থানের সাহিত্যের গতি ও মতি আমরা ইংরাজী ভাষার দ্বারা জানিতে পারি। কেবল ভারতবর্ষের বম্বে, মান্দ্রাজ, মধ্যভারত, পশ্চিম-ভারত, পাঞ্জাব, উৎকল প্রভৃতি নানা স্থানের সাহিত্যের কিছুই আমরা জানিতে পারি না। সে সকল দেশের সাহিত্যসেবীরা আমাদের সাহিত্যের কিছুই খবর রাখেন না। অতএব আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষের যে স্থানে যে-কোন পাঠযোগ্য পুস্তক, কি প্রবন্ধ বাহির হয়, কি পাঠযোগ্য কোনও পুরাতন পুস্তক থাকে, তাহার অনুবাদ পরিষৎ-পত্রিকার এই তৃতীয় ভাগে প্রকাশিত হইবে। শিক্ষিত বাঙ্গালী ভারতের সকল স্থানে এবং সমগ্র ভারতের শিক্ষিত লোক কলিকাতায় আছেন। অতএব একটুক চেষ্টা করিলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। এমন কি, ন্যাশনাল কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে, কি স্বতন্ত্র ভাবে একটা ভারতীয় ভাষার কংগ্রেস করিলে, ভারতীয় রাজনীতির ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যেরও একপ্রাণতা সাধিত হইতে পারে। এই প্রস্তাবের উপকারিতা আর কি বুঝাইব। কিন্তু আমি কলিকাতা পরিত্যাগ করাতে এই প্রস্তাবটি মাটিচাপা পড়িয়া আছে। বলা বাহুল্য যে, পরিষদের গঠন ও কার্য্যাবলীর পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উক্ত 'হিং টিং ছট্' বা 'ডন্‌কুইক্সট্' ও তস্য বিশ্বস্ত ভৃত্য 'সেঙ্কো' ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'স্কুলবুক কমিটি'র মত পরিষৎটাও একচেটিয়া মহল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এখানেও আমি প্রবেশ করিয়া তাহা ধ্বংস করিতেছি দেখিয়া, তাঁহাদের ক্রোধানল ধূমায়িত হইতে লাগিল। তাহার পর যখন আমি শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে হাত দিলাম, তখন তাহা দাবানলে পরিণত হইল।

আমি স্থির করিয়াছিলাম, মাননীয় গুরুদাসবাবুকে হাত করিতে না পারিলে আমি শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। অতএব প্রথমতঃ নারিকেলডাঙ্গা হইতে কার্য্যারম্ভ করিলাম। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিলে দেখিলাম, তিনি তদানীন্তন শিক্ষাপ্রণালীর একজন দৃঢ় পৃষ্ঠপোষক। হইবারই কথা, তিনি দুই দুই বার ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে ঘোরতর তর্কযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিন সন্ধ্যা এরূপে কাটিয়া গেল। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় তিনি অসুস্থ ছিলেন। ভৃত্য বার বার আসিয়া 'পথ্য প্রস্তুত' বলিতেছিল, আমি বার বার উঠিয়া যাইতে চাহিলেও তিনি কিছুতে আমাকে ছাড়িলেন না। শেষে আমি জোর করিয়া চলিয়া আসিলে, তিনি আমার আক্রমণে এত দূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, আমার গাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া, নৈশ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া তর্ক করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর সুস্থ হইলে আমি আবার এক সন্ধ্যা এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কাটাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে তিনি আমাকে ছাড়িলেন। তৃতীয় সন্ধ্যায় তিনি ধীরে ধীরে আমার প্রস্তাব সকল অনুমোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিলাম যে, পরিষদের একটি শিক্ষাসমিতি গঠিত করিয়া, এবং উক্ত সমিতির দ্বারা এই সকল প্রস্তাব আলোচিত ও অনুমোদিত করিয়া, ডিরেক্টারের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছে এ সকল প্রস্তাব পরিষদের পক্ষে উপস্থিত করিব, এবং যাবৎ উহারা গৃহীত না হয়, তাবৎ এ বিষয়ের একটা তুমুল আন্দোলন তুলিব। তিনি ইহারও অনুমোদন করিলেন। আমি করযোড়ে এই সমিতির সভাপতিত্ব গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বহু অনুনয় করিলাম। তিনি বলিলেন, তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' এবং ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার, তখন তাঁহার সভাপতি হওয়া উচিত হইবে না। অগত্যা

তিনি উক্ত সমিতির সভ্য হইয়া আমার পৃষ্ঠপোষণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তবে তিনি হাসিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে, পরিষদের দ্বারা যে এরূপ একটা শিক্ষা-সমিতি আমি গঠিত করিয়া তুলিতে পারিব, তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আমি বুঝিলাম যে, তিনি এ বিষয়ে পরিষদের 'যুগল রূপে'র সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন, এবং তাহারা তাহাদের সর্ব্বনাশ আশঙ্কা করিয়া, কাণ আল্‌গা করিয়া, আমার কার্য্যের অপেক্ষা করিতেছে। তবে আমি বুঝিলাম যে, যদি গুরুদাসবাবু আমার পক্ষ অবলম্বন করেন, 'ডন্‌কুইক্সটে'র ও তাহার 'সেঙ্কো'র প্রতিকূলতা সেই ঐতিহাসিক wind-millএর (বায়ুচালিত কলের) সঙ্গে যুদ্ধে পরিণত হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই হইল। ঠিক সে সময়ে সভাপতির আসন শূন্য হওয়াতে সমবেত পরিষদ্ গুরুদাসবাবুকে সভ্য মনোনীত করেন। কিন্তু সভৃত্য 'ডন্‌কুইক্সট্' আমার কার্য্যের সাড়া পাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রভু স্বয়ং সভাপতি হইয়া আমার কার্য্য নিষ্ফল করিবেন। তিনি তাঁহার সভাপতিত্বের এই অভিলাষ গুরুদাসবাবুকে জানাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব সভাস্থলে প্রথমতঃ আমাকে, তাহার পর রবিবাবুকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইলে আমরা উভয়ে অস্বীকার করিয়া, দুই জনেই পরামর্শ করিয়া গুরুদাসবাবুকে মনোনীত করি। তিনি তাহাতে অসম্মত হন। আমি উঠিয়া বলি —"দেবতার পূজা করিব, তাহাতে আবার দেবতার সম্মতি কি? গুরুদাসবাবু অসম্মত হইলেও আমরা তাঁহার চরণে আমাদের এই সামান্য পূজা প্রদান করিব।" তিনি কৃত্রিম ক্রোধ করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এ বড় সুন্দর কথা। বঙ্গসাহিত্যে যাঁহাদের কীর্ত্তি অমর, সেই নবীনবাবু ও রবিবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন না। আমার বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই, অথচ কি হাস্যকর কথা যে, আমি তাঁহাদের সমক্ষে সেই আসন গ্রহণ করিব।" আমরা কোনও মতে সম্মত না হইলে, তিনি উঠিয়া উক্ত প্রভুকে প্রস্তাব করেন, এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য উঠিয়া উহা তৎক্ষণাৎ সমর্থন করেন। সকলে বিস্মিত হইলেন। সকলে গুরুদাসবাবুকে সাধ্য-সাধনা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। আমার বন্ধু হীরেন্দ্র আমার কাণে কাণে বলিলেন—"বোধ হয়, এই মহা-পুরুষ গুরুদাসবাবুকে আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, আর আপত্তি করা নিষ্ফল।" আমরা সভাপতি হইতে ঘোরতর আপত্তি করিতেছি, কিন্তু তিনি চন্দ্রমুখ হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখের উপর তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলা অভদ্রতার বিষয়। তিনি টেক্সটবুক কমিটিতে এ খেলা খেলিয়া পাকিয়া বসিয়াছেন। শিষ্টাচারের অনুরোধেও একবার অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, গুরুদাসবাবুকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করিতেছেন না। কাজেই যে আসনে আমরা গুরুদাসবাবুকে বসাইব, সে আসনে বসিলেন 'হিং টিং ছট্'! আমি বুঝিলাম, এ দুর্গ আমারই জন্য প্রস্তুত হইল। যাহা হউক, আমি তাহাতে পৃষ্ঠভঙ্গ না দিয়া, শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার আলোচনা করিবার জন্য একটি শিক্ষা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। আমি পরিষৎকে বুঝাইলাম যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী শিশু-মুণ্ডমালিনী মহাকালীবিশেষ। তাঁহার সমস্ত দেহ শিশু-রুধিরে চর্চ্চিত। এই রাক্ষসী শিশুদের রক্ত-মাংস ত্রিধারায় শোষণ করিতেছে ;—বহু বিষয়, বহু পুস্তক, বহু পরীক্ষা। এই তিন 'বহু'তে (too many) দেশের শিশুগণ নিষ্পেষিত হইতেছে। এই তিন অস্ত্রে শিক্ষাপ্রণালী বাঙ্গালীর মনস্বী মধ্যশ্রেণী (intelectual middle class) ধ্বংস করিতেছে। আট দশ বৎসরের শিশুরা ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, কত অপূর্ব্ব তত্ত্বই পাঠ করিতেছে, কেবল পড়িতেছে না—যাহা তাহার পড়িবার আবশ্যক। এই দরিদ্র দেশে পূর্ব্বে শিশুরা ধূলাতে ও তাহার পর কলাপাতে মাত্র লেখাপড়া শিখিত, এবং অক্ষর লিখিতে পারিলেই আপনার পিতামাতার ও পূর্ব্বপুরুষের এবং দেবদেবীর নাম লিখিত ও

পড়িত। এরূপে মাতৃস্তন্যের সঙ্গে তাহাদের সুকুমার হৃদয়ে পিতৃপুরুষদের ও দেবদেবীর প্রতি ভক্তি অঙ্কুরিত হইত এবং আপনার কুলজি শিক্ষা করিত। এখন মাতৃস্তন্য ত্যাগ করিয়াই শিক্ষার নানাবিধ বিদেশীয় উপকরণ কিনিতে হইবে, এবং শিখিবে 'পশ্বাবলি' ইত্যাদি চতুষ্পদ স্কুলপাঠ্য লেখকদের মাথা আর মুণ্ড, এবং ইংলণ্ডের কুইন এনের সপ্ত পুরুষের নাম! বিষয় 'বহু' না হইলে পুস্তক 'বহু' হয় না এবং পরীক্ষা 'বহু' না হইলে পুস্তক বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তন হয় না ও কাটে না। কাজেই শিক্ষা-বিভাগের 'বহু' শিশু-রক্তলোলুপ নরপিশাচের ও তাঁহাদের 'বহু' শালাভগিনীপতির 'বহু' পরিবার প্রতিপালিত হয় না। পুস্তকের সংখ্যা এত 'বহু' যে, তাহা বহু শিশু নিজে বহন করিয়া লইতে পারে না। আমি বসিবামাত্র হীরেন্দ্র ভায়ার 'দাম্ভিকতার প্রতিমূর্ত্তি' 'সেঙ্কো' দণ্ডায়মান হইয়া. আমার প্রস্তাবের ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের কি সম্পর্ক এবং পরিষৎ কেন তাহার অমূল্য সময় এ অনধিকার-চর্চ্চায় কাটাইবে, তাহা তিনি তাঁহার গজেন্দ্র-বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিতেছেন না। আমি ইহার কেবল এই মাত্র উত্তর দিলাম যে, দেশের শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে দেশের সাহিত্যের, কাজে কাজে 'সাহিত্য-পরিষদে'র সম্বন্ধ এত গুরুতর ও প্রমাণিত যে, তাহা বুঝাইতে যাওয়া, আর পরিষদের শিক্ষিত সভ্যাদিগের অবমাননা করা আমি একই কথা মনে করি। গজেন্দ্রের প্রতিবাদ কেহই 'দ্বিতীয়েলেন' না। তাঁহার বাহক সভাপতি মহাশয় দেখিলেন বেগতিক, পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই উচিত। অতএব তিনি বলিলেন যে, তিনিও উক্ত সম্পর্ক বড় ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না, তবে পরিষদের মত হইলে আমার প্রস্তাব গৃহীত হইতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তখন দুই একজন সভ্য তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। পরিষৎ একবাক্যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন, এবং শিক্ষা-সমিতির সভ্য মনোনীত করিলেন। ইহাতে পরিষদের সমস্ত অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন।

'স্কুলবুক কমিটি'র বিরাট্ পুরুষ নিজে সাহিত্য-পরিষদে পদার্পণ করিতেন না। তাঁহার নন্দী ভৃঙ্গি ও বলদটিকে শিক্ষা-সমিতিতে আমার চেষ্টা নিষ্ফল করিতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। 'হিং টিং ছট' বা 'ডন্‌কুইক্সট্' নন্দি। রবিবাবু তাহার এমনই তৈলচিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন যে, আমি তাহার খর্ব্ব বামন-লাঞ্ছিত রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া ইন্দ্রধনুর রঙ্গ ফলাইতে চেষ্টা করিব না। 'সেঙ্কো' ভৃঙ্গি. তাহার শ্রীমুখখানি ভৃঙ্গিরই মত. তবে ভৃঙ্গিরও এমন কণ্টক-কোমল শ্মশ্রুজালে বদনমণ্ডল মণ্ডিত ছিল না। তাঁহার দম্ভ ও গর্ব্বপূর্ণ মুখভঙ্গি দেখিলেই তোমার চাণক্যের 'শৃঙ্গিণাং দশহস্তেন' মনে পড়িবে। বাস্তবিকই আমি তাঁহার দশ হাতের মধ্যে পদার্পণ করিতাম না। আর তাঁহাদের বলদ 'নিধিরাম' একটি 'চিজ'। তিনি তাঁহার দুই মনিবের পশ্চাতে পশ্চাতে থাকেন এবং সুযোগ পাইলেই শিং নাড়েন। তাঁহার জম্বুক প্রকৃতি। শিক্ষা-সমিতিতে এই ত্র্যহস্পর্শ সঞ্চারিত হইল, এবং এই ত্রিমূর্ত্তি পদে পদে আমার ঘোরতর বিপক্ষতা করিতে লাগিলেন। আমি সমিতির প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত দশ প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম—

1. That the present system of education is proving disastrous to the health, intellect and morals of the students, and therefore the principles of the old system of education, which had proved so eminently successful, should, as far as practicable, be reverted to.

2. That the primary schools should teach only three "R's".

3. That the Upper Primary schools being done away with, the Middle Vernacular schools should be assimilated with the last four classes of the Entrance schools, and should teach, in addition to the

three "R's", at a higher stage some easy History and Geography of India through the medium of Vernacular with Sanskrit. English Literature and Grammar should be taught only to those who wish to receive University Education.

4. That the Entrance Course should be lightened in all its branches, and the History of England, Physical Geography, and Science should be done away with.

5. That the F. A. Examination should be abandoned, and the students should be left free to go up to B. A. after Entrance.

6. That Bengali should be taught as a separate subject of examination, being made compulsory both in the Entrance and B. A.

7. That except in the case of examination for degrees, a certificate of general proficiency, based on a system of daily marks on each subject, given by the head of the school, and countersigned by the School Commitee, should entitle a student to prosecute his studies further.

8. That the examination should be confined to boys, who seek scholarships, up to the Entrance and should be made simpler, sufficient only to test the general knowledge of the students, the questions being clear, direct and confined to the text books.

9. That the students should be passed on an aggregate number of marks obtained in all the subjects as in the days of Junior and Senior Scholarship examinations, and those that have secured 25 per cent marks in any subject should be exempted from further examination in it.

10. That the text books of all the classes of all the schools should be fixed by the Text Book Commitee and fixed for at least three years and three examinations.

11. That up to the Entrance the education should be left to the people, the present expenditure being given them as aid, so that they may introduce seperate moral and religious education for the students of each religion.

13. That a petition embodying proposals 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 and 11, and another embodying proposals 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, be submitted to the Government and the Calcutta University respectively.

প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাব সম্বন্ধেই এই ত্রিমূর্ত্তি ঘোরতর আপত্তি ও দিনের পর দিনব্যাপী তর্ক উপস্থিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মূল আপত্তি এই যে, শিক্ষাপ্রণালী আমার প্রস্তাবমতে পরিবর্ত্তিত হইলে তাঁহাদের নিজের ও তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজীদের বহি সকল মারা যাইবে। আত্মমুখ খুলিয়া এ কথা বলিতেও পারেন না। কাজে কাজে ডালপালা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। আমার এমন বদ্ অভ্যাস হইয়াছিল যে, এই ত্রিমূর্ত্তির

রূপ ও তর্কের অসরলতা ও অর্থশূন্যতাজনিত বিকৃত মুখভঙ্গি দেখিলেই আমার হাসি আসিত, এবং আমি একটুক হাসিলেই তাঁহারা তিন জনেই ক্ষেপিয়া উঠিয়া, টেবিলে সজোর করাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেন—"এ উপহাসের স্থান নহে। হাসিবার স্থান নহে।" আমি ধীরে ধীরে বলিতাম—"তবে কি কাঁদিবার স্থান!" তখন তাঁহারা ক্ষেপিয়া উল্লম্ফন আরম্ভ করিতেন। এক দিনের ঘটনা বলিব। আমি এক ব্যারিষ্টার বন্ধু মিষ্টার ——কে পরিষদের সভ্য মনোনীত করিয়াছি। 'বলদ নিধি' তাঁহাকে বাবু——বলিয়া, তাঁহার পুরা নাম লিখিয়া তাঁহার ঠিকানা চাহিয়াছেন। ইংরাজি বলিলে ইহাঁদের এক পয়সা জরিমানার ঐতিহাসিক প্রস্তাব স্মরণ করিয়া একটুক ঠাট্টা করিয়া লিখিলাম—"বন্ধুর নাম বাবু——ও তাঁহার ঠিকানা চক্রবর্ত্ম (Circular Road) বলিয়া লিখিলে তিনি পত্র পাইবেন কি না সন্দেহ। ইংরাজি ঠিকানা লিখিলেও ভয় হয়, পাছে আমাকে এক পয়সা দণ্ড দিতে হয়। অতএব কলিকাতার রাস্তাগুলির নামের একটা বাঙ্গালা সংস্করণ আবশ্যক। যথা, 'কলেজ ষ্ট্রীট' বিদ্যালয় বর্ত্ম, 'কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট' কর্ণবালিশ বর্ত্ম হইতে পারে। 'ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট' ও অন্যান্য ষ্ট্রীটগুলির এরূপে কি বাঙ্গালা নাম হইবে, তাহা আপনারা সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিতমণ্ডলী স্থির করিয়া, পোষ্টআফিসে এই নব ব্যবস্থা প্রেরণ করিলে, আমরা উপরোক্ত দণ্ড হইতে উদ্ধার পাইতে পারি।" ইহাদের সঙ্গে আমি প্রায় ঠাট্টা ভিন্ন কথা কহিতাম না, পত্র লিখিতাম না। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিধিরাম এ ঠাট্টাও, আমার প্রতি নিৰ্জ্জনে দুই চারিটা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বাক্যাস্ত্র বর্ষণ করিয়া, নীরবে সহিবে। ইহার পরের অধিবেশনে আমায় সভাপতির আসন লইতে হইল। পূর্ব্বসভার কার্য্যবিবরণী সম্পাদক পাঠ করিলে দেখিলাম যে, আমার ঐ মহামূল্য পত্র আমার অনুপস্থিতিতে সমিতির কাছে উপস্থিত করা হইয়াছিল, এবং তাহার উপর এই মহামূল্য প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে যে, এরূপ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ পত্রকে সাহিত্যপরিষদের পুস্তক-শূন্য লাইব্রেরিতে স্থান দেওয়া হইবে না। আমি উঠিয়া বলিলাম, পত্রখানির পরিষৎ-লাইব্রেরিতে স্থান প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভের জন্য আমি লিখিয়াছিলাম না। ঠাট্টা বুঝিতে যাঁহাদের অস্ত্র-চিকিৎসা আবশ্যক করে না, তাঁহারা পত্রখানি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা বন্ধুভাবে ঠাট্টা করিয়াই লেখা হইয়াছিল। তখন যে যে সভ্য পূর্ব্ব অধিবেশনে আমার মত অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা উহা দেখিতে চাহিলেন। কিন্তু নিধিরাম কিছুতেই বহুক্ষণ তাহা উপস্থিত করিলেন না। কারণ, পত্র শুনিলেই সকলেই হাসিয়া উঠিবে। সভ্যগণ জিদ করাতে তিনি বহুক্ষণ পরে বহু অন্বেষণে তাহা পাইয়াছেন বলিয়া দাখিল করিলেন। একজন তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন, আর সমস্ত সভ্য হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। ক্রোধে ত্রিমূর্ত্তি অধীর হইলেন, এবং গজেন্দ্র গৰ্জ্জন করিয়া বলিলেন—"একে এই অপমান, তাহার উপর এই হাসি! এই গুরুতর বিষয় হাসিয়া উড়াইবার কথা নহে। ইহার বিচার করিতে হইবে।" বৃদ্ধ, বহুনাটক-রচয়িতা জনৈক সভ্য মহাশয় বলিলেন—"বিচার ছাই! এ কি ছেলেমি! ঐ প্রস্তাবটা কাটিয়া দেও! লোকে দেখিলে যে পাগল মনে করিবে।" ত্রিমূর্ত্তির ঘোরতর প্রতিবাদ না শুনিয়া, সমিতি এ প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তখন গজেন্দ্র উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া এবং বহু বার শুণ্ড আন্দোলন করিয়া মহাগৰ্জ্জন করিতে লাগিলেন—"নিধিরাম! নিয়ে আয় কাগজ কলম! এখনই resign করিব।" হস্তসঞ্চালনটা গুরুতর দেখিয়া, আমি সরিয়া পার্শ্বের কক্ষে গিয়া চা পান করিতে লাগিলাম, এবং গল্প করিতে লাগিলাম। এই বিভ্রাটে ৩টা হইতে রাত্রি ৯টা কাটিয়া গেল। গজেন্দ্রের গৰ্জ্জনে রাজা বিনয়কৃষ্ণের গৃহের ছাদ ফাটিতেছিল। তাঁহার সেই এক কথা—"নিধি! নিয়ে আয় কাগজ কলম। এখনই সভ্যগিরি resign (এস্তেফা) করিব। এত অপমান!" সমবেত সভ্যগণ এই ছয় ঘণ্টা কাল চেষ্টা করিয়া তাহাকে কোনও মতে বুঝাইতে

পারিলেন না যে, পত্রখানি কেবল পরিহাস মাত্র, তাহাতে অপমানের কথা কিছুই নাই। সে কিছুতেই সেই প্রস্তাব কাটিতে দিবে না। আবার অন্য পক্ষে কেহ কেহ জিদ ধরিয়াছেন যে, পরিষদের সুনামের জন্য উহা কাটিতেই হইবে। রাত্রি ৯টার সময়ে রাজা বিনয়কৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, আপনি একবার চেষ্টা না করিলে এই বিভ্রাটে আজ রাত্রি প্রভাত হইবে। গজেন্দ্রকে কেহই থামাইতে পারিতেছে না। আমি ও অন্যান্য সভ্য কয়েক জন এখানে এতক্ষণ বসিয়া, সেই মহাবিতণ্ডা ও শনৈঃ শনৈঃ গর্জ্জন শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে আমাদের পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব আমরা উঠিয়া আবার সভা-কক্ষে গেলাম। আমি বলিলাম—"এ প্রস্তাবটি রাখিতে যাঁহারা জিদ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য—আমার কিঞ্চিৎ অবমাননা। কিন্তু সভ্যগণের এই ছয় ঘণ্টাব্যাপী ঘোরতর বিতণ্ডার পর আমি উহা রাখা মোটেই অপমান বলিয়া মনে করি না। বরং সম্মান মনে করিব। মনে করিব—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং মম শিরসি মা লিখ।' অতএব আমি করযোড়ে সভ্যদিগকে অনুনয় করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহারা এই মহামূল্য প্রস্তাবটি গজেন্দ্রবাবুর কীর্ত্তির ও সম্মানের ধ্বজাস্বরূপ বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ পুরুষদের উপকারার্থ রাখিয়া, আমার পত্রখানির অমরত্ব বিধান করুন!" এই কথা শুনিয়া, যে সভ্যেরা শিষ্টাচারের অনুরোধে উহা কাটাইতে এতক্ষণ জিদ করিতেছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, আমার এরূপ অনুরোধের পর তাঁহাদের আর কিছু বলিবার নাই। গজেন্দ্র সটান দণ্ডায়মান হইয়া, দুই বাহু ভীষণ-রূপে আন্দোলিত করিয়া এবং টেবিলে বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে সমস্ত গৃহ কম্পিত করিয়া বলিল, —"এ কি হইল! এ ত আরও দ্বিগুণ অপমান করা হইল!" আমি সভা ভঙ্গ করিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইলাম, এবং সভ্যগণও চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, সে দিন সভার কার্য্য এই পর্য্যন্তই হইল। রাস্তা হইতে আমরা গজেন্দ্রের চীৎকার শুনিতেছিলাম— "নিধিরাম! এ কি হইল! ইহারা চলিয়া গেল যে, নিয়ে আয় কাগজ কলম! এখনই resign (এস্তেফা) করিব।"

কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের পর প্রস্তাব গৃহীত হইতেছে দেখিয়া, ইহাঁরা আর এক ষড়্যন্ত্র করিলেন। আমি প্রায় বিশ বৎসর সবডিভিসনাল অফিসাররূপে 'উচ্চ প্রাইমারী', 'নিম্ন প্রাইমারী' প্রভৃতি মহামারী পাঠশালা সকল ঘাঁটিয়াছি, অথচ ইহাঁরা কেহ তাহাদের কোনও খবর রাখেন না। ইহাঁদের কলিকাতার মহারাষ্ট্র-খাতের মধ্যে বাস। তাঁহাদের ধারণা, ধান গাছে জন্মায়। অথচ ইহাঁরাই দেশের দরিদ্র শিশুদের জন্য অপূর্ব্ব পাঠ্য পুস্তক সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের রক্ত ও অর্থ শোষণ করেন। কাজে কাজে তাঁহারা যাহা বলিতেন, তাহা এত হাস্যকর ও অমূলক হইত যে, আমি উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। তাঁহারা প্রথমতঃ 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতি ভায়াকে হাত করিয়া, আমাকে এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। মতি ভায়া এক অপরাহ্ণের সভায় এক রাশি পাঠ্য পুস্তক লইয়া উপস্থিত। তিনি সভাভঙ্গের পর আমাকে পাকড়াও করিয়া ভয়ানক ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং যে সকল বহি তিনি আনিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে 'টেক্সটবুক কমিটি'র কাহারও কিছু সম্পর্ক আছে কি না, দেখাইতে আমাকে challenge করিলেন। আমি বলিলাম, আমি শিক্ষাপ্রণালী লইয়া এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি। উহা টেক্সটবুক কমিটির কোনও ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে নহে। অতএব তাঁহার challenge গ্রহণ করিবার আমার কোনও কারণ নাই। আমাদের বাক্‌বিতণ্ডা শুনিয়া কয়েক জন সভ্যও সেখানে আসিয়াছিলেন। এই challenge তাঁহারা গ্রহণ করিলেন, এবং দেখাইলেন যে, ঐ সকল পুস্তকের সঙ্গেও পরোক্ষে ঐ ত্রিমূর্ত্তির, কি তাঁহাদের শালা ভগিনীপতি বা উচ্ছিষ্টভোজীদের সম্পর্ক আছে। মতিবাবু কিছু নরম হইলেন। তথাপি উহা far-fetched (দূর সম্পর্ক) বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

আমি দেখিলাম, তাঁহার পশ্চাতে সংক্রান্তির মত একটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান। মতিবাবু 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তে ও শিক্ষাসমিতিতে এত দিন আমার পৃষ্ঠপোষণ করিতেছিলেন। 'অমৃতবাজারে' আমার প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছিল। আজ তাঁহার এই ভাবান্তর দেখিয়া বুঝিলাম যে, সংক্রান্তিটিই তাহার কারণ। আমি তাঁহাকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, সংক্রান্তিটি টেক্সটবুক কমিটির ও শিক্ষা-বিভাগের বিরাট্ পুরুষের একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী, এবং প্রভুর দ্বারা প্রেরিত। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, সংক্রান্তির নিজেরও পাঠ্য বা অপাঠ্য পুস্তক আছে। তিনি মতিবাবুর আত্মীয়। মতিবাবু আগ্রহের সহিত বলিলেন—"নবীন! তুমি যদি একবার ইহাঁর মুখে সকল কথা শুন, তবে তুমি বুঝিবে যে, তুমি ভ্রমবশতঃ অনর্থক এই agitation (আন্দোলন) করিতেছ।" আমি শুনিয়াছিলাম, এই ব্যক্তিই শিক্ষা-বিভাগের ও শিশু-রক্তজীবীদের প্রেতাত্মাস্বরূপ ছায়ার মত কলিকাতা ঘুরিয়া, মতিবাবু প্রভৃতিকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি বলিলাম—"ক্ষমা কর দাদা! ইনি চুল্লিতে যাত্রা করুন! ইনি যাঁহার প্রেতাত্মা, সেই বিরাট্দেব স্বয়ং বলিলেও, আমি বিশ বৎসর যাবৎ চক্ষে দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করিয়াছি, তাহা ভ্রম বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না। তাহার পরের অধিবেশনে দেখি, সেই প্রেতাত্মা জড়ত্ব লাভ করিয়া, সভ্যগণের সংগে নন্দি ভৃংগি ও বলদ নিধির পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তিনি সভ্য নন বলিয়া, তাঁহার উপস্থিতি সম্বন্ধে আমি আপত্তি করিলে, নন্দি 'হিং টিং ছট্' তাঁহার ক্ষুদ্র মুষ্টি টেবিলে প্রহার করিয়া বলিলেন, তাঁহাদের এ সকল স্কুল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকাতে, তাঁহারা আমার প্রতিপক্ষতা করিতে পারিতেছেন না। অতএব শিক্ষা-বিভাগের একজন লোক কমিটিতে উপস্থিত থাকিবার জন্য তাঁহারাই ঐ সংক্রান্তি মহাশয়কে আনিয়াছেন। আমি বলিলাম,—তিনি যদি গোয়েন্দা না হন, ভদ্রলোক হন, বসিতে পারেন, কিন্তু সমিতির তর্কে যোগদান করিবার তাঁহার অধিকার নাই। কাজে কাজে সে দিন হইতে তিনি প্রত্যেক অধিবেশনে একবার ইহাঁকে, একবার উহাঁকে বড় হাস্যজনক ভাবে কর্ণমন্ত্র দিতে লাগিলেন। কিন্তু জানি না, কেন লোকটির প্রতি আমার এমন একটা ঘৃণা হইয়াছিল যে, আমি কখনও তাঁহার সংগে কোনও তর্কে যোগ দিতাম না। যাহা হউক, তাহার গুপ্তচরত্বে আমার কোন কোন প্রস্তাব কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইল মাত্র। এরূপে প্রায় ছয় মাস প্রত্যেক শনিবার অপরাহ্ণে মল্লযুদ্ধের পর শিক্ষা-সমিতির দ্বারা আমার অধিকাংশ প্রস্তাব গৃহীত হইল। পূজনীয় গুরুদাসবাবু ঐ প্রস্তাবানুসারে ডিরেক্টরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দুই আবেদনপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া, আমাকে দেখিতে দিলেন। উহা যথাসময়ে শিক্ষা-সমিতি অনুমোদন করিলেন। পরিষদের যে অধিবেশনে উহা উপস্থিত হইল, তাহাতে আমি ও শিক্ষা-সমিতির সভ্য আরও কেহ কেহ কোনও কার্য্যগতিকে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সকলে মনে করিয়াছিলেন যে, পরিষদে উহা কেবল বিনা আপত্তিতে গৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য, সে দিন ত্রিমূর্ত্তি ও তাঁহাদের সংক্রান্তি ষড়্যন্ত্র করিয়া যে ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন, তাহা তাঁহারা মনেও স্থান দেন নাই। ইহাঁরা এই সুযোগ বুঝিয়া আবার মহা আপত্তি উপস্থিত করেন যে, দেশের শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্য সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা পরিষদের পক্ষে অনধিকার চর্চা হইতেছে। এই তর্কে আবার পরাজিত হইয়া, অবশেষে ধরিয়া বসেন যে, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যে ইতিহাস ও স্বাস্থ্যরক্ষা থাকিবে, তাহা না হইলে,—"বাচসপোত্ দাদা! একেবারে আমাদের বিরাট্ প্রভু ও আমরা ধনে প্রাণে মারা গেলাম।" চক্ষুলজ্জাতে কেহ কেহ এই স্বার্থে সায় দিয়া, তাঁহাদের পক্ষে এক কি দুই ভোট মাত্র বেশী করেন। কিন্তু শুধু ইহা হইলে আমার প্রতি প্রতিহিংসা হইল কই? মাননীয় গুরুদাসবাবুর পাণ্ডুলিপিতে শিক্ষা-সমিতির গৃহীত প্রস্তাবমতে এই পরীক্ষায় সংগ্রহ-কবিতা পাঠ্য না হইয়া, কাব্য কবিতা

poetical pieces পাঠ্য হইবে বলিয়া লিখিত ছিল। ইহাঁরা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ঐরূপে 'poetical pieces' কাটাইয়া, দ্বিতীয় ধারার (a) প্রকরণে 'selecteions from standard poets' লেখাইলেন। তাহা হইলে এক দিকে 'পলাশির যুদ্ধে'র মত অপাঠ্য পুস্তক আর স্কুলপাঠ্য হইবে না, এবং তাঁহাদের স্বকৃত ও শ্যালককৃত অপূর্ব্ব সংকলন (selections) সকল পাঠ্য হইবে। বস্, বাজী জিত্ আর চাহি কি? আমি দেশের শিশুগুলিকে তাঁহাদের গ্রাস হইতে যেমন রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলাম, আমারও পাপের তেমন দন্ড হইল। উপস্থিত প্রণালীমতে 'পলাশির যুদ্ধ' বরাবর স্কুলপাঠ্য হইতেছে। এখন হইতে আমার সে গুড়ে বালি পড়িল। নিম্নপ্রকাশিত আবেদনপত্র দুখানি ডিরেক্টর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে প্রেরিত হইল।

From President, Bangiya Sahitya Parisad.
To The Director of Public Instruction, Bengal.

Sir, *The 16th December*, 1896.

1. On behalf of the Bangiya Sahitya Parisad I beg leave to submit this memorial for your consideration.

2. I should at the outset state for your information that the Bangiya Sahitya Parisad is a literary association, established on the 8th Sraban 1300, B. S. (23rd July, 1893), chiefly for the improvement of the Bengali language and literature and it includes amongst its members many of the best writers in Bengali and other leading members of the native community of Bengal. A list of the members of the Parisad is herewith submitted.

3. At a meeting of the Parisad held on the 29th Ashar, 1303, B. S. (12th July, 1896), on the motion of Babu Nabin Chandra Sen, one of its Vice-Presidents, who in his capacity as Deputy Magistrate and Deputy Collector has had considerable experience of the working of Vernacular Schools in the Moffussil, a Commitee* consisting of the

---

(1) Babu Chandra Nath Bose, M. A. B. L., (President.)
(2) " Nobin Chandra Sen, B. A. (Vice-President.)
(3) " Rabindra Nath Tagore, " "
(4) Hon'ble Justice Guru Das Banerji, M. A. D. L.
(5) Sir Romes Chandra Mitra, Kt.
(6) Raja Benoy Krishna Deb Bahadur.
(7) Hon'ble A. M. Bose, M. A. (Bar-at-Law).
(8) Ray Jatindra Nath Chaudhuri, M. A. B. L.
(9) N. N. Ghose Esqr., (Bar-at-Law) Principal, Metropolitan Institution.
(10) Babu Mati Lal Ghosh, (Editor, Amrita Bazar Patrika)
(11) " Hirendra Nath Datta, M. A. B. L.
(12) " Umes Chandra Datta, (Principal, City College.)

members named in the margin was appointed to draw up two memorials, one to be addressed to you and the other to the Syndicate of the Calcutta University, embodying suggestions for altering the rules and regulations relating to our Public Examinations in such manner as might be deemed necessary; and the memorial now submitted to you is one of these two, adopted by the Parisad at a meeting held on the 13th December 1896.

4. The Parisad respectfully begs to submit that, considering the ages at which students generally appear at the Lower Primary, Upper Primary, and Middle Scholarship Examinations, the Courses of Study fixed for those Examinations are a little too long for the candidates thoroughly to read, and some of the subjects prescribed are a little too difficult for them properly to understand. In saying this the Parisad does not overlook the fact that a certain amount of reading is necessary to enable the student to acquire even a moderate knowledge of the written language of his country, and that the subjects to which it takes exception deal with matters of which it is certainly desirable that the student should know something as early as possible. But while attaching full value to the importance of making the student go through a fair quantity of reading in certain subjects, and of storing his mind with useful knowledge on a variety of subjects, the Parisad ventures to think that still greater value attaches from an educational point of view to the importance of making the student read throughly what he has got to read and of having his intellectual powers trained properly by such healthful exercise as is afforded by reading only those subjects which he is able fully to grasp. It is hardly necessary for the Parisad to point out that want of throughness in reading, specially in the earlier stages of a student's progress, can never be compensated by its extent or variety.

5. These considerations have induced the Parisad to submit the following suggestions for your special consideration :—

1st. That in the Lower Primary Examination—

(a) Mensuration and Sanitation should be omitted from the

---

(13) " Rajkrishna Ray Chaudhuri, (Late, Dy. Ins. Schools.)
(14) " Isan Chandra Ghosh, M. A., (Dy. Ins. Schools.)
(15) " Rajani Kanta Gupta.
(16) " Nagendra Nath Basu (Editor, Biswa Kosh.)
(17) " Rajendra Chandra Sastri, M. A. (Secretary.)
(18) Pandit Mohendra Nath Vidyanidhi, (Asst. Secretary.)

list of subjects. The former so far as it can be within the grasp of a candidate for this examination, that is, so far as it relates to rectangular areas, will be learned by him as part of his course in Arithmetic and Subhankari; and the latter, so far as it can be intelligible to him, ought to be taught in the shape of lessons forming part of his course in literature, the marks allotted to that subject being raised in proportion.

(*b*) That the existing minimum pass mark be insisted upon only in Literature and Arithmetic (including Subhankari.)

2nd. That in the Upper Primary Examination—

(*a*) The Course in Bengali Prose and Poetry should be so fixed as to give effect to the suggestion contained under the next head (b), and to enable students to read their course throughly.

(*b*) Euclid, Mensuration, Physics and Sanitation should be omitted from the list of subjects, the first two being unsuitable and difficult and the last two in their most elementary parts being more fitly included in the Course in Prose; and agriculture should be made a compulsory subject.

(c) The Elements of Bengali Grammar (omitting Taddhit and Kridanta) and the general Geography of the four quarters, including only the names of Countries and their Chief Towns, with a somewhat detailed information about Bengal should be prescribed to be read, in each subject from the same text book (so far as possible) as that fixed for the Middle Scholarship Examination, with a view to prevent the waste of time, energy and to some extent of money which the reading of these subjects from two different txet books for the two examinations must entail on the student.

3rd. That in the Middle Scholarship Examination—

(*a*) The Course in Bengali Prose and Poetry should be reduced with a view to ensure thoroughness of reading; the lessons in Prose should be arranged methodically in two groups, contained either in one volume or in two separate volumes, the one serving to increase the student's knowledge of the material world with reference to important and useful subjects and the other serving to teach him by story and precept his principle duties in the moral world; and the lessons in Poetry should consist of poetical pieces calculated to develop the higher feelings of the student.

(b) The Course in History should consist of a brief elementary History of India.

(c) The Course in Physics should be materially redused in extent and made to consist of a few elementary propositions which

the student can clearly comprehend at this early stage of his progress.

(*d*) Sanitation and Physical Geography should be prescribed in the alternative with English Prose and Poetry, the reason for this suggestion being that students who go in for the Middle English Examination, as a rule, intend to prosecute their studies further with a view to increase their general knowledge and are not likely to profit much by the little knowledge of those subjects which they may acquire at this early stage.

4th. That the rule which requires that a candidate shall not be allowed to appear at a higher examination unless he has passed the next lower, should be rescinded. The reason for making this suggestion is that the student should not be compelled to go through his early education in any particular way, but should be left free to choose at what stage of his progress he should commence to read with a view to prepare for a public examination.

5th. That with a view to facilitate the work of teaching and the acquisition of knowledge the standards for the different classes in Middle English Schools should be assimilated with those of the different classes in Entrance Schools below the third, English being taught in the latter as in the case of the Middle English Schools as a second language.

6th. That text books should be changed less frequently than at present, so as to avoid the possibility of causing any hardship to poor boys and to unsuccessful candidates for examination competing a second time.

7th. That examinations should aim at testing a general but intelligent knowledge of the subjects and questions that are very minute and very difficult should as a rule be avoided.

6. In conclusion, the Parisad begs to state that it has anxiously considered the question as to what changes are desirable in the existing rules and regulations relating to our public examinations, and that it is its full and clear realisation of the grave importance of the question that forms its justification for approaching you with the foregoing suggestions. And it humbly entertains the hope that those suggestions will receive from you all the consideration that they appear to it to deserve.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
President Bangiya Sahitya Parisad

Bangiya Sahitya Parisad Office
106/1, Grey Street,
The 16th December, 1896.

From President, Bangiya Sahitya Parisad.
To J. H. Gilliland, Esqr, M. A.
Registrar, Calcutta University.
Calcutta, The May, 1897..

Sir,

1. As President of the Bangiya Sahitya Parisad, a literary association, which has had the honour of addressing the University on the question of encouraging the vernacular languages and literatures of India, I beg to submit the following propositions for the consideration of the Syndicate, and to request the favour of your laying them before the Syndicate at its next meeting.

2. I should, at the outset, state that though the propositions submitted by me may at first sight appear to be calculated to lower the standards of our examinations, they will in reality raise instead of lowering the standard of education which the examinations are intended to test. If the object of education is, not merely to store the mind with knowledge but to call forth and develop its powers so as to fit it for the investigation and comprehension of truth, increase in the courses of study, which does not leave time for thorough and thoughtful reading, lowers instead of raising the standard of education; while a judicious reduction in the quantity of matter to be read, may improve the quality of reading by giving the student more time to think over what he reads. There is a widespread complaint that the course for the F. A. Examination generally and that for the Entrance and the M. A. Examination in certain particular subjects, are too long and difficult to be read and understood thoroughly by any but the exceptionally intelligent student. It is with a view to remove the ground of this complaint, and to give our students more time to think over what they read, that this letter is submitted to the Syndicate.

3. My propositions are shortly these :—

1. That for the *Entrance Examination*—

(a) The fourth Book of Euclid be omitted from the Course, as not being absolutely necessary for the general student;

(b) Physical Geography be omitted from the Course as too difficult;

(c) in lieu of Clarke's Class Book of Geography and the Manual of Geography by the Christian Literature Society, which are a little too long, some more elementary text book on Geography be prescribed;

(d) the second paper in the Second Languages be, with a view to encourage the study of vernacular literature, made to contain in

addition to passages for translation, questions on prescribed text-books in an all allied vernacular language; and

(e) the method of prescribing text-books on Grammar be modified so as to encourage the study of Grammar, so far as it is a help towards learning languages.

II. That for the *First Examination in Arts*—

(a) With a view to lighten a little the burden that weighs on the students, and to give fuller and freer scope to the option that is now allowed with regard to certain subjects, the subjects be grouped as follows :—

1. English,
2. A second Language.
3. Mathematics, including—
   Arithmetic.
   Algebra.
   Euclid, Books I—IV.
   Book V, Definitions.
   Book VI. propositions I—XIX.
   Trigonometry.
4. Elementary Physics.

5. and either 6. { Geometrical Conics and Chemistry. } or { History and Logic. }

(b) the Course in English be in point of quality composed of such selections from standard authors as may be suited to the capacity of Indian youths of seventeen or eighteen years of age, and in point of quantity be such as can be conveniently mustered by them within the time allowed; and it be changed less frequently than it is at present;

(c) the Syllabus in Physics be reduced so as to give the student time to grasp the fundamental notions and the general principles of the subject, and a suitable text-book be prescribed; and

(d) text-books of the same degree of fullness in the Histories of Greece and Rome, and of bulk intermediate between the two volumes of Smith and the two Historical Primers now prescribed in alternate years, be selected.

III. That for the *M. A. Examination*, the course in Sanskrit, which is long and complex, be divided into two alternative courses;

One consisting of Sanskrit Language and Literature as the principal subject with Sanskrit Philosophy as a subsidiary subject, and

the other consisting of Sanskrit Philosophy as the principal subject with Sanskrit Language as a subsidiary subject;

A somewhat similar division into alternative courses being already adopted in Mathematics and in Physics and the object of such division being to enable candidates to attain greater proficiency in their respective subjects,

The syllabus of the two courses to be as follows ;—

(1) Language course ;

(2) Philosophy course :—

and the required selections be made by competent scholars appointed by the Syndicate.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant.

আমি তখনই ডিরেক্টর ডাক্তার মার্টিনের সঙ্গে দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ করিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি উক্ত আবেদনের কথা তুলিয়া, আমার সঙ্গে উহার প্রত্যেক প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন, এবং তাহার পর তাহার কোনও কোনও প্রস্তাব বিরাট্ পুরুষের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গ্রহণ করিয়া, পরিষদ্‌কে লিখিলেন যে, অবশিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করিতেও যদি পরিষদ্ জিদ করেন, তবে পরিষদের কয়েকজন প্রতিনিধির সহিত তিনি এই বিষয়ের পরামর্শ করিতে চাহেন। ঠিক এই সময়ে আমি কলিকাতা হইতে আমার ইচ্ছামতে চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হইলাম। উক্ত চতুর্মুখের সাধ্য-সাধনায় ও ষড়্‌যন্ত্রে পরিষদ্ আর কিছুই করিলেন না। তাহার পর ভারতে কর্জ্জন-পেডলারের শুভাগমনে রাম-রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রামরূপী ভারতবাসীর সীতারূপিণী লক্ষ্মী সকল দিকে হৃতা হইলেন। ইহার পর পেডলার বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর আলোচনার জন্য নিজে এক কমিটি নিযুক্ত করিলেন, এবং টেক্সটবুক কমিটি স্বকৃত পাপে ত্রিমূর্ত্তি সহ অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইলেন। নূতন এক কমিটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার আদি অন্ত মধ্য স্বয়ং ডিরেক্টর। পরিষদের অনেক প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তদুপরি 'কিণ্ডারগার্টেন' চালাইয়াছেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তক মেকমিলান কোম্পানীর একচেটিয়া হইয়াছে, আর সশ্যালক ভগিনীপতি ত্রিমূর্ত্তি "হায়! হোসেন, হায়! হোসেন!" বলিয়া এখন বুক কুটিতেছেন। তাহাদের সঙ্গে দেখা হইলে বলিতাম—

"ঐন্দ্রিলে! ঐন্দ্রিলে! জান না কি হেমকুম্ভ
ভাঙ্গিলে দ্বিখণ্ড করি চরণ আঘাতে।"

এই পাপিষ্ঠদের ঘোরতর স্বার্থপরতায় দেশের সাহিত্যসেবীদের যে এক মুষ্টি অন্ন ছিল, তাহাও বিলাত যাত্রা করিল। শুধু তাহা নহে, স্বার্থপরতায় বিশ্ববিদ্যালয়ও দেশের যে অনিষ্ট করিতেছিলেন, তাহার প্রতিও লর্ড কর্জ্জনের চক্ষু পড়িল। সে দিকেও শিক্ষাকমিটি বসিল। তাহার পরিণামে নূতন আইনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় গভর্ণমেণ্টের আর এক ডিপার্টমেণ্টে পরিণত হইয়াছে, এবং যাহাতে ভারতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যা প্রচলিত হইয়া, ইংরাজদের সঙ্গে ভারতবাসীর প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি না করে, তাহার শতবিধ উপায় অবলম্বিত হইতেছে। পরিষদ্ চাহিয়াছিলেন Reform (সংস্কার)। লর্ড কর্জ্জন উপস্থিত করিয়াছেন Revolution (বিপ্লব)। এরূপে উচ্চশিক্ষা, যাহা ভারতবাসীর হাতে ছিল, তাহা হইতেও ভারতবাসী বঞ্চিত হইল। পূর্ব্বোবিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থপরতা-পাপেরও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। পরিশ্রমে হাড় অস্থি কালি করিয়া, এবং অর্দ্ধমৃত হইয়া, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া, যে ভারতবাসী এক মুঠো অন্ন পাইত, তাহার পথও বন্ধ হইল। দেশের ব্যবসায়ের মধ্যে আছে দুই 'চ'কার—চাষ আর চাকরি। চাকরির পথ লর্ড কর্জ্জন সকল দিকে

বন্ধ করিতেছেন। এখন চাবটিও ইংরাজের হাতে গেলে ভারতের নির্ব্বাণ লাভ হইবে। গ্রীক গিয়াছে, রোমান গিয়াছে। হা বিধাতঃ! ভারতবাসীও লুপ্ত হইবে, ইহাই কি তোমার বিধিলিপি!

তীর্থরক্ষা,—ইহা আমার একটি জীবনব্যাপী ব্রত। ইহার আমূল বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে আর একখানি বহি হইবে। অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমি ভবুয়া হইতে চট্টগ্রাম বদলি হই। তাহার পরের বৎসর শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষ্যে 'সীতাকুণ্ডে'র মেলার ভার প্রাপ্ত হই। এই বারই আমি প্রথম 'সীতাকুণ্ড' দেখিলাম। বিদেশীয়েরা ইহাকে 'চন্দ্রনাথ তীর্থ' বলেন। চট্টগ্রাম জেলাকে উত্তর দক্ষিণ দ্বিখণ্ড করিয়া, যে পর্ব্বতমালা নানা বিচিত্র শৃঙ্গে ও উপশৃঙ্গে বিরাজ করিতেছে, উহাই 'চন্দ্রনাথ' গিরিশ্রেণী। উহা উত্তরে হিমালয়-সংসৃষ্ট 'আসাম' পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশীয় শৈলশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতশ্রেণীর একটি উচ্চ শৃঙ্গ 'চন্দ্রশেখর' বলিয়া পরিচিত। এই শৃঙ্গোপরি একটি ক্ষুদ্র মন্দির। তাহাতে যে শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহার নাম 'চন্দ্রনাথ'। মন্দিরটি বহু দূর হইতে অশ্বত্থ-পাদপ-ছায়ায় উপবিষ্ট একটি কপোতের মত বোধ হয়। চন্দ্রশেখরের পদতলে 'ব্যাসকুণ্ড', ক্রোড়দেশে 'শম্ভুনাথ' বা 'স্বয়ম্ভুনাথে'র মন্দির। শম্ভুনাথও শিবলিঙ্গ। উহা পর্ব্বতের সঙ্গে একাঙ্গ। এ জন্য ইহার নাম 'স্বয়ম্ভু'। উহা স্বতন্ত্র স্থাপিত শিবলিঙ্গ নহে। এই লিঙ্গের চতুর্দ্দিকের প্রস্তর কাটিয়া, আমার পিতামহ ৺ত্রিপুরাশরণ রায় 'অষ্ট মূর্ত্তি' অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছি, তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী স্বাভাবিক শিল্পী (born artist) ছিলেন। তিনি কখনও গৃহের বাহির হন নাই, কাহারও কাছে কখনও শিক্ষা করেন নাই; অথচ এমন শিল্পবিদ্যা নাই, যাহাতে তিনি পারদর্শী ছিলেন না। সেই শিল্পশক্তি আমার পিতৃদেবে কাব্যপ্রিয়তা ও কবিতাশক্তি সঞ্চারিত করে। আর সেই কবিতাশক্তি হইতেই আমি কবি। যাঁহারা এই অষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমার পিতামহের শিল্পপ্রতিভা বুঝিতে পারিবেন। চন্দ্রশেখরের বক্ষঃস্থলে 'বিরূপাক্ষে'র মন্দির। 'বিরূপাক্ষ' স্থাপিত শিবলিঙ্গ। তাহার পর শিখরের সানুদেশে চন্দ্রনাথের মন্দির। তুমি যতই পর্ব্বতারোহণ করিবে, ততই তোমার চক্ষে চারি দিকে ইন্দ্রজাল-সৃষ্টিবৎ নৈসর্গিক শোভা ভাসিয়া উঠিবে, এবং চন্দ্রশেখরের সানুদেশস্থ মন্দির ও অশ্বত্থছায়ায় দাঁড়াইয়া তুমি যে দৃশ্য দেখিবে, তাহার তুলনা ভারতবর্ষে নাই। তোমার উত্তরে দক্ষিণে চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতমালা তরঙ্গ খেলিয়া, যত দূর দেখা যায়, চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনন্ত বৃক্ষলতাবৃত শ্যামল শোভায় নয়নে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে কত ফুল ফুটিয়াছে! কতরূপ পাখী উড়িতেছে, বসিতেছে এবং কলকণ্ঠে কাননের নির্জ্জনতায় সঙ্গীতলহরী তুলিতেছে! হরিণের কাননভেদী কণ্ঠধ্বনি, বনকুক্কুটের মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে অমৃতবর্ষণ করিতেছে। তোমার পূর্ব্বে, পশ্চিমে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অনন্ত গ্রামব্যূহ উপবনের মত, স্বর্ণপ্রসূ শস্যক্ষেত্র সুরঞ্জিত কোমল গালিচার মত, এবং গো, ছাগ, মহিষাদি ক্ষুদ্র পুষ্পের মত, এবং নদ-নদী রজত-সর্পের মত শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বে দীর্ঘায়ত শস্য-শ্যামল সমতল ক্ষেত্রের পর—মরি! মরি! কি দৃশ্য! অনন্ত পয়োধির অনন্ত লহরী-লীলা তটাঘাতী কর্দ্দম-ধবল সলিলরাশি ক্রমে কেমন নীল, নীলতর, নীলতম হইয়া আকাশের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। চন্দ্রশেখরের তিন মাইল দক্ষিণে 'বাড়বকুণ্ডে'র জলের সহিত অগ্নি ক্রীড়া করিতেছে। তাহারও তিন মাইল দক্ষিণে নিবিড় কাননমধ্যে 'কুমারীকুণ্ড'। সমস্ত কুণ্ডই পার্ব্বত্য নির্ঝর। আগুন দেখিলেই কুণ্ডসলিল

জ্বলিয়া উঠে। চন্দ্রনাথের উত্তরে 'লবণাক্ষ' কুণ্ড। এখানে লবণ, মধুর ও উত্তপ্ত সলিলবাহী বহু নির্ঝর। তাহার পার্শ্বে ক্ষুদ্র গিরিপ্রপাত 'সহস্রধারা'। কি নির্ম্মল, সুশীতল সলিল, সহস্র ধারায় শত হস্ত ঊর্দ্ধ্ব হইতে পড়িতেছে! এই লবণাক্ষের 'গুরুধ্বনি' তীর্থে ও চন্দ্রশেখর-পাদতলে জ্যোতির্ম্ময় তীর্থে, প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া, অগ্নিশিখা কি কৌতুকক্রীড়া করিতেছে! এমন সুন্দর ও বিস্ময়কর তীর্থ ভারতে নাই। জগতে আছে কি না, জানি না। প্রবাদ এরূপ যে, 'রামায়ত' সম্প্রদায়ের 'গিরি' সন্ন্যাসীরা আগে এই তীর্থের মোহন্ত ছিলেন। 'রামসীতা' নামক এক কুণ্ডের লুপ্ত চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু 'বন' সম্প্রদায় বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া ইহাকে শৈব তীর্থ করিয়াছেন। 'বারাহীতন্ত্র' চন্দ্রশেখর তীর্থের ভূগোল। ইহার মতে এখানের মূল বিগ্রহ 'চন্দ্রশেখর' পর্ব্বত,—'চন্দ্রশেখরমারুহ্য পুনর্জন্মং ন বিদ্যতে।' চন্দ্রশেখর,—ভৈরব। শক্তি—দক্ষিণা কালী। ত্রিপুরাধিপতি এই কালীকে তাঁহার রাজধানী উদয়পুরে লইয়া যান। তিনি এখনও উদয়পুরে আছেন। প্রবাদ, উক্ত ত্রিপুরাপতি শম্ভুনাথকেও লইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু এই বিগ্রহ পর্ব্বতের অঙ্গমাত্র বলিয়া স্থানান্তর করিতে পারেন নাই।

'বন' সম্প্রদায়ের মোহন্ত গোমতি বন ও রতন বন, উভয়েই সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা ধুনির সমক্ষে যোগাবস্থায় থাকিতেন। সমস্ত দেশ তাঁহাদের দেবতার মত শম্ভুনাথের পর পূজা করিত। দেবোত্তর সম্পত্তির সঙ্গে ইহাঁদের কোনও সম্পর্কই ছিল না। মেলার ভার প্রাপ্ত হইয়া, সীতাকুণ্ডে গিয়া দেখিলাম, এ দেবতাদের আসনে একটি বানর উপবিষ্ট হইয়াছে। ইহার নাম লিখিয়া পবিত্র ভাষা কলুষিত করিব না। শুনিয়াছি, এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান তীর্থ দর্শনে সীতাকুণ্ডে আসিয়া মরে। তাহার অনাথ শিশুকে দেখিয়া রতন বনের দয়া হয়, এবং তিনি তাহাকে চতুর্থ চেলা করেন। তাঁহার সমাধিপ্রাপ্ত সময়ে ব্যভিচারের জন্য একজনকে পদচ্যুত করিয়া, তিনি উইল করিয়া যান যে, অবশিষ্ট তিন চেলারা বয়ঃক্রমে মোহন্তের আসন পাইবে, কিন্তু কাহারও চরিত্র মোহন্তের অযোগ্য হইলে, দেশের প্রধান ব্যক্তিরা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া, অন্য মোহন্ত মনোনীত করিতে পারিবেন। প্রথম চেলা প্রকৃত সন্ন্যাসী। সে বিষয়ে লিপ্ত হইতে চাহিল না। দ্বিতীয় চেলারও অকস্মাৎ মৃত্যু হয়, কিরূপে কেহ জানে না। এই দ্বারবান্‌-পুত্র কিশোর বয়সে মোহন্তপদে আমার পিতা ও দেশের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির দ্বারা নিয়োজিত হয়। ইহার অপ্রাপ্তবয়সবশতঃ কিছু কাল দেবোত্তর সম্পত্তির ভার কলেক্টর গ্রহণ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এরূপে তীর্থরক্ষা করিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছেন বলিয়া খ্রীষ্টান মিশনারিরা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলে, গবর্ণমেণ্ট তীর্থের ভার প্রথম 'লোক্যাল এজেণ্টে'র, তাহার পর ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আইন দ্বারা স্থানীয় 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি'র হস্তে সমর্পণ করেন। মিশনারিদের কৃপায় আইনটি এরূপ ভাবে গঠিত হয় যে, উহার দ্বারা কমিটির পক্ষে তীর্থরক্ষা অসম্ভব। তীর্থাদির ধ্বংসই মিশনারিভীত গবর্ণমেণ্টের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মোহন্ত ও মতয়োলিরা আইন-মতে নামতঃ এই কমিটির অধীন হইল। কিন্তু ইহারা কমিটির অধীনত্ব অস্বীকার করিলে,—এই পাপিষ্ঠ বারম্বার তাহাই করিয়াছিল—কমিটির দীর্ঘ দেওয়ানি মোকদ্দমা করা ভিন্ন ইহাদের পদচ্যুত করিবার উপায়ান্তর নাই। সেই মোকদ্দমা করিতেও পূর্ব্বে কলেক্টরের, কি 'এডভোকেট জেনারেলে'র অনুমতি চাহি। তাহার পর কমিটির আপন ব্যয়েই মোকদ্দমা করিতে হইবে, আর ব্যভিচারী মোহন্তেরা তীর্থের অর্থরাশির দ্বারা প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত লড়াই করিবে। ইহাতেও দেববৃত্তি রক্ষিত না হইয়া বরং ধ্বংসিত হইবে, এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিশ পঁচিশ বৎসর—এমন কি, মোহন্তের জীবিতকালে হইবে কি না সন্দেহ। এই দ্বারবান্‌পুত্রের বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যভিচারস্রোত বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। উক্ত আইন

প্রচারের পর দেশের প্রধান ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ করিবার পথ নাই। এরূপ অবস্থায় একটি শিক্ষাশূন্য দ্বারবানের পুত্র বিপুল বিষয়ের অধিকারী হইলে, তাহার সন্ন্যাস ব্যভিচার ভিন্ন আর কি হইবে। দেশের যে সকল কালজয়ী উৎকৃষ্ট বিধানাবলী ছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া, গবর্ণমেণ্ট এইরূপে হিন্দু মুসলমানের তীর্থ ও ধর্ম্মবৃত্তিগুলিরও ধ্বংস সাধন করিতেছেন। আর দেশের লোক নিরুপায় হইয়া চাহিয়া আছে। আমি মেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়া যখন সীতাকুণ্ডে যাই, এই 'মোহন্তে'র তখন প্রথম যৌবন। সে সন্ন্যাসী না হইয়া, একজন ঘোরতর বিলাসী। সে শম্ভুনাথের মন্দিরের সম্মুখে কয়েক হস্ত মাত্র দূরে, অনুমান ২০,০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া, এক দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, উহা বহুমূল্য বিলাতি উপকরণে সজ্জিত করিয়াছে। উহা দেখিয়া কোনও ধনী ইংরাজের গৃহ বলিয়া আমার ভ্রম হইল। তাহাতে প্রথম শ্রেণীর বিলাসিতার ও নানাবিধ ব্যভিচারের উপকরণ সকলই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তাহার বহুমূল্য সৌখিন পরিচ্ছদ এবং উৎকৃষ্ট গাড়ী, ঘোড়া ও হাতি। তাহার সঙ্গে আমার কিশোর বয়স হইতে পরিচয় ছিল। সে চট্টগ্রাম সহরে গেলে প্রায়ই আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত এবং ব্যাপারাদির সময়ে আমাদের পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীতেও যাইত। আমি তাহাকে বন্ধুভাবে প্রথমতঃ অনেক করিয়া বুঝাইলাম। কিন্তু সে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিল না। তখন আমি আমার নিজমূর্ত্তি ধরিয়া, তাহার বিলাসিতার স্বপ্নের মধ্যে বজ্রক্ষেপ করিলাম। পূর্ব্বে পূর্ব্বে মোহন্তদিগকে যাত্রীরা দেবতার মত ভক্তি করিত, এবং যথেষ্ট 'প্রণামী' দিত। কিন্তু এরূপ নরাধমকে তাহারা প্রণামই বা করিবে কেন? 'প্রণামী' দেওয়া দূরের কথা। কাজেই সীতাকুণ্ডের ও বাড়বের মোহন্তেরা নিজে পৈতৃক ব্যবসানুযায়ী প্রহরী সাজিয়া ও মুসলমান প্রহরী রাখিয়া, বলপূর্ব্বক শম্ভুনাথের মন্দিরের দ্বারে ১৲ এক টাকা—ও বাড়বকুণ্ডের দ্বারে আট আনা টেক্স, যাত্রীর উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়া আদায় করিতেছে। কেবল লবণাক্ষের মোহন্ত তাহা করিত না। এই লোকটি কিঞ্চিৎ ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিল বলিয়া, যাত্রীরা অযাচিতভাবে তাহাকে প্রণামী দিত। এই প্রণামীর নাম উপরোক্ত দুই স্থানে হইয়াছে—'কর' অর্থাৎ আরঙ্গজিবের 'জেজিয়া'। ইহাতে সীতাকুণ্ডের পাপিষ্ঠ বৎসর দশ পনর হাজার টাকা পাইতেছে। তদ্ভিন্ন দেবসম্পত্তির আরও প্রায় দুই তিন হাজার টাকা আছে। এই তস্করবৃত্তির উপার্জ্জন, সীতাকুণ্ডের মোহন্ত সম্যক্ তাহার বিলাসিতায় ব্যয় করিতেছে। বাড়বের মোহন্ত সন্ন্যাসধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, বিবাহ করিয়া সন্তান জন্মাইতেছে, এবং এই 'করে'র ও দেবসম্পত্তির আয়ের দ্বারা তাহার স্ত্রীপুত্রের নামে ভূ-সম্পত্তি কিনিতেছে। আমি ঘোষণা করিয়া দিলাম যে, মোহন্তদের বলপূর্ব্বক 'কর' আদায় করিবার অধিকার নাই। যাত্রীরা যাহা আপন ইচ্ছায় দিবে, তাহাই গ্রহণ করিবে। তাহার ফলে সীতাকুণ্ড ও বাড়বের মোহন্ত এই বৎসরের মেলায় একটা পয়সাও পাইল না। যাত্রীদের আনন্দের সীমা নাই। আমি যেখানে যাইতেছি, সেখানেই দু হাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। শম্ভুনাথের মন্দিরের সম্মুখে দরিদ্র বৈরাগী ও বৈরাগিণীরা আমাকে বেড়িয়া আনন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কারণ, 'কর' দিতে অক্ষম বলিয়া, ইহাদের দেব-দর্শন প্রায় ঘটিয়া উঠিত না। তাহাদের মধ্যে আমার চট্টগ্রামের স্কুলের সেই পণ্ডিত ও কবিতাশিক্ষক জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ও ছিলেন। তিনি তখন চট্টগ্রাম নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছেন। তিনিও গোমুখা হস্তে নৃত্য করিতেছিলেন এবং ঘন ঘন পদধূলি লইতে আমার মস্তকের কাছে চরণ উত্তোলন করিতেছিলেন। আমার তখন প্রথম যৌবন। ২২ বৎসর মাত্র বয়স। আমার বিলাসপ্রিয়তা জানিয়া, পণ্ডিত মহাশয় আমাকে বড় সুবিধাজনক বৈরাগ্যধর্ম্মে এই শম্ভুনাথের মন্দিরের দ্বারেই দীক্ষিত করিলেন। আমার এক কর্ণ ধারণ করিয়া বলিলেন—"বল—

মাগুর মাছের ঝোল,
যুবতীর কোল,
তবু হরি হরি বোল।"

আমি মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলাম, আর সকলে হাসিতে লাগিল। আমিও আমোদের হাসি হাসিতেছিলাম। বহু বর্ষ পরে যখন পড়িলাম যে, চৈতন্যদেব এক ধোপাকে বলিতেছেন—"বাপু! কাপড় কাচ, আর সঙ্গে সঙ্গে হরি হরি বল দেখি।" তখন বুঝিলাম, ইহার কি গভীর অর্থ। তখন বুঝিলাম, পঞ্চ মকারের দ্বারা তান্ত্রিক উপাসনার অর্থও—

"মাগুর মাছের ঝোল,
যুবতীর কোল
তবু হরি হরি বোল!"

যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়—খাও, করিতে ইচ্ছা হয়—কর, কেবল এক বার সেই সঙ্গে হরি হরি বল। তাহা হইলে তুমি ক্রমে প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্তির পথে যাইবে। মেলা হইতে ফিরিয়া তীর্থাদির ও মোহন্তদের শোচনীয় অবস্থা, এবং আমার ক্রিয়াকলাপ আদ্যোপান্ত 'রিপোর্ট' করিয়া, তীর্থাদির উন্নতির জন্য কয়েকটি প্রস্তাব করিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিয়া, উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে মোহন্তের নামে আদেশ প্রচার করিলেন। এক বৎসর চলিয়া গেল, কি কিছুই করিল না। ঐ অপূর্ব্ব আইনের কল্যাণে ম্যাজিষ্ট্রেটেরও আর কিছু করিবার ক্ষমতা নাই। পরের বৎসর 'শিবচতুর্দ্দশীর মেলা'তেও তিনি আমাকে সীতাকুণ্ডে পাঠাইলেন। আমার বন্ধু বাবু উমাচরণ দাস তখন সীতাকুণ্ডের পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর। মোহন্ত আমার সেই 'কর'-ধ্বংসী অস্ত্রে আহত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়াছে বাপ। তিনি আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। বলিলেন—একেবারে 'কর' উঠাইয়া দিলে, মোহন্ত আমার প্রস্তাবিত উন্নতির কার্য্য করিতে টাকা কোথায় পাইবে? দেবসেবাও বন্ধ হইবে। তাঁহার অনুরোধে আমি বলিলাম যে, মোহন্ত যদি এই সকল কার্য্য এই বৎসর করিবে বলিয়া তাঁহার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে, তবে আমি তাহাকে কিছু 'কর' দেওয়াইয়া দিব। সে আমার কাছে আসিয়া, অনেক কাঁদাকাটা করিয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিল। আমি সেই বৎসর সীতাকুণ্ডে আট আনা ও বাড়বে চারি আনা কর দিতে সক্ষম যাত্রীদের অনুরোধ করিয়া ঘোষণা দিলাম। তাহাতে উভয় স্থানের মোহন্ত যথেষ্ট টাকা পাইল। ইহার অব্যবহিত পরে আমি চট্টগ্রাম কমিশনরের প্রথম বার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইলাম। পরের বৎসর ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে মেলায় প্রেরণ করিলেন। তিনি আমার কার্য্যাবলী অনুমোদন করিয়া লিখিলেন যে, মোহন্ত আমার কোনও প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণত করে নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট তখন নিরুপায় হইয়া কমিশনরের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। ১৮৬৩ সালের ২০ আইনে কমিশনরেরও হাত বন্ধ। তিনি কি উপদেশ দিবেন! উক্ত আইনমতে 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি' মাত্র তীর্থাদির একমাত্র তত্ত্বাবধারক। তখন আমি পুরাতন কাগজপত্র বাহির করিয়া, এই তীর্থাদির সমস্ত ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিয়া দেখিলাম যে, প্রথমে গবর্ণমেণ্ট 'লোক্যাল এজেণ্টে'র হস্তে এবং তাহার পর উক্ত কমিটির হস্তে উহাদের ভারার্পণ করিয়াছেন। কমিটির সদস্য প্রায়ই নরলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। অনেক লেখালেখি ও চেষ্টার পর আবার একটা কমিটি গঠন করাইয়া, কমিটির দ্বারা মোহন্তের গ্রীবানিষ্পীড়ন আরম্ভ করিলাম। ইহাতেই তিন বৎসর চলিয়া গেল। যেই ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি বিপন্ন হইয়া পুরী স্থানান্তরিত হইলাম, আর সকলে নিবিয়া গেল। মোহন্তদের পথ নিষ্কণ্টক হইল, এবং অবরোধমুক্ত সমুদ্রগামী নদীর মত তাহাদের ব্যভিচার বর্দ্ধিত বেগে ছুটিল।

শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিয়াই আমি শ্রীমন্দিরের ভার প্রাপ্ত হই। জগন্নাথদেবের যে ভূসম্পত্তি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট শ্রীক্ষেত্রের রাজ্যচ্যুত দরিদ্র রাজার হস্তে রাখিয়াছেন, তাহার আয় কেবল আঠার হাজার টাকা মাত্র। শুনিয়াছি, মহারাষ্ট্রদের সময়ে লক্ষ টাকা ছিল। তাহার দ্বারা এবং মন্দিরের প্রণামী ও মহাপ্রসাদের বিক্রয়ের দ্বারা বৎসরে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে অতি কষ্টে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীন রাজাগণ যে বিপুল সম্পত্তি জগন্নাথদেবের সেবার জন্য দান করিয়াছেন, তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীক্ষেত্রের রাজার হস্তে না দিয়া, তাহার শাসনভার এক এক মঠের উপর দিয়া, উহাকে 'ট্রাষ্টি' বা তত্ত্বাবধারক করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, শ্রীক্ষেত্রের রাজা দুরবস্থাপন্ন, এবং মঠধারীরা নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী। ফল তাহার বিপরীত হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের আয় সম্যক্ তাহাতে ব্যয়িত হয়। অন্য দিকে শ্রীক্ষেত্রের তিন শত মঠের আয় প্রায় তিন লক্ষ টাকার সামান্য অংশ মাত্র জগন্নাথের সেবায় ও দাতব্যে ব্যয়িত হয়। এই সকল মঠের মোহন্তগণও সীতাকুণ্ডের মোহন্তের অন্য সংস্করণ মাত্র। তাহাদের বিলাসে ও ব্যভিচারে এই বিপুল অর্থ ব্যয়িত হইতেছে দেখিয়া, আমি একটি 'মন্দির-কমিটি' গঠন করিয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করি। ইহাতে একজন প্রধান মোহন্তও ছিলেন। দেখিলাম, ১৮৬৩ সালের ২০ আইন পরিবর্ত্তিত না হইলে এই ধর্ম্মার্থ অর্পিত সম্পত্তির রক্ষার ও সদ্ব্যবহারের উপায়ান্তর নাই। আমরা এই মর্ম্মে গবর্ণমেণ্টে আবেদন উপস্থিত করিলাম। ঠিক সেই সময়ে মান্দ্রাজবাসীদের আন্দোলনের ফলে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় কাউন্সিলে এক 'বিল' উপস্থিত করিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও আমাদের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন। তখন ভারত গবর্ণমেণ্ট মান্দ্রাজ কাউন্সিলের 'বিল' স্থগিত রাখিতে আদেশ দিয়া, সমস্ত ভারতব্যাপী এক 'বিল' গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে উপস্থিত করিলেন। দেবতাদের অদৃষ্ট মন্দ। ঠিক সেই সময়ে লর্ড লিটনের আফগান-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে গবর্ণমেণ্ট ভীত হইলেন, এবং এই বিলটিও চাপা পড়িল। এরূপে আমার শ্রীক্ষেত্রের সম্যক্ চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। কেবল সাত মাস কাল শ্রীক্ষেত্রে অবস্থিতির পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আমি বদলি হইয়া, মাদারিপুর এবং তথা হইতে বেহারে যাই। বেহারেও দেখিলাম, সে অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু মঠগুলিরও শোচনীয় অবস্থা। সুরক্ষিত জৈন মন্দিরগুলি দেখিলে এ অবস্থা আরও শোচনীয় বোধ হয়।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আমি যখন নোয়াখালি বদলি হইয়া যাইতেছিলাম, শম্ভুনাথের বাড়ীতে গিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যে শম্ভুনাথের বাড়ী আমি লোকারণ্য দেখিয়াছি : কত সন্ন্যাসী, বৈরাগীকে কত স্থানে বসিয়া শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালাপ করিতে শুনিয়াছি, সেই শম্ভুনাথের বাড়ী আজ জনমানবশূন্য। জগন্নাথের বাড়ী, কালীবাড়ী ও অন্যান্য দেবতাদের মন্দিরের ও গৃহের চিহ্ন মাত্র নাই। বৈষ্ণব ও শাক্ত বিগ্রহসকল একটি পাঁচ সাত হাত কুড়ে ঘরে ধর্ম্মবিদ্বেষ ভুলিয়া এক কেরোসিনের বাক্সের উপর বিরাজ করিতেছেন। আছে কেবল অসংস্কৃত অবস্থায় শম্ভুনাথের মন্দির, এবং তাহার সমক্ষে ভগ্নপ্রায় মোহন্তের সেই বিশ হাজার টাকার দ্বিতল গৃহ। লোককোলাহলপূর্ণ স্থানের দিবাভাগে এই নির্জ্জনতা ও নীরবতা আমার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিল। আমি সভয়ে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছিলাম, পথে একজন ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বলিল যে, আমি শম্ভুনাথের বাড়ীতে গিয়াছি শুনিয়া, মোহন্ত তাহাদের পাঠাইয়াছেন। তাহাদের মুখে শুনিলাম, 'আস্তানা' মোহন্ত নীচে লইয়া গিয়াছেন। তীর্থ সকল ধ্বংসপ্রায়, দেবসেবা বন্ধ। চন্দ্রনাথের ও বিরূপাক্ষের পূজা হয় না। শম্ভুনাথেরও পূর্ব্বের মত পূজা ও ভোগ ইত্যাদি নাই। কেবল পূর্ব্বাহ্নে তাহারা দুই জন আসিয়া তাঁহাকে জল ফুল মাত্র দিয়া যায়। পূজার অন্য উপকরণও বন্ধ। তাহারা আমাকে মোহন্তের নূতন আস্তানায় লইয়া গেল। দেখিলাম,

সেখানে আর এক কদাকার বৃহৎ দ্বিতল গৃহ ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকায় নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু শুনিলাম, মোহন্ত অধিকাংশ সময়ে নিকটবর্ত্তী উপপত্নীর আলয়ে বিরাজ করেন। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার হৃৎকম্প হইল। পুরাতন উপদংশ রোগের শেষ অবস্থা। তাহার সমস্ত শরীরের চর্ম্ম বিবর্ণ হইয়া মৎস্যের আঁমষের মত উঠিয়া যাইতেছে, এবং কুষ্ঠ-রোগ সঞ্চারিত হইতেছে। তিনি বলিলেন যে, উপরের জল-বাতাস তাঁহার সহ্য হয় না বলিয়া, তিনি 'আস্তানা' পর্য্যন্ত নীচে আনিয়াছেন। ঐ ভৃত্যেরা আমাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিল যে, পর্ব্বতোপরে মন্দিরের সমক্ষে তাঁহার ব্যভিচারের অসুবিধা হয় বলিয়া, তিনি এই কর্ম্ম করিয়াছেন। ক্রোধে, ঘৃণায় আমার গা জ্বলিতেছিল। আমি বলিলাম,—"আস্তানার জল-বাতাস সহ্য না হয়, তুমি দার্জিলিং চলিয়া যাও। আমি তোমাকে মাসিক দুই শত টাকা দিব। তথাপি তীর্থটি রক্ষা হউক।" সে আমাকে বহু অনুনয় করিয়া বলিল—ছয় মাস সময় দিলে সে পুনর্ব্বার ধ্বংসিত দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। নোয়াখালিতে সে সর্ব্বদা আমাকে পত্র লিখিত যে, গৃহাদির উপকরণ সঞ্চয় করিতেছে। কিন্তু ফেনী হইতে প্রথম বৎসর পূজার সময় বাড়ী যাইতে আমি দেখিলাম যে, সে কিছুই করে নাই। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের এক নরাধম সাহেবসেবক, কাজেই ক্ষমতাপন্ন, বাক্‌ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী তাহার পৃষ্ঠ-পোষক জুটিয়াছে। সে তাহাকে তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজীতে "Boozam friend" বলিয়া ডাকিত ও লিখিত। এবার সে বলিল যে, অর্থাভাবে দেবগৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছে না। নরাধম এক দিকে এখন উক্ত পাপিষ্ঠের পৃষ্ঠপোষকতায় ও পুলিসের সাহায্যে মুসলমান দ্বারবান্ রাখিয়া, এবং রেলওয়ের টিকিটের মত টিকিট করিয়া, যাত্রিগণ হইতে ঘোরতর অত্যাচারপূর্ব্বক প্রত্যেক বৎসর বিশ পঁচিশ হাজার টাকা টেক্‌স উশুল করিতেছে। তাহার 'কর' এখন পাঁচ সিকি, কি দেড় টাকা! অন্য দিকে দেবপূজক ব্রাহ্মণবংশীয়েরা, যাহারা 'অধিকারী' বলিয়া পরিচিত, মন্দির হইতে একপ্রকার নিষ্ক্রান্ত। সে তাহাদের যাহা প্রাপ্য, তাহাও আত্মসাৎ করিয়া, বহুবৎসরব্যাপী মোকদ্দমা করিতেছে।

আমি দেখিলাম যে, এই পাপিষ্ঠের পদচ্যুতির জন্য দেওয়ানি মোকদ্দমা করা ভিন্ন উপায় নাই। কারণ, কমিশনর লায়েল সাহেবের কাছে তীর্থের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থার কথা লিখিলে, তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, মোহন্তের বিরুদ্ধে তিনি স্ব-ইচ্ছায় ফৌজদারি মোকদ্দমা স্থাপন করিলে, দেশব্যাপী "Hindu relegion in danger" (হিন্দুধর্ম্ম সংকটাপন্ন) বলিয়া চীৎকার উঠিবে। সে সময়ে মান্দ্রাজের ত্রিপতির মোহন্তের দেববৃত্তির অপব্যয়ের জন্য তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হইলে, আমি সেই মোকদ্দমার রায় লায়েল সাহেবের কাছে পাঠাইলাম। তিনি যখন বলিলেন যে, দেশীয় কেহ সীতাকুণ্ডের মোহন্তের বিরুদ্ধে এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তিনি আদেশ দিবেন। কিন্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবে কে? চট্টগ্রামের 'এন্ডাওমেণ্ট কমিটি' মোকদ্দমা করা দূরে থাকুক, বরং সন্ন্যাসধর্ম্মভ্রষ্ট বাড়বের মোহন্তের গৃহী পুত্রকে তাঁহারা—লোকের সন্দেহ—দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া, বাড়বের মোহন্ত করিলেন। চট্টগ্রামের উকিলগণ? বরং কেহ মোকদ্দমা করিলে, ইহাঁরা দল বাঁধিয়া মোহন্তের পক্ষ গ্রহণ করেন। কারণ, সে বেশী ফিস দিতে পারে। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের কাছে সাহায্যের জন্য লিখিলে, একজন লিখিলেন যে, মোহন্ত ও তিনি উভয়েই *পুরী বাবাজির শিষ্য। তিনি মোহন্তের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। আমি লিখিলাম যে, আমি *পুরী বাবাজির সর্ব্বপ্রথম শিষ্য। কিন্ত তাঁহার শিষ্যত্বের অর্থ যদি এই হয় যে, তাঁহার শিষ্য একজন মহাপাপী হইলেও আমাকে তাহার পাপের প্রশ্রয় দিতে হইবে, তবে আমি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিব না। যাহা হউক, পদচ্যুতির মোকদ্দমা স্থাপন করিবার জন্য আমি অল্প দিনের মধ্যে দুই হাজার

টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করাইলাম। পূজার বন্ধের সময়ে ফেনী হইতে বাড়ী গেলে হাইকোর্টের উকিল, আমার খুড়তুত ভাই দাদা অখিলবাবুর সাহায্য চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে, সীতাকুণ্ডের মোহন্তের কাছে তিনি বৎসর পাঁচ শত টাকা ফিস পাইয়া থাকেন, অতএব সীতাকুণ্ডের সমস্ত তীর্থ ধ্বংস হইলেও তাঁহার আপত্তি নাই। তাঁহার ফিস পাইলেই হইল। অথচ ইহাঁর পিতা প্রতি বৎসর সীতাকুণ্ডে গিয়া তান্ত্রিক উপাসনা করিতেন! যাহা হউক, তাঁহার মাতা তাঁহার এই মনুষ্যত্বপূর্ণ অভিপ্রায় শুনিয়া, বিরক্ত হইয়া, দুই শত টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিলেন। তিনি বলিলেন যে, একবার চন্দ্রগ্রহণের সময়ে তিনি সীতাকুণ্ডে গিয়াছিলেন। গ্রহণ আরম্ভ হইল। কিন্তু মন্দির অন্ধকার। মোহন্ত একটি সামান্য মাটির প্রদীপ, কি একজন ভৃত্য পর্য্যন্ত মন্দিরে পাঠায় নাই। তিনি নিজে বাজার হইতে লণ্ঠন আনাইয়া মন্দিরে আলো দিলেন। তাহার পর যাত্রিগণ শম্ভুনাথ দর্শন করিল। তিনি বলিলেন, এই পাপিষ্ঠকে পদচ্যুত করিতে যত ব্যয় হয়, তিনি সমস্ত দিবেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি সাধে প্রথমে সরলা গোপবালাদের কাছে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু রমণী আছে, তাই ভারতে হিন্দুধর্ম্ম আছে। যাহা হউক, দাদা আমার বড় ফাঁফরে পড়িলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তিনি হাইকোর্টের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ কৈলাস জজকোর্টের উকিল। অতএব মোহন্তের নামে মোকদ্দমা করিতে চাঁদার ও অন্যের সাহায্যের কি প্রয়োজন? তিনি ও আমি একযোগ হইলে এরূপ শত মোকদ্দমা চলিবে। তিনি বলিলেন, তিনি শীঘ্র সীতাকুণ্ডে যাইবেন, এবং মোহন্তকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। যদি না পারেন, তবে তৎক্ষণাৎ মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন। আমাদের কুলমাতার সমক্ষে তাঁহাকে আমি এই প্রতিজ্ঞাবন্ধ করাইলাম, এবং চাঁদা সংগ্রহ বন্ধ করিলাম। তিনি কিছু দিন পরে সীতাকুণ্ডে সত্য সত্যই আসিলেন। আমি আমার বাড়ীতে বলিদান উঠাইয়া দিলে, তিনি কমিটি করিয়া তাহার প্রতিবাদস্বরূপ আমার বাড়ীতে সমস্ত বংশীয়দের কুলমাতা দশভুজার পূজা পাঠাইয়া, জোর করিয়া পাঁঠা কাটিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি যখন বলিলাম যে, তাহা হইলে নিরীহ অজশিশুকে মায়ের কাছে বলি না দিয়া, যে পাঁঠা লইয়া আসিবে, আমি তাহাকেই বলি দিব। তখন তাঁহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন। কিন্তু শম্ভুনাথ কি চন্দ্রনাথ Vegetarian (নিরামিষহারী) বিগ্রহ। তাঁহাদের কাছে বলি চলে না। সে জন্য তিনি সতেরটি খাসি কাটিয়া, সীতাকুণ্ডের মৎস্য-মাংস-খোর বামুনদের নিমন্ত্রণ করিয়া এবং মোহন্তের সঙ্গে 'ভাই' পাতাইয়া ও ফিসের আরও সুবিধা করিয়া, কলিকাতায় চলিয়া যান। তাহার পর আমাকে পত্র লেখেন যে, সীতাকুণ্ডের মোহন্ত অপেক্ষা বাড়বের মোহন্ত আরও দুরাচারী। সেও তাহার পিতার মত বিবাহ করিয়া, তীর্থরক্ষা ছাড়িয়া, বংশরক্ষার দ্বারা মোহন্তের সন্ন্যাসধর্ম্ম 'এন্ডাওমেণ্ট কমিটি'র কৃপায় পালন করিতেছে। তিনি লিখিলেন যে, যদি মোকদ্দমা করিতে হয়, তবে তাহারই নামে করা উচিত। আমি লিখিলাম, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। তিনি তাহাই করুন। মাসের পর মাস চলিয়া গেল। অনেক বার তাঁহাকে পত্র লেখার পর উত্তর আসিল যে, তিনি উকিল, এ সকল মোকদ্দমা করা তাঁহার কার্য্য নহে। আমি রাজকর্ম্মচারী, আমার কার্য্য! এরূপে আমার এই চেষ্টাও নিষ্ফল হইল।

সে সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের 'শশধরী হুজুগ' উঠিয়াছে। পেশাদারি হিন্দুয়ানির ঢক্কানিনাদে কর্ণ বধির হইতেছে। কোনও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক তারকেশ্বরের মোহন্তের প্রতিকূলে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের তোপ দাগিতেছেন। আমি জানিতাম না যে, উহা কেবল Blank cartridge (ফাঁকা আওয়াজ)। আমি তাঁহাদের কাছে পত্র লিখিলাম। তাঁহারা লিখিলেন যে, প্রথমতঃ তারকেশ্বরের মোহন্তকে পদচ্যুত করিয়া, পরে সীতাকুণ্ডের মোহন্তের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবেন। এই সময়ে তর্কচূড়ামণি ও বেদান্তবাগীশ চট্টগ্রামে

হিন্দুয়ানি প্রচার করিতে আসেন। বেদান্তবাগীশ ফেনীর পথে চট্টগ্রাম যাইতে আমাকে বলেন যে, তাঁহারা শীঘ্র তীর্থরক্ষা-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং সীতাকুণ্ডের ও তারকেশ্বরের মোহন্তদের মত পাপিষ্ঠ মোহন্তদের তাড়াইবেন। তিনি চট্টগ্রামে এ বিষয়ে বক্তৃতা দিতেও প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু সীতাকুণ্ডে গিয়া শুনিয়াছি, সামান্য কয়েকটি অখণ্ড মণ্ডলাকার রজতমুদ্রা মোহন্তের কাছে পাইয়া, তাহার মহাপ্রশংসা করিয়া সেখানে এক বক্তৃতা দেন এবং যাহারা তাহার নিন্দা করে, তাহাদের মস্তকে সরব্রহ্মশাপ বেদান্তী অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাহার কিছু দিন পরে উক্ত সাপ্তাহিকেও তারকেশ্বরের মোহন্ত সম্বন্ধে আন্দোলন নিবিয়া গেল। কেবল তাহা নহে, এখন তাঁহারাও বৈদ্যনাথবাসী শিশিরদাদার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মত মোহন্তদের ঘোরতর পৃষ্ঠপোষক! হা বিধাতঃ!

ফেনী হইতে রাণাঘাট বদলি হইবার কিছু দিন পরে স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে তিনি ও মহারাজা সূর্য্যকান্তই প্রকৃত জমিদার। অন্য জমিদারেরা ন্যূনাধিক জমিদারির বিত্তভোগী (annuitant) মাত্র। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জমিদারির কোন কার্য্যই করেন না। প্যারীমোহন একটি সামান্য ফৌজদারি মোকদ্দমা নিজে চালাইবার জন্য রাণাঘাটে উপস্থিত হইয়াছেন আমি তাহাতে বিস্মিত হইলে তিনি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত মোকদ্দমা নিজে চালান, এবং তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারির সমস্ত কার্য্য নিজে দেখেন। আমি সুরেন্দ্রবাবুর দ্বারা কাউন্সিলে তীর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে গবর্ণমেণ্ট উত্তর দিলেন যে, তীর্থদিগের শোচনীয় অবস্থা গবর্ণমেণ্ট অবগত নহেন, এবং তদ্বিষয় তদন্ত করিতেও চাহেন না। কটন সাহেব গোপনে সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন যে, যদি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা'র দ্বারা একটা আবেদন উপস্থিত করাইতে পারি, তবে গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন। আমি রাজা প্যারীমোহনকে ধরিয়া, উক্ত সভার দ্বারা এক আবেদনপত্র গবর্ণমেণ্টে উপস্থিত করিলাম। আমার কাছে তাহার মুসাবিদা রাজা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমার মত কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আবেদনের গবর্ণমেণ্ট কি উত্তর দিয়াছিলেন, মনে নাই। মোট কথা, ইহার দ্বারাও কোন ফল হইল না। অতএব কলিকাতায় আসিয়া আমি আবার দ্বিগুণ উৎসাহে তীর্থরক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমি 'বেঙ্গলী'তে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রচার করিলাম, এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আইনের অকর্ম্মণ্যতা (impractibility) দেখাইয়া বহু প্রবন্ধ উক্ত পত্রে লিখিলাম। আমি পাণ্ডুলিপিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, কলেক্টর দেশের প্রধান হিন্দু মুসলমান ও অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত করিয়া, তাহাদের দ্বারা নূতন স্বতন্ত্র 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি' তিন বৎসর অন্তর গঠিত করিবেন। এই কমিটির হস্তে স্ব স্ব ধর্ম্মের তীর্থ ও দেবত্রের ভার অর্পিত হইবে, এবং মোহন্ত নিযুক্ত ও পদচ্যুত করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁহাদের থাকিবে। তাঁহাদের আদেশ আদালতের ডিক্রির মত জজ কার্য্যে পরিণত করিবেন। ভারতব্যাপী এই বিলের সমালোচনা হইল, এবং কলিকাতার মুসলমান নেতাগণও ইহার সমর্থন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি উক্ত সমালোচনামতে পাণ্ডুলিপিটি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া ভারত কাউন্সিলের সদস্য, মান্দ্রাজের প্রতিনিধি আনন্দ চার্লু মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। মান্দ্রাজ অঞ্চলেও তীর্থাদির এরূপ শোচনীয় অবস্থা যে, তিনি আগ্রহের সহিত আমার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তার পর তিন দিন তিনি আমার কলিকাতার গোমেস লেনস্থ গৃহে বসিয়া, আমার সাক্ষাৎ আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিলেন, এবং তাহার প্রত্যেক প্রস্তাব ও শব্দ লইয়া তর্ক করিয়া, পাণ্ডুলিপিটি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিলেন। এই পরিবর্ত্তিত পাণ্ডুলিপি পঞ্চাশ কপি 'বেঙ্গলী প্রেসে' ছাপাইয়া, তাঁহাকে দিয়া, আমি সেই রাত্রিতেই চট্টগ্রাম বদলি হইয়া রওনা হইলাম।

'প্রভাস কাব্য'

কুরুক্ষেত্রের আশাতীত সমাদর ও সম্মান দেখিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে রাণাঘাটে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার দিন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে 'প্রভাস' রচনা আরম্ভ করি, এবং সেই দুই সর্গ সেখানে শেষ করিয়া, কলিকাতায় বদলি হই। কলিকাতায় কিছু দিন অবস্থিতির পর আমার আশৈশব প্রিয়তম সুহৃদ্ উমেশের (Dr U. C. Mukerji, Civil Surgeon)—হায়! সে উমেশও আজ স্বর্গে!—শিয়ালদহের ১০ নং গোমেস লেনের বাড়ীতে বসিয়া আবার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে 'প্রভাস' লিখিতে আরম্ভ করিলাম। বলিয়াছি, প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে আমি কবিতা, কি অন্য কোনও গুরুতর বিষয় লিখিতে পারি না। শিয়ালদহ হইতে আলিপুর পাঁচ মাইলের ব্যবধান। অতএব ঠিক সাড়ে দশটা, কি তৎপূর্ব্বে আমাকে আলিপুরে পাড়ি যোগাইতে হইত। যদিও এ জন্য জুড়ী করিয়াছিলাম, তথাপি অর্দ্ধ ঘণ্টার কম পাড়ি ঘাটে লাগিত না। কাজেই সকালে তিন ঘণ্টা কাল মাত্র আমার অবসর। এ সময়ে রাশি রাশি চিঠি, কিম্বা যে সকল আন্দোলনে হাত দিয়াছিলাম, তাহার জন্য সংবাদপত্রে পত্র এবং প্রবন্ধও লিখিতে হইত। ইহার উপর কলিকাতায় আর এক নূতন উৎপাত ভোগ করিতে হইত,—বঙ্গভাষার 'বিখ্যাত' গ্রন্থকারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। বঙ্গভাষার একে পাঠকের সংখ্যা হইতে গ্রন্থকারের সংখ্যা অধিক, তাহাতে আবার বিজ্ঞাপনে দেখিবে—সকলেই 'বিখ্যাত'। প্রতি দিন কলিকাতার মুদ্রাযন্ত্র যত আবর্জ্জনা উদ্গিরণ করিতেছে, তাহাও কলিকাতার অন্য আবর্জ্জনার মত পরিষ্কার করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীর বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। এখন সকল ব্যবসা অপেক্ষা সংবাদপত্র খুলিয়া সম্পাদক হওয়ার পর বহি লেখার মত এমন সহজ-সাধ্য ব্যবসা আর নাই। যাহার আর কিছু জুটিল না, সে একখানি কাগজ খুলিল, কিম্বা একখানি বহি লিখিল। এই গ্রন্থকাররোগে কত দরিদ্র হাতের অন্নমুষ্টিও হারাইতেছে। 'বঙ্গদর্শন' চাবুক পিটিয়া একবার এ রোগের 'এপিডেমিক' (প্রাদুর্ভাব) থামাইয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু নিজমুখে বলিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার এত শত্রু হয়, 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করিবার উহাও একটা প্রধান কারণ। এখন 'সাপ্তাহিক' ও 'মাসিকে'র আনুকূল্যে আবার এ রোগ 'প্লেগে'র মত দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যহ প্রাতে দুই চারি জন গ্রন্থকার, কেহ কেহ বহু দূর হইতে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সকলের মুখে এক কথা—তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয়। তাহার উন্নতি করিবার জন্য একখানি বহি লিখিয়াছেন। উহা অধিকাংশ স্থলে উপন্যাস ও নাটক, তাহার পর কবিতা। কবিতায় তথাপি চৌদ্দের জন্য একটু মাথা ঘামাইতে হয়। উপন্যাস নাটকের পথ পরিষ্কার। একটা কিছু লিখিলেই উপন্যাস ও নাটক হয়। কিন্তু অরসিক বাঙ্গালা পাঠক ধর্ম্মঘট করিয়া এই সকল বহির একখানিও কিনিতেছেন না। অতএব গ্রন্থকার তাঁহার বহিখানির বিক্রয়ের জন্য আমার 'মত' চাহেন, কিম্বা চাহেন যে, তাঁহার এক এক খণ্ড বহি কিনিয়া, তাঁহার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত পরিবারকে রক্ষা করি। কেহ কেহ সোজাসুজি অর্থ ভিক্ষা চাহেন। একজন বলিলেন যে, 'প্রেসওয়ালা' বলিয়াছিল যে, তাঁহার বহিখানি একচোটে বিক্রয় হইবে। অতএব তাঁহার ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া বহিখানি ছাপাইয়াছেন। তাহাতেও ছাপার সম্যক্ বিল আদায় হয় নাই। বাকী টাকার জন্য ছাপাওয়ালা ডিক্রি করাইয়া উহা জারিতে দিয়াছে। তাঁহার কপোল বাহিয়া দর দর ধারায় অশ্রু পড়িতেছে। তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। আমি তাঁহার যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য করিলাম। দেখি, কিছু দিন পরে তিনি আবার উপস্থিত। বলিলেন—আমি ও কলিকাতার অন্যান্য ভদ্রলোকেরা তাঁহার সাহায্য করাতে তিনি ঋণমুক্ত হইয়াছেন। এখন তিনি আর একখানি বহি লিখিয়াছেন, এবং তাহার ছাপার খরচের সাহায্যের জন্য আসিয়াছেন! আর একজন বলিলেন, তাঁহার দিনান্তে অন্ন জোটে না। তাহার উপর অবশ্য পত্নী ও বহু সন্তান আছেন। তাঁহার শিক্ষাও এণ্ট্রেন্স স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত। অথচ তিনি লিখিয়াছেন কি?—না, এক স্কুলপাঠ্য

পুস্তক। তিনি চাহেন, উহার জন্য আমার একটা অনুকূল মত। বলিলেন, স্বয়ং গুরুদাসবাবুও সেরূপ মত দিবেন আশা দিয়াছেন। আর চাহেন কিঞ্চিৎ ছাপা খরচ। তিনি 'টেক্সট-বুক কমিটি'র ত্রিমূর্ত্তির জনৈক বিখ্যাত স্কুলপাঠ্য পুস্তক-লেখকের একখানি বহির নাম বিকৃতরূপে 'নূতন কাঠ' বলিয়া, বলিলেন যে, আমি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে, উক্ত 'নূতন কাঠ' অপেক্ষা তাঁহার বহি অনেক ভাল্ যাহা হউক, এই গ্রন্থকার-প্লেগগ্রস্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার অনেক সময়ের সদ্ব্যবহার হইত। হা ভগবান্ ! তুমি কতরূপ দুর্গতিই বাঙ্গালীর ভাগ্যে লিখিয়াছ! বঙ্গসাহিত্য ব্যবসায় হইবার এখনও অনেক দিন বাকী আছে। কখনও হইবে কি না জানি না। যাঁহারা বঙ্গভাষার প্রথিতনামা লেখক, তাঁহাদেরও সাহিত্য-সেবার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না। হয় কেবল স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখক, শিক্ষা-বিভাগের ও স্কুলবুক কমিটির আইনত বা বে-আইনত কুটুম্বদের। তথাপি লোকে কেন নিজে এরূপ দুর্গতি ভোগ করে, এবং দরিদ্র মাতৃভাষারও দুর্গতি ঘটায়? আমি প্রত্যেক বহি লিখিতে কেবল দীর্ঘকাল কাটাইয়াছি, তাহা নহে ; বহু দিন ফেলিয়া রাখিয়া, নিতান্ত নিরুৎসাহে ছাপিতে দিয়াছি। মুদ্রাকরও দয়া করিয়া উহা দীর্ঘকাল তাঁহার লৌহগ্রাসে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। অতএব দেশে কেন যে এই 'গ্রন্থকার-রোগ' প্লেগের সঙ্গে বাড়িতেছে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। যাহা হউক, এ সকল কাজের পর প্রাতঃকালে যে সময়টুক থাকিত, সেটুক সময় উপরের তলার পূর্ব্বদিকের কক্ষে বসিয়া আকাশের ও পার্শ্বস্থ বাড়ীর প্রাঙ্গণের কোণায় আম্র-নারিকেলের একটি ক্ষুদ্র স্তবকের (topc) দিকে চাহিয়া 'প্রভাস' লিখিতাম। এই স্নিগ্ধ শ্যামল স্তবকটি মাত্র কলিকাতায় আমার সান্ত্বনার বিষয় ছিল। তদ্ভিন্ন যত দূর দেখা যায়, বাড়ীর চারি দিকে অবশিষ্ট দৃশ্য কেবল শোভা-সৌন্দর্য্যহীন পাকা বাড়ীর উপর পাকা বাড়ী, এবং পাকা ছাদের উপর পাকা ছাদ! একদিন আফিস হইতে আসিবার সময় দেখি, নিষ্ঠুর কুলিরা এই গাছগুলিও কাটিয়া ফেলিয়াছে। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। শুনিলাম, সবজজ গৃহস্বামীর আদেশ আসিয়াছে যে, বৃক্ষাবলির স্থলে একখানি একচালা প্রস্তুত করিতে হইবে। কি অপূর্ব্ব দেওয়ানি রুচি! আমার ইচ্ছা হইল, আমিও কবিগুরু বাল্মীকির মত—'মা নিষাদ!' বলিয়া এই হৃদয়হীন গৃহস্বামীর উপর সেই ঐতিহাসিক অভিশাপ বর্ষণ করি। আমার বোধ হইল, যেন আমার একটি পরম-বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটিল। সুখের বিষয়, তখন 'প্রভাস' শেষ হইয়াছিল। অন্যথা সেই ছাদসমষ্টির বিকৃত বিস্তার দেখিয়া কলিকাতায় আমার 'প্রভাস' লেখা হইত না। প্রত্যেক স্থানের একটি স্বতন্ত্র বাতাস (atmosphere) আছে। পশ্চিমে শরীর এত ভাল থাকিত, কিন্তু কেমন মানসিক কোনও কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইত না। বঙ্গদেশের মফস্বল হইতে কলিকাতার বাতাস যেন অধিক intellectual। বেশী লেখাপড়া ও কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয়। প্রাতে 'প্রভাস' লিখিতাম, আফিসে অধিকাংশ সময়ে সংবাদপত্রের জন্য পত্র ও প্রবন্ধ লিখিতাম। তথাপি 'প্রভাস' লিখিতেও প্রায় দেড় বৎসর লাগিয়াছিল। উহা ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে শেষ হয়।

লিখিবার সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। এই তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায়ই কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্তিতে, কখন বা করুণ রসের উচ্ছ্বাসে কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা বহিত। কখন বা সমস্ত প্রাতঃকাল এরূপে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতাম। 'কুরুক্ষেত্রে'র শেষ কয়েক সর্গ লিখিতে আমি অনর্গল কাঁদিয়াছি। কখনও এরূপ কান্না পাইত যে, কাগজ ভিজিয়া যাইত, লিখিতে পারিতাম না। 'প্রভাসে'র "বীণাপূর্ণতান" সর্গ লিখিয়া যেখানে জরৎকারু ভগবানের শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করিতেছে, সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত ভক্ত-সেবিত কুসুমকোমল শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রপাতের কথা আমি পাষাণ-হৃদয়ে কেমন করিয়া লিখিব! আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে ; আমার চক্ষু ফাটিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে। কাগজ

ভিজিয়া যাইতেছে, অক্ষর ভাসিয়া যাইতেছে। আমি সেই কাগজ ফেলিয়া দিয়া স্নানকক্ষে গিয়া বার বার চক্ষু প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া বার বার লিখিবার চেষ্টা করিতেছি, বার বার লেখা অশ্রুজলে ধুইয়া যাইতেছে। আমি ছট্‌ফট্ করিতেছি, এমন সময়ে আমার ভায়রা-ভায়ের স্ত্রী কি কার্য্য উপলক্ষ্যে উপরের ঘরে আসিয়া, আমার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার স্বামীকে ডাকিয়াছেন। তাঁহারা সে সময়ে কলিকাতায় এক পীড়িত পুত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংগে তাঁহার কন্যা ও আমার স্ত্রীও আসিয়াছেন। তাঁহারা চুপে চুপে আসিয়া, চুপে চুপে কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া, আমার এই অভিনয় দেখিতেছেন। আমি কিছুই টের পাই নাই। আমার বাহ্যজ্ঞান মাত্র নাই। নির্ম্মল এ কথা শুনিয়া, ছুটিয়া আমার কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া, আমার অবস্থা দেখিয়া, অবাক্ হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তখন আমার বাহ্যজ্ঞান হইল। তাহাকে বলিলাম—"বাবা! আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তুই একবার আমার বুকে আয়!" সে ছুটিয়া আসিয়া আমার বুকে পড়িল। আমার নিজের কল্পিত একখানি লিখিবার মেজ্ ও লিখিবার 'সোফা' আছে। এই সোফায় তাহাকে বুকে লইয়া পিতাপুত্রে খুব কাঁদিলাম। আমার আত্মীয় আত্মীয়ারাও তখন কপাটের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন—"এ ভক্তি মানুষের নহে। শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে এরূপ ভক্তিতে পাগল করিয়া তুলিয়াছেন।" তাঁহাদের সমালোচনা বন্ধ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া যাইতে বলিলাম। নির্ম্মলকে বিদায় দিয়া, আমি আবার স্নানকক্ষে গিয়া, খুব ভাল করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিয়া, আবার টেবিলের উপরস্থিত শ্রীভগবানের ছবির দিকে চাহিয়া, ধ্যান করিয়া,আর একখানি নূতন কাগজ লইয়া লিখিতে লাগিলাম। এ কাগজও অশ্রুজলে সিক্ত হইল। এবার অতি কষ্টে সর্গটি শেষ করিলাম। অস্ত্রপাতের কথা কিছুতেই লিখিতে পারিলাম না। লিখিলাম—"হায়! ভগবন্! অতীতের কত কবি তোমার এ দৃশ্য স্মরণ করিয়া, আমার মত পত্মী পুত্র বুকে লইয়া কাঁদিয়াছে, এবং ভবিষ্যতের আরও কত কবি এরূপ ভাবে কাঁদিবে। এই ভাবে বিহ্বল অবস্থায় 'প্রভাস' শেষ করিলাম। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যত্রয়ের ধ্যান আরম্ভ করি, এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রভাস' শেষ করি। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করিয়া 'মহাভারত' শুনিয়াছিলেন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী এই যজ্ঞ করিয়া, শ্রীভগবানের মহাভারতীয় লীলা ধ্যান করিয়াছিলাম। এই চতুর্দ্দশ বৎসর আহারে, বিহারে, বিচারাসনে, অশ্বারোহণে, গৃহে, শিবিরে আমি এই ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম। যখন যে সর্গ লিখিতেছি, উহার দৃশ্য দিন রাত্রি আমার চক্ষের উপর ভাসিত। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতাম না। আমি সম্পূর্ণরূপে সময়ে সময়ে আত্মহারা হইতাম। আহারে বসিয়া কি খাইতেছি, জানিতাম না। কোনও কোনও ব্যঞ্জন, কি খাদ্য খাইতে ভুলিয়া যাইতাম। স্ত্রী ভর্ৎসনা করিতেন—"দূর হউক ছাই, খাওয়ার সময়েও কি একটুক অন্যমনা না হইয়া খাইতে পার না।" আমি নিবিষ্ট মনে লিখিতেছি। তিনি তাঁহার সাংসারিক গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি। তিনি ক্রোধে গরগর করিয়া বলিলেন—"কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, আর উত্তর কি পাইলাম।" কোর্টের কার্য্য আমি কলের পুতুলের মত করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। সাক্ষীর জবানবন্দি আমি অনর্গল লিখিয়া যাইতেছি, স্থানে স্থানে উকিল মোক্তারদের প্রশ্ন ও উত্তর পর্য্যন্ত লিখিতেছি, এবং নোট করিতেছি, অথচ কি লিখিতেছি, আমি কিছুই জানি না। সময় সময় আমি যে সর্গ লিখিতেছি, তাহার দৃশ্যে আমার মন নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমাকে উকিল মোক্তারগণ বলিতেন যে, অন্য হাকিমগণ মোকদ্দমা ধরিবামাত্র তিনি কোন্ দিকে যাইতেছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কিন্তু মোকদ্দমার সওয়াল জবাব শেষ হইয়া গেলেও, হুকুম দেওয়ার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমি আসামীকে শাস্তি দিব, কি ছাড়িয়া দিব, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন

না। আমি যখন নিজেই বুঝিতে পারিতাম না, তাঁহারা কিরূপে বুঝিবেন? মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেলেও, আমি জবানবন্দি ও কাগজপত্র পড়িয়া, তবে 'রায়' লিখিতে বসিতাম। অনেক সময়ে শাস্তি দিব স্থির করিয়াও লিখিতে লিখিতে খালাস দিতাম, খালাস দিব স্থির করিয়া শাস্তি দিতাম। তাহার কারণ, লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মন আমার কাব্যের চিন্তায় নিমজ্জিত থাকিত। কি 'যাত্রা'য়, কি 'থিয়েটারে' কৃষ্ণ সাজিয়াছে দেখিলে আমার অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া যাইত। মুখে রুমাল গুঁজিয়া দিয়াও আমি রোদনের আবেগ থামাইতে পারিতাম না। চারি দিকের দর্শকগণ অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া থাকিত। রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং আমাকে এক দিন তাঁহার 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয় দেখাইতে লইয়া গিয়া, আমার এই অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিন বৎসর 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন তাঁহার 'প্রহ্লাদচরিত্র' রচনা সার্থক হইল। এরূপে 'প্রভাস' শেষ করিলাম। আমার বোধ হইল, আমার চৌদ্দ বৎসরের ধ্যান ভাঙ্গিল ; আমার চৌদ্দ বৎসরের স্বপ্ন শেষ হইল। কি যেন এক অপরিজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাবে আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়াছিল। এ ভার সময়ে সময়ে আমাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিত। কি যেন এক অচিন্তনীয় শক্তির হস্তে আমি ক্রীড়া-পুতুলের মত এই চৌদ্দ বৎসর পরিচালিত হইয়াছিলাম। এ শক্তি সময়ে সময়ে আমাকে বিহ্বল, আত্মহারা করিত। আজ যেন সে শক্তি অন্তর্হিত হইল, আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্তে মিশিয়া গেল। আমার সমস্ত শরীর যেন কি এক ভারমুক্ত হইল। আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ক যেন শূন্য হইল ; সমস্ত সংসার যেন শূন্য হইল। আমি বুঝিলাম। আমার কাব্য-জীবন ফুরাইল।

শুনিয়াছি, হেমবাবুর কবিতা মুদ্রাঙ্কনের পূর্ব্বে তাঁহার বহু বন্ধু দেখিয়া দিতেন। কলিকাতায় থাকিয়াও কাহাকে আমার কবিতা দেখাইতে, কি পড়িয়া শুনাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। আমার সর্ব্বদা কবি 'বাইরনে'র সেই উপহাস মনে হয়—"কেহ যদি বলে, সে ৫০ লাইন কবিতা লিখিয়াছে, তোমার ভয় হয়, পাছে সে তাহা পড়িয়া শুনায়।"* 'অমিতাভ' রচনার আরম্ভ হইতে যখন সে সর্গ লিখিতাম, পুত্র পড়িয়া শুনাইত। আমি কখন একা, কখনও সস্ত্রীক, নীরবে শুনিতাম। 'প্রভাসে'রও কিশোর পুত্র পাঠক এবং সমালোচক। নির্ম্মল তখন হিন্দু স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেছে। এরূপ ভাবে শেষ হইয়া 'প্রভাস' প্রেসে গেল, এবং পিতা পুত্রের নিত্য তাড়নায় ছয় মাসে মুদ্রাঙ্কন শেষ হইয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পূজার বন্ধের সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রেস হইতে আমার কাছে বিতরণের ২৫ এবং বিক্রয়ের জন্য ২৫ কপি মাত্র আসিল।

'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' অপেক্ষাও 'প্রভাস' কিরূপ হইল, জানিবার জন্য অধিক ব্যাকুল হইলাম। কারণ, 'রৈবতক' যেরূপ নিরুৎসাহ বুকে ঠেলিয়া লিখিয়াছিলাম, জানিতাম—উহা কেহ পড়িবে না, পড়িলেও গালি দিবে। বঙ্কিমবাবুর মত লোকের ধারণা কখনও এত অমূলক হইবে না। 'রৈবতক' বঙ্গ-সাহিত্যে একরূপ দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া যখন 'কুরুক্ষেত্র' লিখিলাম, তখন মনে আশঙ্কা হইল,—কি জানি, ইহার দ্বারা পাছে 'রৈবতকে'র প্রতিপত্তিও হারাই। এখন 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' উভয়ের প্রতিপত্তি হইয়াছে। 'রৈবতক' হইতে বরং 'কুরুক্ষেত্রে'র প্রতিপত্তি অধিক হইয়াছে। কাজেই 'প্রভাস' সম্বন্ধে আশঙ্কা অনেক বেশী হইয়াছে। উহা যদি অগ্রবর্ত্তী দুই কাব্যের উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে যে—"ডুবালে কনক-লঙ্কা, ডুবিলে আপনি"। 'প্রভাস' আপনিও ডুবিবে, সঙ্গে সঙ্গে কনকলঙ্কাসদৃশ 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্রে'র কবিযশঃও ডুবিবে। অতএব 'প্রভাস' কেমন হইয়াছে, জানিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলাম।

* পূর্ব্বে যখন সে সর্গ লিখিতাম, স্ত্রী পড়িয়া শুনাইতেন।

'প্রভাস' বাহির হইবার পরদিন সন্ধ্যার পর কলিকাতার চিকিৎসকাগ্রণী দেবপ্রতিম ডাক্তার নীলরতন সরকার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দিকে এম. এ., অন্য দিকে এম. ডি.। এরূপে সাধারণ বিদ্যায় ও চিকিৎসা-বিদ্যায় তিনি সমান পারদর্শী। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। আবার তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একজন নেতা ও প্রধান স্তম্ভ। ব্যবসায়ে তিনি দেশীয় ডাক্তারদের শীর্ষস্থানে। এমন সহৃদয় ও নির্ম্মলচরিত্র লোক বুঝি, এ জগতে বড় বেশী নাই। তাঁহার সঙ্গে যদিও আমার অল্প দিনের মাত্র আলাপ, তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন। এরূপ সময়ে সময়ে বহু রোগীদর্শনে ক্লান্ত হইয়া, সন্ধ্যার পর তিনি আমার গৃহে আসিয়া একটুক বিশ্রাম করিতেন, এবং নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন। সে দিন আসিয়াই তাঁহার সেই সুপ্রসন্ন জ্ঞানমাধুর্য্যমণ্ডিত মুখে বলিলেন—"আমি আপনার প্রভাস পড়িয়াছি।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"সে কি! ইতিমধ্যে আপনি আমার 'প্রভাস' পড়িয়াছেন! কই, আমি ত 'প্রভাস' আপনাকে এখনও উপহার পাঠাই নাই। কাল পাঠাইব স্থির করিয়াছি।" তিনি বলিলেন যে, 'প্রভাস' বাহির হইলেই তাঁহাকে এক কপি দিতে আমার পুস্তক-বিক্রেতাকে তিনি বলিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহার গাড়ী থামাইয়া, পুস্তক-বিক্রেতা এক কপি তাঁহাকে গাড়ীতে দিয়াছিলেন। তিনি বাড়ী ফিরিয়া, রাত্রি দুইটা পর্য্যন্ত জাগিয়া উহার পাঠ শেষ করেন, এবং নিজে পাঠ করিয়া বহিখানি বৈদ্যনাথে তাঁহার স্ত্রীকে দিতে একজন বৈদ্যনাথগামী বন্ধুকে দিয়াছেন। আমি আগ্রহের সহিত বহিখানি তাঁহার কেমন লাগিয়াছে জানিতে চাহিলাম। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিলেন—"আপনার বহি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিব, সেরূপ শক্তি আমার নাই। তবে যদি ক্ষমা করেন, বলিব যে, আমার মতে আপনার 'রৈবতক' প্রথম, 'প্রভাস' দ্বিতীয়, 'কুরুক্ষেত্র' তৃতীয়। আপনি 'প্রভাসে' ভাষার উপর যেরূপ অসাধারণ অধিকার দেখাইয়াছেন, এমন আর কোথায়ও দেখি নাই।" আমি বলিলাম, বহি তিনখানিই আমার। কোন্‌টা প্রথম, কোন্‌টা দ্বিতীয়, কোন্‌টা তৃতীয়, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। তাঁহার ক্ষমা চাহিবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। বরং 'প্রভাস' সম্বন্ধে তাঁহার মত লোকের মত জানিবার জন্য আমি এত ব্যাকুল হইয়াছিলাম যে, তাঁহার মত শুনিয়া আমার হৃদয় হইতে একটি গুরুতর আশঙ্কা দূরীভূত হইল। ইহার জন্য তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। তার পরে 'প্রভাসে'র চরিত্র-চিত্রণ ও ভক্তির ও ভাবের উচ্ছ্বাস লইয়া অনেক ক্ষণ আলাপ হইল। আমি বড়ই আশ্বস্ত হইলাম।

কেবল নীলরতনবাবু বলিয়াই নহে, অনেকেই কলিকাতায় এখানি প্রথম, ওখানি দ্বিতীয় বলিতেন। আমি দেখিতাম, যাঁহাদের মন philosophical (দর্শনপ্রবণ), তাঁহারা 'রৈবতক'কে প্রথম, যাঁহাদের মন emotional (ভাবপ্রবণ), তাঁহারা 'কুরুক্ষেত্র'কে প্রথম, এবং যাঁহাদের হৃদয় devotional (ভক্তিপ্রবণ), তাঁহারা 'প্রভাস'কে প্রথম বলিতেন।

তাহার পর মাননীয় গুরুদাসবাবুর পত্র পাইলাম। উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শ্রীহরিঃ শরণম্‌। নারিকেলডাঙ্গা ৯ই নবেম্বর ১৮৯৬।

কল্যাণবরেষু—

আপনার 'প্রভাস' পাঠ করিতেছি, এখনও পাঠ সম্পূর্ণ হয় নাই। যত দূর পাঠ করিয়াছি, তাহাতে (আপনার অপূর্ব্ব ভাষায় বলিতে যদি অনুমতি দেন)।

"প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র, প্রেমে ভরিয়াছে বুক।"

যদিও কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ শব্দবাহুল্য আছে বলিয়া কাহারও বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভাবের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে এত বিমুগ্ধ হইতে হয় যে, ভাষার প্রতি বড় লক্ষ্য থাকে না।

বিশ্বব্যাপী প্রেম আপনার কাব্যের মূল মন্ত্র এবং বিশ্বপতিই ইহার নায়ক। এইরূপ কাব্যরস পান করিলে মোহান্ধ জীবের নয়ন উন্মীলিত হয়, এবং জীব কিঞ্চিৎ দেখিতে পায় যে, "সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ পদতরী। এই তীরে সন্ধ্যা ; ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।"

এই দুইটি পংক্তিতে আপনি কি পবিত্র, কি মধুর, কি অপূর্ব্ব গীতই গাহিয়াছেন আর অধিক কি লিখিব। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এ পত্রে কই, জরৎকারু সম্বন্ধে কোনও কথা নাই। অথচ তাহা জানিবার জন্য আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার কাছে 'প্রভাস' উপহার পাঠাইয়াছিলাম। এই পত্রের উত্তরে তাঁহার সেই 'স্থগিত রায়' (suspended judgment) প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করিলে, তিনি 'প্রভাস' পাঠ শেষ করিয়া দ্বিতীয় পত্র লেখেন। দুঃখের বিষয়, আমি সে পত্রখানি হারাইয়াছি। স্মরণ হয়, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, জরৎকারুর প্রতি তিনি অবিচার করিয়াছিলেন। এখন বুঝিয়াছেন, তাহার তুল্য চরিত্র কোনও সাহিত্যে নাই। আবার প্রভাসের শেষ দুই ছত্র—"সম্মুখে অজ্ঞাত সিন্ধু, ভাসে কৃষ্ণ-পদতরী। এই তীরে সন্ধ্যা ; ঊষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।" উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে ভগবান্‌কে আমি চৌদ্দ বৎসর ধ্যান করিয়াছি, তাঁহার কাছে যেন প্রার্থনা করি, আমার মত তিনি ও আমার অন্য পাঠকেরাও যেন এই জীবনের সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্য জীবনে ঊষা দর্শন করিতে পারেন।

ইহার দুই এক দিন পরে গুরুদাসবাবুর বাড়ীতে জগদ্ধাত্রীপূজার নিমন্ত্রণে সন্ধ্যার পর গিয়াছি। কলিকাতার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মাত্রই নিমন্ত্রণোপলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। আমাদের প্রাচীন নিয়মানুসারে বাড়ীর কর্ত্তা গুরুদাসবাবু একখানি মলিন ধুতি ও চাদর মাত্র পরিহিত। আমি দেবীকে প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, সমবেত নিমন্ত্রিতের কাছে লইয়া গিয়া, আমাকে তাঁহারা চিনেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাদের অনেকেই এ গরীবকে চিনেন বলিয়া বলিলে, গুরুদাসবাবু বলিলেন—"না, আপনারা এখনও তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনেন না। আমার বোধ হয়, আপনারা কেহ এখনও তাঁহার 'প্রভাস' পড়েন নাই।" তাহার পর আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া তিনি 'প্রভাসে'র এত প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, আমি মাথা হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে বসিয়া রহিলাম। সর্ব্বশেষে 'প্রভাসে'র শেষ কয়েক লাইন—

"যাও মা করুণাময়ি! পূর্ণ ব্রত মা তোমার!"

হইতে মুখস্থ আবৃত্তি করিয়া বলিলেন—"বলুন দেখি! ইহার তুলনা সাহিত্যে আছে কি না?" তাঁহাদের অনুরোধমতে তিনি ঐ কয়েক লাইন আবার আবৃত্তি করিলেন। তাঁহারা সকলে শুনিয়া যেন মুগ্ধ হইলেন, এবং গুরুদাসবাবুর প্রশংসার সমর্থন করিলেন। পরদিন অপরাহ্নে বন্ধু শ্যামাধব আসিয়া তাহার বড় চক্ষু দুটি আরও বিস্তৃত করিয়া বলিল—"ব্যাপারখানা কি বল দেখি! কাল গুরুদাসবাবুর জগদ্ধাত্রীপূজার নিমন্ত্রণে গিয়া দেখি কি না, গুরুদাসবাবু জগদ্ধাত্রীপূজা ফেলিয়া, তোমাকে ধরিয়া বসিয়া আছেন, এবং তোমার কি বহির ভয়ানক প্রশংসা করিতেছেন। বলি, ব্যাপারখানা কি?" শ্যামাধব একজন রসিক পুরুষ। সে এরূপ মুখভঙ্গি করিয়া বলিল যে, আমি ও উপস্থিত বন্ধুগণ সকলে হাসিয়া উঠিলেন। শ্যামাধব তবু ছাড়ে না। বলিল—"হুঁ হুঁ, হাসিয়া উড়াইলে হইবে না। যদিও বাঙ্গালাটা আমার আসে না, তথাপি বহিখানা আমাকে পড়িতে হইবে। এক কপি আমাকে দিতে হইবে।. সহজ কথা! গুরুদাসবাবু জগদ্ধাত্রীপূজা ফেলিয়া, অনর্গল মুখস্থ কবিতা আওড়াইতেছেন!" আমরা আবার হাসিলাম।

রবিবার অপরাহ্নে কখন কখন কলিকাতার সাহিত্যিক বন্ধুগণ আমার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিতেন। 'প্রভাস' বাহির হইবার পরের রবিবারও তাঁহারা আসিয়াছেন। কবি-সুহৃদ্ অক্ষয়কুমার বড়াল বলিলেন, তিনিও 'প্রভাস' পড়িয়াছেন। বলিলেন যে, 'প্রভাস' পড়িবার জন্য তাঁহার এত আগ্রহ ছিল যে, তিনি উপহারের অপেক্ষা না করিয়া, আমার পুস্তক-বিক্রেতার মুখে 'প্রভাস' বাহির হইয়াছে শুনিয়া, এক কপি কিনিয়া লইয়া, রাত্রি জাগিয়া পড়িয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'প্রভাস' 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্রে'র উপযোগী হইয়াছে। তবে 'প্রভাসে' ভাষা সম্বন্ধে আমি স্থানে স্থানে কিছু অসাবধান। আমি তাঁহাকে হাসিয়া, প্রথমতঃ নীলরতনবাবুর মত বলিলাম। তাহার পর 'প্রভাসের "বীণা ছিন্নতান" সর্গে শ্রীভগবানের শ্রীঅঙ্গে জরৎকারুর সেই অস্ত্র ত্যাগের কথা লিখিবার সময়ে আমার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বলিলাম। বলিতে বলিতে অশ্রুতে আমার নয়ন ছল ছল করিয়া উঠিল। বলিলাম, এরূপ অবস্থায় মানুষের ভাষার প্রতি লক্ষ্য থাকিতে পারে না। অতএব নীলরতনবাবু যে 'প্রভাসে'র ভাষার প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা হয় ত ঠিক নহে। সম্ভবতঃ অক্ষয়বাবুর মতই ঠিক। 'প্রভাসে'র ভাষায় সাবধানতার অভাব। এরূপ অবস্থায় লেখক ভাষা সম্বন্ধে সাবধান হইতে পারে না।

ইহার পর কবি-ভ্রাতা গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্র পাইলাম। আমার রাণাঘাট অবস্থিতি সময়ে তাঁহারা দুই ভাই গিরিজা ও কুমার এবং তাঁহাদের খ্যাতনামা পিতা 'ধাত্রী-শিক্ষা'র ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ গিরিজার পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। কারণ, গিরিজা নিজেও কবি।

৮ই কার্ত্তিক ১৩০৩।

দাদা মহাশয়,

'প্রভাস' অনেক দিন পাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, পড়িয়া প্রাপ্তিস্বীকার করিব। 'প্রভাস' পড়িলাম। 'কুরুক্ষেত্রে'র যশঃ 'প্রভাসে' উজ্জ্বলীকৃত হইবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। 'প্রভাসে'র প্রথম সর্গ ভাবে গভীর—ভাষায় চূড়ান্ত কবি-শক্তি প্রকটিত। প্রথম সর্গ অতি সুন্দর লাগিল। দুর্ব্বাসার চিত্র পরিবর্ত্তন ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত হইয়াছে যেন বোধ হইল। শৈলজা ও জরৎকারুর পরিণাম অপূর্ব্ব। সপ্তম সর্গের মত ভয়ঙ্কর বর্ণনা পড়িয়াছি, মনে হয় না। পড়িতে পড়িতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। লিটনের Last Days of Pompeii উপন্যাসে পম্পি নগর ধ্বংসের চিত্রও তত ভয়ঙ্কর নহে। একাদশ সর্গের মত 'প্রভাসে' আর সর্গ নাই। ভাবে, ভাষায় এই সর্গ তুলনা-রহিত।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" প্রভৃতি গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি নবম সর্গে প্রতিফলিত। কৃষ্ণ-চরিত্রের এইখানে পূর্ণ বিকাশ। কোন সর্গ ভাল লাগে নাই বলিতে পারি না। মোটামুটি কতকগুলি লিখিলাম। একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় নাই। হয় ত সকল বেশ অন্তরস্থও হয় নাই। আর দু' এক বার পড়িব। আপনার জন্য আমার মাইকেল ও হেমচন্দ্রকে ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কাহারও ভাষা আপনার মত মিষ্ট লাগে না। ইস্তক 'পলাশি' নাগাইত 'প্রভাস'। 'প্রভাস' যে ভাবে লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনার Interpretation সকলে গ্রহণ করিবে—নিশ্চয়ই। 'প্রভাস' কি, এত দিন বুঝি নাই—আজ বুঝিলাম।

আপনার ব্রত পূর্ণ হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস-সম্মিলিত কীর্ত্তিমন্দির চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। আপনার নাম অক্ষয় হইবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্রে'র সমালোচক পণ্ডিতপ্রবর বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতের জন্য

আমি, বলা বাহুল্য, বিশেষ উৎকণ্ঠিত ছিলাম। তিনি বড় সাবধান পাঠক। বিশেষতঃ এ সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মত জানিতে বিলম্ব হয়। তিনি 'প্রভাসে'র সমালোচনা করেন নাই। এ সময়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা তাঁহার লেখা বলিয়া শুনিয়াছিলাম। তাঁহার পত্র ও উক্ত সমালোচনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীহরি

দাদা মহাশয়,

ইতিমধ্যে জ্বর হইয়া অসুস্থ হইয়াছিলাম, সেই জন্য বৈদ্যনাথ যাত্রা স্থগিত আছে। 'প্রভাস' দুই বার পড়িয়া শেষ করিয়াছি। প্রথম বার কৌতূহলতাড়িত হইয়া বড় দ্রুত পড়িয়াছিলাম। আর একবার না পড়িয়া মতামত লেখা সংগত মনে করি নাই। সেই জন্য এই বিলম্ব।

এক কথায় প্রভাস, কুরুক্ষেত্র ও রৈবতকের উপযোগী Conclusion। ইহাতে আপনার কবি-প্রতিভার কিছু খর্ব্বতা লক্ষিত হয় না। কবিতার প্রবাহ সমান উচ্ছল বেগে প্রবাহিত। কাব্যাংশে প্রভাস অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। আপনার সৃষ্ট চরিত্র সকলগুলিরই (বাসুকি, দুর্ব্বাসা, জরৎকারু ও শৈল) অতি সুন্দর পরিণাম ঘটাইয়াছেন—সুন্দর Consistent এবং কাব্যোপযোগী। আর কৃষ্ণপ্রেমের যে বন্যা বহাইয়াছেন, তাহাতে সকল সমালোচনাই ভাসিয়া যায়। 'মহাপান' ও 'মহাপ্রস্থান' এ অংশ বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যদুদিগের গৃহবিবাদ ও দ্বারাবতী ধ্বংসের যে কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আপনারই উপযুক্ত। কিন্তু ইতিহাসাংশে, যদুবংশ ধ্বংসের ফলাফল পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান ও বলরামের সমুদ্রযাত্রার অনুমোদন করিতে পারা যায় না। প্রভাসের মহাধ্বংসের ফলস্বরূপ উক্ত দুই ঘটনার সমাবেশ করাতে এবং তাহাদের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াতে কৃষ্ণের অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়া যায়। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে যেরূপ 'কুরুক্ষেত্র' পড়িয়া সন্দেহ থাকে না, এ সেরূপ নহে।

আর এক কথা। কৃষ্ণ সম্বন্ধে মহাপ্রস্থান সর্গে অতিপ্রাকৃতের অধিক সমাবেশ করিয়া কাব্যত্বের কিছু হানি হইয়াছে। জরৎকারু ও বাসুকিকে কৃষ্ণের নিমিত্তমাত্র ও মহাভক্ত বলিয়া ফল কি? বরং বিষ্ণুপুরাণ শিশুপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সেরূপ বলিলে চলিত। ইহার ফলে বাসুকি প্রভৃতির সমস্ত পূর্ব্বজীবন যেন অলীকতায় পরিণত হইয়াছে। ইতি—

স্নেহার্থী—
শ্রীহীরেন্দ্র।

REVIEW

Provas—By Babu Nabin Chandra Sen : Published by Sanyal & Co. Price 1—4. This volume completes the grand and sublime trilogy of epic poems about India's Divine National Hero, Srikrishna, upon which the poet embarked about fourteen years ago. Raibatak, dealing with the early life of Srikrishna, first made its appearance about 10 years ago. The novelty of the historical truths therein embodied and the sublimity of its philosophical deductions made it at first "Caviare to the general." This has always been the first reception given to world-poetry by the public. It has to create a taste for itself before it can be appreciated. *Kurukshetra* appeared about four years ago, in which the poet expounded that part of the life-work of Srikrishna which culminated in the war of Kurukshetra. It was greeted with a chorus of applause and in its light the public came to understand and thus to

appreciate *Raibatak* which, in the meantime, had secured a fit audience though few.

And now *Provas* has made its appearance, dealing with the closing part of Srikrishna's career, which came to consummation on the sea-coast of Provas.

The chief merit of this Srikrishna trilogy, that which stamps it as the most enduring poem in the language and lays the nation under deep obligation to the poet, is that it has been the means of restoring Srikrishna to the national heart as its Divine National Hero. Ages of superstition and ignorance had served to tarnish the glory of Srikrishna's life-work by making Him appear in a false and distorted light. This has been effectually dispelled by the poet; and in his work, Srikrishna shines forth in His true glory and splendour which one has only to look upon to love Him and fall at His lotus feet as the Incarnation of the Supreme Being, the Divine Teacher of the Gita, and the founder of a united and imperial India.

Speaking of the poem (*Provas*) which is now before us, we would confine ourselves to noticing certain prominent characteristics thereof, because the space at our disposal would not permit anything like an exhaustive review. We find that the poetic powers of the author do not show any signs of decay or abatement; for we meet with a great many passages in the poem which for depth of feeling, sublimity of sentiment, high seriousness of thought, sweetness of rhythm, and beauty of expression may challenge comparison with the best and highest portion of Bengali poetry. There are some grand descriptions in the poem—that of the Jadava battle, amidst the dust ashes, lava discharge and earthquake of a volcanic eruption, or of the battle-field after the extermination of the Jadu race, which cannot fail to extort admiration. The consummation of the three original characters introduced into the poem—Jaratkaru, Basuki and Durbasa and the master-touch of poetic art in making Jaratkaru murder Srikrishna, demand the highest praise.

The current of Krishna-bhakti (devotion) which flows through the 5th and the 11th Canto in sweet abundance has the inevitable result of carrying one along with it, engulfing his hard-hearted scepticism, and Basuki in his self-forgetful devotion and abiding feeling of the pervasiveness of the God-head reminds one of his prototype Sri Gouranga. The historical reader may be apt to find fault with the poet's heresies in making Balaram lead an expedition of civilising and prosely-tising colonisation to Greece and identifying him with the Greek Hercules and also in making the Pandava Princes depart upon a

divine errand round the Red Sea and the Mediterranean Sea, but he will, we think, be propitiated with the exquisitely beautiful vision of the future set forth in the closing canto where the poet passes in review, the mission of the world prophets, Buddha and Christ and Mahomed and Sri Chaitanya and which ends with the triumph of *Harinama* in this world of sin and anguish.

ইহার কয়েক দিন পরে রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ী হীরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে পার্শ্বের একটি কক্ষে লইয়া দুজনে এক সোফায় বসিলাম। সেখানে অন্য কেহ ছিলেন না। হীরেন্দ্র 'প্রভাসে'র খুব সুখ্যাতি করিয়া আবার বলিলেন, 'প্রভাসে'র উপসংহারে আমি যে বলদেবের গ্রীসে সমুদ্রযানের এবং পাণ্ডব ও যাদবদের আরব ও এসিয়া মাইনর ভ্রমণের ইঙ্গিত করিয়াছি, তাহা ঐতিহাসিক বলিয়া কেহ স্বীকার করিবে না। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এরূপ একটি কাল্পনিক ঘটনার আরোপ করিয়া 'প্রভাস' শেষ করাতে শ্রীকৃষ্ণের ও 'প্রভাসে'র গৌরবের হানি হইয়াছে। কিন্তু উহা যদি প্রকৃত ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি, তাহা হইলে এরূপ গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য 'প্রভাসে'র মূল্য আরও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইবে। তখন 'প্রভাসে'র পরিশিষ্টে উহার ঐতিহাসিকতা দেখাইবার জন্য যে সকল প্রমাণ দিয়াছি, তাহা তাঁহার কাছে উল্লেখ করিলাম। তাহার পর তাঁহারই বিশেষ অনুরোধমতে মুদ্রিত 'প্রভাসে' উক্ত পরিশিষ্ট সংযোজিত হইয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া অবধি হীরেন্দ্র আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। এমন একজন দেব-ভ্রাতা প্রাপ্ত হওয়া আমিও আমার দুঃখ-দুর্য্যোগ-সঙ্কুল জীবনের একটি সুখ-সৌভাগ্যের কথা মনে করি। সেই অবধি আমি তাঁহাকে 'হীরেন' বলিয়া সম্বোধন করি। বোধ হয়, এই আত্মীয়তার দরুন, তিনি 'প্রভাসে'র সমালোচনা করেন নাই। 'রৈবতক' সমালোচনার সময়ে আমি তাঁহার কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত, এবং 'কুরুক্ষেত্র' সমালোচনার সময়েও অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ছিলাম। যাহা হউক, 'প্রভাস' সম্বন্ধে ঐ সকল মত পাইয়া এবং 'প্রভাসে'র বিক্রয় দেখিয়া, আমি 'প্রভাস' সম্বন্ধেও নিশ্চিত হইলাম।

কলিকাতার দলাদলি

'রাজস্থানে'র ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন যে, একটি সামান্য বিষয়ে বিরোধ হইলে, জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ উদয়পুরের মহারাজা অভয় সিংহের কাছে লেখেন—"আপনি স্মরণ রাখিবেন, আমার নাম জয়সিংহ।" অভয়সিংহ উত্তরে লেখেন—"আপনার নাম জয়সিংহ, আমার নামও অভয়সিংহ।" ইহাতে যে অভিমানের দাবানল জ্বলিয়া উঠে, তাহাতে 'মার্থা'র সমরক্ষেত্রে রাজপুতনার স্বাধীনতা ভস্মীভূত হয়। কলিকাতায় পঁহুছিয়া দেখিলাম, কেবল পল্লীগ্রাম নহে, মহানগরী কলিকাতাও দলাদলির ভীষণ রঙ্গভূমি। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেন—আমার নাম মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বলেন—আমার নামও রাজা বিনয়কৃষ্ণ। 'বেঙ্গলী'র সুরেন্দ্রবাবু বলেন—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতি ভায়া বলেন—আমার নামও শ্রীমতিলাল ঘোষ এবং আমার দাদার নাম শ্রীল শিশিরকুমার ঘোষ। রঙ্গমঞ্চে গিরিশ ভায়া বলেন—আমি বাঙ্গালার 'গেরিক' গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অমৃত ভায়া বলেন—অবশ্য তোমাকে গুরু বলিয়া মানি, কিন্তু আমার নামও অমৃতলাল বোস। বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, এমন মুনি নাই—যাঁহার ভিন্ন মত নাই, তাহা জানি। কিন্তু তাই বলিয়া ঋষি ঠাকুরেরা যে তাহার জন্য মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করিতেন, তাহা ত শাস্ত্রে লেখে না। সুরেন্দ্রবাবুর সম্পাদকীয় মূর্ত্তির

ও তীর্থের বর্ণনা সংক্ষেপে পূর্ব্বে দিয়াছি। যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ভ্রাতৃযুগলের রাজনৈতিক সাহস ও সূক্ষ্ম সূচিভেদ্য বুদ্ধিকৌশলে ইংরাজ-রাজপুরুষেরা জর্জ্জরিত, এখানে তাঁহাদের কথা কিছু বলিব। বলিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে আমার আযৌবন যশোহরের 'অমৃতবাজার লাইবেল মোকদ্দমা' হইতে বিশেষ বন্ধুতা। তাঁহারা আমাকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে স্নেহ করেন, এবং আমি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা করি। আমি শিশিরবাবুকে দেববৎ ভক্তি করি। মতিবাবুর মত আমিও তাঁহাকে 'সেজদা' বলিয়া ডাকি। দুটি ভ্রাতাই খর্ব্বাকৃতি, কঙ্কাল-শেষ, যেন বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ক্ষুদ্র গণ্ড দুটি ভাসিয়া উঠিয়াছে, এবং চক্ষু কোটরস্থ। কিন্তু তাহাতে কি তীব্র জ্যোতিঃ! তাঁহারা তোমার দিকে চাহিলে, তোমার বোধ হইবে যেন তোমার অন্তস্তল পর্য্যন্ত তাঁহারা স্ফটিকের মত দেখিতেছেন। সাহিত্যে ও সঙ্গীতে উভয়েরই অসাধারণ অধিকার। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উভয়ে অদ্বিতীয়। ইহাঁদের কৃতিত্বের কথা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাঙ্গালা কাগজে লাউয়ের ও কাঠের অক্ষরে যশোহর জেলার একটি অজ্ঞাত পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহার কীর্ত্তি ইংলণ্ড আমেরিকা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহা আজ ইংরাজ রাজপুরুষদের ও এঙ্গলো ইণ্ডিয়ানদের চক্ষুঃশূল। দুটি ভাই আয়নার ছবি,—এমন চতুর যে, কত মতে, কতরূপ আইন পরিবর্ত্তন করিয়াও কত বার তাঁহদের ধরিয়া জেলে দিতে ক্রোধোন্মত্ত রাজপুরুষেরা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক বার তাঁহাদের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, হো হো করিয়া হাসিয়া, বগল বাজাইয়া, দুই ভাই সরিয়া পড়িয়াছে, 'অমৃতবাজার'কে পাকড়াও করিবার জন্য লর্ড লিটন ও ইডেন দিনে দিনে 'ভার্ণাকিউলার প্রেস এক্ট' পাশ করিলেন। আর 'অমৃতবাজার' তাহার পরদিন প্রভাতেই বাঙ্গালা পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, ইংরাজি ভাষায় বাহির হইল! সমস্ত বঙ্গদেশ হাসিতে লাগিল, আর ক্রোধে লিটন-ইডেন, আপনাদের ঠোঁট কাটিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আইন ইংরাজি ভাষায় প্রচারিত সংবাদপত্রে খাটে না। কে জানিত, এক রাত্রির মধ্যে 'অমৃতবাজার' এই খেলা খেলিয়া, তাঁহাদের এরূপ উপহাসভাজন করিবে? ইডেন পরদিন বলিলেন—"ইহারা বহুরূপী (Chameleon)। ইহাদের ধরিবার জো নাই।" তাঁহাদের অপরাধ, তিনি শিশিরবাবুকে ডাকাইয়া তাঁহার হাতের এবং তাঁহার মন যোগাইতে চলিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শিশিরবাবু বলিলেন—"হেব না অবধড়! কোথায় 'অমৃতবাজার'কে গলা টিপিয়া তাঁহারা মারিয়া ফেলিবেন, না ইংরাজি আকারে উহার প্রতিপত্তি আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইল ও সমস্ত ভারত ছড়াইয়া পড়িল। বরদা রেলওয়ে ষ্টেশনে এক সময়ে দাঁড়াইয়া আছি, একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া, কথায় কথায় বলিলেন—"আমাদের একমাত্র আশা 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও কংগ্রেস'।" তাহার পর 'সহবাস-সম্মতির আইনে'র আন্দোলনে 'অমৃতবাজার' দেশে আগুন জ্বালাইতেছে দেখিয়া, লর্ড ল্যান্সডাউন ক্ষিপ্রহস্তে উহা আইনে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। 'অমৃতবাজার' তখন সাপ্তাহিক। এই ক্ষিপ্রতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে না। সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার' আবার এক রাত্রির মধ্যে 'দৈনিক' হইয়া গেল। সমস্ত ভারত, রাজা, প্রজা, সকলেই বিস্মিত হইল। শুনিয়াছি, ভূপালের বেগমের স্বামী নিজে বৈদ্যনাথে ছদ্মবেশে আসিয়া সার লেপেল গ্রিফিনের অত্যাচার হইতে তাঁহাদের রক্ষা করিতে শিশিরবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। 'অমৃতবাজারে'র শাণিত অস্ত্রে লেপেল গ্রিফিন ক্ষত-বিক্ষত হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি প্রার্থনা করে। এ দিকে 'অমৃতবাজারে' প্রচারিত হয় যে, শিশিরবাবু মরণাপন্ন হইয়া, পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করিয়া, বৈদ্যনাথ চলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার জীবনের আশা নাই। চতুর লর্ড ডফরিন তখন গবর্ণর জেনেরেল। তিনি ফাঁদে পড়িলেন। ভাবিলেন, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়া আর কি হইবে? বিশেষতঃ আয়নার ছবি শিশিরকুমারকে পাকড়াও করিবারও জো নাই। লেপেল গ্রিফিনকে সার্টিফিকেট

দিয়া, রাজকার্য্য হইতে অপসৃত করাইয়া দিলেন। মধ্যভারত রক্ষা পাইল। অমনি 'অমৃত-বাজারে' প্রচারিত হইল—'ষষ্ঠীর বাছা' শিশিরকুমার আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। শিশিরকুমারের এরূপ কত অক্ষয় কীর্ত্তি ভারতের অঙ্কে অঙ্কে অমর অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাঁহার প্রধান বল স্বদেশ-প্রেম এবং প্রধান অস্ত্র বিদ্রূপ এবং কূট-নীতিজ্ঞতা। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হাঁ করিতেই শিশির তাঁহার পেটের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন। তাঁহার শাণিত বিদ্রূপাস্ত্রের প্রত্যাঘাত করিতে পারে, এমন মহারথী এই পৃথিবীতে নাই। একবার স্মরণ হয়, 'ইংলিশম্যান' লিখিলেন যে, লেপেল গ্রিফিনের 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র কথা গ্রাহ্য না করিয়া, উহার দ্বারা তাঁহার চুরুট জ্বালান উচিত। 'অমৃত-বাজার' অমনি কুচ করিয়া ছুরি বসাইয়া লিখিল,—"যখন দিয়াশলাই এত সস্তা, তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' দিয়া গাধা ভিন্ন মানুষে চুরুট জ্বালাইবে কেন? আর আমরা যদি বলি, 'ইংলিশম্যান'কে 'Bed-Sheet' বিছানার চাদর করা উচিত!" বিছানার চাদর!' উচ্চ হাসি হাসিয়া 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক রবার্ট নাইট বলিলেন—"বা! অমৃত-বাজার!" দেশসুদ্ধ লোক ইংলিশম্যানের দিকে চাহিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। 'ইংলিশম্যান' আর একদিন লিখিলেন যে, "গবর্ণমেণ্ট অনর্থক বাঙ্গালার পানীয় জলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালীরা (Ditch water) গড় খন্দকের জলই ভালবাসে।" 'অমৃতবাজার' অমনি চাবুক কষিয়া লিখিল—"ঠিক কথা! বাঙ্গালীরা বলে যে, গড়ের জল 'বিয়ার' অপেক্ষা ভাল। আবার রবার্ট নাইট হো হো হাসিয়া বলিলেন—"সাবাস! অমৃত-বাজার!"

বলিয়াছি, উভয় ভ্রাতাই খর্ব্বাকৃতি। বিধাতার কিরূপ নির্ব্বন্ধ জানি না। এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রধান তিন ব্যক্তি ছিলেন, তিন জনেই কদাকার,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, এবং প্যারীচরণ সরকার। আর এ সময়ে বঙ্গের বরপুত্রেরা সকলেই খর্ব্বাকৃতি—শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ইহাঁদের মধ্যে আর একটি সাদৃশ্য—তাঁহাদের Simple life, বিলাসশূন্য জীবন। যতীন্দ্রমোহন রাজ-প্রাসাদবাসী হইলেও যে কক্ষে সমস্ত দিবস অতিবাহিত করেন, তাহাতে একখানি পুরাতন 'সোফা', কয়েকখানি চেয়ার ও একটি শ্বেত প্রস্তরের টেবিল মাত্র আছে। গুরুদাসবাবুর কক্ষ-সজ্জাও তদ্রূপ। তাঁহার সমস্ত পরিবার এই বিংশতি শতাব্দীতেও খড়ম ব্যবহার করেন। সমস্ত অট্টালিকা খড়মের খট্ খট্ শব্দে মুখরিত। ইহাঁদের সকলের আহারও তদ্রূপ অতি সামান্য। তবে গুরুদাসবাবুর, কি মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সকলই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুরেন্দ্রবাবুর মত শিশিরবাবুদেরও সে দিকে দৃষ্টি নাই। কলিকাতার উত্তর প্রান্তে বাগ-বাজারে ইহাঁদের এক বৃহৎ চকমিলান দ্বিতল বাড়ী। গৃহখানির বোধ হয়, এক শতাব্দী সংস্কার হয় নাই। তাহার বাহিরের মহলে উপরে নীচে সর্ব্বত্র ছাপাখানার সুদৃশ্য উপকরণ, যদৃচ্ছা ছড়ান রহিয়াছে। সমস্ত স্থান ময়লা, নোঙ্গরা ও আবর্জ্জনাপূর্ণ। সিঁড়িটি একে সংকীর্ণ, তাহাতে স্থানে স্থানে ভগ্ন। কি গৃহের, কি সিঁড়ির সঙ্গে বহু বৎসর সম্মার্জনীর সাক্ষাৎ হয় নাই। বারান্দায় একখানি ময়লা ক্ষুদ্র ক্যাম্প টেবিল, তাহার এক পার্শ্বে একখানি ভগ্ন চেয়ারে অমিতবিক্রম ইংরাজরাজ্যের হৃৎকম্পকারী খর্ব্বাকৃতি মতিলাল ঘোষ দুই জানুর মধ্যে মুখ রাখিয়া বসিয়া আছেন, এবং নিকৃষ্ট কাগজে পেন্সিল দিয়া রাজনৈতিক ব্রহ্মাস্ত্র-সকল রচনা করিতেছেন। পরিচ্ছদ এক ময়লা মোটা লালপেড়ে সামান্য ধুতি, এবং বোতাম-শূন্য এক সাদা ময়লা পিরান। তাঁহার সম্মুখে টেবিলের অপর দিকে একখানি সামান্য বেঞ্চ, এবং বাম পার্শ্বে আর একখানি পুরাতন 'ছারপোকার আশ্রম' চেয়ার। তাহার এক হস্ত পলাশির যুদ্ধের সময় উড়িয়া গিয়াছে। টেবিলের অপর দিকে ময়লা দেয়াল। তাহাতে যে কখন চূণ পড়িয়াছিল, তুমি হলপ করিয়া বলিতে পারিবে না। এই সম্পাদকীয় পীঠস্থানের

পার্শ্বেই মুখপ্রক্ষালনের স্থান ও সেখানে গাড়ু গামছা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক উপকরণসকল তোমার নয়ন রঞ্জন করিতেছে। উক্ত দেয়ালের অপর দিকে এক বৃহৎ কক্ষ বা 'হল'। তাহার দেয়াল ও ছাদ—কে বলিবে, কত যুগের ময়লায় ও ঝুলে, নিষ্ঠীবনে ও কালিতে রঞ্জিত। কক্ষব্যাপী ফরাস বিছানা। তাহাতে এক চাদর ও এক পার্শ্বে গোটা দুই ক্ষুদ্র তাকিয়া। ইহারাও গৃহপ্রাচীরের মত বিবিধ ময়লা দাগে দাগীকৃত। তাহারা যেন বলিতেছে—

"এমনি বিবিধ দাগে দেগেছে কপাল,
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল।"

বাস্তবিকই চাদর ও তাকিয়া শপথ করিয়া বলিতে পারে যে, তাহারা রজক-জাতীয়ের কাছে কখনও ঋণী হয় নাই। ভারতবর্ষের এমন বড় লোক নাই, যার পদধূলি ও গাত্রগন্ধ এই চাদরে ও তাকিয়ায় নাই। উহারা লর্ড কর্জ্জনের 'কর্জ্জন মেমোরিয়েলে' বা 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল' হলে স্থান পাইবার যোগ্য। এই ত ভায়াদের সদর। শুনিয়াছি, অন্দরের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাহার পশ্চাতে যে পুষ্করিণী আছে, শুনিয়াছি— কলিকাতার হেল্‌থ অফিসার নাকি উহা সমস্ত বঙ্গের ম্যালেরিয়া উৎপাদক মশকের খাসমহল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। শিশিরবাবুর বৈদ্যনাথের বাড়ীর অবস্থাও এইরূপ। অতিরিক্ত—

"ফুলের এ মালা, ফুলের এ ডালা, সেজ বিছাইনু ফুলে।"

এখানে বসিবার আসন, বিছানার চাদর, কপাটের শার্শি, সকলই খবরের কাগজ। এখানে বাস্তবিকই 'ইংলিশম্যান' শয্যার চাদর (Bedsheet)। শুনিয়াছি, 'অমৃতবাজার' যখন বোর্ডের মেম্বর বিম্‌স্ (Beams) সাহেবের কীর্ত্তিকলাপ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, সে সময়ে বিম্‌স্ একবার বৈদ্যনাথে কি কার্য্য উপলক্ষ্যে গিয়াছিলেন। একজন ক্ষুদ্রকায় অস্থিরচর্ম্মসার ব্যক্তি এক অপূর্ব্ব টাট্টু চড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহার পরিধান ময়লা সামান্য ধুতি, মোজাশূন্য পায়ে ছেঁড়া বুট, গায়ে বোতামশূন্য ময়লা সাদা পিরান, এবং মস্তকে এক প্রকাণ্ড 'সোলা হেট'। একটি বালক টাট্টুকে দড়ি ধরিয়া টানিয়া লইতেছে এবং সময়ে সময়ে অশ্বারোহী তাহাকে এক মোটা বাঁশের লাঠির দ্বারা প্রহার করিয়া বালকের সাহায্য করিতেছেন। বিম্‌স্ হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া এই প্রয়াণ দেখিতে লাগিলেন, এবং সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই বিচিত্র টাট্টুবাহী লোকটি কে? সে বলিল—"অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ।" বিম্‌স্ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—O is that the Vagabond!—এই সে হতভাগা?

এই ত আকৃতি, পরিচ্ছদ, ও গৃহের অবস্থা, কিন্তু দুই ভাই মুখ খুলিবামাত্র তুমি বুঝিবে যে, এই মতির জুড়ি ভারত খুঁজিয়া পাইবে না। আর শিশিরকুমারের প্রতিযোগী পৃথিবীতেও বিরল। ইহাঁদের রক্তে স্বদেশ-প্রেম এত প্রবল যে, ইহাঁদের একটি ভাই 'মাতৃভূমির কিছুই করিতে পারিলাম না'—এই কয়েকটি কথা এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। ইহাঁদের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে, বর্ত্তমান সময়ে শ্রীচৈতন্য-প্রেমে উদ্বেলিত। এই উভয় প্রেমে উভয়েরই চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। ইহাঁদের মত এমন স্বদেশাভিজ্ঞতা আর কাহারও নাই। সুরেন্দ্রবাবু কলিকাতাবাসী; দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই জানেন না। তিনি তাহার উপর অসাবধান ও হঠকারী (indiscreet and impulsive)। ইহাঁরা সাবধান, স্থিরবুদ্ধি ও চতুর। মোটের উপর দুটি ভাই, বিশেষতঃ শিশিরবাবু অদ্বিতীয় ক্ষণজন্মা পুরুষ। কিন্তু শ্রীভগবান্ এত গুণে, এমন 'অমৃতে'ও এক বিন্দু বিষ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন,—উহা গুরুতর আত্মাভিমান। ইহাঁরা দেশের কাহাকেও মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করেন না। মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূলমন্ত্র—'এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নাই, এবং মহম্মদ তাঁহার পয়গম্বর।' ইহাঁদেরও বীজমন্ত্র, এক শিশিরবাবু ভিন্ন মানুষ নাই, এবং মতি ভায়া তাঁহার 'পয়গম্বর'। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী,—উভয় রাজ-

নৈতিক ক্ষেত্রে ও 'প্রেসে'। তাঁহারা তাঁহাকে দ্ চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন যে, সুরেন্দ্র হঠকারিতা ও তাঁহার অসাবধান বাগ্মিতায় দেশের ঘোরতর অনিষ্ট করিতেছেন। তাহা কতক পরিমাণে সত্য হইলেও, 'অমৃতবাজার' তাঁহাকে যেরূপ ভাবে সময়ে অসময়ে আক্রমণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের কলঙ্ক ও প্রতিপত্তির অপচয় হয় মাত্র। দেশেরও ঘোরতর অনিষ্ট হয়। সম্মুখে কলিকাতার 'কংগ্রেস'। এ সময়ে 'অমৃতবাজার' ও 'বেঙ্গলী'র পরস্পর বিদ্বেষ এত দূর গড়াইয়াছে যে, 'অমৃতবাজার' সুরেন্দ্রবাবুকে traitor (বিশ্বাসঘাতক) বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিদ্বেষে কলিকাতা নগর টলটলায়মান। অথচ উভয়ে আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মতিবাবু আমাকে বলেন—"নবীন! এবার সুরেন্দ্রের দোষে কলিকাতায় কংগ্রেস হইবে না। টাকা মোটেই উঠে নাই। তুমি যেমন এই মাথাভাঙ্গা সুরেন্দ্রকে চালাইতেছ, আর কেহ তেমন পারে নাই। তুমি তাহার কাছে আমাদের খুব নিন্দা করিও, এবং যেরূপে পার, তাহাকে হাতে রাখিয়া, এবার কংগ্রেসটি যাহাতে হইতে পারে, তাহার চেষ্টা কর। তুমি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা এ কাজ হইবে না।" সুরেন্দ্রবাবুর কাছে গেলে তিনি বলেন—"নবীনবাবু! মতি ঘোষ কেবল আমাকে হিংসা করিয়া এবার কংগ্রেসটি হইতে দিবে না। আমি টাকার জন্য কোনও চিন্তা করি না। কেবল তাহার দলাদলির ভয় করি। আপনি তাহার কাছে আমার খুব নিন্দা করিবেন, এবং যাহাতে তাহাকে হাতে রাখিতে পারেন, চেষ্টা করিবেন।" একদিন মতি ভায়ার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কলেজে থাকিতে এক সন্ধ্যায় বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার রচিত 'বুঝলে কি না?' প্রহসনের অভিনয় দেখিতে যাই। অভিনয়ের আরম্ভের অপেক্ষায় তাঁহার কক্ষে আমি বসিয়া আছি। একটি ভদ্রলোক সাহিত্য বিষয়ক আলাপে তাঁহার কাছে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচিত "অয়ি সুখময়ী ঊষে! কে তোমারে নিরমিল" গানটির অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। যতীন্দ্রমোহন,—তখন তিনি বাবু,—গানটির সমস্ত পদ শুনিতে চাহিলে, আমি উহা মুখস্থ আওড়াইলাম। তিনি গানের রচনার ও আমার আবৃত্তির অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। পরে আমার বাড়ী চট্টগ্রাম, সমুদ্র পার হইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াছি শুনিয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং আমাকে বড়ই আদর করিলেন। এমন কি, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা করিতে বলিলেন। তাহার পর এই প্রথম দেখা। এবারও বড় আদর করিলেন। কথায় কথায় একজন ডেপুটি উপরিস্থ মাজিস্ট্রেটের ভয়ে কিরূপে তাঁহার কতকগুলিন লোককে অকারণে কয়েদ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া ডেপুটিদের খুব নিন্দা করিলেন। আমি বলিলাম,—"দোষ কাহার? ডেপুটিদের, না দেশের তাঁহার মত নেতাদের? আগে ডেপুটি কেহ মাজিস্ট্রেটের কুদৃষ্টিতে পড়িলে দেশের নেতা কৃষ্ণদাস পাল, বিদ্যাসাগর ও তিনি রক্ষা করিতে পারিতেন। এখন কৃষ্ণদাস ও বিদ্যাসাগর নাই। যাহা তিনি আছেন, তিনিও উপাধিশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া দেশের নেতৃত্বচ্যুত হইতেছেন। সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অপেক্ষা বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর দেশের পক্ষে শ্রেষ্ঠতর নেতা ছিলেন। এখন তিনি একজন এসিস্টেণ্ট মাজিস্ট্রেটের ভয়েও ভীত। কোনও ডেপুটি বিপদাপন্ন হইলে এখন দেশের কাহারও কাছে কোনও সাহায্য পায় না। অতএব তাহারা মাজিস্ট্রেটের ইচ্ছামতে বিচার করিবে, তাহাতে তাহাদের দোষ কি? মাজিস্ট্রেটের একটা গুপ্ত মন্তব্য বা ডিঃ ওঃ চিঠিতে তাহার সর্ব্বনাশ হয়।" তিনি আমার এই তীব্র আক্রমণের সত্যতা যেন মর্ম্মস্থলে অনুভব করিলেন। বলিলেন—"নবীনবাবু! কি করিব? এখন আমাদিগকে কে মানে? আমি বৃদ্ধ, এখন আমার কার্য্যশক্তিও তেমন নাই।" আমি বলিলাম যে, তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া দেশের নেতৃত্ব ছাড়িয়া দেন, কাজেই তাহা অন্য লোকের হাতে গিয়া পড়িবে। তাহা হইলে দেশের লোক তাঁহাকে আর মানিবে কেন? তিনি নেতৃত্ব আবার গ্রহণ করিলে, সকলে আসিয়া তাঁহার

পতাকা-ছায়ায় তাঁহার পশ্চাৎ দাঁড়াইবে। মতিবাবুও তাহাই বলিলেন। তখন তিনি আমাকে অন্য এক দিন তাঁহার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কক্ষের বাহিরে আসিবা মাত্র মতি ভায়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—"তুমি আজ যে কাজ করিলে, তাহার মূল্য নাই। তুমি যে ইহাঁর হৃদয় এরূপে স্পর্শ করিতে পারিবে, আমি কখনও মনে করি নাই। তুমি আবার আসিবে, এবং এরূপে তাঁহাকে দাঁড় করাইতে পারিলে, দেশের একটি অভূতপূর্ব্ব মঙ্গল সাধন করিবে।"

আমি ইহাঁদের সকলেরই মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিলাম, সেই রাজস্থানের উপাখ্যান—"আগর তোমারা নাম জয় সিং হ্যায়, মেরা নাম ভি অভয় সিংহ।" যেই আত্মাভিমানে ভারতের এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে, সেই 'হামবড়া' অভিমানই এই দলাদলির মূল। তাঁহার অনুরোধ-মতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া, বরাবর এই ভাবে আলাপ করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার মন ক্রমশঃ আরও নরম হইল। আমি 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিলাম। তাহার নাম দিয়াছিলাম—"The politics of the future—a rising shadow." তাহাতে উপরোক্ত আত্মাভিমানের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের যে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বুঝাইয়া দলপতিদের প্রতি কিঞ্চিৎ কঠোর অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। তাহার পর কিরূপে তাঁহাদের সম্মিলন হইতে পারে, তাহা বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নব্য নেতাদের সম্মিলন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। নবীনের উৎসাহ ও কার্য্যকারিতা প্রবীণের পক্ষে প্রয়োজন, তেমনি প্রাচীনের ও ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি, বিজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা নবীন নেতাদের পক্ষে প্রয়োজন। নবীনেরা প্রবীণের পদধূলি মস্তকে লইয়া, তাঁহাদের অভিমতমতে কার্য্য করিলে, এবং প্রাচীনেরা নবীনদের মস্তকে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া, তাহাদের চালাইলে, উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে উহা যেরূপ সম্মানের এবং দেশের পক্ষে যেরূপ মঙ্গলকর হইবে, তাঁহাদের পরস্পর বিদ্বেষের ফলে তাহার বিপরীত ফল ফলিতেছে। নবীনদের কোনও কার্য্য প্রাচীনেরা যদি দূষণীয় বলিয়া বুঝাইয়া দেন, নবীনেরা তাহা ত্যাগ করিলে, এবং প্রাচীনেরাও ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত না হইয়া নবীনদের সস্নেহে গ্রহণ করিলে, এবং তাঁহাদের কোনও কার্য্য অনিষ্টকর বলিয়া নবীনেরা বুঝাইয়া দিলে, তাহা ত্যাগ করিলে, উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলন সহজে সাধিত হইতে পারে। ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি এবং তাহার উদীয়মান ছায়া দেখাইয়া আমি প্রবন্ধাবলীর উপসংহার করি।

প্রথম প্রবন্ধটি নরেন্দ্রবাবুর কাছে আলিপুর আফিস হইতে শেষ বেলায় বড় গোপনভাবে পাঠাইয়া, পরদিন প্রাতে আমি কি প্রয়োজনবশতঃ 'বেঙ্গলী' আফিসে, আলিপুর যাইবার পথে সুরেন্দ্রবাবুর কাছে যাই। অন্যান্য কথার পর তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরার' খুলিয়া বড় মনো-নিবেশপূর্ব্বক কি পড়িলেন, এবং হাসিয়া বলিলেন—"I see here the Roman hand of a friend of mine.' কাগজখানি তাঁহার সবএডিটারকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"বল দেখি, এ প্রবন্ধ কাহার লেখা?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, উহা নিশ্চয় আমারই লেখা। দেখিলাম, উহা আমারই সেই প্রথম প্রবন্ধ। নরেন্দ্রবাবু যে উহা তৎক্ষণাৎ ছাপিবেন, এবং দলপতিদের প্রতি এরূপ তীব্র আক্রমণ মোটেই ছাপিবেন, আমি তাহা মনে করি নাই। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আমি গালি খাইয়া এমন সুখী আর কখনও হই নাই। আপনি আমাকে আরও গালি দিয়া, 'অমৃতবাজার'কে হাতে রাখিতে চেষ্টা করুন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, প্রবন্ধকারের নাম নাই। আমার ঘাড়ে উহা চাপাইবার কোনও কারণ নাই। তিনি বলিলেন—বঙ্গদেশে কেবল একজন মাত্র লোক আছে, যে এরূপ প্রবন্ধ লিখিতে পারে। সেই দিনই সন্ধ্যার সময়ে মতিবাবু সেই 'ইণ্ডিয়ান মিরার' বগলে করিয়া আমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাকে মারিতেই চাহেন। তিনি বলিলেন—"এ প্রবন্ধ তোমারই লেখা। আর তুমি আমাদের এরূপ গালি দিয়াছ এবং সুরেন্দ্রকে বাড়াইয়াছ। এখন বুঝা গেল, তুমি

আমাদের অপেক্ষা সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যেকে বেশী ভালবাস।" আমি বলিলাম—"কি বিপদ্! প্রবন্ধলেখকের নাম নাই। সুরেন্দ্র বলেন, আমি তাঁহাকে গালি দিয়াছি; তুমি বল, আমি তোমাকে গালি দিয়াছি, সুরেন্দ্রকে বাড়াইয়াছি। কেন দাদা! যে কাজটা করিতেছ, তাহাতে দুঃখ অনুভব কর না, কেবল কাজটার কথা অন্যে বলিলেই কি পিঠে এমন চাবুক লাগে?" তখন তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি এ প্রবন্ধটি লিখিয়া বড় ভাল করিয়াছ। এরূপ আরও লেখ, এবং আমাদিগকে আরও গালি দিয়া, সুরেন্দ্র বাঁড়ুয্যাটাকে হাতে রাখিতে চেষ্টা কর।" পরদিন প্রাতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রাইভেট সেক্রেটারির এক পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—

"The correspondence I shrewdly guess must have come from your able pen. The Maharaja Bahadur thought that it was evidently written by one who knows what is what. It is certainly a very fair and able exposition of the present state of the political horizon."

দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, মহারাজা এবার নিজে লিখিলেন,—

"I have read both your letters on "The Politics of the Future" and I found them very interesting. You take a most sensible and thoughtful view of our present political prospects and I wish there were a good many others who would see the question in the same light."

একদিন রাজা প্যারীমোহন আমার সঙ্গে আলিপুর আফিসে সাক্ষাৎ করিয়া, এ সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধে অনেক ক্ষণ আলোচনা করিলেন, এবং বলিলেন, আমার প্রবন্ধমতে কার্য্য হইলে বঙ্গের ভূম্যধিকারীদের 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা' কংগ্রেসে যোগ দিতে কিছুমাত্র আপত্তি করিবে না। একদিন রাজা বিনয়কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ডেপুটির খাটনি খাটিয়া, এত কাব্য লিখিতে, এবং তাহার উপর এত সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লিখিতে কেমন করিয়া সময় পান? শুনিলাম, 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র ঐ প্রবন্ধগুলি আপনার রচিত।" আমি বলিলাম—সে কি কথা? উহা আমার লেখা তাঁহাকে কে বলিল? উহাতে তাঁহার উপরও কিঞ্চিৎ ভ্রূকুটি ছিল। তিনি বলিলেন, প্রবন্ধগুলির বিষয় এত গুরুতর, এবং উহা এরূপ দক্ষতার সহিত লিখিত যে, উহাদের লেখক কে, জানিবার জন্য তাঁহার বড় কুতূহল হইয়াছিল—অনেকেরই হইয়াছে, —কারণ, অনেকে তাঁহার কাছে লেখকের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। অতএব তিনি নরেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এবং তিনি আমার নাম বলিয়াছেন। আমি বলিলাম, নরেন্দ্রবাবুকে আমার নাম গোপন রাখিতে আমি বিশেষরূপে লিখিয়াছিলাম। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিয়া ভাল করেন নাই। কারণ, লেখকের নাম প্রচারিত হইলে, আমি এত ক্ষুদ্র লোক যে প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব ও কার্য্যকারিত্ব থাকিবে না। লাভের মধ্যে আমি তাঁহাদের অপ্রীতিভাজন হইব মাত্র। তিনি বলিলেন যে, নরেন্দ্রবাবু তাঁহাকে বড় গোপনে আমার নাম বলিয়াছেন, তিনি অন্য কাহাকে বলিবেন না। আর নাম প্রকাশ হইলে বরং প্রবন্ধের গুরুত্ব বাড়িবে। তাঁহার চক্ষে বাড়িয়াছে এবং আমি অপ্রীতিভাজন না হইয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছি। তাঁহাকে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাতে বরং তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

তাহার পর আমি চুপে চুপে একদিন মতি ও সরেন্দ্রবাবুকে আমার গৃহে সান্ধ্য আহারের নিমন্ত্রণ করিলাম। মতিবাবু অগ্রে আসিলে, আমি তাঁহাকে Drawing room-এ বা বৈঠক-কক্ষে বসাইয়া বলিলাম যে, তিনি সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি! তুমি সুরেন্দ্রকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছ?" আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—"হাঁ।" তাহার পর তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বুঝাইলাম যে, দেশের ভাল-

মন্দ তাঁহাদের দুটির উপর যেরূপ নির্ভর করিতেছে, এমন আর কাহারও উপর নহে। অতএব তাঁহাদের মধ্যে এরূপ বিদ্বেষভাব কেবল তাঁহাদের কলঙ্ক নহে, উহাতে দেশেরও সর্ব্বনাশ হইতেছে। অথচ উভয়ে দেশের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া শরীরপাত করিতেছেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি নিমন্ত্রিত আছেন জানিলে সুরেন্দ্রবাবু আসিবেন না। আমি বলিলাম, দেখা যাউক। কিছু ক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া পঁহুছিলে, আমি তাঁহার গাড়ীর কাছে গিয়া বলিলাম যে, তিনি মতিবাবুর সাক্ষাৎ পাইবেন, এবং আমার ইচ্ছা যে, সকল বিদ্বেষ ভুলিয়া তিনি তাঁহার সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করিবেন। সুরেন্দ্রবাবুও বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"কি! আপনি মতিবাবুকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন! আমিও যে নিমন্ত্রিত, তিনি বোধ হয় জানিতেন না, জানিলে নিশ্চয় আসিতেন না। যাহা হউক, আপনি দেখিবেন, আমি কিরূপ ব্যবহার করি।" তাঁহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেলে, তিনি মতিবাবুকে দেখিয়াই বলিলেন—"এই যে, মতিবাবু যে!" মতিবাবুও বলিলেন—"এ কি! সুরেন্দ্রবাবু যে!" আমি বলিলাম—দুজনের কোলাকুলি করিতে হইবে। তখন দুজনেই হাসিয়া চিরবন্ধুর মত কোলাকুলি করিলেন, এবং অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম—"হরি হরি বল সবে পালা হ'ল সায়।" তাহার পর উভয়ের দ্বারা এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইলাম। আমি উহা আগে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার মর্ম্ম এই যে, উভয়ের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া মতভেদ হইলে, পরস্পরের প্রতি কটূক্তি না করিয়া, উভয়ে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া, সে বিষয় সরলভাবে আলোচনা করিবেন। তাহাতেও যদি একমত হইতে না পারেন, পরস্পর সরলভাবে আপনার মত এরূপ ভাবে সমর্থন করিবেন, যেন তাহার দ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কোনওরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়। আর কি কি ছিল, এখন মনে নাই। আমি সন্ধিপত্র পড়িয়া শুনাইলাম। উভয়ে হাসিতে হাসিতে উহা দস্তখত করিলেন। তাহার পর আমার পুত্র গাইল; মতি কীর্ত্তন গাইলেন। এক শিশিরবাবু ভিন্ন এমন প্রাণস্পর্শী কীর্ত্তন আর কেহ গাইতে পারে না। তাহার পর আহার করিয়া, নানা বিষয় আলাপ করিতে করিতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত পরম আনন্দে কাটাইয়া, উভয়ে পরম বন্ধুভাবে চলিয়া গেলেন। কেমন করিয়া পরদিন এই কথা কলিকাতায় প্রচারিত হইল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখিলেন—"দুই প্রতিযোগী যোদ্ধা বঙ্গের খ্যাতনামা কবির বাড়ীতে সম্মিলিত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমরা 'পলাশির যুদ্ধে'র অন্য এক সংস্করণের প্রত্যাশায় রহিলাম।" মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রাইভেট সেক্রেটারি লিখিলেন—

"You have done yeoman's service by bringing about reconciliation between the two great men and patriots of our motherland, and all our countrymen ought to be grateful to you. A short notice of this appeared in the 'Hindu Patriot' of yesterday's date. Our friend Mati Babu himself apprised me of the happy event on the morning following the evening it took place, and I immediately brought it to the notice of our Maharaja Bahadur who was rejoiced to hear the information; for you know it was his object too to bring about the consummation so devoutly wished for."

কলিকাতাময় একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। দেখিতে দেখিতে 'বেঙ্গলী' ও 'অমৃত-বাজারে'র সুর ফিরিল। বঙ্গদেশ জুড়াইল।

তাহার পর একদিন অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে আলিপুর হইতে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। কোনও গোপনীয়, কি গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ করিতে

হইলে তিনি এই সময়ে আমাকে যাইতে বলিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি একা থাকিতেন। আমি যাইতেই 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রবন্ধের ও সন্ধির কথা তুলিলেন, এবং আমার উভয় কার্য্যের খুব প্রশংসা করিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক ক্ষণ বিনীতভাবে বুঝাইলাম যে, এরূপে দেশের নেতৃত্ব তিনি স্বেচ্ছায় পরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া, এবং কংগ্রেস হইতে ভূম্যধিকারিগণ দূরে থাকিয়া, তাঁহাদের নিজের গৌরবের হানি করিতেছেন, এবং দেশের প্রভূত অনিষ্ট করিতেছেন। তিনি কিছু ক্ষণ 'বিশেষণে সবিশেষ' বলিয়া, শেষে খুলিয়া বলিলেন যে, যখন নব্য নেতাগণ তাঁহাদের তুচ্ছ করে, তখন তাঁহারা আর কি করিবেন। কংগ্রেসও যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে তাঁহারা যোগ দিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সর্ব্বনাশ করিবেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি সুরেন্দ্রবাবুকে তাঁহার কাছে যদি আনিতে পারি, এবং তাঁহারই দ্বারা তাঁহাকে নেতৃত্বপদে বরণ করাইয়া, তাঁহার অভিপ্রায়মতে ভবিষ্যতে কংগ্রেস ও সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্য চালাইতে প্রতিশ্রুত করাইতে পারি, তবে তিনি সম্মত হইবেন কি না। তিনি তাহার পরিষ্কার উত্তর না দিয়া বলিলেন যে, 'আমি তাহা পারিব না।' 'আচ্ছা দেখা যাউক' বলিয়া আমি বিদায় হইয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতেই আলিপুর যাইবার পথে সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে 'বেঙ্গলী' আফিসে দেখা করিলাম। তিনি তখন প্রত্যহ ১০টার ট্রেনে বারাকপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া, ৪টার ট্রেনে ফিরিয়া যাইতেন। তাঁহাকে বলিলাম যে, তাঁহাকে আমার সঙ্গে মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে যাইতে হইবে। তিনি বলিলেন, তাঁহার কোনও আপত্তি নাই। তবে তিনি শুনিয়াছেন যে, মহারাজা তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। আমি বলিলাম, আমি দায়ী রহিলাম যে, তিনি তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবেন। তখন তিনি যাইতে সম্মত হইলেন। আমি তখন তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বয়সী। নিজে একজন বিচক্ষণ লোক। এত কাল দেশের নেতৃত্ব করিয়াছেন, এবং তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সর্ব্বেসর্ব্বা। অতএব তাঁহাকে মানিয়া চলিতে সুরেন্দ্রবাবুর পক্ষে কোনও মতে অপমানের বিষয় হইতে পারে না। অন্য দিকে বঙ্গের ভূম্যধিকারিগণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া যাওয়াতে কংগ্রেস অর্থবল ও প্রতিপত্তি হারাইতেছে। সুরেন্দ্রবাবু কিরূপ ব্যবহার করিবেন, কি কথা বলিলেন, উভয়ে মিলিয়া তাহা স্থির করিয়া, আমি আলিপুর চলিয়া গেলাম, এবং সেখান হইতে পত্র লিখিয়া, দিন স্থির করিয়া, একদিন ৪টার সময়ে মহারাজার 'প্রাসাদে' উপস্থিত হইলাম। সুরেন্দ্রবাবুকে লইয়া যাইব বলিয়া আমি লিখি নাই। কারণ, সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ লোক, তিনি সত্যই যে যাইবেন, আমার বিশ্বাস ছিল না। কেবল কোনও গোপনীয় পরামর্শের জন্য মহারাজাকে কোন্ সময়ে নিশ্চয় একক পাইব, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলাম। সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যখন আমি কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তিনি প্রথম বিস্মিত হইয়া, আমার দিকে চাহিয়া একটুক হাসিলেন। তাহার পর সুরেন্দ্রবাবুকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। যতীন্দ্রমোহন প্রকৃত জ্যোতির ইন্দ্র—একখণ্ড অমূল্য হীরক। তিনি যৌবনে মাইকেলের বন্ধু এবং নিজে বাঙ্গালা সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার মাৰ্জ্জিত শিক্ষা, মাৰ্জ্জিত রুচি এবং মাৰ্জ্জিত ও শাণিত বুদ্ধি। এই বুদ্ধিবলেই ইনি বাবু যতীন্দ্রমোহন হইতে আজ স্যার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন হইয়াছেন। অনেক উপাধিধারীদের মত তিনি কেবল খোসামুদির দ্বারা বিলাতি বুটের পূজা করিয়া, কিম্বা অর্থের দ্বারা যথামূল্যে কিনিয়া উপাধি লন নাই। ক্ষুদ্র অবয়বটিতে ঈশ্বর অসাধারণ চতুরতা, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, এবং চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথও বঙ্গের আর একটি অমূল্য রত্ন। বঙ্গের এই দুই বরপুত্রের আলাপ আমি নীরবে শুনিতে লাগিলাম। মহারাজ দুখানি চেয়ার তাঁহার সম্মুখে আনিয়া আমাদের বসিবার স্থান দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠিক তাঁহার সম্মুখে, আমি উভয়ের উত্তর পার্শ্বে। প্রথম—

'পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পূরিয়া' হইতে লাগিল। উভয়ে দূরে দূরে; এ আলাপ চতুরে চতুরে। উভয়ে সাবধান, কেহ কাহাকে ধরা দিতেছেন না। ক্রমে পুরাতন কথা উঠিল; ক্রমে সিন্ধুমন্থনে বিষ উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ indiscretion (অসাবধনতা) বশতঃ কি একটা অপ্রিয় কথা বলিলেন। মহারাজা অমনি চতুরতার সহিত প্রতি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। আমি দেখিলাম—শ্রাদ্ধ গড়ায়। মহারাজাও আমার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে সেই ভাব দেখাইলেন। আমি তখনই সুরেন্দ্রবাবুকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিলাম—"সুরেন্দ্রবাবু! সে কথায় প্রয়োজন কি? যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর এখন কাহারও হাত নাই। এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, তাহা মহারাজার কাছে উপদেশ গ্রহণ করুন ও তাঁহার উপর সমস্ত ভবিষ্যৎ ভার সমর্পণ করুন।" সুরেন্দ্রবাবু তখন বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, শিশুবৎ মহারাজার করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আপনি এখন হইতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করুন। উহা আপনারই উপযোগী মহাব্রত। আমরা দ্বিরুক্তি না করিয়া আপনার আদেশমতে চলিব, এবং কংগ্রেসের সমস্ত কার্য্য চালাইব।" এখন মহারাজা বড় প্রীতি হইলেন, এবং সরল অন্তঃকরণে কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত হইলেন। তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা কংগ্রেস যোগ দিতে পারিতেছেন না। কারণ, কংগ্রেস অস্ত্র আইনে ও সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় হাত দেওয়াতে কংগ্রেসের উপর গবর্ণমেণ্ট খড়্গহস্ত। তাঁহারা যোগ দিলে তাঁহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব প্রথম গবর্ণমেণ্টের এই বিরাগ কৌশলে অপনয়ন করিয়া, বাতাস ফিরাইতে হইবে। তিনি 'ভাইস্রয়ে'র সঙ্গে শীঘ্র সাক্ষাৎ করিবেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, কংগ্রেসে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বিরাগভয়ে যোগ না দিয়া, দেশের নেতৃত্ব হারাইতেছেন, এবং যাঁহাদের গবর্ণমেণ্ট অবিশ্বাস করেন, উহা তাঁহাদের হাতে যাইতেছে। ইহাতে দেশের ও গবর্ণমেণ্টের, উভয়ের ঘোরতর ক্ষতি হইতেছে। অতএব কংগ্রেসের কোন্ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্ট খুলিয়া বলিলে, তাঁহারা সে কার্য্য কংগ্রেসের দ্বারা পরিত্যক্ত করাইয়া, তাহাতে যোগদান করিলে, তাঁহারা আপনার সম্মান ও স্থান রক্ষা করিতে পারিবেন, এবং যথাসাধ্য গবর্ণমেণ্টের যাহাতে অপ্রীতি না হয়, এরূপ ভাবে কংগ্রেস ও দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত করিবেন। এক বৎসরকাল এরূপভাবে চেষ্টা করিয়া, গবর্ণমেণ্টের মতি-গতি ফিরাইয়া, আগামী বৎসর হইতে তাঁহারা দলে বলে কংগ্রেসে যোগদান করিবেন। এ বৎসর তাঁহারা যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিবেন। সুরেন্দ্রবাবু আনন্দে অধীর হইয়া রাত্রি সাতটার সময় বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতেছি, মহারাজা আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমি অসাধ্য সাধন করিয়াছি। আমি যে এই 'মাথাভাঙ্গা'টিকে এরূপ চালাইতে পারিব, তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন না। তিনি অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং আমাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলেন। ফিরিয়া যাইতে পথে তাঁহার গৃহীত পুত্র মহারাজ-কুমার প্রদ্যোৎকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—O Sir! you have done wonders. You have saved Congress! (আপনি আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন। আপনি কংগ্রেসকে রক্ষা করিয়াছেন)। যেমন পিতা, তেমনি, পুত্র। ইনি যুবক, পিতার মত খর্ব্বাকৃতি ও গৌরবর্ণ। তেমনি চতুর, তেমনি বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত, সুরুচি ও শিষ্টাচার সম্পন্ন। তিনি সকল বিষয়েই পিতার হাতের গড়া পুতুল, এবং এই বয়সেই পিতার মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সম্পাদক-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। আমি তাঁহাকে ছাড়াইয়া গিয়া দেখি, সুরেন্দ্রবাবু গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি আমাকে আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"নবীনবাবু! আমি কেমন ভাল ব্যবহার করিয়াছি ত?

মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়াছেন কি?" আমি বলিলাম—"আপনি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিবেন, আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম না। মহারাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভরসা করি, আপনিও সন্তুষ্ট হইয়াছেন।" গাড়ীতে উঠিয়া, তাঁহার পার্শ্বে আমাকে বড় আদরে বসাইয়া, এবং হাতে হাত লইয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! আপনি যে আজ কংগ্রেসের ও দেশের কি উপকার করিলেন, আমি তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা পাইতেছি না। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন টেগোর আমার প্রতি এরূপ সদ্ব্যবহার করিবেন। আমি বড় ভয়ে ভয়ে কেবল আপনার কথার উপর নির্ভর করিয়া আসিয়াছিলাম।" সমস্ত পথ মহা আনন্দের সহিত এই বিষয় আলোচনা করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি আমাকে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত লইয়া গেলেন, এবং যতক্ষণ ট্রেন না ছাড়িল, ততক্ষণ এই কথা আলাপ করিলেন, এবং আমি আজ যে কাজ করিয়াছি, তাহার জন্য ধন্যবাদের উপর ধন্যবাদ দিলেন। পরদিন প্যারীমোহন, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা'র দ্বিতীয় নেতা আমাকে লিখিলেন যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তিনি সেই মাত্র সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন, এবং আমার সমস্ত কার্য্যকলাপ তাঁহার মুখে শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছেন। তিনিও লিখিয়াছেন যে, আমি অসাধ্য সাধন করিয়াছি, এবং এরূপ ভাবে যদি আমার প্রবর্ত্তিত প্রণালীমতে দেশের রাজনীতি (politics) পরিচালিত হয়, তবে দেশে একটা যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

বলা বাহুল্য যে, যতীন্দ্রমোহন স্বয়ং এক হাজার এবং তাঁহার দলস্থ অন্যান্য জমিদারেরাও কংগ্রেসে যথেষ্ট চাঁদা দিলেন। কলিকাতায় সে বৎসরের কংগ্রেস খুব আড়ম্বরের সহিত নির্ব্বাহিত হইল। এক ঘণ্টার জন্য হইলেও একবার কংগ্রেস দেখিতে সুরেন্দ্রবাবু আমাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমাকে এমন স্থানে বসাইবেন যে, পুলিশ 'ডিটেক্‌টিভে'রাও আমাকে দেখিতে পাইবে না। সে সৌভাগ্য আমার হইলই না। একদিন সভাভঙ্গের পর কেবল সাজসজ্জা দেখিতে গিয়াছিলাম, তাহাতেও শুনিলাম, আমার নাম 'ডিটেকটিভে'র গুপ্ত রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে। একজন ডেপুটি বলিলেন যে, আমি বড় বিপদে পড়িব। গবর্ণমেণ্ট টের পাইয়াছেন যে, এবারকার কলিকাতার কংগ্রেসের আমি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলাম। বৈদ্যনাথ হইতে শিশিরবাবু লিখিলেন—"নবীন! তুমি কলিকাতায় না থাকিলে দলাদলির দরুন এবার কংগ্রেস হইত না। তুমি কলিকাতায় থাকিলে দেশের এরূপ গুরুতর মঙ্গল সাধিত হইবে। কিন্তু তোমার বড় সঙ্কটের অবস্থা। এ সকল কথা গবর্ণমেণ্ট টের পাইলে তোমার বড় সর্ব্বনাশ করিবে। অতএব তোমার আর বেশী দিন কলিকাতায় থাকা আমি নিরাপদ মনে করি না। অথচ এই দলাদলি হইতে দেশ রক্ষা করিতে তোমার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি কলিকাতায় নাই।" আমার বিপদ সম্বন্ধে ইহাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক হইল। তাহা স্থানান্তরে বলিব।

কটন অভ্যর্থনা

কটন সাহেব ছুটি লইয়া যাইতেছেন। তাহার পর তিনি কিছু দিন ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারির কার্য্য করিয়া, আসামের চিফ কমিশনর হইবেন। একদিন প্রাতে বন্ধু শ্যামাধব বলিলেন—"কটন সাহেবকে একটা Farewell entertainment (বিদায় উৎসব) দিতে হইবে। তোমার সঙ্গে রাজা মহারাজাদের যেরূপ প্রতিপত্তি, আমার সেরূপ নাই। তোমাকে ইহার ভার লইতে হইবে। এমন সর্ব্বজনপ্রিয় চিফ সেক্রেটারি আর হয় নাই, হইবে না।" আমি যদিও নিজে কখনও কটন সাহেবের অধীনে চাকরি করি নাই, তথাপি তাঁহার সহিত আমার প্রথম দর্শন অবধি তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। সে দিন মাত্র মাজিষ্ট্রেট-মিশনারির গ্রাস হইতে তিনি আমাকে রক্ষা করিয়া প্রমোশন দিয়াছেন। অতএব তাঁহার

কাছে আমি বিশেষ ঋণী। আমি কটন সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার মনোভাব বুঝিলাম। তাহার পর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন, রাজা বিনয়কৃষ্ণ ও রঙ্গপুরের মহারাজা গোবিন্দলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, একটি বৃহৎ Demonstration (সম্মান প্রদর্শনের) প্রস্তাব করিলাম। তাঁহারাও কটন সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, এবং আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ইহার প্রধান কারণ, সকলের ধারণা ছিল যে, কটন শীঘ্রই বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর হইবেন। স্থির হইল যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের 'মরকত-কুঞ্জে' একটা Evening Party (সান্ধ্য উৎসব) হইবে। গোবিন্দলাল একাই ৩০০০্ হাজার, কি কত টাকা দিয়াছিলেন। কাজেই অর্থের জন্য আর কিছু অনর্থ করিতে হইল না। কিন্তু ইহাতেও পদে পদে দলাদলি উঠিতে লাগিল। প্রথমতঃ গোবিন্দলাল বলিলেন যে, বাজী পোড়াইতে হইবে। যতীন্দ্রমোহন বলিলেন—"পাড়াগেঁয়ে জমিদার, তাই গোবিন্দলাল বাজী-প্রিয়। Evening Partyতে বাজী পোড়ান নিয়ম নহে।" এই কথা, জানি না—বিনয়কৃষ্ণ, কি অন্য কেহ গোবিন্দলালকে বলিলেন, এবং গোবিন্দলাল একেবারে 'মেরা নাম ভি অভয় সিং, বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন। যাহা হউক, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনকে আমি অনেক বিনয় করিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত করাইলাম। ইতিমধ্যে আমাকে একবার বিশেষ কাজে বিষ্ণুপুর থানায় যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে ফিরিয়া, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে কি এক পূজার নিমন্ত্রণ পাইয়া সেখানে গেলাম। তিনি উপরের তলায় বারাণ্ডায় বসিয়া, নিম্নে প্রাঙ্গণে এক থিয়েটার অভিনয় দেখিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কি নবীন বাবু! আপনাদের কটন-অভ্যর্থনার কি হইল?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"সে কি মহারাজা! আপনিই এই যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। আপনি আমাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহার অর্থ কি?" তিনি একটুক ঈষদ্ হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"না, আমি ত ইহার কোনও খবরই রাখি না।" আমি বুঝিলাম, আবার একটা দলাদলির তরঙ্গ উঠিল। এখানে আরও অন্য লোক বসিয়াছিলেন। অতএব মহারাজ-কুমার কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"প্রদ্যোৎ নীচে আছে। আপনি তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেন।" আমি নীচে গেলাম। প্রদ্যোৎকুমার ও তাঁহার ভাগিনাগণ আমাকে মহা আনন্দে ধরিয়া সেখানে বসাইতে চাহিলেন। আমি বলিলাম—বিশেষ কথা আছে। প্রদ্যোৎকুমার আমাকে হাত ধরিয়া পার্শ্বের এক কক্ষে লইয়া গেলেন। শুনিলাম যে, তাঁহারা 'গ্রেট ইষ্টার্ণে' জলযোগের অর্ডার দিতে চাহেন, এবং 'লবোস্ ব্যাণ্ড' নিযুক্ত করিতে চাহেন। বিনয়কৃষ্ণ পেলিটিকে জলযোগের ভার দিতে, এবং অন্য আর এক দল ব্যাণ্ড নিযুক্ত করিতে চাহেন। একদিকে এই অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাত, অন্য দিকে মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন তাঁহাকে পাড়াগেঁয়ে জমিদার বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন শুনিয়া, গোবিন্দলাল একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। আমি দেখিলাম, সকলই মাটি হইবার উপক্রম, এবং রাজা বিনয়কৃষ্ণই তাহার মূল। আমি পরদিন সন্ধ্যার সময় বিনকৃষ্ণের সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম যে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন তাঁহার পিতার বয়সী লোক। তাঁহার অধীনে নেতৃত্ব করিলে বিনয়কৃষ্ণের পক্ষে কোনও মতে অপমানের কথা হইতে পারে না। বিশেষতঃ কি গবর্ণমেণ্টে, কি দেশে, যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্ব বহু দিন হইতে স্থাপিত। বিনয়কৃষ্ণ এখনও বালক বলিলেও চলে। তিনি যে সেই নেতৃত্ব রহিত করিয়া, আপনার নেতৃত্ব এখনই স্থাপিত করিতে পারিবেন, তাহা অসম্ভব। তাঁহার উচিত, এখন যতীন্দ্র-মোহনের সঙ্গে সকল কার্য্যে যোগ দিয়া নেতৃত্ব শিক্ষা করা ও আপনাকে এরূপ প্রস্তুত করা, যেন যতীন্দ্রমোহন রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইলে, তিনি সই নেতৃত্ব পাইতে পারেন। তিনি আমার কথায় ভিজিলেন। বলিলেন—আমি যাহা করিতে বলিব, তিনি করিবেন। আমি বলিলাম—এখনই যতীন্দ্রমোহনের কাছে গিয়া, সমস্ত কটন-উৎসবের

ভার তাঁহার হস্তে দিতে হইবে। তিনি অনিচ্ছায় সম্মত হইয়া আমার গাড়ীতে চলিলেন। পথে আমাকে বলিলেন—"দেখুন নবীনবাবু! মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মনে মনে সন্দেহ হইয়াছে, তিনি আমার সাক্ষাতে গোবিন্দলালকে কি বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, আমি তাহা গোবিন্দলালকে বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর মনোবাদ সৃষ্টি করিয়াছি। গোবিন্দলাল এত দিন যতীন্দ্রমোহনের হাতের পুতুল ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেই জন্য আমার উপর চটিয়াছেন। আপনি জিদ করিলেন, তাই আমি যাইতেছি। অন্যথা যাইতাম না।" আমি বলিলাম—"আপনি এরূপ চুক্‌লিখোরের কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া যতীন্দ্রমোহনের আপনার প্রতি সন্দেহ হওয়া আপনার পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। আপনাকে একটি কথা আমি বলিব। আমার বিশ্বাস, কলিকাতার নেতৃত্ব আপনার আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যিনি নেতা হইবেন, তাঁহার সকলের বিশ্বাসভাজন হওয়া চাহি। আপনাকে অনেকে বিশ্বাস করে না। অনেকের সন্দেহ যে, আপনি গবর্ণমেণ্টে প্রতিপত্তি স্থাপন করিবার জন্য লোকের নামে চুকলি করেন। অনেকে আমাকে এরূপ বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আপনি কেবল যতীন্দ্রমোহনের জীবিত কালে নহে, কখনও নেতৃত্ব করিতে পারিবেন না।" তিনি কাতরভাবে আমার দুই হাত ধরিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে? আমি তাঁহাকে গ্রাহ্য করি না। তাঁহার অপেক্ষা আপনাকে বেশী সম্মান করি। যতীন্দ্রমোহন কাল মরিলে, পরশু কেহ তাঁহার নাম করিবে না। আপনি অমর। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, এখন হইতে আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া আমি কোনও কাজ করিব না।" আমি বলিলাম—"সে কি কথা! আমার মত দু চার জন কর্ম্মচারী আপনি রাখিতে পারেন। আপনি আমার কাছে কি পরামর্শ চাহিবেন। আপনি শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও চতুর। আমি আপনাকে পরামর্শ দিব, সে শক্তি আমার নাই। আপনি নিজে একটুক সাবধান হইয়া চলিলে, একদিন কলিকাতার নেতৃত্ব করিতে পারিবেন, আমার এরূপ আশা আছে।"

গাড়ী মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের বাড়ী পেঁৗছিলে, আমি ছুটিয়া গিয়া প্রদ্যোৎকুমারকে বলিলাম যে, রাজা বিনয়কৃষ্ণ তাঁহার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বিনয়কৃষ্ণ আসিয়াছেন। আপনি আচ্ছা খেলা খেলিতেছেন।" হাসিয়া আমার পিঠ চাপড়াইয়া, তিনি সমাদরে বিনয়কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পিতা তখনই বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। সন্ধ্যার পরই ফিরিয়া আসিবেন। আমরা একটুক অপেক্ষা করিলে সাক্ষাৎ হইবে। আমরা অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া, বিনয়কৃষ্ণ বলিলেন—"আমি শুনিলাম, মহারাজা কটন-অভ্যর্থনা ব্যাপারে আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। আমি সে জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম। আপনি তাঁহাকে বলিবেন যে, আমি তাঁহাকে আমার পিতার মত সম্মান করি। তিনি এ বিষয়ে আমাকে যেরূপ করিতে বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" চতুরে চতুরে—প্রদ্যোৎকুমার হাসিয়া বলিলেন—"সে কি কথা! বাবাও আপনাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন। তিনি আপনার প্রতি বিরক্ত হইবেন কেন? তিনি এখন একপ্রকার সংসার-ত্যাগী। এ সমস্ত কার্য্য এখন আপনাকেই করিতে হইবে। যাহা হউক, বাবা আসিলে, আমি এ সকল কথা বলিব।" তাহার পর বিনয়কৃষ্ণকে বিদায় দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া রাখিলেন। বিনয়কৃষ্ণ নামিয়া গেলে, আমাকে খুব করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"আপনি যে বিনয়কৃষ্ণকে এরূপে আনিতে পারিবেন, আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই। আপনি বড় কাজ করিয়াছেন। আমরা কলিকাতায় আপনাকে চাহি। এ কাজটি অন্য কাহারও দ্বারা হইতে পারিত না। কটন-অভ্যর্থনা একেবারে মাটি হইত।" আমি বলিলাম—"তবে এখন আর কোন গোলযোগ হইবে না ত? মহারাজাকে সন্তুষ্ট করিবার ভার আমি আপনাকে

দিলাম।” তিনি বলিলেন,—“আচ্ছা, এ ভার আমি লইলাম। আমার বিশ্বাস, বাবা আর কোনও আপত্তি করিবেন না। তবে আপনি কাল একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।” তাহাই করিলাম, এবং এরূপে এ দলাদলির নিবৃত্তি হইল।

কিন্তু কালাচাঁদের অভিমানের তরঙ্গ হইতে নিস্কৃতি পাইয়া, গোরাচাঁদের মান-তরঙ্গে পড়িলাম। সে বড় বিষম। কটন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। আলিপুরের পথে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে, তাঁহার সেই চিরসস্মিত ভাব নাই। তাঁহার মুখ মলিন। তিনি চিন্তাকুল মনে কক্ষে পাদচারণ করিতেছেন। বলিলেন যে, তিনি এই মাত্র লেঃ গবর্ণর মেকেঞ্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছেন। তিনি সার্ভিসের নিয়ম-বহির্ভূত সাধারণ অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া, মেকেঞ্জি তাঁহার উপর ভয়ানক চটিয়াছেন। মেকেঞ্জি বাঙ্গালার লেঃ গবর্ণর হইয়া আসিলেন, অথচ কলিকাতার একটি টিকটিকিও শব্দ করিল না। আর তাঁহার—চিফ সেক্রেটারির এরূপ সম্মান!—তাহা তাঁহার সহ্য হইবে কেন? আমি বলিলাম,—এ যে বিষম সংকট। কারণ, এ দিকে সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। তিনি একটুক চিন্তা করিয়া বলিলেন—“নবীন! আমি এখন ত আর মেকেঞ্জির অধীনস্থ কর্ম্মচারী নহি। আমি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিব কেন? আমি অভ্যর্থনা গ্রহণ করিব। তিনি যাহা করিতে হয় করুন।” অপরাহ্ণে যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন—“নবীনবাবু! ব্যাপার বড় বিষম হইয়া উঠিল। মেকেঞ্জি আমাকে ডাকাইয়া, এই অভ্যর্থনায় যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি পাঁচ বৎসর আমাদের কর্ত্তা থাকিবেন। তাঁহার কথা কিরূপে অবহেলা করিব? অতএব এ অভ্যর্থনায় আমাকে লিপ্ত করিবেন না।” আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। কটনও এ কথা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—“যতীন্দ্রমোহন যোগ না দিলে এ অভ্যর্থনার কোনও মূল্যই থাকিবে না। তাঁহাকে যেরূপে পার, সম্মত করাইতে হইবে।” আমি এই কথা মহারাজাকে বলিলাম, এবং বুঝাইলাম যে, এ সময় তিনি যদি এ উৎসব হইতে সরিয়া পড়েন, তবে কটনকে ঘোরতর অপমান করা হইবে, এবং তাঁহার পক্ষেও উহা কাপুরুষতার কার্য্য বলিয়া লোকে কলঙ্ক করিবে। তিনি কিছু ক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—“আচ্ছা, অভ্যর্থনা আমার মরকত-কুঞ্জে না হইয়া ‘ডেলহাউসী ইন্‌ষ্টিটিউটে’ হউক। আমি কটন সাহেব পঁহুছিবার সময়ে যাইব, এবং তাঁহাকে receive (গ্রহণ) করিয়া, আমি বৃদ্ধ, শরীর অসুস্থ বলিয়া বিদায় লইয়া আসিব। প্রদ্যোৎকুমার আপনার সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। ইহার বেশী আর পারিব না।” কটন ইহাতে সম্মত হইলেন।

উক্ত সুন্দর গৃহ পত্রে, পুষ্পে, পতাকায়, বৈদ্যুতিক আলোক-মালায়, এবং স্থানে স্থানে বরফের ক্রীড়া-পর্ব্বতে সুসজ্জিত হইল। সন্ধ্যা না হইতেই নিমন্ত্রিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। কারণ, কটন সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠিক সময়ে আসিলেন, এবং কলিকাতার অন্যান্য বড়লোক সমভিব্যাহারে কটনকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, মিনিট পাঁচেক থাকিয়া, কটন হইতে উপরোক্ত মতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। গৃহে স্থানে স্থানে সঙ্গীত, ভোজবাজী হইতেছিল। এক প্রশস্ত কক্ষে নানাবিধ জলযোগের ও সুরাযোগের ব্যবস্থা ছিল। লালদীঘির চারি দিকে নানাবিধ বাজী জ্বলিয়া উঠিল, এবং তাহার প্রতিবিম্ব তিমিরাচ্ছন্ন সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নৈশ হিল্লোলে কি সৌন্দর্য্যই প্রকটিত হইল! এক এক বাজীতে আগুন দিলে, তাহার কৌশল ও শোভায় দর্শকগণ করতালি দিতেছিল। দীঘির চারি দিকে সহস্র সহস্র দর্শক সমবেত হইয়াছিল। এই দৃশ্য যে দেখিয়াছে, সে কখনও ভুলিবে না। সকলে একবাক্যে বলিতেছিল যে, কোনও লেঃ গবর্ণর,

কি গবর্ণর জেনারেলও এরূপ অভ্যর্থনা পান নাই। মহারাজা, গোবিন্দলাল ও বিনয়কৃষ্ণ এক স্থানে বসিয়া লোকের বাহবা লইতেছেন। আমাকে দেখিয়াই গোবিন্দলাল বলিলেন—"কেমন নবীনবাবু! পাড়াগেঁয়ের পছন্দ আছে কি না?" আমি বলিলাম—"আজ আমাদের পাড়াগেঁয়েরই জয়!" লোকের ভিড়ে প্রদ্যোৎকুমার যে আমার পশ্চাতে ছিলেন, তাহা তিনি দেখেন নাই। প্রদ্যোৎকুমার আমাকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! বেটার রসিকতা শুনিলেন ত? আপনি যে সূক্ষ্ম ঠাট্টা করিয়া উত্তর দিয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আমার গা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহাকে দু কথা শুনাইয়া দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল।" আমি বলিলাম, যাহার যেরূপ শিক্ষা, তাহার সেরূপ পরীক্ষা। আপনি উহা গ্রাহ্য করিবেন না। কটন্ সাহেবের আনন্দের সীমা নাই। তিনি আমাকে বলিলেন, এ অভ্যর্থনা যে এমন Grand affair (বৃহৎ ব্যাপার) হইবে, তিনি মনে করিয়াছিলেন না। প্রদ্যোৎকুমার শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। মধ্য-রাত্রিতে এরূপে মহা আড়ম্বরে কটন-অভ্যর্থনা শেষ হইল।

হিতবাদীর লাইবেল মোকদ্দমা ও কলিকাতা ত্যাগ

আমার কলিকাতার কাজ শেষ হইল। আমি যে চারিটা কার্য্যের জন্য চেষ্টা করিব বলিয়া রাণাঘাট হইতে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিলাম, শ্রীভগবান্ এ ক্ষুদ্র তৃণের দ্বারা যত দূর হইতে পারে, তাহা সম্পাদিত করাইয়াছেন। এখন কলিকাতায় আমার আর কোনও কাজ নাই। শিশিরবাবু যথার্থই লিখিয়াছেন, কলিকাতায় থাকাও আমার পক্ষে নিরাপদ্ নহে। ইট কাঠের সৃষ্টি কলিকাতা আমার কাছে কখনও বড় ভাল লাগে নাই। শুধু কলিকাতা সহর নহে, কলিকাতার মানুষগুলিও ইট কাঠের সৃষ্টি। কলিকাতা একটা ইট কাঠের মহাবন। উহার উপরতলাবাসী নীচের তলার লোককে চিনে না। মানুষে মানুষে প্রকৃত স্নেহ, মমতা, বন্ধুতা কলিকাতায় নাই। পরস্পরে দেখা হইলে—"কি মহাশয়! কেমন আছেন?" উত্তর—"ভাল আছি,"—এই ফাঁকা শিষ্টাচার পর্য্যন্ত। তাহার উপর আর বেশী কিছুই নাই। চতুরচূড়ামণি কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে কলিকাতা লইয়া আমার বরাবর ঝগড়া হইত। একদিন ভ্রাতৃসম কুমার মন্মথনাথ মিত্রের 'পোর্টিকো'র উপরের ছাদে জ্যোৎস্নাময় বসিয়া আছি। তিনি বলিলেন—"সকলে কলিকাতাকে ভাল বলে। আপনি কেবল নিন্দা করেন।" আমি বলিলাম—"নিন্দা করি কেন, তাহার প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না। এই দেখ না, নির্ম্মল জ্যোৎস্নাটুকু পর্য্যন্ত তোমাদের ভাগ্যে ঘটে না। আজ পূর্ণিমা, অথচ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না পর্য্যন্ত এমন ধূলি-বাষ্পে বিকৃত যে, উহা জ্যোৎস্না বলিয়াই বোধ হইতেছে না। তুমি আমার সঙ্গে রাণাঘাটে চল। একবার জ্যোৎস্না কাহাকে বলে দেখিবে।" ফলতঃ আহারের পর আমি সেই রাত্রির ট্রেনে রাণাঘাট ফিরিয়া আসি। কলিকাতার ধূলি-বাষ্প ও পূতিগন্ধ হইতে যেই ট্রেন বাহির হইল, মরি! মরি! কি প্রাণারাম ফুল্ল জ্যোৎস্না! কি নির্ম্মল, শীতল, নৈশ সমীরণ! রাণাঘাট হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রথম কয়েক মাস বাড়ী ও গাড়ী-ঘোড়ার বিভ্রাটে কাটাইলাম। প্রথম ১৩নং হ্যারিসন রোডে নামি। তাহাতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনেরও স্থান নাই। তাহার পর হ্যারিসন রোড ও শিয়ালদহ রোডের মোড়ের উপর ৭ কি ৮ নম্বর বাহ্যিক বাহারযুক্ত বাড়ীতে যাই। ভাড়া ১০০৲ টাকা। তথাপি নীচে দোকান। পাইপে কেঁচো উঠিয়া সমস্ত গৃহ অলঙ্কৃত করিত। তাহার উপর চারি দিকে কি সুদৃশ্য ও সদ্গন্ধ! বন্ধু উমেশ

(Dr. U. C. Mukherji) আসিয়া ক্যাম্বেল হস্পিটালের সম্মুখে, তাহার ১০নং গোমেশ লেন বাড়ীতে লইয়া গেলেন। ভাড়া এক শত টাকা, কিন্তু আমি তাঁহার শৈশব-বন্ধু বলিয়া কিছু কমাইয়া দিলেন। তাহার উপরে তিনখানি কামরা ও সম্মুখে একটুক খোলা ছাদ। নিম্নের কক্ষগুলিন এত 'ড্যাম্প' ও অন্ধকার যে, তাহা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় পার্শ্বে গায়ের উপর অন্য বাড়ী। কেবল সম্মুখে পশ্চাতে একটুক খোলা স্থান। উপরের ঘর নূতন প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার কার্য্য শেষ হয় নাই। বন্ধুবর উহা শেষ করিবার ভার আমার উপর দিলেন। আমি উপরের তিনটা কামরা সুন্দর রং লতার (Scroll) দ্বারা চিত্রিত করিয়া, তাহা আমার অবস্থানুযায়ী সাজাইয়াছিলাম। মহারাজকুমার প্রদ্যোৎকুমার প্রথম বার আসিয়া বলিলেন—"O Sir, you have nicely furnished your house!" (আপনার ঘর বেশ সাজাইয়াছেন)। আমি বলিলাম, তাঁহার মুখে উহা শোভা পায় না। তবে তাঁহারা যখন আমার গরিবের গৃহে আসেন, আমি তাঁহাদের ত একখানি তক্তাপোষের উপর বসিতে দিতে পারি না। আমার কয়েকখানি সামান্য oliograph ছবি তাঁহারা বড় প্রশংসা করিতেন। বলিতেন—চমৎকার নির্ব্বাচন! আমার চট্টগ্রামের দুই উকিল ইহার উপরও সুর তুলিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে গিয়া বলিয়াছিলেন—He is living like a prince! (সে কলিকাতায় রাজার মত আছে)। তাঁহাদের একজন আমার স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া, চীৎকার করিয়া আর একজনকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—"একবার গোসলখানাটা দেখিয়া যাও!" কিন্তু বিশ বৎসর যাবৎ আমি প্রকাণ্ড হাতাযুক্ত সুসজ্জিত সবডিভিসন-গৃহে বাস করিয়া আসিয়াছি। এই গৃহটিও আমার কাছে যেন একটি সম্মানার্হ বিবর বা জেলখানা বলিয়া বোধ হইত। ইহাতে আমার যেন নিশ্বাস পড়িত না। একটুক বিশুদ্ধ বাতাসের জন্য আমি ছট্‌ফট্ করিতাম। কলিকাতায় সমস্ত জীবনটা দুই 'ড়'কারে কাটাইতে হয় ;—হয় বাড়ী, নহে গাড়ী। রাস্তা দিয়া গাড়ী ঘোড়ার উৎপাতে বেড়াইবার ত জো নাই। আর কর্দ্দমাক্ত বহুগন্ধসেবিত 'ফুট্‌পাথ' দিয়া যদি বেড়াইতে গেলে, কখন্ কোন্ কুলি মজুর বা সংক্রামক রোগী আসিয়া ঘাড়ে পড়িয়া আপ্যায়িত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তাহার উপর 'কাঙ্গালের ঘোড়া-রোগ'। যদি বহু কষ্টে একখানা গাড়ী (Brownberry) কিনিলাম, ঘোড়া কেনা এক বিষম সঙ্কট। প্রত্যহ পালে পালে ঘোড়ার দালাল ঘোড়া আনিতেছে, এবং প্রত্যেকে বলিতেছে—"প্রথম শ্রেণীর ঘোড়া, মহাশয়! ইচ্ছা হয় ত 'ভেট'কে (ঘোড়ার ডাক্তারকে) দেখান। এমন ঘোড়া কলিকাতায় পাইবেন না!" তাহার কোনটি কোমর-ভাঙ্গা, কোনটি ত্রিপদ, কোনটি দ্বিপদ! আমার এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া আলিপুরের নাজির বলিলেন—তিনি খুব ঘোড়া চেনেন, কত ঘোড়া কিনিয়াছেন। তিনি কুকের নিলাম হইতে সেই দিনই ঘোড়া কিনিয়া দিবেন। নিলামে গিয়া, যে ঘোড়াটির তখন নিলাম হইতেছিল, উহাই ডাকিতে লাগিলেন। ষাট টাকাতে মাত্র এক প্রকাণ্ড 'ওয়েলার' ঘোড়ার ডাক বন্ধ হইল। আমার কেমন কেমন লাগিল। ঘোড়া সম্প্রতি ত তিনি লইয়া গেলেন। পরদিন শুষ্কমুখে বলিলেন—ঘোড়াটা একেবারে কোমরভাঙ্গা! বিশ টাকাতে বেচিয়া ফেলিয়াছেন। আর এক ডেপুটি অহঙ্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি চিৎপুর হইতে এক চমৎকার ঘোড়া কিনিয়াছেন। তাহার পরদিন দেখি যে, ঘোটক ধর্ম্মতলায় ঘোরতর অধর্ম্ম করিয়া, আড় হইয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকাণ্ড এক বাঁশ লইয়া সহিস তাহাকে ঠেঙ্গাইতেছে। কিন্তু ঘোটক স্থিরপ্রতিজ্ঞ!

এই যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া স্থির করিলাম, যাহা কপালে থাকে ও মূল্য লাগে, কুকের আড়গড়া হইতে ঘোড়া কিনিব। চারি শত টাকাতে ঘোড়া একটা C. B. কিনিয়া আনিলাম। চমৎকার চলে। চট্টগ্রামের আবুল রউফ নামক এক মুসলমান আফ্রিকা গিয়া এবং একটা গরীব শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিয়া, মিষ্টার রুফ (Mr. Ruff) সাজিয়াছে। সে এখন

কলিকাতায় ঘোড়ার দালাল। সে ঘোড়াটি দেখিয়াই বলিল যে, তাহার এক চোক কানা। 'কুক'দের এ কথা বলিলে তাহারা বলিল—"মিথ্যা কথা। কে এরূপ বলিয়াছে, তাহার নাম বল। তাহার নামে ডেমাজের নালিশ করিব।" কিন্তু সে দালাল জিদ করিয়া বলিল যে কুক আমাকে ঠকাইতেছে। অথচ তাহারা গ্যারাণ্টি দিয়াছে। সংকটে পড়িয়া আমি এক সূক্ষ্ম বুদ্ধি কাড়িলাম। ঘোড়াটির চক্ষে কোনও রোগ থাকিলে তাহাকে চিকিৎসার জন্য বেলগাছিয়ার 'অশ্ব-চিকিৎসালয়ে' পাঠাইলাম। তাহারা লিখিল—তাহার এক চক্ষু চিকিৎসাতীত অন্ধ (incurably blind)। আমি এই চিঠি কুকের কাছে পাঠাইলাম। তথাপি তাহারা গোলযোগ করিতে লাগিল। একজন বন্ধু তাহাদের 'কেশিয়ার' বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কেশিয়ার বাবুর চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। এমন সময় সংবাদপত্রে এক 'প্যারা' বাহির হইল যে, প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট নওয়াব (!) ছুটি লইতেছেন, সার চার্লস পল মিঃ বোনোর জন্য এবং মিঃ কটন শ্যামাধব রায়ের জন্য সেই পদের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর স্বয়ং আমার প্রতি অনুকূল! কেশিয়ারবাবু উহা 'কুক'দের কর্ত্তাকে দেখাইয়া বলিলেন যে, যে লোক দুদিন পরে প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইবে, তাহার সঙ্গে তাঁহাদের এ ব্যবহার ভাল হইতেছে না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ টাকা আলিপুর কাচারিতে আমার কাছে ফেরত পাঠাইলেন। কে বলে যে, বাগবাজারের গল্প কাজে আসে না? ঘোড়া কিনিতে ত এই কষ্ট! তাহাতে শিয়ালদহ হইতে আলিপুর যাওয়া আসা দশ মাইল গাড়ী টানিয়া, তাহার উপর আবার ঘন ঘন 'সান্ধ্য সম্মিলনী' ইত্যাদিতে আর পাঁচ সাত মাইল আমার 'পক্ষিরাজে'র যাইতে হয়।

যাহা হউক, রোজ পনর ষোল মাইল চলিয়া ঘোটকের পর ঘোটক কায়া ত্যাগ করিতে লাগিল। দেখিলাম, ঘোড়াও ডেপুটিদের মত খাটিতে পারে না। কলিকাতার এই সকল সুখের উপর পুত্রের গলায় ঘা হইল। উহা কিছুতেই সারিতেছে না। ডাক্তারেরা বলিলেন—কলিকাতার ধূম, বাষ্প, কয়লাণুপূর্ণ বাতাস উহার কারণ। কলিকাতা না ছাড়িলে উহা সারিবে না। অতএব কলিকাতা হইতে কেমন করিয়া পরিত্রাণ পাইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে চট্টগ্রামের একজন বন্ধু আসিয়া, আমার গৃহে অতিথি হইয়া, বহু দিন রহিলেন। তিনি চট্টগ্রামে এক দিন আমার গলায় ছুরি দিয়াছিলেন। কিন্তু এমনই কর্ম্মফলের গতি, তিনিই আবার আমার অতিথি। তিনি বলিলেন, চট্টগ্রামের কমিশনর মিঃ স্ক্রীন (Skrine) আমাকে তাঁহার পার্শন্যাল করিয়া লইতে চাহেন। আমি স্ক্রীন সাহেবকে চিনিও না। তবে তিনি একজন Literary man (সাহিত্যসেবী) সুলেখক বলিয়া জানিতাম। তিনি ইংরাজী মাসিকপত্রাদিতে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখিতেন। বন্ধু বলিলেন যে, আমিও Literary man (সাহিত্যসেবী) বলিয়া তিনি আমাকে লইতে চাহেন। চট্টগ্রাম হইতে একবার এই বন্ধু মহাশয়ের কৃপায় ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলাম। এ জন্য চট্টগ্রাম যাওয়া আর নিরাপদ মনে করিলাম না। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, তিনি সে জন্য বড়ই অনুতপ্ত। বিশেষতঃ এখন দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বহু লোক। তাঁহারা সকলে আমাকে চাহেন। আমি এখন দেশে গেলে, অনেক দেশ-হিতকর কার্য্য করিতে পারিব। ইহাঁরা সকলেই সাহায্য করিবেন। তিনি অনেক বুঝাইয়া আমাকে একরূপ নিমরাজি করিলেন। আমারও একবার চাকরির শেষ সময়ে জন্মস্থানে যাইতে ইচ্ছা হইল। জননীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চিরদিন আমার চিত্তাকর্ষক। কিন্ত পত্নী পুত্র কিছুতে সম্মত হইল না। তাহারা কিছুতে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবে না। এমন সময়ে মিঃ স্ক্রীন একবার কলিকাতায় আসিলে, বন্ধু আমার অজ্ঞাতসারে, আমি তাঁহার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইয়া যাইতে সম্মত বলিয়া বলিলেন। আর স্ক্রীন তৎক্ষণাৎ চিফ সেক্রেটারি মিঃ বোল্টনকে সে কথা বলিলেন এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ বদলি করিতে ধরিয়া পড়িলেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমার স্ত্রী ও পুত্র চটিয়া, সেই বন্ধুকে

গালি দিতে লাগিলেন। কিন্তু তখন পাশা হস্তচ্যুত হইয়াছে, আর উপায় নাই। কিন্তু কই, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল। বদলি গেজেট হইতেছে না। মিঃ বোল্টন কটনের স্থানে চিফ সেক্রেটারি হইয়া আসিলে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। এই তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তিনি উঠিয়া আসিয়া, সজোরে আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"I am proud to make your acquaintance. Your name is a household word in Bengal" (আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া গর্ব্বিত হইলাম। আপনার নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে পরিচিত)। তিনি বলিলেন, তিনি আমার 'পলাশির যুদ্ধ' পড়িয়াছেন এবং তাহার খুব প্রশংসা করিলেন। অতএব এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় থাকা কষ্টকর হইলে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আপনা হইতে বলিলেন যে, স্ক্রীন আমাকে বড়ই চাহেন, এবং তাঁহাকে পত্র লিখিয়া ও টেলিগ্রাম করিয়া অস্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমি যাইতে ইচ্ছুক কি না, মিঃ বোল্টন জানেন না বলিয়া, আমার বদলি গেজেট করেন নাই। আমি বলিলাম—আমি সে বিষয় স্থির করিবার ভার তাঁহার উপর দিলাম। তিনি যদি ভাল বুঝেন, আমাকে বদলি করুন, কলিকাতায় রাখা ভাল বুঝেন, রাখুন। তিনি তাহার পরও বলিলেন—"আপনি কলিকাতা ভালবাসেন?" আমার দুর্ম্মতি হইল। আমি বলিলাম, কলিকাতা আমার কাছে ভাল লাগে না। খরচ বড় বেশী। দুই বৎসরে আমাকে সাত শত টাকা বেতন খোওয়াইয়া, পনর শত টাকা কর্জ্জ করিতে হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"সে কথা ঠিক। আমিও কলিকাতা ভালবাসি না। It is frightfully expensive (ভয়ানক খরচের স্থান)। তবে আপনি চট্টগ্রাম যান।" তাহার পরই আমার চট্টগ্রাম বদলি গেজেট হইল। একজন বন্ধু তখনই আমার গৃহে আসিয়া, বিরক্ত হইয়া, আমি কেন কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছি জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম, দুই বৎসর সাত শ টাকা বেতন উড়াইয়া, পনর শত টাকা কর্জ্জ করিয়াছি। তিনি বলিলেন—"করিলে কেন? তোমার এমন বাড়ী, এমন সজ্জা, এমন গাড়ী ঘোড়ার প্রয়োজন কি? অন্য ডেপুটিদের মত ত্রিশ চল্লিশ টাকার একখানি বাড়ী লও, এক শত দেড় শত টাকার মধ্যে গাড়ী ঘোড়া কর, দুই চারিখানি চেয়ার ও খান দুই তক্তাপোষ রাখ, তাহা হইলে এত টাকা খরচ পড়িবে না।" আমি বলিলাম, আমার বাড়ীর কষ্ট হইবে, গাড়ীর কষ্ট হইবে, আহারের কষ্ট হইবে, শয়নের কষ্ট হইবে। তবে আমি 'কি সুখে রহি বর্দ্ধমানে'? বরং—

"যমুনা সলিলে সখি অব তনু ডারব, আন সখি! ভখিব গরল।"

ঠিক এই সময়ে আমি এক উৎপাতে পড়িলাম। একদিন দশটার সময়ে আলিপুর যাইবার পথে 'বেঙ্গলী' আফিসে কি প্রয়োজনে সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি গত সংখ্যক 'হিতবাদী'র "কুসুম" কবিতাটি পড়িয়াছেন কি? আমি বলিলাম হাঁ।

সু।—উহা আপনার কেমন লাগিয়াছে?

উ।—বেশ লাগিয়াছে।

সু।—আপনি উহার মধ্যে কোনও 'লাইবেল' (অপবাদ) টের পাইয়াছেন কি?

উ।—লাইবেল!—কই না, আমি কোনও 'লাইবেল' ত টের পাই নাই।

সুরেনবাবু টেবিলের অপর পার্শ্বস্থ একটি স্থূলকায় কৌতুকমূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তবে আমরা ইহাঁকে সাক্ষী মানিব।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কিসের সাক্ষী? তিনি বলিলেন—"ইনি 'হিতবাদী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। সেই কবিতার জন্য ব্রাহ্মরা তাঁহার নামে লাইবেল করিবে বলিয়া ধমকাইতেছে।" আমি বিস্মিত হইয়া—"কিসের লাইবেল?" সুরেন্দ্রবাবু—"তা জানি না। এখনও আমরা নোটিশ পাই নাই।" আমি তখন দুঃখিতভাবে বলিলাম, এরূপ অবস্থায় আমাকে unguarded (অসাবধান) ভাবে

তাঁহার এই কথাটা জিজ্ঞাসা করাটা ভাল হয় নাই। আমাকে সাক্ষী না মানিতে তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলিলাম।

ইহার দুই চারি দিন পরে সত্য সত্যই ব্রাহ্মরা 'হিতবাদী'র সম্পাদকের নামে 'লাইবেল' মোকদ্দমা কলিকাতা পুলিশ-কোর্টে উপস্থিত করিলেন। আন্দোলনে কলিকাতা টলটলায়মান হইল। শুনিলাম, সে কবিতায় কে এক জন ব্রাহ্মের ও তাঁহার ব্রাহ্মিকার অপবাদ আছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে সুরেন্দ্রবাবুর 'ইণ্ডিয়ান' সভায় কোন ব্রাহ্ম না কি কাব্যবিশারদকে গালি দিয়াছিলেন। কাব্যবিশারদ এ জন্য এই 'কুসুম' কবিতায় নাকি এমন হুল ফুটাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে ব্রাহ্মিকার ঘোরতর অপবাদ হইয়াছে। যদিই হইয়া থাকে, এই ভিতরের কথা ব্রাহ্ম ভ্রাতা দুই চার জন ছাড়া আমার মত দেশের কেহই জানিত না। কারণ, তাঁহাদের চেনা দূরে থাকুক, নামও কেহ শুনে নাই। কিন্তু এখন ব্রাহ্মরা হাটের মাঝে এই হাড়ি ভাঙ্গিয়া এই কলঙ্ক দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। কলিকাতায় কাণ পাতিবার জো নাই। পথে হাটে ব্রাহ্মিকাটির সম্বন্ধে কত কথাই হইতে লাগিল। কলিকাতা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। কয়েক জন ব্রাহ্ম মাত্র এক দিকে এবং প্রায় সমস্ত কলিকাতাবাসী অন্য দিকে। মোকদ্দমা দেখিতে দেখিতে সেসনে অর্পিত হইল। বিবাদীর পক্ষ আমাকে সাক্ষী মানিলেন। আমি এক বিষম সঙ্কটে পড়িলাম।

সর্ব্বপ্রথমেই 'অমৃতবাজারে'র মতি ভায়া সেই 'হিতবাদী'র তৈলাক্ত মলিন এক সংখ্যা লইয়া, আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া, উহা যে 'ঘোরতর অপবাদ,' আমাকে বুঝাইলেন। তিনি একটি 'এই' শব্দের, না কি শব্দের নীচে বহু দাগ দিয়াছেন। বলিলেন, সে শব্দটি একেবারে মারাত্মক! আমার কেবল হাসি পাইতেছিল। পরে তাঁহার মুখে শুনিলাম, কাব্যবিশারদ পূর্ব্বে তাঁহাদের হাতের পুতুল ছিল। তাঁহারা তাহাকে গড়িয়াছেন। এখন সে পুতুল কেবল 'সুরেন বাঁড়ুজ্জ্যে'র হাতে গিয়াছে, তাহা নহে : 'হিতবাদী'তে যখন তখন তাঁহাদিগের উপর 'ঘোষ-নন্দন' ইত্যাদি তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করে। মতি ভায়া সে জন্য এই কৃতঘ্নকে এবার শিক্ষা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, পরে শুনিলাম—তিনিই ব্রাহ্ম বেচারিকে এরূপ বলিদান দিতেছেন, এবং লাইবেল -মোকদ্দমার প্রধান উৎসাহদাতা। তিনি আরও একজন 'সুবিখ্যাত' ব্যক্তিকে আমার মত 'জপাইতে' গিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত ব্যক্তি আমার এক বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি সুরেন্দ্রবাবুর হাতে পায় ধরিয়া যখন সাক্ষী হইতে কোনও মতে অব্যাহতি পাইলাম না, তখন মতি ভায়াকে 'জপাইয়া' মোকদ্দমাটি যাহাতে আপোষ হয়, তাহার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার সঙ্গে সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এক-দিন বাগবাজারের নিকটস্থ গঙ্গার ধারে এ বিষয়ের আলোচনায় কাটাইলাম। কিন্তু দেখিলাম, তিনি কিছুতেই আপোষে সম্মত হইলেন না। তিনি যেরূপ apology (ক্ষমা-প্রার্থনা পাঠ) চাহিলেন, তাহা কোনও ভদ্রলোক দিতে পারে না। তাহা সুরেন্দ্রবাবুকে দেখাইলে তিনি বলিলেন, উহা কাব্যবিশারদ কখনও স্বীকার করিবে না। বন্ধু নীলরতন সরকার মহাশয়কেও অনেক সাধাসাধি করিলাম। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা এই কথার আলোচনায় তিনি আমার বাড়ীতে কাটাইলেন। তিনি ঐরূপ ক্ষমাপাঠ চাহেন।

অন্য দিকে আমার এই চেষ্টার এক বিষময় ফল ফলিতেছিল। আমি ত কোনওরূপে এই মোকদ্দমার সাক্ষী হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, কিসে জন্মভূমিতে এত বৎসর পরে আসিব, ব্যাকুল হইয়া এই চেষ্টা করিতেছি। অন্য দিকে ইহার বিপরীত অর্থ হইয়াছে। একদিন 'হাইকোর্টে'র জজ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে 'সান্ধ্য সম্মিলনে' (Evening party) সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং 'হিতবাদী'র আর এক তীব্র আক্রমণের ও বিদ্রূপের পাত্র নীলমণিবাবু আমাকে উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন —'আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।

আপনি কি 'হিতবাদী'র সেই "কুসুম" কবিতাটি লিখিয়াছিলেন?" আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। আমি বলিলাম, সে কি এমন কথা কে আপনাকে বলিল? তিনি বলিলেন—"অনেকে সন্দেহ করেন যে, উহা আপনার লেখা। তাহার কারণ এই যে, এমন সুন্দর কবিতা আর কাহারও লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না।" আমি বলিলাম, সে কবিতার পরও আরও সেই ধরণের অনেক কবিতা 'হিতবাদী'তে বাহির হইয়াছে। তিনি বলিলেন—লোকের বিশ্বাস, উহার সকলই আমার লেখা। জানি না, এ কথা কে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং তাহা কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। দশ বৎসর পরে সে দিন এই সুদূর 'রেঙ্গুন' নগরে পর্যান্ত একজন ভদ্রলোক সে কবিতা আমার লেখা বলিয়া অম্লান-মুখে বলিতেছিলেন। আমি সে সকল কবিতা লেখা দূরে থাকুক, তাহার নাম গন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে জানিতাম না। আমি এ জীবনে 'হিতবাদী'তে কখনও একটি অক্ষরও লিখি নাই। সমস্ত কবিতা কাব্যবিশারদ তাঁহার স্বরচিত বলিয়া পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

সকল দিকে নিষ্ফল হইয়া, আমি সর্ব্বশেষ বোল্টন সাহেবের আশ্রয় লইলাম। আমি বলিলাম, আমি কত কাল কলিকাতায় বসিয়া থাকিব। তিনি অনুমতি দিলে আমি চট্টগ্রামে চলিয়া যাই। তিনি বলিলেন—"এ অন্য কোর্ট নহে, হাইকোর্ট। আপনি যখন সমন পাইয়াছেন, তখন সাক্ষী না দিয়া যাইতে পারিবেন না। স্ক্রীন রোজ টেলিগ্রাম করিতেছেন। আমি এই মর্ম্মে তাঁহাকে উত্তর দিয়াছি।" পরদিন তাহার এক নকল 'অফিসিয়ালি' আমার কাছে পাঠাইলেন। দেখিলাম, এ চেষ্টাও নিষ্ফল হইল।

তখন সোজাসুজি আনন্দমোহন বসুর কাছে গেলাম। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'পোপ' (Pope), আর এ মোকদ্দমা অসাধারণ নহে, সাধারণ ব্রাহ্মদের। তাঁহাকে অনেক 'জপাইয়া' একটা 'এপলজি' (ক্ষমাপাঠ) মুসাবিদা করিতে বলিলাম। তিনি একটা মুসাবিদা করিলেন। তাহা মাজিয়া ঘষিয়া, স্মরণ হয় শেষে এরূপ দাঁড়াইল—"I frankly and sincerely apologise to——for having published the poem——in the *Hitabadi* understood to contain an imputation on the character of his wife——"

আমি দেখিলাম, এরূপ 'এপলজি' দিতে 'হিতবাদী'র পক্ষে কোনওরূপ সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে না। তাহার পর বাদীর খরচের একটা নির্দ্দিষ্টাংশ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। আমি আনন্দমোহনের হাতের লেখা উক্ত 'এপলজি' ও প্রস্তাব লইয়া আলিপুরে যাইবার সময়ে সুরেন্দ্রবাবুর কাছে গেলাম। তাঁহাকেও অনেক 'জপাইয়া' উভয় প্রস্তাব স্বীকার করাইলাম। তিনি বলিলেন যে, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ সার রমেশচন্দ্র মিত্রের কাছে তিনি তখনই যাইতেছেন, এবং তিনি উভয় প্রস্তাব গ্রহণ করিলে আর কোনও গোল হইবে না। জানি না, সার মিত্রের সঙ্গে এ মোকদ্দমার কি সংস্রব ছিল। কথায় বোধ হইল, তিনি 'হিতবাদী' পক্ষের প্রধান সহায়। অপরাহ্নে আলিপুর হইতে ফিরিবার সময়ে সুরেন্দ্রবাবুর কাছে গেলে তিনি বড় আনন্দের সহিত বলিলেন—"নবীনবাবু! আপনি বড় কাজ করিলেন। রমেশ মিত্রও উভয় প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আনন্দমোহনের দ্বারা কালই 'এপলজি' লওয়াইয়া এ উৎপাতটা থামাইয়া দিতে পারিলে, আপনাকে একটা Statue (প্রতিমূর্ত্তি) দেওয়া যাইবে।" আনন্দমোহনকে এ সংবাদ দিয়া, পরদিন প্রাতে দশটার সময়ে আমি সুরেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে লইয়া, আনন্দমোহনের ধর্ম্মতলার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। আনন্দ-মোহন তাঁহার মিহি সুরে বলিলেন যে, ব্রাহ্মরা এরূপ 'এপলজি' লইতে স্বীকার করে না। তাহারা বলে, understood to contain an imputationর স্থানে containing an imputation কথা বসাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ 'উক্ত কবিতায় চরিত্রের উপর দোষারোপ

আছে বলিয়া বুঝা গিয়াছে, এ জন্য ক্ষমা চাহিতেছি' না বলিয়া, উহার স্থলে—'উক্ত কবিতায় চরিত্রের উপর দোষারোপ আছে বলিয়া ক্ষমা চাহিতেছে' বলিতে হইবে। আমি আনন্দ-মোহনকে অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে, আমাদের অব্রাহ্মদের চক্ষে প্রথমটা বরং সেই ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার পক্ষে অধিকতর সম্মানকর। আমি তোমার স্ত্রীর **কলঙ্ক করি নাই,** কিন্তু **কলঙ্ক** করিয়াছি বলিয়া তুমি বুঝিয়াছ, তাই ক্ষমা চাহিতেছি, আর আমি তোমার স্ত্রীর **কলঙ্ক করিয়াছি** এবং তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি,—বোধ হয়, এ দুটোর মধ্যে প্রথমটা সাধারণ ব্যক্তি মাত্রেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মরা অনেকে অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁহারা বলিলেন, 'হিতবাদী' উক্ত স্ত্রীকে অসতী বলিয়াছে এবং তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছে বলিলে উহা তাহার ও তাহার স্বামীর পক্ষে অধিকতর সম্মানের কথা হইবে। আমরা দুজনে এ কথা আনন্দমোহনকে অনেক করিয়া বুঝাইলে, তিনি বলিলেন,—আমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তিনি——কে ডাকিবেন। আমরা বলিলাম, কোনও আপত্তি নাই। তিনিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন চাঁই, এবং এ মোকদ্দমার মূল। আনন্দমোহন নাম করিয়া ডাকিবা মাত্র তিনি একটি পর্দ্দার আড়াল হইতে তাঁহার কৃষ্ণ দাড়ি এবং দন্ত লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আমি ও সুরেন্দ্রবাবু বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করিলাম। আমাদের বোধ হইল, 'পলোনিয়সে'র মত তিনি ভদ্রতার বিধানানুসারে গুপ্তভাবে পর্দ্দার আড়ালে সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। শুনিয়াছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে অধিকাংশ ঢাকাই আমদানি। 'হিতবাদী'র 'বাক্যবিশারদ' মাইকেলের অনুকরণে 'বাঙ্গালে'র 'মেঘনাদ' পাঠের নকল করিয়া, তাহার বিচিত্র আবৃত্তি এবং ব্যাখ্যা করেন। 'ছুম্মুক ছুমরে' অর্থ—"পেছন থাক্যা খাম্‌চা খাম্‌চি করলে ছুম্মুক ছুমর হইব না।" তিনি আজ উপস্থিত থাকিলে the rat! the rat!" (ইন্দুর! ইন্দুর!) বলিয়া হয় ত ছুম্মুখ সমর' অর্থাৎ 'ছুমুক থাক্যা খামচা-খাম্‌চি' করিয়া একটা ব্রাহ্মহত্যা ঘটাইতেন। আনন্দমোহন তাঁহাকে আবার সকল কথা বলিলেন, এবং তাঁহার লিখিত 'এপলজি' গ্রহণ করিতে আমরা বিশেষ অনুরোধ করিতেছি বলিলেন। কিন্তু তিনি 'দন্তরুচি-কৌমুদী'তে আমাদের আপ্যায়িত করিয়া বলিলেন, the wounded feelings of a husband (একটা স্বামীর অস্ত্রাহত হৃদয়ের ভাব) আমাদের মনে করা উচিত। এরূপ 'এপলজি'তে স্বামীর ক্ষত হৃদয়ের ভাব সারিবে না। Containing an imputation, অর্থাৎ উক্ত কবিতার তাঁহার স্ত্রীকে অসতী বলা হইয়াছে বলিয়া পরিষ্কাররূপে না বলিলে সে ক্ষত হৃদয়ের ভাব কিছুতেই সারিবে না। তাঁহাকে আমরা দুজনে অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু তিনি ঐ সকল যুক্তির উত্তরে দাড়ির সুন্দরবন-শোভিত ভ্রমরকৃষ্ণ মুখ নাড়িয়া বারম্বার সেই এক কথাই বলিলেন—the wounded feelings of a husband। আমাদের সন্দেহ হইল, তাঁহার উদ্দেশ্য যে, 'বাক্যবিশারদ' এরূপ 'এপলজি' দিতে স্বীকার করিলে, তাঁহারা উহা গ্রহণ না করিয়া, এই প্রমাণ হাইকোর্টে উপস্থিত করাইয়া দেখাইবেন যে, 'বাক্যবিশারদ' এই কবিতায় উক্ত ব্রাহ্মিকাকে অসতী বলিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তখন আমরা 'সচ্চিদানন্দ হরি!' বলিয়া,—কারণ, শুধু হরি বলিলে পৌত্তলিকতা!—চলিয়া আসিলাম। আমি তিন মাস চেষ্টা করিলাম। সর্ব্বশেষ এই এক understood কথার জন্য সমস্ত mis-understanding রহিয়া গেল। তাহার পরদিন সেসনে বিচার আরম্ভ হইল। আমি সুরেন্দ্রবাবুকে আবার হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম যে, আমার সাক্ষ্যের দ্বারা 'বাক্যবিশারদে'র কোনও উপকার হইবে না। আমি ত কেবল এই মাত্র বলিব যে, আমি যখন কবিতা পড়ি, তখন তাহাতে কোন লাইবেলের গন্ধ পাই নাই। কিন্তু যখন কূট প্রশ্নে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, অমুক অমুক শব্দ যদি প্রকৃত নর-নারীর নাম হয়, তাহা হইলে রমণীর চরিত্রে দোষারোপ করা হয় কি না? তখন আমাকে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা তথাপি আমাকে ছাড়িলেন না। তিন মাস

এত চেষ্টার পরও আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইল। যাহা আমি তাঁহাদের বলিয়াছিলাম, কোর্টে তাহাই বলিলাম। 'অবকাশ-রঞ্জিনী'তে যে "পাগলিনী রে আমার!" নামক একটি কবিতা আছে, তাহা বাদীর পক্ষে উপস্থিত করিয়া, আমি ব্রাহ্মিকাদের তাহাতে 'লাইবেল' করিয়াছি কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া 'কাউন্সেলি' বাঁধা ধরণে কাউন্সেল হাঁ কি না উত্তর চাহিলেন। এরূপে সকল প্রশ্নেরই তিনি আমার কাছে ভ্রূকুটি করিয়া, হাঁ কি না উত্তর চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও প্রশ্নেরই হাঁ কি না প্রকৃত উত্তর হইতে পারে না। আমি নিজে জজের কাছে এরূপ প্রশ্নের অবৈধতা সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছি, কিন্তু বিবাদীর কাউন্সেল চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। জজ বার বার ঐরূপ 'হাঁ না' উত্তর চাওয়া অন্যায় বলিয়া, আমাকে প্রকৃত উত্তর দিতে বলিলেন। আমি বাদীকে চিনি না বলিলে একটি কদাকার এবং কৌতুকবেশী লোককে দেখাইয়া, তাঁহাকে আমি চিনি কি না, কাউন্সেল জিজ্ঞাসা করিলেন ; বলিলাম—না। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে আপনার বাড়ী যায় নাই, আপনি শপথ করিয়া বলিবেন,—উত্তর হাঁ কি না বলুন?" আমি জজকে বলিলাম—"ইহার কেমন করিয়া আমি হাঁ কি না উত্তর দিব?" আমার সঙ্গে অনেক লোক সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া থাকে। তাহাদের সঙ্গী আবার অনেক লোক থাকে। ইনি যদি সেরূপে যাইয়া থাকেন, আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করি নাই। অতএব কেমন করিয়া এ প্রশ্নের হাঁ কি না উত্তর দিব? কিন্ত কথাটি বোধ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। জজ এবারও বিরক্ত হইয়া, কাউন্সেলের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করিয়া, আমার পুরা উত্তর লিখিয়া লইলেন। তখন কাউন্সেল বলিলেন যে, তিনি আমাকে আর একটি মাত্র প্রশ্ন করিবেন। তাহার একটুক ইতিহাস বলা প্রয়োজন।

বোধ হয়, ইহার সপ্তাহ পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে আমার তিন জন আত্মীয় এক পত্র লেখেন যে, আমাদের একটি আত্মীয় বালককে ব্রাহ্মরা পাইয়াছে। দেশে পূর্ব্বে ছেলেদের পেঁচোয় পাইত, ভূতে পাইত। এখন সে কার্য্য কোন কোন খ্রীষ্টান মিশনারি ও ব্রাহ্ম করেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, বালকটির সহবাসীরা লিখিয়া পাঠাইয়াছে যে, বালকটিকে ব্রাহ্মরা কয়েক দিন যাবৎ নিরুদ্দেশ করিয়া কোথায় রাখিয়াছে, তাহারা অন্বেষণ করিয়া স্থির করিতে পারিতেছে না। তাহাকে কোনও মতে ব্রাহ্মদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহারা আমাকে কাঁদা-কাটা করিয়া লিখিয়াছেন। আমি ছাত্রটির সহবাসীদের 'মেসে' গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল যে, সে বালকটি, বয়স চৌদ্দ পনর বৎসর মাত্র, কয়েক দিন হইতে পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা শুনিয়াছে যে, উক্ত সমাজে দুই এক দিনের মধ্যে দীক্ষিত হইয়া, কোন ব্রাহ্মের কন্যাকে বিবাহ করিবে। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'পোপ' আমার কলেজের পরিচিত বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে গেলাম। শুনিলাম, তিনি কোন 'কুঞ্জে' উপাসনা করিতে গিয়াছেন। আমি তখন আনন্দমোহন বসুর বাড়ীতে গেলাম। তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া, একটুক ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—"তুমিও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের জয়েণ্ট পোপ। তুমি এই বালকটিকে ছাড়িয়া দিতে বল। আমি বুড়া বয়সেই নিরাকার ব্রহ্মের ধারণা করিতে পারি না, এ বালক কি বুঝিবে? আর যদি বলিদান দিতে হয়, তবে এই ছাগল বলিদান দিলে কি হইবে? চট্টগ্রামের লোক তাঁহাকেই তজ্জন্য অনুযোগ দিবে। কারণ, তাঁহাকে সকলে চেনে। অতএব এরূপ ছাগল বলিদান না দিয়া, আমার মত একটা মহিষকে বলিদান দিলে বরং ব্রাহ্মসমাজের আরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে। তোমরা পিতৃহীন বালকটিকে ছাড়িয়া দাও। আমি তাহার স্থানে গিয়া বসিব, এবং আমার শিবনাথ ভায়া যত দীক্ষা দিতে পারেন, কাণ ভরিয়া শুনিব।" আনন্দমোহন হাসিয়া বলিলেন—"আমার কোর্টে যাওয়ার সময় হইয়াছে। তুমি আবার শিবনাথের কাছে যাও। তাঁহার ক্ষমতা আমার অপেক্ষা অধিক। তাঁহাকে তুমি বলিলেই তিনি বালকটিকে ছাড়িয়া দিবেন।" আমি বিস্মিত হইলাম যে, বাদীর কাউন্সেল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার একটি

আত্মীয় বালককে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দীক্ষিত করিয়াছে বলিয়া আপনি ব্রাহ্মদের উপর ঘোরতর ক্রুদ্ধ হইয়া, সে দিন মাত্র মিঃ এ. এম. বোসকে ধমকাইয়াছিলেন কি না? হাঁ কি না বলুন?" আমি আবার জজের দিকে চাহিয়া বলিলাম যে, এই প্রশ্নেরও হাঁ কি না উত্তর হইতে পারে না। শ্রাদ্ধ এই পর্য্যন্ত গড়াইলে, এবার বিবাদীর কাউন্সেল উঠিয়া, প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, তিনি এত ক্ষণ নীরব ছিলেন। কারণ, জজই বাদীর কাউন্সেলের প্রশ্ন অনুমোদন করিতেছিলেন না। কিন্তু এরূপ সম্ভ্রান্ত সাক্ষীর সঙ্গে বাদীর কাউন্সেল এরূপ ব্যবহার করিয়া, তাঁহার নিজের পদের ও আদালতের অবমাননা করিতেছেন। তখন জজ আমার উত্তরে উপরোক্ত উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখিয়া লইলেন। বাদীর কাউন্সেল বলিলেন, তিনি আমাকে আর প্রশ্ন করিবেন না। এখানে আমি একটি প্রশ্ন করিব। আমি বন্ধুভাবে আনন্দমোহনকে ঠাট্টা করিয়া যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা আমার জেরার জন্য এরূপ বিকৃতভাবে ব্যবহার করিতে দিয়া, আনন্দমোহন কি ঠিক কার্য্য করিয়াছিলেন? ইহা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নূতন, কি পুরাতন বিধান-সঙ্গত কি না জানি না, কিন্তু ইহা কি ভদ্রসমাজের ঘৃণিত কার্য্য নহে? আনন্দমোহনও আমার কলেজের সময় হইতে বন্ধু এবং তাঁহাকে চট্টগ্রামে এক মোকদ্দমায় লইয়া আমিই তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দিয়াছিলাম, এবং তাঁহার ব্যবসার প্রথম প্রতিপত্তির সহায়তা করিয়াছিলাম। ডাক্তার নীলরতন বলিয়াছিলেন যে, বোধ হয় আনন্দমোহন ঐ বালকটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য এ কথা কাহাকে বলিয়াছিলেন, এবং সে তাঁহার অজ্ঞাতসারে উহা জেরাতে ব্যবহার করিয়াছিল। যদি তাহাই হয়, তবে কি এই জেরার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া, এই কথা আনন্দমোহনের আমাকে লেখা উচিত ছিল না? যদিও এ কথা আমি আমাদের পরস্পরের বহু বন্ধুর কাছে বলিয়াছি, কই— আনন্দমোহন ত আমাকে একটি অক্ষরও লিখেন নাই। বলা বাহুল্য, সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে আর আলাপ করি নাই।

যাহা হউক, এ কলঙ্ক-ভঞ্জনের বা মানভঞ্জনের পালা শেষ হইল। হাইকোর্ট শতছিদ্র কলসীতে মানের জল আনিয়া, ব্রাহ্মিকার অপবাদ ধুইয়া ফেলিলেন, এবং ব্রাহ্মিকার অপবাদকারী মহিষাসুরের হৃদয় 'ব্রাহ্মশূলেন নির্ভিন্ন', এবং বৃটিশ-সিংহের বিচার-দণ্ডে তাহারই 'রক্তারক্তীকৃতাঙ্গ' করিয়া, ভ্রূকুটিভূষণানন বাক্যবিশারদকে আট কি নয় মাসের জন্য ব্রাহ্মসমাজের গ্রাস হইতে আলিপুরের কয়েদিসমাজে প্রেরণ করিলেন। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয় হইল ; ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা ঘোষিত হইল, ব্রাহ্ম-প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত হইল, এবং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ, হরি ওঁ—এখানে সচ্চিদানন্দ হরি না হইয়া কেবল পৌত্তলিক হরি হইল কেন?—বলিয়া সমস্ত দেশ জুড়াইল।

আমি চট্টগ্রামে বিজয়া করিবার জন্য বন্ধুদের কাছে বিদায় হইতে চলিলাম। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের সোপানের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইয়া বঙ্গের এক খ্যাতনামা ডেপুটি। তাঁহার সপ্ততি বৎসর বয়স, প্রায় দশ বার 'এক্সটেন্‌শন্‌' (চাকরির কাল প্রসারণ) লইয়াছেন। অতএব বলা বাহুল্য যে, তাঁহার কেবল কৃষ্ণাঙ্গ নহে, গুম্ফ ক্ষৌরীকৃত, এবং কেশকলাপ কলপের কল্যাণে ভ্রমরকৃষ্ণ। তিনি গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর ও একজন যথাশাস্ত্র সাহেব সেবক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তবে লোকটি চতুর, যোগ্য ও বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্‌। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"সে কি নবীনবাবু! আপনি কি সত্য সত্যই চট্টগ্রাম চলিলেন?" আমি "যখন গেজেট হইয়াছে, মিথ্যা কেমন করিয়া বলিব?" তিনি—"আপনি এত 'প্রস্‌পেক্ট' (উন্নতির আশা) ফেলিয়া, কেন কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছেন? আপনার যোগ্য কর্ম্মচারী আজ বঙ্গদেশে আর কে আছে? না না, আপনি বোল্টন সাহেবকে বলিয়া এ বদলি রহিত করান। কিম্বা বলেন ত আমি গিয়া বোল্টন সাহেবকে ধরি।" আমি—"আপনার মত লোক থাকিতে আমার আবার প্রস্‌পেক্ট কি? আর কলিকাতায় মরিলে যে সোজাসুজি সাহেব-স্বর্গে যাইব, তাহাও ত কোন শাস্ত্রে

লেখে না।" তিনি—"না, আমি আর 'এক্সটেন্‌শন্‌' লইব না। এবারই 'রিটায়ার' (চাকরি ত্যাগ) করিব। আপনি কলিকাতা ছাড়িবেন না।" আমি—"আপনি 'রিটায়ার' করিবেন, সে কি কথা! আপনি আমাদের 'সার্ভিসে'র মঙ্গলঘট। আপনি যত দিন থাকেন, তত দিন ঐ 'সার্ভিস' গৌরবান্বিত থাকিবে।" তিনি—"সে আপনি আমাকে ভালবাসেন বলিয়া বলিতেছেন। আমাদের 'সার্ভিসে'র—বঙ্কিমবাবুর পর আপনিই একমাত্র গৌরব। যাহা হউক, এ বদলি রহিত করাইতে হইবে। আপনার কলিকাতা ছাড়া ভাল হইতেছে না।" তিনি নামিয়া গেলেন। মহারাজার কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র তিনি আমাকে বলিলেন—"বোধ হয়, আপনার সঙ্গে——র সাক্ষাৎ হইয়াছে।" আমি স্বীকার করিলে তিনি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, ইনি কেন আসিয়াছিলেন, আপনি তাহা বলিতে পারেন কি?" আমি বলিলাম—বোধ হয় পারি। তিনি—"বলুন দেখি।" আমি—"ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট সাহেব চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। বোধ হয়, তাঁহাকে একটা 'এড্রেস' (অভিনন্দনপত্র) দেওয়ার জোগাড়ে আসিয়াছিলেন।" তিনি—"ঠিক বলিয়াছেন। কিন্তু ক্রফ্‌ট সাহেবের জন্য ইহার মাথাব্যথা কেন?" আমি—"সাহেব-সেবাই ইহাঁর জীবন-ব্রত।" তিনি—"কেন? লোকটির সন্তানাদি কিছুই নাই। এত বৎসর 'এক্সটেন্‌শন্‌' লইয়াছে। এ বৃদ্ধ বয়সেও তার সাহেব-সেবা কেন?" আমি—"প্রবৃত্তি।" তিনি—"আচ্ছা, আমি কি উত্তর দিয়াছি, বলিতে পারেন কি?" আমি—"বোধ হয়, পারি। বলিয়াছেন—আমি বৃদ্ধ, সাংসারিক সকল কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছি। আমি এ সকল বিষয়ে আর লিপ্ত হইতে চাহি না। অবশ্য আমি ক্রফ্‌ট সাহেবকে খুব সম্মান করি। তিনি একটা 'এড্রেস' পাইলে আমি যথেষ্ট সুখী হইব ইত্যাদি।" তিনি—"আশ্চর্য্য! আমার প্রত্যেক কথাটি আপনি বলিয়াছেন। এরূপ বলিয়া ভাল করিয়াছি ত?" আমি—"বেশ করিয়াছেন। কোথাকার ক্রফ্‌ট সাহেব, সে দেশের কি করিয়াছে? তাহাকেও আবার 'এড্রেস' দিতে হইবে!" তিনি শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর আমি বলিলাম—"মহারাজ! আমি বিদায় হইতে আসিয়াছি। আমি চট্টগ্রাম বদলি হইয়াছি।" তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া—"সে কি কথা! আপনি চট্টগ্রাম যাইবেন কেন? আপনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট হইবেন, কলিকাতার কলেক্টর হইবেন। আমি আপনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। আপনি কেন এমন 'প্রস্‌পেক্ট' ছাড়িয়া যাইবেন। না না, তাহা হইবে না। আমি আজই যাইয়া বোল্টনকে বলিয়া, আপনার বদলি রহিত করাইয়া দিব।" আমি—"আমি জানি, মহারাজ আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। এমন কি, মহারাজ-কুমার (তিনি ও তাঁহার ভাগিনেয়রা আসিয়া ইতিমধ্যে মহারাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছেন) আমাকে দয়া করিয়া ভাই (বা Dear brother) বলিয়া সম্বোধন করেন। আমিও আপনাকে পিতার মত ভক্তি করি। কিন্তু মহারাজ! সে সকল পদ আমি পাইব না। আমি তাহাদের জন্য লালায়িতও নহি। যাহাদের শরীরে মনুষ্যত্বের গন্ধ আছে, তাহারা তাহা পায় না। বঙ্কিমবাবু পান নাই, রামশঙ্করবাবু পান নাই, আব্দুল জব্বর পান নাই। যাহারা পাইয়াছে, ইহাঁদের সঙ্গে একবার তাঁহাদের তুলনা করিয়া দেখুন। শুনিয়াছি, এই দুই পদ গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচরদের জন্য 'রিজার্ভ' করা আছে। মহারাজ! ঘৃণিত গোয়েন্দাগিরি কি আমার দ্বারা চলিবে? আর তাহা করিতে কি মহারাজ আমাকে বলিবেন? এ সকল পদের জন্য আমি কলিকাতায় আসিয়াছিলাম না। মহারাজ! আমার আকাঙ্ক্ষা বড় অল্প। শ্রীভগবান্‌ আমাকে দয়া করিয়া যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমি যেন চিরদিন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি। কলিকাতায় আসিয়াছিলাম কয়েকটা দেশহিতকর কার্য্যের জন্য। মহারাজের সাহায্যে ও সদুপদেশে আমি-ক্ষুদ্র-তৃণের দ্বারা তাহা যত দূর হইতে পারে, তাহা যে হইয়াছে, তাহা ত মহারাজ জানেন। অতএব কলিকাতার মত মহানগরীতে আমার আর কাজ নাই। আমি

এত কাল আমার বড় মাতা বঙ্গদেশের সেবা করিয়াছি। আমার একটি ছোট মা আছেন। বড় দরিদ্রা ও নিঃসহায়া। আমার চাকরি ও জীবন, উভয় শেষ হইয়া আসিতেছে। অতএব শেষ জীবনে আমার সেই দুঃখিনী ছোট মায়ের সেবা করিতে যাইতেছি। দেখি, যদি শেষ জীবনে এ দুঃখিনীর কিছু করিতে পারি।" বলিতে বলিতে আমার চক্ষু ছলছল করিতেছিল। দেখিলাম, তাঁহারও চক্ষু ভিজিল। তিনি উপস্থিত ভদ্রলোকদের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু কি বলিতেছেন, শুনিলেন?" তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন —"মহারাজ! কবির মুখ, যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে।" তাহার পর আমি চট্টগ্রামের, চট্টগ্রাম পর্ব্বত-শীর্ষস্থিত আমার ভবিষ্যৎ আফিসের, সর্বশেষ সীতাকুণ্ডের শোভা-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া বলিলাম যে, আমি পার্ব্বতী-মাতার সন্তান কলিকাতায় কি দেখিতে থাকিব? তিনি শুনিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং আমি নিজে সঙ্গে লইয়া গেলে সীতাকুণ্ড দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম, তাহাই হইবে। তিনি কখন যাইবেন, আমাকে সংবাদ দিলে, আমি পাণ্ডা হইয়া তাঁহাকে দর্শন করাইব। আমি বিদায় হইবার সময়ে আবার বলিলেন—"নবীনবাবু! তুমি কলিকাতা ছাড়িয়া ভাল করিতেছ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না।" তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইবার সময়ে মহারাজ-কুমার আমাকে গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাঁহার ফটোগ্রাফ তুলিবার কক্ষে লইয়া গিয়া, তাঁহার আপনার শাল আমার গায়ে দিয়া, নিজে আমার প্রকাণ্ড দুটি ফটোগ্রাফ স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ তুলিলেন। কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিতে তাঁহার ভাগিনারা ধরিলেন। বলিলেন, তাঁহাদের সুদ্ধ এক ফটোগ্রাফ তুলিতে হইবে। না হইলে আমি তাঁহাদের ভুলিয়া যাইব। আমার চক্ষে এই স্নেহোচ্ছ্বাসে জল আসিল। হায়! আমি এই স্নেহ-স্বর্গ ছাড়িয়া চলিলাম! আমি ছলছল নেত্রে বলিলাম,—তাঁহাদের এই স্নেহের কি প্রতিদান দিব। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আর ফটোগ্রাফ তুলিবার সময় ছিল না। তাঁহারা ধরিয়া পড়িলেন, আমাকে পরদিন অপরাহ্ণে আবার এ জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে আর একবার আসিতে হইবে। আমি গেলাম। আমাকে মধ্যস্থলে বসাইয়া, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদ্যোৎকুমার স্বয়ং এবং বাম পার্শ্বে ও পশ্চাতে তাঁহারা ভাগিনাগণ, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, আর একটি বৃহৎ ফটোগ্রাফ তুলিলেন। এই তিনখানি ফটোগ্রাফ আমার সঙ্গে সঙ্গে এই রেঙ্গুন পর্য্যন্ত যত্নে রক্ষিত হইতেছে। এই ফটোগ্রাফ দেখিলেই আমার সমস্ত কলিকাতা-জীবন আমার চক্ষে এরূপ চিত্রাঙ্কিত মত ভাসিয়া উঠে, এবং আমি আত্মহারা হইয়া ভাবিতে থাকি।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের 'প্রাসাদ' হইতে শ্রদ্ধাস্পদ মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নারিকেলডাঙ্গা ভবনে উপস্থিত হইলাম। তিনি বলিলেন—"আপনি চাকরির শেষ সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি এখান হইতে 'রিটায়ার' করিয়া কলিকাতায়ই থাকিবেন। এত শীঘ্র যে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা কখনও ভাবি নাই। কলিকাতায় আপনি সমস্ত দলকে মিলাইয়া যে মহৎ কার্য্য করিতে-ছিলেন, আর কেহ তাহা পারিবে না। অতএব আপনার এ সময়ে কলিকাতা ত্যাগ দেশের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টের কথা। বিশেষতঃ শিক্ষাসংস্কারের আন্দোলনের আর কিছুই হইবে না।" আমি বলিলাম—" আপনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন বলিয়া এরূপ বলিতেছেন। আমি-তৃণের দ্বারা কলিকাতায় কি কার্য্য হইতেছে? কলিকাতায় যেরূপ দলাদলি, এ সম্মিলন যে স্থায়ী হইবে, আমি বিশ্বাস করি না। আমি ঠিক সময়ে যাইতেছি। এখন আমি সকল দলেরই প্রিয়পাত্র। কিন্তু বেশী দিন থাকিলে, আমাকে এক দলে না এক দলে যোগ দিতে হইবে। এই মধ্যস্থতা চিরদিন আপনার মত রাখিতে পারিব না। আপনি দেবতা, আমি ক্ষুদ্র নর। আপনাকে যেরূপ সকল দলে শ্রদ্ধা করে, আপনি চেষ্টা করিলে অনায়াসে এ দলাদলি নিবারণ করিতে পারেন।" তিনি একটুক হাসিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক

কৌতুকপ্রিয় ভাষায় বলিলেন— "কই, দেবতা ত তাহা এত দিন পারেন নাই। আমি এই দলাদলি হইতে দূরে থাকি, এই মাত্র।" শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে বলিলাম যে, আমি-ক্ষুদ্র-জীবের দ্বারা যাহা হইতে পারে, তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় তাহা করিয়াছি। এখন কার্য্য ডিরেক্টরের হাতে ও 'সেনেট' গৃহে। ডিরেক্টরের সঙ্গে আমি দেখা করিয়াছি। তিনি আমাদের অনেক প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন বলিয়াছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নহি। 'সেনেট' গৃহে আমার অধিকার নাই। সেখানে তাঁহাকে অর্জ্জুন-সারথী বরণ করিয়া যাইতেছি। রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাড়ীতে আমার প্রস্তাবমতে একটা সান্ধ্য সম্মিলনীতে ফেলোদের নিমন্ত্রণ করিয়া, একটি 'আইরিস পার্টি' (পার্লিয়ামেণ্টের আইরিশ দল) সৃষ্টি করিয়া, তিনি তাহাদের নেতা হইবেন, এবং এরূপে সেনেট-গৃহে বারম্বার যুদ্ধ করিয়া আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কার গ্রহণ করাইবেন। তিনি আবার কৌতুক-হাসি হাসিয়া বলিলেন —"অর্জ্জুন ভিন্ন অর্জ্জুন-সারথী ক্ষমতাহীন। আর কিছুই হইবে না। আপনি চলিয়া গেলে আপনার প্রস্তাবিত সান্ধ্য সম্মিলনও হইবে না।" তিনি ত্রিমূর্ত্তির দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন, আপনার সংস্কারের একদল ক্ষমতাপন্ন বিরোধী আছে। আপনি আর কয়েকটি মাস থাকিয়া গেলে এই কার্য্যটা শেষ হইত।" তাহার পর গলদশ্রু-নয়নে আমাকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন—"আপনার এ সময়ে কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়া কি দেশের পক্ষে, কি আপনার পক্ষে যে ভাল হইতেছে, আমার এমন বোধ হইতেছে না।" সুরেন্দ্রবাবু, মতিবাবু, রাজা বিনয়কৃষ্ণ, সকলেই যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিলেন। সকলেই বলিলেন, কলিকাতায় আমি যেরূপ মধ্যস্থের কার্য্য করিতেছিলাম, আর কেহ তাহা পারিবে না। কিন্তু দুষ্ট সরস্বতী আমার মাথায় অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। আমি জন্মভূমির সরিৎ সাগর ভূধরের আকর্ষণে একরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। সেই দিন অর্থাৎ হাইকোর্টে সাক্ষী দেওয়ার পরদিন রাত্রি দশটার ট্রেনে চট্টগ্রাম রওনা হইলাম। প্রদ্যোৎকুমার সন্ধ্যার সময়ে আবার আসিয়া, রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আমার গৃহে বসিয়াছিলেন। কত কথা কহিলেন, কত দুঃখ করিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার পরিবারদের একবার আমার স্ত্রীকে দেখিবার বড় আগ্রহ ছিল। সঙ্কোচ করিয়া এত দিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। এরূপ হঠাৎ যে আমি চলিয়া যাইব, তাহা জানিতেন না। রাজা বিনয়কৃষ্ণও এ কথা বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, তাঁহাদের বাড়ীর বালিকাদের রূপের বর্ণনা—মেয়ে ত নহে, এক একটি নন্দনের পারিজাতবিশেষ—আমার মুখে শুনিয়া, স্ত্রীরও একবার তাহাদের দেখিবার বড়ই আগ্রহ ছিল। তিনি তখনই গিয়া তাহাদের আনিতে চাহিলেন। তাঁহার কাছে অতি কষ্টে বিদায় লইয়া—তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন—পুত্রের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য স্ত্রী পুত্রকে পর্য্যন্ত কলিকাতায় রাখিয়া, আমি কি এক বিহ্বল অবস্থায় চট্টগ্রাম চলিলাম। ট্রেন খুলিল, মহানগরীর আলোকরাশি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইল। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িলাম। কল্পনাপ্রবণ হৃদয়ের আবেগে এ জীবনে অনেক ভুল করিয়াছি। কিন্তু এরূপে কলিকাতা ত্যাগের মত ভুল এ জীবনে আর করি নাই। এই ভুলে আমার অবশিষ্ট চাকরি-জীবন ভস্মীভূত হইল। আমি সমস্ত পথ কি এক আনন্দমিশ্রিত বিষাদে কাটাইয়া, পরদিন প্রভাতে যখন ট্রেনের গবাক্ষ খুলিয়া, সম্মুখে চন্দ্রনাথ-শৈলমালা দেখিলাম, তখন মাতৃপ্রেমে আত্মহারা হইলাম। এখান হইতে নিম্নলিখিত গানটি মুখে মুখে রচনা করিয়া, গাইতে গাইতে চলিলাম,—

মা

১

মা! মা! মা!—কত কাল পরে
ডাকিলাম মা গো পরাণ ভ'রে!
শৈল-কিরীটিনী সাগর-কুন্তলা
সরিৎ-মালিনী দেখিলাম তোরে!

২

বসি সিন্ধুকূলে, বিন্ধ্যাচল-শিরে,
যমুনার তটে, জাহ্নবীর তীরে,
ভাবিয়াছি তোরে ভাসি অশ্রুনীরে,
ডাকিয়াছি ও মা! দেশ দেশান্তরে।

৩

নাহি জুড়াইল তাপিত পরাণ,
রাখি বুকে মুখ, প্রেম করি পান,
তৃষিত চাতক এসেছে সন্তান,
জুড়াইতে প্রাণ দুদিনের তরে।

৪

যৌবনে প্রথমে যেই রক্তে, শ্যামা!
পূজিলাম পদ, সেই রক্ত, ও মা!
জীবন-সন্ধ্যায় কোথায় বল না
পাব মা পার্ব্বতি! হৃদয়-নির্ঝরে?

৫

হৃদে নাহি রক্ত; আছে নেত্রজল,
প্রেমে উচ্ছ্বসিত পবিত্র শীতল;
আশা বরষিয়া পদে অবিরল,
ঘুমাইব বুকে চিরদিন তরে।

চট্টগ্রাম ষ্টেশনে লোকে লোকারণ্য। কত আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু, অবন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত সমবেত হইয়া, কি আনন্দ পুষ্পমালায় ও কবিতামালায় বরণ করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন! এই আনন্দপ্রবাহে কলিকাতার বিদায়ের বিষাদ-ছায়া হৃদয় হইতে ভাসিয়া গেল। মাতৃপ্রেমোচ্ছ্বাসে নির্ম্মল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গৃহে উপস্থিত হইলাম।

তৃতীয় বার চট্টগ্রামের পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষে তৃতীয় বার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইয়া চট্টগ্রামে আসিলাম। তিন পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রে ও বিশ্বাসঘাতকতায় প্রথম বার ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এই পদ ছাড়িয়াছিলাম। এই পদে আবার আমাকে অধিষ্ঠিত দেখিতে আমার পরিবারবর্গের ও আমার প্রকৃত বন্ধুগণের চিরদিন একটি আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। মধ্যে যে একবার আসিয়াছিলাম, তাহা অস্থায়িরূপে। এবার স্থায়িরূপে আসিয়া আমার, ও তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল। বিশেষ আনন্দের কথা, সেই তিন জনের দুই মূর্ত্তি বহু পূর্ব্বে চট্টগ্রাম হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তিই অনুতপ্তহৃদয়ে আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে, আমার চট্টগ্রামে বদলি সংঘটিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পদে আবার অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবান্‌কে গলদশ্রুনয়নে ধন্যবাদ দিলাম। আবার আমার প্রস্তাবিত 'ফেয়ারি হিলে'র রাজপ্রাসাদসদৃশ অট্টালিকায় আমার নির্ব্বাচিত সেই সুরম্য কক্ষে বসিয়া, তাহার গবাক্ষপথে আমার জন্মভূমির অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভার অনন্ত অনর্গল ভাণ্ডার দেখিয়া, বিশেষতঃ বঙ্গোপসাগরের সহিত কর্ণফুলী নদীর ও তৎতীরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর সম্মিলনস্থান—মরি! মরি! কি সুন্দর, কবির কল্পনাতীত সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া, প্রাণে বহু বৎসর পরে বড়ই আরাম পাইলাম। পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের কক্ষ আবার এমন সামুদ্র-সবুজ (sea-green) বর্ণে রঞ্জিত ও নানা উপকরণে এরূপ সজ্জিত করিলাম যে, স্বয়ং কলেক্টর এণ্ডার্সন এক দিন আমার কক্ষ দেখিতে আসিয়া বলিলেন যে, উহা আফিস-কক্ষ ত নহে, একটি সুন্দর বৈঠকখানা (Drawing room)! ১১টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত

উহা এত আত্মীয় অনাত্মীয় দর্শকে পরিপূর্ণ থাকিত যে, প্রথম দুই এক মাস আমার কাজ করা কঠিন হইয়াছিল। তাহার উপর বাঙ্গালী দর্শক। আমি বিশ বৎসর পরে দেশে আসিয়াছি। কোন কথা নাই, হন হন করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া বসিলেন। পরিচয় ত দিলেন না; আমি ফাঁকা আলাপ করিলাম এবং চিনিলাম না বলিয়া চটিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর নাম ও পরিচয় লিখিবার জন্য কক্ষদ্বারে আর্দ্দালির হাতে একখানি 'শ্লেট' রাখিলাম। তাহার ফল আরও বিপরীত হইল। এক দিন একজন বন্ধু উহা ফেলিয়া দিতে বলিলেন। কারণ, লোকে বলিতেছে যে, শ্লেটে নাম না লিখিয়া দিলে চাপরাসি দেখা করিতে দেয় না, এমন নবাবি। নিরুপায় হইয়া তাহা রহিত করিলাম। চিনি না চিনি, যিনি আসেন, যত ক্ষণ থাকেন, তাঁহার সঙ্গে নিরুপায় হইয়া, কাজকর্ম্ম ফেলিয়া আলাপ করিতাম। কেহ কেহ বা তাম্রকূট পর্য্যন্ত তলব দিতেন। বলিতাম, কমিশনর তামাকের গন্ধ সহিতে পারেন না।

আমি যখন চট্টগ্রাম স্কুলের ছাত্র, পিতা তখন এক পাগলা জজের হাতে পড়িয়াছিলেন। জজ আমার এক আত্মীয়ের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া, এক চট্টগ্রামি নাচওয়ালীকে লইয়া এরূপ ক্ষেপিলেন যে, তাহাকে তাঁহার খোলা 'থানজানে' (একরূপ sedan chair) তুলিয়া, চট্টগ্রামে লইয়া আসিলেন। সময়ে সময়ে তাহাকে কোর্টে আনিয়া, উপস্থিত আমলা ও অর্থী প্রত্যর্থীকে 'কুইন ভিক্টোরিয়া' বলিয়া তাহাকে সেলাম করিতে বলিতেন। তখন কলিকাতা ও চট্টগ্রামের মধ্যে ষ্টীমারও খোলে নাই। এই খবর গবর্ণমেণ্টে পঁহুছিতে বিলম্ব হইল। বহু দিন এই অভিনয়ের পর জজ ফরিদপুর বদলি হইলেন। মাদারিপুরে গিয়া গল্প শুনিলাম, সেখানে তিনি সময়ে সময়ে কোর্টের সমীপবর্ত্তী এক বটবৃক্ষের উচ্চতর শাখায় বসিয়া এজলাস করিতেন। পেস্কার এক বাঁশের আগায় বাঁধিয়া ধর্ম্মাবতারের কাছে কাগজ পেশ করিতেন। এখানেও কিছু দিন এই লীলা করার পর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বলপূর্ব্বক জাহাজে তুলিয়া বিলাত পাঠাইয়া দেন। আমিও সেইরূপ, পুরা না হউক, এক অর্দ্ধপাগলের হাতে পড়িলাম। মিঃ স্ক্রীনের পাগলামির গল্পে দেশ পরিপূর্ণ। শুনিয়াছি, তিনি কুমিল্লার কলেক্টর থাকিবার সময়ে এক দিন অশ্বারোহণে রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। পার্শ্বের এক বাসাবাড়ী হইতে সপ্ সপ্ শব্দ শুনিয়া, উহা কিসের শব্দ, সঙ্গীয় ওভারসিয়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল বামুনভোজন। তিনি গৃহে পঁহুছিয়া, কত টাকায় বামুনভোজন হয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ওভারসিয়ার ত্রিশ চল্লিশ টাকা বলিলে, তিনি তাহাকে চল্লিশ টাকা দিয়া বলিলেন যে, তিনি বামুনভোজন দেখিবেন। তাহার প্রতিবাদ করে সাধ্য কার। কাজে কাজেই এক আমলার বাসায় বামুনভোজন আরম্ভ হইল। স্ক্রীন দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে দেবতাদের সেই অপূর্ব্ব আহার ব্যাপার দেখিতেছেন। পাতে ভাজি পড়িল, তাহারা খাইতে লাগিল। স্ক্রীন বলিলেন—কই, সেই সপ্ সপ্ শব্দ হইতেছে না? ওভারসিয়ার বলিলেন—একটুক অপেক্ষা করিলে হইবে। তাহার পর ডাল পড়িল, তরকারি পড়িল। সাহেব এবার ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন যে, ওভারসিয়ার তাঁহাকে 'জুঠে বাত' বলিয়াছে। কই, এখনও সপ্ সপ্ শব্দ হইতেছে না। তিনি ওভারসিয়ারকে মারিতেই চাহেন। বেচারি দৌড়িয়া গিয়া, বামুনদের মধ্য-আহারে খুব বেশী করিয়া ঘোল দিতে বলিলেন, এবং যাহাতে খুব বেশী করিয়া শব্দ হয়, সেরূপ ভাবে ঘোল খাইতে বামুনদের বলিলেন। তাহা না হইলে দক্ষিণাটা স্ক্রীন কিরূপ দিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন। তখন বামুনেরা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সপ্ সপ্ করিয়া ঘোল খাইতে লাগিল। স্ক্রীন আনন্দে পাছা চাপড়াইয়া বলিলেন—now it is all right! (এখন ঠিক হইয়াছে!) চট্টগ্রামে কমিশনর হইয়া আসিয়া, কালীপূজার জন্য এক বিরাট সভা করেন। তাহাতে প্রাচীন গণ্যমান্য উকিল, ডেপুটি—এমন কি, বিলাতফেরতা ধর্ম্মজ্ঞানহীন বাঙ্গালী ও মুসলমান

ব্যারিষ্টার পর্য্যন্ত কালীপূজার গুরুতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া, এবং পুলিস-বিভীষিকা দেখাইয়া ছয় হাজার টাকা তোলেন। কালীপ্রতিমা একটা নির্ম্মিত হইল। স্ক্রীন তাহা দেখিয়া চটিয়া লাল। হাত তুলিয়া দেখাইয়া বলিলেন—"হাম এত্না বড়া কালী মাংগতা হ্যায়।" তৈয়ারী মূর্ত্তি ভাংগিয়া ফেলিলেন। তাহার পর এত্না বড়া' হাত তোলা উচ্চ এক প্রকাণ্ড কালী প্রস্তুত হইল। হিন্দু, মুসলমান, হাকিম, আমলা, উকিল, ব্যারিষ্টার ও জমিদার মিলিয়া, যথাশাস্ত্র পূজা ও বলিদান নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ করিয়া, কলিকাতা হইতে আনীত বেংগল থিয়েটারের ত্রিরাত্রি অভিনয়ে কালীপূজা শেষ করিলেন। দেশ সুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। স্ক্রীন গবর্ণমেণ্টে না কি তাঁহার এই সকল পাগলামি সমর্থন করিয়া রিপোর্ট করিতেন যে, তিনি এই সকল আমোদ আহ্লাদের দ্বারা বাংগালীর রাজভক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন। বাস্তবিকই যদি প্রজাদের আমোদ উৎসবে রাজপুরুষেরা যোগদান করেন, তবে তাহাতে প্রজাদের রাজভক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সে আর এক কথা। আকবর এই কৌশলে হিন্দুদিগের 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' হইয়াছিলেন। আর আরংগজীবের এই কৌশলাভাবেই মোগলসাম্রাজ্য ধরাশায়ী হইয়াছিল।

আমি কিঞ্চিৎ সংকটে পড়িলাম। 'সিবিল সার্ভিসে'র অনেক মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু এমনটা দেখি নাই। চট্টগ্রামে তখন একটুক আকাল হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ নহে। আমার কার্য্য-ভার গ্রহণ করিবার দুই এক দিন পরে মিঃ স্ক্রীন দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এক মিটিং ডাকিলেন। মিটিংএর দিন বারটার সময়ে তাঁহার 'প্রোগ্রাম' পাইলাম। তিনি আরম্ভে মিটিং-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া এক বক্তৃতা দিবেন। উহা শেষ হইবা মাত্র আমাকে তৎক্ষণাৎ উহার বাংগালা অনুবাদ করিয়া শুনাইতে হইবে। আমি মনে করিলাম, তিনি বক্তৃতা লিখিয়া মিটিংএর পূর্ব্বে আমাকে পড়িতে দিবেন। আমি প্রস্তুত হইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু কই, ক্রমে ক্রমে মিটিংএর সময় হইয়া আসিল, আমি বক্তৃতার চিহ্নও দেখিলাম না। স্ক্রীন একে অস্পষ্ট কথা বলেন, তাহার উপর তোৎলা, এবং বিদ্যুৎবেগে কথার স্রোত বহিয়া যায়। অতএব বক্তৃতা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কেমন করিয়া অনুবাদ করিব, বড়ই চিন্তিত হইয়া, পিতার নাম স্মরণ করিয়া, এবং এই সংকট হইতে উদ্ধার করিতে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া, সভাস্থ হইলাম। সভাতে স্ক্রীন পঁহুছিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। উহা তিনি পূর্ব্বে লিখিয়া, মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন। তোৎলাইতে তোৎলাইতে বিদ্যুৎবেগে ও অস্পষ্ট কণ্ঠে উহা বলিতে লাগিলেন। আমি যথাসাধ্য কাণ পাতিয়া শুনিলাম। বক্তৃতা শেষ হইল। তিনি বসিবামাত্র আমি উঠিয়া তাহার অনুবাদ করিতে লাগিলাম। সকলে আশ্চর্য হইয়া শুনিতে লাগিলেন। কারণ, স্ক্রীনের কথা প্রায় অনেকেই বেশী কিছু বুঝিতে পারেন নাই। সভা-ভংগের পর অনেকে আসিয়া আমার অনুবাদের বড়ই প্রশংসা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, এমন সুন্দর ভাষায় বলিয়াছি যে, তাঁহারা লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এত দ্রুত বলিয়াছি বলিয়া, বিশেষতঃ বক্তৃতা শুনিবার অনুরোধে লিখিতে পারেন নাই। ইহার দুই এক দিন পরে এলেন সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ করিতে যাই। ইনি এখন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, আমার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, উহা আমাকে অনুবাদের জন্য পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল কি না, তাঁহারা মিটিংএর পর স্ক্রীনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্ক্রীন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বলিবার পূর্ব্বে তিনি কি বলিবেন, তাহার একটা কথাও আমি জানিতাম না। এলেন বলিলেন—"এই চাটগেঁয়ে ভাষা শুনিবার পর আপনার বাংগালা ভাষা ও সুন্দর আবৃত্তি যে কি ভাল লাগিয়াছিল, তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু আপনার অদ্ভুত স্মরণশক্তিতে সকলে বিস্মিত হইয়াছেন। একটা বক্তৃতা, বিশেষতঃ মিঃ স্ক্রীনের, শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এরূপ সুন্দর বাংগালায় অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করিয়া আপনি আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইয়াছেন।" কিছু দিন

পরে 'ইংলিসম্যানে' স্বয়ং স্ক্রীনের লিখিত এই মিটিংএর বিবরণ বাহির হইল। দেখিলাম, স্ক্রীনও লিখিয়াছেন যে, "তৎক্ষণাৎ কমিশনরের বক্তৃতা বঙ্গের খ্যাতনামা কবি বাবু নবীনচন্দ্র সেন, পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অনর্গল (eloquently) অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ স্মরণশক্তির একটা আশ্চর্য্য ক্রীড়া (a wonderful feat of memory); কারণ, তিনি পূর্ব্বে এই বক্তৃতার একটি শব্দও জানিতেন না।" ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। দেখিলাম, চট্টগ্রাম-স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক ভ্রাতাযুগল দুর্গাচরণ ও উমাচরণ দত্ত টেবিলের খুঁটার সঙ্গে আমাকে গলবস্ত্রে বন্ধন করিয়া, ভূগোল মুখস্থ করাইয়া, স্মরণশক্তির যে বিকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই বৃদ্ধ বয়সেও একটুক কাজে লাগিল। এই সংকট হইতে শ্রীভগবান্ ও পিতা উদ্ধার করিলেন।

এইরূপে মিঃ স্ক্রীনের নিত্য নূতন খেয়াল চাগিয়া উঠিতে লাগিল। রক্ষা ছিল যে, তিনি সপ্তাহে মাত্র একদিন আফিসে আসিতেন। তাঁহার আদেশ ছিল যে, তাঁহার আফিসে আসিবার সময়ে পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টকে সিঁড়ির উপর উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার যে দিন যে আদেশ থাকে, তাহা শুনিতে হইবে। কোনও দিন সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, nasty (ঘৃণিত) হুকার গন্ধ পাইয়াছেন। ইংরাজিতে 'Hooka, Hooka' (হুকা, হুকা) করিতেছেন। কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিছুক্ষণ পরে বিষয়টা কি বুঝিলাম। বলিলাম, তাঁহার কক্ষদ্বারে কি সোপানে হুকা টানিবে, এমন 'কলিজা' কাহার? তিনি তাহা বিশ্বাস করিলেন না। লাঠি ঘাড়ে করিয়া সোপানের পার্শ্বস্থিত আফিস-কক্ষে ছুটিলেন। কেরানিগণ লেখাপড়া ফেলিয়া, দৌড়িয়া, নানা কৌতুকতর ভাবে পলায়ন করিল। ফিরিয়া আসিয়া নিজের কক্ষের চেয়ার, টেবিল, বাক্স, সকলই লাঠির দ্বারা উল্টাইয়া ফেলিলেন। চেয়ার, টেবিল, বাক্স ত আর হুকা খায় না। তাহাদের চিৎপাত করিলে হুকা তামাক বাহির হইবে কেন? 'ফেয়ারি হিলে'র পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও তামাকের গন্ধ নাই। তথাপি তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন যে, তিনি তামাকের গন্ধ পাইতেছেন। কাজেই আমারও 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' না বলিয়া উপায়ান্তর নাই। বলিলাম, সিঁড়ির নীচে বোধ হয় কেহ তামাক খাইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিয়া সে পলায়ন করিয়া, সহুকা একেবারে পাহাড়ের নীচে চলিয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই সময়ে সময়ে এ দৃশ্য দেখা যাইত। কোনও আমলা কোথায়ও লুকাইয়া তামাক খাইতেছে। আর যেই স্ক্রীন সাহেব আসিতেছেন শুনিয়াছে, অমনি কলনিনাদী তাম্রকূটযন্ত্রহস্তে সে তাহার চাদর বা চাপকানের লেজ পতাকাবৎ উড়াইয়া, প্রাণভয়ে পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ দিকে আমি আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টের কক্ষই আমলা ও হাকিমদের তাম্রকূট সেবনের ''লাইসেন্সড্' (পাসপ্রাপ্ত) আড্ডা ছিল। আমাকে সে নরক পরিষ্কার করিতে হইয়াছিল। বোধ হয় সেখান হইতে তামাকের সধূম সৌরভ প্রাপ্ত হইয়া স্ক্রীন সাহেব এরূপ তামাকের উপর ক্ষেপিয়াছিলেন। অন্য কোনও দিন সিঁড়ি বাহিয়া উঠিবার সময়ে পার্শ্বের অনারারি মাজিস্ট্রেটের কক্ষে একজন আমলাকে 'বঙ্গবাসী' কাগজ পড়িতে দেখিয়া, ক্ষুদ্রমূর্ত্তি স্ক্রীন এরূপ বিকট গর্জন করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিলে স্বয়ং 'বঙ্গবাসী'র স্বনামধন্য সম্পাদক পেশাদারি হিন্দুয়ানি উদ্গিরণ করিতে করিতে দশ দিক্ অন্ধকার করিয়া ঘটোৎকচের মত পড়িয়া যাইতেন। মিঃ স্ক্রীন গর্জ্জন করিতে করিতে উপরে আসিয়া বলিলেন যে, কোন্ আমলা dirty rag (ময়লা নেকড়া) বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়িতেছিল, তাহা আমাকে তদন্ত করিয়া আসিতে হইবে। আমি যাইয়া দেখি, আমলা দৌড়িতেছে, এবং তাহার পশ্চাতে 'বঙ্গবাসী', পার্ব্বত্য বাতাসে হিন্দুয়ানির বোঝা সহ নানা বিকৃত লীলা করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। চারি দিকে লোকে খিল খিল করিয়া হাসিতেছে। স্বয়ং স্ক্রীন সাহেবও আজ মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। কালীপূজক স্ক্রীন সাহেবের দ্বারা যখন 'বঙ্গবাসী'র এই 'অকথ্য অবমাননা ও সর্ব্বনাশ', তখন আর কে

দেশের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবে! আমি অপরাধী 'বঙ্গবাসী'কে পবনদেবের ক্রীড়া হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইয়া, স্ক্রীন সাহেবের কাছে হাজির করিলাম এবং ঘটনাটি আমূল রিপোর্ট করিলাম। 'হুকা সার্কিউলার' জারি হইয়াছিল। ডার্টি (নোঙরা) বাঙ্গালা সংবাদপত্র আফিসে না পাড়িবার জন্য আর এক 'সার্কিউলার' (চক্র আদেশ?) জারি করিবার জন্য আমার প্রতি হুকুম হইল। এ সকল মহামূল্য আদেশ শুনিবার ও প্রচার করিবার জন্য আমাকে ঘণ্টার গরুড়ের মত তাঁহার আসিবার সময়ে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। যে দুই এক ঘণ্টা আপিল শুনিবার জন্য আফিসে থাকিতেন, ঘন ঘন গর্জ্জনে 'ফেয়ারি হিল' কম্পিত করিতেন। সময়ে সময়ে উকিল মোক্তারগণ 'জগদম্বা! আপনি বাঁচলে বাবার নাম' বলিয়া এক হাতে শকটচক্র সামলা ও অন্য হস্তে চোগা চাপকানের লেজ ধরিয়া পলায়ন করিতেন। কেহ বা অন্যবিধ অকর্ম্ম করিয়া ফেলিতেন।

কিন্তু মিঃ স্ক্রীন বড় যোগ্য লোক। এমন সুলেখক ও শাসনকার্য্যে দক্ষ কর্ম্মচারী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার ইংরাজি লেখার জন্য তিনি ভারতখ্যাত ছিলেন। দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার এরূপ অদম্য উৎসাহ যে, তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেইখানেই দেশহিতকর কার্য্যে তাঁহার কীর্ত্তি রাখিয়া আসিয়াছেন। চট্টগ্রাম যে অস্বাস্থ্যের জন্য এরূপ ভীষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ তিন 'জ'—জল, জঙ্গল, জলাশয়। তাহার পর পায়খানার বেবন্দোবস্ত। চট্টগ্রামে সহরের উপর যে কয়েকটি নির্ঝর আছে—এখানের লোক ঝর্ণা বলে—তাহার অপর্য্যাপ্ত জল লবণাক্ত ও কর্দ্দমাক্ত কর্ণফুলী নদীতে গিয়া পড়িতেছে, অথচ সহরের উপর ঘন বসতির স্থানে পানীয় জলের একান্ত অভাব। স্থানে স্থানে জঙ্গল এরূপ যে, দিবা দ্বিতীয় প্রহরেও তাহাতে রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারে না। অথচ সকলই কুবৃক্ষের জঙ্গল বলিলেও চলে। কারণ, চট্টগ্রামে সুফলাভাব। যাহা আম্র হয়, তাহা এরূপ কীটদুষ্ট যে, পাকিলে তাহার এক খণ্ডও পাওয়া যায় না। অতএব লোকে উহা চৈত্র বৈশাখ মাসে কাঁচা অবস্থায় লবণ, লঙ্কা ও গুড় মাখিয়া একরূপ চাটনি করিয়া খায়, এবং তাহার ফলে উক্ত সময়ে চট্টগ্রাম সহরে ঘোরতর জ্বরের প্রাদুর্ভাব হয়। জলাশয় যাহা আছে, সকলগুলিই একরূপ সবুজবর্ণ বিকৃত সলিলে পূর্ণ। এরূপ জল অন্য স্থানের গরু বাছুরেও স্পর্শ করে না। ইহার উপর নির্ঝর হইতে যে সকল স্রোত নির্গত হইয়া নদীতে গিয়াছে—ইহাদিগকে স্থানীয় লোকেরা 'ছড়া' বলে,—তাহাতে সহরের পায়খানা! সমস্ত বৎসর এই সকল পায়খানার ময়লা সঞ্চিত হইয়া থাকে, কেবল বর্ষার সময়ে ছড়ায় নদীর জোয়ার আসিলে এই সঞ্চিত ময়লা ধুইয়া যায়। কর্ণফুলী ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া, নগরের সমক্ষে বিস্তৃত চর সৃষ্টি করিতেছে। প্রত্যহ সহস্র গ্রামবাসী আজানু কর্দ্দম পার হইয়া নৌকা হইতে নগরে আসিতেছে। ইহাদের ক্লেশ দেখিলে পাষাণেরও দয়া হয়। অথচ এই চট্টগ্রামে পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ 'মিউনিসিপ্যালিটি' আছে। তথাপি ইহার কিছুই প্রতিবিধান হয় নাই। আমি স্কুলের শেষ শ্রেণীতে নাম লেখাইবার সময়ে চট্টগ্রাম সহরের যেরূপ মিউনিসিপ্যাল অবস্থা দেখিয়াছিলাম, নগর বৃদ্ধি হইয়া আজও মিউনিসিপ্যালিটির ঠিক সেরূপ অবস্থা ও ব্যবস্থা। ইংরাজেরা বলেন—"ঈশ্বর আহার্য্য প্রেরণ করেন, আর পাচক প্রেরণ করেন 'ডেভিল' (সয়তান)।" আমিও একবার চট্টগ্রামের মাজিস্ট্রেটকে বলিয়াছিলাম, তদ্রূপ ঈশ্বর আমাদিগকে এরূপ সুন্দর নগর দিয়াছেন, আর মিউনিসিপ্যাল কমিশনর দিয়াছেন—'ডেভিল'। ইহার উপর আমার পাপে নগরের স্বাস্থ্যকর উত্তরাংশ শূন্য হইয়া দক্ষিণাংশে এরূপ ঘন বসতি হইতেছে যে, ঘরের চালে চাল লাগিয়া যাইতেছে। আমার প্রথম পার্শন্যাল এসিষ্টেন্সির সময়ে দেওয়ানি আদালত উত্তরাংশের পর্ব্বতসানু হইতে দক্ষিণাংশে আনিয়া, আমি নগরের এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছি। পূর্ব্বে কলেক্টরির ও কমিশনরির বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত দুই মাইল পথ হাঁটিয়া উত্তরাংশ হইতে আফিসে আসিত, এবং আদালতের কর্ম্মচারীরা সেই উচ্চ

পাহাড় বাহিয়া আফিসে যাইত। এই শারীরিক ব্যায়ামে তাহাদের কি বলিষ্ঠ দেহই ছিল, এবং কি স্বাস্থ্যসুখ তাহারা ভোগ করিত! এখন সকলে নগরের অস্বাস্থ্যকর দক্ষিণাংশে, বিশেষতঃ 'ফেয়ারি হিলে'র চারি দিকে একটা খড়ের গৃহের সুন্দরবন সৃষ্টি করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ মিউনিসিপ্যালিটি নীরবে চাহিয়া আছে। এই সকল কারণে আমি মধ্যে যে একবার অস্থায়ী পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইয়া আসিয়াছিলাম, সে সময়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছিলাম।

১। ঝর্ণায় ঝর্ণায় 'পাম্প' বসাইয়া, সমস্ত জল 'পাইপে'র দ্বারা সহরে চালাইতে হইবে, এবং স্থানে স্থানে উহা জলাশয়ে লইয়া গিয়া, 'রিজার্ভ' জলাশয় করিতে হইবে।

২। যেখানে জঙ্গলের জন্য রৌদ্র ও বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে না, সেখানকার জঙ্গল কাটিতে হইবে।

৩। দূষিত জল ও কর্দ্দমপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়সকল যথাসম্ভব পাহাড়ের মাটি আনিয়া ভরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং বড় বড় জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়া, উপরোক্তভাবে রিজার্ভ করিতে হইবে।

৪। 'ছড়া'র পায়খানা উঠাইয়া দিয়া, পশ্চিম হইতে মেথর আনিয়া পায়খানার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫। বক্‌সির হাটে নদীর প্রধান ঘাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকার মালা গাঁথিয়া একটা floating jetty (ভাসমান পুল) প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহাতে 'টোল' বসাইয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ ও মিউনিসিপ্যালিটির আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে।

৬। গৃহ নির্ম্মাণের নিয়ম (building regulation) প্রচলিত করিয়া এবং আদালত আবার উত্তরাংশে লইয়া দক্ষিণাংশের বসতির ঘনতা নিবারণ করিতে ও উত্তরাংশে বসতি স্থাপন করিতে হইবে।

চট্টগ্রামের তদানীন্তন কলেক্টর কার্লাইল আমার প্রস্তাবগুলিন, বিশেষতঃ প্রথম প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া আমার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। আমার বদলির পর তিনিও বদলি হইয়া যান। কাজেই কিছুই হয় নাই। মিঃ স্ক্রীন প্রায় সমস্ত প্রস্তাবগুলিতে হাত দিয়াছেন। তবে আমার সহজ প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণ না করিয়া, কি না জানিয়া, তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পাহাড়তলি রেলওয়ে আফিসাদির নিকটে পর্ব্বতগহ্বরে এক বৃহৎ জলাশয় Reservoir করিয়া, তিনি সেখান হইতে কলে জল আনিয়া, নগরে নিয়মিত Water work (জলপ্রণালীর) ব্যবস্থা করিবেন। তাহার ব্যয় তিন লক্ষ। এক লক্ষ রেলওয়ে এই জল ব্যবহারের জন্য দিবে, এক লক্ষ ডিঃ বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি ধার করিবে, এবং এক লক্ষ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, এরূপ প্রস্তাব করিয়া তিনি অদম্য উৎসাহে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতেছিলেন। আফিসের অন্য কার্য্য তিনি প্রায় কিছুই করিতেন না। তিনি তাহার জন্য কতকগুলিন সাঁট করিয়াছিলেন। ডাক আসিলে চিঠি সকল পড়িয়া, তিনি তাহার উপর এই সকল সাঁট চিহ্ন বা অক্ষর মাত্র লিখিয়া দিতেন। তাহার পর সেই সাঁটমতে সমস্ত কার্য্য আমি করিতাম। কেবল জলের ও পায়খানার বন্দোবস্তের ফাইলগুলি মাত্র তাঁহার কাছে পাঠাইতে হইত। আমার জবাবদিহি বড়ই গুরুতর। পাহাড়তলির চৌকিদারি ট্যাক্‌সের বিরুদ্ধে রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ আপীল করিয়াছেন। উহা আমি কেমন করিয়া নিষ্পত্তি করিব? 'ফাইল' তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছি। তিনি তাহার উপর লিখিয়া দিয়াছেন—"আমাকে যদি পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টের কার্য্য করিতে হইত, তবে আমি তাহার বেতন মাত্র পাইতাম।" তখন হইতে এই সকল আপিলও আমি নিষ্পত্তি করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, এই জনাই তিনি আমাকে এত চেষ্টা করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি আফিসের উপরও ভয়ানক চটিয়া-

ছিলেন। আমি আসিলে আমাকে বলিলেন, "The office is simply execrable (আফিসটি অভিশাপের উপযুক্ত)।" আমি দেখিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমার পূর্ব্ব-বর্ত্তী তাঁহার নিজের বিদ্যা দেখাইবার জন্য আফিসের কেরানীদের মুসাবিদাসকল লাল কালিতে কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিয়া কমিশনরের কাছে পাঠাইতেন। মিঃ স্ক্রীন একে ত চাহেন না যে, এরূপ কাজ তাঁহার কাছে যায়, তাহাতে এরূপ কাটাকুটি দেখিয়া, মহা চটিয়া, তাহার উপর disgraceful ইত্যাদি অমৃতবাণী লিখিয়া, ফাইল ফেরত দিতেন। আমি দেখিলাম, এক দিকে ত এই। অন্য দিকে এই সকল মুসাবিদা আমাকে কাটিতে হইলে আমাকে দিন-রাত্রি অবিরাম খাটিতে হইবে। আমি বলিয়াছি যে, বারটার আগে এবং তিন চারটার পর কলম ধরা আমার অভ্যাস নাই। অতএব আমি প্রথমে যে কার্য্য যে কেরানীর দ্বারা চলিবে, বিবেচনা করিয়া, তাহাকে সে কার্য্য দিলাম, এবং কাহারও মুসাবিদা বা 'নোট' আমার মনোমত না হইলে আমি তাহাকে ডাকিয়া উহার দোষ দেখাইয়া দিয়া, এক বার, দুই বার, তিন বার তাহাকে আবার মুসাবিদা বা নোট লিখিতে দিতাম। নিতান্ত না পারিলে আমি মুখে বলিয়া লেখাইয়া দিতাম। অতএব অল্প দিনের মধ্যে কার্য্য এমন সহজে ও সুশৃঙ্খলায় চলিতে লাগিল যে, মিঃ স্ক্রীন তজ্জন্য আমাকে বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয় হইয়া একদিন আমার এক সেট বহি চাহিলেন। আমি বুঝিলাম যে, তাঁহার ইচ্ছা—তিনি আমাকে একটা 'রায় বাহাদুর' করিবেন। আমি পুস্তক পাঠাইয়া লিখিলাম যে, পুস্তক চাহিবার উহাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমাকে মুখ খুলিয়া বলিতে হইতেছে যে, আমি 'রায় বাহাদুরি'কে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখি। তিনি আমাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, প্রথমতঃ আমি দরিদ্র, উপাধির উপযোগী আমার অবস্থা নহে। দ্বিতীয়তঃ এই চট্টগ্রামেই এরূপ লোক 'রায় বাহাদুর' হইয়াছে —একজনকে আমিই করিয়াছিলাম—যে, তাহাদের পার্শ্বে বসিলেও, আমার ও আমার বংশের অমর্য্যাদা হইবে। তিনি বলিলেন,—ঠিক কথা, গবর্ণমেণ্ট উপাধিগুলিন বিক্রয়ের পদার্থ করিয়া এরূপ ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছেন। এ জন্য এখন ভাল ভাল লোককে উপাধি দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পরিয়াছে। জানি না, তিনি গবর্ণমেণ্টে আমার নাম পাঠাইয়াছিলেন কি না, কিন্তু তাঁহার এরূপ উত্তর পাইয়া আমি বড় নিশ্চিন্ত হইতে পারিলাম না। তাহার উপর এক ঢাকাই 'রায় বাহাদুর' আমাকে হঠাৎ এক দিন লিখিয়াছেন—তিনি কখনও আমার কাছে পত্র লেখেন নাই—যে, তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, এ বার 'জুবিলি'র সময়ে আমি 'রায় বাহাদুর' হইব। ইহাঁরা নিজে উপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া খুঁজিয়া বেড়ান যে, আর কেহ এই সংক্রামক রোগে তাঁহাদের অবস্থাপন্ন হইতেছে কি না। উহাই তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা। এই পত্র পাইয়া একরূপ আহার-নিদ্রাশূন্য হইলাম। যে দিন 'উপাধি গেজেট' বাহির হইবে, সে দিন প্রথম আফিসে চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট প্লীডার হাসিতে হাসিতে আমার কক্ষে আসিয়া বলিলেন—"উপাধি গেজেট দেখিয়া আসিলাম।" আমি ভাবিলাম—তবেই হইয়াছে। বুঝি এই দুর্গতি আমার ঘটিয়াছে। চট্টগ্রামের একজন উকিল 'রায় বাহাদুর' হইতে অমৃত বোসের গাণিক্য ধনের মত ক্ষেপিয়াছে। সে প্রথম হাসিয়া বলিল—"তাহার নাম নাই। এবার সে গলায় দড়ি দিয়া মরিবে।" কিন্তু আছে কার নাম?—চট্টগ্রাম-বিভাগের একটা অশ্রুতনামা মুসলমানের নাম। ইনি মিঃ স্ক্রীনের এক প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাহার পর ঢাকার দাদা কালীপ্রসন্নের পত্র পাইয়া জানিলাম যে, আমার আসন্ন উপাধি তাঁহার স্কন্ধে পড়িয়াছে, এবং তিনি আনন্দে আটখানা হইয়াছেন। আমি ভাবিলাম—"যা শত্রু পরে পরে"। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, তিনি যখন এত সুখী হইয়াছেন, আমরাও সুখী। কিন্তু আমার মতে তিনি সাদাসিদা কালীপ্রসন্ন ঘোষ থাকিলে তাঁহার পক্ষে সম্মানের বিষয় হইত। তিনি 'এমন রসে বিরসের ধ্বনি' শুনিয়া বোধ হয় বিরক্ত হইয়াছিলেন। কারণ, তাহার পর বহুদিন তাঁহার

পত্র পাইলাম না। আমি এই দ্বিতীয় বার 'রায় বাহাদুরি' হেলায় হারাইলাম। এই উপাধি-ব্যাধির দিনে এ কথা কে বিশ্বাস করিবে?

মাতৃসেবা

১। পুত্রের উপনয়ন

কিন্তু স্ক্রীন সাহেবের এই অনুগ্রহে আমার এক প্রকার কয়েদীর অবস্থা হইয়া পড়িল। তিনি রবিবারে, কি বন্ধের দিনেও আমাকে কোথাও যাইতে দিতেন না। ছুটি চাহিলে বলিতেন যে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ভার আমার উপর দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন বলিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন। আমি ছুটি লইলে তাঁহার কার্য্য কিরূপে চলিবে। এমন কি, আমার পুত্রের উপনয়নের জন্যও তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় আমাকে একটি দিন মাত্র ছুটি দিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের বৈদ্যেরা অনেকে উপনয়ন-ভ্রষ্ট, কাজেই জাতিভ্রষ্ট। কারণ, একমাত্র উপনয়নের দ্বারাই তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন। আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও উপনয়নই তাহাদের সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। উহাই আর্য্য-জাতির বিশেষ লক্ষণ। পূর্ব্ববঙ্গের অধিকাংশ বৈদ্যের উপনয়ন-ভ্রষ্ট হইবার নানাবিধ উপাখ্যান আছে। নিজ চট্টগ্রামেই ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন হয়, এবং উহার নিষ্পত্তির জন্য এক মহতী বৈদ্যসভা পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে আহূত হয়। আমি এই সভার একটা পুরাতন মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী পাইয়াছিলাম। তাহাতে রাজবল্লভের সময়ের সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতাগ্রণীর স্বাক্ষরিত উপনয়ন-ভ্রষ্ট বৈদ্যজাতির উপনয়নের একখানি ব্যবস্থা ও উপনয়ন-পদ্ধতি মুদ্রিত ছিল। আমি এই ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অনুসারে পুত্রের উপনয়নের সংকল্প দুই বৎসর পূর্ব্বে করিয়াছিলাম। তাহাতে দেশে ঘোরতর আন্দোলন উঠিল যে, 'যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতা পিতামহাঃ' ধর্ম্মটা নষ্ট করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি। যাহা হউক, যাঁহারা আমার প্রধান বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইতিমধ্যে নিজে বুড়ো বয়সে বিনা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন, কেহ কেহ বা আপনার পুত্রদের 'শিব-গায়ত্রী'—জানি না, জিনিসটা কি—দিয়া উপনয়ন করাইয়াছেন। কারণ, 'প্রণব' গ্রহণ করিলে 'শূদ্র' হইবে কি না, ভয় আছে। আমি স্থির করিলাম যে, উপনয়ন দিতে হইলে 'প্রণব' না দিয়া একটা খিচুড়ি পাকাইব না। সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—ইহাতে কখনও শুভ হইবে না। সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীভগবানের ধ্যান শিক্ষা দিলে যদি অমঙ্গল হয়, তবে আর মঙ্গল কিসে হইবে? 'হিন্দুধর্ম্ম' চুলায় যাক্—'হিন্দু' শব্দ কোনও শাস্ত্রে কি অভিধানে নাই। শুনিয়াছি—উহা পারস্য শব্দ, অর্থ গোলাম। 'প্রবণ' সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ও আর্য্যদর্শনের সারাংশ, মূল তত্ত্ব। 'প্রবণ'ই বেদের, কাজে কাজে আর্য্যধর্ম্মের চরম তত্ত্ব, চরম শিক্ষা, চরম সাধনা। 'প্রবণ'ই আমাদিগকে অনন্ত অতীতের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে, এবং প্রত্যহ সেই অতীত আমাদের স্মৃতিপথে আনিয়া, আমাদের এই পতিত সময়েও আমাদের হৃদয় গৌরবে, গাম্ভীর্য্যে ও মনুষ্যত্বে পূর্ণিত করে। যে প্রণব না শিখিল, না বুঝিল, সে আর্য্যধর্ম্মের কিছুই শিখিল না, বুঝিল না। যাহারা প্রণবে অধিকার নাই, সে অনার্য্য। যদি এই সনাতন ধর্ম্মের নাম 'হিন্দু' রাখিতে চাহ, তব সে 'অহিন্দু'। অতএব আমি পুত্রকে 'প্রণবে'ই দীক্ষিত করিলাম। যখন শিশু গৈরিক পরিধান করিয়া, এই মহাদীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারী সাজিল, তখন আমাদের পতি পত্নীর চক্ষে দরদর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল। জগতে এমন পবিত্র দৃশ্য বুঝি আর নাই। তাহার উপর যখন সেই শিশু সন্ন্যাসী খোল করতালের সঙ্গে গাইতে লাগিল।—'আমার ডোর কৌপীন দেও ভারতি গোঁসাই!'—তখন সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ও নরনারী সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। সেই

শিশু সন্ন্যাসী যখন আমার কাছে ভিক্ষা চাহিল, আমি তাহাকে বক্ষে লইয়া প্রণবের অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বলিলেন যে, তাঁহারা প্রতি বৎসর কত উপনয়ন দিয়া থাকেন। কিন্তু এত দিনে তাঁহারা প্রকৃত উপনয়ন কি, তাহা বুঝিলেন। এত দিনে একটি প্রকৃত উপনয়ন দেখিলেন। তাহা হইলে কি হয়? আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে আমার বাড়ী হইতে বলিদান উঠাইয়া দিয়াছি। নিরীহ ছাগ ও মহিষ-শিশুগুলি ঘোরতর নিষ্ঠুরভাবে বলিদান দিলে যে জগৎপিতা দয়াময় ভগবান্ বা জগন্মাতা দয়াময়ী ভগবতী কেন আপনার সন্তান-হত্যায় প্রীত হইবেন, এবং এই ঘোরতর জীবঘাতী হিংসাকার্য্য কিরূপে ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে, আমি তাহা বুঝিতে পারি না। তবে পুরাতন নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা ভগবান্‌কে না নিবেদন করিয়া কিছুই গ্রহণ করিতেন না। কাজেই মাংস খাইতে হইলে উহা তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এরূপ নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি অতি কষ্টে একটি মাত্র ছাগল বৎসরে বলিদান দিতেন, এবং সেই একবার মাত্র মাংসাহার করিতেন। এরূপ বলিদানের অর্থও জীবহিংসা নিবারণ। শ্রীভগবানের নিকট বলিদান দিয়া মাংস খাইতে হইলে উহা কত ব্যয়সাধ্য! কিন্তু এখন বলিদান যে যত দিতে পারে, তাহার তত বাহাদুরি, এবং অনিবেদিত মাংস দূরে থাকুক, কসাইয়ের মাংস পর্য্যন্ত এই বাহাদুরেরা খাইতে ছাড়েন না। আমি বলিদান উঠাইয়া দিলে, এই 'যেনাস্য পিতরো যাতা' বাহাদুরের দল ক্ষেপিয়া উঠিল। জ্ঞাতি-বিদ্বেষের মারাত্মক বিদ্বেষ আর নাই, রাবণও বুঝিয়াছিল। আমার বংশীয়েরা সভার পর সভা করিয়া, জোর কয়িরা আমার বাড়ীতে আমার বংশের কুলমাতা দশভুজার কাছে বলি দিবেন বলিয়া, তাঁহাদের এক জনকে দৌত্যে বরণ করিয়া, আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আমি জননীকে বলিব—"মা! নিরীহ ছাগল-শিশু খাইয়া কি হইবে, এই বলিদানকারীদিগকে নরবলি লও!" আমার সেরূপ করিবার অধিকার কি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি দণ্ডবিধি-তন্ত্রের দোহাই দিয়া বলিলাম যে, আমি স্বয়ং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, অতএব আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসে কেহ আঘাত করিলে, আমার আত্মরক্ষার অধিকার কি আছে, আমি জানি! তাহার পর তাঁহারা আমার পার্শ্বের একটি দরিদ্র অংশীদারে বাড়ীতে হাড়িকাঠ পুঁতিয়া বলিদান দিবেন সংকল্প করিলেন। আমি বলিলাম যে, আমার বাড়ী ডিঙ্গাইয়া মা বলি খাইতে পারিলে আর একখানি ঘর ডিঙ্গাইয়া কি খাইতে পারিবেন না? আর একখানি ঘর পার হইলেই তাঁহাদের বাড়ী। শেষে এই মহৎ সংকল্পও ত্যাগ করিয়া, সে বৎসর তাঁহারা বলির সংখ্যা আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিলেন। হিন্দু কলাপাতের বুকের দিকে খায় বলিয়া মুসলমান তাহার পিঠের দিকে খায়। কেবল তাহা নহে, দেশময় আনন্দের ধ্বনি উঠিল যে, দশভুজা বলি খাইতে না পাইয়া, শীঘ্রই আমার মুণ্ডটা ভক্ষণ করিবেন। হা অদৃষ্ট! ইহাই কি আজ হিন্দু ধর্ম্ম! কিন্তু যখন দেখিলেন যে, আমার মুণ্ডটা আমার স্কন্ধের উপর ঠিক রহিয়া গেল, তখন ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বলির সংখ্যা কমিয়া, এখন হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় দাঁড়াইয়াছে। কারণ, উঠাইয়া দিলে যে আমার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা হয়। তাহার অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। আমি যদি কোনও কার্য্য করিয়া স্বর্গে যাই, তাঁহারা বরং তাহার বিপরীত করিয়া নরকে যাইবেন, তথাপি তাঁহারা আমার অনুকরণ করিবেন না। দীনবন্ধুবাবুর রামমাণিক্যের সেই মহাবাক্য—"বাগ্যদরি ভাইভাতারি করবে, সেও ভাল; তবু পরের লগে দেহ দিব না।" যাহা হউক, এবারও এই "পিতরো যাতা" গ্রাম্য পাটোয়ারির দল বলিলেন—আমার নিশ্চয় একটা ঘোরতর বিপদ্ হইবে। তাহার পর যখন আমার পল্লীগ্রামের বাড়ী দগ্ধ হইল, তাঁহারা বলিলেন—"এই দেখিলে! প্রণবে ব্রাহ্মণের মাত্র অধিকার। উহাতে পূর্ব্বে বামুনের মুখে আগুন জ্বলিত (বোধ হয়, শীতকালে এখনও জ্বলে)। সেই আগুনে তাঁহার বাড়ী পোড়া গিয়াছে।" তবে খট্‌কার মধ্যে এই ছিল যে, এই প্রণবের আগুনে তাঁহাদেরও কাহারও কাহারও বাড়ীও এই সঙ্গে পুড়িয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক পোড়া গিয়াছিল বেলা

দুইটার সময়, আমার সংসার-জ্ঞানহীন ভ্রাতা ও তাঁহাদের পরিবারবর্গের অসাবধানে। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, আমার গুরুদেব ৺শঙ্কর পুরী আমার বাড়ীর আগুন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। আর কখনও পোড়া যাইবে না। এই বিশ্বাসের ফলে তাহারা আগুন লইয়া যদৃচ্ছা খেলা করিত। এই উপনয়নের সময়ও আমি তাহাদের অসাবধানতা দেখিয়া, বারম্বার তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলাম যে, তাহারা বাড়ীখানি না পোড়াইয়া ছাড়িবে না। যাহা হউক, প্রণবের এই আগুন ক্রমে নিবিয়া আসিতেছে, এবং তাহার পর চট্টগ্রামের বৈদ্যদের মধ্যে ক্রমে উপনয়ন প্রচলিত হইতেছে। বুদ্ধদেব পশুঘাতী হিন্দুধর্ম্মের সকলই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। রাখিয়াছিলেন কেবল এই উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যা। এই রেঙ্গুনে পালে পালে শিশু ব্রহ্মচারীর দল গৃহ ত্যাগ করিয়া 'কেয়াঙ্গে' বৌদ্ধ 'ভিক্ষু' বা 'ফুঙ্গি'দের সঙ্গে বাস করে, এবং তাহাদের সঙ্গে ভিক্ষায় বহির্গত হয়। ধনী দরিদ্র সকল ব্রহ্মজাতীয় লোকের শিশু পুত্রদের, দীক্ষিত হইয়া কিছু কাল ব্রহ্মচর্য্যা গ্রহণ করিতে হয়। শুনিয়াছি, অদ্ভুতকর্ম্মা শ্বেতাঙ্গিনী এনি বেশান্তও তাঁহার কাশীস্থ হিন্দুকলেজে এই ব্রহ্মচর্য্য প্রচলিত করিয়াছেন।

২। স্থানীয় উন্নতি

চট্টগ্রাম সহরের পায়খানার বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করাতে সহরের ইতর মুসলমানেরা আবার লালচাঁদ চৌধুরীর মোকদ্দমার সময়ের মত আগুন জ্বালাইয়াছে। দিন রাত্রি সহরে স্থানে স্থানে আগুন লাগিয়া লোকের সর্ব্বনাশ হইতেছে। মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ তাঁহাদের ধনপ্রাণভয়ে অস্থির। একজনকে গাড়ী হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, অবৈতনিক কমিশনরির কিছু বেতনও দেওয়া হইয়াছে। এলেন সাহেব অগ্নি নির্ব্বাণের ভার প্রাপ্ত হইয়া দিন রাত্রি— "কোতোয়াল যেন কাল খাড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশান হান্ হান্ ডাকে॥"

মিঃ স্ক্রীন পাগলামি করিয়া এক 'সার্কিউলার' জারি করিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে কেহ কই মাছ ভাজা করিতে পারিবে না। ইংলিসম্যানের পত্রপ্রেরক--বোধ হয় মিঃ এলেন, কি মিঃ এণ্ডারসন---এই 'কই মাছ ভাজা' লইয়া দেশ শুদ্ধ লোককে হাসাইয়াছে। মিঃ স্ক্রীনকে পাকা কমিশনর করিতে গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই নারাজ ছিলেন। এখন কবুল জবাব দিলেন। মিঃ স্ক্রীন চটিয়া, পদত্যাগ করিয়া, বিলাত চলিয়া গেলেন, এবং যাইবার সময়ে তাঁহার প্রতিকূলে যাঁহারা ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি 'ক্যাপিটাল' কাগজে এক পত্রে 'বিদায়ী অস্ত্র' ত্যাগ করিয়া, 'সিমলা দলে'র রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া গেলেন। দেখিলাম, 'সিভিল সার্ভিসে'ও বেশ একটুক দলাদলি আছে। কটন সাহেবও সময়ে সময়ে Simla clique তাঁহার অনিষ্টকারী বলিয়া বলিতেন। যাহা হউক, স্ক্রীন চলিয়া গেলেন, এবং চট্টগ্রামের স্থানীয় উন্নতির আশা ফুরাইল। তাঁহার স্থানে মিঃ কলিয়ার (Collier) আসিলেন। তিনি বহু দিন আলিপুরের কলেক্টর ছিলেন। সকলে বলিতেন যে, তিনি শিবতুল্য লোক। দেখিলাম, বাস্তবিকই তাই। এমন শান্ত, স্থির, ধীরপ্রকৃতির লোক আর সিভিল সার্ভিসে দেখি নাই। আমি প্রথম দিনই তাঁহাকে বলিলাম যে, মিঃ স্ক্রীন কেবল তাঁহার নিজের প্রিয় কয়েকটি বিষয়ের 'ফাইল' নিজে দেখিতেন, অন্য যাবতীয় কার্য্য আমি নির্ব্বাহ করিতাম। মিঃ কলিয়ারের সময়ে কিরূপ কার্য্য করিব, উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এই তাঁহার প্রথম কমিশনরি। অতএব তিনি সকল কার্য্য প্রথম কিছু দিন নিজে দেখিবেন, যেন কমিশনরের কাজের ধারণা তাঁহার হয়। আমি তদনুসারে ছাই ভস্ম পুরিয়া চার পাঁচ বাক্স প্রথম দিনই তাঁহার কাছে পাঠাইলাম। বলিয়াছি, কমিশনর এক পোষ্টমাষ্টারবিশেষ। উপরের কাগজের নকল নীচে, এবং নীচের কাগজের নকল উপরে পাঠানই ইহাঁর প্রধান কার্য্য। তিনি এক বাক্স মাত্র দেখিয়া, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি মিঃ স্ক্রীনের প্রণালীমতে কাজ করুন। কেবল যে ফাইল আপনি আমার দেখা উচিত মনে করেন, তাহাই আমাকে পাঠাইবেন।" মিঃ

স্ক্রীন নানা স্থানীয় উন্নতি বিষয়ে হাত দিয়াছিলেন। কাজেই প্রত্যহ তাঁহাকে এক বাক্স কাগজ পাঠাইতে পারিতাম। ইহাঁর কাছে তিন চার ফাইলের বেশী পাঠাইবার কিছুই থাকিত না। তাহাতেও প্রায় তিনি আমার লিখিত নোট, কি মুসাবিদা স্বাক্ষর করিয়া দিতেন। কাজেই দশ পনর মিনিটের বেশী কাজ থাকিত না। এক দিন এই কাজ শেষ করিয়া, আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমার জন্য আর কোনও কাজ আছে কি?" আমি বলিলাম—'না।" তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তবে কমিশনর একজন রাখিবার প্রয়োজন কি?" লাঠি বগলের নীচে লইয়া চলিয়া গেলেন, প্রায়ই এরূপ হইত। তাহার ফল এই হইল যে, তিনি এক এক বার পনর কুড়ি দিনের জন্য মফঃস্বল চলিয়া যাইতেন। কোথায় যাইতেছেন, কবে আসিবেন, তাহাও আমাকে বলিয়া যাইতেন না। কাজেই সমস্ত ডিভিসনের কার্য্য আমাকে করিতে হইত। স্ক্রীনের সময় কখন কখন টেলিগ্রাম করিয়া, কোনও কোনও বিষয়ে তাঁহার আদেশ, কি মত আনাইতাম। এখন তাহাও করিবার জো নাই। সকল কাজ আমি প্রকৃত কমিশনরের মত নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। কেবল কোনও গুরুতর বিষয় থাকিলে, আমি তাহা কিরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছি, তাহা দেখিবার জন্য. এবং আমার কার্য্য তাঁহার অনুমোদিত না হইলে, তাঁহার আদেশের জন্য সেই ফাইল তিনি ফিরিয়া আসিলে, তাঁহার কাছে পাঠাইতাম। এরূপ ফাইলের উপর আমি এক 'D' (disposed of) লিখিয়া দিতাম। কেরানীরা এই 'ডি'-চিহ্নিত ফাইল জমা করিয়া, কমিশনর ফিরিয়া আসিলে, এক বাক্সে তাঁহার আদেশের জন্য পাঠাইত। তিনি আমার স্বাক্ষরের পার্শ্বে স্বাক্ষর মাত্র করিয়া, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বাক্স ফেরত পাঠাইতেন। তাঁহার কাছে কি সুখেই কাজ করিয়াছিলাম!

কিন্তু স্থানীয় কোনও উন্নতির কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। মিঃ স্ক্রীনের জলের কলের প্রস্তাব, তিনি আসিয়াই, আমার মাথা কুটা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিলেন। তাহার কারণ লিখিলেন যে, রেলওয়ে এখন লক্ষ টাকা দিতে অসম্মত। তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পরদিন প্রায় তিন হাজার মুসলমান দল বাঁধিয়া আসিয়া. গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র তাঁহাকে ঘিরিয়া তাঁহার হাতে এক দরখাস্ত দিল। তিনি তাহাদের দলপতি কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া, উপরে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া, আমার হাতে দরখাস্তখানি দিয়া বলিলেন—"ইহারা কি চাহে?" আমি বলিলাম—নূতন পায়খানার যে বন্দোবস্ত হইতেছে, ইহারা তাহা রহিত করিতে প্রার্থনা করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি ইহাদের কি বলিব?" আমি বলিলাম—তাঁহার কিছুই বলিতে হইবে না। যাহা বলিবার, আমি বলিতেছি। আমি তাহাদের পরদিন প্রাতে আমার ঘরে যাইতে বলিলাম। তাহারা চলিয়া গেল। পরদিন প্রাতে আমার গৃহে উপস্থিত হইলে আমি তাহাদের বলিলাম যে, আমি বিদেশীয় হাকিম নহি, তাহাদের দেশীয় হাকিম। তাহাদের রক্ত-মাংস আমার রক্ত-মাংস। অতএব আমি তাহাদের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী। তাহারা এরূপ অগ্নিকাণ্ড করিয়া কোনও ফল পাইবে না। লাভের মধ্যে তাহারা জেলে যাইবে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটি, সেখানে এ সকল ট্যাক্স। আজ পায়খানার ট্যাক্স দিতে হইবে বলিয়া তাহারা এই উৎপাত করিতেছে, কাল জলের ট্যাক্স, পরশু আলোর ট্যাক্স, এরূপ কত ট্যাক্সই মিউনিসিপ্যালিটিত থাকিলে দিতে হইবে। সহরে থাকিয়াও তাহাদের বিশেষ কিছু লাভ নাই। আগে তাহারা 'মনোহারি' ইত্যাদি দোকান করিয়া ও অন্যান্য ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এখন বিদেশীয় বাণিজ্যে সকল ব্যবসার পথ বন্ধ করিয়াছে। এখন তাহাদের একমাত্র অবলম্বন পেয়াদাগিরি ও দপ্তরিগিরি। তাহাতে কয় জন লোকেরই অন্ন চলিবে। অতএব তাহাদের পক্ষে সহর ত্যাগ করাই উচিত। সহরের উপর তাহাদের যে বাড়ী আছে, তাহা বিক্রয় করিলে তাহারা প্রত্যেক বাড়ীর জন্য সাত আট শত টাকা পাইবে। সহরের বাহিরে পল্লীগ্রামে ঐ টাকাতে তাহারা সাত আট 'কানি' (কানি বিঘার কিছু কম) জমি কিনিয়া কৃষিকার্য্য করিলে পরম সুখে থাকিতে পারিবে।

আমার কথায় ও সহানুভূতির কণ্ঠে তাহাদের হৃদয় ভিজিল। তাহারা এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। বলিল—এখন তাহাদের আপাততঃ এই পায়খানার ট্যাক্স ও স্ত্রীলোকদের বেইজ্জতি হইতে রক্ষা করিলে, তাহারা ক্রমে ক্রমে সহরের বাহিরে চলিয়া যাইবে। আমি তাহা স্বীকার করিলাম, এবং পরদিন কমিশনরকে এই কথা বলিয়া, মাজিষ্ট্রেটের কাছে আদেশ প্রেরণ করিলাম যে, আপাততঃ পায়খানার বন্দোবস্ত পরীক্ষাধীন ভদ্রপল্লীতে প্রচলিত করিয়া কৃতকার্য্য হইলে, পরে দরিদ্র পল্লীতে প্রচলিত করা যাইবে। অগ্নিকাণ্ড নির্বিয়া গেল। মুসলমানেরা আমার জয়জয়কার করিতে লাগিল, এবং কমিশনরেরা নির্ভয় হইলেন। ঐতিহাসিক 'ছড়া' পায়খানা উঠিয়া গেল, এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত নগরে নূতন বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল। আমার একটি উদ্দেশ্য সাধিত হইল। জলের কলের প্রস্তাব মিঃ কলিয়ার মাটিচাপা দিলে, আমি আমার প্রস্তাবমতে ঝর্ণার জল 'পাম্প' এবং 'পাইপে'র কিম্বা কেবল সুপারি গাছের দ্বারা সমস্ত সহরে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, এবং তজ্জন্য মিউনিসিপ্যালিটির গ্রীবা নিষ্পীড়ন আরম্ভ করিলাম। তাহার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি অনেক লেখালেখির পর 'বাজেট' করিয়াছিলেন।

৩। সীতাকুণ্ড

আর হস্তক্ষেপ করিলাম আবার দেশের তীর্থটিতে। "আজিকে বিফল হ'লে, হ'তে পারে কাল"—নূতন আইন করিয়া তীর্থরক্ষা করা লর্ড কার্জ্জন নিষ্ফল করিয়াছেন। এখন অন্যরূপে সীতাকুণ্ড তীর্থটির উন্নতিসাধন ও রক্ষা করিতে পারি কি না, দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম যে, মোহন্তের পদচ্যুতির জন্য 'অধিকারী'রা মোকদ্দমা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। সীতাকুণ্ডে পাণ্ডাদিগকে 'অধিকারী' বলে। ইহাতে বুঝা যাইবে যে, ইহারাই এই তীর্থের প্রকৃত অধিকারী। মোহন্ত কেবল তীর্থগুরু মাত্র। অধিকারীদের মোক'দ্দমায় নিষ্ফল হইবার কারণ, সীতাকুণ্ড যে কখন এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির অধীন ছিল, তাহার প্রমাণ অধিকারীরা উপস্থিত করিতে পারে নাই। তাহারা পুরাতন কাগজপত্রের নকল চাহিলে, কলেক্টর ও কমিশনরের আফিসে মোহন্তের যে দুই জন উচ্ছিষ্টভোজী নরাধম ছিল, তাহারা তাহা লুকাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা রিপোর্ট দিয়াছিল, এরূপ কোনও কাগজ উভয় আফিসে নাই। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কারণ, আমি প্রথম বার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট থাকিতে সেই সকল কাগজ বাহির করিয়া নূতন এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি গড়িয়াছিলাম। কমিশনর আফিসের সেই নরাধম আমাকে বলিল যে, আফিস তিন স্থানে নাড়াচাড়া করিতে সেই সকল কাগজ হারাইয়া গিয়াছে। এই লোকটির গোবরের মত বর্ণ, খর্ব্বাকৃতি, এবং বিদ্যাতে গরু হইলেও তাহার মুখের অবয়ব ও তাহার প্রকৃতি ঠিক শৃগালের মত। আমি তাহাকে শৃগাল (Mr. Fox) নাম দিয়াছিলাম। এই ব্যক্তি কমিশনরের আফিসে উচ্চপদস্থ। ইহার মত নষ্ট ও দুষ্টবুদ্ধি লোক, তাহার বাহক সাহেবসেবী 'সয়তান দাস' ভিন্ন আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। এই সয়তানের কথা পরে বলিব। এইখানে এই মাত্র বলিলেই হইবে যে, সয়তান দাসের মত এমন সাহেবের ও সয়তানের দাস বুঝি আর এ জগতে নাই। তাহার সাহেব-সেবার গুণে চট্টগ্রামের কলেক্টর ও কমিশনর তাহার হাতের ক্রীড়াপুতুল। অন্য দিকে সে ধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের বহির্ভূত হইলেও সে মোহন্তের নিজের অপূর্ব্ব ইংরাজীতে, মোহন্তের 'বুঝম ফেফ্রেণ্ড' (Boozom ffrend) (পরাণের বঁধু)। এই মোহন্তের ও তাহার 'বুঝম ফেফ্রেণ্ডে'র মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া আমি 'রঙ্গমতী'র গদাধর বন ও 'ঢেঁকি পঞ্চাননে'র মূর্ত্তি আঁকিয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম যে, মোহন্তের বিরুদ্ধে পদচ্যুতির মোকদ্দমা হইলে, মোহন্ত তাহার 'বুঝম ফেফ্রেণ্ডে'র কাছে ষাট হাজার টাকা গচ্ছিত রাখে। বলা বাহুল্য উহা তাহার বৃহৎ উদর বা 'বুঝম' হইতে আর বহির্গত হয় নাই। উহার

পরিবর্ত্তে মোহন্ত এই 'বুঝম ফেফ্রেন্ডসিপ' মাত্র পাইয়াছিল। এই নরাধমই তাহার সকল পাপের প্রশ্রয়দাতা এবং তাহার ও সীতাকুণ্ড তীর্থের ধ্বংসের প্রধান কারণ। তাহারই সাহায্যে মোহন্ত পুলিস মাজিষ্ট্রেটকে হাত করিয়া, রেলওয়ের মত টিকিট কাটিয়া ও মুসলমান প্রহরী রাখিয়া, যাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া, দেড় টাকা নিয়মে ট্যাক্স আদায় করিতেছিল। নিরুপায় হইয়া শেষে তাহার বিষদন্ত উৎপাটন করিবার জন্য একজন যাত্রীর দ্বারা এই 'ট্যাক্স' ফেরতের জন্য অধিকারীরা আমার ইঙ্গিতে দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করে। সীতাকুণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয় পরমহিতৈষী মুন্সেফ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উহা ডিক্রী দেন। মোহন্ত বড় বড় ব্যারিষ্টার দিয়া হাইকোর্টে আপিল করে। হাইকোর্ট উহা অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার এরূপ কার্য্য 'অবরোধ' ও 'অপহরণ' (wrongful confinement and extortion) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেই অবধি এই 'জিজিয়া' ট্যাক্স কিছু কাল বন্ধ থাকে। এই পাপিষ্ঠের সাহায্যে মোহন্ত আবার উহা প্রচলিত করিয়াছে দেখিয়া, আমি কার্য্যভার পাইয়াই প্রথম উহা বন্ধ করিয়া, স্ক্রীন সাহেবের দ্বারা তীব্র আদেশ প্রচার করি। আমি বুঝিলাম, এই সয়তানের ইঙ্গিতেই পুরাতন কাগজ অদৃশ্য হইয়াছে। আমি তাহার জন্য আফিসের উপর চোটপাট আরম্ভ করিলে এবং কমিশনরের কাছে রিপোর্ট করিব বলিলে—কমিশনর তখন মিঃ স্ক্রীন, তিনি 'শৃগাল' ও 'সয়তান' উভয়ের উপর খড়্গহস্ত—শৃগাল ভয়ে কাগজ বাহির করিয়া দিল। একদিন 'রেকর্ড কিপার' এই ফাইল বহু অন্বেষণে পাইয়াছে বলিয়া আমার কাছে উপস্থিত করিল। আমি দেখিলাম, তাহাতে সমস্ত কাগজ, এবং আমার পূর্ব্ব নোট ইত্যাদিও আছে। তখন অধিকারীদের দ্বারা কমিশনরের কাছে মোহন্তের দুশ্চরিত্র এবং তীর্থ ধ্বংস সম্বন্ধে এক দরখাস্ত দাখিল করাইলাম। একজন ডেপুটি কলেক্টরের দ্বারা সমস্ত বিষয়ের তদন্ত করাইবার জন্য এক চিঠি মুসাবিদা করাইয়া দিলে, মিঃ স্ক্রীন তাহার ভাষা আরও তীব্র করিয়া অনুমোদন করিলেন। কলেক্টর লিখিলেন যে, পুরাতন কাগজ সকল হারান গিয়াছে। অতএব এই তদন্তের দ্বারা কোনও উপকার হইবে না। আমার আফিসের সমস্ত কাগজ তখন মিঃ স্ক্রীনের কাছে উপস্থিত করিলে, কলেক্টরের আফিস হইতে পুরাতন কাগজ কিরূপে চুরি হইল, তাহার কড়া কৈফিয়ৎ চাহিলেন। কলেক্টর ভীত হইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইলে, আমি তাঁহাকে সমস্ত পুরাতন কাগজ দেখাইলাম। গতিক মন্দ দেখিয়া, তখন মোহন্তের প্রসাদভোজী তাঁহার আফিসের সেই কেরানী মহাশয় এক পুরাতন বহি লইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিলেন যে, সকল কাগজ পাওয়া গিয়াছে। কলেক্টরের মুখ চূণ হইয়া গেল। আমি তখন নিয়োজিত ডেপুটি কলেক্টরকে ডাকিয়া, সীতাকুণ্ডের সমস্ত ইতিহাস বলিলাম, এবং তাঁহার রিপোর্টে সমস্ত পুরাতন চিঠির নম্বর ও বৃত্তান্ত দিয়া, এরূপ একটা ইতিহাস লিখিয়া দিতে বলিয়া দিলাম, যেন ভবিষ্যতে এই চিঠিপত্রগুলিন আবার পাপিষ্ঠেরা সরাইতে না পারে। তিনি তদন্ত করিতে সীতাকুণ্ডে গেলেন। 'সয়তান' মোহন্তকে লইয়া আসিয়া, প্রথম আমার কাছে কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। মোহন্ত আমার হাতে ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল—"আপনি ছেলেবেলা আমার সঙ্গে খেলা করিবার সময়ে একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আপনি বড়লোক হইলে আমার সাহায্য করিবেন। আজ আমার প্রতি দয়া করুন। আমাকে 'এন্ডাওমেণ্ট কমিটি'র অধীন করিয়া এই বুড়া বয়সে আপমানিত করিবেন না। আপনার অধীন করিয়া রাখুন। আপনি যাহা বলেন, আমি তাহাই করিব।" তাহার রোদনে আমারও কষ্ট হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সয়তানও অশ্রু মুছিতেছিল। আমি বলিলাম—"আমি যদি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকি, তাহা পালন করিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিব। তিনি তীর্থের মোহন্ত। তীর্থের ভাল হইলেই তাঁহার ভাল। তীর্থের হিতসাধনে আমি আমার বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত। তবে তাঁহার সাহায্যের অর্থ যদি তীর্থ

ধ্বংস করা হয়, তাহা আমি পারিব না। যাহারা এই তীর্থ-ধ্বংসে তাঁহার সাহায্য করে, তাহারা তাঁহার বন্ধু নহে, পরম শত্রু।" আমাকে অটল দেখিয়া তাহারা তাহার পর সেই ডেপুটি কলেক্টরের হাতে পায়ে ধরিল। তিনি আমাকে সেই কথা বলিয়া বলিলেন যে, মোহন্ত 'এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি'র অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইয়াছে। আমি বলিলাম, সে সেরূপ স্বীকার করিয়া, কমিশনরের কাছে, কি তাঁহার কাছে দরখাস্ত করিলে, আমি তদন্ত বন্ধ করিয়া দিব। ইহার কয়েক দিন পরে তিনি আসিয়া বলিলেন যে, 'সয়তান দাস' মোহন্তকে কিছুই করিতে দিবে না। তাহার পরামর্শমতে মোহন্ত উক্ত রূপ দরখাস্ত তাঁহাকে দিয়া ফিরাইয়া লইয়াছে। মোহন্ত বলিয়াছে যে, 'সয়তান' ঐরূপ দরখাস্ত দিতে তাহাকে নিষেধ করিয়াছে। অধিকারীরা মোহন্তের বিরুদ্ধে যে ঘোরতর অপব্যয়ের, অত্যাচারের ও ঘৃণিত পাপের অভিযোগ করিয়া, তাহার পদচ্যুতির জন্য দেওয়ানি নালিশের অনুমতি চাহিয়াছিল —কারণ, কলেক্টর বা এডভোকেট জেনারেলের অনুমতি ভিন্ন এরূপ নালিশ চলে না, ডেপুটি কলেক্টর তখন তদন্ত করিয়া, তাহার সমর্থন করিয়া, এক দীর্ঘ রিপোর্ট করিলেন। কলেক্টর উচ্চবাচ্য না করিয়া উহা কমিশনরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ঠিক এমন সময়ে মিঃ স্ক্রীন চলিয়া গেলেন। 'সয়তানে'র শিক্ষামতে কলেক্টর মিঃ কালিয়ারকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি মোহন্তের শত্রু বলিয়া এই সকল গোলযোগ করিতেছি। ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। ডেপুটি কলেক্টরের রিপোর্টের উপর দেওয়ানি কার্য্যবিধির ৫৩৯ ধারামতে মোহন্তের বিরুদ্ধে পদচ্যুতির মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়ার জন্য কলেক্টরকে আদেশ করিয়া, আমি এক চিঠির মুসাবিদা মিঃ কালিয়ারের কাছে উপস্থিত করিলে, ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত বলিয়া, তিনিও মাটিচাপা দিলেন। লাভের মধ্যে সালতামামিতে আমার খুব প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে, সময়ে সময়ে আমি কিঞ্চিৎ partizan (পক্ষপাতী) ভাবে কার্য্য করি।

এই সঙ্গে সঙ্গে সীতাকুণ্ডের জলের, ডিস্পেনসারির ও পায়খানার বন্দোবস্তেও আমি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমি দ্বিতীয় বার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইয়া, যে মন্দাকিনী নির্ঝরিণীর জল দুই স্থানে দুইটা জলাশয়ে সঞ্চিত করিয়া, উহা যাত্রীদের ও স্থানীয় লোকের পানীয় জলের জন্য 'রিজার্ভ' করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এবার আসিয়া দেখিলাম যে, সয়তানের ও মোহন্তের কৌশলে পাইপের দ্বারা ঐ জল কেবল শম্ভুনাথ-বাড়ী পর্য্যন্ত আনিয়া বন্ধ হইয়াছে। নীচে লইয়া গেলে মোহন্তের শত্রু অধিকারীরা ও তাহাদের যাত্রীরা উপকৃত হইবে ; এমন মহাপাতক সয়তান ও মোহন্ত করিবে কেন? সেই বৎসর 'মেলা-কমিটি'র রিপোর্ট আসিলে আমি প্রস্তাব করিলাম,—

(১) উক্ত জল পাইপের দ্বারা নীচে লইয়া, স্থানে স্থানে জলাশয়ে সঞ্চিত করিয়া, 'রিজার্ভ ট্যাঙ্ক' করিতে হইবে,

(২) কেবল মেলার সময়ে না করিয়া, সীতাকুণ্ডে একটা স্থায়ী ডিস্পেনসারি খুলিতে হইবে, এবং

(৩) স্থায়ী পায়খানার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

কমিশনর মিঃ স্ক্রীন এ সকল প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া আদেশ দিলেন যে, জল নীচে লওয়ার খরচ এক হাজার টাকা মোহন্ত নিজে দিবে। সয়তানের মাথায় বজ্র পড়িল। সে তাহার অধীনস্থ এক ওভারসিয়ারের দ্বারা রিপোর্ট করিল যে, মন্দাকিনীর জল শম্ভুনাথ-বাড়ীর জন্যও যথেষ্ট নহে। সমস্ত সেখানে নিঃশেষ হইয়া যায়। কলেক্টর অম্লানমুখে সয়তানের খাতিরে এই মিথ্যা রিপোর্টও পাঠাইয়া দিলেন। তখন মিঃ স্ক্রীন আদেশ দিলেন যে, ঘণ্টায় কত 'গ্যালন' জল মন্দাকিনীতে পাওয়া যায়, কলেক্টর নিজে মাপিয়া রিপোর্ট করিবেন। এবার রিপোর্ট আসিল যে, ওভারসিয়ারের ভুল হইয়াছিল। জল যথেষ্ট আছে।

রাবণ তাহার প্রস্তাবিত সৎকার্য্যগুলিন করিতে যাইতেছিল ; এমন সময়ে রাম-রাবণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ সময়ে মিঃ স্ক্রীন চলিয়া গেলেন, আর কলিয়ার এ কার্য্যটিও কলেক্টরের অনুরোধে বন্ধ করিলেন। ইহার পর আমি সয়তানের ষড়্যন্ত্রে চট্টগ্রাম হইতে ঘোরতর বিপদ্গ্রস্ত হইয়া বদলি হইলাম। অথচ এই কলেক্টরই আমার একজন নিতান্ত গুণানুরক্ত (admirer) ছিলেন। তিনি পেন্‌সন লইয়া, বিলাত গিয়া, আমার 'ভানুমতী'র সমালোচনা ইংলন্ডের কাগজে লিখিয়াছিলেন, এবং আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, 'সয়তানে'র উপর তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা আমরা বিশ্বাস করিতাম, সেরূপ ছিল না, তিনিও তাহাকে চিনিতেন। ইঁহার পরবর্তী সহৃদয় মিঃ লি (Lea) জল সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবের এই অবশিষ্ট অংশও কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। কেবল জলাশয়ে মন্দাকিনীর জল লইয়া 'রিজার্ভ' না করিয়া, তিনি এক পাকা জলাশয়ে (Reservoir) জল লইয়াছেন। তাহাতে মেলার সময়ে জলের অকুলান হয়। সমস্ত বৎসর এই মন্দাকিনীর জল 'রিজার্ভ' জলাশয়ে জমা হইলে এরূপ জলাভাব হইত না। লি মহোদয় একটা স্থায়ী ডিস্পেনসারিও খুলিয়াছেন। তিনি সীতাকুন্ডের আরও অনেক উন্নতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু তীর্থটির দুর্ভাগ্য, তিনিও তাহা সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন।

এখন সয়তান ও তাহার বাহন মোহন্ত, উভয়ে স্বধামে চলিয়া গিয়াছে। স্বয়ম্ভূনাথ ও চন্দ্রনাথ তাঁহাদের এই তীর্থটিকে এরূপে এই পাপিষ্ঠদের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিলে, এই মোহন্তের অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট তাহার এক চেলা বলপূর্ব্বক গদিতে বসিয়া, চট্টগ্রামের এক চতুর্থ শ্রেণীর ইংরাজিতে সমস্ত খবরের কাগজে এই বার্ত্তা প্রচার করে। আইনমতে 'এন্ডাওমেন্ট কমিটি'র ও পূজনীয় রত্নবন মোহন্তের উইলমতে দেশীয় প্রধান ব্যক্তিদের মোহন্ত নিয়োগ করিবার অধিকার। আমি বর্ত্তমান কলেক্টরের কাছে এই সকল কথা লিখিয়া পাঠাইলে, তিনি এক প্রকান্ড সভা ডাকিলেন, এবং বড় বড় উকিল ও জমিদারগণ বড় বড় বক্তৃতা করিয়া এই চেলাকে অনধিকারী (trespasser) সাব্যস্ত করিলেন। তাহার পর এন্ডাওমেন্ট কমিটির শূন্য স্থান সকল পূর্ণিত হইল। আমার অনুরোধে দেশের প্রধান জমিদার মহাশয়ও এখন ইহার সভ্য হইলেন। কি সম্পত্তিতে, কি চরিত্রে, কি বিদ্যায়, ইনি চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রকারে অগ্রণী। কিন্তু ঈশ্বর এত দুগ্ধে এক ফোঁটা গোময় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এত গুণ দিয়াও হৃদয়ের বল দেন নাই। এই বলাভাবে তিনি দেশের বহু মঙ্গল করিবার শক্তি পাইয়াও পদে পদে তাহার ঘোরতর অমঙ্গল ঘটাইতেছেন। তিনি মোহন্তের মৃত্যুর পর সীতাকুন্ডে ঘন ঘন যাইতেছেন শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি সেই চতুর্থ শ্রেণীর উকিলের পশ্চাতে কি দ্বিতীয় বেহালা বাজাইতে যাইতেছেন? তিনি লিখিলেন, তাহা নহে। কি হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি যাতায়াত করিতেছেন। পরে তাঁহারই গৃহে এন্ডাওমেন্ট কমিটির সভা হইল। জানি না কি কারণে, জানিলেও তাহা বলিতে কষ্ট হয়, সভ্যদের বিক্রম পূর্ব্ব-সভার বক্তৃতাতে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত চেলা তাহার মোহন্তগিরি তাঁহাদের শ্রীহস্ত হইতে গ্রহণ করিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার নামে নোটিশ মাত্র দিলেন। তাহার পরদিনই জমিদার মহাশয় সীতাকুন্ডে উক্ত চেলার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া গেলেন, এবং শুনিলাম, তাঁহার পত্নী চেলার 'দিদি' হইলেন। তাহার পর সস্ত্রীক ত্রিপুরেশ্বরী দর্শনে যাইতে এই চেলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কুমিল্লায় তিনি আমাকে বলিলেন যে, চেলা এন্ডাওমেন্ট কমিটির অধীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। সে সম্পূর্ণ-রূপে আমার অধীনতা স্বীকার করিবে। এক দিন চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লা আসিবার সময়ে এই চেলাও আমার বাড়ীতে উঠিয়া সেই কথা বলিল। আমি তাহার শ্রীমূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই। আমি এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলাম। পালা এইরূপে শেষ হইল। এন্ডাও-মেন্ট কমিটি তাহার পর হইতে নীরব। তাহা দেখিয়া মাজিস্ট্রেটও নীরব। অথচ ইনি

আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে আসিয়া সীতাকুণ্ডই তিনি প্রথম তীর্থ দেখিয়াছিলেন, অতএব ইহার কিছু উপকার করিয়া যাইতে পারিলে, তাঁহার জীবন সার্থক মনে করিবেন। এণ্ডাওমেণ্ট কমিটির যে একটা ভয় পূর্ব্বে মোহন্তের ছিল, এখন হইতে তাহাও রহিত হইল। এই চেলা তীর্থটি ধ্বংস করিলেও কাহারও কিছু বলিবার ক্ষমতা রহিল না। তাহার চেলা পাষণ্ড হউক, পশু হউক, উত্তরাধিকার স্বত্বে গদি পাইবে, এবং যদৃচ্ছা তীর্থের সম্পত্তি অপব্যবহার করিতে পারিবে। জমিদার মহাশয়ের হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় এরূপে দেশের তীর্থটির ধ্বংসের পথ মুক্ত হইয়াছে। চেলা তাহার স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইতে বিলম্ব করে নাই। ত্রিপুরার মহারাজা আমার অনুরোধে ব্যাসকুণ্ডে স্ত্রীলোকদের জন্য একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, এই চেলা উহা প্রস্তুত করিতে দিতেছে না, তিনি কি করিবেন। আমি বলিলাম—"চট্টগ্রামের দেশতিলকেরা গাল পাতিয়া দিয়া চড় খাইয়াছে, ভেড়াকান্ত! তুমিও সেই উপাদেয় বস্তুটি আহার কর। আমি ত্রিপুরেশ্বরের মন্ত্রী হইলে, ঘাটের কার্য্য বলপূর্ব্বক আরম্ভ করিতাম। যে ব্যক্তি রাজবিধি, কি সমাজবিধি, কোনও বিধিমতেই মোহন্ত নহে, এবং মোহন্ত হইলেও যাহার এরূপ তীর্থহিতকর কার্য্য বন্ধ করিবার কোন অধিকার নাই, সে প্রতিবন্ধক হইলে আমি তাহার জন্য অর্দ্ধচন্দ্র ব্যবস্থা করিতাম।" শুধু ইহা নহে। শরৎচন্দ্র ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরকিশোর অধিকারী এত কাল যাবৎ আমার সীতাকুণ্ডের কার্য্যের প্রধান সহায় ছিল। শরৎ তাহার এই তীর্থোন্নতির ব্রত উদ্‌যাপন করিবার পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। হরকিশোর একদিন শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল যে, সে স্বপ্ন দেখিয়াছে যে, তাহার দাদা আসিয়া তাহাকে বলিতেছে—"সীতাকুণ্ডের উন্নতির ব্রত ছাড়িও না। নবীনবাবুর সাহায্য লইয়া, গয়াকুণ্ডে একটা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, স্থানটির উন্নতি কর এবং যাত্রীদের কষ্ট দূর কর।" আমার পরামর্শমতে সে ভিক্ষাপত্র লিখিয়া আনিল। আমি তাহাকে চিনি বলিয়া উহাতে আমার নাম স্বাক্ষর করিয়া দিলাম। চাঁদা আসিতে লাগিল। এমন সময়ে টাঙ্গাইলের স্বনামধন্যা শ্রীযুক্তা দীনমণি দেবী আমাকে লিখিলেন যে, তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। আমার নাম মাত্র উক্ত ভিক্ষাপত্রে দেখিয়া, এই কার্য্যটি তাঁহার একাকিনী করিবার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি সমস্ত কার্য্যের ভার আমার হস্তে দিলেন। কিন্তু উক্ত চেলা এই মন্দিরও প্রস্তুত করিতে দিবে না। কিছুদিন এই পরম হিতকর কার্য্যটি পড়িয়া রহিল। অবশেষে জানি না, কি কারণে চেলাপুঙ্গব অনুমতি দিয়াছেন, এবং মন্দিরটি বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু সে আবার পিণ্ডদানের জল লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছে, এবং আমি আবার চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেটের দ্বারস্থ হইয়াছি। কারণ, চট্টগ্রামের এণ্ডাওমেণ্ট কমিটি ও চট্টলমাতার বরপুত্রেরা এরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের করপদ্ম কলুষিত করেন না। হায় মা!

৪। গৃহরক্ষা

আমি ইতিপূর্ব্বে 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডে' সম্পত্তি দিয়া, চট্টগ্রামের জমিদার গিরিশচন্দ্র রায়, ইন্দ্রনারায়ণ রায়, রমেশচন্দ্র রায়, লতিফা খাতুন প্রভৃতির গৃহরক্ষা করিয়াছিলাম। আমার অনুগত খুড়তুত ভাই উমেশ একসঙ্গে তাহার ও আমার পুত্রের উপনয়ন দিয়া, বিবাহ করাইয়া, বিলাত পাঠাইবে বলিয়া দুই মাস যাবৎ কলিকাতায় থাকিয়া, এবং স্ত্রী-পুত্রকে বুঝাইয়া, আমাকে চট্টগ্রাম বদলি হইয়া আসিতে সম্মত করাইয়াছিল। আমার চট্টগ্রাম আসিবার অল্প দিন পরেই আমার সেই ক্ষমতাপন্ন ভাই আমার এক বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার সম্পত্তি ক্ষুদ্র। তাহাতে অবিভক্ত জমিদারি মাত্রই নাই। তথাপি অনেক কৌশল করিয়া উহা 'কোর্টে' আনিতে কলেক্টরকে সম্মত করাইলাম। দরখাস্ত ও কাগজপত্র সমস্তই আমি নিজে

লিখিয়া দিলাম। কলেক্টর কেবল তাহার নকল মাত্র কমিশনরের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। অনুকূল প্রতিকূল কিছুই বলিলেন না। কমিশনর মিঃ কলিয়ার পার্ব্বত্য অঞ্চলে নিরুদ্দেশ। আমি পিতার নাম গ্রহণ করিয়া, বিষম সাহস করিয়া কাগজপত্র বোর্ডে পাঠাইয়া, বাকী খাজনার নিলাম নিকট বলিয়া, টেলিগ্রাফে ষ্টেট গ্রহণের আদেশ পাঠাইতে লিখিলাম। লিখিলাম, কিন্তু কমিশনর কি বলেন বড়ই চিন্তিত রহিলাম। এক দিন আর দুই খুড়তুত ভ্রাতার সঙ্গে কথা কহিতেছি, এমন সময়ে বোর্ডের এক টেলিগ্রাফ আসিল যে, আমাকে চিঠির প্রস্তাব বোর্ড মঞ্জুর করিলেন। আমি বলিলাম, বোধ হয় উমেশের ঘর রক্ষা হইল। কিন্তু পত্রের বিষয় টেলিগ্রামে লেখা নাই। তখন বেলা পাঁচটা। এই টেলিগ্রাম কি উমেশবাবুর ষ্টেট সম্পর্কীয়?—জিজ্ঞাসা করিয়া উহা আমার হেড ক্লার্কের বাসায় পাঠাইয়া দিলাম। সে রেকর্ড-কিপারের কাছে পাঠাইয়া দিল। সে রাত্রিতে আফিসে গিয়া, আমার প্রশ্নের নীচে—'হাঁ' লিখিয়া পাঠাইয়া দিল। তখন রাত্রি দুইটা। এই পর্য্যন্ত আমি জাগিয়াছিলাম। বোর্ড প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। কমিশনর ফিরিয়া আসিয়া, কেবল ফাইলটি স্বাক্ষর করিয়া ফেরত দিলেন। এই উপকারের প্রতিদান আমি তৎক্ষণাৎ পাইয়াছিলাম। উমেশ এক পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রে তাহার প্রথম স্ত্রী ও তাহার পুত্রকে ত্যাজ্যা ও ত্যাজ্য করিয়া, তাহার দ্বিতীয় পত্নী ও তাহার পুত্রকে উইল করিয়া সমস্ত সম্পত্তি দিয়াছিল। আমি উভয় পত্নী ও উভয় পুত্রকে মিলাইয়া, সম্পত্তি উইলমতে দ্বিতীয় পত্নীর নামে 'কোর্টে' দিয়াছিলাম। কারণ, উইলে এই স্ত্রী 'সম্পাদিকা' (Executrix) নিযুক্ত হইয়াছিল। এক মাস অতীত না হইতে এই স্ত্রী, যে হৃদয়-রক্ত দিয়া এই গৃহ রক্ষার জন্য আমার চরণ প্রক্ষালন করিয়াছিল, সে দুই পাপিষ্ঠের ষড়যন্ত্রে আমার মহাশত্রু হইল : এমন কি, তাহার পুত্রটিকে পর্য্যন্ত আমার বিদ্বেষী করিল। আমার অপরাধ, ইহারা সম্পত্তিটি আমার জন্য গ্রাস করিতে পারে নাই। আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগৃহীত ছিলাম বলিয়া তাঁহার জীবনের ছায়াও বুঝি আমার জীবনে পড়িয়াছে। আমিও যাহার উপকার করিয়াছি, সেই আমার মহাশত্রু হইয়াছে। আমি বলিয়া থাকি যে, কাহাকেও আমার শত্রু করিবার প্রয়োজন হইলে, তাহাকে আমার একটুক নুন খাওয়াইলেই হইল। কিন্তু ইহার মত এমন দ্রুত প্রতিদান আর কেহই দেয় নাই। নিজ রক্তের এমনই মহিমা। কিন্তু পাপের ফল অনিবার্য্য। উক্ত পাপিষ্ঠেরা দুই পত্নীর মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ উপস্থিত করে। তাহাদের উদ্দেশ্য, প্রথমাকে সপুত্র পথের কাঙ্গালিনী করিবে। কিন্তু বিধাতার এমনই সূক্ষ্ম নীতি যে, দ্বিতীয় পত্নী নিজে ঘোরতর দুর্গতি ভোগ করিয়া মরিল, এবং তাহার কিছু দিন পরে আমার বংশের নক্ষত্রস্বরূপ পুত্রটিরও শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল। আজ তাহার সেই ত্যাজ্যা পত্নী ও ত্যাজ্য পুত্র সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী! হা ভগবান! তোমার নিয়তি ক্ষুদ্র নর কি বুঝিবে?

চট্টগ্রামের বিশ্বম্ভর সার্ব্বভৌম ফলিত জ্যোতিষে একজন বিশেষ দক্ষ। আমার চট্টগ্রামের সেই নন্দিভৃঙ্গি-সম্বলিত বিপদের সময়ে সে আমার হাত দেখিয়া প্রথম সাক্ষাতে বলিয়াছিল যে, আমার চাকরির কোনও বিঘ্ন হইবে না, বরং যে আমাকে বিপদে ফেলিয়াছে, তাহারই চাকরির বিঘ্ন হইবে। তাহার কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। এবার আমি পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইয়া আসিবা মাত্র সে আমাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িল যে, তাহার সম্পত্তি 'কোর্টে' দিয়া রক্ষা করিতে হইবে। সে আবার একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলিল। সে বলিল—"আপনার ও আমার উভয়ের এখন শনির দশা। শনিতে আমাকে মারিবে। আপনাকে আবার দেশভ্রমণ করাইবে এবং কষ্ট দিবে, কিন্তু প্রাণের আশঙ্কা নাই। কারণ, তাহার কার্য্য অন্য প্রতিকূল গ্রহ প্রতিরোধ করিবে।" আমি হাসিয়া বলিলাম যে, শনি গ্রহ আর আমাকে দেশভ্রমণ করাইতে পারিবে না। কারণ, অনুকূল গ্রহ মিঃ বোল্টন প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, তিনি আমাকে এখানেই চাকরি হইতে পেন্সন লইতে দিবেন, আর বদলি করিবেন না। আমি

শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, আমার ডেপুটিগিরির অপেক্ষা তাহার ফলিত জ্যোতিষ ব্যবসায় শ্রেষ্ঠতর। সে বলিল যে, এই ব্যবসায়ে কাশী ইত্যাদি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সে তিন হাজার টাকা মুনফার জমিদারি ও নগদ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা করিয়াছে। তাহার কৃষ্ণ, সরল, ধূলিচাদরাবৃত বংশখণ্ডের মত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া তাহার কাছে পঞ্চাশটি পয়সা আছে, তাহাও আমি বিশ্বাস করিতাম না। তাহার এক শিশু পুত্র। সেও রূপে পিতার ক্ষুদ্র ছবি মাত্র। যাহা হউক, আমি আবার কলেক্টর ও কমিশনর কলিয়ার সাহেবকে ধরিয়া তাহার সম্পত্তি কোর্টে লওনের প্রস্তাব বোর্ডে পাঠাইলাম। কিন্তু এবার বোর্ডের মেম্বর মিঃ টয়েনবি (Toynbee) চট্টগ্রাম কোর্টে বহু ক্ষুদ্র সম্পত্তি আছে বলিয়া, ইহা লইতে অস্বীকার করিলেন। সার্ব্বভৌম সংবাদ শুনিয়া আমার দু হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি তখন তাহাকে বলিলাম, এক উপায় আছে—সে কলিকাতায় গিয়া যদি তাহার ফলিত জ্যোতিষের বুজরুকি দেখাইয়া মিঃ টয়েনবিকে সম্মত করাইতে পারে। লোকটি সাহসী। সে কলিকাতায় গিয়া আমার উপদেশমতে পূর্ব্বে মিঃ টয়েনবির বেহারাদের বুজরুকি দেখাইয়া, তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। টয়েনবি তাহাকে দেখিয়া, লোকটি কে—জিজ্ঞাসা করিলে, বেহারারা তাহার অসাধারণ ক্ষমতার কথা বলিল। সাহেব তাহাকে ডাকিয়া তাঁহার ড্রইংগ কক্ষে লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌমের শ্রীচরণে কলিকাতার ধূলা জমাট বাঁধিয়াছে। সে গৃহের মহামূল্য সজ্জা দেখিয়া ভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল না। সাহেব তাহাকে জিদ করিয়া, চরণ দুখানি সুকোমল গালিচার উপর রাখিয়া, একখানি পুষ্পশয্যানিভ কৌচে বসিতে দিলেন। সাহেবের হাত দেখিয়া সে তাঁহার জন্মের তারিখ, নক্ষত্র এবং তাঁহার জীবনের দুই একটা অজ্ঞাত ঘটনা বলিল। তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার পত্নীকে ডাকিলেন। সে তাঁহার পত্নীর ও তাঁহার শিশু পুত্রের হাত দেখিয়াও ঐরূপ বলিল। তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। সাহেব মহাসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দশ টাকার একখানি নোট দিলেন। সে তখন করযোড়ে তাহার অবস্থার কথা বলিয়া, তিনি যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা বলিল। সাহেব তখনই আফিস হইতে তাহার ফাইল আনাইয়া দেখিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! সত্য সত্যই আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। আচ্ছা, আমি এখনই আদেশ দিতেছি। তুমি চট্টগ্রামে ফিরিবার পূর্ব্বে তোমার সম্পত্তি কোর্টে যাইবে।" তিনি তখন তাহাকে তাঁহার হাতায় রাখিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ অসম্মত হইয়া, পরদিন প্রাতের ট্রেনে চট্টগ্রাম ফিরিবে বলিলে, সাহেব তাহাকে পরদিন ভোরে তাঁহার সংগে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন। চট্টগ্রাম ট্রেন বড় সকালে ছাড়ে। সাহেব বলিলেন, তিনি তাহার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করিয়া তাহার অপেক্ষায় রহিবেন। পরদিন তাহাই হইল। তিনি ব্রাহ্মণকে জোর করিয়া, তাহার পাথেয়ের জন্য কুড়ি টাকা দিয়া, বিদায় করিয়া বলিলেন যে, তিনি শীঘ্র চট্টগ্রাম আসিবেন, এবং সেখানে তাহার সংগে আবার সাক্ষাৎ করিবেন। সার্ব্বভৌম চট্টগ্রামে আসিয়া, আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, এবং তাহার পর এই উপাখ্যান বলিল। বাহা ফলিত জ্যোতিষ! আফিসে গিয়া দেখি, সেই ট্রেনেই তাহার ষ্টেট 'কোর্টে' লওয়ার আদেশ আসিয়াছে। কমিশনর মিঃ কলিয়ার বিস্মিত হইয়া, আমাকে ডাকিয়া, চিঠি আমার হাতে দিয়া, বোর্ডের মত পরিবর্ত্তনের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে আমূল উক্ত উপাখ্যান শুনাইলাম। তাঁহাকে এত দূর ওষ্ঠ প্রসারণ করিয়া হাসিতে আমি আর দেখি নাই। হাসিয়া বলিলেন—"বটে!" (Really!)

৫। জুবিলি ও টাউন হল

পুণ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'জুবিলি'র দেশব্যাপী হুজুগ উঠিল। ঢাকের শব্দে যেমন সে কালের 'গাজন'-সন্ন্যাসীদের পিট চড়-চড় করিত, 'জুবিলি'র ঘোষণায়ও উপাধি-

ব্যাধিগ্রস্তদের বুক চন্-চন্ করিতে লাগিল। আমি মনে করিলাম, এই উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের একটা অভাব পূরণ করিব। আমার অস্থায়ী পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টের সময়ে টাউন হলের প্রস্তাব 'ওল্ডহ্যাম ইন্‌ষ্টিটিউটে' কিরূপে পরিণত হইয়া, এক ডেপুটিপুঙ্গব জেলার মাজিস্ট্রেট হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবার আবার সেই প্রস্তাবে হাত দিলাম। দেশের প্রধান জমিদার তাঁহার বাড়ীর দিকে একটা খাল কাটিবার জন্য দশ হাজার টাকা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডকে ধার দিয়াছিলেন। এই টাকা তাঁহার আর পাইবার আশা ছিল না। এই টাকার দ্বারা তাঁহার পিতার নামীয় এক 'জুবিলি'-হল প্রস্তুত করিবার জন্য আমি এক পত্র তাঁহা হইতে কলেক্টরের নামে আদায় করিলাম, এবং উহা কমিশনরের আফিসে আসিলে, আমি তখনই এই টাকা প্রত্যর্পণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে কলেক্টরকে আদেশ প্রেরণ করিলাম। অন্য দিকে এক দিন এক ঘণ্টার মধ্যে, ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট প্লিডারের পুত্র হইতে, উক্ত হলে এক পুস্তকালয় করিতে ছয় হাজার এবং হলের উপকরণ ইত্যাদির জন্য অপর দুই জন সওদাগর হইতে দুই হাজার করিয়া চারি হাজার টাকা স্বাক্ষর করাইয়া, ইহাদের একজনের দুই হাজার ও উক্ত ছয় হাজার ট্রেজারিতে জমা করাইলাম। এরূপে এক দিনে আমি বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া, 'জুবিলি হলে'র জন্য একটি সুন্দর নক্‌সা ও এষ্টিমেট প্রস্তুত করাইয়া, তাহা 'ফেয়ারি হিলে'র উপত্যকার দক্ষিণ দিকে, কিম্বা দেওয়ান-বাড়ীর খালি পাহাড়ের উপর নির্ম্মাণ করিবার স্থির করিলাম। নানা চূড়া ও কোণবিশিষ্ট সুন্দর অট্টালিকার মধ্যস্থলে হল, তাহার উত্তর পার্শ্বে রঙ্গমঞ্চ, তৎপশ্চাতে সাজসজ্জা-কক্ষ। হলের এক পার্শ্বে লাইব্রেরি ও অন্য পার্শ্বে পড়িবার স্থান ও ক্লাব। মিউনিসিপ্যাল স্কুলগৃহে এক সভা আহ্বান করিয়া, 'জুবিলি হলে'র প্রস্তাব সাধারণের দ্বারা অনুমোদিত করাইলাম। এই সভায় আমি মহারাণীর জীবনী সম্বন্ধে একটি মৌখিক বক্তৃতা করিয়াছিলাম। সভাপতি কলেক্টর মিঃ এণ্ডার্সন তাহার এত পক্ষপাতী হইলেন যে, স্কুলপাঠ্য করিবার জন্য উহা লিখিয়া মুদ্রিত করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, সংক্ষেপে মহারাণীর এমন সুন্দর কবিত্বপূর্ণ জীবনী তিনি পাঠ করেন নাই। এই সভায় আমি বিশ হাজার টাকা সংগ্রহের কথা প্রকাশ করি। চট্টগ্রামের একটি স্থানীয় দরিদ্র সংবাদপত্র তাহার পরের সংখ্যায় লিখিয়াছিল যে, আমি এক দিনে বিশ সহস্র টাকা তুলিলাম, আর চট্টগ্রামের এই চাঁদাদাতাগণ বরাবরই চট্টগ্রামে ছিলেন, এত কাল কেহ একটি পয়সাও তুলিতে পারেন নাই। অথচ 'টাউন হলে'র অভাব বহু কাল হইতে সকলে অনুভব করিতেছিলেন। সভাতে আমি আরও কিছু চাঁদা প্রার্থনা করি। এখানে আবার আমার অর্থ-পিশাচ বাল্যবন্ধুর আর একটি গল্প বলিব। বলিয়াছি, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীর চট্টগ্রাম শহরে একটি সামান্য কারবার ছিল। তিনি উহার উন্নতি করিয়া, এবং মহাজনির দ্বারা চট্টগ্রামের জমিদারের পর জমিদারের গৃহ ধ্বংস করিয়া, তিনি এখন চট্টগ্রামের একজন প্রধান ধনী। আমি বিশ হাজার টাকা তুলিয়াছি। ইনি কিছু দিলে চাঁদা আর কাহারও কাছে চাহিব না আমার সঙ্কল্প ছিল। তাঁহার কাছে সভাতে চাঁদাবহি লইয়া গেলে তিনি উঠিয়া আসিয়া আমার কানে কানে বলিলেন যে, এখানে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি না করিলে তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া উপযুক্ত চাঁদা দিবেন। আমি তাহাতে সম্মত হইয়া সভায় চাঁদা স্বাক্ষর বন্ধ করিয়া দিলাম। পরদিন প্রাতে আমি তাঁহার গৃহে গেলাম। তিনি এক লাল 'গোমুখো' হাতে করিয়া, তাহার ভিতর মালা জপিতে জপিতে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' করিয়া আসিলেন।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমি কলিকাতা হইতে আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিতে সময় পাই নাই। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তোমাকে একবার আমার খুব ভর্ৎসনা করিতে হইবে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! শুনিলাম, গাড়ী ঘোড়া, গৃহের উপকরণ ও সাজসজ্জাতে ঢের টাকা উড়াইয়াছ। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ব্যাপারটা কি! এঁ।

আমি। তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু জান ত, আমি চিরকালই এই ভাবে

কাটাইয়াছি। এখন শেষ জীবনে কষ্ট করিব কি প্রকারে?

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি এরূপে যাহা উপার্জ্জন করিলে, সব উড়াইলে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পরে কি হইবে ভাব কি?

আমি। পরে! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তবে ভাবি বই কি। তুমি পরের কথা ভাব, আর আমি পরকাল পর্য্যন্ত ভাবি। যখন তোমার আমার শেষের দিন আসিবে, তখন দুই বন্ধুতে হিসাব করিয়া দেখিব, তুমি জমিদারি কয়টা, টাকার তোড়া কয়টা, এবং কোম্পানি কাগজের ও মহাজনির তমসুকের তোড়া কয়টা গলায় বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তাহা কি আর কেহ লইতে পারে? তবে তোমার একটি ছেলে আছে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তাহার জন্য এতটুকু ভাবা ত উচিত।

আমি। আমার এই এক ছেলে (আমার খুড়া) বসিয়া আছে। ইহাঁর পিতা জমিদারি, মহাজনি, নগদ, যত প্রকার মানুষ সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারে, রাখিয়া গিয়াছিলেন। দশ বৎসরও যায় নাই। আজ তোমার দ্বারস্থ ভিখারী।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! উহা তাঁহার অদৃষ্টের ফল।

আমি। এখন পথে আইস। আমার পুত্রের, এমন কি, তোমার পুত্রেরও অদৃষ্ট ফল যে অন্যরূপ, তাহা তুমি কিসে জানিলে। তুমি কিসে জানিলে, আমি কিছু রাখিয়া গেলে, আমার পুত্র, আর তুমি যে এত বিষয় রাখিয়া যাইতেছ, তোমার পুত্র খাইতে পারিবে? তুমি আপনি না খাইয়া ও লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া সম্পত্তি সৃজন করিতে পার। কিন্তু তোমার আপনার পুত্রেরও অদৃষ্ট তুমি সৃজন করিতে পার কি? তাই তোমাকে বরাবর বলি যে, যখন এই বিপুল সম্পত্তির সিকি পয়সাটাও সঙ্গে লইতে পারিবে না, তখন এমন সম্পত্তি কিছু কর যে, যাহা সঙ্গে লইতে পারিবে। ঢের বিষয় করিয়াছ, এখন কিছু সৎকার্য্য কর। ঢের লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ, এখন কিছু লোকহিতকর কার্য্য কর। এখন বল দেখি, 'জুবিলি হলে'র জন্য তুমি কত টাকা দিবে?

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমি জান—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমার আরও অংশীদার—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আছে। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—তাহাদের জিজ্ঞাসা না করিয়া—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমি কিছু—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—বলিতে পারি না।

আমি। এত ঘন ঘন কৃষ্ণ নাম করিলে যে কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কাছে এ সকল ছলনা করিয়া কি ফল বল? আমি জানি, তুমিই কর্ত্তা। তুমি যাহা দিবে, তাহাতে তোমার অংশীদারেরা কিছু বলিবে না।

তিনি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তুমিও ত—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—এখন কৃষ্ণ নাম কর—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—এখন ত আর—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—সেই নবীন নাই। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমি কিছুই—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—চাঁদা দস্তখস্ত করিতে পারিব না। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমার অংশীদারদের কাছে—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—পত্র লিখি। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—উত্তর পাইলে—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—তোমার কাছে—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ—উহা লইয়া যাইব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! তবে তুমি—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—বুঝিবে যে এখন—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—আমার ষোল আনা—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—হাত নাই। তো—তোমার খুড়া—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!—জা—জানে।

বলা বাহুল্য, তাহার পর আমি এই কৃষ্ণনাম শুনিয়াই চলিয়া আসিলাম। বলিয়াছি, ইহাকে জেল হইতে পর্য্যন্ত একবার আমি বাঁচাইয়াছি, এবং আরও কত রূপে কত সাহায্য করিয়াছি। আমি বিদেশে থাকাতে প্রয়োজনবশতঃ দেশের জরুরি খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার কাছে টাকা হাওলাত লইতাম। তিনি সিকি পয়সা সুদ পর্য্যন্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া আদায় করিতেন। একবার হিসাবে সুদ কত টাকা ও এক আনা হইল। তিনি আমার খুড়তত ভাইকে বলিলেন—"এক আনা পয়সা, তাহা আর দিও না।" আমার খুড়তত ভাই বলিল—

"সে কি কথা! আপনার চারটা পয়সা ক্ষতি করিব! আমি টাকা ভাঙ্গাইয়া পয়সা আনিয়া দিতেছি।" তার পর সেই চারটা পয়সাও লইলেন। তাঁহার সুদ অতিরিক্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার এক কুটুম্বের কাছে অল্প সুদে টাকা ধার করি। চট্টগ্রাম বদলি হইয়া আসিলে তিনি আমাকে সেই জন্য আমার এক আত্মীয়ের দ্বারা অনুযোগ দেন। আমি উক্ত কারণ বলিলে, তিনি অতিরিক্ত সুদের কয়েকটি টাকা আমার কাছে ফেরত দেন। আমি উহা গ্রহণ না করিয়া কোনও দরিদ্রকে উহা দান করিবার জন্য ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তথাপি তিনি একজন আমার আজীবন বন্ধু ছিলেন। চট্টগ্রামে দেশীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে সৃষ্টি করিয়া তিনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। এক দিন সুখ কি, তিনি জানেন নাই। তাঁহাকে সুখী বলিলে তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেন। পরলোকে তাঁহার অর্থ-পিপাসা মোচন করিয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দিউন!

যাহা হউক, আমার আর টাকার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। 'জুবিলি হলে'র প্ল্যান ও এস্টিমেট প্রস্তুত হইলে দেখিলাম যে, বিশ হাজার টাকা যথেষ্ট হইবে। কিন্তু 'জুবিলি'র সপ্তাহকাল বাকী। কমিশনর মিঃ কলিয়ার নীরব। তাঁহার প্রকৃতি জানিয়া আমি এক দিন তাঁহাকে 'জুবিলি' উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে কিছু করিতে হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনও আদেশ পান নাই, অতএব গায়ে পড়িয়া কিছুই করিবার প্রয়োজন নাই। তাহার পর 'জুবিলি'র দুই দিন মাত্র বাকী থাকিতে, আফিসে আসিয়া আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার ভুল হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের 'ডেমি অফিসিয়াল' পত্রখানি তাঁহার বালিশের নীচে রহিয়া গিয়াছিল। চট্টগ্রামে কিরূপ ব্যাপার হইবে তাহার কোনও রিপোর্ট না পাইয়া গবর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। তাহাতে কলিয়ারের চৈতন্য হইয়াছে। তিনি ভয়ানক চিন্তিত হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আর দুই দিন মাত্র বাকী, এখন কেমন করিয়া কিছু করা যাইবে? সভা করিয়া চাঁদা তুলিবারও সময় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার ইচ্ছা কি কিছু একটা করা? তিনি বলিলেন, কিন্তু আমি করিব কি প্রকারে? আমি বলিলাম, সে ভার আমার। তবে সময় নাই। দেখি, যত দূর করিতে পারি। দেখিলাম, গবর্ণমেণ্ট একটি পয়সাও দেন নাই। অতএব স্থির করিলাম যে, কেবল আফিসগুলিন আলো করিব ও তাহার নিকটবর্ত্তী রাস্তায় 'গেট' দিব। মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে তাহাদের আফিস আলো করিতে আদেশ পাঠাইয়া, যে সদাগরের দুই হাজার টাকা ট্রেজারিতে জমা ছিল, আমার ইচ্ছামতে উহা ব্যয় করিতে ক্ষমতা দিয়া, এক পত্র আমার কাছে তৎক্ষণাৎ পাঠাইতে তাহাকে লিখিলাম। সেই পত্র কলেক্টরের কাছে পাঠাইয়া, ট্রেজারি হইতে এক হাজার টাকা আনিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। 'জুবিলি' সন্ধ্যার সময়ে 'ফেয়ারি হিলে'র ও তদুপরিস্থ রাজপ্রাসাদ-তুল্য অট্টালিকার ও নিকটবর্ত্তী আফিসসমূহের যে শোভা হইল, তাহা চট্টগ্রাম কখনও দেখে নাই। 'ফেয়ারি হিলে' আরোহণের উভয় পথে এবং অন্যান্য আফিসের প্রবেশপথে বিচিত্র 'গেট' নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং সমস্ত আফিস ও রাজপথ আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। 'ফেয়ারি হিলে'র প্রকাণ্ড অট্টালিকার আশীর্ষ আলোকদামের অপূর্ব্ব শোভা, পরে শুনিলাম, বহু দূর সমুদ্রগর্ভ হইতে পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা শোভা হইয়াছিল 'ফেয়ারি হিলে'র পর্ব্বতাঙ্গে তরঙ্গায়িত আলোক-মালার। তাহার সর্ব্বাঙ্গে অবয়বে অবয়বে লহরে লহরে রমণীকণ্ঠলগ্না মুক্তামালার মত আলোকমালার যে শোভা হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। সেই সন্ধ্যায় ইংরাজ, বাঙ্গালী, যাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার মুখে আর এই কবিত্বের প্রশংসা ধরে না। তাঁহারা বলিলেন, এই আলোকসজ্জা (illumination) কবির উপযুক্ত। পরদিন কমিশনরও আফিসে আসিয়া আমার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। বলিলেন, আমি একটা অলৌকিক কার্য্য (miracle) দেখাইয়াছি। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, দু দিনে আমি এরূপ একটা আশ্চর্য্য

কান্ড করিতে পারিব। কত টাকা ব্যয় হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম, অনুমান হাজার টাকা। তিনি আর কিছু বলিলেন না। পরদিন আফিসে আসিয়া, আমাকে ডাকিয়া, হাজার টাকার একখানি নোট আমার হাতে দিয়া বলিলেন যে, এ টাকা তিনি দিবেন। কারণ, তাঁহার ভুলে আমি চাঁদা তুলিতে পারি নাই, আর এখন তুলিবার সময়ও নাই। আমি—"সে কি! আপনি কেন এ টাকা দন্ড দিবেন?" তিনি—"তবে আপনি টাকা কোথায় পাইবেন? আপনি দন্ড দিবেন কেন?" আমি—"আমিও দন্ড দিব না। টাকার আমি সংস্থান করিয়াছি।" তিনি—"কিরূপে?" তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলে, তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি—"তবে আপনার আর টাকার প্রয়োজন নাই?" আমি—"না।" তখন আচ্ছা বলিয়া নোটখানি পকেটে রাখিলেন। এমন সাধু লোক কি সিভিল সার্ভিসে আর হইবে?

'সাইক্লোন' ও 'ভানুমতী'

'জুবিলি'র অল্পদিন পরেই চট্টগ্রামে আবার একটা খন্ডপ্রলয় হইল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবরের প্রাতে, আমার পাহাড়স্থ বাটীতে বসিয়া কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছি। পর দিন কালীপূজা। আফিস বন্ধ। বেলা এগারটার সময়ে দেখিলাম, কর্ণফুলী সাগর-সঙ্গমে একটা গভীর কৃষ্ণ প্রকান্ড মেঘ দেখা দিল। মেঘ যেন সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠিয়া ক্রমে আকাশ ছাইয়া যাইতেছে। কয়েক দিন অসাময়িক ও অস্বাভাবিক গরম পড়িতেছিল। আমার মনে একটা 'সাইক্লোনে'র (চক্রবাত্যার) আশঙ্কা উদয় হইয়াছিল। আমি মিঃ কলিয়ারকে পর্য্যন্ত আমার এই আশঙ্কার কথা তৎপূর্ব্বদিন বলিয়াছিলাম। বন্ধুদিগকে বলিলাম যে, গতিকে ভাল নহে। সমুদ্রগর্ভে যে ঘন কৃষ্ণ মেঘ উঠিতেছে, উহাতে বা 'সাইক্লোন' লইয়া আসে, তাঁহাদের বাড়ী যাওয়া উচিত। তাঁহারা আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কিন্তু বৃষ্টির আশঙ্কায় চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে লিক লিক করিয়া একটুক বাতাস ও তৎসঙ্গে একটু বৃষ্টি আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল, এবং মেঘের পশ্চাতে মেঘ তীব্রবেগে ছুটিতে লাগিল। আমি ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় দুই, গঙ্গাসাগরে এক, যশোহরে এক, চট্টগ্রামে এক এবং নোয়াখালিতে এক,— এরূপে ছয়টি 'সাইক্লোন' ভুগিয়াছি। অতএব সাইক্লোন সম্বন্ধে আমার এক প্রকার আত্মপ্রত্যয় জন্মিয়াছে। আমার হৃদয় ঘোরতর আশঙ্কায় ছাইয়া গেল। পরিবারস্থ সকলকে বলিলাম, নিশ্চয় সাইক্লোন হইবে। তাহাই হইল। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি ও বাতাস বাড়িতে লাগিল। বেলা তিনটার সময়ে, ঠিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইল, এবং প্রবলবেগে সাইক্লোন বহিতে আরম্ভ হইল। সমস্ত ঘরে এরূপ জল পড়িতে লাগিল যে, দাঁড়াইবার স্থান নাই। জিনিসপত্র, ছবি, কৌচ, সোফা, গৃহের সাজসজ্জা, সকলই ভিজিয়া যাইতেছে। ঝট্‌কায় ঝট্‌কায় গৃহ কাঁপিতে লাগিল, পিলার ও দেওয়াল ভাঙ্গিতে লাগিল এবং টিনের ছাদ এরূপ মড় মড় করিতে লাগিল, যেন উড়িয়া যাইবে। পুত্রকে বুকে লইয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার জিহ্বায় আর এক 'সাইক্লোন' আমার কর্ণপথে বহিতে লাগিল। এই উচ্চ পাহাড়ের বাড়ীতে আসিতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, আমি জিদ করিয়া আনিলাম, তাঁহার অভ্রান্ত যুক্তি শুনিলাম না, এখন সব গেল, তিনি পুত্রটি লইয়া কোথায় যাইবেন? একবার পাহাড় হইতে নামিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু যেই ভৃত্যেরা বাহিরে গেল, ঝড় তাহাদিগকে উড়াইয়া বারান্ডায় আনিয়া ফেলিল। আর যাইবেন বা কোথায়? পাহাড়ের নীচেই একটা বাঙ্গলায় একটা সাহেব ছিল। মনে করিয়াছিলাম, তাহা পাহাড়ে বেষ্টিত বলিয়া তাহাতে ঝড় কম লাগিতেছে, সেখানে যাইব। ভৃত্যেরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, তাহার ছাদ উড়িয়া যাইতেছে

এবং টিন চারি দিকে তীরের মত ছুটিতেছে। আমাদের সম্মুখে একটি নিম্ন পাহাড়ে আর একটি বাঙ্গলা। তাহাতেও একটি সাহেব থাকে। তাহারও ছাউনি উড়িয়া গিয়াছে। আমার আস্তাবল, গোশালা ইত্যাদি যাহা পাহাড়ের নীচে ছিল, সকলই ধরাশায়ী হইয়াছে। পাহাড়ের উপর রান্নাঘর ইত্যাদি উড়িয়া কোথায় গিয়াছে, চিহ্ন মাত্র নাই। তাহাদের চালের টিন লইয়া ঝড় লোফালুফি করিতেছে। দেখিয়া ভৃত্যেরা হাসিতেছে। পাঁচটার সময়ে নিবিড় অন্ধকার হইল। দারুণ শীত। কম্বল ও ওয়াটারপ্রুফ জড়াইয়া, এবং জিনিসপত্র একবার এখান হইতে সেখানে, এবং ঝড়ের গতি ফিরিলে আবার সেখান হইতে এখানে সরাইয়া, সমস্ত রাত্রি হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! করিয়া কাটাইলাম। জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। যে দিকে যখন ঝড় বহিতেছিল, তাহার বিপরীত দিকের আয়নার শার্সির পথে সেই ঘোরতর ভৌতিক বিপ্লব আমি নীরবে বসিয়া দেখিতেছিলাম। কত বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কত ডালপালা উড়িয়া যাইতেছে, এবং চক্ষের উপর যেন একটা মহাপ্রলয়ের অভিনয় হইতেছে। এরূপে রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত পূর্ণবেগে বহিয়া, সাইক্লোন ক্রমে কমিতে লাগিল। প্রভাতের সঙ্গে তাহার তাণ্ডবনৃত্য শেষ হইল। আমার পাহাড় হইতে চারি দিকে কি ধ্বংসের দৃশ্যই দেখা যাইতেছে! কত বাড়ী ঘর উড়িয়া গিয়াছে; কত মহামহীরূহ আমূল উৎপাটিত হইয়াছে! আমার পাহাড় প্রায় শহরের সকল পাহাড় হইতে উচ্চ। সকলে ভাবিয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে আমার গৃহই ধ্বংসিত হইবে। কিন্তু শ্রীভগবানের কি কৃপা! আমার পাহাড়ের পাদমূলস্থ বাঙ্গলা দুইটি ছাদশূন্য হইয়াছে; আর আমার কেবল বারাণ্ডার দুই একটি স্তম্ভের মাথা মাত্র ভাঙ্গিয়াছে। বন্ধুবান্ধব ব্যস্ত হইয়া আমাদের তত্ত্ব লইতে আসিয়া, এবং গৃহের অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শহরের পথ ঘাট, বৃক্ষ ও গৃহ পড়িয়া বন্ধ হইয়াছে। পদব্রজে বেড়াইতে গিয়া দেখিলাম যে, কয়েকটা পাকাবাড়ী ভিন্ন আর সমস্ত নগরই ধরাশায়ী হইয়াছে। নদীতীরস্থ স্থানসকল যেরূপ প্লাবিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ হইল, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সাইক্লোনের মত এবারও সমুদ্রতরঙ্গে তৎতীরস্থ স্থানসকল ধৌত হইয়া গিয়াছে। কমিশনর মিঃ কলিয়ার ও সেট্‌লমেণ্ট অফিসার মিঃ এলেন ষ্টীমলঞ্চ লইয়া সেই সকল স্থান দেখিতে ছুটিলেন, এবং ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিলেন ও যে রিপোর্ট পাঠাইলেন, তাহাতে চট্টগ্রামে একটা গভীর শোকের ছায়া পড়িল। এক একটি রিপোর্ট পড়িতে অশ্রুজলে আমার বুকের পরিচ্ছদ ভিজিয়া যাইত। সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ কুতুবদিয়া ও মহেশখালিতে, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরস্থ ছুনুয়া, গণ্ডামারা প্রভৃতি গ্রামে বসতির চিহ্ন মাত্র নাই। মানুষ, গরু, বাছুর, বাড়ী, ঘর, সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। ঘরের চাল পর্য্যন্ত সমুদ্রের জল উঠিলে, লোক চালে আশ্রয় লইয়াছিল, এবং চালসুদ্ধ ভাসিয়া গিয়া পশ্চাতে পর্ব্বত-শ্রেণীর গায়ে গিয়া ঠেকিয়াছিল। তাহাতে কেহ কেহ রক্ষা পাইয়াছে। মিঃ এলেন লিখিয়াছেন যে, কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি যে সকল সমৃদ্ধিশালী গ্রাম নরনারী, পালিত পশুপক্ষী ও ধনধান্যে পূর্ণ দেখিয়া আসিয়াছিলেন, এখন তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই। উৎপাটিত বৃক্ষাবলী পর্য্যন্ত ভাসিয়া গিয়াছে। কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত বৃক্ষ ও হৃদয়বিদীর্ণকারী অবস্থায় নরনারীর ও শিশুর শব পড়িয়া রহিয়াছে। একটি সম্পত্তিশালী তালুকদারকে তিনি বিশেষরূপে চিনিতেন। তাহার প্রকাণ্ড পরিবারপূর্ণ বহু গৃহ, গরুপূর্ণ গোশালা, এবং ধান্যপূর্ণ গোলা, কিছু দিন পূর্ব্বেও তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। এখন তাহার গোলার একটা ভগ্ন খুঁটি মাত্র আছে, আর কিছুই নাই। তাহার বাড়ীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণী ও পার্শ্বস্থ গড় মানব ও পশুশবে পূর্ণ! কলিয়ার দেবতুল্য হৃদয়বান্ লোক ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিভাজন হইয়াও অকাতরে এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের ও অন্য স্থানের সর্ব্বস্বহৃত দরিদ্রদের সাহায্য করিতেছিলেন। 'জুবিলি হলে'র জন্য যে জমিদার দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহার জমিদারি মহেশখালি দ্বীপের ও কয়েক

গ্রামের প্রজা ভাসিয়া গিয়াছিল। অতএব 'জুবিলি হল' আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, তাঁহাকে ঐ দশ হাজার টাকা উক্ত স্থানের প্রজাদের সাহায্যের জন্য ও ভগ্ন বাঁধ বাঁধিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে দেওয়া হইল। সর্ব্বাপেক্ষা এসিস্টেণ্ট মাজিস্ট্রেট মিঃ এফ. পি. ডিক্সনের দেবত্বের কাহিনীতে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহাকে 'রিলিফ' (দুঃখমোচন) কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইনি এই সকল মহাশ্মশানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, অশ্রুজলে বক্ষঃ ভাসাইয়া, নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র ও রোগীকে ঔষধ দিতেছিলেন, এবং স্বহস্তে কোদাল ধরিয়া, গর্ত্ত করিয়া শবসকল পুঁতিতেছিলেন। ইংরাজদের মধ্যে নরাধম যেমন আছে, দেবতাও তেমন আছেন। সেরূপ দেবতা এ দেশে নাই, বুঝি সেরূপ নরাধমও নাই।

মিঃ এলেনের উক্ত রিপোর্ট প্রাতঃকালে ঘরে বসিয়া পড়িয়া অশ্রুমোচন করিয়া কর্ণফুলি সাগর-সঙ্গমের দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে আমার খুড়তত ভাইয়ের কন্যা দ্বাদশবর্ষ-বয়স্কা 'আশা' আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া বলিল—"কই, জেঠামহাশয়! তুমি যে একখানি বহি লিখিয়া আমাকে উপহার দিবে বলিয়াছিলে, দিলে না?" সে সর্ব্বদা আমার কাছে এরূপ আবদার করিত, এবং তাহাকে আমি বড় ভালবাসিতাম। লেখাপড়ায় তাহার বড়ই অনুরাগ। আমি বলিলাম—"আচ্ছা! এই দেখ্, তোর জন্য বহি একখানি লিখিতে বসিলাম।" এলেন সাহেবের সেই রিপোর্ট হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিয়া মুখপত্রে দিয়া 'ভানুমতী' সে অবস্থায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম, এবং সপ্তাহমধ্যে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুলাই শেষ করিলাম। এরূপে একটি বালিকার আবদারে লিখিত 'ভানুমতী'তে বড় বেশী কিছু থাকিবার কথা নহে। উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা উচিত কি না, সন্দেহ হইলে উহা 'সাহিত্য' পত্রিকায় পাঠাইলাম। সম্পাদক সুরেশ উহা আগ্রহের সহিত মাসে মাসে ছাপিতে লাগিলেন, এবং লিখিলেন যে, অনেকে উহার বেশ প্রশংসা করিতেছেন। 'ভানুমতী' বালিকার পাঠোপযোগী সরল ভাষায় একটা সরল গল্পবিশেষ। তবে নরনারীর ইন্দ্রিয়জনিত প্রেম ভিন্ন বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে পারে কি না, এবং উপন্যাসে গদ্য পদ্য উভয় ব্যবহার করিলে কিরূপ লাগে, উপন্যাসলেখকদের চিন্তা করিয়া দেখিতে দেওয়া,—এই দুটি আমার উদ্দেশ্য ছিল। এইখানে 'ভানুমতী'র নূতনত্ব। বিনাইয়া বিনাইয়া একখানি প্রকৃত উপন্যাস লেখা আমার উদ্দেশ্য ছিল না; লিখিও নাই। প্রথম নূতনত্বটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। 'পিরীতে'র উপন্যাসে বঙ্গ-সরস্বতীর হাড় অস্থি জ্বলিয়া যাইতেছে। সেই 'পিরীত'ও আবার পাশ্চাত্য 'পিরীতে'র একটা অস্বাভাবিক ছায়া মাত্র। একদিন একজন বন্ধু বলিয়াছিলেন' বাঙ্গালীর 'লভ' (পিরীত) পরের স্ত্রী লইয়া। বাঙ্গালায় একখানি ভাল উপন্যাস নাই, যাহা পিতা পুত্র, ভাই বোন একসঙ্গে পড়িতে পারে। আমি এ কথা বঙ্কিমবাবুকে বরাবর তাঁহার উপন্যাস উপহার পাইয়া লিখিতাম। 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রথম কয়েকটি অধ্যায় প্রথমতঃ মাসিক পত্রিকার স্তম্ভ হইতে এক দিন প্রাতঃকালীন আহারের সময়ে স্ত্রী পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া দুজনে মুগ্ধ হইলাম। উহাতে বঙ্কিমবাবুর নাম ছিল না। পত্নী বলিলেন যে, উহা বঙ্কিমবাবুর লেখা না হইয়া যায় না। আমি বলিলাম যে, বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস বিনামা বাহির হইবে কেন? এই কয় অধ্যায় আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে, উহা বঙ্কিমবাবুর লেখা কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি ঠাট্টা করিয়া উত্তরে লিখিলেন—"আশ্চর্য্য যে, স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়া উহার লেখককে তুমি দেখিতে পার নাই। নাতবউ তোমার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তুমি নিশ্চয় এ সংসারের সকল বিষয়ে দিশাহারা হও।" তাহা ঠিক। তিনি আমার সংসার-সমুদ্রের 'পাইলট' (আড়কাটি)। আমি তাহার পর লিখিলাম—দোহাই আপনার! এবার যুবক যুবতীর পিরীত ছাড়া একখানি উপন্যাস আমাদের দিন। ইহার পরে গরীব প্রফুল্লকে ঘূর্ণীবাত্যার পৃষ্ঠে চড়াইবেন না।" তাহার পরের মাসের মাসিক পত্রিকায় দেখি, প্রফুল্ল

সুন্দরী ঘড়া ঘড়া টাকা পাইল। তাঁহার একখানা উপন্যাসও আমি আমার পুত্রবধূকে পড়াইতে পারিলাম না। যাহা হউক, 'ভানুমতী' প্রকাশিত হইল, এবং তাহার মুখপত্রের কবিতায় আমার ভাইঝি 'আশা'র আবদার রক্ষা করিয়া, উহা তাহাকে উপহার দিলাম।

'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালী মহলে তাহার আর সমালোচনা হইল না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই আবদারে ও অসাবধানতায় লিখিত ক্ষুদ্র উপন্যাসের সমালোচক জেন্টেলমেন—ইংরাজ। এ সম্মান আমার কোনও কাব্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইংলণ্ড হইতে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান আমাকে 'ভানুমতী' সম্বন্ধে দুখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। দুখানি পত্রই গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ। দুই পত্রই এত দীর্ঘ যে, তাহা সম্যক্ উদ্ধৃত করিবার স্থান এখানে হইবে না। তাঁহার প্রথম পত্রে উপরোক্ত নূতনত্বের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

I want to write to you about two or three literary matters. I have been re-reading *Bhanumati*, reading it not as merely literature, but as a Hindu "novel with a purpose", and yet what has most struck me is its literary form. In the first place is there any Indian precedent (excuse my ignorance) for its mixture of verse and prose or did you invent this form of expression? The device is found in the Roman poet Petronius Arbiter, whose novel contains obvious borrowing from India, especially the famous story of the Matron of Ephesus. From Petronius the fashion of telling a story in alternate verse and prose was borrowed by many French writers, most successfully by a Scotchman who wrote in French, Count Anthony Hamilton, who, though he wrote in a foreign tongue, achieved one lyric which is one of the masterpieces of French poetry. In English, this mixed form of expression is, I think, excessively rare. The only instance I can think of is Cowley's Essays. Did you hit upon it by accident? Or is it usual in Indian literature?

তাহার পর 'ভানুমতী'র ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্বের আলোচনার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। আমি বলিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের একটি বিশেষত্ব এই যে, হিন্দুধর্ম্মে বালক বৃদ্ধ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সংসারী সন্ন্যাসী, সকল অবস্থার লোকের জন্য একটা না একটা সোপান আছে। তিনি তাহার পর খ্রীষ্টান ধর্ম্মেও সেরূপ সকল অবস্থার উপযোগী সোপান, এবং তাহাতেও শান্ত বাৎসল্য প্রভৃতি আছে বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া, সর্ব্বশেষ লিখিয়াছেন—

But men, like your intelligent men, while retaining the conservative instincts of all Aryan races, would not conserve the abuses of your faith. You do not want the (Brahmo) *Samaj*. You want to be loyal to India. No one is more loyal to India than I am. But all living religions *spread*, and will admit *all* men. Caste has many advantages, as you have pointed out with your poetic power of speech. Caste would probably be an excellent thing if India were in a planet by itself. Caste feeling—you rightly say—is inherent in human nature. But all other nations have had to modify it, even to abandon it more or less. It seems to me that the most vital defect of Hinduism, even in the very liberal and tolerant

form you follow is that it is too exclusively Indian. That, to be sure, is also its chief merit in the eyes of patriotic Indians. My own belief is that, some day, Christianity will make great strides in India through the preaching of some great Indian preacher. I do not think our missionaries will ever do much. But a Christian Keshub with the gift of preaching, a man who could show that *bhakti* and devotion are not the monopoly of any one creed, might have a great following, and I am convinced that the Christianity so preached could not be a bit like our official Christianity, but would absorb into it much that has interested me so much in your book. Christianity is as various as Hinduism, and adapts itself to the needs of different races and climates. But these are only my personal views. In the mean-while I think you do well in resisting the (Brahmo) *Samaj* which (unless I am misinformed) is a sort of compromise with Christianity.

ব্রাহ্মরা কি বলেন? তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে আবার ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে লেখেন—

I have been reading your *Bhanumati* with care. My Bengali has grown very rusty; but surmounted difficulty adds an additional zest to one's reading, and it is with a thrill of pleasure that I find my native language (I spoke Bengali as a child before I spoke English) coming back to me. What you say about *Samaj* (Brahmo Samaj) religion and education interest me greatly. As to Samaj, I do not see much use in discussing *national* manners. *Personal* manners, *individual* manners, may be modified to some extent. *National* manners are a thing of long growth and the fruit of many obscure influences. Of course, Englishmen think their own social customs best, and best they are *for them.* But you have only to cross the narrow straits of Dover to find a kindred Aryan race, speaking a kindred language and following a slightly different form of the same religion—brought up in a totally different set of customs—customs, much more like those of India than English customs are. Social customs are not things that can be altered by argument or by any violent change. The French Revolution strove to alter, and did for a very short time alter, the customs of France. But under a nominal Republic, the people of France are as subject to official rule and follow the old aristocratic manners as closely as before, whereas under a Monarchy, the English are impatient of official control, and are democratic in their manners. Curiously enough, that tends to make them tolerant. If the French had succeeded in capturing India, they would have forced their social system on India as they have on Algeria.

তাহার পর ইওরোপের অবস্থা আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

What you say of religious toleration, is admirable. The new criticism, which shows the origin of the religious beliefs of Christianity, is

decidedly in the direction of the unity of all religious belief and all religious effort. There, there again, India has had an advantage in coming under the rule of Protestants, and not Roman Catholics. The Roman Catholics are more consistent, more pious, perhaps, than we, but they are more intolerant and those of them who are not earnest believers, are free thinkers, whereas the looser-flitting Protestant belief resembles Hinduism in affording room for diversity of belief, and is as tolerant as the creed which ranges from the newly-converted savage followers of the *Goshains* of Assam to the hereditary and exclusive Brahmans of Benares. I don't think, we at all realise that ethnologically and linguistically India is far more of a continent than Europe is......It may be the true business of British rule in India to draw together the peoples of the Indian Continent, as Roman Empire drew together and civilized the savage tribes of Britain and Germany and made them to resemble the polished inhabitants of Italy and Greece. It caused the fall of the supremacy (intellectual and political) of Greece and Rome. But it gave birth to the great popular Governments of Britain, America, Australia, France and Germany. So British rule has suppressed the supremacy of Delhi and Poona. But it may result in the discovery of new ruling races. The Bengalees at all events already have (and will improve) a position in modern India which they could hardly have had in ancient India. When the British rule began, Bengali literature had only advanced as far as Bharat Chandra Roy—rather coarse verse stories, something like those of our own Chaucer, full of promise, indeed, but still puerile and tentative. See what has followed in only 150 years. Ram Mohon Roy, A. K. Dutta, the noble Iswar Chandra, Dinobandhu, Madhusudan, Bankim and yourself! It is all very well for you to say that you avoid European influences in your verse. Its structure, no doubt, owes its beauty and charm of sound to indegenous influences; but its thoughts, it catholicity, its expression of the (of course, universal) enjoyment of the beauty and healing power of the influences of nature,—are not those due to the fact that you have read the world's literature, and have half consciously absorbed the imaginings of cultured men in the West as well as in the East?

I am writing hastily and without elaboration, and may be saying less or more than I mean. But my chief object is to tell you that I have found your little book very stimulating and interesting, and to express my gratitude.

আমি এই পত্র দুখানি হইতে এই দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করিলাম। কারণ, ইহাতে হিন্দুর ও ব্রাহ্মদের চিন্তা করিবার অনেক বিষয় আছে। কেবল গোঁড়ামি'তে হিন্দুসমাজ দ্রুতবেগে ধ্বংসের দিকে যাইতেছে, তাহা নহে; ব্রাহ্মসমাজও 'ইওরেসিয়ান' নরকের দিকে তীব্র বেগে ছুটিয়াছে।

ইহা অপেক্ষাও গৌরবের ও বিস্ময়ের বিষয় যে, 'ভানুমতী' কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সুনজরে পড়িয়াছিল। আমাকে একজন সিবিলিয়ান জজ বলিলেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের মৌলিকতা (originality) নাই বলিয়া আমাদের বন্ধু 'পাইওনিয়ার' পত্রে এক প্রবন্ধ বাহির হইলে, 'ইংলিসম্যান' 'ভানুমতী'র প্রাকৃতিক শোভার বর্ণনা ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া উক্ত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। জজ বলিলেন যে, 'ইংলিশম্যানে'র প্রবন্ধটি আমার দেখা উচিত ছিল। কিন্তু প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া স্বজাতির নিন্দা ও গালি পড়া বড় অপ্রীতিকর বলিয়া বহুকাল হইতে আমি 'ইংলিশম্যান' গ্রহণ করা, কি পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি। কাজেই দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত প্রতিবাদ পাঠ করি নাই। কিন্তু ইহার কিছু দিন পরে "Moslem vs Hindu" শীর্ষক প্রবন্ধে 'ইংলিশম্যান' আবার 'ভানুমতী'র এইরূপ ভাবে উল্লেখ করেন,—

A hundrer years ago its models were chiefly the Persian poets. Now-a-days the Bengali author draws his language from the rich store-house of Sanskrit, but in matter and manner copies the master-pieces of English. The result is still somewhat hybride, still manifestly derivative. But few literatures have made so good a start in their early existence as has Bengali. The novels of Bankim Chandra, the plays and epics of Madhu Sudan, the charming prose elegies of Vidyasagar,—all show matured literary power, ease and grace of manner, skill in characterisation and description. Among other things they bring out the fact, not perhaps sufficiently observed by European critics, that the native of India possesses and can express that love of nature which is only a recent acquisition of our own literature. In modern Bengali novels, you will find a natural, and not merely conventional, love of scenery, of mountains, plains and sea. The influence of the scenery of the sea-shore in assisting the poet's meditation and ecstasy has been ably depicted in a recent novel by the well-known poet Babu Nabin Chandra Sen in language which reminds the reader at times of Mr. Swinburne's poem of the joy and splendour of the sea. And from all this wealth of literary charm, emotion and stimulus, the Mohamedan Bengali has cut himself off. Hence, the Mussalman strikes a foreigner in Bengal as more manly perhaps than his Hindu cousin, but as having less refined ideals of life, as being less ingenious, less astute perhaps, but certainly less literary, less artistic in temperament."

শুনিলাম, ইহার পর 'ইংলিশম্যানে'র বর্ত্তমান সম্পাদক 'Vis-a-Vis' নামক এক প্রবন্ধ কলিকাতায় পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি ইংরাজের ও ভারতবাসীর মধ্যে সম্মিলন ও সহানুভূতির অভাবের জন্য দুঃখ করিয়া না কি বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ইংরাজের এক একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করা উচিত। শুধু তাহা নহে, বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে যে, কেবল বাঙ্গালা-সাহিত্য পড়িবার জন্য তাঁহাদের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা উচিত। ইহাতে বোধ হইতেছে, তিনি নিজে বাঙ্গালা ভাষা শিখিয়াছেন, এবং তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহারও সুদৃষ্টি পড়িয়াছে। যাহা হউক, আমরা কয়েকজন দরিদ্র বাঙ্গালী লেখকের ইহার অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের বিষয় কি হইতে পারে যে, আমাদের জীবদ্দশায়

বটতলা হইতে উত্থিত বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ সুখ্যাতি 'ইংলিশম্যানে'র (উভয়ার্থে) কাছে শুনিলাম। বোধ হয়, এই সকল প্রবন্ধের ও আলোচনার ফলে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী 'কিপলিঙ্গে'র বাঙ্গালীর পেটমোটা কদাকার চিত্রের প্রতিবাদে একজন ইংরাজ—বোধ হয়, কোনও অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান—আমাদের বাঙ্গালী লেখকদের আকৃতির নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা বিখ্যাত 'লিটারেচার' (Literature) পত্রে প্রচার করিয়াছিলেন,—

Similarly, portly pompousness no longer adequately describes the modern Bengali. The lamented Iswar Chandra Vidyasagar, the type of the learned ascetic, an Eastern Cardinal Newman, was a Bengali Babu. The religious reformers, Ram Mohan Roy and Keshab Chandra Sen, were neither portly nor pompous, and they were Bengali Babus. The Poet of modern Bengal—the "Bengali Byron" as he has been called in a mixture of jest and appreciation—(Babu Nobin Chandra Sen) is a Bengali Babu. He has the slim, oval face, the bright, dark eyes, the gracious and proudly submissive manners of an Italian or Spaniard of good family.

এবার চূড়ান্ত! 'ভানুমতী' আমার শেষ কাব্য। তাহার এই সমালোচনাও একশেষ! জানি না, আমার এ রূপের বর্ণনা পড়িয়া কোনও 'আহেল বিলাতী' বলিয়াছিলেন কি না—

"কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল হৃদয়দ্বার না লাগে কপাট॥"

জীবনের শেষ স্বপ্ন

চট্টগ্রাম পাহাড়ের উপর একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে অতিবাহিত করা আমার জীবনের একটি স্বপ্ন হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা এই জন্যই 'ডেপুটি-স্বর্গ' আলিপুর ত্যাগ করিয়া আমি চট্টগ্রামে আসি। ফেণী থাকিতে অবধি আমি একটি পাহাড়ের বন্দোবস্তি গবর্ণমেণ্ট হইতে পাইতে চেষ্টা করিতেছিলাম। মধ্যে চট্টগ্রামে অস্থায়ী পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইয়া আসিয়া, দুটি পাহাড়ের বন্দোবস্তির চেষ্টা ক্রমান্বয়ে কিরূপে নিষ্ফল হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি। তাহার পর চট্টগ্রামের বর্ত্তমান 'মদরসা'র উত্তরদিক্‌স্থ পাহাড়টির বন্দোবস্তির দরখাস্ত করিয়া, সাত বৎসর যাবৎ উহা পাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। সেটেলমেণ্ট অফিসারের পর সেটেলমেণ্ট অফিসার আমার কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, শহরের জরিপ শেষ হইলে, উহার বন্দোবস্তি আমাকে দিবেন। 'কর্জ্জনের পাহাড়' এত কাল পড়িয়াছিল, তাহার উপর কাহারও চোখ পড়িল না। কিন্তু যেই আমি উহা কিনিতে চাহিলাম, অমনি দেশসুদ্ধ 'শিক্ষিত বাঙ্গালী' তাহার মূল্য বৃদ্ধি করাইয়া আমাকে বঞ্চিত করিলেন। এবারও বদলি হইয়া দেখিলাম যে, পাহাড়টির জন্য একপাল উমেদার হইয়াছেন। উহা নিলাম হইলে একজন আমার দশগুণ খাজনা স্বীকার করিয়া ডাকিয়া লইলেন। তাহার পর ছাড়িয়া দিলেন। তখন আর একজন 'শিক্ষিত স্বদেশী' তাহার জন্য ক্ষেপিয়া গেলেন। সেটেলমেন্ট অফিসার বলিলেন, আমি অস্বীকার না করিলে তাঁহাকে দিবেন না। তিনি অর্দ্ধেক অংশের জন্য আমাকে ধরিলেন। এই পাহাড়টির নিম্নাঙ্গে মুসলমানদের শত শত কবর আছে। তাহার উপর উহা পথহীন ও জনহীন। অতএব ইতিমধ্যে আমি উহা লইব না স্থির করিয়াছিলাম। কেবল আমার শিক্ষিত স্বদেশীদিগের শিক্ষার ও স্বদেশীয়তার আমোদ

দেখিতেছিলাম মাত্র। আমি বলিলাম, তিনি উহার পূর্ণাংশ লইলেও আমার আপত্তি নাই। তিনি অতিরিক্ত জমায় উহার বন্দোবস্তি লইলেন। আমি আর একটি পাহাড়স্থ বাড়ী চুপে চুপে বন্ধক ও পাট্টা করিয়া লইয়া, সেই বাড়ীতে গেলাম। শিক্ষিত স্বদেশীয় বুকে একটা শেল বিদ্ধ হইল। বাড়ীখানির তখন বড় শোচনীয় অবস্থা ছিল, তাই উহার প্রতি তাঁহাদের চক্ষু পড়ে নাই। এত শোচনীয় যে, কলেক্টর ও অন্যান্য সাহেবেরা আমার কবিত্বপূর্ণ ও সুমার্জ্জিত উপত্যকাস্থ বাড়ী ছাড়িয়া এই বাড়ীতে আসিলাম বলিয়া, আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। পাহাড়টি শহরের উত্তর প্রান্তে স্থিত, এবং শহরের অন্যান্য পাহাড় অপেক্ষা উচ্চ। ইহার উপর হইতে চারি দিকে যেরূপ প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়, অন্য কোনও পাহাড় হইতে সেরূপ দেখা যায় না। দক্ষিণে বা সম্মুখে কোনও পাহাড় না থাকাতে পর্ব্বত, নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থানটি একটি চিত্রের মত দেখা যায় এবং স্নিগ্ধ সমুদ্রানিল সমস্ত দিন এরূপ অবারিত ভাবে বহিয়া যায় যে, গৃহের উপরে টিনের ছাউনি হইলেও কিছুমাত্র গরম অনুভূত হয় না। পূর্ব্বদিকে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য রাজ্যের শোভা, এবং পশ্চিম দিকে রেলওয়ের বিচিত্র গৃহাবলী-শীর্ষ, আর একটি গগনস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণীর তরঙ্গায়িত শোভা। পশ্চাতে বা উত্তরে একটি পর্ব্বতবেষ্টিত শস্যপূর্ণ উপত্যকা-শোভা। ঋতুতে ঋতুতে, মাসে মাসে, দিনে দিনে কৃষির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গভূমির পট-পরিবর্ত্তনের মত সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রীর রূপান্তর হইতেছে। দূরে চন্দ্রশেখর-গিরিমালা নীলাকাশে স্থির তরঙ্গরেখা আঁকিয়া রহিয়াছে, এবং সমস্ত শৃঙ্গের উপর চন্দ্রনাথশৃঙ্গ বহু ঊর্দ্ধে মস্তক তুলিয়া যেন প্রকৃতিদেবীর মন্দিরের নীলমণি-নির্ম্মিত চূড়ার মত শোভা পাইতেছে। সম্মুখে গিরিপাদমূলে পর্ব্বত ও বৃক্ষরাজি-বেষ্টিত একটি প্রাকৃতিক সরোবর (lake)। ইহার নাম ইংরাজেরা Fairy tank (পরী দীঘি) রাখিয়াছেন। মুসলমানদের বিশ্বাস, ইহা আস্কর খাঁ নামক একজন ফকির দ্বারা খনিত। তাহারা ইহাকে 'আস্কর খাঁর তালাও' বলে। ইহার সংলগ্ন পাহাড়ের অধিত্যকার পশ্চিম পার্শ্বে চট্টগ্রামের রক্ষায়িত্রী দেবী 'চট্টেশ্বরী'র মন্দির। আমরা এই শৈল-কুটীরে আসিয়া, পতি-পত্নী-পুত্র ভূতলে জননীর মন্দিরের দিকে প্রণত হইয়া বলিলাম—"মা! ত্রিশ বৎসর বিদেশে ঘুরিয়াছি। আর আমাদের ঘুরাইও না। তোমার চরণতলে অবশিষ্ট জীবনের জন্য স্থান দেও।" বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই আমি কবিকল্পনা খাটাইতে লাগিলাম। গৃহখানির বৈঠকখানা (Drawing Room) সমুদ্র-শ্যাম (Sea green) বর্ণে, আহারের কক্ষ (Dining Room) গোলাপি বর্ণে, এবং শয্যাকক্ষদ্বয় বাসন্তী বর্ণে চিত্রিত করিলাম, এবং কলিকাতা হইতে আনীত বিবিধ উপকরণ, চিত্র ও গৃহসজ্জায় পিতা পুত্রে মিলিয়া সজ্জিত করিলাম। দক্ষিণের ও পূর্ব্বের বারান্ডা নানাবিধ ক্রোটন, লিলি ও ফর্ণের টবে সাজাইলাম, এবং স্তম্ভের ব্যবচ্ছেদে স্থানে স্থানে জাফরিতে নানাবিধ লতা তুলিয়া দিলাম। কলেক্টর বলিয়াছিলেন যে, এই বাড়ীতে একজন পাদ্রী ছিলেন। তিনি জানেন যে, বর্ষার সময়ে উঠান হইতে জল গড়াইয়া গৃহে প্রবেশ করিত। এ জন্য পাদ্রী বাড়ী ত্যাগ করেন, এবং বহু বৎসর এই বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছিল। আমি সম্মুখের প্রাঙ্গণের মাটি প্রায় দুই ফিট কাটিয়া ফেলিলাম, এবং এখানে অর্দ্ধচক্রাকারে কেয়ারিতে, কলিকাতা হইতে আনীত উৎকৃষ্ট গোলাপ রোপণ করিলাম। তাহার পর গোলাকার পথ। পথের মধ্যে গোলাকার দূর্ব্বাখন্ড, এবং তাহার কেন্দ্রস্থানে একটি উদ্যান-ঝাউ ও তাহার চারি দিকে একটি উদ্যান-তালের স্তবক (group) রোপণ করিলাম। পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের সীমায় পাহাড়ের অবয়বে কেয়ারি করিয়া নানাবিধ ফুল রোপণ করিলাম, এবং মধ্যস্থলে পিতা পুত্রের খেলিবার জন্য 'টেনিস্ কোর্ট' করিলাম। কোর্টের লাইন সকল একরূপ লাল শাকের দ্বারা চিহ্নিত করিলাম। সম্মুখে পাহাড়ের বক্ষে একটি হৃদয়াকৃতি পুষ্পোদ্যান রোপণ করিলাম। তাহার পার্শ্ব দিয়া একটি নূতন রাস্তা, পাহাড়ের অঙ্গ কাটিয়া নির্ম্মাণ করিলাম, যেন তাহার অর্দ্ধ

পথ গাড়ী উঠিতে পারে, এবং অবশিষ্টও এরূপ করিলাম যে, উঠিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। ডিষ্টিক্ট ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছিলেন যে, বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে, এই পথ 'ফেয়ারী হিলে'র পথের মত পাকা ও তাহার পার্শ্বে পাকা ড্রেন না করিলে বর্ষায় এ রাস্তা থাকিবে না। আমি কেবল উহার পৃষ্ঠ এবং উহার ভিতর দিকের ড্রেন দূর্ব্বায় আবৃত করিয়াছিলাম। বর্ষার সময়ে তাহার কোনও ক্ষতি হইল না। পূর্ব্বে যে দুটি পথ ছিল, উহাদের এরূপ 'চড়াই' যে, উঠিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত। একজন স্ফীতোদর বন্ধু একদিন মাত্র আমার বাড়ী-প্রবেশের অব্যবহিত পরে আসিয়া 'তোবা' করিয়াছিলেন যে, তিনি আর কখনও আমার বাড়ীতে আসিবেন না। কিন্তু নূতন রাস্তা হইয়াছে শুনিয়া, তিনি একদিন আসিয়া হাসিয়া আকুল। বলিলেন, এত উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইতেছে না। তাহার পর পাহাড়ের উপরে ও পার্শ্বে স্থানে স্থানে ভাল ফলের বৃক্ষেরও মেহগনি প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষের স্তবক (group) রোপণ করিলাম। একটি পক্ষিশালা প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে নানাবিধ পার্ব্বত্য ও সমতলীয় পক্ষী রাখিলাম, এবং বারাণ্ডার ব্যবচ্ছেদে সুন্দর পিঞ্জরে 'কেনারি', ময়না, নানাবিধ টিয়া, কাকাতুয়া পাখী রাখিলাম। তাহাদের কলকণ্ঠে সমস্ত দিবস গৃহ কল-কলায়িত থাকিত। পর্ব্বতের পাদমূলে একটি কূপ খনন করিলাম। তাহাতে একটি পার্ব্বত্য নির্ঝরধারা বহির্গত হইয়া, সুস্বাদু নির্ম্মল সলিলে পূর্ণ করিল। তাহার পার্শ্বে একটি 'হাওজ' নির্ম্মাণ করিয়া, সমস্ত স্থানটি একটি পুষ্পলতা ও পুষ্পবৃক্ষকুঞ্জে পরিণত করিলাম। একদিন কলেক্টর ও সেটেলমেণ্ট অফিসার আমার গৃহে আসিয়া, তাহার এরূপ রূপান্তর দেখিয়া, বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং আমার রুচির (taste) অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। বিশেষতঃ প্রাচীরের রঙ্ দেখিয়া বলিলেন, উহা নিশ্চয়ই আমারই কবিত্ব, অন্যথা চট্টগ্রামে এমন চিত্রকর নাই যে, এমন সুন্দর রঙ্ দিতে পারিবে।

একদিন তাঁহাদের বলিলাম যে, তাঁহাদের প্রতিশ্রুতিমতে একটি পাহাড় কই আমাকে বন্দোবস্তি দিলেন না। আমি যে পাহাড়টি পছন্দ করি, তাহার জন্য পালে পালে গ্রাহক জোটে। তাহাদের বিশ্বাস, আমি যখন পছন্দ করিয়াছি, তখন উহাতে অবশ্য কিছু একটা মাহাত্ম্য আছে। অতএব সেটেলমেণ্ট অফিসার যদি গোপনে বন্দোবস্তি দেন, তবে আমি আমার পাহাড়ের পশ্চিম দিকের সংলগ্ন পাহাড়টির বন্দোবস্তি চাহিব। তিনি প্রতিশ্রুত হইয়া এক দিন প্রাতে পাহাড় দেখিতে আসিলেন। উহা আমার বসতির পাহাড় হইতেও উচ্চতর এবং তখনও জঙ্গলাবৃত। তিনি উহার সানুদেশে উঠিয়া, চারি দিকের দৃশ্যাবলি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রাতঃসূর্য্য-প্রদীপ্ত পশ্চিম দিকের সমুদ্রের অনন্ত সলিল-শোভা বহুক্ষণ স্থিরনয়নে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"নবীনবাবু! এমন সুন্দর দৃশ্য চট্টগ্রামের কোনও পাহাড় হইতে দেখা যায় না। আপনি এই পাহাড় ছাড়িয়া, ঐ কবরপূর্ণ, জলহীন ও পথহীন পাহাড় কেন চাহিয়াছিলেন? আমি এক পয়সা দিয়াও উহার বন্দোবস্তি লইতাম না। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, উহার জন্য এত গ্রাহক হইয়াছিল কেন, এবং আপনার স্বদেশীয় ডেপুটি ক্ষেপিয়া এত টাকাতে উহার বন্দোবস্তি লইয়াছে কেন? তাহার তুলনায় এই পাহাড় স্বর্গ। কি চমৎকার স্থান!" আমি বলিলাম,—"সেই পাহাড় কখনও বন্দোবস্তি লওয়ার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি যে পাহাড়টি পছন্দ করি, সেটার জন্যই একপাল উমেদার জুটিয়া মূল্য বাড়াইয়া ফেলে। ইহাদের 'হাম্‌বগ' (ছলনা) করিবার জন্য মাত্র আমি শেষে উহার বন্দোবস্তি চাহিয়াছিলাম, এবং আমার স্বদেশীয় মহাশয় সেই ফাঁদে পড়িয়াছেন। উহা তাঁহার পক্ষে একটা শ্বেত হস্তী হইবে।" সাহেব স্বল্প জমায় আমাকে এই পাহাড়টির বন্দোবস্তি সেই দিনেই দিলেন। আমি উহার অঙ্গ ব্যাপিয়া, কলিকাতা হইতে আনীত ভাল ভাল আম্র, লিচু, সফেটা, লকেট ইত্যাদি ফলের ৩০০ বৃক্ষ রোপণ করিলাম, এবং স্থানে স্থানে চাঁপা, বকুল, নাগেশ্বর, বিলাতি কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি বৃক্ষ বসাইলাম। এই পাহাড়টির

তিনটি শৃঙ্গে ঠিক হারের মত গ্রথিত। আমি সন্ধ্যার সময় শৃঙ্গে শৃঙ্গে বেড়াইয়া চারি দিকে আমার পার্ব্বতী মাতার শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্তলা এবং সরিৎমালিনী শোভা সন্দর্শন করিতাম। কখনও বা দক্ষিণ শৃঙ্গের দূর্ব্বার গালিচায় বসিয়া, তাহার দক্ষিণ-পশ্চিমস্থ সুরক্ষিত শ্যামল 'ক্যাণ্টনমেণ্ট' উপত্যকায় শ্বেতাঙ্গদের টেনিস, ক্রিকেট, পলো, হকি, গল্‌ফ, ফুটবল ক্রীড়া দেখিতাম। কোন্ কোনও দিন এই উপত্যকা স্কুলের ছাত্রে ছাইয়া যাইত। চারি দিকে চক্রাকারে শত শত বালক যুবক বসিয়া আছে, আর কয়েক জন (সাধারণতঃ বকাটে) ছেলে মাত্র ফুটবল খেলিতেছে। হা অদৃষ্ট! ১১ জন ছাত্রে খেলা করে, আর সমস্ত দেশের ছেলে বসিয়া 'সিগারেট' টানিতে টানিতে উহা দেখে ও থাকিয়া থাকিয়া শাখামৃগের মত চীৎকার করিয়া বাহবা দেয়, ইহাই এখনকার ছেলেদের ব্যায়াম! এখন আমাদের দেশের ব্যয়হীন, অথচ স্বাস্থ্যপ্রদ খেলাগুলি উঠিয়া গিয়াছে। পল্লীগ্রামের ছেলেগুলা পর্য্যন্ত ন্যাকড়ার নিশান পুতিয়া, এবং ন্যাকড়ার এক অপূর্ব্ব 'বল' প্রস্তুত করিয়া, অর্দ্ধকর্ত্তিত ধানের ক্ষেতে ফুটবল খেলে। কখনও বা উত্তর শৃঙ্গে বসিয়া নিম্নের উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের শোভা, এবং সুদূরস্থ চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতমালার সান্ধ্যাকাশে তরঙ্গায়িত নীললীলা দেখিতাম।

এক দিন আমার কলেজের বন্ধু, দেব-প্রতিম পবিত্রচরিত্র পণ্ডিত দেবনাথ শাস্ত্রী আমার এই শৈলাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আমি পাহাড়ের নাম 'Fancy Hill' 'ফ্যান্সি হিল' (কল্পনা-শৈল বা রম্য শৈল) রাখিয়াছিলাম। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ নাম 'রম্য ভূমি'। আর গৃহের নাম রাখিয়াছিলাম 'আশ্রম'। দেবনাথকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে গেলে তিনি—"সে কি! নবীনবাবু! সে কি!" বলিয়া, আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, কোলাকুলি করিলেন। আমি বলিলাম,—"দেবনাথ! আমি ত ব্রাহ্ম নহি। তোমাকে প্রণাম করিব না, তোমার পদধূলি লইব না. তবে কাহার লইব? শুনিয়াছি, তুমি চট্টগ্রামের 'নববিধান' সমাজে গেলে, তাহারা লাঠির দ্বারা ভ্রাতৃপ্রেম প্রকাশ করিবে। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চল. আমি তোমাকে হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে লইয়া যাই, তুমি দেখিবে—সকলে আমার মত তোমার পদধূলি লইবে।" দেবনাথ তাঁহার সেই সুপ্রসন্ন হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"সত্য সত্যই কি তাহারা আমাকে মারিবে?" তাঁহার কথার ভাবে বোধ হইল, তাঁহার মনেও এইরূপ ভ্রাতৃপ্রেম লাভের আশঙ্কা আছে। আমি বলিলাম,—শুনিয়াছি. তাহারা তোমাকে তাহাদের সমাজে প্রবেশ করিতে দিবে না। তিনি তাঁহার সঙ্গী ব্রাহ্মের দিকে চাহিলেন, এবং উভয়ে হাসিলেন। বহুক্ষণ নানাবিধ আলাপের পর দেবনাথ আমার সমস্ত 'আশ্রম' বেড়াইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন. এবং পাহাড় হইতে নামিবার সময়ে বলিলেন.—"আমি সময়ে সময়ে চট্টগ্রামে আসিয়া থাকিবার জন্য আপনার আশ্রমে একটুক স্থান ভিক্ষা করিব।" আমি বলিলাম,—"তাহা হইলে আমি যে কত সুখী হইব, বলিতে পারি না। তোমাকে আমাদের আশ্রমে দেবতার মত স্থাপিত করিয়া, আমরা পতি-পত্নী-পুত্র তোমার পূজা করিব।" তাঁহার কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার দিন, আমার গাড়ীতে দুজনে ষ্টেশনে যাইতেছি। আমি ইচ্ছা করিয়া একটু আঁচড় দিলে দেখিলাম, ব্রাহ্ম চর্ম্মের নীচেই ব্রাহ্মণের রক্ত। কথায় কথায় বলিলাম. তাঁহাদের সাম্যবাদটা আমি বড় বুঝি না। কই, দেবনাথ শাস্ত্রী যদি মুচি মুদ্দাফরাসের ব্যবসা করিতেন, তবে সাম্যটা কি, বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কই, তিনি হিন্দু থাকিলে হিন্দুর বাড়ীতে যে পৌরোহিত্য করিতেন, ব্রাহ্ম হইয়া, ব্রাহ্মের বাড়ীর সেই পৌরোহিত্যই করিতেছেন। দেবনাথ হাসিয়া বলিলেন.—"একটা কথা মনে পড়িল। আমি যখন ব্রাহ্ম হইলাম. পাড়ার স্ত্রীলোকেরা মাএর কাছে গিয়া বলিল,—'করিলে কি? দেবনাথটিকে ভিখারী করিয়া দিলে?' মা বলিলেন,—দেবনাথের সাত পুরুষ ভিখারী। দেবনাথও ভিখারী হইয়াছে। তাতে নূতন কথা আর কি?" আমি বলিলাম, ব্রাহ্মণের এই অধঃপতনের দিনেও সর্ব্বত্র শীর্ষস্থানে ব্রাহ্মণ। কি সাহিত্যে, কি 'বারে,' কি বিচারাসনে, কি রাজনৈতিক আন্দোলনে,

সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ। তিনি উৎসাহ ও আনন্দের সহিত বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের পার্থক্য ও প্রাধান্য মান্দ্রাজে যেমন দেখা যায়, এমন আর কোথায়ও নহে। তুমি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাও, সহস্র লোকের মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণ, তাহা চিনিতে পারিবে।" কেমন! ব্রাহ্ম চর্ম্মের নীচেই ব্রাহ্মণ-রক্ত কি না? তিনি ট্রেনে উঠিলে বলিলাম,—"দেখ দেবনাথ! তুমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'পোপ'। বিলাত-ফেরতা প্রায় সকলেই তোমার চেলা। ইহাদের না আছে ধর্ম্ম, না আছে দেশ, না আছে মনুষ্যত্ব। তুমি ইহাদের মতিগতি ফিরাইয়া, তাহাদিগকে 'ইওরেসিয়ান' নরক হইতে উদ্ধার কর। যত বাঙ্গালী, তত পরিচ্ছদ ত আছেই। তাহার উপর যত ব্রাহ্ম বা বিলাত-ফেরত, তত ধর্ম্ম ও সমাজ। তুমি একটি সংহিতা করিয়া, ইহাদিগকে একটা কিছু ধর্ম্ম ও বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে, শুধু তাহাদের উদ্ধার সাধন করিবে, এমন নহে; দেশেরও একটা মহৎ কল্যাণ করিবে।" তিনি বিষণ্ণ বদনে বলিলেন,—"নবীনবাবু! ও কিছুতে কিছু হইবে না। যে খরতর বিলাতী সভ্যতার স্রোত ছুটিয়াছে, তাহাতে সকল চেষ্টা ভাসিয়া যাইবে।" ট্রেন খুলিল, তিনি চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে তাঁহার এক উপন্যাস বাহির হইল, এবং তাহাতে 'মিঃ নোন্দি', অমৃতের সুর 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র 'মিঃ সিঙ্গ' মহাশয়ের জুড়ী বঙ্গসাহিত্যে দেখা দিলেন। বিলাত-ফেরতার উপরোক্ত দল ইহাতে এমন ক্ষেপিয়াছিল যে, একজন আমাকে বলিলেন, তিনি দেবনাথকে পাইলে তাহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া দিবেন।

একজন বিখ্যাত বিলাসী বিলাত-ফেরতা ব্যারিষ্টার এই সময়ে চট্টগ্রামে এক মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে আসিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া, আমার 'আশ্রমে'র ও 'ডিনারে'র এরূপ ব্যাখ্যা কলিকাতার বড়লোক মহলে করিয়াছিলেন যে, আমি তাহার কিছু দিন পরে কলিকাতায় গেলে অনেকে আমাকে বলিলেন,—তাঁহারা আমার পার্ব্বত্য আশ্রম দেখিতে একবার চট্টগ্রামে আসিবেন। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া, সূর্য্যদেবের উদয় পর্য্যন্ত গৃহ-প্রাঙ্গণে বেড়াইয়া স্নিগ্ধ সমুদ্রানিল সেবন করিতাম। শরীরে যেন অমৃত বর্ষিত হইত। তাহার পর এক গবাক্ষের সমক্ষে বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে সমস্ত প্রাতঃকাল লেখায় ও বন্ধু-দর্শনে কাটাইতাম। অপরাহ্নে আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া, পত্নী সহ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পর্ব্বতের গৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, এবং বাগানের তত্ত্বাবধারণ করিতাম। পার্ব্বত্যানিলে আমার ধুতির ও স্ত্রীর শাড়ীর অঞ্চলাগ্র পতাকার মত উড়িতে থাকিত। জ্যোৎস্না রাত্রি হইলে, রাত্রির বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বেড়াইতে বেড়াইতে কৌমুদীরঞ্জিত শৈল-সমতল, সরিৎসাগরমিশ্রিত চারি দিকের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া, আনন্দে অধীর হইতাম। সন্ধ্যার পর বন্ধুবান্ধব আসিতেন। তাঁহারা কেহ কেহ হারমোনিয়ামের সঙ্গে গাইতেন। পাঠ সমাপন করিয়া আসিয়া পুত্রও গাইত। এরূপ আনন্দে সমস্ত সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত। মধ্যে মধ্যে বন্ধোপলক্ষ্যে নদীপথে পর্ব্বতের, পল্লীগ্রামের ও বহুদূর-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের শোভা দেখিতে দেখিতে পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীতে যাইয়া, সমস্ত অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা গ্রামের বৃক্ষচ্ছায়ায় ও দীর্ঘিকার তীরে তীরে বেড়াইতাম। বন্ধের পর যেন নূতন জীবন লইয়া শহরে ফিরিয়া আসিতাম। এই idyllic (গীতিকাময়) জীবন একটি বৎসর অনুভব করিলাম। শ্রীভগবান্ আমার আযৌবনপুষ্ট একটি বাসনা পূর্ণ করিলেন। ভাবিতাম, এই ভাবে 'প্রভাসে'র উপসংহারে যেরূপ চাহিয়াছি, জীবনের অপরাহ্ন বহিয়া গিয়া শান্তির সন্ধ্যায় শেষ হইবে। স্বদেশীয় যিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তিনি পাহাড়ে উঠিয়া বলিতেন,—"কি সুন্দর স্থান! স্বর্গ বলিলেও চলে। এমন সাজান বাড়ী, এমন গাড়ী ঘোড়া, মাজিষ্ট্রেট কমিশনরেরও নাই। এত সুখ দেখিয়া কি মানুষ হিংসা না করিয়া থাকিতে পারে?" সত্য সত্যই মানুষ হিংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। এক দিন অকস্মাৎ আমার এই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

সয়তান

"For some of you there present are worse than devils." *The Tempest.*

একদিন মিঃ কলিয়ার আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি পাটনার কমিশনর হইয়া যাইতেছেন, তাঁহার স্থানে আসিতেছেন—মিঃ মহানিষ্টী। অকারণ লোকের মহা অনিষ্টকারী এমন আর ভূভারতে দুটি নাই। অতএব তিনি সংবাদটি আশঙ্কার সহিত বলিলেন। আমি তাঁহার অধীনে ফেনীতে কার্য্য করিয়াছিলাম, এবং একা আমি মাত্র তাঁহার কৃপাকটাক্ষভাজন ছিলাম। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমি যখন তাঁহার বদলিতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আমি তাঁহার পরবর্ত্তীকে চিনি, তখন মিঃ কলিয়ার যেন আমার জন্য আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"O you know him then!" (আপনি তবে তাঁহাকে চিনেন!) চিনি বটে, কিন্তু এরূপ প্রকৃতির লোকের অধীনে কাজ করা, আর সসর্প গৃহে বাস করা এক কথা। অতএব কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। উত্তর পাইলাম যে, আমাকে তিনি পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট পাইবেন শুনিয়া বড়ই সুখী হইয়াছেন। পূর্ব্বে সয়তান দাসের উল্লেখ করিয়াছি। আমারই এক ভূতপূর্ব্ব সহপাঠী। সে চট্টগ্রামের একজন উচ্চ কর্ম্মচারী। এমন ভীষণ হিংস্রক জীব বুঝি বনেও নাই। হিন্দু ধর্ম্ম এমন পাপীর কল্পনা করিতে পারে না। এই নরাধম খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের সয়তানের জীবন্ত আদর্শ। এ জন্য আমি তাহার নাম 'সয়তান' দাস' ওরফে 'সাহেবদাস' রাখিয়াছিলাম। দেখিতে একটি মাংসপিণ্ড-বিশেষ। ঠিক যেন মৃত কীচকের দেহপিণ্ড। কিম্বা সেক্সপিয়ারের 'ক্যালিবান' বা 'ফলসটাফ'। তাহার আকৃতি নিতান্ত খর্ব্ব, উদরের পরিধি শরীরের দৈর্ঘ্য হইতেও বেশী। একটি মেটে তেলের পিপে, কি ঢাকাই জালার উপর একটা বৃহৎ হাঁড়ি বসাইয়া দিয়া, তাহাতে কচ্ছপের মত দুটা ক্ষুদ্র চক্ষু এবং হস্তীর মত স্থূল হস্ত পদ যোগ করিয়া দিলে, তাহার আকৃতি হইবে। সে চলিয়া যাইবার সময়ে হাঁটিতেছে, কি গড়াইতেছে, আমি ঠিক করিতে পারিতাম না। তাহার শ্রীমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়াই আমি 'রঙ্গমতী'র ঢেঁকি পঞ্চাননের রূপ কল্পনা করিয়াছিলাম। সেই বৃহৎ উদরে প্রবেশ করে নাই, এমন ঘৃণিত বস্তু নাই ; তাহাতে নাই, এমন পাপ নাই। সে নিজে বলিত যে, জলচরের মধ্যে কেবল নৌকা, এবং স্থলচরের মধ্যে কেবল শকট তাহার আহার্য্য নহে। কোনও বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে যাইতেছি। সে এক বাক্স 'সার্ডিন' মাছ লইয়াছে। উহা খুলিবামাত্র দুর্গন্ধে আমরা বমি করিতে লাগিলাম। তাহাকে ভৃত্যদের নৌকায় তাড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা ও মাঝি-মাল্লারা বমি করিতে করিতে নৌকা ছাড়িয়া ডাঙ্গায় উঠিল। আমাদের কুসংস্কারের জন্য নিন্দা করিয়া, সে পচা মাছ বাক্স সুদ্ধ খাইল। বন্ধুর বাড়ীতে পঁহুছিয়াই তাহার ওলাউঠা। এই পিশাচকে সঙ্গে আনিয়াছি বলিয়া বন্ধু আমাদিগকে মারিতেই চাহিলেন। সে আমার চট্টগ্রাম স্কুলের সহপাঠী। শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন ও নিতান্ত দরিদ্র ছিল। তাহার এক আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পড়িত। সেই আত্মীয়ের পুত্র তাহার প্রতি এত অত্যাচার করিত যে, সে স্কুলে আমার মত সকালে আসিয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিত, আর তার দুরবস্থার কথা বলিত। আমি সে জন্য তাহাকে বড় দয়া করিতাম এবং ভালবাসিতাম। সময়ে সময়ে তাহাকে কাপড় বই কিনিয়া দিতাম। শৈশবেই শিক্ষকেরা তাহাকে চিনিয়াছিলেন। সে একজন সাধারণ (average) বুদ্ধির ছেলে ছিল। পড়া প্রায়ই বলিতে পারিত না। কেবল চালাকি করিয়া বা 'কপি' করিয়া পার পাইতে চেষ্টা করিত। সে জন্য শিক্ষকেরা স্কুলে তাহার নাম 'চালাক-দাস' রাখিয়াছিলেন। 'প্রোমোশন' না পাওয়াতে সে শেষে তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণী হইতে স্কুল ছাড়িয়া, তাহার কোনও আত্মীয়ের আফিসে 'এপ্রেণ্টিস' হয়। আমি যখন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আসিলাম, সে তখন একজন সামান্য কেরানী। আমাকে আসিয়া ধরিয়া পড়িল। আমি প্রথম তাহার বর্ত্তমান পদ সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে তাহাকে সামান্য বেতনে নিযুক্ত করি, এবং পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইয়া, তাহার খোসামুদিতে

বশীভূত হইয়া, সেই বেতন অনেক চেষ্টায় বৃদ্ধি করিয়া দিই। জানিতাম না যে, আমি দুধ দিয়া একটি কালসর্প পুষিতেছি। আমি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপদাপন্ন হইয়া চট্টগ্রাম ছাড়ি। সেই বিপদের সময় আমি রাজবিদ্রোহী, সংবাদপত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষীয়দের ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লিখি, এই বলিয়া সাক্ষ্য দিয়া, সে প্রথম আমার এত উপকারের প্রতিদান দেয়। যাহা হউক, সেই বিপদের পর চট্টগ্রাম আসিলে, সে আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলে যে, কেবল সাহেবদের ভয়ে সে এরূপ বলিয়াছিল, না হয় তাহার চাকরি থাকিত না। তাহার পর ২০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সে সাহেব-সেবার বলে ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি করাইয়া এখন চট্টগ্রামের একজন প্রধান কর্ম্মচারী। সাহেব-সেবায় এমন সিদ্ধহস্ত লোক আমি আর দেখি নাই। তাহার ব্রহ্মাস্ত্র ডালি। সে তাহার কার্য্যোপলক্ষ্যে ফাঁকি দিয়া এক বাগান করিয়াছিল, এবং তাহা হইতে নিত্য কলেক্টর কমিশনরের কাছে ডালি পাঠাইত, এবং সে তাঁহাদের General Supplier. সে জানিত, ইংরাজদের হাত করিবার দুই অব্যর্থ উপায়—তাহাদের উদর ও পকেট। সে লোকের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়া, সময়ে সময়ে নিজে কিছু দণ্ড দিয়া, সাহেবদের এমন সস্তা জিনিসপত্র যোগাইত যে, সাহেবেরা এই সামান্য বিষয়ের জন্য তাহার হাতের পুতুল হইতেন। চট্টগ্রামে এই ২০ বৎসরের মধ্যে যত কলেক্টর কমিশনর আসিয়াছেন, সে সকলকে বাপ ডাকিয়াছে, এবং তাঁহাদের পাদুকা লেহন করিতেও ছাড়ে নাই। সে অহঙ্কার করিয়া বলিত—"জুতা বার্ণিস করিতে হয়, 'ডসনের বাড়ী'র (অর্থাৎ সাহেবের জুতা) বার্ণিস করিব। নবীনের ভিন্ন বাঙ্গালীর জুতায় কালি দিব না।" সে এরূপে সাহেবদের হাত করিয়া, দেশের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। কয়েক বার তজ্জন্য বিপদে পড়িয়া, আমার কাছে কাঁদিয়া এবং আমার পরামর্শে ও সাহায্যে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। সমস্ত চট্টগ্রামে তাহার অভিশপ্ত নাম। সাহেবদের চক্ষে ধূলা দেওয়ার জন্য সে ব্রাহ্ম হইয়াছিল। যাহার গোত্রের স্থিরতা নাই, সে কাশ্যপ গোত্র। সাহেবদের দেখাইয়া সে রাস্তায় রাস্তায় সঙ্কীর্ত্তনে বাহির হইত, এবং মুদি 'দোকানদার ভ্রাতাগণ'কে চক্ষু বুজিয়া ভ্রাতৃপ্রেম বিতরণ করিত। আর আফিসে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের মাতা এবং ভগিনীর সঙ্গে কুটুম্বিতা না করিয়া,—তাহাদের অবৈধ প্রেম বিতরণ না করিয়া, এবং অভিধান-বহির্ভূত গালিবর্ষণ না করিয়া, কথা কহিত না। তাহার দেশব্যাপী অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, স্বনামখ্যাত ব্রাহ্ম ডাঃ কাস্তগির পর্য্যন্ত একবার তাহার বিপদের সময়ে, দেশোদ্ধারের জন্য তাহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আমার কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে, আমি জানি যে, এমন পাপিষ্ঠ ও ঘৃণিত জীব জগতে নাই, কিন্তু তাহাকে আশৈশব আপনার ভাইয়ের মত আমি দেখিয়া আসিয়াছি। আমি তাহার প্রতিকূলে কিছু করিতে পারিব না। সেই বিপদেও আমি যত দূর পারি, তাহার সাহায্য করিয়াছিলাম। মিঃ মহানিণ্টী ইতিপূর্ব্বে চট্টগ্রামের কলেক্টর হইয়া আসিয়াই আমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে বলিয়া, ফেনী হইতে আসিয়া জোবওয়ারগঞ্জে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লিখিয়াছিলেন। আমি আসিলে সয়তান কিছু পথ আগে যাইয়া, আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"যে দুরন্ত লোকের হাতে পড়িয়াছি, এবার বুঝি আর চাকরি থাকে না। কিন্তু তোমার উপর তাহার বড় 'হাই ওপিনিয়ন' (উচ্চ মত)। সে বলে যে, সে তোমার মত এমন যোগ্য লোক দেখে নাই। তুমি ভাই! আমার জন্য দুটি কথা না বলিলে, আমার রক্ষা নাই।" আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া, আপনার ভাইয়ের মত পরিচয় করাইয়া দিলাম। জানিতাম না, ইহাতেই একদিন আমার সর্ব্বনাশ হইবে। সেই অবধি ইনি তাহার হাতের পুতুল হইলেন। সে ইতিমধ্যে তাঁহার দুর্ব্বলতা বুঝিয়াছিল। লোকটা ভয়ানক কৃপণ; ইংরাজ জাতির মধ্যে এমন দেখি নাই। সয়তানদাস বলিল,—"তোমার সাহেব, ভাই! ভারি কৃপণ। তাহার পেছনে আমার আধা মাহিয়ানা যাইতেছে। যে মাছটির মূল্য চারি আনা, লইয়া থাকি এক আনা! তাতেও বলে—বড় বেশী

দাম।" আমি বলিলাম—"তুমি এরূপ কর কেন? উচিত মূল্য লইলেই হয়।" সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আরে পাগল! তা হইলে কি আর চাকরি থাকে? আমার বিদ্যাবুদ্ধি ত তুমি সব জান। এই শালাদের খোসামুদি করিয়াই ত এত দূর উঠিয়াছি। সব সাহেবদের এরূপ অল্প মূল্যে জিনিসপত্র যোগাইতে হয়। তাতেই ত আমার কিছু থাকে না।" এই অবধি সে সাহেবের মহা প্রিয়পাত্র হয়। বলা বাহুল্য, সে এই সকল গুণেই এখন 'রায় বাহাদুর।'

সে তাহার রায় বাহাদুরির উপাখ্যান এরূপে বলিত। সে গর্ব্বের সহিত বলিত—"জান, আমি কিরূপে রায় বাহাদুর হইয়াছি?" আমি—"না, অবশ্য তোমার sterling merit-এর (প্রকৃত গুণের) দ্বারা।" সে sterling শব্দের অর্থ কেবল টাকা পয়সা বলিয়াই জানিত। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া, গ্রীবায় একটা রেখামাত্র ছিল, বলিল,—"না। জান ত, আমার কাছে 'ষ্টারলিঙ্গ' 'ফারলিঙ্গ' কিছুই নাই। 'মেরিট' (গুণও) সেই চট্টগ্রাম স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত। কেবল খোসামুদির চোটে আমি 'রায় বাহাদুর' হইয়াছি।" আমি—"বটে!" সে আবার সেই রেখা-মাত্র-গ্রীবা গর্ব্বে বাঁকাইয়া বলিল,—"জান, আমি সাহেবদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কি করি?" আমি—"না।" সে—"আমি প্রথম পাহাড়ের নীচে আস্তাবলের কাছে গিয়া বলি—ঘোড়া সাহেব সেলাম! সহিস সাহেব সেলাম! কোচম্যান সাহেব সেলাম! তাহার পর পাহাড়ে উঠিয়া—আর্দালি সাহেব সেলাম! বেহারা সাহেব সেলাম! আয়া সাহেব সেলাম! তার পর কক্ষে প্রবেশ করিয়া—কুকুর সাহেব সেলাম। তাহার পর মাটিতে পড়িয়া—হুজুর! গড! ফাদার! মাদার! সেলাম। তুমি যদি এরূপ করিতে, আজ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে পারিতে। আর তোমার নামের সঙ্গে, দাসের বেটার মত পাঁচটা উপাধি বসিত।" আমি—"কি করিব! অদৃষ্ট মন্দ।" সে—"আমি লুসাই-যুদ্ধের বলদের লেজ মলিয়া (তাহা হাতের ভঙ্গি করিয়া দেখাইয়া) 'রায় বাহাদুর' হইয়াছি। এখন যে চাটগাঁয়ে 'রায় বাহাদুর' হইবে, তাহাকে আমার লেজ মলিতে হইবে।" 'আমার লেজ' বলিয়া সে তাহার পশ্চাৎ অঙ্গে হাত দিয়া দেখাইত। কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, সেই ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অঙ্গটি আমি দেখি নাই। সে যেরূপ হাস্যকর পরিচ্ছদে তাহার বৃহৎ উদরায়তন-সর্ব্বস্ব দেহটা আবৃত করিয়া রাখিত, হয় ত তাহার অভ্যন্তরে লেজটা লুক্কায়িত ছিল, আমি কিন্তু দেখি নাই। হয় ত ব্রাহ্ম ভ্রাতারা কেহ কেহ উহা দেখিয়া থাকিবেন। কারণ শুনিয়াছি, অনেকে 'ওঁ সচ্চিদানন্দ হরি!' ও চট্টগ্রামের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বলিয়া তাহাতে তৈলমর্দন করিতেন।

হাত করিতে সে পারে নাই কেবল কলিয়ার সাহেবকে। কলিয়ার নিজে শিবতুল্য উদাসীন লোক। তাঁহার দ্বিতীয় ভার্য্যা নব-যুবতী। তাঁহার কাছেও ঘেঁষিবার জো নাই। ডালি পাঠাইলে তিনি ইদানীং ফেরত দিতেন। মিঃ কলিয়ার ইংরাজদের সঙ্গেও বড় একটা মিশিতেন না যে, কলেক্টর 'বাপ এণ্ডার্সনের (পাপিষ্ঠ বরাবর তাঁহাকে 'বাপ এণ্ডার্সন'ই বলিত) দ্বারা তাঁহাকে হাত করিবে। অতএব এত কাল পরে সয়তানদাস ফাঁপরে পড়িয়া, ষোড়শোপচারে আমার খোসামুদি আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অনেক পুত্র কন্যা আছে, তাহার উপর আবার একটি উপপুত্র আছে। সে তাহাকে 'পালকপুত্র' বলিত। কিন্তু কোন্ শাস্ত্র-মতে সে তাহাকে কখন কি কারণে 'পালন' করিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। 'বাপ এণ্ডার্সন' পালককে অস্থায়ী খাস তহশিলদার করিয়াছিলেন। এখন তাহাকে স্থায়ী করিবার জন্য রিপোর্ট করিয়াছেন, উহা কেরানীরা বোর্ডে পাঠাইবার 'মামুলি মেমো' দিয়া, কমিশনরের কাছে পাঠাইয়াছে। সয়তান আমার আফিসে আসিয়া, তাহার উচ্ছিষ্টভোজী সেই শৃগালটির কাছে খবর পাইয়া, ছুটিয়া আমার কক্ষে উপস্থিত। দুই হাত মাথায় দিয়া বলিল,—"তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ!"—আমি আশ্চর্য্য হইলাম।—"তুমি আমার পালকের মাথা খাইয়াছ।"

আমি বলিলাম,—"মাথা খাওয়া আমার অভ্যাস নাই। রিপোর্ট কমিশনরের কাছে গিয়াছে, এখনই মঞ্জুর হইয়া আসিবে।" সে বলিল,—"একটি মামুলি 'মেমোতে' কি বোর্ড মঞ্জুর করিবে? তুমি 'ফাইল'টা ফিরাইয়া আনিয়া, তোমার নিজের হাতে একটা চিঠি মুসাবিদা করিয়া না দিলে কিছুই হইবে না।" আমি এই অবস্থায় ফাইল ফিরাইয়া আনা অসম্ভব বলিলাম। কিন্তু এমনই ঘটনা, কমিশনর হইতে বাক্স ফিরিয়া আসিলে, সে উক্ত 'ফাইল' বাহির করিয়া দেখিল যে, কমিশনর সেই মেমো স্বাক্ষর করেন নাই। সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—"তুমি এখন ত একটা চিঠির মুসাবিদা দিতে পার।" আমি বলিলাম,—"কলিয়ার অবশ্য মেমো দেখিয়াছেন, বোধ হয় ভুলক্রমে স্বাক্ষর করেন নাই। এখন মেমো ফেলিয়া দিয়া চিঠির মুসাবিদা দিলে, তিনি আমার প্রতি সন্দেহ করিবেন।" সে তখন চেয়ার হইতে নামিয়া, এবং টেবিলের নীচে মাথা দিয়া, আমার পা দুখানি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, এবং চক্ষের জল ছাড়িয়া দিয়া,—সে কথায় কথায় চক্ষের জল ফেলিতে পারিত—কাঁদিয়া বলিল, —"তুই এবার আমার পালককে উদ্ধার না করিলে, আমি তোর পা ছাড়িব না।" মহাসংকটে পড়িলাম। তখন 'মেমো' ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, একখানি চিঠি—বেশ একটুক অনুরোধ করিয়া মুসাবিদা করিয়া দিলাম। সে তখন পা ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া, অশ্রু মুছিয়া, উহা পড়িল, এবং একটি লাল কাগজের নিশান (জরুরি চিহ্ন) দিয়া, উহা কমিশনরের কাছে পাঠাইতে বলিয়া, 'দুর্গা! দুর্গা!' করিতে লাগিল। আমি বলিলাম,—"ব্রাহ্মের আবার দুর্গা কি?" সে বলিল,—"তুই এ সময়ে ঠাট্টা করিস না।" ফাইল তখনই ফিরিয়া আসিল। কমিশনর একটি অক্ষরও না কাটিয়া, মুসাবিদা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছেন। সয়তান আনন্দে নাচিতে লাগিল। সে ঘটোৎকচের নৃত্য! আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—"দেখ্‌লি, কমিশনর কিছু বললে? তোর কথার উপর আবার কমিশনর হাত দিবে? সাধে তোর পা চাটি। এমন সাহস কি আর কোনও শালা কালাচাঁদের হইত। এবার তুই আমার পালককে উদ্ধার করিলি।" আমি জানিতাম, বোর্ড কখনও এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না। কারণ, গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে গোপনীয় আদেশ দিয়াছিলেন যে, আর খাস-তহশীলদারের পদ থাকিবে না। এই কার্য্য সাব-ডেপুটিরা করিবে। আমি তাহাকে বলিলাম যে, এই প্রস্তাব কখনও বোর্ড মঞ্জুর করিবে না, আমি কেবল কমিশনরের কাছে এরূপ মুসাবিদা দিয়া, তাঁহার বিশ্বাসের অপব্যবহার করিলাম মাত্র। সে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল,—"তাহার জন্য ভয় নাই। বোর্ডে আমার বাপ ওল্ডহ্যাম আছে। এখনই গিয়া 'মাই ডিয়ার ফাদার' বলিয়া পত্র লিখিতেছি।" গবর্ণমেণ্ট প্রথম অমত করিয়া, শেষে অগত্যা এই প্রস্তাব কমিশনরের বিশেষ সুপারিসের অনুরোধে গ্রহণ করিলেন।

এত করিয়াও আমি এই ভুজঙ্গের বিষদন্ত হইতে রক্ষা পাইলাম না। সে আর দুইটি বিষয়ের জন্য এইরূপ কাঁদিয়া, আমার পা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে, তাহার স্বার্থের অনুরোধে ঘোরতর অন্যায় করিতে হয়। আমি অস্বীকার করিলাম। একজন জমিদার তাহার নামে তাহার এক সম্পত্তি নষ্ট করিবার জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকার দাবিতে নালিশ করিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা যে, আমি জমিদারকে ধরিয়া এই মোকদ্দমাটি উঠাইয়া লই। তাহাতে সেই জমিদারের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। অতএব আমি তাহাকে ধরিয়া, এবং কমিশনরকে বুঝাইয়া উহা আপোস করাইয়া দিলাম। কিন্তু তাহাতে সয়তানের তৃপ্তি হইল না। কারণ, আপোস করিতে তাহার কুকার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। আর একজন জমিদারের জমিদারিও সে যাবজ্জীবন গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল। আমি এরূপ অধর্ম্মে তাহার সাহায্য করিতে পারিব না বলিয়া পরিষ্কার জবাব দিয়াছিলাম এবং উক্ত জমিদারি তাহার গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়াছিলাম। সর্ব্বশেষ এই সময়ে 'হিতবাদী'তে তাহার কুকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া, কয়েকটি দীর্ঘ প্রবন্ধ কাহার দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাহার

বিশ্বাস, তাহার শত্রু কলেক্টরের হেড কেরানী আমাকে এই সকল কথা বলিয়াছিল, এবং আমিই 'হিতবাদী'র প্রবন্ধ-লেখক। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট গোপনীয় রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন। 'বাপ কলেক্টর' তাহার কৈফিয়ৎ লইয়া, তাহাকে বাঁচাইয়া রিপোর্ট করেন। কিন্তু মিঃ কলিয়ার ভুলিবার লোক নহেন। তবে তিনি কাহারও অনিষ্ট করিতেন না। শুনিয়াছিলাম যে, তিনি তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে বদলি করিতে গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছিলেন। Confidential (গোপনীয়) বলিয়া এই রিপোর্ট আমি দেখি নাই। নরাধম তখনই পীড়িত বলিয়া, দীর্ঘ ছুটি লইয়া, কলিকাতায় 'বাপ ওল্ডহ্যামে'র কাছে ছুটে। সে বাস্তবিকই পীড়িত ছিল। ইহ জীবনেই তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছিল। সে এরূপ এক উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়াছিল যে, রাত্রিতেও তাহার নিদ্রা ছিল না। তাহার পালঙ্গের নীচে. সমস্ত রাত্রি শীত গ্রীষ্মে অগ্নি জ্বালিয়া রাখিতে হইত, এবং উপরে পাখা টানিতে হইত। বলা বাহুল্য, এই কর্ম্মে পেয়াদারাই নিযুক্ত থাকিত, এবং তাহাদের উপর পাপিষ্ঠ এরূপ উৎপীড়ন করিত যে, তাহারা সমস্ত রাত্রি তাহার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিত। সমস্ত দেশ তাহার শত্রু। কে কখন্ তাহাকে হত্যা করে, সে দিনরাত্রি এ জন্যও ভয়ে পেয়াদার পাহারা রাখিত। ছুটি লইয়া কলিকাতা যাইবার সময়ে আমি তাহাকে দেখিতে গেলে, সে আমার দুই হাত ধরিয়া বলিল,—"নবীন! তুমি বল,—তুই ফিরিয়া আসিস।" আমি বলিলাম,—"তাহার অর্থ কি?" সে বলিল,—"অর্থ যাহা হউক, তুমি বল—তুই আসিস।" আমি তাহা বলিলাম। তখন সে গলদশ্রুনয়নে বলিল,—"তুমি আমাকে 'হিতবাদী'র হাত হইতে রক্ষা কর।" আমি তাহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, 'হিতবাদী'র সঙ্গে আমার কোনও সংস্রব নাই। সেই সকল প্রবন্ধের লেখক আমি নহি, আমি কখনও 'হিতবাদী'তে কোনও প্রবন্ধ লিখি নাই। তথাপি সে সম্পাদকের কাছে আমার এক অনুরোধ-পত্র না লইয়া কিছুতেই ছাড়িল না। তাহার পর 'হিতবাদী'তে আমার অনুরোধমতে তাহার বিরুদ্ধে আর কোনও প্রবন্ধ বাহির হয় নাই।

এমন সময়ে মিঃ মহানিষ্ঠী কমিশনর হইয়া শুভাগমন করিলেন। তিনি ট্রেন হইতে নামিয়াই আমাকে বলিলেন যে, কলিকাতায় নরাধম তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। শুনিলাম, সে তাঁহাকে কলিকাতা খুঁজিয়া এক প্রকাণ্ড ডালি দিয়াছে। সে আমাকে লিখিয়াছিল যে, তাহার পুরাতন মুনিবের আগমন সময়ে অভ্যর্থনা করিতে পারিল না, তাহাতে সে বড় দুঃখিত। তাহার কিছু দিন পরেই সে ছুটি ক্যান্সেল করাইয়া, চট্টগ্রামে আসিয়া আবার উদয় হইল। সত্য কি মিথ্যা, জানি না; শুনিলাম, সেই অবধি সে সাহেবের সমস্ত খোরাক যোগাইতেছিল। কেবল তাহা নহে, কলিকাতার তৃতীয় শ্রেণীর ছক্কর গাড়ীর মত তাহার এক গাড়ী এবং তদুপযোগী তাহার হাঁড়ি-পেটা (pot-bellied) এক ক্ষুদ্র 'পক্ষিরাজ'ও ছিল বিভাগীয় কমিশনরের উহাই বাহন হইল। নির্লজ্জের মত তিনি সেই অপূর্ব্ব রথের ঘর্ঘর রবে, এবং ধূলিপটলে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিয়া আফিসে আসিতেন, এবং সময়ে সময়ে বায়ু বা ধূলিভক্ষণে পাপিষ্ঠের সঙ্গে এই রথে বাহির হইতেন। সাহেব যোগ্য লোক এবং ভাল 'এক্জিকিউটিভ' (শাসনকার্য্যে পটু), কিন্তু তাঁহার দোষের মধ্যে তিনি ঘোরতর চুক্লিপ্রিয়। এই চুক্লিপ্রিয়তায় তিনি যেখানে কার্য্য করিয়াছেন, সেখানেই ঢলাইয়াছেন, এবং লোকের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদে এক ভাঙ্গা পিস্তল বিনা লাইসেন্সে রাখিয়াছিল বলিয়া, একজন প্রধান জমিদারকে তিনি জেলে দেন। তাহার বিরুদ্ধে কি চুক্লি শুনিয়াছিলেন। উক্ত পিস্তল ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া, জমিদার হাইকোর্টে 'মোশন' করিলে, তিনি কৈফিয়ৎ লিখিলেন যে, উহা ভাল পিস্তল, তিনি উহা আওয়াজ করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা করিবেন না। হাইকোর্ট পিস্তল তলব দিলে, তাহার অবস্থা দেখিয়া, কোর্টময় হাসির তুফান উঠিল। জমিদারকে অব্যাহতি দেওয়ার সময় জজেরা লিখিলেন যে, মাজি-

ষ্ট্রেট যদি এই পিস্তল আওয়াজ করেন, তবে আপনাকে ভিন্ন তিনি অন্য কাহাকেও আহত করিতে পারিবেন না। নোয়াখালিতে তাঁহার কীর্ত্তির কথা কতক বলিয়াছি। একে ত তাঁহার এই চুকলিপ্রিয়তা, তাহাতে 'সয়তানদাস' স্বয়ং 'আত্মারাম সরকার।' সোনায় সোহাগায় যোগ। যে ভগবান্ আমেরিকার মহাবিষধর 'রেটেল' সর্পের গতিতে ঘণ্টার শব্দ দিয়াছেন, তিনিই এই সয়তানদাসকেও তাহার পাপের ফলে বহু দিন হইতে ঘোরতর কালা করিয়াছিলেন। তাহার সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা কহিলে মাথা ধরিত। সময়ে সময়ে আমি কাগজে কলমে তাহার সঙ্গে কথা কহিতাম। চারিটা হইতে রাত্রি সাতটা আটটা পর্য্যন্ত তাহাকে তাঁহার ঘরের দক্ষিণের বারান্ডায় লইয়া কমিশনর বসিতেন। উভয়ের মধ্যে এরূপ উচ্চকণ্ঠে প্রেমালাপ চলিত যে, সময়ে সময়ে মারামারি হইতেছে বলিয়া আর্দ্দালিরা ছুটিয়া যাইত। এই আলাপের ফলে চট্টগ্রামে একটা হাহাকার উঠিল। যে হেড কেরানী 'হিতবাদী'র প্রবন্ধ-লেখক বলিয়া পাপিষ্ঠের সন্দেহ হইয়াছিল, সে তৎক্ষণাৎ তোপে উড়িল। কমিশনর তাহাকে সর্ব্বপ্রথমেই নোয়াখালী বদলি করিয়া, তৎস্থানে শ্রীপাটের একজন লোক আনিলেন। অথচ মহানিষ্টী চট্টগ্রামের কলেক্টর থাকিতে এই ব্যক্তি তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। বলিতে ভুলিয়াছি যে, এই নরাধম ঢাকা অঞ্চলের লোক—যদিও সেখানে তাহার বাড়ীঘরের চিহ্ন মাত্র নাই। কখনও ছিল কি না, তাহাতে সন্দেহ। তাহার পর চট্টগ্রামের কর্ম্মচারীদের মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইল। কে কখন্ বদলি' সস্‌পেন্ড' পদচ্যুত এবং ফৌজদারিতে অভি-যুক্ত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। তাহাদের দিবসে আহার, রাত্রিতে নিদ্রা নাই। চট্টগ্রামের স্থানীয় ডেপুটি কলেক্টর, খাস-তহশিলদার, সকলেই বিপদ্‌গ্রস্ত। এমন কি, কণ্টম কলেক্টরও বাদ গেলেন না। তিনি একজন চতুর কার্য্যদক্ষ লোক। সমস্ত ইংরাজ তাঁহার বাধ্য, এবং চট্টগ্রামে তাঁহার অসাধারণ প্রভুত্ব ও নবাবগিরি। সয়তান কেবল তাঁহাকে পারিয়া উঠিত না। এবার সে তাঁহাকেও ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিল। তাহার চুকলিতে তাঁহার প্রতিকূলে কত প্রকারের অভিযোগই হইল। সর্ব্বশেষে স্বয়ং 'বাপ কলেক্টর'ও অস্ত্রাহত হইতে লাগিলেন। এক দিন একজন চট্টগ্রামবাসী ডেপুটিকে কমিশনরের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে গিয়াছি। তিনি বলিলেন, তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন কি, তাঁহার আপনার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। সয়তানদাস তাঁহার নামেও চুকলি কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি বলিলাম,—"সে কি! আপনি যে তাহার বাপ।" তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ও নবীনবাবু! সেই সম্পর্ক এখন রহিত হইয়াছে। এখন তাহার বাপ—তোমার কমিশনর।" দুঃখের কথা, এতদিনে আমি এই ঘৃণিত লোকটিকে চিনিলাম। আমার গতিক কি, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—"নবীনবাবু! আপনার কোনও ভয় নাই। আমি কাল রাত্রিতে ক্লাবে কমিশনরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি চট্টগ্রামবাসী গেজেটেড অফিসার সকলকে বদলি করাইতেছেন। আপনাকে কি করিবেন? তিনি বলিলেন,—O! my P. A. is all right. He is an excellent officer. (আমার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট সম্বন্ধে কোনও গোল নাই, তিনি একজন অতিশয় উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী)।" এ পর্য্যন্ত সত্য সত্যই তিনি আমাকে খুব বিশ্বাস ও সম্মান দেখাইতেছিলেন। মিঃ কলিয়ারের সময় হইতেও তাঁহার সময়ে আমার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল। কলিয়ার কোনও স্থানীয় উন্নতির কার্য্যে হাত দিতে চাহিতেন না। ইহাঁর কাছে যে কার্য্যের জন্য আমি নোট বা মুসাবিদা করিয়া দিতাম, তিনি তাহাই মঞ্জুর করিয়া দিতেন। অনেক সময়ে দেখিতাম, আমার স্বাক্ষর দেখিলে, না পড়িয়া তিনি কাগজ স্বাক্ষর করিতেন। তবে এক দিন তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া, তাঁহার গায়ের কাছে বসাইয়া, কাণ্টম কলেক্টর ও আরও একটি লোক সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি দেখিলাম, তাঁহার উদ্দেশ্য যে, তিনি আমাকেও একজন চুকলিব্যবসায়ী

করেন। আমি কবুল জবাব দিলাম। বলিলাম,—"হেব না অবধড়! মু পারিবি না অবধড়!" আমি কিছু জানি না। তার পর তাঁহাদের বিষয় আমাকে অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম, এরূপ কার্য্য আমি কখনও করি নাই। উহা করিতে পারিব না বলিয়া আমি তাঁহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। তিনি একটুক কষ্টের হাসি হাসিয়া আমাকে বিদায় দিলেন। সেই অবধি কিঞ্চিৎ দূর দূর ব্যবহার করিতেছিলেন। আমার বোধ হয়, ইহাও পাপিষ্ঠের চক্রান্ত। সে জানিত যে, কমিশনরের আমার সম্বন্ধে খুব ভাল মত ছিল। অতএব সোজাসুজি আমার বিরুদ্ধে লাগাইলে কিছু ফল হইবে না। এ জন্য প্রথমে সূচ ফুটাইবার জন্য বোধ হয় বলিয়াছিল যে, উক্ত দুইটি লোকের বিষয় আমি বিশেষ-রূপে অবগত আছি। সে তাহা জানে। কারণ, সে আমার বন্ধু, এবং আমার সঙ্গে তাহার এই সম্বন্ধে কথা হইয়াছে। সে জানিত যে, আমি কখনও ঘৃণিত পৃষ্ঠদংশকের কার্য্য করিব না। কিছুই জানি না বলিয়া বলিব, তাহা হইলে আমার প্রতি সাহেবের সন্দেহ হইবে। এইরূপে সূচ চালাইয়া, তাহার পর সে একেবারে কুড়াল চালাইল। সে একদিন তাঁহার পবিত্র চরণে (sacred foot) তাহার গৃহ পবিত্র করিতে জানু পাতিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিল। সাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া একা যাইতে অস্বীকার করিলেন। তার পর সে 'বাপ কলেক্টরকে'ও নিমন্ত্রণ করিল। তখন দুজনে একদিন সন্ধ্যার সময়ে সয়তানদাসের পুষ্পক রথে তাহার গৃহে 'পবিত্র চরণ' অর্পণে তাহার চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেন। সে এবার একেবারে নীচত্বের শেষ সীমায় গিয়া অপূর্ব্ব চাল চালিল,—তাহার বর্ষীয়সী পত্নী ও যুবতী সেই পালক পুত্রবধূকে তাঁহাদের কাছে দাখিল করিয়াছিল। সন্ধ্যা না হইতে এই সংবাদ ঝটিকাবেগে শহরময় প্রচারিত হইল, এবং একটা হাসির তুফান ছুটিল। অবিলম্বে এই কুড়াল আমার মাথার উপর পড়িল।

ইহার কিছু দিন পরে কলিকাতা হইতে পঞ্চাশ টাকার আম্র, লিচু প্রভৃতি ফলের ও শিশু, মেহগিনি প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষের কতকগুলি চারা আসিয়াছিল। পরদিন প্রাতে তাহা লাগাইতেছি, স্ত্রী আসিয়া বলিলেন,—"তুমি ত জলের মত টাকা খরচ করিয়া এই নন্দনকানন সৃষ্টি করিতেছ। কিন্তু আমি কাল রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, আমরা বদলি হইয়াছি। আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। আমি আবার ঘুমাইলাম। আবার সেই স্বপ্ন দেখিয়া প্রভাত সময়ে জাগিলাম।" কথাটা কেমন আমার প্রাণেও লাগিল। আমি বলিলাম,—নরাধম চুকলিখোরটি দেশব্যাপী আগুন জ্বালাইয়াছে। হয় ত তাহাতে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। আফিসে গিয়া দৈনিক সংবাদপত্র দেখিতেছি, এমন সময়ে কলেক্টর আফিসের পেস্কার, আমার অনুগত ভক্ত কালী আসিয়া, আমার কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল,—"আপনি শুনিয়াছেন কি? কলেক্টর বলিলেন, ইংলিশম্যানে, তিনি আপনার ময়মনসিংহ বদলি দেখিয়াছেন। তিনি আপনাকে ডাকিয়াছেন।" আমি এক মুহূর্ত্ত অকস্মাৎ বজ্রাহতবৎ হইলাম। তার পর সামলাইয়া বলিলাম,—"কি! ময়মনসিংহ! তবে বুঝি এবার সীতাকুণ্ড তীর্থটি রক্ষা করিতে পারিব। ময়মনসিংহে বহু ধনী জমিদার। বোধ হয়, এ জন্য শ্রীভগবান্ ময়মনসিংহে বদলি করাইলেন।" উঠিয়া কলেক্টরের কাছে গেলাম। তিনি নিতান্ত বিষণ্নভাবে বলিলেন,—"নবীনবাবু! আমি গত রাত্রিতে যখন 'ইংলিশম্যানে'র গেজেট-বিজ্ঞাপনীতে আপনার ময়মনসিংহ বদলি দেখিলাম, আমার প্রথম বিশ্বাস হইল না। কারণ, সেই দিন মাত্র কমিশনর আপনাকে এত বাড়াইয়াছেন। কিন্তু তার পর যখন দেখিলাম, আপনার স্থানে আর একজন নিযুক্ত হইয়াছে, তখন আর সন্দেহ রহিল না। কমিশনর আপনাকে কি ইহার কিছুমাত্র ইঙ্গিত করেন নাই।" আমি বলিলাম,—"কিছু না। কাল পর্য্যন্ত আফিসে তিনি আমার সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া কত গল্প করিয়াছেন, ও কত আত্মীয়-তার ভাব দেখাইয়াছেন।" তিনি বলিলেন,—"O shame! shame! (কি লজ্জা! কি

লজ্জা!) ইংরাজের মধ্যে, নবীনবাবু! এমন লোক আছে, আমি জানিতাম না। সমস্ত সেই সয়তানদাসের কার্য্য। সে আমাকেও অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। আমি শীঘ্রই অবসর গ্রহণ (retire) করিব।" আমি ফিরিয়া আসিয়া কমিশনরের ঘরে গেলাম। অন্য দিন তিনি আমার কার্ড পাইবা মাত্র, নিজে আসিয়া, আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইতেন। আজ চার পাঁচ মিনিট বিলম্ব করিয়া ডাকিলেন। আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে তিনি অধোমুখে একখানি কাগজের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। সেক্‌স্‌পিয়ারের ভ্রাতৃরাজ্যাপহারক বিশ্বাসঘাতক এন্টনিও বলিয়াছিল,—

"Ay, Sir, where lies that (conscience) ? If't were a kite
"T would put me to my slipper : but I feel not This deity in my bosom."

এণ্টনিওর মত মহাপাপীও মুখে বলুক,—"বটে! বিবেক মানুষের কোথায় থাকে? পায়ে থাকিলে আমি শিলপার পরি। আমি আমার বক্ষে এই দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করি না।" কিন্তু পাপকার্য্যের পর তাহা অনুভব করিতেই হইবে। আমাকে দেখিয়া যেন তাঁহার বুকে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। তাঁহার মুখে একটা কথা বাহির হইল না। আমি বলিলাম,— "আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, আমি হঠাৎ ময়মনসিংহে বদলি হইয়াছি। আমি ত জানি না যে, আপনি আমার কার্য্যে কোনওরূপ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।" তিনি সেইরূপ অধোমুখে বলিলেন,—"তাহা নহে। আমি বরং আপনার কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আমি আপনার মত এমন যোগ্য কর্ম্মচারী আর দেখি নাই। তবে আপনি এখানে আপনার স্ত্রীর নামে মহাজনি করিয়াছেন। অতএব আপনার এখানে চাকরি করা উচিত নহে বলিয়া, আমি মিঃ বোল্টনকে লিখিয়াছিলাম।" আমি আহত ভুজঙ্গবৎ গর্জ্জিয়া বলিলাম,—"আমি জানি, কোন্ পাজি চুক্‌লিখোর এরূপে আপনার মন বিষাক্ত করিয়াছে। আপনি তাহাকে আমার সঙ্গে মোকাবেলা করুন। আমি তাহাকে পঞ্চাশ বার তাহার মুখের উপর আপনার সমক্ষে নারকীয় মিথ্যুক (damned liar) বলিব।" তাঁহার মুখ এবার একেবারে কালা হইল। তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন,—"আপনি কি আপনার স্ত্রীর নামে আপনার দুই কুটুম্ব ভাইকে টাকা কর্জ্জ দিয়া, তাহাদের জমিদারি বন্ধক লন নাই?" আমি আরও তেজের সহিত বলিলাম,—"আমার স্ত্রী লইয়াছেন। আমি তাঁহার নামে লই নাই। তাহাও আমি রাণাঘাটে থাকিবার সময়ে। এখানে নহে। আমার স্ত্রীর নিজের টাকা বেঙ্গল ব্যাঙ্কে আছে। তিনি সেখান হইতে টাকা আনিয়া, আমার অমতে, কেবল পৈতৃক অংশীদারি সম্পত্তি বলিয়া এই বন্ধক লইয়াছিলেন। আমি ব্যাঙ্কের পাশবহি ও হিসাব আপনাকে এই মুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি। আপনি ইংরাজ। আমি আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী। কেবল ন্যায়ের অনুরোধেও কি আমাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, গোপনে আমার উপর এরূপ একটা অস্ত্র ত্যাগ করা আপনার উচিত ছিল? আমি এই মুহূর্ত্তে আমার স্ত্রীর ব্যাঙ্কের পাশবহি ও হিসাব এবং সমস্ত কাগজ-পত্র দেখাইব। আপনি দেখিবেন, কথাটা damned lie." তিনি সেইরূপ অধোমুখে বলিলেন,—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু আপনি যখন বদলি হইয়াছেন, তখন আমার আর এই সকল বিষয়ে হাত দেওয়ার অধিকার নাই।" তখন আমি সগর্ব্বে রঙ্গভূমির অভিনেতার ভঙ্গিতে 'গুডবাই' বলিয়া চলিয়া আসিলাম। গৃহে ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম,—"তোমার স্বপ্ন সত্য হইয়াছে। আমি ময়মনসিংহ বদলি হইয়াছি। "কি!" বলিয়া তিনি অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

-"and this demi-devil.
For he's a bastard one—had plotted with them
To take my life,"—The Tempest.

এ দিকে দেশব্যাপী একটা মহা হাহাকার উঠিল। ন দিবা, ন রাত্রি, আমার পার্ব্বত্য গৃহ লোকারণ্য। আত্মীয় বন্ধু কেহ কেহ কাঁদিয়া ফেলিলেন। সকলের মুখে হাহাকার ও পাপিষ্ঠের প্রতি অভিসম্পাত। বোধ হইল, সয়তান ষড়্‌যন্ত্রটি এইরূপ করিয়াছিল,—সে প্রথম সূচিবিদ্ধ করিয়া ক্রমে ক্রমে কমিশনরের মন বিষাক্ত করিয়াছিল। কিন্তু তিনি তথাপি ঠিক পথে আসিলেন না। এই সময়ে চট্টগ্রামে একটা সংবাদপত্র প্রকাশের প্রস্তাব লইয়া পুত্রপ্রতিম যুবক নলিনী আমার কাছে উপস্থিত হয়, এবং পৃষ্ঠপোষকতার প্রার্থনা করে। আমি তাহাতে অসম্মত হইয়া বলি,—"কলিকাতার সাপ্তাহিকগুলিনের এরূপ দুরবস্থা যে, উপহার দিয়া চালাইতে হইতেছে। চট্টগ্রামের মত ছোট স্থানে একটা ক্ষুদ্র 'ব্রাহ্মসংশোধনী' কাগজ আছে। আবার আর একটি সাপ্তাহিকের প্রয়োজন কি? লিখিবেই বা কে, আর লিখিবেই বা কি? দু দিন পরে উহা কেবল ব্যক্তিগত কুৎসার ও দলাদলির একটা অমোঘাস্ত্র হইবে মাত্র। তাহাতে দেশে মানুষ তিষ্ঠিতে পারিবে না। লাভের মধ্যে আমি কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিষদৃষ্টিতে পড়িব এবং চট্টগ্রাম হইতে বদলি হইব। আমার এই ভবিষ্যদ্‌বাণীও অনেক ভবিষ্যদ্‌বাণীর মত সত্য হইল। কিন্তু নলিনী কিছুতেই শুনিল না। সে একটি দেবশিশু। তাহার পিতার সঙ্গে তাহার দেশহিতৈষিতার জন্য অসদ্ভাব হইলেও নলিনী আমাদের মাতা পিতা সম্বোধন করিত, এবং আমরাও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। এ দেশে বুঝি আর এমন সুন্দর ও পরার্থ-প্রাণ শিশু জন্মাইবে না। আমি তাহার জিদে পড়িয়া অগত্যা সম্মত হইলাম। চট্টগ্রামে আর একটা কাগজ খুলিল। সম্পাদক রোজ সন্ধ্যার সময়ে পেন্‌সিল কাগজ লইয়া আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইত। আমি বলিয়া যাইতাম, আর সে লিখিয়া লইত। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজনীতি সম্বন্ধে আমি বুদ্ধদেবের মধ্যপথাবলম্বী। স্মরণ হয়, মিঃ এলেনের বদলি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এরূপে প্রকাশিত হয়। পরদিন এলেন স্বয়ং উহা আমার লেখা কি না জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহার এরূপ সন্দেহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন,—"এরূপ সুন্দর প্রবন্ধ চট্টগ্রামে আর কেহ লিখিতে পারে না। আমি অধিক সন্তুষ্ট হইয়াছি। কারণ, উহাতে আমার কেবল নির্জ্জলা খোসামুদি নাই। আমার কার্য্যের নিরপেক্ষ এবং বিচক্ষণ সমালোচনা আছে।" এরূপে দেখিতে দেখিতে কাগজখানির বেশ একটু প্রতিপত্তি হইল। কমিশনর সয়তানদাসের অনুরোধে তাহার 'বেলজিবাব' কমিশনর আফিসের ধূর্ত্ত শেয়াল এক আত্মীয়কে 'কানুনগো' নিয়োজিত করিয়াছেন। শেয়াল-কুকুরে চিরপ্রসিদ্ধ বৈরিতা। এখানেও তাহার ব্যতিক্রম প্রকাশ্যতঃ ছিল না। উভয় নরাধম এরূপ সন্ধি করিয়াছিল যে, লোকে যেন তাহাদের ষড়্‌যন্ত্র সকল বুঝিতে না পারে। তাহারা পরস্পরকে প্রকাশ্য গালি দিবে। এই সন্ধিবশতঃ উভয় উভয়কে এত গালি দিত যে, লোকে মনে করিত, তাহাদের মধ্যে ঘোরতর শত্রুতা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কুকুর শৃগালের গোষ্ঠীকে চাকরি দেওয়াইয়া ডিভিসন পূর্ণ করিয়াছিল। এই কানুনগো নিয়োগ এত অন্যায় হইয়াছিল যে, তজ্জন্য চট্টগ্রামের বহু কর্ম্মচারী আপিল করে। তাহাতে সয়তানের উত্তেজনায় কমিশনর সমস্ত ডিভিসনে আদেশ প্রচার করেন যে, চট্টগ্রামের লোক কানুনগোর পদ পাইবে না। আদেশের এই অংশ শেয়ালের ষড়্‌যন্ত্রে তাহার এক গুপ্ত-চরের দ্বারা প্রকাশিত হইল। আমি ফাঁদে পড়িলাম। তখনই সয়তান কমিশনরকে উহা দেখাইয়া, লাগাইল যে, তিনি আমাকে এত বিশ্বাস করেন, অথচ আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই 'আফিসিয়াল গুপ্ত কথা' আমার কাগজে ছাপাইয়া দিয়াছি। এবার বিষ ধরিল। কমিশনর

তখনই উহা আমার কাগজ কি না, এবং 'অফিসিয়াল গুপ্ততত্ত্ব' আমি প্রকাশ করিয়াছি কি না, আমার কৈফিয়ত চাহিলেন। আমি বুঝিলাম, এত দিনে কমিশনর সয়তানের বড়্‌শি গিলিয়াছেন। আমি উভয় কথা অস্বীকার করিলাম। তিনি লজ্জিত হইয়া, আদেশের এই অংশের নকল কে দিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। সম্পাদককে ডাকাইলাম। সে ভয়ে আসিল না। বরং গম্ভীরভাবে বলিয়া পাঠাইল যে, কেবল আমার আদেশমতে সে তাহার কাগজ চালাইতে পারে না। তাহার নিজেরও সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য আছে। আমি কমিশনরকে সে কথা বলিলাম। তিনি তাঁহার সেই কাষ্ঠ-হাসি হাসিলেন।

কিন্তু এ যে আমার কাগজ তাহার প্রমাণ কি? আমি ত অস্বীকার করিয়াছি। তখন শেয়াল কুকুর আর এক চাল চালিল। শেয়ালের ইচ্ছা যে, কমিশনরের আফিসটি সমস্ত তাহার আত্মীয় ও দেশীয় লোকে পরিপূর্ণ হউক। কারণ, 'চাটগাইয়া হালারা আমাগোরে দেখতে পারে না।' তিনি দুই উমেদার খাড়া করিয়াছিলেন। আমি তাহাদের না দিয়া, দুটি 'এপ্রেন্টিসকে'— দু জন অতিশয় যোগ্য লোককে নিযুক্ত করিয়াছি। কারণ, পূর্ব্বে এই শেয়ালের চক্রান্তে অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য লোক 'এপ্রেন্টিস' হইয়া, এবং পরে তাহারা কেরানী হইয়া আফিসটি একেবারে দুর্ব্বল হইয়াছে। এ জন্য মিঃ স্ক্রীন Execrable office বলিয়া নিত্য গালি দিতেন। এই দুজনের মধ্যে একজন আব্দুল করিম এবং আর একজনের হস্তাক্ষর মুক্তার মত। সুলেখক মাত্র তখন আপিসে ছিল না। আব্দুল করিম চট্টগ্রামের প্রাচীন কাব্যাবলির সংগ্রহের দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের ও চট্টগ্রামের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছিল। সে মুসলমান, অথচ সংস্কৃতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা জলের মত লিখিতে পারে। কলিকাতায় থাকিতে মাসিক পত্রিকায় তাহার প্রবন্ধাদি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম যে, চট্টগ্রামের মুসলমানের মধ্যে এরূপ লোক আছে। চট্টগ্রামে আসিয়া দেখিলাম, সে একজন আদালতের এপ্রেন্টিস মাত্র। বড় কষ্টে জীবন কাটাইতেছে। অতএব আমি মিঃ স্ক্রীনকে বলিয়া, তাহাকে আমার আফিসে একটি অস্থায়ী পদে আনি, এবং তাহার পর এপ্রেন্টিস ভাবে রাখিয়া, সময়ে সময়ে অস্থায়ী পদে নিযুক্ত করিতেছিলাম। সে উক্ত কাগজে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছে যে, প্রাচীন কাব্য যে তাহার কাছে পাঠাইবে, এই কাগজ বিনা মূল্যে এক বৎসর পাইবে। তাহার প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের সাহায্যার্থ সম্পাদক এই বিজ্ঞাপন দিয়াছে। আমি তাহার কিছুই জানিতাম না। শেয়াল এই বিজ্ঞাপন কুকুরকে দিল। কুকুর উহা দাঁতে করিয়া কমিশনরের কাছে উপস্থিত করিল। উহা যে আমার কাগজ, আর প্রমাণ চাই কি? এই বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট। কারণ, আব্দুল করিম আমার লোক, এবং সে কাগজ বিনামূল্যে দিবে বলিয়াছে। আমি কোন্ কমিশনরের আদেশমতে এই দুই এপ্রেন্টিস নিযুক্ত করিয়াছি এবং হিন্দুটি আমার এক আত্মীয়ের জামাতা কি না, তৎক্ষণাৎ কৈফিয়ত তলব হইল। আমি বুঝিলাম, পালা জমাট বাঁধিতেছে। আমি উত্তর দিলাম,—এপ্রেন্টিস নিযুক্ত করা আমার কার্য্য, আমি নিযুক্ত করিয়াছি। এমন কি, মিঃ স্ক্রীন ও মিঃ কলিয়ারের সময়ে কেরানী নির্ব্বাচনের ভারও আমার উপর ছিল। কমিশনর তখনই এই গরিব দুটিকে বরখাস্ত করিলেন এবং শেয়ালের লোক দুটিকে,—বলা বাহুল্য, সয়তানের প্ররোচনায় নিযুক্ত করিলেন।

কিন্তু ইহার জন্য ত আমার ফাঁসি হইতে পারে না। বদলিও হইতে পারে না। বরং গবর্ণমেণ্টে লিখিলে কমিশনরই উপহাসাস্পদ হইবেন। তখন সয়তান আমার উপর সেই মিল্টনের বর্ণিত মহাশেল নিক্ষেপ করিল। আমার বংশধর দুজন হইতে আমার পত্নীর সেই বন্ধকী দলিলের এক নকল লইয়া, সে কমিশনরকে দিয়া বলিল যে, আমি দেশে গবর্ণমেণ্টের 'রুলের' বিরুদ্ধে মহাজনি করিয়াছি। অতএব কেবল বদলি নহে, আমার পদচ্যুতি হওয়া উচিত। এই সকল ষড়্‌যন্ত্র এত গোপনে হইয়াছে যে, আমি তখন তাহার কিছুই জানি না।

লেঃ গবর্ণর কুমিল্লা আসিতেছেন। কমিশনর এই মহাশূল বা বন্ধকী দলিলের নকল বগলে করিয়া কুমিল্লা চলিলেন। ঠিক এই সময়ে বোর্ড, কি গবর্ণমেণ্ট হইতে কি একটা গুরুতর টেলিগ্রাফ আসিল। আমি ছুটিয়া ষ্টেশনে গিয়া দেখি যে, ঘোরতর বৃষ্টির মধ্যে ভিজিয়া সয়তানদাস নানাবিধ ফলের এক প্রকাণ্ড ডালি মাথায় করিয়া, কমিশনরের গাড়ীতে তুলিয়া দিতেছে, এবং দুজনের মধ্যে বড় প্রেমালাপ হইতেছে। সয়তান কালা বলিয়া, কানে হাত দিয়া, তাঁহার মুখের কাছে কান রাখিয়াছে তথাপি কমিশনরের উচ্চ কণ্ঠ বহু দূর হইতে শুনা যাইতেছে। এই অবস্থায় আমাকে দেখিয়া দুজনেরই মুখ চুন হইল। কমিশনর থতমত খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি এই মহাবৃষ্টিতে কেন আসিয়াছেন?" আমি—কে দেখাইয়া বলিলাম,—"ইহার সঙ্গে আপনার কোনও সম্পর্ক নাই, সে আসিয়াছে। আমি আপনার পার্শ-ন্যাল এসিষ্টেণ্ট, আপনার যাত্রার সময়ে আমার কি আসা উচিত নহে?" এই তীব্র মর্ম্মভেদী আঘাতে তিনি অধোমুখে রহিলেন। তখন তাঁহার হাতে টেলিগ্রামটি দিলে, তিনি বলিলেন,—"ইহার কি উত্তর দেওয়া উচিৎ?" আমার মত বলিলাম। তিনি বলিলেন,—'আচ্ছা, সেরূপ উত্তরই দিন।" ট্রেন খুলিল। আমি সয়তানের গলা জড়াইয়া, ষ্টেশনে আসিয়া, দৃঢ়ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"তুই শেষে কি আমার পিছনেও লাগিলি?" সে দুই হাত যোড় করিয়া, তাহার ললাটে দিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিল,—"আমি যদি তোর নামে কিছু বলিয়া থাকি, আমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। আমার কি সাধ্য, তোর নামে লাগাই? তুই ত আমাকে ইহাঁর কাছে পরিচয় করইয়া দিয়াছিলি। তোর উপর তাঁহার যেরূপ 'হাই ওপিনিয়ন' আমারসাধ্য কি, তোর বিরুদ্ধে কিছু বলি?" হা ভগবান্! এমন পাপীকে তোমার পবিত্র সৃষ্টি কলুষিত ও বিষাক্ত করিতে কেন সৃষ্টি কর? এ যে মহাবিষধর ভুজঙ্গ হইতেও ভয়ঙ্কর! যাহা হউক, এই চেষ্টাও নিষ্ফল হইল। বোধ হয় মিঃ বোল্টন বলিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ একটা খোসকা নকল বিশ্বাস করিতে পারেন না। কমিশনর ফিরিয়া আসিলে, সয়তান তাহার বাসার নিকটস্থ এক কালীবাড়ীর বামুনের দ্বারা এই বন্ধকী দলিলের সহি-মোহরি নকল, সাবরেজিষ্ট্রারকে হাত করিয়া, এরূপ গোপনভাবে লইল যে, কেহ কিছু জানিল না। সাবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ও আমার একজন বন্ধু ছিলেন। হায়! বাঙ্গালীর বন্ধুতা! তিনি যদি আমাকে একটুক ইঙ্গিত করিতেন, আমি এক ফুৎকারে সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র উড়াইতে পারিতাম। তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, কমিশনর ও কলেক্টর সয়তানের হাতের পুতুল বলিয়া, তিনি ভয়ে বলেন নাই। কমিশনর এই নকল ঘর হইতে গোপনে রেজিষ্টারি করিয়া মিঃ বোল্টনের কাছে পাঠাইলেন এবং কাঁদাকাটা করিয়া আমার বদলির জন্য লিখিলেন। মিঃ বোল্টন আমাকে যে চট্টগ্রাম হইতে বদলি করিবেন না, এখন হইতে পেন্‌সন্ লইতে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া চট্টগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া আমাকে ময়মনসিংহ বদলি করিলেন। এই নারকীয় ষড়্‌যন্ত্রের আগাগোড়া আমি কিছুই টের পাই নাই। আমি আযৌবন যে পাহাড়ের বাড়ীর স্বপ্ন দেখিতাম, তাহার সফলতার আনন্দে বিহ্বল হইয়া, পিতা পুত্র পত্নী পাহাড় ও বাড়ী সাজাইতেছিলাম। আর এমন সময়ে নির্ম্মল আকাশ হইতে বজ্রের মত এই বদলি মস্তকে পড়িল। আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।

ইহাতেও পাপিষ্ঠদের তৃপ্তি হইল না। দেশে যেরূপ ঘোরতর হাহাকার উঠিল, এবং আমি যেরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তাহাদের ভয় হইল—আমি কখনও চুপ করিয়া থাকিব না। তাহাদের কুকীর্ত্তি ও এই ষড়্‌যন্ত্র সম্বন্ধে আগুন জ্বালাইব। তখন তাহাদের পরামর্শ হইল যে, আমাকে একেবারে ধ্বংস করিতে হইবে, ফাঁসিকাষ্ঠে চড়াইতে হইবে। বদলি গেজেট হইবার দুই একদিন পরে আমি প্রথম বার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের পদ হইতে

রাজদ্রোহিতার অভিযোগে বদলি হইয়াছিলাম কি না, কমিশনর কৈফিয়ৎ চাহিলেন। বুঝিলাম, এবার উদ্দেশ্য ফাঁসি। আমি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিলে, শেয়াল চক্রবর্ত্তী আসিয়া বলিল,—"করেন কি? এমন ঠাস্যা জবাব দিলে কমিশনর আরও চট্‌বো। একটুক রকম-সকম কর্‌য়া উত্তর লেখ্যা দেন।" সে এখন আমার প্রতি সহানুভূতিতে গলিয়া যাইতেছে! আমার বোধ হইল, এই 'রাজদ্রোহিতা' সম্বন্ধে সেও সাক্ষ্য দিয়াছে। সেই সময়ে সে কমিশনরের আফিসের কেরানি ছিল। তাহার ভয়, পাছে আমার এই 'ঠাস্যা' উত্তরে কমিশনর তাহাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিয়া, তাহার ঘাড়ে পড়েন। সে আমার কয়েক জন বন্ধুকে ডাকিয়া আনিল। তাঁহারা উহা একটুক মোলায়েম করিয়া দিলেন। বোধ হয়, এ সম্বন্ধে আর এক রিপোর্ট আমার ধ্বংসের জন্য গবর্ণমেণ্টে গিয়াছিল। সে কথা পরে বলিব।

যাহা হউক, দলে দলে দেশের লোক ঘরে ও আপিসে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন,—"নরাধম আপনার সহপাঠী বন্ধু বলিয়া, আপনি এত দিন তাহার সাহায্য করিয়া, তাহাকে কত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এবার সে আপনার গায়ে পর্য্যন্ত যখন হাত দিয়াছে, তখন দেশের সকলের মনে আশা হইয়াছে, এবার এই দেশ-শত্রু নিপাত হইবে।" আমি বলিলাম,—যখন দেশ-শত্রু বলিয়া আমি তাহার কিছু করি নাই, এখন সে আমার নিজ-শত্রু বলিয়া আমার কিছু করা উচিত নহে। আমি কিছুই বলিব না। ভগবান্ তাহার পাপের দণ্ড বিধান করিবেন।

বিজয়ার বাজনা আবার বাজিল। আমি আত্মীয়দের কাছে বিদায় লইতে গেলাম। আমার এক বৃদ্ধা পিসী পূজায় বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। কোসা হইতে জল লইয়া বলিলেন,—"আমার বাছার যে এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার শ্রীনাশ হউক!" সাধ্বীর এই অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। আমার দাদা অখিলবাবুর কাছেও বিদায় হইয়া আসিলাম। কিন্তু ময়মনসিংহ রওনা হইবার দিন প্রাতে তিনি আর একবার আমাকে দেখিতে চাহেন বলিয়া বড় কাতরভাবে সংবাদ পাঠাইলেন। আমি অপরাহ্ণে গেলাম। তিনি পাঁচ বৎসর যাবৎ দুরন্ত যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন। রোগের শেষ অবস্থা। জ্বরে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছেন। তিনি আমাকে যদিও সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ ঈর্ষা করিতেন, কিন্তু আশৈশব আমাকে বড় স্নেহ করিতেন। তাঁহার অস্থায়ী বিরাগ সত্ত্বেও আমি তাঁহাকে সমানভাবে পিতৃবৎ ভক্তি ও বন্ধুবৎ স্নেহ করিতাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,—"নবীন! তুমি আর আমাকে দেখিবে না। তুমি একবার আমার বুকে আইস।" আমার সেই বিদায়কালের মনের অবস্থা। আমি কাঁদিয়া তাঁহার পা দুখানি বুকে লইলাম। তিনি বলিলেন,—"না। তুমি একবার আমার বুকে আইস। তাহা হইলে আমার বুক জুড়াইবে।" তাঁহার পত্নী ও সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। তাঁহারাও আমাকে তাঁহার বুকে যাইতে জিদ করিলেন। তিনি তাঁহার বুকের পিরান ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমিও তাহা দেখিয়া, আমার পিরান ছিঁড়িয়া, আত্মহারা ভাবে তাঁহার বুকে পড়িলাম। দুজনে কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"তুমি আমার প্রকৃত ভাই। তুমি এক জীবন আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছ, এমন আর কেহ করে নাই। এত দিনে আমার বুক জুড়াইল। তুমি আমার বংশের গৌরব, আমার দেশের গৌরব। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সুখে থাক। আমি আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া বলিলাম,—"দাদা! এ যে আপনার প্রশংসা আপনি করিতেছেন। আমি আপনারই সৃষ্টি। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী হইতে আপনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেছেন। আপনার কাছে পত্র লিখিয়া আমি ইংরাজি লিখিতে শিখি। আপনি আমার

এ জীবনের আশ্রয় ছিলেন। বিপদে আপদে সকল সময়ে আপনার দিকে চাহিয়াছি। আমার সকল বিপদ্ আপনার স্নেহ-স্মৃতিতে জড়িত। আপনার এখনও দুই সহোদর আছে। আমার তুলনায় তাহারা দেবতা। যদি ঈশ্বরের এরূপ ইচ্ছা হয় যে. আপনি আমাদের অঙ্কচ্যুত করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে আপনি আপনার ভাই দুজনকে বুকে লইয়া. সমস্ত সংসার-চিন্তা ত্যাগ করিয়া, শ্রীভগবানের নাম করিতে করিতে মনের শান্তিতে চলিয়া যান।" রোগ-যন্ত্রণায় আপনার ভাইদের প্রতি—এমন কি, আপনার স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও তাঁহার বিরাগ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন,—"না, তুমি দেবতা। তোমার দেব-হৃদয় তাহারা কোথায় পাইবে। আজ তোমাকে বুকে লইয়া আমার বুক পবিত্র হইল।" এরূপে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া, আমার মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া. কত স্নেহের কথাই বলিলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি আর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া. উঠিয়া বারাণ্ডায় গিয়া খুব কাঁদিলাম। শেষে চোক মুখ মুছিয়া, আবার গৃহে আসিয়া বিদায় চাহিলে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে শালের নূতন চোগাটা আনিতে বলিলেন। কেন, আমি বুঝিলাম না। বৌঠাকুরাণী সেই নূতন চোগাটা না আনিয়া, একটা পুরাতন চোগা আনিলেন। তখন তিনি চীৎকার করিয়া তাঁহাকে গালি দিয়া, উহা ফেলিয়া দিয়া. আবার ঐ নূতন চোগাটি আনিতে বলিলেন। উহা আনিলে আমাকে বলিলেন,—"তুমি আমার এই চোগাটা আমার চিহ্নস্বরূপ রাখিবে। চোগাটা গায়ে দেও. আমি একবার দেখি। উহা গায়ে দিয়া আমাকে আর একবার বুকে লও।" আমি উহা গায়ে দিয়া. উচ্চরবে কাঁদিয়া. আবার পাগলের মত তাঁহার বুকে পড়িলাম। এবার তাঁহার. কি আমার. কাহারও মুখে কথা সরিল না। হৃদয়ের এই পবিত্র ভাবের ভাষা নাই। তাহার পর আমি তাঁহার পা দুখানি অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া, চিরজীবনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। আমি ময়মনসিংহ পঁহুছিবা মাত্রই তিনি চট্টগ্রাম নিষ্প্রদীপ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থান আজ পর্য্যন্ত কেহ পূরণ করিতে পারে নাই। পরে পারিবে, সে আশাও বড় নাই। তিনি ত্রিশ বৎসর কলিকাতা হাইকোর্টের একজন নামকরা দ্বিতীয় শ্রেণীর উকিল ছিলেন। ত্রিশ বৎসর কলিকাতায় অকাতরে দেশবাসীর অন্ন যোগাইয়াছেন। দাদা! তুমি এ জীবনে কোনও পাপ কর নাই। তুমি নিশ্চয় আজ কোনও শ্রেষ্ঠ লোকে আছ। তুমি সেখান হইতে আশীর্ব্বাদ কর. যেন এই বংশ নিষ্প্রদীপ না হয় এবং তোমার পুত্রটিকে সুমতি দেও!

সেই সন্ধ্যার ট্রেনে ময়মনসিংহ চলিলাম। ষ্টেশন ও তাহার প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ। কেবল আত্মীয় বন্ধু নহে. দু একটি অনাত্মীয় বন্ধুও বোধ হয়, আমার বিদায়-দৃশ্য দেখিয়া, হিংসা-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য আসিয়াছিলেন। আসে নাই কেবল সেই সয়তানদাস। তীর্থস্থানে যেরূপ যাত্রীদের ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভক্তিহীন পাষাণও দ্রব হয়, এখানেও শত শত লোকের সস্নেহ শোকের উচ্ছ্বাসে এই পাপিষ্ঠদেরও যেন হৃদয় স্পর্শ করিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন আর অনুশোচনা চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন.—"আপনার না কি সন্দেহ হইয়াছে. আমিও এই বদলির ষড়্‌যন্ত্রে ছিলাম। আমি সে জন্য ষ্টেশনে আপনার হৃদয় হইতে এই সন্দেহ দূর করিতে আসিয়াছি। আমি আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি।" আমি বলিলাম,—"এই ঘৃণিত ষড়্‌যন্ত্র হিংস্র পশুর কার্য্য. মানুষের কার্য্য হইতে পারে না। আপনি এই ঘোরতর পাপে লিপ্ত ছিলেন না. শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম।" তিনি তখন বলিলেন.—"আপনাকে হিংসা করিয়া. কে কি করিবে? আপনি এখানে যে রাজত্ব করিতেছিলেন. ময়মনসিংহে গিয়াও সেই রাজত্ব করিবেন। ক্ষতি যাহা হইল, এ দেশের। এ জন্য সমস্ত দেশে একটা হাহাকার উঠিয়াছে। সকলে আশা করিয়াছিল যে. আপনি এখানে শেষ জীবন কাটাইবেন. এবং দেশের কত উপকার করিবেন।" আমি বলিলাম,—"আমিও সেই আশায় কলিকাতার সেই গৌরব ও সুখ ছাড়িয়া এই হিংসার নরকে

আসিয়াছিলাম। কিন্তু শ্রীভগবানের তাহা ইচ্ছা নহে। আর দেশের ক্ষতিই বা কি? আপনারা পাঁচ জনে আছেন। আপনারা দেশের সকল প্রকার হিতসাধন করিবেন।" তিনি তাহার উপরও বলিলেন,—"দেশে আর মানুষ কে আছে? আপনার হৃদয়, আপনার ক্ষমতাই বা আর কার আছে?" ট্রেনের সময় হইয়া আসিল। সমবেত সকলের কাছে একে একে বিদায় হইলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলাম, এক বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিয়া, সয়তানদের পরিতৃপ্ত করিব না। পুত্রকেও সেরূপ শিক্ষা দিয়া আনিয়াছিলাম। ময়মনসিংহে কলেজ নাই বলিয়া, স্ত্রী পুত্র রাখিয়া, আমি একা যাইতেছি। আমার ত্রিশ বৎসর চাকরিতে তাহা আর কখনও হয় নাই। শিবিরে পর্য্যন্ত তাহারা আমার সঙ্গে থাকিত। পিতাপুত্রে আর বিচ্ছেদ হয় নাই। নির্ম্মল আমার বড় নিরীহ শিশু। আমি তাহার পিতা, আমি তাহার বন্ধু, আমি তাহার খেলার সঙ্গী। তাহার জন্মাবধি পিতাপুত্রে সঙ্গে খাই, সঙ্গে খেলি, সঙ্গে বেড়াই, সঙ্গে গান করি, সঙ্গে শয়ন করি। তাহার মুখ দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তথাপি আমি হাসিতে হাসিতে সকলের কাছে বিদায় লইয়া যেই গাড়ীতে উঠিলাম, পুত্র তখন আর তাহার শিশু-হৃদয়কে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। আমাকে নমস্কার করিলে আমি যখন মুখ-চুম্বন করিয়া তাহাকে বুকে লইলাম, সে আমার বুকে কাতরভাবে মুখ রাখিয়া, অঝোর কাঁদিতে লাগিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"বাবা! আমরা ত কখনও কাহারও কোনও অনিষ্ট করি নাই। শ্রীভগবান তবে কেন আমাদের এরূপ কষ্ট দিলেন। আমি তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?" তখন আমি আর আমার হৃদয়ের ঝটিকা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া, যেন দর দর ধারায় অশ্রু বহিয়া, শিশুর মস্তকে পড়িতে লাগিল। সে সময়ে বুঝি, সমবেত বন্ধু অবন্ধু কাহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না। পরে এক জন বন্ধু আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, পিতাপুত্রের বিদায়-দৃশ্যে ষ্টেশনের কাঠখানি পর্য্যন্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। নির্ম্মল প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমার সঙ্গে সংকীর্ত্তন করে। আমার 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', তাহার চরিত্র, তাহার হৃদয় গঠিত করিয়াছে। শ্রীভগবানে তাহার দৃঢ় ভক্তি। আমি তাহাকে গলদশ্রুনয়নে বুঝাইলাম,—"ছি বাবা! এই না তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, এক বিন্দু অশ্রু ফেলিয়া হিংস্রকদের হাসাইবে না! তুমি শ্রীভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস হারাইও না। তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার কার্য্য আমরা কি বুঝিব? তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য, আমাদের এই ভুজঙ্গদের বিষদন্ত হইতে সরাইতেছেন। আমরা সত্যই এ জীবনে কাহারও অনিষ্ট করি নাই। আপনার বুকের রক্ত দিয়া যথাসাধ্য পরের উপকার করিয়াছি। অতএব তিনি অবশ্য আমাদের মঙ্গল করিবেন। আবার তিনি আমাদের পিতাপুত্রকে একত্র করিয়া পরম সুখে রাখিবেন। তুমিও তোমার শিশু হৃদয়ে পাপিষ্ঠদের ক্ষমা করিয়া, তাঁহার কাছে কেবল প্রার্থনা কর।" শ্রীভগবান্ পিতা-পুত্রের এই করুণ ভিক্ষা শুনিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আন্তরিকতাপূর্ণ প্রার্থনা শুনিয়া থাকেন। জানি না, সয়তান ও তাহার বাহন কমিশনর কোন্ নরকে গিয়াছে। তাঁহার কৃপায় আজ আমরা পিতাপুত্র গৌরবে ও সুখে আছি, এবং এই সুদূর ব্রহ্মদেশে তাঁহার বুদ্ধ অবতারের জগদ্বিখ্যাত সুবর্ণ-মন্দিরের ছায়ায় বসিয়া, আমি সেই গভীর দুঃখের আখ্যায়িকা লিখিতেছি।

ট্রেন খুলিল, আর আমার জীবনের একটি প্রধান সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। আমার সুখের বাজার ভগ্ন হইল। আমার জীবনের একটি আনন্দ অধ্যায় শেষ হইল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারির শেষে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলাম। আর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়া, চট্টেশ্বরী-বিগ্রহকে পিতাপুত্রে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলাম,—"হায় মা! ত্রিশ বৎসর বিদেশে ঘুরিয়া, তোমার মন্দিরের ছায়ায় অবশিষ্ট জীবন শান্তিতে কাটাইতে প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তুমি মা! সে প্রার্থনা শুনিলে না।

তোমার চরণে স্থান দিলে না মা! তুমি অসুরনাশিনী! আর একটি ঘৃণিত অসুর কি মা! আমার অকারণ এই সর্ব্বনাশ সাধন করিল দয়াময়ি! তথাপি তুমি দয়া করিও। যেখানে থাকি, তোমারই দয়ার রাজ্য। তোমার দয়া হইতে যেন বঞ্চিত না হই। তুমি কালী। মনে করিয়াছিলাম, তোমার পার্শ্বে কালার 'নবীন কিশোর' মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, সমস্ত পর্ব্বত ব্যাপিয়া, ফলপুষ্পে উপবন রোপণ করিয়া, একটি প্রকৃত আশ্রম সৃষ্টি করিব, এবং অন্ধ ধর্ম্মদ্বেষীদিগকে দেখাইব—কালা কালী অভিন্ন। সীতাকুণ্ড ও আদিনাথ তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসিগণ সেই সকল বৃক্ষছায়ায় বসিয়া নানাবিধ ধর্ম্মালাপ করিবে ও ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিবে। সমস্ত পশ্চিম ও উত্তর-ভারত ভ্রমণ করিয়া, একটি আশ্রমও দেখিতে না পাইয়া, সংকল্প করিয়াছিলাম, 'রৈবতকে'র আশ্রমকল্পনা এরূপে কার্য্যে পরিণত করিব। হায় মা! মনের সংকল্প মনে রহিয়া গেল। সর্ব্বার্থসাধিকে! এই পুণ্য সঙ্কল্প পুত্রের দ্বারা হইলেও সফল করিও।" ট্রেন চলিল। ট্রেনের গবাক্ষ হইতে কৌমুদীপ্রদীপ্তা পার্ব্বতী জন্মভূমির চলৎশোভা দেখিয়া হৃদয় উদ্বেলিত হইল। বলিলাম,—"হায় মা! চন্দ্রকরোজ্জ্বলা শ্যামা! তোমার কত কার্য্য করিব বলিয়াই মা! কলিকাতার সেই গৌরব, সেই সুখ, সেই উন্নতির আশা ভাগীরথীগর্ভে বিসর্জ্জন করিয়া, তোমার অঙ্কে আসিয়াছিলাম! আজ মা! সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, এবং আত্মভবিষ্যৎ-জীবন ভস্মীভূত করিয়া চলিলাম! তাহাতেও মা! দুঃখ ছিল না, যদি তোমার যে যে কার্য্য করিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সমস্ত সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারিতাম। কিন্তু মা! এই অযোগ্য পুত্রের দ্বারা বুঝি তাহা হইবে না। সে জন্য বুঝি তাহাকে স্থান দিলে না। এই দ্বিতীয় বার মা! সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বিদীর্ণহৃদয়ে চলিলাম।" বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গৃহসজ্জা, গাড়ী, ঘোড়া কলিকাতা হইতে আনিয়াছিলাম। তাহা এ দেশে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই। বহু অর্থ ব্যয়ে উদ্যানাদি রোপণ করিয়াছিলাম। তাহার ফল পর্য্যন্ত দেখিলাম না। স্ত্রী অশ্রুপূর্ণ নয়নে লিখিয়াছিলেন যে, এমন গোলাপ কিছু দিন পরে ফুটিয়াছিল যে, চট্টগ্রামে কেহ কখনও দেখে নাই। এই উদ্যান, উপবন দুদিন পরে ধ্বংস হইবে। অন্য দিকে কমিশনর আমার প্রতি যে সকল শাণিতাস্ত্র ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহাতে আমার অবশিষ্ট সার্ভিস যে ভস্মীভূত করিবে, তাহা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলাম। মানুষে মানুষের অকারণে এরূপ সর্ব্বনাশ করিতে পারে, আগে বিশ্বাস করি নাই। বলিয়াছি, যদি এরূপ আত্মবলিদান দিয়া জন্মভূমি সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলিন করিয়া যাইতে পারিতাম, তথাপি দুঃখিত হইতাম না। মনে করিয়াছিলাম, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে প্রবেশ করিয়া, চট্টগ্রাম নগরের ও ডিষ্ট্রিক্টের রূপান্তর ঘটাইব। বিদেশের জন্য এত করিয়া আসিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এই পরিণত বয়সে, পরিণত কার্য্য-কৌশলতায় ও পরিণত রুচির দ্বারা জন্মস্থানটির কতই উন্নতিসাধন করিব! পূর্ব্বেবার অস্থায়ী পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট থাকিতে যে সকল কার্য্যের জন্য কমিশনর ওল্ডহ্যাম ও কলেক্টর কার্লাইলকে দীর্ঘ নোট লিখিয়া দিয়াছিলাম, সমস্তই কার্য্যে পরিণত করিব। কিন্তু কিছুই পারিলাম না। এই অল্প সময়ের মধ্যে পারিবই বা কি প্রকারে? চট্টগ্রাম শহরে ঝর্ণার জলের ব্যবস্থা, বক্সির হাটে ভাসমান জেটি-সেতু, সদরঘাট হইতে বক্সির হাট পর্য্যন্ত নদীতীরস্থ ষ্ট্রাণ্ড রোড, চট্টগ্রামের উত্তরাংশে শৈল উপত্যকা ও অধিত্যকা লইয়া উদ্যান বা পার্ক, দেওয়ানি আদালত উত্তর দিকে সরাইয়া, শহরের উত্তরাংশকে পুনর্জীবিত করা, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী স্থাপন, চট্টগ্রাম-স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদের বাৎসরিক সম্মিলন দ্বারা পরস্পর বিদ্বেষ নিবারণ, ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্রদের চিত্র বর্ত্তমান ছাত্রের উৎসাহের জন্য কলেজ-প্রাচীরে স্থাপন, উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তস্থ ফটিকছড়ি ও সাতকানিয়া খাস তহশিল সবডিভিসনে পরিণত করা, স্থানে স্থানে রাস্তা প্রস্তুত করিয়া ও খাল কাটিয়া দেশের স্থলপথের ও জলপথের সুবিধা করা, জলপথে ডিষ্ট্রিক্টব্যাপী ষ্টীমার পরিচালন,

আকিয়াব এবং তাহার পর রেঙ্গুন পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ, সর্ব্বশেষ টাউন হল ও পুস্তকালয়, সকলই পড়িয়া রহিল। জানি না, আত্মদ্রোহী চট্টগ্রামের শিক্ষিত সন্তানেরা কখনও এই সকল হিতকর কার্য্যে হস্ত দিবে কি না। সে ত দূরের কথা, 'টাউন হল' এবং পুস্তকালয়টিও যে হইল না, এই দুঃখ কোথায় রাখিব? আমি চলিয়া আসিবার পর দুই বৎসর যাবৎ পুস্তকালয়ের ছয় হাজার এবং সেই সওদাগর-দত্ত অবশিষ্ট এক হাজার টাকা চট্টগ্রাম-ট্রেজারিতে পড়িয়া রহিল। কেহ আর এই কাজে হাত দিল না। শেষে দাতারা আমার অনুমতি লইয়া, সেই টাকা ফেরত লইলেন। চট্টগ্রামের শিক্ষিতমণ্ডলীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? জ্যোৎস্নালোকে চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতমালার স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা দেখিতে দেখিতে, এবং এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। ফেনী নদী পার হইলে জননী জন্মভূমি অদৃশ্য হইলেন। ফেনী ষ্টেশনে এই গভীর রাত্রিতেও তাহাদের ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসনাল আফিসারকে দেখিতে বহু লোকের সমারোহ হইয়াছে। ফেনীর বর্ত্তমান সবডিভিসনাল অফিসার আমার অনুগামী ও ভক্ত। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন। 'সিদ্ধবিদ্যা'র ধ্বংসাবশেষ ইনি রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোডের উভয় পার্শ্বের গর্ত্তগুলি কাটাইয়া, দুই গঙ্গা-যমুনা খাল সৃজন করিয়া, উক্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ ফেনীবাসীর ও বাজারের অত্যন্ত অসুবিধা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া, আমি এই দুই খাল বন্ধ করিতে কমিশনর আফিস হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এবং একরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ও কিছু পরে তাঁহার বদলিতে ফেনীবাসীর এই দুর্গতি স্থায়ী হইয়াছে। ফেনী ছাড়িয়া অবসন্ন হৃদয়ে নিদ্রার বিস্মৃতি-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া, এই বিদায়ের দুঃখ ভুলিলাম। আমার জীবনের শেষ স্বপ্ন ফুরাইল। দুঃখ নাই--

"ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর।
বহিয়াছি এ জীবন আশার ও নিরাশার।"

ময়মনসিংহ

প্রভাতে চাঁদপুরে পঁহুছিলাম। এখানে অখিলবাবুর তৃতীয় সহোদর ও আমার পরম প্রেমাস্পদ ভাই শ্রীমান্ তারাচরণ সেন সর্ব্বজনপ্রিয় মুন্সেফ। তাহার অতুলনীয় স্নেহ-স্বর্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া, অপরাহ্ণে ঢাকা রওনা হইলাম, এবং সন্ধ্যার সময়ে নারায়ণগঞ্জ পঁহুছিলাম। সেখানে কেমন করিয়া ইতিমধ্যে 'পলাশির যুদ্ধে'র ভেরী বাজিয়াছে। ষ্টীমার পর্য্যন্ত অনেক লোক আমাকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ বেড়াইলাম। উহা ইতিমধ্যে বাণিজ্যের কল্যাণে একটি সুন্দর স্থান হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সন্ধ্যালোকে একটি চিত্রের মত দেখা যাইতেছিল। সন্ধ্যার পর ঢাকায় পঁহুছিলাম, এবং সুহৃদ্‌বর রায় বাহাদুর অভয় মিত্রের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। পরদিন ঢাকা বেড়াইলাম। যে ঢাকা, এখনও সেই ঢাকাই আছে; তাহার সৌন্দর্য্য এখনও খোলে নাই। এবার লাট কার্জ্জনের নূতন খেয়ালে পূর্ব্বপ্রদেশের রাজধানী হইয়া যদি খোলে। পূর্ব্বদর্শনের পর বেশী কিছু পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। পার্শ্যন্যাল এসিস্টেণ্ট বরদাবাবু ও ঢাকার স্বনামখ্যাত ব্যাঙ্কার ও ভূম্যধিকারী শ্রীশবাবুর স্নেহে একটা দিন বড় সুখে কাটাইলাম। রাত্রিতে শ্রীশবাবুর বৈঠকখানায় রায় অভয় মিত্র বহু অর্থব্যয় করিয়া এক সান্ধ্য-সম্মিলনী ও ভোজ দিলেন। তাহাতে ঢাকার উকিলতিলক আনন্দচন্দ্র রায় আমার 'স্বাস্থ্যপানার্থ' ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। আমি উত্তরে বলিলাম যে, যদিও তিনি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল, তথাপি তাঁহার দুইটি বৃত্তান্তঘটিত ভুল হইয়াছে। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম, প্রথম ভুল—বাঙ্গালা কবির অভ্যর্থনায় ইংরাজি বক্তৃতা। দ্বিতীয়

ভুল—তিনি বলিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গবাসী আমাদের চিরকাল ঘৃণা করে। কিন্তু এখন তাহারা দেখুক, পূর্ব্ববঙ্গে কেমন 'কবি' পয়দা হইয়াছে। আমি বলিলাম,—এই 'ন্যাশন্যাল কংগ্রেসে'র দিনে যখন এত নদ-নদী-গিরিমালাবিভক্ত ভারত এক হইয়া যাইতেছে, তখন ক্ষুদ্র বাঙ্গালা দেশটাকে পদ্মার দ্বারা দুই ভাগ করা আর এক বৃত্তান্তঘটিত ভুল। আর এরূপে ভাগ করিলে পূর্ব্ববঙ্গ বক্তার মত পুত্র-রত্নের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইবেন। কারণ, তাঁহার ভদ্রাসন বাটীও এখন পদ্মার দক্ষিণ তীরে। তখন সকলেই খুব হাসিলেন। সকলকে দেখিলাম ; কিন্তু ঢাকায় দ্বিতীয় বার আসিয়া দেখিলাম না দাদা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে। তিনি জয়দেবপুর থাকিয়াও ঢাকায় আমার এই দ্বিতীয় অভ্যর্থনায় আসিলেন না ; বরং জয়দেবপুর ময়মনসিংহের পথে রেলের উপর বলিয়া, আমাকে এক ট্রেন খোয়াইয়া, তাঁহার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমার সময় ছিল না। তাহা ছাড়া তিনি তখন জয়দেবপুর রাজ্যের ম্যানেজার বা রাজা। ময়মনসিংহে জয়দেবপুরের বিস্তৃত জমিদারী আছে। এ জন্য সকলে আমাকে জয়দেবপুর যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং সেখানে যাইবার নিমন্ত্রণ একটা কূট অভিসন্ধি বলিয়া বুঝাইলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে এক উদ্যান-ভোজে উদর পূর্ণ করিয়া, এবং ঢাকার নাটকাভিনয়ের নমুনা দেখিয়া ময়মনসিংহ রওনা হইলাম। শ্রীশবাবুরা আমার ট্রেন মিস্ করাইয়া, সেই রাত্রিটা রাখিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখন সকল সস্নেহ অনুরোধ কাটাইয়া আমি গাড়ীতে উঠিলাম, তখন শ্রীশবাবুর স্মরণ হইল যে, আমার জন্য একটা মাছ তুলিয়া রাখিয়াছেন। এই মঙ্গল-দ্রব্য সঙ্গে লইতে হইবে। এই মৎস্য দিতে আরও বিলম্ব হইল। ট্রেন খুলিতেছে, আমি এই সময়ে ষ্টেশনে পঁহুছিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে লাফাইয়া এক কক্ষে উঠিলাম। সঙ্গী বলিলেন যে, ট্রেন পাঁচ মিনিট লেট হইয়াছে, তাহা না হইলে ট্রেন পাইতাম না। শ্রীশবাবুরা এরূপে গণনা করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন, এবং আমার ফিরিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষায় 'বাগানে' দাঁড়াইয়া পথের পানে চাহিয়া আছেন। আমি এই দিনেকের পরিচিতের প্রতি এরূপ নিঃস্বার্থ স্নেহের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য এই ঘটনাটি সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করিলাম। আমার বালসুহৃদ পাগলা ষষ্ঠীর এক কবিতা ছিল—

"I am hungry for my food,
As monkeys from Bhawal wood"

দাদা কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের রাজ্য এই সেই 'ভাওল বনে'র শারদীয় চন্দ্রকরস্নাত নৈশ শোভা দেখিয়া, পরদিন প্রাতে ময়মনসিংহ পঁহুছিলাম। সেই ঊষাসময়েও রেলওয়ে ষ্টেশনে বহু ভদ্রলোক আমার অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে খুব সাদর সম্ভাষণ করিলেন, এবং বলিলেন যে, আমি যে এই ট্রেনে আসিতেছি, তাহার সংবাদ রাত্রিতে আমার টেলিগ্রাম ময়মনসিংহে আসাতে, সকলে জানিতে পারেন নাই। অন্যথা ষ্টেশনে লোক ধরিত না এবং তাঁহারা আমাকে যথাশাস্ত্র একটা অভিনন্দন ও অভ্যর্থনা প্রদান করিতেন।

ময়মনসিংহে আমার স্বদেশীয় একজন সহপাঠী কলেক্টরের সেরেস্তাদার ছিলেন। আমার জন্য একখানি বাড়ী স্থির করিয়া রাখিতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বাজারের কেন্দ্রস্থলে একখানি গুদামে লইয়া দাখিল করিলেন। তাহার দুই পার্শ্বের কক্ষে দুই দোকান। মধ্যের দুই তিনটা কামরা আমার ভবিষ্য নিকেতন! আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ডেপুটিদের ময়মনসিংহে একটা মহল্লা ছিল। তাহাতে কয়েকখানি এইরূপ ইষ্টকনির্ম্মিত দৌলতখানা ছিল। তাহা সকলই পূর্ব্ববৎসরের ভীষণ ভূমিকম্পে ধরাশায়ী হইয়াছে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে পূর্ব্ব-উত্তর বঙ্গে ও আসামে যে খণ্ড প্রলয় উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা এখন ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। যখন এই ভূমিকম্পে মহারাজা সূর্য্যকান্তের ছয় লক্ষ টাকায় নির্ম্মিত নব রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করিয়াছে, তখন

ডেপ্‌ুটিদের দৌলতখানার কথাই বা কি? শ্‌ুনিলাম, উক্ত প্রাসাদে ইটালি ও ফ্রান্স হইতে আনীত এক এক চিত্র ও দর্পণ দশ পনর হাজার টাকার ছিল। সমস্ত গ্‌ৃহসজ্জাই এইর্‌ূপ ছিল। তিনি যখন তাঁহার ম্যানেজারের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন যে, ভ্‌ূমিকম্পে তাঁহার রাজপ্রাসাদ ধ্বংস হইয়াছে, তখন তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ম্যানেজারের টেলিগ্রামের অর্থ কি? সে আবার সেই কথা টেলিগ্রাফ করিলে, তিনি আবার টেলিগ্রাফ করিলেন,—"আমার বহ্‌ুম্‌ূল্য গ্‌ৃহ-সজ্জাগ্‌ুলিন রক্ষা পাইয়াছে ত?" তাহার উত্তরে শ্‌ুনিলেন যে, একটি তৃণও রক্ষা পায় নাই। আমি এই বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নস্ত্‌ূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। এক ম্‌ুহ্‌ূর্ত্তে যে এইর্‌ূপ একটা ধ্বংসকার্য্য সাধিত হইতে পারে, আমার দেখিয়াও বিশ্বাস হইল না। মহারাজা কেমন করিয়া শ্‌ুনিয়া বিশ্বাস করিবেন। কেবল ভগ্ন ইষ্টক ও কাষ্ঠের স্ত্‌ূপ, এবং সম্ম্‌ুখস্থ ও প্রাঙ্গণের কোণস্থ উদ্যান-তালের স্তবকগ্‌ুলিন মাত্র প্‌ূর্ব্ব-অট্টালিকার নিদর্শন স্বর্‌ূপ আছে। যাহা হউক, এখন এইর্‌ূপ দ্‌ুই দোকানের জাঁতার মধ্যে কেমন করিয়া বাস করিব? ময়মনসিংহে ডাক-বাঙ্গলা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সেরেস্তাদার মহাশয় ভ্‌ূমিকম্পের আর এক উপাখ্যান বলিলেন। ভ্‌ূমিকম্পে ডেপ্‌ুটিরা গ্‌ৃহশ্‌ূন্য, কেহ কেহ পরিবারশ্‌ূন্য হইলে, গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া তাঁহাদের জন্য কয়েকটি বাঙ্গলা ঘোড়দৌড়ের মাঠে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। চাটাইয়ের ঘর, কিন্তু কলিকাতার ডেপ্‌ুটিরা তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে কলিকাতার 'প্‌ুরাতন বিধান' মতে দ্বিতল পায়খানা প্রস্তুত করেন। পরবর্ত্তী কলেক্টর তাঁহাদের সাধের ঘোড়দৌড়ের মাঠে দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ক এই সকল ডেপ্‌ুটি-কীর্ত্তি দেখিয়া, সেখান হইতে dirty nigger-দিগকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করেন। সেই অবধি তাঁহারা এইর্‌ূপ দোকানঘর আশ্রয় করিয়া আছেন। সে বাঙ্গলার একটা 'ডাক-বাঙ্গলা'। অবশিষ্ট ঘরের মধ্যে দ্‌ুখানি সাহেবদের ধ্বংসপ্রাপ্ত গির্জ্জা ও তস্য উপকরণে অধিকৃত হইয়াছে এবং বাকী গ্‌ৃহ শ্বেতাঙ্গদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, আপাততঃ সেই ডাক-বাঙ্গলায় নামিব, তাহার পর যাহা হয়, ব্যবস্থা করা যাইবে। সহপাঠী আমাকে শহর ঘ্‌ুরাইয়া সেই ডাক-বাঙ্গলায় উপস্থিত করিলে, আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমার চট্টগ্রামের 'বাঙ্গলা' এক একটি ছবিবিশেষ। এ ত 'বাঙ্গলা' নহে, 'কাঙ্গলা'; 'বাঙ্গলা'র কাঙ্গাল সংস্করণ মাত্র। সেঁতসেঁতে এক পাকা ভিটা, এবং সামান্য চাটাইয়ের বেড়া ও খড়ের ছাউনিয্‌ুক্ত দ্‌ুইটি ক্ষ্‌ুদ্র কক্ষ মাত্র। এইর্‌ূপ সারিবদ্ধ কয়েকখানি কুটীর। তাহার চারি দিকে বর্ষার জল ও কর্দ্দমপ্‌ূর্ণ বিস্তৃত ঘোড়দৌড়ের মাঠ। সম্ম্‌ুখে বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত ম্‌ুক্তাগাছার রাস্তা। গাড়ী হইতে এই রাস্তায় নামিয়া 'ডাক-বাঙ্গলা'য় যাইতে ব্‌ুট প্যাণ্ট কর্দ্দমে রঞ্জিত হইল। ডাক-বাঙ্গলায় স্থান নাস্তি। দ্‌ুই শ্বেতম্‌ূর্ত্তি দ্‌ুই কক্ষে বিরাজ করিতেছেন। তখন সঙ্কটে পড়িয়া দেখিলাম, একটি কুটীর খালি। উহা মোচড় খাইয়া এক দিকে ঈষৎ হেলিয়াছে, যেন শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ময়মনসিংহ নগর মহারাজা স্‌ূর্য্যকান্তের' রাজ্য। তিনি প্রচলিত হিন্দ্‌ুয়ানিতে বীতশ্রদ্ধ। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ আয়ান-ভয়ে যেমন কৃষ্ণ-কালী হইয়াছিলেন, তাঁহার ভয়ে কুটীর এই র্‌ূপ ধারণ করিয়াছে। গ্‌ৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার চট্টগ্রাম-পাহাড়ের গোশালাও ইহার অপেক্ষা ভাল ছিল। বহ্‌ুদিনের সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য মেথর সংগ্রহ করিতে এবং ষ্টেশন হইতে আমার ভৃত্যদিগকে ও জিনিসপত্র আনিতে বন্ধ্‌ু চলিয়া গেলেন। আমি একাকী গ্‌ৃহের এক ময়লা সোপানে আসীন হইয়া যোগাবলম্বন করিলাম। শৈশবে গ্‌ুর্‌ু-মহাশয় ম্‌ুখস্থ করাইয়াছিলেন,—

"বরমসিধারা তর্‌ুতলে বাসঃ বরমপি ঘোরে নরকে মরণং
বরমপি ভিক্ষা, বরং উপবাসঃ। ন চ ধনগর্ব্বিত-বান্ধব-শরণং॥"

আমার পাহাড়ের বাড়ী দেখিয়া লোকে আমাকে বড় সুখী বলিলে আমি বলিতাম, আমাকে আজ সেই গৃহে তাঁহারা যেরূপ সুখী দেখিতেছেন, কাল যদি বৃক্ষতলায় বাস করিতে হয়, তখনও সেরূপ সুখী দেখিবেন। সুখ মানুষের মনে, গৃহে কি গৃহসজ্জায় নহে। শ্রীভগবান্ বুঝি আমার পরীক্ষা লইবার জন্য আজ এরূপ 'তরুতলে বাস' ব্যবস্থা করিলেন। এরূপ ঘরে থাকা আর 'তরুতলে বাস' একই কথা। বরং তরুতল নিরাপদ্। এই 'কাঙ্গলা', একটুক জোরে বাতাস বহিলেই মস্তকের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। অপরাহ্নে দাদার কাছে সেই বিদায়, সন্ধ্যার সময় যাত্রাকালে পরিবার ও আত্মীয়দের পাষাণভেদী করুণ রোদন, ভাইঝি আশা উম্মাদিনীর মত পাহাড় হইতে ছুটিয়া আসিয়া, আমার গাড়ীতে উঠিয়া, আমাকে এরূপ ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া, এমন হৃদয়বিদারী করুণ আর্ত্তনাদ করিতেছিল যে, তাহাকে দুই জনে টানিয়া, আমার কোল হইতে বহু কষ্টে লইয়াছিল। ষ্টেশনে পিতা-পুত্রের বিদায়-দৃশ্য সকলই মনে পড়িতে লাগিল, এবং নীরবে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সর্ব্বশেষ সেই পার্ব্বত্য অট্টালিকা হইতে এই গোশালায় পতন! দুই দিনের মধ্যে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! ভৃত্যেরা আসিল এবং এই নরক পরিষ্কার করিল। কলেক্টর অনেক আপত্তির পর এই 'ডার্টি নিগার'কে দয়া করিয়া বিংশতি মুদ্রায় এই গরুর ঘর ভাড়া দিলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্তের রাজ্যে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দাঁড়াইবার স্থান পাইলাম।

সেই দিনই কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। কোর্ট ত নহে, ঠিক একটা পূজার দালান। এক দিক্ খোলা। অথচ এইটিই ময়মনসিংহের শ্রেষ্ঠ কোর্ট, উহা জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এজলাস। আমি তাঁহারই কার্য্যভার পাইয়াছি। আমার সান্ত্বনার মধ্যে এই যে, এজলাস হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি স্থান ও সুদূরস্থ একটা পর্ব্বতশ্রেণী নীলাকাশে মেঘের মত দেখা যাইতেছে। ভাদ্র মাস ব্রহ্মপুত্রের আকুলপূরিত সলিল-শোভা এজলাস হইতে দেখিয়া প্রাণে একটুক শান্তি পাইলাম। কোর্টগৃহে ভয়ানক লোকের ভিড়। প্রাঙ্গণে পর্য্যন্ত মাথায় মাথা লাগিয়া গিয়াছে। সমস্ত মোক্তারগণ সভাস্থ। আমি অধোমুখে কি কার্য্য করিতেছি। একজন মোক্তার আর কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া, পেস্কারকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শুনিলাম, এই এজলাসে আজ নবীনবাবু বসিবেন। কই, তিনি কোথায়? এ ছোকরাটাই বা কে?" আমার পেস্কার চুপে চুপে বলিলেন,—"ইনিই নবীনবাবু।" মোক্তারগণ এই কথা শুনিয়া, হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি এই গুপ্ত আলাপ শুনিয়া, ঈষৎ হাসিতেছিলাম। যখন মুখ তুলিলাম, তখন সেই মোক্তারটি বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! আপনিই কি আমাদের কবি নবীনবাবু? 'পলাশির যুদ্ধ' প্রভৃতির কবি?" আমি বলিলাম,—"আমি কবি নহি—সে অমরত্ব আমি কোথায় পাইব? আর আমি আপনাদের কি না, সেই পরিচয়ের সময় উপস্থিত ; তবে 'পলাশির যুদ্ধ' প্রভৃতি কাব্য আমার লেখা বটে।" তিনি অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—ধর্ম্মাবতার! 'পলাশির যুদ্ধ' ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় আমার পাঠ্য ছিল। আমার চুল পাকিয়াছে, এবং বৃদ্ধ হইয়াছি। আমরা মনে করিয়াছি—'পলাশির যুদ্ধে'র কবি এখন প্রাচীন লোক। এই যে এত লোকের ভিড় হইয়াছে, এবং আমরা সমস্ত মোক্তার উপস্থিত হইয়াছি, কেবল আপনাকে দেখিবার জন্য। কিন্তু কেহ এত ক্ষণ বিশ্বাস করে নাই যে, আপনিই সেই নবীনবাবু। আমি পেস্কারবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—এ ছোকরাটি কে?" তখন কোর্টময় একটা হাসি উঠিল। মনে হয়, অমৃত ভায়ার কলুবাবু মধুসূদন বলিয়াছিলেন, —"কি বালাই! যেখানে যাই, সেখানেই জেতের খোঁটা! এবার হইতে মধুসূদন ব্রহ্মানন্দ হইব।" আমিও ভাবিলাম—কি বালাই! যেখানে সেখানে বয়সের খোঁটা। ব্রহ্মানন্দ হইলেও যে এ খোঁটা যায় না। এখন হইতে চুলে গোঁপে পাউডার মাখিব। সমস্ত দিন কাচারিতে দর্শকের গোলযোগে কাজ করিতে পারিতেছিলাম না। আফিস হইতে ফিরিয়া ময়মনসিংহের

সেই উত্তর-গোগৃহে বসিয়া আছি। মহা বৃষ্টি! আরদালী এক কার্ড দিল—'বি. সেন' এবং বলিল, জইণ্ট মাজিস্ট্রেট 'হুজুরের' সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। হুজুর বারাণ্ডায় ছুটিয়া গিয়া দেখে যে, মিঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র সেন কর্দ্দমাক্ত বেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিয়া বলিলাম—"আমি বড় লজ্জিত হইলাম, আপনি এই কাদা ভাঙ্গিয়া আমার সঙ্গে এমন স্থানে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমারই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত ছিল, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে যাইতে পারি নাই।" তিনি বলিলেন,—"তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমার অনেক দিন যাবৎ আপনাকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। মনে করিলাম, এমন সুযোগ আর হইবে না। আমি আজ রাত্রির ট্রেনে চলিয়া যাইতেছি। তাই আপনাকে দেখিতে আসিলাম।" দেখিলাম, মিঃ বি. সেন বড় সুন্দর, সদাশয় ও বিনয়ী লোক। তিনি প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন। তিনি এ গৃহও পান নাই। 'সারকিট হাউসে'র এক কক্ষে বহু কষ্টে সস্ত্রীক ছিলেন। আমাকেও সেখানে থাকিতে বলিলেন। আমি বলিলাম,—'সারকিট হাউসে' একজন কালা ডেপুটিকে থাকিতে দিবে কেন? এই গোশালাটাও অতি কষ্টে কলেক্টর ভাড়া দিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, এ ঘরে আমি কেমন করিয়া থাকিব? আমি বলিলাম,—কি করিব, প্রাক্তন! ময়মনসিংহ শিক্ষিত লোকের স্থান। ইহার উপর প্রায় পনর দিন যাবৎ আমার কোর্ট ও কুটীর দর্শকপূর্ণ থাকিত। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত নব-পরিচয়ের আলাপে ও আমোদে কাটিয়া যাইত। শ্রীভগবান্ আমাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিলেন। আমি তরু-তলায়ও পরম সুখে কাটাইতে লাগিলাম। একদিন নগরভ্রমণ সময়ে একটা ছবির দোকান দেখিলাম। একবার চোখ বুলাইয়া কয়েকখানি ছবি ও কাগজের পাখা ও একটা ল্যাম্প কিনিলাম। ইহাদের দ্বারা সেই গরুর ঘরের কি শোভা হইল জানি না। কিন্তু যিনি আসিতেন, তিনি এই সকল জিনিস কোথায় পাইলাম, জিজ্ঞাসা করিতেন। এবং আমার বদলির সময়ে তাঁহার কাছে বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করাইতেন। একদিন একজন ডেপুটি উপস্থিত। তিনি মহাবিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"মহাশয়! এ সমস্ত জিনিস কি আপনার?" সমস্ত জিনিসের মধ্যে আমার স্বকল্পিত একটা রাইটিঙ্গ টেবল ও রাইটিঙ্গ সোফা। সোফা দিবসে বসিয়া লিখিবার আসন, রাত্রিতে শয্যা। গোল্ড স্মিথের "Cap by night, and a pair of stocking by day"—রাত্রিতে টুপি, দিনে মোজা। একটি আলনা ও কয়েক জোড়া জুতা। অন্য কক্ষে একটা ক্ষুদ্র টেবল, একটা 'ফোল্‌ডিং লাউঞ্জ ও কয়েকটা 'ফোল্‌ডিং চেয়ার।' আমি বলিলাম,—"সমস্ত জিনিস আর কি? এই কয়েকটা সামান্য জিনিস মাত্র সঙ্গে আনিয়াছি।" তিনি আরও বিস্ময়ে বলিলেন,—"এত জিনিস আপনি সঙ্গে আনিয়াছেন? আলনায় এত কাপড়, এত জুতা, একা আপনার? তাহা হইলে বলুন যে, আপনি যাহা পান, তাহাই উড়ান, কিছুই রাখেন না। মহাশয়! আমি কোনও ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের ত এমন বাবুয়ানা দেখি নাই।" আমি কি উত্তর দিব, ভাবিয়া পাইলাম না। দেখিলাম, তিনি এক দোকানের একটি মাত্র কক্ষ ভাড়া করিয়া আছেন। সম্বল এক তক্তাপোষ, তাহা তাঁহার আমলার; আর নিজের এক 'ব্যাগ'। তাঁহার ভৃত্য ও পাচক তাঁহার আরদালী। একদিন আমাদের সার্ভিস gentleman's service বলিয়া আমাদের অহঙ্কার ছিল। কিন্তু আমার অনুসৃত 'প্রতিযোগী পরীক্ষা'র ফলে সার্ভিস এরূপ ডেপুটিতেই পূর্ণ হইতেছিল। উহা উঠিয়া গিয়াছে, বালাই গিয়াছে! যাহা হউক, ময়মনসিংহে আমার দিন বড় আনন্দে কাটিতে লাগিল। এখানে উকিল মোক্তারদের মধ্যেও অনেক সাহিত্যপ্রিয় লোক আছেন। একজন মোক্তার সুন্দর সংস্কৃতজ্ঞ। উকিল সাহিত্যসেবীরা আমার 'অমিতাভ' অভিনয় করিবার জন্য নাটক করিয়া দিতে আমাকে ধরিয়া পড়িলেন। 'অমিতাভে'র এত প্রশংসা আমি আর কোথাও শুনি নাই। এইরূপে কলিকাতার এক নাট্যসমাজ 'রৈবতক'

নাটক করিয়া দিতে অনেক দিন আমাকে সাধিয়াছিলেন। বিশালায়তন ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত ময়মনসিংহ বড় সুন্দর স্থান। এখন বর্ষাশেষে ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত লহরী-বিক্ষোভিত সলিলরাশির শোভা দেখিবার যোগ্য। শহরের প্রধান রাস্তাগুলিন বৃহৎ বিটপীশ্রেণীতে সজ্জিত ও সমস্ত দিন ছায়াসমাচ্ছন্ন। নগরের প্রান্তস্থ ইংরাজমহল একটি বিস্তৃত ময়দানের স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে, এবং এই ময়দান বিভক্ত করিয়া, বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত একটি রাস্তা শ্যাম কণ্ঠহারের মত শোভা পাইতেছে। আমি সমস্ত অপরাহ্ন এই বৃক্ষছায়ায় ও ব্রহ্মপুত্রতীরে বেড়াইতাম। এবং সমস্ত সন্ধ্যা দর্শকদের সঙ্গে সাহিত্যের চর্চা ও নানাবিধ আলাপ, কখনও বা সঙ্গীতে বড় সুখে কাটাইতাম।

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও চট্টগ্রামের হাহাকার-ধ্বনি প্রত্যহ বহু পত্রে আসিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গবাসীরা চট্টগ্রামকে কেবল 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত' নহে, বঙ্গভাষাবর্জ্জিত স্থান বলিয়াও জানেন। অতএব একজন সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের দুখানি পত্র নিম্নে প্রকাশ করিলাম। চট্টগ্রামের একজন সামান্য শিক্ষিত লোক কিরূপ বাঙ্গালা লিখিতে পারে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীহরি

শ্রীকরকমলেষু

আপনার কোমল করাঙ্কিত পত্রখানি পাইয়া এত দিন আপনাকে লিখিব লিখিব বলিয়া লিখিতে পারি নাই। আর লিখিবই বা কি? যেই অন্ধকারে আমরা চিরনিমজ্জিত ছিলাম, আবার সেই অন্ধকারে ডুবিয়া গেলাম। আপনার কানন-কুন্তলা, পর্ব্বতোন্নত পীন-কঠিন-বক্ষা জননীর কি অবস্থা হইয়াছে দেখিতেছেন কি? যেই দুইটি চন্দ্রকে বক্ষে পাইয়া মার মুখ-জ্যোতিঃ সমগ্র ভারতে বিকীর্ণ হইয়াছিল, তার একটি কাল রাহুর করাল কবলে চির-গ্রস্ত এবং দ্বিতীয়টি, মার অতি স্নেহের, অতি আদরের, যে হৃদয়ের ত্রিতন্ত্রী মিলাইয়া মধুরকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিয়া জগতের প্রাণে মাতৃপ্রেম-সুধা ঢালিয়া দেয়,—সেই সুধাকর অলক্ষিতরূপে মাতৃকোল হইতে অপহৃত! সেই অখিল চন্দ্র বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তিনি এই পাপজগতে নাই! এবং নবীনচন্দ্র চট্টলৈকপ্রদীপ, চিরদুঃখিনী মার কোল শূন্য করিয়া বিদেশে! বনবাসিনী চট্টলের এই দুঃখ রাখিবার স্থান আছে কি? এই বিষম শোকসংঘাতে, এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে, মার শোকাশ্রু এত প্রবল হইয়াছিল যে, 'কর্ণফুলী ও শঙ্খ'—জননীর এই দুই চিরপ্রবাহিত অশ্রুধারাতেও শোকবেগ বহন করিতে পারে নাই,—সমগ্র দেশ প্লাবিত হইয়া উচ্ছন্ন যাওয়ার মধ্যে হইয়াছিল। অখিলচন্দ্রের তিরোধান বড় অসময়ে নহে, তার কিনা বড় কষ্ট হইল, এই দুঃখ! এখন বুঝিলাম, চিরদুঃখিনী জননীর সুখ কিছুতেই হইল না, এক একটি করিয়া মহারত্নগুলি অঞ্চল হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। বুঝিলাম, মায়ের বুকের পাষাণ চিরকাল বুকেই চাপা থাকিবে। কংসভীতি* কিছুতেই অপসারিত হওয়ার নহে।

আমি আর এখন সাতকানিয়া নাই। শহরে,—এখন অরণ্যে,—অন্ধকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। শহরে আসিয়া আপনার সেই শূন্য বৃন্দাবনে যাইব যাইব বলিয়া কত বার মনে করিয়াছি, কিন্তু পাছে সেইখানে গেলে আমার হৃদয়াবেগ অসহনীয় হইয়া আমাকে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া দেয়, আমি এই ভয়ে যাইতে সাহস করিতেছি না। কিন্তু বাবা নির্ম্মলকুমারকে ইতিমধ্যে দুই বার দেখিয়া প্রাণ জুড়াইয়াছি।

আপনি এইবার আমার বড় অনিষ্ট করিয়াছেন, আমার মহাব্রত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি 'গোপনে অতি যতনে' যে একটি মূর্ত্তি প্রাণের মধ্যে অতি নিভৃততম প্রকোষ্ঠে

---

* কংস—সেই সয়তানদাস।

স্থাপন করিয়া প্রগল্‌ভিতা বালিকার অতি সোহাগের পুতুলের ন্যায় তিলে শত বার দেখিতাম —(অন্যকে দেখিতে না দিয়া)—অতি ক্ষুদ্র হস্তে তাহার গায়ে প্রাণের ফুল সাজাইয়া দিতাম —আপনি আমার সেই মূর্ত্তি অন্যের কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভয়-ভীতি-আশঙ্কা এবং সঙ্কোচ ইত্যাদি নানাপ্রকার আবর্জ্জনায় আমার প্রাণকে কলুষিত করিয়া দিয়াছেন। যৌবনোন্মুখী বালিকার অনুরাগ যত দিন লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে, তত দিনই বালিকার সুখ, কিন্তু সেই অনুরাগ হৃদয়ান্তরে বিভাসিত হইলে আর সেই সুখ, তেমন সুখ থাকে না। কমলের মুদ্রিত অবস্থার সুখ. প্রস্ফুটিত অবস্থায় থাকে না, কমলকলিকার গুপ্ত অনুরাগ ভ্রমর জানে না, কিন্তু ফুটিয়া গেলে তাহা বিকীর্ণ হইয়া ভ্রমর-প্রাণে ভাগ হইয়া যায়।

একটি শ্রীরামপন্থী পরিবারের মধ্যে একটি লোক কখনও রাম নাম করিত না, সুতরাং সে সাধারণের কাছে নাস্তিক বলিয়া নিন্দনীয় ছিল। একদিন ঘটনাচক্রে নিদ্রাবশে সে গদগদ স্বরে রাম রাম করিয়া উঠিল ; অন্যে জানিতে পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে, তুমি যে আজ রামনাম উচ্চারণ করিলে? তুমি কি কখনও রামনাম করিয়া থাক?" তখন সে আর হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিল,—কি, আমার মুখ হইতে রামনাম নির্গত হইয়াছে? আমি এত দিন যে নাম প্রাণের মধ্যে অতি যত্নে ক্ষুদ্র কৌটা ভরিয়া রাখিয়াছিলাম, যেই রামনামসুধা আমি আমার আত্মারামের সঙ্গে পান করিয়া সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকিতাম, আমার সেই প্রাণারাম নাম কি আমার ক্ষুদ্র কৌটা হইতে সরিয়া গিয়াছে? এই বলিয়া সে রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।—প্রেম গোপনে রাখিতে না পারিলে তাহার আয়তন বাড়িয়া যায়। সুতরাং আর তেমন করিয়া হৃদয়ে ধারণ করা যায় না।

সাতকানিয়ার মুন্সেফ বাবু চারুচন্দ্র মিত্র অতি শান্ত এবং চরিত্রবান্ লোক, বাড়ী বারাসত। আপনার বদলি গেজেট দেখিয়া কথাপ্রসঙ্গে আপনার 'অমিতাভ' সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিলে, আমি তাঁহাকে 'কুরুক্ষেত্র' দেখিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—আমি বীরেশ্বর পাঁড়ের সমালোচনা পড়িয়াছি, কিন্তু মূল গ্রন্থ দেখি নাই। তখন আমি সেই সাতকানিয়ার মত স্থান হইতে অতি আয়াসে একখানা 'কুরুক্ষেত্র' সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিলাম। তিনি তাহা পাঠ করিয়া একদিন স্তম্ভিত ও চিন্তাযুক্ত ছিলেন এবং বলিলেন,—"এই কি তিনি? যাঁহাকে 'নবীন নটবর' রূপে আমি কলিকাতায় দেখিয়াছি, তিনিই কি এই 'কুরুক্ষেত্রে'র প্রণেতা?" তিনি তাঁহার পরিবারের মধ্যে একখানা 'কুরুক্ষেত্র' রক্ষা করিবার জন্য পত্র লিখিয়া দিয়াছেন। অতএব এখন দেখিতেছি, আপনাকে দেখা ভাল নয়, আপনাকে দেখিয়া আমরা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছি। সাতকানিয়ায় আপনার বিয়োগ-বিধুর প্রাণে শান্তিলাভ করিব প্রত্যাশায়, আপনার 'কুরুক্ষেত্র' বারম্বার পাঠ করিয়া দেখিলাম —আপনার কল্পনা গোমুখীনিঃসৃত কবিতা-রত্নরাজি, যাহা ভারতের কোহিনুরকেও অন্ধকার করিয়া জ্যোতিঃ বিকাশ করিতেছে, হৃদয়ে ধারণ করিলে আপনার হৃদয়ের ভাবসমুদ্রে সামান্য বালুকার ন্যায় কোথায় যে ডুবিয়া যাইতে হয়, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। আমার কক্সবাজার অবস্থিতিকালে আমি দক্ষিণ সমুদ্রের বীচিমালা অবলোকন করিয়া যেমন আপন অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইতাম, আপনার কল্পনাপ্রসূন 'কুরুক্ষেত্রে'র ভাবতরঙ্গে আমাকে ততোধিক আত্মহারা করিয়াছিল। আপনার কল্পনা ও কবিত্ব-সমুদ্র যে প্রশান্ত মহাসাগর হইতেও কত গুণ গভীর, কত কোটি গুণ বিস্তৃত ও মহান্ ও ভগবানের বিরাট্ ছায়ায় বিভাসিত। তাহার ভিতর আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পরমাণুর ন্যায় কোথায় যে লুকাইয়া গেলাম, কোথায় যে হারাইয়া গেলাম, যেন নির্ব্বাক নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি আর নাই!

বৃন্দাবনে গোপবৃন্দ কৃষ্ণহারা হইয়া চিরকাল কাঁদিয়াছিল। বলিয়াছিল,—"তাই ভেবে

কি ভাই রে সুবল, ছেড়ে গেল প্রাণের কানাই। আমরা সামান্য ভেবে কখনও মান্য করি নাই॥" আমাদের কি সেই দিন হইবে, আমরা কখনও বলিব,—"আমরা সামান্য ভেবে কখনও মান্য করি নাই।" যাঁহাকে অসংখ্য নরনারী কেহ 'পিত,' কেহ 'সখে,' কেহ 'গুরো' এবং কেহ 'প্রভো' বলিয়া চারি দিক্ হইতে প্রেম ও ভক্তির অঞ্জলি বর্ষণ করিতেছে, তাঁহাকে কি আমরা কখনও চিনিতে পারিব? এমন দিন কি হইবে, যে দিন আমরা তাঁহার মূর্ত্তি প্রতি গৃহে গৃহে স্থাপিত করিয়া, একপ্রাণে 'জয়তি প্রাচীবদনৈকদর্পণতপন!' বলিয়া পূজা করিব! আমি ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের নবীনচন্দ্রকে বৃন্দাবনচন্দ্র করুন, আর জগতের অনন্ত নরনারী যেন সেই চন্দ্রের সুধা পান করিয়া চির-কাল তৃপ্তিলাভ করে।

আপনি পূজার বন্ধে বাড়ী আসিবেন শুনিয়া, অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হইলাম। আপনি ময়মনসিংহে কেমন আছেন, স্থানীয় লোকেরা আপনাকে কেমন সমাদর করিতেছে এবং থাকিবার ঘর আপনার বাসোপযোগী হইয়াছে কি না ইত্যাদি লিখিতে আজ্ঞা করিবেন।

আপনার স্নেহের—

চট্টগ্রাম, কাতালগঞ্জ

শ্রীকরকমলেষু

আপনার প্রীতি ও স্নেহমাখা পত্র পাইয়াছি। আমিই কি কেবল আপনাকে ভাল বলিবার, ভাল বাসিবার একমাত্র লোক,—আপনার এই জন্মভূমিতে আপনার হৃদয়ের এইরূপ দারিদ্রতা দেখিয়া আমার হৃদয়ে ব্যথা পায়। সেই রাজন্যকুলঈপ্সিত, মহামহার্ঘ্য রত্নরাজি-খচিত পরিচ্ছদপ্রিয়, সেই পলাশী-প্রাঙ্গণের গগনবিঘোষী মহাসমর-নিনাদে উন্মত্ত, আবার অন্য দিকে মূর্ত্তিমান্ দয়া ও প্রেমের আধার,—হৃদয়ের এইরূপ দুর্ব্বলতা কি প্রাণে সহ্য হয়? আমার এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আমি আপনাকে ভালবাসিতে পারি? প্রীতি-প্রফুল্লতা, প্রেমপ্রিয়তা, রূপরসিকতা, দয়াদাক্ষিণ্যতা, জ্ঞানগরিমা ও ক্ষোভক্ষিপ্রতা প্রভৃতি মহাশক্তি ও বৃত্তিসমূহের যুগপৎ একাধারে সমাবেশ—সেই উগ্র হইতে উগ্রতর, তীব্র হইতে তীব্রতর, ক্ষিপ্র হইতে ক্ষিপ্রতর,—মহাগর্ব্বিত, মহাপ্রগল্‌ভী; আবার আরও নিকটে যাইয়া দেখ, মূর্ত্তিমান্ কামরূপ; মহাসরল, চিরপ্রসন্ন, মুক্তহৃদয়, বিলাসবিভাসিত নেত্রযুগল চির প্রেমধারা, পরহিতার্থ আত্মোৎসর্গে চিরক্ষম, এমন মহিমময় অমানবিক, অনৈসর্গিক, উষ্ণে শীতলে, কঠিনে তরলে, বীরে বালকে, বিচ্ছেদে মিলনে, আগ্রহে বিক্ষোভে এবং আত্মত্যাগে ও আত্মবঞ্চনায় (আপনার কথিত জীবনী) একত্রে মাখামাখি যেই মহামানবের সম্ভবে, তাঁহাকে হৃদয়ে লইয়া ভালবাসা আমার ন্যায় মহামূর্খ, মহাকর্কশ এবং সংকীর্ণহৃদয় ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে। তবে আমি আপনাকে উপলব্ধি করিতে উপাসনা করিতেছি মাত্র। আমার এই উপাসনার অন্তর্ব্বীজ আপনাকে উপভোগ করা; উপভোগ ইহার বিকৃত অর্থে নহে—আপনাকে উক্তরূপে হৃদয়ে রাখিয়া অন্তশ্চক্ষুতে দেখা। সেই এক অনির্ব্বচনীয় মহারাসায়-নিক সংমিশ্রণের সূক্ষ্মতা হৃদয়ে অনুভব করা, যাহাতে ঝড় আছে, বৃষ্টি আছে; তরঙ্গ আছে, স্থিরতাও আছে—বাৎসল্য ও বিলাস একাধারে একত্রে আছে। এইরূপ অনির্ব্বাচনীয় প্রভাব ও রূপের সহিত যিনি আপনাকে হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহাকে দেখিলে জীবন সার্থক হয়। সুতরাং আপনার 'পাপে-পুণ্যে-ফল সমা' রমণীশক্তি, যিনি আপনার অপার্থিব প্রেম সুধাপানে বিমুগ্ধা হইয়া অবিচ্ছিন্নভাবে আপনার হৃদয়কমলে চির-সমাসীনা—মহালক্ষ্মী; এবং যে মহাশক্তির প্রতিঘাতে এইরূপ ক্ষিপ্রগতি মহাগ্রহের অস্থির গতিও শিথিল হইয়া যায়, এমন শক্তির দর্শনলাভ কি আমার ন্যায় দরিদ্র-হৃদয় ব্রাহ্মণের পক্ষে মহালাভ নহে? আমি এই জন্য অন্যের চক্ষে সমালোচনার পাত্র হইতে পারি, কিন্তু আপনার চক্ষে প্রীতির পাত্র হইব সন্দেহ নাই।

আমি আপনার বিজয়া-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। একমাত্র কুমার বাবা নির্ম্মলকে আপনার সেই বিপুল ভদ্রাসনে বিজয়ায়-বিষণ্ণ গৃহস্বামীর ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। স্বর্গীয় অখিলবাবুর মহাপ্রস্থান,—ভীষ্মদেবের মহাশর-শয়নে শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন!*—সে কি অনির্ব্বচনীয় মহাদৃশ্য কুমার নির্ম্মল আমার চক্ষে ধরিয়া দিলেন। আমি কুমার শুকদেব-মুখনিঃসৃত ভাগবতামৃত পানের ন্যায় তন্ময়প্রাণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই ক্ষুদ্র স্বর্গের সম্যক্ দর্শনে প্রাণে প্রাণে মরমে মরমে স্বর্গীয় দেবভাষায় কখনও কি কেহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে তিনি দেবতা, মানব নহেন। ঢাকায় মহা-সমারোহে আপনার অভ্যর্থনা ও ময়মনসিংহে আপনার গৃহ নির্দ্দেশ ইত্যাদি কুমার আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী—

চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রধান উকিল ভ্রাতৃসম যাত্রামোহন লেঃ গবর্ণরের কাউন্সিলে সদস্য হইয়া আমার বদলির সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। এই বদলি তাঁহার প্রাণেও এরূপ আঘাত করিয়া-ছিল যে, তিনি আমাকে লিখিলেন যে, সয়তানের উৎপীড়ন আর সহ্য হইতেছে না। মেনেষ্টি-সয়তান-ঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন যে, সুরেন্দ্রবাবু বেঙ্গলীতে এরূপ প্রবন্ধ ছাপিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তাঁহাকেও লিখিলাম যে, যখন দেশবৈরী বলিয়া এত কাল আমি তাহার গায়ে হাত দিই নাই, এখন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি অস্ত্রত্যাগ আমি করিব না। শ্রীভগবান্ এই অত্যাচারীদের বিচার করিবেন। অতএব তাঁহাদেরও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলাম। তাঁহারা আমার নিষেধ মানিলেন না। কারণ, আমি আসিবার পর চট্টগ্রামে একটা ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। 'বেঙ্গলী'তে মেনেষ্টি-সয়তানের কুকীর্ত্তিপূর্ণ এক প্রবন্ধ বাহির হইল। সয়তান 'মিরারে' এক টেলিগ্রাম ও 'বেঙ্গলী'তে তাহার উত্তরে এক পত্র পাঠাইয়া, আমাকে এরূপ সর্ব্বস্বান্ত করিবার পরও আক্রমণ করিয়া লিখিল যে, আমার বদলির দরুন আমি ও আমার seditious clique (রাজদ্রোহী দল) তাহার ও মহাযোগ্য কমিশনর মেনেষ্টির বিরুদ্ধে এরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছি। 'বেঙ্গলী'তে বোধ হয় যাত্রামোহন ও আমার পিসতত ভাই নগেন্দ্র ইহার যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিলেন। কিন্তু এখন আমার আর চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া চক্র ধরিয়াছিলেন। তিনি শত অপরাধ ক্ষমা করিতে 'মহাভারত'-মতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আমি এ পাপিষ্ঠ সম্বন্ধে এরূপ কোনও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম না। কেবল শৈশবে সহপাঠিত্বের অনুরোধে আমি তাহার এত অত্যাচার ক্ষমা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এই কৃতঘ্নতার ও বিশ্বাসঘাতকার পর, ঘোরতর ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আমার এরূপ সর্ব্বনাশ করিবার পরও, সে যখন আমাকে 'রাজবিদ্রোহী' বলিয়া আমার ফাঁসির চেষ্টা করিতেছে, তখন আত্মরক্ষার্থ আমার অস্ত্র ধরা উচিত। সে অকারণ আমার এত অনিষ্ট করিয়াছে। অতএব বোধ হয়, শ্রীভগবানের ইচ্ছা যে, আমার অস্ত্রে তিনি তাহাকে নিহত করিবেন। তাই বুঝি এত দিন তাহার পাপের দণ্ড দিতে বহু লোক চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। আমি প্রথমতঃ 'মিরারে' "That mendacious telegram'—"ঐ মিথ্যা টেলিগ্রাম"—শীর্ষক দুইখানি পত্র লিখিলাম। চট্টগ্রামে হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। একে ত 'বেঙ্গলী'র প্রবন্ধে 'যুগলরূপে'র হৃৎকম্প ও মুখ শুষ্ক হইয়াছিল, তাহার উপর এই চাবুক-প্রহারে মিলিত মহিষাসুরের 'রক্তারক্তীকৃতাঙ্গ হত' হইল। কালী পেস্কার মিঃ এণ্ডার্সনকে

* দাদার সহিত আমার সেই বিদায়ের দৃশ্য। হা কপাল! আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনীয়! স্নেহে, ভালবাসায়, মানুষ কি এত অন্ধ হয়?

উক্ত প্রবন্ধ দেখাইলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন—"চট্টগ্রামে একজন মাত্র লোক আছে, যে এরূপ ইংরাজি লিখিতে পারে। ইংরাজদের মধ্যেও অল্প ইংরাজ এরূপ লিখিতে পারে।" তিনি কাগজ দুখানি লইয়া যান। তাহারা ইংরাজমহল বেড়াইয়া জীর্ণাবস্থায় ফিরিয়া আসে। কাষ্টম কলেক্টর গুড সাহেবের উপর উৎপীড়ন করাতে এবং সয়তান-সম্বলিত কুৎসাতে, শুনিয়াছি—ইংরাজমহলও মেনেষ্টির উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এবং ঘৃণা করিয়া কেহ তাহার সঙ্গে মিশিতেন না। এই সকল প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহাতে প্রকাশিত কলঙ্ক সকল এরূপ গুরুতর, এবং একজন কমিশনরের পক্ষে এত ঘৃণাস্পদ যে, গবর্ণমেণ্ট মেনেষ্টিকে তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম হইতে সরাইলেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহাকে কমিশনারি হইতে অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতম জেলা মালদহের—উহা একটা সবডিভিসন বলিলেও চলে—মাজিষ্ট্রেটিতে অবনমিত করিলেন। 'যুগলরূপ' আমার মস্তকে যেরূপ অকস্মাৎ বজ্র নিক্ষেপ করাইয়াছিল, সেরূপ অকস্মাৎ বজ্র তাহাদের মস্তকে পড়িল। সমস্ত চট্টগ্রামে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। লোকে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, মেনেষ্টি চলিয়া যাইবার সময়ে গুড সাহেব সয়তানকে রেলওয়ে ষ্টেশনেই ঘোরতর অপমানিত করেন। এই সময়ে মেনেষ্টি-সয়তান পালা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিবার জন্য 'বেঙ্গলী'তে "Chittagong affairs. Their humorous side. The genesis of a Rai Bahadur.—চট্টগ্রামের কেলেঙ্কারি! তাহাদের হাস্যকর দিক্। এক রায় বাহাদুরের জন্মবৃত্তান্ত" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখি। উহাতে সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটা হো হো হাসি উঠে। চট্টগ্রামের ত কথাই নাই। সেখানকার সাহেবমহলেও মাসেক পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধ লইয়া বিরাট হাসি। কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন একদিন আমাকে, আমি এই প্রবন্ধের লেখক কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন তিনি এমন humorous (রসিকতাপূর্ণ) লেখা আর কখনও পড়েন নাই। আরও বলিলেন যে, ইংরাজমহলে উহা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাঁহারা তাঁহাদের 'কৃষ্টমাসে'র উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের রঙ্গভূমিতে উহা অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি ঠিক 'কৃষ্টমাসে'র সময়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে বাহির হইয়াছিল। অনেকেরই বোধ হয়, এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি দেখিবার কৌতূহল হইবে। তাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য উহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

CHITTAGONG AFFAIRS.

Their humorous side. The Genesis of a Rai Bahadook.

Here is an interesting communication which the Government will do well to study, if for nothing else, only for the purpose of understanding why the honors bestowed by it have become an object of contempt in the eyes of the public :—

I. Thank God, Mr. Collier has returned, and with him fair weather, in proof whereof please take note that a Rai Great Old Back-Biting Bahadur had a most delightful scene, it is said, on the Railway platform with a redoubted Good Saheb. Mr. Good, a true sailor, is no respecter of persons, and as he had some very fresh scores to settle—Mr. Manisty having turned his last kind attentions to him,—settled they were on

the spot. The G. O. B. was completely floored, and lay like a heap of tallow, even Mr. Anderson—O irony of fate!—enjoying the scene. The laws of *karma* never had a swifter agent than Mr, F, Good, the energetic Collector of Customs and the Port-Officer of Chittagong.

He sang—"Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall."

In the evening, however, the G. O. B.'s manufactured son and Sam Weller, propped the G. O. B. up, when Mr. Manisty was sneaking out of Chittagong. Mr. Good, who was then in disguise to enjoy the scene, is said to have quoted Milton at the sight of the "poor honest man" the G. O. B.—

"If thou be'est he.
O how changed, How fallen!"

The recitation was so pathetic that the G. O. B. fainted, as the train started, shedding copious tears, and it was only by vigorous application of smelling salts that a little life was restored to that inordinate mass of fat, and a tragedy averted.

II. Though people call him the G. O. B. (great old back-biter) I like to be polite, and so does Mr. Anderson. I call him Fat Chand, and Mr. Anderson calls him Rai Bahadur. Well, Rai Fat Chand Bahadur is a good fellow, and can be very frank if it please him. He once told me—"Do you know, my boy, how I rose in the service?" I replied—"I am sure, I don't—I suppose by your sterling merits." He said, throwing his head aside—No. I have no sterling—not even a penny, and as for merit, it does not extend beyond the 3rd class of an Entrance School. *I rose by tact and Dollies*—Do you know what I do when I go to see a Saheb? Well, I begin at the stables.

"First *Salaam Ghora* Saheb! Then *Salaam* Syce Saheb! Then *Salaam* Coachman Saheb! Then *Salaam* Baburchi Saheb! Then *Salaam* Orderly Saheb! Then *Salaam* Khitmutgar Saheb Then *Salaam Aya Saheb! Then Salaam Dog Saheb! Finally Salaam* Hazor Saheb himself—

"Your honour! Your Excellency! Your Majesty! You Father! I son! I slave!" He paused and proudly looking at me for a little time in silence said. "take my word my boy! Do it, and you will see how rapidly you will rise in the service!" I said—"Many thanks. But I fear so many *Salaams* from the *Ghora Saheb* to the *Burra Saheb* may give me the lumbago!!" He looked at me sternly and said—"No. Habit—only habit. I have done it these thirty years, though fat as I am, and with this promontory of a belly, my making a *Salaam* is a geometrical problem."

III. He gradually waxed warm over his achievements and said, again throwing his head aside and looking and smiling at me slyly—"and do you know how I became a Rai Bahadur?" I replied—"No, but I suppose it was the sublimated result of a million of *Salaams* and *dolies*." 'No!' he replied in righteous indignation, "It is by twisting the tails of the Lushai expedition bullocks! And those who want to be Rai Bahadurs at Chittagong, must twist my tail!" Pointing significantly to his hind quarters. But my dear *Bengalee*, I swear I saw no tail there. The people say however that my friend Fat Chand always wraps himself up in a disreputable sort of dress particularly with a view to make that mighty instrument of honour and emolument invisible to the people of Chittagong."

IV. Now the poor boy Fatik Chand has gone wrong in the head for a Rai Bahadurship. His contention is very simple—"If Fat Chand could be a Rai Bahadur, why could not Fatik Chand be one?" As the fates would have it, Fatik Chand overheard the interesting and instructive conversation narrated above, and, as a lawyer, readily siezed the idea, and has since been assiduously twisting Rai Fat Chand Bahadur's tail. He even went the length of sending a lying telegram eulogising Fat Chand and his patron to one of the Calcutta dailies. Fat Chand gave him to understand that in addition to these patriotic services if he could cut a figure on the occasion to the Viceregal visit, he would be proclaimed a Rai Bahadur. And my dear *Bengalee*, a figure Fatik Chand did cut on that memorable occasion. He lit a few *Chirags* and lustily drummed on an empty Kerosine tin. But the Viceroy came and the Viceroy went and Fatik Chand remained—Fatik Chand! I found him the very image of despair standing *shamla*-headed before the Reception pavilion and gazing at the "Clive". This was a few minutes after the *Durbar*, in which Fat Chand "clothed in transcendant brightness, did outshine myriads though bright"—the poor dishonoured Zemindars and respectable men of Chittagong. I accosted him and said—"How d' you do, my dear Fatik Chand!" He exclaimed piteously—"Humbugged; Humbugged" I—by whom? He—By that Fat Villain! I—How? He—He made me spend Rs. 15 As. 13 p. 9 for nothing. Not even introduced to the Viceroy! I—O, you empty earth-oil-barrel! Rightly served.

Well, 'Empty earth-oil-barrel', is not an expression of abuse. It is not to be found in any dictionary of abuse not even in that one out of which Rai Fat Chand daily regales his subordinates to their faces, and his friends and superiors behind their backs. Still the poor boy, my dear *Bengalee*, fell into such a violent fit of crying, throwing up

his hands and legs, that I had to send for our good Collector Dr. Anderson to calm him. A most obliging man Dr. A. He gave the poor boy some of his 'sweet pills' for which he holds a patent,—I have seen it with my own eyes,—and patting him good-naturedly on the head consoled him thus—'My dear Babu Fatik Chand; don't be disconsolate. Things will come right at the right time. Don't worry yourself because my esteemed friend—an excellent man in his way—Fat Chand is a Rai Bahadur. Well, he took two Hony titles before he became Rai Bahadur—*Chalak Das* for dull cunning at school, and Ghasiram Das for abject servility in life. You are only a beginner in both. He has nothing under the sun to call his own, while you have, some property. Lay the scriptures to your heart—'sell all thou hast, give it away in *dolies*, and follow Fat Chand. The only other thing I can suggest is this—seated on Fat Chand's famous pot-bellied Rozinante behind him, and back to back thus'—Dr. A. showed it, placing the back of one hand against the back of the other—and go the way taken by the Viceregal *cortege* lustily drumming on your belly, and shouting in the Hasan Hossein style—Hai Manisty! Hai Manisty! Let Moulvie A., Mr. R. and the manufactured son go about gyrating and beating tom toms in that desperate Maharam fashion which used to drive Mr. Oldham mad, and let Babu G. like the Mohoram fool follow behind—shouting, Manisty ka Lashkar, Yah Hosen!' I dare say such a demonstration of loyalty will be duly wired by Mr. M. an excellent man in his way, and very able too,—to Head quarters, and then'—with a significant wink of the eye—'I verily say unto you, you shall have your reward!' The poor boy was thus composed to sleep and Mr. Good, our Municipal Chairman, extemporising a cradle out of a scavanger cart lying broken in the neighbour-hood,—a clever man Mr. Good and ready for all emergencies—put him into it. Thus another tragedy was averted."

If the above account of his rise and distinction is really and often given by any worthy, we have nothing to do with him. Our Fat Chand and Fatic Chand are mere *Dramatis personœ*. If the cap however fits any one he has only to thank himself. With this brief explanation, we have seriously to express our deep regret at the approaching retirement of our Collector, Mr. Anderson. Good, kind, and generous, with a kind word for every body, and easily accessible to every body, he would have left a fragrant name behind, if he had only not placed undeserved confidence as he must have found out by now, on a self-seeking time-server, a sanctimonious summer-fly, a veritable serpent under the grass. We do not blame him for it, for

faith in such a despicable character has been handed down as an administrative creed since some years. But now that Mr. Anderson has—let us hope—found him out, if he will break that evil tradition in handing over his charge to his successor, the people of Chittagong will bless him with a million tongues in his retirement. We wish him peace and prosperity. Looking back from his Island home across the sea while he will receive cold comfort from all that he was by his goodness induced to do, straining his sense of justice for the satisfaction of the insatiable vanity and selfishness of a vile man, the good that he has been able to do to the people at large, will bring him joy for ever. We wish him God speed.

বলা বাহুল্য, ফ্যাটচাঁদ রায় বাহাদুরের এই জন্মবৃত্তান্ত আমি তাঁহার শ্রীমুখে বহু বার শুনিয়াছি, এবং তাহার সারাংশ—ঘোড়া-সাহেব হইতে কুকুর-সাহেব পর্য্যন্ত সেলামের অদ্ভুত উপাখ্যান—পূর্ব্বে দিয়াছি। উভয়ে এই বজ্রে নিহত হইল। মালদহে গিয়া কিছু দিন পরেই মেনেষ্টি 'সিভিল সার্ভিস' হইতে অস্ত হইলেন। সয়তানের শোচনীয় পরিণাম পরে যথাস্থানে বলিব।

ময়মনসিংহের কার্য্য

ময়মনসিংহ একটা প্রকান্ড ডিষ্ট্রিক্ট। উহা ভাঙ্গিয়া দুই ডিষ্ট্রিক্ট করিবার প্রস্তাব বহু দিন হইতে চলিতেছে। অতএব উহা একটা heavy district (ভারি ডিষ্ট্রিক্ট) বলিয়া বিখ্যাত। মিঃ বি. সেনও বলিলেন যে, তিনি বেলা দশটা হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতেন। আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, রোজ চল্লিশ পঞ্চাশখানা দরখাস্ত পড়িতেছে। পুলিসের চালানও প্রত্যহ অন্য জেলার দ্বিগুণ। অথচ সদর এলাকা দুই সবডিভিসনে বিভক্ত। আমি 'এ' সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত। মিঃ সেন একা দরখাস্তের এজাহার লইতে না পারিয়া অধীনস্থ ডেপুটিদের কাছে পাঠাইতেন। তাঁহারাও খাটিয়া খুন। এত বেশী মোকদ্দমার কারণ কি? ডেপুটিরা বলিলেন, এক কারণ, তখনকার বাঙ্গালি ব্রাহ্ম সেসন-জজ। দরখাস্ত, কি মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেই তিনি 'মোসন' গ্রহণ করেন, কৈফিয়ৎ তলব করেন, এবং তাহার পর পুনর্ব্বিচার আদেশ দেন। এ জন্য ডেপুটিরা দরখাস্ত ডিসমিস করা একরূপ বন্ধ করিয়াছেন। ছাই-মাটি যাহা হউক, দরখাস্ত রাখিতেই হইবে। টাউরা এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? কাজে কাজে, দরখাস্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। কেবল মিথ্যা ও ছাই-ভস্মের নালিশ নহে, যত প্রকারের দেওয়ানি বিবাদ, অল্প খরচে ফৌজদারি আদালতে মারপিট ও অনধিকার প্রবেশের ছলনায় উপস্থিত হইতেছে। ইহার ফলে যেমন অন্য স্থানে আমি বলিয়াছি, খুন ও হাঙ্গামা বৃদ্ধি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের মোকদ্দমাও বাড়িতেছে। আমি দরখাস্ত পাইয়াই কখনই ডিসমিস করি না। নিজে প্রমাণ তলব দিয়া, কি পঞ্চাইতের দ্বারা তদন্ত করাইয়া ও তাহার সম্বন্ধে আপত্তি শুনিয়া তবে ডিসমিস করি। প্রথম মোকদ্দমা এরূপে ডিসমিস করিলে 'মোসন' হইল। আমি সাক্ষীর জবানবন্দি না লিখিয়া ডিসমিস করিয়াছি কেন, জজ কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি আশী সিক্কা ওজনে কৈফিয়ৎ দিলাম যে, এরূপ তদন্তের সময়ে সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিবার কোনও আইন আমি জানি না, এবং আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ এইরূপই করিয়াছি। সমারি বিচারে তিন মাস মেয়াদ দিবার সময়েও যখন জবানবন্দি

লিখিতে হয় না, তখন আসামী তলবের পূর্ব্বে এক রাশি জবানবন্দি লিখিয়া সময় নষ্ট করিবার বিধান কোন্ আইনে আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিতে জজের কাছে প্রার্থনা করিলাম। এই কৈফিয়ৎ পাইবার সময়ে মাজিষ্ট্রেট রো (Rowe) না কি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে জজ has caught a Tartar (এক তুর্কির পাল্লায় পড়িয়াছেন)। জজ নীরবে আমার আদেশ বাহাল করিলেন। তখন নিম্নশ্রেণীর উকিলগণ আর এক ফিকির বাহির করিলেন। এক মোকদ্দমায় এই মর্ম্মে 'মোসন' দাখিল করিলেন যে, আমি এগারটার পূর্ব্বে কোর্টে আসিয়া, মোকদ্দমা ডাকিয়া ডিসমিস করি। আমি কৈফিয়ৎ লিখিলাম, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এগারটার পরে ভিন্ন আগে যে আফিসে আসি না, সকলেই জানে। তাহার পর মাজিষ্ট্রেট শীতের সময়ে মফঃস্বল যাওয়াতে প্রথমতঃ এক ঘণ্টা কাল আমাকে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের কার্য্য করিতে হয়, তাহার পর কোর্টে বসি। অতএব কোন্ উকিল এরূপ মিথ্যা মোসন দাখিল করিয়াছেন, আমি তাঁহার নাম চাহিলাম। জজ উকিলকে ধমকাইলেন, এবং আমার আদেশ বাহাল রাখিলেন। এই এক উৎপাত থামিল।

মোকদ্দমা বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণও ব্রাহ্ম জজ ও স্থানীয় ব্রাহ্ম সংবাদপত্র। একটি দলবদ্ধ বলাৎকারের (Gang rape) মোকদ্দমা হয়। ব্রাহ্ম সংবাদপত্র তাহা লইয়া চীৎকার করিতে করিতে গগন বিদীর্ণ করেন, এবং ব্রাহ্ম জজ তাহাতে আসামীদিগকে দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ করেন। সেই হইতে উক্ত সংবাদপত্র 'মহিলানিগ্রহ' ধূয়া ধরিয়া আছেন, এবং 'সতী রমণীর প্রতি দলবদ্ধ পাশব অত্যাচারে'র প্রবন্ধ এক স্রোতে বাহির হইতেছে। টাঁন্নদের একটা মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক নালিশে, কি কোর্টে, কি পুলিসে, দলবদ্ধ বলাৎকারের অভিযোগ গাঁথিয়া দিতেছে। সামান্য মারপিটের, কি গরু খোয়ানের মোকদ্দমায়ও বাদী বলিতেছে, যে, তাহাকে মারপিট করিয়া, কি গরু কাড়িয়া লইয়া, বিবাদীরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রী, কি ভগিনী, কি অন্য রমণীকে ধরিয়া 'নালিয়া ক্ষেতে' (কোষ্টা ক্ষেতে) লইয়া গিয়া সকলে বলাৎকার করিয়াছে। যে দরখাস্ত হাতে পড়িতেছে, তাহাতেই এইরূপ দলবদ্ধ বলাৎকার! পূর্ব্ববাঙ্গালা সমস্তই মুসলমানপ্রধান স্থান। পার্শ্ববর্ত্তী জেলা ঢাকা, ফরিদপুর, এমন কি, পীঠস্থান বরিশালে পর্য্যন্ত এরূপ মোকদ্দমার নাম-গন্ধ নাই। কেবল ময়মনসিংহে ইহার প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? উকিল মোক্তারেরা বলিলেন,— "ধর্ম্মাবতার! ময়মনসিংহে নালিয়া ক্ষেত দেখা দিলেই বসন্তের কোকিল ডাকে।" বঙ্কিম বাবুর রোহিণীর মত তাঁহারা বলেন যে, এই অপরাধ কোকিলের। সে এমন অসময়ে ডাকে কেন? আমি বলিলাম যে, তবে তাঁহাদের 'ঐ কালো কোকিলের' নামেই দরখাস্ত করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহে কোকিল বধের জন্য পুরস্কার দিয়া, তাহা বিতরণের ভার ব্রাহ্ম মহাশয়দের উপর দেওয়া উচিত। কিন্তু কই, কোকিলের ডাক ত শুনি না। শুনি কেবল এই ব্রাহ্ম সম্পাদক মহাশয়ের ডাক। অথচ এরূপ অপরাধের কারণ ময়মনসিংহে যেরূপ অভাব, অন্য কোথাও তাহা নাই। এখানে অধিকাংশ নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকের, বিশেষতঃ মুসলমানদের স্ত্রী, একাধিক 'ইস্ত্রী' (পত্নী) ত আছেই, তাহার উপর আবার গৃহের উপকরণের মত 'উপ'ও একটা, কি একাধিক আছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রাম্য হাট ও বাজারে অবিদ্যার আড্ডা আছে। হাটের জমিদারদের তাহাই সোনার কাটি, রূপার কাটি। তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা কত! শুনিয়াছি, ময়মনসিংহ সহরে পর্য্যন্ত পরব পার্ব্বণে, এমন কি, যাত্রার গানে পর্য্যন্ত তাহাদের যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। এক জমিদারের হাটের অবিদ্যা অন্য জমিদার অপহরণ করিয়া তাঁহার হাটে লইলে, উভয়ের মধ্যে একটা 'ট্রোজান যুদ্ধ' উপস্থিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত 'হেলেনে'র উদ্ধার না হয়, সে পর্য্যন্ত মোকদ্দমানল নির্ব্বাপিত হয় না। হাট বাজার ছাড়াও শুনিয়াছি, যেখানে একটা বটবৃক্ষ আছে, তাহার নীচেই একটি অবিদ্যা বিরাজিতা। এক

গ্রামের ভূতের অধিকারে অন্য গ্রামের ভূত হস্তক্ষেপ করিলে যেমন একটা ভৌতিক যুদ্ধ উপস্থিত হয় বলিয়া প্রবাদ, ইহাদের মধ্যেও সেরূপ 'জুরিসডিক্সন্' (অধিকার) লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অতএব এরূপ সতী সাবিত্রীর দেশে কেন যে 'ঘোরতর মহিলা-নিগ্রহ' হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই 'গ্যাঙ্গ রেপের' প্রথম যে মোকদ্দমা আমার হাতে পড়িল, তাহাতে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল।

মোকদ্দমাটি এইরূপ।—একটি প্রকাণ্ড বাজারের কেন্দ্রস্থলে একটি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানীর একখানি ক্ষুদ্র মুদীর দোকান। তাহাতে চাটাইএর বেড়া, এবং অভ্যন্তরে একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। সে এমন স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে একাকিনী রাখিয়া বারাণ্ডায় শুইয়াছিল। পরদিন প্রাতে পুলিসে এজেহার দিয়াছে যে, রাত্রিতে তাহার স্ত্রী কাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার পর কোর্টে আসিয়া স্ত্রীরত্ন এক 'ঘোরতর মহিলানিগ্রহে'র অভিযোগ উপস্থিত করিলে, উহা তদন্তের জন্য পুলিসে যায়। সেই পুলিসই দীর্ঘকাল তদন্তের পর একটা দলবদ্ধ বলাৎকারের মোকদ্দমায় দুই জন মধ্যবিত্ত অবস্থার আসামী চালান দিয়াছে। এখন 'মহিলা মঙ্করু' বলিতেছেন যে, তাঁহার কুঁড়ের কোণা কাটিয়া, আসামীরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র খালে এক নৌকায় সেই বাজারেরই নীচে সমস্ত রাত্রি আক্রমণ করিয়াছে, এবং প্রাতে অপর পারে এক নালিয়া ক্ষেতে রাখিয়া আসে। সেখানে তাঁহার স্বামী সাক্ষিগণকে লইয়া তাহার হারান ধন নালিয়া ক্ষেতে প্রাপ্ত হয়। তাহার পর এই নালিশ। মোকদ্দমার দুই সাক্ষী বলিতেছে, তাহারা দুপুর রাত্রিতে বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল। তাহারা দেখিল যে, এই নিগৃহীতা মহিলার মত একটি রমণী দুই বিবাদীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। কোনও বেশ্যা যাইতেছে বলিয়া তাহারা দ্বিরুক্তি করিল না। জেরাতে প্রকাশ পাইল—জেরার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না, প্রত্যেক সাক্ষীর জবান-বন্দির ভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়া আমি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না,—জেরাতে প্রকাশ পাইল যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে দুইটি দল। ইংরাজ রাজ্যের কল্যাণে কোন্ গ্রামেই বা নাই? পরদিন প্রাতে যেমন বিবাদীর বিপক্ষ দল শুনিল যে, বাদীর স্ত্রী বাহির হইয়া গিয়াছে, তখনই তাহারা গিয়া তাহাকে শিকার করিল। সে নিতান্ত দরিদ্র লোক। তাহার পর এই নালিশ ও টাউটদের দ্বারা যথাবিধি সাক্ষী গঠিত হইয়া, উপযুক্ত দক্ষিণাপ্রাপ্ত পুলিসের দ্বারা কোর্টে উপস্থিত হইল। ঘরের কোণা কাটিয়া স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল, অথচ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সতী রমণী বাজারের মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিয়া গেলেন, সমস্ত রাত্রি নৌকাতে নিগৃহীতা হইলেন, অথচ একটুক উচ্চ বাচ্য করিলেন না—সতী কি না? একটুক উঃ শব্দ করিলেই বাজারের শত শত লোক ছুটিয়া আসিত। সর্ব্বশেষ পরদিন প্রাতে স্বামী পুলিসে এজাহার দেন যে, তাঁহার সন্দেহ, তাঁহার সতী মহিলা কাহারও সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। অথচ এই মোকদ্দমা লইয়া ব্রাহ্ম সম্পাদক মহাশয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ লোকের কর্ণ বধির করিয়া চীৎকার করিতেছিলেন! বলা বাহুল্য, বাদীর পক্ষেও দলাদলির কল্যাণে উকিল দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, এই মোকদ্দমা সেশনে পাঠান উচিত। কারণ এরূপ আরও মোকদ্দমায় জজ 'সঙ্গীন' শাস্তি দিয়াছেন। বিবাদীর উকিল বলিলেন, তাহাতেই ত এইরূপ মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইতেছে। আমি কিছু সঙ্কটে পড়িলাম। 'গ্যাঙ্গ রেপ' চুলায় যাক্, তাহা ত হইতেই পারে না। জোর পরস্ত্রী বাহির করিয়া লওয়ার অপরাধ হইতে পারে। বাদী নিতান্ত দরিদ্র। অতএব সতী সহজেই এ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়া, আমার রায়ে 'গ্যাঙ্গ রেপে'র রহস্যটা জজের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলাম। সকলে বলিতে লাগিলেন যে, জজ নিশ্চয়ই এই মোকদ্দমা সেশনে পাঠাইতে আদেশ দিবেন। ব্রাহ্ম সম্পাদকের গলা একবারে পঞ্চমে উঠিল। কিন্তু ব্রাহ্ম জজ 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ করিয়া,

আমি যে শাস্তি দিয়াছিলাম, তাহাও রহিত করিলেন। বলিলেন, স্বামী যখন নালিশ করে নাই, তখন স্ত্রী বাহির করিবার অপরাধে শাস্তি হইতে পারে না। অথচ বাদী বেচারি প্রথমেই পুলিসে এই অপরাধেরই এজাহার দিয়াছিল। তিনি 'গ্যাঙ্গ রেপ' সম্বন্ধে কথাটিও কহিলেন না। যাহা হউক, প্রহসন বাড়াইবার জন্য পরদারহরণ অপরাধের নূতন নালিশ করিতে আমি স্বামীর নামে নোটিশ দিলাম। সে তখন আসিয়া দরখাস্ত দিল যে সে বিবাদীর সঙ্গে আপোষ করিয়াছে, অর্থাৎ কিছু পাইয়াছে, অতএব সে আর নালিশ করিতে চাহে না। আমার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল—গরিব কিছু পায়। এরূপে এক বিরাট 'গ্যাঙ্গ রেপে'র পালা শেষ হইল। ইহার ফলে আমি যে চার মাস ময়মনসিংহে ছিলাম, কি পুলিসে, কি কোর্টে, আর 'গ্যাঙ্গ রেপে'র মোকদ্দমা হয় নাই।

মোকদ্দমা বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ, পুলিসের একাধিপত্য। মাজিস্ট্রেট ও ডিঃ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পুলিসের 'হস্তগত আমলক'। ময়মনসিংহ বহু ধনী জমিদারের রাজ্য। প্রজা ও প্রতিযোগী ভূম্যধিকারীর শাসনের এক অমোঘাস্ত্র—পুলিসকে হাত করিয়া, প্রজার নামে বদমায়েসি, কি শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত করা। শুনিলাম, এরূপ মোকদ্দমার এক এক রিপোর্টের মূল্য পাঁচ শত টাকা। দেখিলাম, প্রায় আড়াই শত বদমায়েসি ও দেড় শত শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ সেন সমস্ত শীতকাল মফঃস্বল ঘুরিয়া, কুড়িটি বদমায়েসি মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন। কারণ, এরূপ মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন নিষ্পত্তি হইতে পারে না। শুনিলাম, এক এক তদন্তে পঞ্চাশ ষাট মাইল কিছু দূর অশ্বে, কিছু দূর নৌকায়, কিছু দূর হস্তিপৃষ্ঠে, এবং অবশিষ্ট পথ পদব্রজে যাইতে হয়। আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, প্রত্যেক পুলিস-রিপোর্টের নীচে ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় তাঁহার দক্ষিণা আদায় করিয়া, 'জুডিসিয়াল তদন্ত আবশ্যক' লিখিয়া দিয়াছেন। আমি স্থির করিলাম যে, প্রথমতঃ তাঁহার এই করকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিতে হইবে ও তাঁহাকে কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। আমি মাজিস্ট্রেটের কাছে এক 'নোট' পাঠাইলাম। আমি প্রথমতঃ দেখাইলাম যে, বৎসরে ২৫টি হিসাবে ২৫০টি বদমায়েসি মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত করিতে আমার দশ বৎসর লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়ই মোকদ্দমা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে পুলিস দায়ের করিয়াছে। এখন সে সকল বদমায়েস সে গ্রামে আছে কি না, জীবিত আছে কি না, তাহারও স্থিরতা নাই। ইন্‌স্‌পেক্টর প্রত্যেক মাসে থানা পরিদর্শনে যাইতেছেন। তিনি সমস্ত মোকদ্দমা একবার তদন্ত করিয়া, উক্ত বদমায়েসেরা জীবিত ও সেই সেই স্থানে আছে কি না, এবং মোকদ্দমা চালাইবার কোনও প্রয়োজন আছে কি না এবং শান্তিরক্ষার মোকদ্দমায় এখনও শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না রিপোর্ট করিলে, তাহার পর প্রয়োজন-মতে 'জুডিসিয়াল তদন্ত' করা যাইতে পারিবে। মাজিস্ট্রেট ইহা অনুমোদন করিলেন। আমি চুপে চুপে এই আদেশ এবং চারি শত মোকদ্দমার সুদীর্ঘ শান্তিপ্রদ তালিকা ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়ের কাছে পাঠাইলাম। তাঁহার মাথায় বজ্র পড়িল। তিনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমি কিরূপে এই চারি শত মোকদ্দমার তদন্ত করিব?" আমি বলিলাম,—"আপনি প্রত্যেক মাসে থানা পরিদর্শনে এই সকল ঘটনাস্থানের নিকটে যান, আপনি পারিবেন না? তবে আপনি কেমন করিয়া ডেপুটি, কি জইণ্ট মাজিস্ট্রেটের ঘাড়ে এই কার্য্য চাপাইয়াছেন? আপনার ত থানায় থানায় পঞ্চ 'ম'কার সেবন ভিন্ন কোনও কাজ নাই বলিলেও চলে, তাহারা ত খাটিয়া খুন। তাহারা কিরূপে আড়াই শত বদমায়েসি মোকদ্দমার তদন্ত করিবে?" তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি জানেন যে, এখন স্থানীয় তদন্ত হইলেও সকল মোকদ্দমার প্রায় কোনটাই টিকিবে না। অথচ নিজেও পূর্ণমাত্রায় দক্ষিণাটা লইয়াছেন। এখন কেমন

করিয়া মোকদ্দমা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্ট করিবেন। প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্ট করিলে যদি বিচারে ডিসমিস হয়, তবে সমস্ত জবাবদিহি তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। অন্য দিকে এত মোকদ্দমা তদন্ত করা ঘোরতর পরিশ্রম ও ক্লেশের কথা। তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। আমি তখন বলিলাম,—"আচ্ছা, আসুন, আমাদের মধ্যে একটা সন্ধি হউক। আপনি প্রথমতঃ একটা মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া, উহা বিচারোপযোগী চালান দিন, এবং তাহার বিচারের ফলসাপেক্ষে অন্য মোকদ্দমার তদন্ত স্থগিত রাখিলেন বলিয়া রিপোর্ট করুন। এই মোকদ্দমার বিচারের পর অন্য মোকদ্দমাসমূহের যাহা হয় করা যাইবে। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং কিছু দিন পরে একা মোকদ্দমার জন পাঁচেক আসামী চালান দিলেন। বিচারে দাঁড়াইল যে, তাহারা সকলে অবস্থাপন্ন লোক, কেহ কেহ স্কুলের মাষ্টারি ও পণ্ডিতি করে। জমিদারের সঙ্গে বৃদ্ধি খাজনা লইয়া তাহাদের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। জমিদারের নায়েব মহাশয় কোর্টে উপস্থিত থাকিয়া, কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টরের দ্বারায় মোকদ্দমা চালাইতেছেন। তাহাদের পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে বদমায়েসির গন্ধ নাই। ইন্‌স্‌পেক্টর স্বয়ং কোর্টে উপস্থিত। এরূপ মোকদ্দমা তিনি কেমন করিয়া চালান দিলেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার তদন্তের সময় এই সকল কথা প্রকাশ পায় নাই। আমি আসামীদের অব্যাহতি দিয়া, মোকদ্দমার নথি মাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাইলাম এবং আবার এক 'নোট' দিলাম যে, এই ত বদমায়েসি মোকদ্দমার নমুনা। অতএব অবশিষ্ট মোকদ্দমায় অনর্থক মূল্যবান্ সময় নষ্ট না করিয়া, সমস্ত খারিজ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহার পর পুলিস হইতে বদমায়েসি মোকদ্দমার নূতন এক তালিকা আনাইয়া, আগামী শীতের সময়ে মফঃস্বল পরিদর্শন সময়ে মাজিস্ট্রেট স্বয়ং ও স্থানে স্থানে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট গিয়া, স্থানীয় তদন্ত করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিলে, সকলের পক্ষে সুবিধা হইবে। মাজিস্ট্রেট আমার এই প্রস্তাবও অনুমোদন করিলেন। অতএব এক হুকুমে আড়াই শত বদমায়েসি মোকদ্দমা খারিজ হইল। উকিল মোক্তারদের হাহাকার এবং সমস্ত দেশে একটা আনন্দধ্বনি উঠিল।

বাকী রহিল শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা। দেখিলাম, তাহার অধিকাংশই মহারাজা সূর্য্যকান্তের ও তাঁহার অংশীদার ভ্রাতা জগৎকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, এখনও রোজ চার পাঁচটা করিয়া পুলিস-রিপোর্ট আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের উভয়ের ম্যানেজাররা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমি আবার তাঁহাদের ডাকাইলাম। এই সকল মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে উভয়েই বলিলেন যে, মহারাজা সূর্য্যকান্ত জগৎকিশোরের এক পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। জগৎকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের জননী পুণ্যবতী বিদ্যাময়ী দেব্যা একজন বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই পোষ্য নাম মাত্র। তাঁহাদের এক বাড়ী, তাঁহার ঘরের ছেলে ঘরেই থাকিবে, লাভের মধ্যে সে মহারাজা সূর্য্যকান্তের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। মহারাজা সূর্য্যকান্তের মত এমন চতুর ও প্রকৃত ভূম্যধিকারী বোধ হয়, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই। তিনিও তাঁহার পিতার পোষ্য পুত্র। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবলে তিনি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা হইয়া ও কেবল মহারাজা হন নাই, তাঁহার অংশের তিন লক্ষ টাকার মুনাফা ছয় লক্ষ টাকা করিয়াছেন, এবং এখনও প্রত্যেক বৎসর উহা বৃদ্ধি করিতেছেন। তিনি যদিও বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ মাজিস্ট্রেট ও পুলিসের ভয়ে অন্যান্য ভূম্যধিকারীদের মত কলিকাতাবাসী, কিন্তু এরূপ শাসন-প্রণালী পরিচালিত করিয়াছেন যে, একটা পয়সার খরচ, কি সামান্য কার্য্যটুক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমতি ছাড়া নিষ্পন্ন হয় না। শুনিয়াছি, গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য, বাড়ী ও জমিদারির খরচের জন্য, তাঁহার নিজ খরচের জন্য, এমন কি, প্রত্যেক বৎসর নূতন জমিদারী ক্রয় করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরগণা নিয়োজিত আছে।

এক পরগণার এক পয়সাও নিয়োজিত ব্যয় ভিন্ন অন্যরূপে ব্যয়িত হইতে পারে না। এমন সুন্দর শাসনপ্রণালী অন্য কোন জমিদারের আছে কি না জানি না। তিনি তাঁহার গৃহীত পুত্রকে পল্লীগ্রামে রাখিবেন কেন? তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা দিতেছেন। তদপেক্ষাও বিদ্যাময়ী দেব্যার বিশেষ আপত্তি যে, ছেলেকে তিনি 'সাহেব' বানাইতেছেন। এই কারণে বিদ্যাময়ী দেব্যার আদেশমতে, মহারাজা সূর্য্যকান্তের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিদানে মহারাজার আদেশমতে, বিদ্যাময়ী দেব্যার কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এই সকল শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। উভয়ের ম্যানেজাররা আমাকে বলিলেন যে, আমি একবার মুক্তাগাছা গিয়া যদি মহারাজকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পত্নী বিদ্যাময়ী দেব্যার কাছে লইয়া গিয়া, উভয়ের মিলন করিয়া দিতে পারি, তবে এই উৎপাত থামিয়া যাইবে। মহারাজা শীঘ্র ময়মনসিংহ আসিবেন। আমি সম্মত হইলাম, এবং প্রস্তাব করিলাম যে, আমি আপাততঃ এই সকল মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিব, এবং তাঁহারা আর এখন কোনও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না, কি মফঃস্বলে কোনরূপ শান্তিভঙ্গের কার্য্য করিবেন না। তাঁহারাও সম্মত হইলেন। আমি তদনুসারে এই দেড়শত মোকদ্দমাও এক হুকুমে খারিজ করিয়া দিলাম। মাজিস্ট্রেট কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টরের মুখে শুনিয়া, আমাকে ডাকাইয়া, বিস্মিত ভাবে এরূপ অন্যায় আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম এবং বুঝাইলাম, যেখানে জমিদার দুজনের মধ্যে এই মনোবাদের দরুন এই সকল ভুয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে এই সকল মোকদ্দমার দ্বারা কি ফল হইবে। অতএব যাহাতে ইহাঁদের মনোমালিন্য দূর হয়, তিনিও তাহার চেষ্টা করিলে এই উৎপাত আর থাকিবে না। তিনি বলিলেন যে, আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। জানিবেন কেমন করিয়া? তাঁহাদের সম্পর্ক 'আর্দালি খুড়া' ও পুলিসের নরাধমদের সঙ্গে মাত্র। তাহা না হইলে আজ বৃটিশরাজ্যে এই হাহাকার উঠিবে কেন? যাহা হউক, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, আমার এই কার্য্যেরও অনুমোদন করিলেন।

এই সকল কৌশলের ফলে মোকদ্দমার সংখ্যা দেখিতে দেখিতে কমিয়া গেল। যেখানে প্রত্যহ চল্লিশ পঞ্চাশখানা দরখাস্ত পড়িত, এখন দশ পনর খানির বেশী পড়ে না। মোক্তারেরা সারি বাঁধিয়া দরখাস্তের সময়ে বসেন ও কার্য্য শেষ হইলে ম্লানমুখে বলেন,—"ধর্ম্মাবতার! ময়মনসিংহে এমন কখনও হয় নাই। অথচ আপনার ত কোনও দোষ দিতে পারি না। আপনি ত কোনও দরখাস্ত ডিস্‌মিস করেন না। লোকে নালিশ না করিলে আপনি কি করিবেন? আচ্ছা পূজার বন্ধের পর দরখাস্তের সংখ্যা আপনি কেমন করিয়া কমান, দেখা যাইবে।" পূজার পরও আমি যত কাল ছিলাম, আর মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। অন্যদিকে পুলিসের দক্ষিণামূলক মোকদ্দমা কয়েকটির রহস্য উদ্ভেদ করাতে পুলিস ধর্ম্মঘট করিল যে, আমি যতদিন ছুটিতে না যাই,—আমি ইতিমধ্যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটির প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তাঁহারা আর 'এ ফর্ম্ম' পাঠাইবেন না, কোনও মোকদ্দমা চালান দিবেন না। 'এ' বিভাগে আমার অধীনে দুইজন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের ও মিঃ সেনের 'ন দিবা ন রাত্রি' খাটিতে হইত। মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে তাঁহাদের একজনকে সরাইয়া লইয়া, কলেক্টর ট্রেজারি-অফিসার করিলেন। আর একজন নব যুবক, আমার সেই মাদারিপুরের সহকারী ডেপুটি, যিনি সেশনে আমার প্রতিকূলে 'দিনারা' মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়া, আমাকে সাক্ষী প্রস্তুত করার অভিযোগে পদচ্যুত করিয়া, জেলে দেওয়ার যোগাড় করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্র। যাহা হউক, সে আমাকে শ্রদ্ধা করিত, আমিও তাহাকে স্নেহ করিতাম। তাহার 'ডিপার্টমেণ্টাল' পরীক্ষা

নিকট। তাহাকে মোকদ্দমা কিছু কম দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলে আমি বলিলাম যে, আমি তাহাকে মোটেও মোকদ্দমা দিব না। সে বিস্মিত হইয়া বলিল,—"অসম্ভব কথা। আপনি একা প্রতিটি বিভাগের কাজ কেমন করিয়া চালাইবেন। আর আমাকে একেবারে মোকদ্দমা না দিলে মাজিস্ট্রেট মনে করিবে, আমাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন। তখন আমার উপর অন্য কাজ চাপাইবে। তাহাতে আমার উপকার না হইয়া বিপরীত হইবে।" আমি এ জন্য সামান্য একটুক কাজ দিতাম। অবশিষ্ট সমস্ত কাজ, ডিষ্ট্রিক্ট চার্জ্জের কাজ সন্ধ্যা আমি বারটা হইতে চারিটার মধ্যে শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতাম। সকলে বলিতে লাগিলেন যে, ময়মনসিংহে এই দৃশ্য কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই।

বড় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিধাতা আমার ভাগ্যে লেখেন নাই। আমি গোলাপটি রোপণ করিলে, বিধাতা তাহাতে একটা কণ্টক ফুটাইয়া দেন। যেখানে যাই, যত সাবধানে থাকি, তথাপি একটা না একটা ঘটনা আসিয়া, উপরিস্থের সঙ্গে একটা ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া দিয়া, আমাকে তাঁহার বিরাগভাজন করে। এখানে এ পর্যন্ত মাজিস্ট্রেট রো সাহেবের সঙ্গে আমার বেশ চলিতেছিল। এই সুখ-শান্তির সময়ে আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। একটি পশ্চিম অঞ্চলবাসী তাহার কন্যা শুদ্ধ পুলিসে উপস্থিত হইয়া কি এক নালিশ করে। পুলিস প্রভু দুজনেই—দুই সবইন্‌স্‌পেক্টর,—একসঙ্গে তাহার 'তদন্তে' সন্ধ্যার সময়ে বহির্গত হন। কন্যাটি নবযুবতী ও সুন্দরী। অতএব সমস্ত রাত্রি তাহাকে তাঁহাদের নৌকায় রাখিয়া 'তদন্ত' করেন। পরদিন প্রাতে এক স্থানে নৌকা লাগাইলে, তাহার অরসিক পিতা রসভঙ্গ বা তদন্তের বিঘ্ন করিলে গোলযোগ হয়। তাহাকে তাঁহারা প্রহার করিয়া, এবং তদুপরি তদন্তের কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকও আদায় করিয়া, পিতাপুত্রীকে তাড়াইয়া দেন। তাহারা কোর্টে আসিয়া মিঃ সেনের কাছে নালিশ করে। পূর্ব্বে ডেপুটিরা পুলিসের ডিঃ সুপারিন্টেন্ডেন্টের প্রতিকূলেও নালিশ লইতে পারিতেন। কিন্তু এখন ইলিয়টি আমলে বোধ হয়, গোপনীয় আদেশ প্রচলিত হইয়াছিল যে পুলিসের বিরুদ্ধে স্বয়ং মাজিস্ট্রেট ভিন্ন আর কেহ নালিশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অতএব মিঃ সেন এই নালিশ মাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাজিস্ট্রেট তদন্ত করিয়া, সবইন্‌স্‌-পেক্টরদ্বয়কে অব্যাহতি ত দিয়াছেনই, তাহার উপর বাদীকে ও তিন সাক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ফৌজদারিতে দিয়া, চার মোকদ্দমা মিঃ সেনের কাছে বিচারের জন্য অর্পণ করিয়াছেন। বাদী জজের কাছে মোসন করিল। ব্রাহ্ম জজ মহাশয় দীর্ঘ রায় লিখিয়া বাদীর নালিশ সমূলক সাব্যস্ত করিয়া, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, তাহার বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, আর মাজিস্ট্রেটের বর্ণ অমল ধবল। অতএব উপসংহারকালে 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, মাজিস্ট্রেটের আদেশ আইনবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার উহা রহিত করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাও ঠিক নহে। বাদীর অভিযোগ যখন সেশনে বিচার্য্য, তখন উক্ত মোকদ্দমা সেশনে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তত দূর সাহসে না কুলাইলে, তিনি মাজিস্ট্রেটের অবৈধ আদেশ রহিত করিবার জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে পারিতেন। আমার কলেজে পড়িবার সময়ে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না।" (তাহার পর গলা ছোট করিয়া)—"জো পাইলে কিন্তু সব সময় ছাড়িও না।" তিনি এখন জীবিত থাকিলে বলিতেন,—"সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দোহাই দিয়া গগন বিদীর্ণ করিও। কিন্তু কেবল জো পাইলে উহা কার্য্যে পরিণত করিও।" 'যা শত্রু পরে পরে'—জজ এই নীতি অবলম্বন করিয়া, এই বিপদ্‌ আমি

গরীব ডেপুটির স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়ে আমি এরূপ অবৈধ মোকদ্দমায় আসামীদের শাস্তি দি, সে পাপ আমার হইবে। আর ছাড়িয়া দি, আমিই ম্যাজিস্ট্রেটের ক্রোধানলে নিক্ষিপ্ত হইব। তাঁহার Conscience (বিবেক) এরূপে তিনি রক্ষা করিয়াছেন। 'জগদম্বা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' আমি তাঁহার রায় পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম, আর এক বিপদ্ দুই দিন না যাইতে আমার মস্তকে পতিত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট এই সকল মোকদ্দমা চালাইতে গবর্ণমেণ্ট প্লিডারকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ময়মনসিংহে এই মোকদ্দমার কথায় আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে দেশ উলট-পালট হইতেছে। অতএব দরিদ্র আসামীদের প্রতি দয়া করিয়া একজন স্থানীয় ব্যারিষ্টার মোকদ্দমাটি বোধ হয় বিনা ফি'সে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশের মোকদ্দমারই বিচার হইল। পুলিসের সবইন্‌স্‌পেক্টর এক জন দীনবন্ধুবাবুর "সন-ইন-ল—সার!" একে ত তাঁহার ইংরেজী বিদ্যা তদ্রূপ, তাহাতে তিনি আবার তোত্‌লা। ব্যারিষ্টার বাঙ্গালায় রসিকতাপূর্ণ প্রশ্ন করিতেছেন, আর সে গম্ভীর ভাবে তোত্‌লাইয়া তোত্‌লাইয়া তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজিতে উত্তর দিতেছে। সে কিছুতেই বাঙ্গালা বলিবে না। কোর্টে একটা হাসির তুফান উঠিয়াছে। এইরূপ একটা গুরুতর অভিযোগ মিথ্যা স্থির করিয়া, ম্যাজিস্ট্রেটের এই গরীবদের ফৌজদারিতে দেওয়ার একমাত্র কারণ—পুলিসের এক 'ষ্টেশন ডাইরি'। তাহাতে লেখা আছে যে, সবইন্‌স্‌পেক্টরযুগল এই মোকদ্দমা তদন্তের জন্য পরদিন প্রাতে রওনা হইয়াছিলেন। বাদী, যে স্থানে তাহাকে প্রাতে নয়টার সময়ে পুলিশ প্রহার করিয়াছিল ও অর্থদণ্ড করিয়াছিল বলিয়া বলিয়াছিল, তাহা ষ্টেশন হইতে পনর কুড়ি মাইল ব্যবধান। অতএব থানা হইতে প্রাতে রওনা হইয়া, সেখানে নয়টার সময়ে নৌকায় পেঁছা অসম্ভব। কাজেই বাদীর নালিশ মিথ্যা। কিন্তু পুলিস প্রভুদের জবানবন্দিতে পরিষ্কার প্রমাণ হইল যে, ষ্টেশন ডাইরিটি সম্পূর্ণ জাল। তাঁহারা উক্তরূপ 'তদন্তে'র উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পর বাহির হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে বাদী গোলযোগ করিয়া বিভ্রাট উপস্থিত করাতে, আত্মরক্ষার জন্য পরদিন প্রাতে রওনা হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। ডায়রির পূর্ব্বের ও পরের লিখিত বৃত্তান্তের দ্বারা ইহা যে জাল, পরিষ্কার প্রমাণিত হইল। ডায়রির অন্যান্য পৃষ্ঠার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, আরও এরূপ মিথ্যা Entry (বৃত্তান্ত) উহাতে লেখা হইয়াছে। এই ডায়রিও যে সময়ে সদর পুলিস আফিসে আসিবার কথা, তাহার দুই দিন পরে আসিয়াছে। এই বিলম্বের কারণও পুলিস প্রভুরা কিছুই দিতে পারিলেন না। যে দিন এই মোকদ্দমার 'রায়' দিব, সে দিন কোর্টে গিয়া দেখি যে, উকিল, মোক্তার ও লোকে কোর্ট পরিপূর্ণ। আমি বাদীকে অব্যাহতি দিয়া, যেই আদেশ প্রচার করিলাম, কোর্টে একটা আনন্দধ্বনি উঠিল। এই মোকদ্দমার বিচার সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্লিডার অন্য তিন মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিতে আবেদন করিলেন। উহা স্থগিত রাখিলাম। কোর্টের ভিড় কমিয়া গেলে আমার সেই নব যুবক ডেপুটি আসিয়া বলিলেন,—"সকলে বলিতেছিল যে, নবীনবাবুর বড়ই সঙ্কট। যদি এরূপ মোকদ্দমায় তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের ভয়ে শাস্তি দেন, তবে তাঁহার যে সুনাম আছে, তাহা নষ্ট হইবে। আর যদি খালাস দেন, তবে তিনি শেষ জীবনে ঘোরতর বিপদে পড়িবেন। ব্লো সাহেবের যেরূপ জিদ্, সে সহজে তাঁহাকে ছাড়িবে না। অতএব আপনি কি করেন, সমস্ত দেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া আপনার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, এখন আপনার যেরূপ জয়ধ্বনি ও এই বিচার লইয়া যেরূপ আন্দোলন উঠিয়াছে, আমাদের অন্য

কোর্টের কাজ বন্ধ হইয়াছে। সকলে বলিতেছে—বাহাদুর ছেলে। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমন দেখিলাম। কিন্তু আপনি বিপদে পড়িবেন। রো সাহেব সহজে ছাড়িবে না।" সন্ধ্যার সময়ে আমার গৃহেও আমলা, মোক্তার ও উকিলের ভিড় হইল। সকলে বলিতে-ছিলেন যে, ডেপুটিদের মধ্যে এই সাহস ও স্বাধীনতা আর কেহ দেখাইতে পারিত না। সকলেরই আমার জন্য কিন্তু আশঙ্কা। তাহা অমূলক হইল না।

রো সাহেব এই সময়ে মফঃস্বলে ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টর তাঁহার আদেশমতে এই মোকদ্দমার ফল তাঁহার কাছে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। তিনিও টেলিগ্রাফ করিয়া নথি তলব দিয়াছিলেন। তিনি মফঃস্বলে যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার ছুটি মঞ্জুর হইলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্টমাসের বন্ধের দিন আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। তাহা হইলে তিন মাস ছুটির উপর আমি কৃষ্ট-মাসের বন্ধও পাইব। তিনি আমার প্রতি এত দূর সদয় ছিলেন। আফিস বন্ধের দিন প্রাতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আগে তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ খুব সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেন। আজ কিছুক্ষণ আরদালি মহাশয়ের সঙ্গে বারাণ্ডায় বসাইয়া রাখিয়া ডাকাইলেন। কক্ষে প্রবেশ করিলে করমর্দ্দন ত করিলেনই না। নগণ্যভাবে বসিতে বলিয়া, এক লাউঞ্জে বসিয়া মহামনো-নিবেশের সহিত 'ইংলিশম্যান' পড়িতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম—বাজি মাৎ। কথাই কহেন না। কয়েক মিনিট পরে আমি বলিলাম যে, আমার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। তাঁহার প্রতিশ্রুতিমতে আমি সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে ছুটিতে যাইতে চাহি। তিনি 'ইংলিশম্যানে' দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন,—বটে! কিন্তু আপনার স্থানে যে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিয়োজিত হইয়াছেন, তিনি কৃষ্টমাসের মধ্যে আসিতে পারিবেন না লিখিয়াছেন। অতএব তিনি না আসিলে আমি ছাড়িতে পারিব না।" আমি—"আমি নিজে পীড়িত। আমার একমাত্র সন্তান চট্টগ্রামে ১০৭ ডিগ্রি জ্বরে ভুগিতেছে। ডাক্তারেরা তাহাকে জল-বাতাস পরিবর্ত্তনের জন্য তৎক্ষণাৎ পশ্চিম লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া থাকিব? তাঁহার আমার প্রতি দয়া করা উচিত।" তিনি—"আপনার ফাইলের অবস্থা কিরূপ?" আমি—"আমার ফাইলে সামান্য কয়েকটি মোকদ্দমা আছে মাত্র। কোনও গুরুতর মোকদ্দমা নাই।" তিনি—এখনও 'ইংলিশম্যানে' দৃষ্টি—"সেই মিথ্যা নালিশের ও মিথ্যা সাক্ষীর চারি মোকদ্দমা কি হইল?" আমি—"বাদীর বিরুদ্ধের মোকদ্দমা মাত্র বিচার করিয়া, আমি আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছি। তিনি বিস্ময়ের সহিত আমার দিকে চাহিয়া —"কেন?" আমি—"আপনি যে পুলিস-ডায়রির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া ইহাদের ফৌজদারিতে দিয়াছিলেন, উহা জাল সাব্যস্ত হইয়াছে। সমস্ত অবস্থা আপনি আমার 'রায়' দেখিলে জানিতে পারিবেন।" তিনি ক্রোধের সহিত আবার ইংলিশম্যানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন,—"আমি অতিশয় সাবধানে বিচার করিয়া ইহাদের ফৌজদারিতে দিয়াছিলাম। অতএব আপনার বিচারের ফল শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।" আমি—"আমি মানুষ। আমার ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। আমি আসামীকে acquit করি নাই, discharge করিয়াছি মাত্র। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহার পুনর্বিচার করাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন আর তিন মোকদ্দমায় আমি হাত দিই নাই। এ সকল মোকদ্দমার এখন অন্য অফিসারের দ্বারা বিচার হইবে।" তিনি নীরব রহিলেন। আমি দেখিলাম, আর বেড়া নাড়িয়া ফল নাই। অতএব আমি দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম যে,—"আপনি যদি আমাকে আজই ছুটিতে যাইতে না দেন, তবে আমার একমাত্র পুত্রের জীবনের জন্য আমি আজই পেন্‌সনের দরখাস্ত করিয়া, চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—আপনার কি

পেন্‌সনের সময় হইয়াছে? আমি আরও দৃঢ়তর কণ্ঠে—"হাঁ! আমার ত্রিশ বৎসরের অধিক চাকরি হইয়াছে। অতএব আমি যে দিন ইচ্ছা, সে দিন retire (অবসর গ্রহণ) করিতে পারি।" তিনি এবার নরম হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা। আপনি আজই ছুটিতে যাইতে পারেন।" আমি তখন ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। আফিসে ছুটির চিঠি-পত্র স্বাক্ষর করিয়া বাসায় যাইতেছি, এমন সময়ে সেই ডেপুটি—আমার ভগ্ন কুটীরে সামান্য কয়েকখানি জিনিস দেখিয়া যাহার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি ছুটিয়া আমার এজ-লাসে আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমাকে সাহেব 'কৃষ্টমাসে'র ছুটি দিয়াছিল। এখন এই আদেশ পাঠাইয়াছে—আমাকে আপনার কার্য্যভার লইতে হইবে। মহাশয়! আমার উপায় কি? আপনি বন্ধের কয়টা দিন থাকিয়া যান।" আমি বলিলাম, তাহা অসম্ভব। তবে আর একজন ডেপুটি যখন থাকিতেছেন, তিনি সে কথা বলিয়া কাঁদাকাটা করিলে তাঁহাকেও যাইতে দিবে। বন্ধের মধ্যে ত আর কোনও মোকদ্দমার বিচার হইবে না।" তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! তাহাও কি পারি? আপনার সাহস কি আমাদের আছে? শুনিলাম, আপনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধমকাইয়া ছুটি লইয়াছেন। কি জানি মহাশয়! আপত্তি করিলে যদি চটে। তবেই ত সর্ব্বনাশ!" আমি বাসায় চলিয়া গিয়া, তৎক্ষণাৎ আমার সেই যুবক ডেপুটির বাসায় চলিয়া গেলাম। সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সেখান হইতে সন্ধ্যার পর ট্রেনে রওনা হইব। শূন্য বাসায় আরদালিকে রাখিয়া, বলিয়া গেলাম যে, সাহেব যদি কোনও চিঠিপত্র পাঠায়, তবে যেন আমি কোথায় চলিয়া গিয়াছি, সে জানে না বলে। আমার ভয়, পাছে আবার এই ডেপুটির কাঁদা-কাটায় আমার যাওয়া বন্ধ করে। ষ্টেশনে গিয়া দেখি লোকারণ্য। আমি চারি মাস মাত্র ময়মনসিংহে ছিলাম। আমি কি করিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রধান উকিলেরা পর্য্যন্ত আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন? ময়মনসিংহ বহু শিক্ষিত লোকের স্থান। এখানের মত যোগ্য ও শিক্ষিত মোক্তার আমি আলিপুরেও দেখি নাই। আমি চারিটি মাস বড় সুখে ময়মন-সিংহে কার্য্য করিয়াছিলাম। কোর্টেও ঠাট্টা তামাসা, গল্পে ও হাসিতে দিন কাটাইতাম। সকলে আমাকে ছুটির পর ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। এবার আমার ঘরের কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, আমি অসুস্থ হইয়াছি। ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারা আমার জন্য Lowther Castle, কি এরূপ নামযুক্ত একটি সুন্দর বাড়ী নিযুক্ত করিবেন বলিলেন। আমার কাছেও ময়মনসিংহ নগর ও স্থানীয় ভদ্রসমাজ বড় ভাল লাগিয়া-ছিল। অতএব আমারও ফিরিয়া যাইবার বড় অনিচ্ছা ছিল না। তবে মানুষের আশা, কয়টিই বা সফল হয়? ট্রেনের সময় হইয়াছে: তাঁহারা বড় শ্রদ্ধার সহিত বিদায় দিতেছেন। এমন সময়ে সেই ডেপুটি তাঁহার একমাত্র সম্বল সেই ক্ষুদ্র ট্রাঙ্ক হস্তে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমার পরামর্শমতে কার্য্য করাতে তাঁহাকে সাহেব ছুটি দিয়াছেন। অতএব আমারও একটা আশঙ্কা দূর হইল। তিনি তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! ষ্টেশনে এই ভিড় কি আপনার জন্য? আপনাকে বিদায় দিতে ময়মনসিংহ ভাঙ্গিয়া এত ভদ্রলোক আসিয়াছেন? মহাশয়! আপনি ত সহজ লোক নহেন! চার মাসে আপনি এরূপ popular (লোকপ্রিয়) হইয়াছেন! আপনি অসাধারণ লোক!" সকলে হাসিতে লাগিলেন। ট্রেন খুলিল, বাহ্য জগতের মত মানব-জীবনেও ছায়ালোক আছে। চট্টগ্রামের সেই বিপদের ছায়ার পর, আমার জীবনের এই একটা আনন্দালোক-পূর্ণ ক্ষুদ্র অঙ্ক ফুরাইল।

প্রাণান্ত পীড়া

জানি না, মস্তিষ্কের সঙ্গে মূত্রাশয়ের কি সংস্রব। ফেনীতে 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' লিখিবার সময়ে ঘন ঘন প্রস্রাব হইত। আমি মনে করিতাম, সাহিত্যসেবীদের মহাশত্রু 'বহুমূত্র' আমার প্রতিও কর প্রসারণ করিতেছে। রাণাঘাটে 'অমিতাভ' রচনার সময়ও এরূপে কাটিয়া গেল। কলিকাতায় 'প্রভাস' লিখিবার সময়ও এরূপ হইলে ডাক্তার মেকোনেলের কাছে গেলাম। তিনি কেমিক্যাল একজামিনারের দ্বারা প্রস্রাব পরীক্ষা করাইলেন। কোনও দোষ পাওয়া গেল না। তিনি বলিলেন, Constipation-এর দরুন এরূপ হইতেছে। সহোদরসম স্বনামখ্যাত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনও তাহাই বলিলেন। তাঁহার সহিত কি শুভ ক্ষণে দেখা। কলিকাতা আসিবার পর প্রথম দর্শন হইতেই তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। বিজয়রত্ন একজন দেবচরিত্রের লোক। আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তিনিও ডাক্তার নীলরতন সরকারের মত রোগী দর্শনে শ্রান্ত হইয়া, রাত্রি আট নয়টার সময়ে আমার গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন ও নানা আলাপে কাটাইতেন। দুই পরিবারের মধ্যেও পরম আত্মীয়তা হইল। ডাঃ মেকোনেল ও বিজয়রত্ন অনেক ঔষধ দিলেন, কিছুই ফল পাইলাম না। জনৈক রসিক বন্ধু বলিলেন, 'ব্লটিং পেপার' খাও। কেহ কেহ বলিলেন, কলিকাতার কলের জল ও কয়লার রান্না এই রোগের কারণ। কলিকাতা ছাড়িলেই এ উপদ্রব সারিয়া যাইবে। কলিকাতা পরিত্যাগের ইহাও এক কারণ। চট্টগ্রামে বদলি হইয়া আসিলে, সিভিল সার্জ্জন ডাঃ ড্রুরি (Dr. Drury) এ জন্য কতকগুলিন বিস্বাদ 'জারমন ওয়াটার' খাওয়াইলেন। সুহৃদ তারাচরণ কবিরাজ তাহার পর তাঁহার 'সোমরস', 'সূর্য্যরস', সকল রসই সেবন করাইলেন। কোনও ফল হইল না। ময়মনসিংহে দারুণ শীত। তাহাতে কুটীরের চাটাইয়ের বেড়ার সহস্র ছিদ্র দিয়া শীত অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, কেবল এই রোগ বৃদ্ধি করিল এমন নহে, সময়ে সময়ে প্রস্রাব বন্ধ হইত। কখন বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইতে লাগিল সিভিল সার্জ্জন ডাঃ এস্ (Ash)। প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই আমি কেমন তাঁহার সুনজরে পড়িলাম। তিনি লোকের কাছে বলিতেন যে, আমি অন্যান্য ডেপুটিদের মত নহি। আমি উচ্চজাতীয় লোক। "He belongs to a higher caste"। আমার কুটীরের সম্মুখ দিয়া তাঁহার জেলের পথ। তিনি জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে রোজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নানাবিধ খোসগল্প করিতেন। তিনি আমার এরূপ পক্ষপাতী ও অনুরাগী হইলেন যে, আমার স্বকল্পিত 'রাইটিঙ্গ টেবল' ও 'রাইটিঙ্গ সোফা'র নকল প্রস্তুত করাইয়া আমার নিদর্শনস্বরূপ রাখিলেন। আমি উহাদের উপহার দিতে চাহিলে বলিলেন, তিনি তাহা লইবেন না। আমি এই টেবিলে কাগজ রাখিয়া ও এই সোফায় বসিয়া আমার কাব্যাবলি রচনা করিয়াছি। অতএব এই দুটি আমার পুত্রের প্রাপ্য, এবং তাহার দ্বারা দেব-প্রসাদের মত আমার গৃহে রক্ষিত হইবে। আমি বলিলাম, এই টেবিলে আমার সকল কাব্য রচিত হয় নাই। আমার ফেনীর টেবিল সোফা একজন ইংরাজ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমার নিদর্শনস্বরূপ জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিলাম, তিনি ফেনী হইতে যাইবার সময়ে আমার এই দুই চিহ্ন সঙ্গে করিয়া বিলাত লইয়া গিয়াছেন। এই সকল গুণেই ত ইংরাজ আমাদের প্রভু। একজন বাঙ্গালী কবির একটুক নিদর্শন রাখিতে ইহাঁদের এত আগ্রহ! কই, কোনও বাঙ্গালীকে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে ত দেখি নাই। আমি তাঁহাকে আমার রোগের কথা বলিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতেন,—"আপনার বয়স প্রায় আমার ডবল। আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ আপনি এখন যাবৎ প্রকৃতই 'নবীন'। অতএব আপনার শরীরে কোনও

রোগ আছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। উহা আপনার কবি-কল্পনা মাত্র। আমি জানি, আপনি ময়মনসিংহে কখনও থাকিবেন না। আপনি যখন ছুটির সার্টিফিকেট চাহেন, আমি তখনই দিব। রোগের ছলনার প্রয়োজন নাই।” কিন্তু ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতেছে ও আমি কাতর হইতেছি দেখিয়া তিনি ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, এবং তিন মাস ছুটির সার্টিফিকেট দিলেন। কেবল তাহাই নহে, চিফ সেক্রেটারি মিঃ বোল্টন ছুটি মঞ্জুর করিতেছেন না; তাঁহার বিশ্বাস, আমি ময়মনসিংহে বদলিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পাশ কাটাইতে চাহিতেছি। তখন ডাঃ এস্ এক তীব্র সার্টিফিকেট দিয়া, আমাকে তৎক্ষণাৎ ছুটি দেওয়ার জন্য লিখিলেন। এবার মিঃ বোল্টন নাচার হইয়া ছুটি মঞ্জুর করিলেন। ময়মনসিংহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। নারায়ণগঞ্জে ট্রেন ভোর পাঁচটার সময়ে পঁহুছিল। একে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগের শীত, তাহাতে নারায়ণগঞ্জে তিনটি বিস্তৃত মহানদনদীর সঙ্গম। ট্রেনের দ্বারগবাক্ষ খুলিলে শীতে কম্প উপস্থিত হইল। ‘কৃষ্টমাসে’র বন্ধের ভিড়, কুলি পাওয়া কঠিন। ভৃত্যকে কয়েকটি ট্রাঙ্ক লইয়া আগে পাঠাইলাম। উহা একখানি প্রথম শ্রেণীর কেবিনে রাখিয়া, আবার আসিতে বলিলাম। তাহার আর দেখা নাই। ময়মনসিংহের বহু আমলা উকিল মোক্তার এই ট্রেনে আসিয়াছেন। তাঁহারা সাহায্য করিয়া, আমার সমস্ত জিনিসপত্র আমার জাহাজে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কই, আমার ভৃত্য ও পূর্ব্বপ্রেরিত ট্রাংক সকল কোথায়? তিনটা ‘ষ্টীমার’ পাশাপাশি রহিয়াছে। তিনটা তিন দিকে যাইবে। এই দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি তিন ষ্টীমারে ঘুরিয়া ভৃত্যকে খুঁজিতে লাগিলাম। ডাকিতে ডাকিতে গলা ফাটিয়া গেল। সেই মহাহট্টগোলের মধ্যে কে কার কথা শুনে। প্রায় ঘণ্টাখানিক এরূপে দারুণ শীত ভোগ করিয়া তাহাকে পাইলাম। সে ট্রাঙ্ক লইয়া, ময়মনসিংহের কলেক্টরের সেরেস্তাদার চট্টগ্রামবাসী আমার এক বন্ধুর কাছে নিশ্চিন্তে বসিয়া তামাকুট সেবন করিতেছে। চাঁদপুরে পঁহুছিয়া ট্রেন পাইলাম না। আমার প্রেমাস্পদ খুড়তত ভ্রাতা মুন্সেফ তারাচরণের অতিথি হইয়া, আর একটা দিন দুর্গোৎসবের আনন্দে কাটাইলাম। রাত্রি নয়টার সময়ে ট্রেনে গেলে, আমার স্বদেশীয় এক ডেপুটি বেঙ্গল আফিসের ছোট চিত্রগুপ্ত মহাশয়কে আনিয়া আমার হাতে দাখিল করিয়া দিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইতেছেন। তাঁহাকে আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে তুলিলাম। ট্রেন উষার সময়ে সীতাকুণ্ড পঁহুছিয়াছে। আমরা নিদ্রিত। ডেপুটি মহাশয় আসিয়া আমাদের কক্ষের সমস্ত গবাক্ষ খুলিয়া বলিতেছেন,—“উঠুন! চন্দ্রনাথ ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের শোভা দেখুন!” যেই আমরা বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, আর যেন শরীরে তুষারবৃষ্টি হইল। ছোট চিত্রগুপ্ত ও আমি শীতে কম্পিতকলেবর হইয়া তাড়াতাড়ি গবাক্ষ বন্ধ করিলাম। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ও এখানের অকস্মাৎ শীতভোগে আমার রোগ বৃদ্ধি হইল। আমি ঘন ঘন ‘ওয়াটার ক্লসেটে’ যাইতেছি দেখিয়া বন্ধু ব্যাপারখানা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম,—আমার অবস্থা এই। তথাপি আপনার বোল্টন সাহেবের বিশ্বাস যে, আমি ছলনা করিয়া ছুটি লইয়াছি। প্রাতে চট্টগ্রাম পঁহুছিয়া, বন্ধুকে লইয়া, পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়া, চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখাইলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এবং কুয়াসায় সূর্য্যদেব অদৃশ্য। তাহাতে মাঘ মাসের পাহাড়ের বাতাসে আবার দুই ঘণ্টা শীতভোগ করিলাম। পল্লীগ্রামের বাড়ীতে পুত্র পীড়িত। আমার পাহাড়ের বাড়ীতে দিনটা কাটাইয়া, সন্ধ্যার জোয়ারে বাড়ী ছুটিলাম। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত আবার শীতভোগ করিয়া বাড়ী পঁহুছিলাম। আহার করিয়া উঠিলে এরূপ উপর্য্যুপরি শীতভোগ নিবন্ধন প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল,

ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। গ্রাম ভাঙ্গিয়া বংশীয়গণ, ব্রাহ্মণ ও প্রজারা ছুটিয়া আসিল। আমাদের মগজাতীয় প্রজারা হস্‌পিটালের কম্পাউন্ডারি করিয়া ডাক্তারি করে। তাহাদের একজন আসিয়া বলিল, 'কেথিটার' পাশ করিতে হইবে। এ রোগ ও কেথিটারের নামও কখন শুনি নাই। কিন্তু এরূপ যন্ত্রণা, যেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইবে। পত্নী পুত্র পরিবারবর্গের রোদনের ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ। অগত্যা 'কেথিটার পাশ' করিতে দিলাম। 'মূর্খ বৈদ্য সমো যমঃ'—সে কেথিটার পাশ করিতে জানে না, রক্তপ্রবাহ ছুটাইল। রাত্রি প্রভাত হইলে চট্টগ্রাম সহরে রওনা হইলাম। বুঝিলাম, ইহা আমার অগস্ত্য-যাত্রা। পীড়িত পুত্র ও পত্নী অন্য দুই পাল্কিতে সঙ্গে চলিলেন। সমস্ত পথ উন্মাদের মত পাল্কি হইতে যন্ত্রণায় এক এক বার দুই চার মিনিট পরে লাফাইয়া পড়িতেছিলাম। এরূপ ভাবে নয় ঘণ্টাকাল প্রত্যেক সেকেণ্ডে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে বেলা তিনটার সময়ে সহরে হস্‌পিটালে গিয়া পঁহুছিলাম, এবং এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন বাবু কালীপ্রসন্ন কুমার কেথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইলেন। ঠিক যেন আগুনে জল পড়িল। চক্ষের পলকে সকল যন্ত্রণা নিবিয়া গেল। এ যেন যাদুকরের খেলা। হাসিতে হাসিতে আমার পাহাড়ের বাড়ীতে গেলাম।

কলিকাতায় একদিন সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ বিজয়রত্ন বলিলেন যে, আমার 'কুরুক্ষেত্র'কে যাত্রা করিয়া, ভূষণ দাসের দল গাইতেছে। তিনি উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে, আমাকে উহা একদিন শুনিতে হইবে। প্রথিতনামা চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে গানে বিজয়রত্ন স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি বালক অভিমন্যুর অদ্ভুত অভিনয় করিতেছে। সে ঠিক যেন আমার কল্পনার অভিমন্যু। তাহার যেরূপ মধুর কণ্ঠ, সেরূপ সুন্দর দীর্ঘ মূর্ত্তি, তেমনই বিষাদগাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখশ্রী, এবং তেমনই গৌরবব্যঞ্জক দেহভঙ্গি। এরূপ অভিনেতা কোনও রঙ্গালয়েও দেখি নাই। সে এই যাত্রাদলের প্রাণ। যাত্রা আগাগোড়া কীর্ত্তনের সুরে বাঁধা। শুনিলাম একজন গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত 'কুরুক্ষেত্র' হইতে এ যাত্রা রচনা করিয়াছেন। তিনি যদিও স্থানে স্থানে 'কুরুক্ষেত্রে'র উপর হাত চালাইয়া, যাত্রার অধিকারীর মত দুই একটা দৃশ্য দিয়া রসভঙ্গ করিয়াছেন, এবং সুভদ্রার শোকের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া সেই সর্গ একেবারে মাটি করিয়াছেন, তথাপি 'কুরুক্ষেত্রে'র ভাষা ও ভাব লইয়া এমন মধুর কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন যে, তাহাতে পাষাণ দ্রব হয়। গঙ্গা-প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীবাবুর আদরের ও আহারের আব্‌দারে যদিও আমি যাত্রাটি ভাল করিয়া শুনিতে পারিলাম না, তথাপি যাহা শুনিয়াছিলাম, বিশেষতঃ অভিমন্যুর অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি ময়মনসিংহ থাকিবার সময়ে টাঙ্গাইলের এক যাত্রার দল ভূষণ দাসের এই পালা গাহিতেছিল, এবং এক মাস যাবৎ প্রত্যহ ময়মনসিংহ অশ্রুজলে প্লাবিত করিতেছিল। যদিও প্রত্যেক স্থানে আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তথাপি কোনও কারণবশতঃ প্রথম যে বাসায় গান হয়, সে বাসায় গিয়াছিলাম না বলিয়া, অন্য বাসায়ও গেলাম না। কিন্তু সকলে আমাকে একবার এই যাত্রা শুনিতে জিদ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মুখে গানের প্রশংসা ধরিতেছিল না। এমন সময়ে সুহৃদ্‌বর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আবকারি পরিদর্শন উপলক্ষে—হাস্যরসিকের উপযুক্ত কার্য্য!—ময়মনসিংহে আসিয়া দুই দিন আমার সঙ্গে কাটান। তিনি ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহের একটি যুবকের গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। এবার আসিয়া তাহার গান শুনিতে চাহিলে আমি তাহাকে ডাকাইলাম। সে 'কুরুক্ষেত্রে'র কোনও গান গাইতে পারে কি না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বিস্মিত হইলাম, তিনি এ গান কোথায়

শুনিলেন। তিনি বলিলেন, ভূষণ দাসর এই পালা লইয়া কলিকাতা তোলপাড় হইতেছে। এমন কি, 'সংগীতসমাজে' ও রবিবাবুদের বাড়ীতে পর্যন্ত এই যাত্রা হইয়াছে। সেই অভিমন্যুর অভিনয় দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'সংগীতসমাজ' তাহাকে রাখিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ছাড়িয়া আসিলে, তাহার উপকারী ভূষণ দাসের দল ভাঙ্গিবে বলিয়া, সে এই কৃতঘ্নতা করিতে অসম্মত হইয়াছে।' পরে শুনিলাম, কুচবেহারের মহারাজ এই যাত্রা উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি শুনিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের দল হইতে উক্ত যুবক মাত্র দুটি গান শিখিতে পারিয়াছে বলিলে, দ্বিজেন উহা শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সে তখন সেই দুটি গীত গাহিল। আমার অশ্রু ধারায় প্রবাহিত হইল। দুই গান এত সুন্দর ও এমন করুণরসের উচ্ছ্বাসপূর্ণ যে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। অভিমন্যু যুদ্ধে যাইতে উত্তরার কাছে বিদায় চাহিয়া গাইতেছেন,—

গীত

১

হে কৃষ্ণ ! কেশব ! হরে !
অনাথনাথ ! দীনবন্ধো !
করুণাসিন্ধো ! মুরারে !

২

আজি এ অনাথা
পাইল বিষম ব্যথা,
হাসি-কথা বিনে কিছু জান্‌তো না,—
কোমল কুসুম হৃদি,
কেন দুঃখ দিলে বিধি?
নিরবধি আনন্দ কি রহে না?

৩

দেখ লো উত্তরে, আমার
কাঁপে হৃদি মরমাধার,
এমন সজল নয়নে তুমি থেকো না।
পুতুল সাজায়ে,
থাক খেলা ল'য়ে, তুমি কেঁদো না।
আমি আসিব,—আসিব,—আসিব,—
তুমি কেঁদো না।
পুতুল সাজায়ে
থাক খেলা লয়ে, তুমি কেঁদো না॥
তবে যাই,—যাই,—যাই,—
তুমি কেঁদো না।

৪

আরও বলি শুন সতি!
মা আমার করুণাবতী ;
কাছে থেকো, মা যেন কাঁদে না।

৫

বিদায় সাঙ্গ হলো,—
হরি! দেও এখন পথের সম্বল।
(হরি! তোমার কর্ম্মে প্রাণ সঁপেছি।)
এ অনাথা বালিকা রইল,
স্থান দিও চরণে তারে।

দ্বিতীয় গীত, অভিমন্যু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তিম সময়ে গাহিতেছেন,—

গীত

১

আজি সাঙ্গ হ'ল রে আমারি জীবন!
অনন্ত সাগরে কাল-নীরে ধীরে নিমগন।

২

আমার আমিত্ব ল'য়ে
চলিলাম বিদায় হ'য়ে,
বিস্মৃতির তলে যাব অনন্তে মিশিয়ে।
যেমন জলে হয়, জলে লয়,
জলে পয়োবিম্ব যেমন।

৩

পাণ্ডব-শিবিরে সুত!
যেও যেও যেও ফিরে!

যেন পাণ্ডবের তেজ না ভেসে যায়
আঁখি-নীরে।
আমার মরণকথা,
শুনে যদি পান ব্যথা,
ব'লো, আমি দিয়েছি প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের তরে।
যেও ভদ্রা-মায়ের কাছে,
ব'লো, অভি তোমার ভাল আছে,
সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে দিয়ে,
অভি তোমার ভাল আছে।
আমি ষোড়শ বৎসরে
ষোড়শোপচারে,
পূজিনু কৃষ্ণনিধিরে।

৪

আদরিণী উত্তরারে দিও আমার এই মালা।
সে যে হাসি-তরঙ্গিণী,
হয় ত হাসছে এত বেলা।
তারে খেল্‌তে ব'লো পুতুলখেলা।
(আবালবৃদ্ধ সবাই খেলে,
তারে খেল্‌তে ব'লো পুতুলখেলা।)
খেলা সাঙ্গ হলে,
সবাই যাবে চলে,
কেহ ত্বরা, কেহ ধীরে।

৫

এস সূত! এস কাছে,
আমার অনেক কথা বলবার আছে,
হৃদয়ের গুপ্ত দ্বার কে যেন খুলেছে।
আমার এ মিনতি পদে,
যেন পরপদে,—
কৃষ্ণপদে,—হয় রে মিলন।

গ্রামের বাড়ী হইতে চট্টগ্রাম সহর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ যখন মুহূর্ত্তেক যন্ত্রণার একটুক বিরাম হইত, আমি কখন বা—"হে কৃষ্ণ! কেশব! হরে!" কখন বা—"আজি সাঙ্গ হ'ল রে আমারি জীবন" গাইতেছিলাম। হস্‌পিটাল হইতে পাহাড়ের বাড়ীতে আসিয়া দুটি গান পত্নী পুত্রকে শুনাইলাম। তিন জনের অশ্রুতে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। এ রোগের সময়ে এই দুটি গান বরাবর আমার মুখে ছিল। সিবিল সার্জ্জন ডাঃ ড্রুরি দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেই মগ কম্পাউণ্ডার কেথিটার দিতে ভুল করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ফৌজদারিতে দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিয়া থামাইলাম। বলিলাম, সে আমার প্রজা। সে আমার ভালোর জন্যই করিয়াছিল। তাহার শিক্ষার অভাবে হিতে বিপরীত হইয়াছে। রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভুল পথে কেথিটার গিয়া ঘা করাতে মূত্রাশয়ে ফোড়া (abcess) হইল। আমার এই বাড়ী হস্‌পিটাল হইতে দূর বলিয়া, ডাঃ ড্রুরি আমাকে হস্‌পিটালের নিকটে এক বাড়ীতে লইলেন। এত বৎসর পরে তাঁহারা পরীক্ষার দ্বারা আমার প্রকৃত রোগ 'মূত্রাঘাত' বলিয়া নির্ণয় করিলেন। ডাক্তার বলিলেন যে, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়সের পর মূত্রাশয়ের মুখের একটা শিরা (prostate gland) বড় হয়, এবং তাহাতে প্রস্রাব অবরোধ করাতে ঘন ঘন অল্প প্রস্রাব হয়। এই কারণেই যে আমার এত কাল এইরূপ হইতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। কোনওরূপে বেশী হিম লাগিলে এই শিরা আরও বেশী ফুলিয়া উঠে। তাহাতে আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। রোগ আরও বৃদ্ধি হইল। একদিন হঠাৎ খুব কম্পের সহিত জ্বর আসিল। আমার জীবনের আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়া, ডাক্তার ড্রুরি ও কালীপ্রসন্নবাবু অত্যন্ত যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার সাহেব দিনে কত বার আসিতেন। এমন কি, দুপুর রাত্রিতেও একা এক লণ্ঠনহাতে উপস্থিত হইতেন। দেশে একটা হাহাকার পড়িল। বলিয়াছি, দুই চারি জন হঠাৎ-অবতার শিক্ষিত মহাশয়েরা ছাড়া দেশের আপামর সাধারণ আমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে। শুনিয়াছিলাম, সর্ব্বপ্রধান উকিল গবর্ণমেণ্ট প্লীডার না কি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কেহ মরিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি মরিলে চট্টগ্রাম শত হাত রসাতলে যাইবে। শত শত লোক প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এ দিকে ডাক্তার সাহেব আমার

স্ত্রী পুত্রকে পর্য্যন্ত আমার কক্ষে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। শুনিলাম, লোকে কালী-প্রসন্নবাবুর ও আমার বাসার লোকের পায়ে পড়িয়া বলিতেছিল—"আমরা কথা কহিব না, কেবল একটুক দেখিয়া আসিব।" ডাক্তার সাহেব তাহাতেও অসম্মত। লোকের এই শ্রদ্ধার কথা শুনিয়া আমি রোগশয্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতাম, প্রাণে একটুক শান্তি পাইতাম। আমি যে চট্টগ্রামের জন্য বারম্বার বিপদাপন্ন হইয়াছি, সার্ভিসে উন্নতির আশা বলিদান দিয়াছি, এত দিনে তাহার প্রতিদান পাইলাম। আমি ডাক্তার সাহেবকে নিজে অনুনয় করিয়া বলিলাম যে, তাহাদের কক্ষদ্বার হইতে আমাকে দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিন। তিনি বরং চটিয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রি এগারটার সময়ে তিনি অকস্মাৎ লণ্ঠন-হস্তে উপস্থিত। নির্ম্মল কক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"Who are you?" (তুমি কে?) তিনি "Get away! Get away!" (চলে যাও! চলে যাও!) বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, আমার পুত্র। তিনি ক্রোধের সহিত বলিলেন—"আপনার পুত্র হউক, আর যে হউক, আপনি যদি এরূপে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তবে আমি আপনার চিকিৎসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, আপনার জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে।"

যাহা হউক, ডাক্তার ড্রুরির যত্নে ও চিকিৎসায় আমার জীবন রক্ষা পাইল। চারি পাঁচ দিন পরে জ্বর ত্যাগ হইল। তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি আমাকে ও আমার পরিবারকে বলিলেন, আর আশঙ্কা নাই। ক্রমে স্ত্রী পুত্র ও পরিবারবর্গকে, তাহার পর বন্ধুবান্ধবকে মাত্র কক্ষে আসিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু আমার প্রতি তীব্র আদেশ যে, আমি বেশী কথা কহিতে পারিব না। ইহা আমার রোগযন্ত্রণা হইতেও অধিক হইল। মেনেণ্টির পতনের সহিত দেবতুল্য মিঃ কলিয়ার আবার কমিশনর হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কয়েক মাসের জন্য মাত্র পাটনা না গেলে আমার এত বিপদ্ ঘটিত না। তিনি আমার রোগের সংবাদ পাইয়াই আমাকে পত্র লেখেন। তাহার পর প্রত্যহ দুই তিন বার লোক পাঠাইয়া খবর লইতেন। ডাঃ ড্রুরির কাছে আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে শুনিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া আবার পত্র লিখিলেন। এই সময়ে ভদ্রলোক মাত্রই আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আসে নাই কেবল সয়তানদাস। সে পথে ঘাটে আমার ভাইদের গলায় পড়িয়া কাঁদিয়া বলিত—"নবীন আমার আশৈশব বন্ধু। আমার কত উপকার করিয়াছে। তাহার এই ব্যারাম, আমি একটুক দেখিতে যাইতেও পারিতেছি না। কারণ, সে আমার উপর অনর্থক চটিয়াছে। আমার এবার রক্ষা নাই।" এই বলিয়া সে অশ্রু মুছিত। আমার ভাইয়েরা তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইত। কিছুদিন পরে আমি আমার পাহাড়ের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেলে ডাঃ ড্রুরি আমাকে জল-বাতাস পরিবর্ত্তন জন্য বৈদ্যনাথ যাইতে উপদেশ দিলেন। আমি স্ত্রীপুত্র সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইলাম। ডাঃ ড্রুরির ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। তিনি আমার জীবনদাতা। তিনি আমার জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, যেরূপ যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, এই মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ দেখাইয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসক-সম্প্রদায়ে দুর্লভ। তাঁহার সেই সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলেই, তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত সস্নেহ রসিকতাব্যঞ্জক কথা শুনিলে, আমার রোগের আপনিই যেন শান্তি হইত। তিনি শেষে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেন—"Well, your water-works all right?" (তোমার জলের কল ঠিক চলিতেছে?) তার পর বহুক্ষণ কাছে বসিয়া, আমার মাথায় ও পায় হাত বুলাইয়া কত গল্প করিতেন। এই সময়ে একদিন আমাকে বেঙ্গলীর সেই 'রায় বাহাদুরের জন্মবৃত্তান্ত' প্রবন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এবং উহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তিনি আমার কাছে

একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। একটি উপহার দিতে চাহিলে, তাহাও লইতে অসম্মত হন। বলেন, আমি 'গেজেটেড অফিসার'। অতএব তিনি গবর্ণমেণ্টের রুলমতে আমার কাছে কিছু লইতে পারেন না। ডাক্তার ব্রুরি! তুমি দেবতা, কি মানুষ তোমার পবিত্র নাম এই পরিবারে পুরুষানুক্রমে দেবতার মত পূজিত হইবে।

ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আমার কি আড়াআড়ি আছে, জানি না। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক। বোধ হয়, এই অপরাধে তিনি চিরদিন আমার স্থানান্তরে যাইবার সময়ে বিশেষ কৃপা করেন। চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত সমস্ত রাত্রি জানুয়ারি মাসের শেষে ঝড় বৃষ্টি হইল। তাহাতে ট্রেনে হিম লাগিয়া, কলিকাতা পঁহুছিবামাত্র আমার আবার রোগ বৃদ্ধি হইল। এখানে ডাক্তার চার্লস্ চিকিৎসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই অবস্থায় তিনি আমাকে বৈদ্যনাথ যাইতে দিতে পারেন না। এ জন্য এক পক্ষ কলিকাতা থাকিয়া, আবার কিছু সুস্থ হইয়া, আমি বৈদ্যনাথ গেলাম। কলিকাতায় প্রত্যহ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ দয়া করিয়া আমাকে দেখিতে আসিতেন। রোগশয্যায়ও তাঁহাদের সহানুভূতিতে আমি যথেষ্ট শান্তি পাইয়াছিলাম। বৈদ্যনাথ যাত্রার পূর্ব্বে একদিন চিফ সেক্রেটারি মিঃ বোল্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমার রুগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, আমি এরূপ পীড়িত হইয়াছি, তিনি তাহা মনে ভাবেন নাই। আমি বলিলাম, আমার এই গুরুতর পীড়ার কারণ তিনি। তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, আমাকে চট্টগ্রাম হইতে বদলি করিবেন না, সেখান হইতে পেন্সন লইতে দিবেন। অথচ দুই বৎসর না হইতেই তিনি অকস্মাৎ একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, মেনেণ্টির মিথ্যা দোষারোপ শুনিয়া, আমাকে ময়মনসিংহ বদলি করিয়া, আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। আমি বলিলাম, আমার চট্টগ্রামে মহাজনির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কাগজপত্র তাঁহাকে দেখাইতে আসিয়াছি। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আমি কোনও কাগজ দেখিতে চাহি না। মিঃ মেনেণ্টির সে সকল কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। কেবল আপনি স্থানীয় লোক, কমিশনরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে আর বেশী দিন চট্টগ্রামে রাখা উচিত নহে বলিয়া, আপনাকে বদলি করিয়াছিলাম। আমার সেই প্রতিশ্রুতি ভুলিয়াছিলাম। তবে বদলি আপনার রোগের কারণ নহে। আপনার রোগের কারণ, চট্টগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জল বাতাস। ডেপুটিদের একটা দোষ আছে। ইচ্ছামতে একটা স্থান পাইলে মরিলেও তাহা ছাড়িতে চাহে না। বঙ্কিমবাবুর জামাতা রাখাল এরূপে বারাসতে থাকিয়া, বদলির ভয়ে ছুটি না লইয়া, জীবন হারাইয়াছে।" তিনি তাহার পর আমাকে বলিলেন—"যাহা হউক, সে সকল কথায় এখন প্রয়োজন নাই। আপনার শরীরের অবস্থা বড় শোচনীয়। আপনার জীবন কেবল সার্ভিসের জন্য নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্যও অত্যন্ত মূল্যবান। আপনি এখন বৈদ্যনাথ গিয়া স্বাস্থ্য লাভ করুন। তাহার পর আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে সে স্থানে বদলি করিব।" স্ত্রীপুত্রের, পরিবারের ও আত্মীয়বর্গের নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমি কুমিল্লায় বদলি হই। কুমিল্লার স্বাস্থ্য ভাল। উহা পূর্ব্ববঙ্গের দার্জিলিঙ বলিয়া খ্যাত। কুমিল্লা চট্টগ্রামের খুব নিকট। রেলে পাঁচ ঘণ্টার পথ মাত্র। অতএব আমি কুমিল্লা চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"হাঁ, কুমিল্লা বেশ জায়গা। আপনার ছুটি শেষ হইলে আপনি আমাকে পত্র লিখিবেন। আমি আপনাকে কুমিল্লায় বদলি করিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বৈদ্যনাথ চলিলাম।

বৈদ্যনাথ

প্রাতের ট্রেনে হাওড়া হইতে রওনা হইয়া, ঠিক সন্ধ্যার সময়ে বৈদ্যনাথ পঁহুছিয়া, ভারতের খ্যাতনামা কৃতী পুত্র শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গেলাম। তিনি তখন

বৈদ্যনাথে ছিলেন না। গৃহ শূন্য পড়িয়াছিল। রাত্রিতে দারুণ শীত লাগিল। তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি, গৃহখানি লোমশ মুনির আশ্রম-বিশেষ। কপাটের শার্সি নাই বলিলেও চলে। তাহার স্থানে ভারতবর্ষের নানা স্থানের সংবাদপত্র, কোথায় বা পূর্ণ লগ্ন, কোথায় বা অর্দ্ধলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং প্রাচীর ও গৃহতল নিষ্ঠীবনাদি বহু উপাদেয় পদার্থে রঞ্জিত। মতি ভায়ার কাছে সেই প্রাতেই লিখিলাম যে, এই গৃহখানি ভারতের কেবল রাজনৈতিক মহাতীর্থ নহে, কেবল এখানে রচিত বিচক্ষণ প্রবন্ধাদিতে রাজপুরুষগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তোপের গোলার মত পড়ে, তাহা নহে; 'অমিয় নিমাইচরিতে' যে অমিয় প্রেমের প্রবাহ বহিয়া স্বদেশে বিদেশে সংখ্যাতীত নর-নারীর হৃদয় জুড়াইতেছে, এই ক্ষুদ্র গৃহখানি তাহারই গঙ্গোত্তরী। অতএব ইহাকে তাঁহাদের একটি দেবালয়, কিম্বা বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাষায় 'কুঞ্জ' করিয়া রাখা উচিত। মতি লিখিলেন, তাঁহারা দরিদ্র লোক। গৃহের এরূপ অবস্থা তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট। মতি ভায়ার এই কথাটা অবশ্য ঠিক নহে। তাঁহারা অতুল সম্পত্তির অধিকারী। আসল কথা, শ্রীভগবান্ যাঁহাদের প্রতিভা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়ই বীতরাগ করেন। আমি শিশিরবাবুকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, আমার ইচ্ছা হইল যে, ঘরখানি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া ও তাহার চারি দিকে উদ্যান বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া, —স্থানটি অতি সুন্দর—ইহার নাম 'অমিয়-নিমাই-কুঞ্জ' রাখি। যাহা হউক—দেখিলাম, আমার এই গৃহে থাকা অসম্ভব। কেবল ঘরের শোচনীয় অবস্থার জন্য নহে। আমার মনে কেমন ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল যে, এই গৃহ ভারতের একটি তীর্থ। এই গৃহে স্বয়ং শিশিরকুমার ভিন্ন অন্য কাহারও বাস করা উচিত নহে। বৈদ্যনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক পশ্চাৎভাগে একটি সুন্দর দ্বিতল গৃহ আছে। উহা বৈদ্যনাথের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহ বলিলেও চলে। শ্রীভগবান্ বৈদ্যনাথের কৃপায় এই বাড়ীখানি খালি ছিল। আমি তখনই উহা ভাড়া করিয়া, সেই বাড়ীতে গেলাম, এবং বাড়ীখানি পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল। এই বাড়ীতে গিয়াই দিন দিন আমার স্বাস্থ্য ভাল হইতে লাগিল। ইহার দ্বিতল হইতে চারি দিকে বড় সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়। কয়েক দিন পরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

একদিন প্রভাত হইয়াছে। সার্শি দিয়া ঘরে উষার আলোক আসিয়াছে। আমি ঠিক উষার সময়ে জাগি। কিন্তু ডাঃ চার্লস্ বলিয়া দিয়াছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসেও বৈদ্যনাথে প্রাতে খুব কন্‌কনে শীত পড়ে। অতএব বেশ রৌদ্র না উঠিলে যেন আমি শয্যাত্যাগ না করি। আমি জাগিয়া আছি। এমন সময় একজন লোক যেন বুট পায়ে, খুব জোরে নীচে হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। সিঁড়ি নীচের ঘরের বাহির দিকে। আমি 'কে! কে!" জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না। উপরে দুটি ঘর। একটি বড় 'হল', তাহার পশ্চাতে একটি ছোট লম্বা কক্ষ। হলের তিন দিকে তিনটা আয়ত বারাণ্ডা। কিন্তু এক বারাণ্ডা হইতে অন্য বারাণ্ডায় যাওয়া যায় না। লোকটি উত্তরের বারাণ্ডা হইতে যেন লাফাইয়া পশ্চিম বারাণ্ডায় গেল। আমি এখনও 'কে! কে!' করিতেছি। কোনও উত্তর নাই। পশ্চিমের বারাণ্ডায় বাড়ীওয়ালার একটা বৃহৎ তক্তপোষ আছে। আমরা তাহাতে বসিয়া, সুদূরস্থ নীল শৈলশ্রেণীর আকাশপটে চিত্রিতবৎ শোভা দেখিতাম। সে একটি লাঠির দ্বারা এই তক্তপোষে এমন তিনটি গুঁতা দিল যে, সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে হল-কক্ষে স্বতন্ত্র ক্যাম্প-খাটে পুত্র এবং পশ্চাতের কক্ষে আর এক তক্তপোষে স্ত্রী ও নীচে একটি বালক ভৃত্য শুইয়াছিল। সকলে জাগিল। আমি 'কে! কে!' বলিয়া চেঁচাইতেছি। পুত্র ভয়ে তাহার বিছানায় বসিয়া কাঁপিতেছিল। কোনও উত্তর না পাইয়া, নীচের ঘরে আমার কনিষ্ঠ সহোদর, পাচক ও এক ভৃত্য শুইয়াছিল, আমি

তাহাদের নাম করিয়া ডাকিলাম। কোনও উত্তর নাই। বালক ভৃত্য বারাণ্ডায় গিয়াছে না কি জিজ্ঞাসা করিলে, স্ত্রী বলিলেন—সেও বিছানায় বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। আমি বলিলাম, এ কি বিচিত্র কথা!' রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। বালক ভৃত্যকে দ্বার খুলিতে বলিলাম। তাহার পর আমরা সমস্ত বারাণ্ডা ও নীচের ঘর ও চারি দিকের মাঠ দেখিলাম। কোথায়ও কোনও লোকের চিহ্নমাত্র নাই। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিলাম না। প্রাতে পেন্সন প্রাপ্ত, বৈদ্যনাথবাসীও 'হাওয়াখোর' বাবুরা প্রায়ই কবিদর্শনে আসিতেন। আজ প্রাতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের এই কথা বলিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, বৈদ্যনাথে বড় চোরের ভয়। এ কোনও চোরের কার্য্য। কিন্তু চোর প্রভাতে আসিয়া এরূপ তক্তাপোষে গুঁতা দিবে কেন? সয়তানের এক আত্মীয় এই বাড়ীর হাতায় এক খোলার ঘরে থাকিতেন। তিনি আসিয়া বলিলেন যে, তিনি তিন বৎসর এই বাড়ীতে আছেন। ভাড়াটিয়া না থাকিলে তিনি একা উপরের ঘরে শয়ন করেন, কিন্তু কখনও কোনও ভয় পান নাই। আমি জানি, আমাদের তীর্থগুলিতে নানাবিধ পাগল থাকে। আমার বিশ্বাস হইল, এ কোনও পাগলের কার্য্য। পাগল বারাণ্ডা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করাও বিচিত্র নহে।

কিছুক্ষণ পরে ডাক আসিল। কলিকাতা হইতে সেই 'জ্যোতিঃ'-সম্পাদকের একখানা কার্ড পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্ব্বদিন কলিকাতায় সেই সয়তানের কন্যার কাছে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, তাহার পিতার সে দিন প্রাতে চট্টগ্রামে মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীপুত্রকে কার্ড দেখাইয়া বলিলাম যে, আমার বোধ হয় উহা মিথ্যা টেলিগ্রাম। পাপিষ্ঠ চট্টগ্রামে এত ঘৃণিত যে, তাহার মাথাব্যথা হইলে লোকে বলে—"বেটা এবার মরিয়াছে।" অথবা তাহার কোনও শত্রু এই দুষ্টামি করিয়াছে। তাহার সেই আত্মীয়, তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরা বরাবর আমাদের কাছে থাকে। এ কথা প্রকাশ করিতে আমি স্ত্রী পুত্রকে নিষেধ করিলাম। যাহার জমিদারি সয়তানের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াতে সে আমার মস্তকে সেই বজ্রাঘাত করিয়াছিল, সে হিংসায় অন্ধ হইয়া এক মোকদ্দমায় সেই জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতে, সেই জমিদার তাহার মাতার সত্ত্বমতে গৃহীত নহে—ক্রীত, বলিয়া ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে। জমিদার তাহার বিরুদ্ধে ৩০,০০০ টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশের আর্জি মুসাবিদা করাইয়া কলিকাতার উকিল ব্যারিষ্টারকে দেখাইতে পাঠাইয়াছেন। সীতা-কুণ্ডের দেবসম্পত্তি মোহন্তের নিজের সম্পত্তি, উহা দেবতার বিত্ত নহে, বলিয়া পাপিষ্ঠ আর এক মোকদ্দমায় ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। আমি এই জবানবন্দির নকল আনাইয়া, এই সাক্ষ্য মিথ্যা কি না, সুরেন্দ্রবাবুর দ্বারা কাউন্সিলে প্রশ্ন দিয়াছি। তদ্ভিন্ন "A Tragedy in five acts (পাঁচ অঙ্কে শোকান্ত নাটক) নাম দিয়া, আমি তাহার সমস্ত কুকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া, 'বেঙ্গলী'তে পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি। এই পাঁচটিই এত গুরুতর যে, প্রত্যেকের জন্য তাহার পদচ্যুতি হইবার কথা। আমাকে যে 'জ্যোতিঃ-সম্পাদক কার্ড লিখিয়াছে ,সে সুরেন্দ্রবাবুর কাছেও তাহার মৃত্যু-সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছে। আমার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সয়তানের ষড়যন্ত্রে 'জ্যোতিঃ' কাগজ বন্ধ হইয়াছে, এবং সম্পাদক ঘোরতর উৎপীড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কলিকাতায় আমার কাছে এই পীড়িত শয্যায় কাঁদিয়া পড়িলে আমি তাহাকে সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়াছি। সুরেন্দ্র-বাবু তখন তাঁহার 'সিমুলতলা' বাটীতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ট্রেনে একজন লোক দ্বারা সেই সংবাদ আমাকে জানাইয়া কাউন্সিলে উক্ত প্রশ্ন পাঠাইবেন কি না, এবং উক্ত নাটকের প্রথম অঙ্ক সেই সপ্তাহে ছাপিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, সয়তানের মৃত্যুসংবাদ সত্য হইলে আমি দুই এক দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম হইতে পত্র পাইব। আপাততঃ প্রশ্ন ও প্রবন্ধ তিনি স্থগিত রাখিবেন।

সে দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাদের কেমন ভয় করিতে লাগিল। অন্য দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা বারাণ্ডায় কাটাইয়াছি, এবং ঘরের চারি দিকের বিস্তৃত মাঠে বেড়াইয়াছি, কিন্তু আজ যে এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতে ভয় হইতেছে। স্ত্রী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে, নিকটে একটা বাড়ীতে একজন লোক মৃত্যু-শয্যায়, তাহাতে সম্ভবতঃ এরূপ ভয় বোধ হইতেছে। সে লোকটিও চট্টগ্রামবাসী। সয়তান তাহাকে ব্রাহ্ম করিয়া, তাহার দ্বারা এক বিধবা বিবাহ করাইয়াছে। সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া বৈদ্যনাথে আসিয়াছে। আমি তাহাকে চিনি না। কখনও নামও শুনি নাই। আমি বৈদ্যনাথে আসিয়াছি শুনিয়া, সে আমাকে দেখিতে চাহিল। আমি ও স্ত্রী উভয়ে গেলাম। দেখিলাম, বিধবাটি তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে। রোগের শেষ অবস্থা। বড় বিচিত্র কথা যে, বিধবাবিবাহকারী ভায়া ব্রাহ্ম এখন মৃত্যুশয্যায় কেবল 'বাবা বৈদ্যনাথ ! বাবা বৈদ্যনাথ !' করিতেছে, এবং মন্দিরের দিকে দেখিতেছে। হতভাগ্য তাহার মাতা ও ভগিনীকে দেখিতে আকুল হইয়াছে। আমাকে বার বার বলিল— "আপনি আমাকে চট্টগ্রামে নিয়া একবার আমার মা বোনকে দেখান।" বিধবাবিবাহের পর আর তাহাদের দেখে নাই। আমি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"তুমি একটুক সারিয়া উঠিলে, আমি বাড়ী যাইবার সময়ে তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব এবং যেরূপে পারি, তোমার মা বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।" হা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় ! তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি ভাবে স্থাপন করিয়াছিলে, আর আজ তাহা কতকগুলি অদূরদর্শীর হাতে পড়িয়া কি হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য সকল দেখাইতেছে ! একটি মধ্যমবয়সী বিধবাকে এরূপে বিবাহ দিয়া, এবং সংসারে কতকগুলিন হতভাগ্য সন্তান আনিয়া, সর্ব্বশেষ মৃত্যুশয্যায় ইহাকে এরূপ অনুতপ্ত করিয়া, কি ধর্ম্ম সাধিত হইয়াছে? এই বিধবা এতগুলি অনাথ শিশু লইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে? পূর্ব্ব-দিন অপরাহ্নে এই হতভাগাকে আমরা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইতে তাহার আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় আমাদের হৃদয় পর্য্যন্ত ছাইয়াছে। স্ত্রীকে বলিলাম যে, এই জন্যই আমাদের ভয় বোধ হইতেছে। আমার সিস্‌টাইটিস্‌ রোগ। রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় না। বহু বার উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হয়। সমস্ত রাত্রি যেন ঘরের খড়খড়ি পড়িতেছিল। ঠিক যেন বাহির হইতে কেহ নাড়িতেছে। পরদিবসের রাত্রিও এই ভাবে কাটিল।, তৃতীয় দিবস আমার খুড়তত ভাই রমেশের পত্র পাইলাম যে ঠিক, যে সময়ে আমাদের বাড়ীতে সেই উপদ্রব হইয়াছিল, সেই সময়ে সয়তানের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। অনেকের সন্দেহ যে, সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। রমেশ আরও লিখিয়াছে, সেই দিন ৪টার সময়ে আমাদের পাহাড়ের রান্নাঘর ইত্যাদিতে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। কিরূপে আগুন লাগিল, কেহ বলিতে পারে না। আমি কলিকাতায় যখন খুব পীড়িত, তখন এক দিন রাত্রি নিশীথের সময়ে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় না কি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি। স্ত্রী পুত্র ছুটিয়া আসিলে এবং কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় না কি বলি যে, সয়তান তাসুরের মত একটা কালো লোক লইয়া আসিয়াছিল, এবং আমার গলা টিপিয়া ফেলিতে বলিতেছিল। একটি কালো মেয়ে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, মা জয়কালী রক্ষা করিয়াছেন। এত শত্রুতা করিয়া ও আমাদের এত দুঃখ দিয়া' হতভাগার তৃপ্তি হয় নাই। এখন প্রাণে মারিবার চেষ্টায় আছে।' তিনি রাত্রি ৪টার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে জয়কালীর বাড়ীতে পূজা দিতে চলিয়া যান। পরদিন প্রাতে তাঁহাকে না দেখিয়া, তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে পুত্র বলিল—"বাবা! তোমার কি গত রাত্রির কথা কিছু মনে নাই?" তখন এই সকল কথা বলিয়া সে বলিল যে, তাহার

মা কালীঘাটে পূজা দিতে গিয়াছেন। স্ত্রী আমাকে এই ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"কলিকাতায় তুমি সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিলে। মরিয়াও বুঝি আমাদের ছাড়িতেছে না। দেশে ঘরগুলি পোড়াইয়া, এখানে আমাদের আজ দুদিন যাবৎ তিষ্ঠিতে দিতেছে না।" সে দিন সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। নীচের ঘরের কপাটের সারা রাত্রি শব্দ হইতেছিল। আমি প্রাতে উঠিয়া স্ত্রীকে বলিলাম—"কাল রাত্রিতে বুঝি, ভ্রাতা কপাটগুলিন খোলা রাখিয়া শুইয়াছিলেন, কি বারম্বার কপাট খুলিয়া বাহিরে যাতায়াত করিতেছিলেন। কপাটের শব্দে আমি এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা যাইতে পারি নাই।" আমি স্নানকক্ষে গেলাম, স্ত্রী বিষয় কি জানিতে নীচে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত ভীতা হইয়া বলিলেন—"না। আমাদের এ বাড়ীতে থাকা হইবে না। অন্য বাড়ী দেখ। কাল রাত্রিতে অতুল ও চাকরেরাও ঘুমাইতে পারে নাই। সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে।" ভ্রাতা, পাচক ও ভৃত্য, স্ত্রীর পিছে পিছে আসিয়াছিল। দেখিলাম, তাহাদের চোক কপালে উঠিয়াছে। তাহারা বলিল যে, আহারের পর কপাট বন্ধ করিয়া তাহারা শুইতে যাইতেছে, এমন সময়ে বোধ হইল, যেন দক্ষিণ দিকের কপাটে কে ধাক্কা দিতেছে। তাহারা কোনও ভিখারী, কি পাগল মনে করিয়া, লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া চারি দিকে দেখিল, কিন্তু কোনও লোকের সাড়া-শব্দ পাইল না। তাহার পর আবার শুইতে যাইতেছে, আবার সেরূপ কপাটে আঘাত। কপাট যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। আবার তাহারা বাহির হইয়া দেখিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। এরূপে তিন চারি বার দেখিয়া, তাহারা দা ও লণ্ঠন সম্মুখে রাখিয়া, তিন জনে ভয়ে জড়সড় হইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিতেছেন—"শ্রীনাশা মরিয়াও আমাদের তিষ্ঠিতে দিবে না।" আমি অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলাম—"আমি এ জীবনে তাহার কোনও অনিষ্ট করি নাই। বরং যথাসাধ্য ছাত্রজীবন হইতে আমি তাহার সাহায্য করিয়াছি। যদি আমাকে এরূপ হিংসা করিয়াছে বলিয়া, তাহার আত্মার অশান্তি হইয়া থাকে, আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলাম। শ্রীভগবান্‌ও তাহাকে ক্ষমা করুন। সে যেন আর আমাদের প্রতি এ উৎপাত না করে।" আমরা ইহার পর এক মাসের অধিক বৈদ্যনাথে ছিলাম। আর কখনও কোন উৎপাত হয় নাই। বৈদ্যনাথে অনেকে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন। ইহার দুই দিন পরে ঋষিতুল্য পূজনীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাড়ীতে না কি একটা উৎপাত হইয়াছিল?" আমি বলিলাম—"আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিবেন? আমিও এত দিন করি নাই।" তিনি বলিলেন—"আমি বিশ্বাস করি। আমার বাড়ীতেও ঠিক এরূপ একটা ঘটনা হইয়াছিল।" তিনি তাহার বৃত্তান্ত 'মিরার', কি কোন কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিলেন। ঘটনাটি এইরূপ—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একজন আত্মীয় বড় বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা দুজনে বরাবর পরলোকের কথা লইয়া তর্ক করিতেন, দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যিনি আগে মরিবেন, পরকাল থাকিলে তিনি অপরকে যে প্রকারে হউক, তাহার প্রমাণ দিবেন। এখন বিধাতার ইচ্ছায় তাহার কিছুদিন পরে আত্মীয়টির মৃত্যু হয়। যে বাড়ী মহারাজা সূর্য-কান্ত কিনিয়াছেন, রাজনারায়ণবাবু তখন সেই বাড়ীতে ছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার ঘরে হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ফল পড়িতে লাগিল। চৌকি পাহারা দিয়া কিছুই হইল না। দেওঘরের সবডিভিসন্যাল অফিসারকে সংবাদ দিলে তিনি পুলিস পাহারা দিলেন। কিন্তু কিছুতে উপদ্রব নিবারণ হইল না। কোথা হইতে ফল কিরূপে পড়ে, কিছুই বুঝা গেল না। একদিন তিনি হল-ঘরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে 'টুক' করিয়া একটা ফল তাঁহার সম্মুখের টেবিলে পড়িল। সে দিন হঠাৎ তাঁহার সেই

আত্মীয়ের প্রতিশ্রুতির কথা যাহা তাঁহার পুত্র হইতে শুনিয়াছিলেন, মনে পড়িল। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হাঁ হে, তুই কি অমুক? তুই সেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলি, তাই কি এরূপে ফল ফেলিতেছিস। তাহা যদি হয়, কই—আর একটি ফল ফেল্ দেখি!” তনখই ‘টুক’ করিয়া আর একটি ফল পড়িল। তখন তিনি বলিলেন—“বটে! আচ্ছা, বুঝা গেল। তুই এখন তোর সদ্‌গতি দেখ্। আর এ উপদ্রব করিস্ না।” তাহার পর হইতে আর সে উপদ্রব হয় নাই। সত্যই কবিগুরু সেক্ষপিয়ার বলিয়াছেন—

“স্বর্গে মর্ত্ত্যে আছে বহু ঘটনা এমন
স্বপ্নেও ‘দর্শন’ যাহা করে নি দর্শন।”

ইহার পর চট্টগ্রাম হইতে এক আত্মীয় নরাধমের মৃত্যুর এক দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তাঁহাকে বলিয়াছিল—“নবীন আমার পিছে লাগিয়াছে। এবার আমার রক্ষা নাই। আমি এবার মরিব, এবং সেখানে গিয়া আবার ক্রিকেট খাড়া করিয়া রাখিব। নবীন ও তোমরা গেলে, তোমাদের সঙ্গে আবার ছেলেবেলার মত ক্রিকেট খেলিব। নবীন একদিন বুঝিবে—আমি নহে, তাহার আত্মীয়েরা তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।” তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে সকলের সন্দেহ হয় যে, সে উক্ত ড্যামেজের মোকদ্দমার ও আমার ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্ম সংবাদপত্রে এই সন্দেহ অমূলক বলিয়া, এক প্রবন্ধও তাহার পক্ষে প্রকাশিত হইল। শুনিলাম, সে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, সে তিন ফাঁকি খেলিয়া যাইতেছে,—প্রথম, লেখাপড়া না জানিয়াও সে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ও রায় বাহাদুর হইয়াছে। দ্বিতীয়, সম্পূর্ণরূপে বধির হইয়াও সে একটা দেশের উপর এই প্রভুত্ব করিয়াছে। তৃতীয়, একটা দেশ তাহার শত্রু হইয়াও কেহ তাহার কিছু করিতে পারে নাই। দেশে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে। তাহার আত্মহত্যা সত্য কি মিথ্যা জানি না। যেরূপেই হউক, বড় সঙ্কট সময়ে সে স্বধামে চলিয়া গিয়াছিল। আর কিছুদিন থাকিলে তাহার বিপদের সীমা থাকিত না। বিশেষত যে মিঃ কলিয়ারের ভয়ে সে ছুটি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই মিঃ কলিয়ার আবার কমিশনর হইয়া আসিয়াছেন। তাহার পরিণাম এই হইল! আর সে যাহার এই বিপদ্ ঘটাইয়াছিল ও যাহাকে মৃত্যুশয্যায় পর্য্যন্ত শায়িত করিয়াছিল, সে এখনও জীবিত এবং সম্মানের সহিত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ও আজ পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সুখ-শান্তিতে জীবনসন্ধ্যা অতিবাহিত করিতেছে। হায় ভগবান্! তুমি এরূপে তোমার সূক্ষ্ম ধর্ম্ম ও কর্ম্মনীতির দ্বারা দুষ্কৃতের বিনাশ ও সুকৃতের পরিত্রাণ সাধন কর!

একে রুগ্ন। তাহাতে এই সকল ঘটনায় প্রাণে কেমন নিরানন্দ ও উদাসীনতা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথও নিরানন্দের স্থান। মন্দির ও ক্ষুদ্র নন্দনপাহাড় ভিন্ন দেখিবার কিছুই নাই। যে শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসিয়াছে, এ মন্দির ও তাহার উৎসবাদি তাহার চক্ষে কিছুই লাগে না। আর যে পার্ব্বতী মাতার পুত্র, তাহার চক্ষে ক্ষুদ্র নন্দনশৈল কিছুই নহে। এই নিরানন্দ ও নির্জ্জনতার মধ্যে শ্রীভগবান্ একটি আনন্দের জ্যোতিঃ সঞ্চার করিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া গৃহে ফিরিয়াছি, এমন সময়ে সেই সয়তানের আত্মীয় বলিলেন যে, দুটি স্ত্রীলোক ষ্টেশনে আমার বাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছিল, তিনি তাহাদের আনিয়া তাঁহার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছেন। কারণ, আমার ঘরে সে সময়ে কেহ ছিল না। স্ত্রী ও নির্ম্মল মন্দিরে গিয়াছেন। বৈদ্যনাথে দুটি স্ত্রীলোক আমার অনুসন্ধান করিতেছে!—আমি বিস্মিত হইয়া তাহাদের দেখিতে গেলাম।

দেখিয়া, আমার বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। অনেক ভদ্রমহিলা সময়ে সময়ে আমার কাব্যাবলী পাঠ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে সেইরূপে কলিকাতা অঞ্চলের দুটি রমণী আমাকে পত্র লিখিতেছিলেন। উভয়েই শিক্ষিতা। একজনের শিক্ষা এত দূর যে, তিনি আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্র লিখিতেছেন যে, তাহার উত্তর দিতে আমার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। আমি সপরিবারে কখনও কলিকাতা গেলে তাঁহাদের সংবাদ দিতে তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে জন্য এবার পীড়িত হইয়া কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তাঁহাদের কাছে পুত্রের দ্বারা কার্ড পাঠাইলে, তাহারা দুজনেই আমাকে দেখিতে আসেন, এবং প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই দুজনেই যেন চিরপরিচিতা আত্মীয়ার মত ব্যবহার করিতে ও স্ত্রীকে মা বলিতে আরম্ভ করেন। দেখিলাম, তাঁহারা দুজনেই আসিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর আত্মীয়। আমি পরম আদরে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়া, স্ত্রীর কাছে মন্দিরে সংবাদ পাঠাইলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহাদের জন্য ষ্টেশনে লোক পাঠাইতে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে পত্র পাই নাই। সঙ্গে যে একটি লোক ছিল, সে জলখাবার আনিতে যে মধুপুর ষ্টেশনে নামিল, আর উঠিতে পারিল না। অতএব তাঁহারা সেখান হইতে সঙ্গিহীনা অবস্থায় বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে চলিয়া আসেন। স্ত্রী ও পুত্র ছুটিয়া আসিলেন। এ দুটিকে লইয়া গৃহ আনন্দে পূর্ণ হইল। একজন কৃষ্ণা, অন্যা গৌরী। উভয়েই সুন্দরী, ক্ষীণাঙ্গী, মধ্যযৌবনা। কৃষ্ণা গম্ভীরা, বঙ্কিমবাবুর ভ্রমর। নির্ম্মল তাহাকে 'ফিলজফার' দিদি বলিত। গৌরী ঠিক যেন কমলমণি ;—একটি আনন্দের ফোয়ারা। দুটিই হতভাগিনী। একজনের স্বামী মতিচ্ছন্ন ও চিরুদ্দেশ। অন্যটি বাল-বিধবা। একজনের চাপা ঈষৎ হাসি। অন্যের হাসিধ্বনিতে গৃহ দিন রাত্রি মুখরিত। আমি তাহাকে পাগলী বলিয়া ডাকিতাম। আমি দেখিতে দেখিতে সুস্থ হইলাম। প্রত্যহ প্রাতে একবার হাওয়া ভক্ষণে বাহির হইতাম। কখন কখন এই দুটি আমার সঙ্গে যাইত। সমস্ত দিন আহাদের সঙ্গে পুস্তক পাঠে ও নানা আমোদে কাটাইতাম। নির্ম্মলের দার্শনিক দিদি দুপুরবেলা আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া প্রথম রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, তাহার পর গীতা পড়িত, এবং নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করিত। পাগলীর এ সকল আসে না। সে কবিতা পড়ে, কবিতা লেখে, এবং সমস্ত দিন হাসি তামাসা করে। অপরাহ্নে আমি আবার হাওয়া ভক্ষণে বাহির হইতাম। সময়ে সময়ে নন্দনশৈলে সায়াহ্নের নির্ম্মল আকাশতলে বসিয়া মধুসূদনের জীবনীলেখক যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ব্রাহ্মসঙ্গীত শুনিতাম। তীর্থস্থান ও হাওয়াভক্ষণস্থান বঙ্গ-মহিলার মুক্তিরাজ্য। এখানে পুরুষেরা যেরূপ হাওয়া খাইতে বাহির হন, অপরাহ্নে মহিলারাও দলে দলে সেই সর্পিণীর কার্য্য করিতে বাহির হন। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা গানবাজনা ও আমোদে কাটাইতাম। আমার নির্ম্মল বেশ গাহিতে পারে। অনেক ভদ্রলোক তাঁহাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া, পরিবারদের তাহার গান শুনাইতে কত খোসামুদি করিতেন। এরূপে বৈদ্যনাথের বাকী সময় বড়ই সুখে কাটিল।

বৈদ্যনাথের অনতিদূরে একটি বড় নির্জ্জন শান্তিপ্রদ স্থানে একজন সন্ন্যাসী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বহু দিন হইতে আছেন। তিনি একজন পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের গুরু। একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক হাওয়াখোর ভদ্রলোক তাঁহার আশ্রমে গেলেন। তিনি আমাকে পাইয়া বসিলেন, এবং নানামতে তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। আমি তখন খুলিয়া বলিলাম যে, আমিও একজন খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর শিষ্য। তিনি আমাদের বেশ খাওয়াইলেন। ভারতের অতীত আশ্রমের স্মৃতি, তাঁহার আশ্রম

দেখিলে ছায়ার মত হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। বড় আনন্দে একটা দিন কাটাইলাম। ইহার পর একদিন সেই রমণী দুটি ও নির্ম্মলকে সঙ্গে করিয়া স্ত্রী আশ্রম দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে, সন্ন্যাসী বলিলেন—"মাই! আনন্দ মন্ মে।" এই দার্শনিক কথা তাঁহার না বলিলেও চলিত। কিন্তু যেই বলিয়াছেন, অমনি সেই 'দার্শনিক দিদি' তাঁহাকে পাকড়াও করিল। সে বলিল—"কেন? বাহিরে কি আনন্দ নাই? সংসারটি কি মিথ্যা?" পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পুরিয়া। দুজনের মধ্যে ঘোরতর দার্শনিক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর দুই একজন গ্রাজুয়েট শিষ্যও আছেন। স্ত্রী বিদায় হইয়া আসিবার সময়ে তাঁহাদের একজন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এটি কি আপনার কন্যা?" স্ত্রী বলিলেন, তাঁহার কন্যা নহে, সে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। শিষ্য বলিলেন—"বাপ! অসাধারণ মেয়ে! বাবাজীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।" স্ত্রী বাড়ী আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার দার্শনিক 'মানি' বাবাজীকে ভারি জব্দ করিয়া আসিয়াছে।"

পাগলি হি হি হাসিয়া কহিল,—"ওগো! তোমার মানিকে আজ থেকে ভট্টাচার্য্য উপাধি দেও। বাবা গো! অত বড় সন্ন্যাসীটাকে হেস্ত-নেস্ত করে এসেছে।" আমি বলিলাম,—"সে কি মৃণাল! তুই এত বড় একটা সন্ন্যাসীর সঙ্গে লড়্‌তে গিয়েছিলি?" সে গম্ভীরভাবে বলিল,—"লড়্‌তে যাব কেন? গায়ে পড়ে লাগলে আমি তাকে ছাড়্‌ব কেন? ও কিসের সন্ন্যাসী! একজন ঘোর বিলাসী। মা! তুমি শুন্‌লে না, রাত্রিতে আহারের জন্য পায়রা আর মাগুর মাছ বলে দিলে।" আমিও দেখিয়াছিলাম, তিনি একজন 'দস্তুর-মতাবেক' গৃহী হইয়াছেন। স্মরণ হয়, ধানের গোলা পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলাম। তবে আমার পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডেপুটি মহাশয় তাঁহার বড় ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি আমাকে যোগসাধনা করিতে বলিতেন। যোগ কি হয়? বড় আনন্দ হয়, কিছু দিন পরে একটা জ্যোতি দেখা যায় এবং আয়ু দীর্ঘ হয়। আনন্দ আর জ্যোতি যাহাই হউক আয়ু দীর্ঘ হওয়া কি বড় বাঞ্ছনীয়? স্বয়ং গ্লাডষ্টোন মৃত্যু ভিক্ষা করিতেন। ইহার সমস্ত পরিবারকে এ সন্ন্যাসী যোগ শিক্ষা দিতেছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে স্ত্রীলোকেরা বড় বড় চাদর জড়াইয়া, চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিত। আমার গুরুদেব এরূপ যোগকে 'বুজরুকি ও ভোজকে বাজি' বলিতেন। ডেপুটি মহাশয়ও আর যাহা পাইয়া থাকুন, আয়ু বড় বেশী পাইয়াছেন বোধ হয় না। কারণ, ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জীবনের এই আনন্দের অঙ্ক ফুরাইল। ছুটি শেষ হইয়া আসিলে, বোল্টন সাহেবকে কুমিল্লা বদলির জন্য লিখিলাম। যথাসময়ে উত্তর না পাইয়া বড় চিন্তিত হইলাম। পত্র এক দিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলিল,—"বাবা! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, তোমার কুমিল্লা বদলির অর্ডার আসিয়াছে।" সে ছুটিয়া পোষ্ট আফিসে গেল। সত্য সত্যই সেই ডাকে কুমিল্লা বদলির সংবাদ আসিয়াছে। আমরা বৈদ্যনাথ ছাড়িবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। সে দিন হইতে বালিকা দুটির চক্ষের জল ধারায় পড়িতে লাগিল। তাহাদের অশ্রু দেখিয়া, তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া, আমার হৃদয়ও ডুবিয়া গেল। আমরাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহাদের সঙ্গে করিয়া বৈদ্যনাথ ত্যাগ করিলাম, এবং কলিকাতার নিকট এক ষ্টেশনে তাহাদের রাখিয়া গেলাম। সমস্ত পথে তাহাদের অশ্রুর বিরাম ছিল না। ষ্টেশনের সেই বিদায়-দৃশ্যে পাষাণ দ্রব হইল। স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার এই দৃশ্য দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহারা আপনার কে হয়?" আমি বলিলাম, —"কিছুই হয় না।" তিনি বিস্মিত হইলেন। ট্রেন খুলিল। যতদূর দেখা যাইতেছিল তাহাদের অশ্রু ষ্টেশনের একটি স্তম্ভ বাহিয়া, ও আমাদের অশ্রু গাড়ীর গবাক্ষ বাহিয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সেই কাতর মুখ আমি

জীবনে ভুলিতে পারিব না। ইহার পর যখন সেই ষ্টেশন হইয়া গিয়াছি, যে স্থানে তাহারা দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানটি দেখিয়া আমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। ধরাতলে রমণী-হৃদয়ই স্বর্গ এবং প্রকৃত স্নেহই সুধা। শ্রীভগবান্ দুটির হতাশ হৃদয়ে সুখ শান্তি বর্ষণ করুন। বৈদ্যনাথ হইতে বাড়ী গেলাম। তাহার পর কুমিল্লায় গেলাম।

কুমিল্লা

স্মরণ হয়, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার ট্রেনে চট্টগ্রাম হইতে আমি একা রওনা হইয়া, রাত্রি তিনটার সময়ে কুমিল্লা পঁহুছিলাম। পথে ফেনীতে বহু ফেনীবাসী দেখিতে আসিয়াছিল। কুমিল্লা বদলিতে তাহাদের বড় আনন্দ। কারণ, কুমিল্লা ফেনীর খুব নিকট। দেবতার সঙ্গে আমার যেরূপ সম্পর্ক, সারা রাত্রিতে একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল। পুরাতন বন্ধু বাবু শশিভূষণ দত্ত কুমিল্লার ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ষ্টেশন হইতে তাঁহার গৃহে, তাঁহার এক অপূর্ব্ব 'ডগ কার্টে' লইয়া গেলেন। গাড়ীখানি প্রকৃতই 'ডগ কার্ট'। কারণ টাট্টু দুটি শশী ভায়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন জানি না, 'ডগ' (কুকুর) অপেক্ষা তাহারা বড় বেশী বড় হইবে না। শশী রায়বাহাদুর হইয়া যখন তাহাদের যুড়িতে চালাইতেন, আমি তখন বাহক দুটিকেও 'রায়বাহাদুর' ও 'খাঁ বাহাদুর' উপাধি দিয়াছিলাম। শশী নিজেও একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন চট্টগ্রামে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, শশী তখন একজন বাঙ্গালী এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পুত্রের 'প্রাইভেট টিচার' হইয়া চট্টগ্রামে আসে। সে অবস্থায় অসাধারণ উদ্যোগ, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বলে শশী ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা একটুক একটুক শিক্ষা করিয়া, 'ওভারসিয়ার' হইতে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া, বহুকাল সেখানে অতিবাহিত করে। তাহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ শশী কুমিল্লার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। চট্টগ্রামে এমন নরনারী নাই যে, যে শশীকে চেনে না ও ভালবাসে না। কুমিল্লায়ও তদ্রূপ। বলা বাহুল্য, শশীও সাহেব সেবায় ও বশীকরণে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শশী সর্ব্বজনোপকারী, কাজেই সর্ব্বজনপ্রিয়। জেলার সর্ব্ব-প্রধান রাজকর্ম্মচারী হইতে পেয়াদা ও মুটে মজুর পর্য্যন্ত শশী সকলের সাহায্যকারী, সকলের বিপদের বন্ধু, সঙ্কটের মন্ত্রী, রোগের ঔষধ, দুঃখের দুঃখী, সুখে সুখী। শশী সত্য সত্যই তৃণ হইতে নীচ, শশীর তরুর মত সহ্যগুণ, এবং শশী মানহীন ব্যক্তিরও মানদাতা। অতএব ভগবান্ এমন লোকের উন্নতি করিবেন না কেন? শশী ভায়ার 'রায়বাহাদুরি' বৈঠকখানাখানিও তাঁহার 'ডগ কার্টে'র যুড়ি। উহা মুকুন্দরামের কালকেতুর 'কুঁড়িয়া ঘর'। এ গৃহে নিশির অবশিষ্ট অংশ কাটাইয়া, প্রাতে প্রথমে স্নেহাস্পদ ভ্রাতা তারাচরণের বাসায় গেলাম। দু এক দিন আগে তারাচরণ চাঁদপুর হইতে বদলি হইয়া, এখানের মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছে। এটি আমার বিশেষ সান্ত্বনার বিষয় হইয়াছিল। তাহার পর ভায়ারা আমার জন্য যে 'বাঙ্গলা' ঠিক করিয়াছিলেন, আমার সেই ভবিষ্যৎ আবাস দেখিতে গেলাম। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন, এই 'বাঙ্গলা'তে এক মেম সাহেব ছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তবে চট্টগ্রামের 'বাঙ্গলা'র মত হইবে। কিন্তু ও হরি! গৃহ দেখিয়া ও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে, এও সেই ময়মনসিংহের বাঙ্গলার দ্বিতীয় সংস্করণ, কি সহোদর ভ্রাতা। সেইরূপ দুখানি মাত্র কামরা। ময়মনসিংহের 'বাঙ্গলা'য় চাটাইয়ের বেড়া ছিল, এটিতে বাঁশের বেড়া। তাহার মেজে পাকা ছিল; ইহার তাহাও নাই। তাহার বারাণ্ডা খোলা ছিল; ইহার পশ্চিমমুখী বারাণ্ডায় বাঁশের জাফরি। দেখিতে ঠিক যেন চট্টগ্রামের মুর্গি রাখিবার ঘর। আমার চক্ষু সজল হইল। আমার সেই পাহাড়ের বাড়ীতে আবার

কয়েক দিন কাটাইয়াছি। হায় ভগবান্! আবার কি আমাকে এরূপ গৃহে আনলে? বুঝিলাম, আমার পরীক্ষা শেষ হয় নাই? ময়মনসিংহে এরূপ গৃহে থাকিয়া, মৃত্যুশয্যায় শায়ী হইয়াছিলাম। সেই রোগগ্রস্ত শরীরে কিরূপে এ ঘরে থাকিব? শুনিলাম, ইহার অপেক্ষা ভাল ঘর কুমিল্লায় পাওয়া যাইবে না। গৃহস্বামী বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সঙ্গে ছিলেন। তিনি একজন স্থানীয় জমিদার ও বড় কন্ট্রাক্টর এবং সহৃদয় লোক। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আমি এই ঘরের যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে বলিব, তিনি আমার সুবিধার জন্য তাহা করিবেন। আমি বলিলাম,—"সে বড় সহজ কথা নহে। তিনি আমার জন্য এত টাকা ব্যয় করিবেন কেন?" তিনি বলিলেন—"আমার পছন্দে তাঁহার ঘরের উন্নতি হইলে তাঁহারই লাভ।" আমি বলিলাম,—"তাহা হইলে আমি ইহার উপর কবিগিরি করিতে পারি।" সেই দিনই এই গৃহে আসিয়া, পরদিন হইতে তাহাতে কবি-কল্পনা খাটাইতে আরাম্ভ করিলাম। প্রথম অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া, চারি দিকে দরজা জানালা কাটাইলাম। দুই দিকে দুইখান চৌচালা কামরা, এবং সম্মুখে বারান্ডার জাফরি ফেলিয়া দিয়া, অষ্টকোণসমন্বিত এক আটচালা বারাণ্ডার মধ্যস্থলে নূতন ফ্যাসানে যোগ করিয়া দিলাম। মেজে পাকা করিয়া লইলাম। সমস্ত দ্বার ও জানালায় আয়না ও কাঠের কপাট দিলাম, এবং বেড়ার গায়ে ভিতর দিকে আর এক প্রস্থ চাটয়ের বেড়া ও উপরে চাটায়ের ছাদ দিয়া, বাহিরে বাসন্তী রং ও ভিতরে কক্ষে কক্ষে গোলাপী, আসমানি ও সামুদ্রী রং দিলাম। সম্মুখের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক গোল বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার শীর্ষস্থানে কামিনী এবং তাহার চারি পার্শ্বে কলিকাতা হইতে আনিয়া উদ্যান-তাল রোপণ করিলাম। প্রাঙ্গণের প্রান্ত সীমায় নানাবিধ ফুল রোপণ করিয়া, স্থানে স্থানে বিচিত্র কেয়ারি করিয়া, season flower (ঋতুফুল) বসাইলাম, এবং স্থানে স্থানে 'গেট' ও কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর নানাবিধ লতা তুলিয়া দিলাম। পশ্চাতের প্রাঙ্গণে নানাবিধ ফলবৃক্ষ কলিকাতা হইতে আনাইয়া লাগাইলাম। বাড়ীর নাম রাখিলাম গৃহস্বামীর নামে Anand Lodge (আনন্দলয়)। কুমিল্লায় একটা sensation (তোলপাড়) পড়িয়া গেল। প্রত্যহ ছোট বড় কত লোক আমার দৌলতখানা দেখিতে আসিতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধ পুলিশ-সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন,—"নবীনবাবু! আমার স্ত্রী প্রত্যহ এই পথ দিয়া যান। তিনি বলিলেন আপনি এই পচা গর্ত্তটাকে একটি স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন। তাই আমি দেখিতে আসিলাম।" বাঙ্গালীর ঘর সাহেব দেখিতে আসিয়াছেন—কি অকথ্য সম্মান! বাহিরে সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রশংসা আর তাঁহার মুখে ধরে না। তিনি বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, আপনি বাঙ্গালার প্রধান কবি। এই যাদুগিরি কবিরই উপযুক্ত। এ স্থানটি যেন কোনও যাদুকর পরিবর্ত্তন করিয়াছে।" এক দিন মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল 'বাইক' করিয়া আমার গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন।' আমি সেই অষ্টকোণ বারাণ্ডার সবুজ চিকের মধ্যে বসিয়া 'কবিগিরি' করিতেছি। মাজিষ্ট্রেটের ভাই চেঁচাইয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলেন,—"Halloh ! what's this ? Is it a theatre? (বাহাবা, এটা কি? এটি কি থিয়েটার ?)" মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"না। আমার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নবীন-বাবুর ঘর। এটা আগে একটা নরক ছিল।"

কুমিল্লা সহরটি বড়ই সুন্দর। স্থানে স্থানে কয়েকটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা পানীয় জলের জন্য রক্ষিত (reserved) হইয়াছে। স্বচ্ছ গভীর নীল সলিলে তরঙ্গ খেলিতেছে। ইহাই কুমিল্লার সুস্বাস্থ্যের একমাত্র কারণ। আয়ত রাস্তার দুই ধারে বিশাল বট ও অশ্বত্থশ্রেণী। দ্বিতীয় প্রহর দিবসেও রাস্তা শীতল ছায়ান্বিত। কিন্তু আগরতলার

রাজনীতির কল্যাণে সমস্ত সহরে কেবল টিনের ছাউনিযুক্ত বাঁশের ঘর। বড় বড় জমিদারের দৌলতখানাও এরূপ। দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আগরতলা রাজ্যটার উপর বিধাতার কি অভিশাপ আছে। শাসনকার্য্যে যাহার কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোককে মন্ত্রী নিয়োজিত করা আগরতলার রাজনীতি নহে। বহু পূর্ব্বে চট্টগ্রামবাসী আমার আত্মীয়েরা আগরতলার পুরুষানুক্রমিক দেওয়ান ছিলেন। চট্টগ্রাম সহরে এ জন্য যেখানে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল, তাহা এখনও 'দেওয়ান-বাজার' বলিয়া পরিচিত। চট্টগ্রামের শেষ দেওয়ান 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁহার পর হইতে আগরতলা পূর্ব্ববঙ্গের একচেটিয়া মহল হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য একজন বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। তবে রাজকার্য্যে তিনি বড় বীতরাগ ছিলেন। তিনি কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গের একটি দলের ক্রীড়াপুত্তল হইয়াছিলেন, ইহারা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য কিরূপে তাঁহার রাজ্যে এক জলপ্লাবন ঘটাইয়াছিল, সেই 'জলপ্লাবনে কিরূপে মহারাজার স্থানীয় কর্ম্মচারী সকলে ভাসিয়া গিয়া, তাহাদের স্থান ষড়্যন্ত্রকারীদের আত্মীয় water fowls 'জলচরেরা' পালে পালে আসিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে কিরূপে মহারাজ চৌদ্দ পনর লক্ষ টাকার ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন' ও সমস্ত রাজ্যে জলচরদের উৎপীড়নে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং এই আগুন হইতে ত্রিপুরা-রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া, আমি কিরূপ ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার ফেনী-জীবনীতে বলিয়াছি। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমার জনৈক বন্ধু এসিস্টেণ্ট পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন। তিনি মহারাজার বিরুদ্ধে এই সকল বিশৃঙ্খলা উপলক্ষে রিপোর্ট করিয়া মহারাজাকে শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। এই সুযোগে গবর্ণমেণ্ট রাজ্যটি গ্রাস করিবার ছিদ্র খুঁজিতে লাগিলেন। নোয়াখালির সেই 'মানিনী মাজিস্ট্রেট' আমার কাছে রিপোর্ট চাহিলে আমি লিখিলাম যে, তখন মহারাজার ফেনীর জমিদারীতে কোনওরূপ অশান্তি নাই। তিনি আমার কাছে বত্রিশ প্রশ্ন পাঠাইয়া, মহারাজার প্রত্যেক তহসিল কাছারি পরিদর্শন করিয়া, তাহার উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। উত্তর এক রাশি গেল। তাহাতে বরং ইহাই প্রকাশ পাইল যে, প্রজারা খাজনা দিতেছে না। তাহাদের রামরাজ্য হইয়াছে, 'মানিনী' ইহাতে দাঁত ফুটাইতে না পারিয়া, আমি মহারাজার পক্ষপাতিত্ব করিতেছি বলিয়া, আমার ফেনী হইতে বদলির জন্য আমার বিরুদ্ধে ঘোরতর রিপোর্ট করিলেন। আমার রক্ষা যে, তখন লায়েল সাহেব কমিশনর। তিনি আমাকে বেশ জানিতেন। এই সময়ে লেঃ গবর্ণর সার ষ্টুয়ার্ট বেলি এই সকল গোলযোগের জন্য চট্টগ্রাম আসিলেন। তখন রেল খোলে নাই। কুমিল্লা একপ্রকার অগম্য স্থান ছিল। এজেণ্টবাবু ও মহারাজার এক দেওয়ান লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করিতে চট্টগ্রাম যাইবার সময়ে আমার ফেনীর গৃহে আহার করিয়া গেলেন। তাহার দুই দিন পরে প্রাতে আমি কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে আলাপ করিতেছি, দেওয়ান বিষন্নমুখে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, আমার সঙ্গে তাঁহার একটা গোপনীয় কথা আছে। আমি উঠিয়া কক্ষান্তরে গেলে, তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আপনি স্বীকার করুন যে, আপনি আমাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন।" আমি বলিলাম—"এ কি কথা? অকস্মাৎ এ প্রস্তাব কেন? ষ্টুয়ার্ট বেলি কি বড় উৎপাত করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন,—"সে সকল কথা বলিবার আমার সময় নাই। যত শীঘ্র পারি, আমাকে আগরতলায় যাইতে হইতেছে। আপনি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মহারাজাকে বলিতে আমি অনুমতি চাহি।" আমি বলিলাম যে, এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ের আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে অক্ষম। আমি যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি, তবে কেবল বেতনের অনুরোধে করিব না। যদি কার্য্য করিতে পারি বুঝি,

তবেই করিব। অতএব মহারাজ আমাকে কি নিয়মে লইতে চাহেন, তাহা লিখিলে আমি আমার অভিপ্রায় জানাইব। তিনি চলিয়া গেলেন, আর অমনি এজেণ্টবাবু প্রবেশ করিলেন। তিনি এ পথে ফিরিবেন না বলিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি সে কথার উত্তর না দিয়া, দেওয়ানের সঙ্গে আমার কি কথা হইল, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রাতার মত বিশ্বাস করিতাম। সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"তুমি যদি যাও, তব আর কথা নাই। , আগরতলার পরম সৌভাগ্যের কথা হইবে। তবে যে নিয়ম স্থির কর তৎসম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করিও।" আমি বলিলাম,—"তাহা নিশ্চয় করিব। কিন্তু তুমি মন্ত্রী হও না কেন? তুমি এত দিন আগরতলায় আছ। রাজ্যের সকল অবস্থা জান। অতএব তোমাকে ফেলিয়া মহারাজা অন্য লোক খুঁজিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন,—"তুমি এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি এ পদ স্বীকার করিব না। আমি এতকাল মহারাজার ি...ুদ্ধাচরণ করিয়াছি। এখন কি তাঁহার চাকরি করিতে পারি?"

তাহার পর সমস্ত বঙ্গদেশ বিস্ময়ে পূরিত করিয়া, 'অমৃতবাজার' প্রকাশ করিল যে, এজেণ্টবাবু কুমিল্লার মাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া, মহারাজকে ভয় দেখাইয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যত্যাগ-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। 'অমৃতবাজার' আগুন জ্বালাইয়া এই পত্র পোড়াইল। বীরচন্দ্র মাণিক্য বড় চতুর লোক ছিলেন। তাঁহার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল যে, এজেণ্ট মহাশয় কেবল তাঁহার মন্ত্রী হইবার জন্য তাঁহার উপর এই সকল উৎপীড়ন ঘটাইতেছেন। কিছুদিন পরে আমি বন্ধুর নিকট হইতে পত্র পাইলাম,—"তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, আমি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছি। মহারাজার নুণ খাইব, ইহা আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল।" আমি বলিলাম,—"বটে! never consenting consented." তিনি আমার কাছে একটা শাসন-প্রণালী চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম,—আমি কি প্রণালী পাঠাইব। তিনি আমার অপেক্ষা, ত্রিপুরারাজ্যের খবর অধিক রাখেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। তখন জমিদারীটা কয়েকটি 'সার্কেলে' (বিভাগে) বিভাগ করিয়া, প্রত্যেক 'সার্কেলে' একজন ম্যানেজার নিয়োজিত করিতে, এবং আরও কি কি করিতে, লিখি। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' মলাটযুক্ত প্রথম Administration Report (বার্ষিক রিপোর্ট) আমাকে পাঠাইয়া, তাহার প্রত্যেক 'প্যারার' পার্শ্বে আমার মত লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি দেখিলাম, উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য লিখিত। লিখিলাম যে, ইহাতে মহারাজা অসন্তুষ্ট হইবেন এবং এই রিপোর্ট হয় ত তাঁহার মন্ত্রিত্বের শেষের আরম্ভ। তাহাই হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম, মহারাজ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এবং তিনি পদরক্ষার জন্য তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর ইলিয়টের কাছে রাজ্য জরিপের দরখাস্ত করিয়াছেন। ইলিয়ট জন্মান্তরে বোধ হয়, জরিপের আমিন ছিলেন। জরিপ তাঁহার একটা হলোওয়ের বটি, সর্ব্বশাসন রোগের ঔষধ। দারভাঙ্গার মহারাজা পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার এই বটির প্রতিকূলে প্রশ্ন উঠাইলেন। ষ্টেট-সেক্রেটারি তাহার উত্তরে বলিলেন যে, উহা এমন উৎকৃষ্ট চিজ যে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার স্বাধীন রাজা তাহার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। এইরূপে ইলিয়টের মুখ রক্ষা হইলে, তিনি কুমিল্লায় আসিলেন। চতুর মহারাজ এক চালে বাজিমাৎ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ইলিয়টের একজন বিশেষ বন্ধুকে পদচ্যুত মন্ত্রীর স্থলে তিনি ম্যানেজার করিয়াছেন। তখন এজেণ্ট মন্ত্রী ঘোরতর অপমানিত হইয়া ডেপুটি কলেক্টরত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঘোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। চুলে খোঁপা বাঁধিলেন, মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলেন।

আমি কুমিল্লায় আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে বীরচন্দ্র মাণিক্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমিল্লায় আসিয়া শুনিলাম যে, বর্ত্তমান মহারাজা 'জলচরের দল ঝাঁটাইয়া' তাড়াইয়া দিয়া, নিজে 'সুন্দররূপে' রাজ্যশাসন করিতেছেন। কিন্তু 'জলচরের' মধ্যে এজেন্টের বন্ধুরূপী এক কচ্ছপ ছিল। সে আবার ধীরে ধীরে রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং কুমিল্লায় আসিয়া শুনিলাম যে, কচ্ছপের বাহন পেন্সন লইয়া, পূর্ব্ব অপমান পকেটস্থ করিয়া, আবার ঘন ঘন আগরতলায় যাতায়াত করিতেছেন। তাহার পর মহারাজা তাঁহার এক পুত্রকে হঠাৎ যুবরাজপদে বরণ করিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের পুরুষানুক্রমিক নিয়মানুসারে যিনি মহারাজা হন, তিনি একজন 'যুবরাজ' ও 'বড় ঠাকুর' মনোনীত করেন। মহারাজ, অভাবে যুবরাজ রাজা হন এবং বড় ঠাকুর যুবরাজ হন। বর্ত্তমান 'বড় ঠাকুর' একজন সুশিক্ষিত তেজস্বী লোক। তিনি এই যুবরাজ নিয়োগের প্রতিকূলে আপিল করিলেন। আগরতলায় আবার আগুন জ্বলিল। আগরতলায়ও 'বাঃ বুদ্ধিমানদের' আধিপত্য। কচ্ছপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার বাহন পুরাতন এজেন্ট ভিন্ন এ আগুন আর কে নিবাইতে পারে? কাজেই তিনি আবার সহস্র রজত-মুদ্রায় বৈরাগ্য ছাড়িয়া মন্ত্রী হইয়াছেন, খোঁপা কাটিয়াছেন, আবার মৎস্য মাংস ধরিয়াছেন। কিন্তু সে আগুন এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা-রাজ্য ভস্ম হইতেছে। এই মন্ত্রীকেই তাড়াইবার জন্য বীরচন্দ্র মাণিক্য আপন রাজ্যের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, ব্রিটিশ-রাজ হইতে সনন্দ লইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তদনুসারে বর্ত্তমান মহারাজা কেবল রাজার সনন্দ মাত্র পাইয়াছিলেন। তিনি এখনও নিজে সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিতে পারেন নাই। একটি অষ্টমবর্ষীয় বালকও বুঝিতে পারে যে, এ সময়ে তাঁহার কাহাকেও যুবরাজ করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। জীবনের কিছুই নিশ্চয়তা নাই। হয় ত তাঁহার পূর্ব্বে বড় ঠাকুরের, কি তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিতে পারে। তিনি মৃত্যু-শয্যায়ও যাহাকে ইচ্ছা, যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু মহারাজ অপেক্ষা করিতে পারিলেও মন্ত্রী মহাশয় যে পারেন না। তাঁহার ষাটবৎসর বয়স। বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া মাসে মাসে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জনের আর সময় কই? মহারাজার নাম রাধাকিশোর। আমি তাঁহাকে 'সাধা কিশোর' বলিয়া থাকি। পূর্ব্বে একটা তপস্যা না করিলে কেহ ত্রিপুরার মহারাজাকে দেখিতে পাইত না। এখন মহারাজ যেখানে সেখানে যান, যখন তখন কুমিল্লায় আসেন, এবং তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বনামধন্য 'সন্দেশ সাহেবে'র পার্শ্বে বসিয়া নগর ভ্রমণ করেন। সন্দেশ সাহেব তাঁহাকে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গুঁতা দিয়া এটা সেটা দেখান। নগরবাসীরা দেখিয়া ম্রিয়মাণ হয়।

একবার তিনি এরূপ দলবলে কুমিল্লা আসিয়াছেন। কারণ, লেঃ গভর্ণর কুমিল্লায় আসিতেছেন। মন্ত্রী মহাশয় 'বড় ঠাকুরে'র জনৈক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া, ব্যারিষ্টারকে তাঁহার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। সে তখনই বলিল,—"তোমার আত্মীয়তা রাখ, তুমি এখন বড় ঠাকুরের গ্রীবাচ্ছেদী আগরতলার ঘৃণিত মন্ত্রীর মত কথা কহ।" তাহার পর দুই জনের মধ্যে ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত। শেষ মারামারির গতিক হইলে, আগরতলার এমন একটি মূল্যবান্ মন্ত্রিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমি তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। তিনি তখন বলিলেন যে, তিনি একটা কথার পরামর্শের জন্য আসিয়াছিলেন—মহারাজা লেঃ গভর্ণরের অভ্যর্থনার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবেন কি না। আমি কোনও মত প্রকাশ করিতে চাহিলাম না। কিন্তু তিনি ছাড়িবেন না। পরে বলিলাম, আগে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লেঃ গভর্ণর আগরতলায় যাইতেন। এখন মহারাজা নিজে তোমার পূর্ব্বমন্ত্রিত্বের ফলে লেঃ গভর্ণরের সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য কুমিল্লা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন! তাহার পরও কি তিনি মহারাজকে রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া আর্দ্দালিদের পার্শ্বে দাঁড় করাইতে চাহেন? তিনি বলিলেন যে, তবে উহা আমার মত নহে বলিয়া তিনি মহারাজাকে বলিবেন। কারণ, মহারাজা আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। তাহার পর এক দিন তাঁহাকে আমার গৃহে প্রাতঃকালে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আমার আরও দুটি বন্ধু নিমন্ত্রিত ছিলেন। বড় ঠাকুরকে লঙ্ঘন করিয়া মহারাজার যে যাহাকে তাহাকে—এমন কি, মন্ত্রী মহাশয়কে পর্য্যন্ত যুবরাজ করিবার অধিকার আছে—ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি আগরতলার ইতিহাস আরম্ভ করিলেন। এই পুরাণ পাঠের আরম্ভেই আমি অন্য কার্য্যের ছলনায় সরিয়া পড়িলাম। এক বন্ধুর তন্দ্রা আসিল। দ্বিতীয় বন্ধু ফেনীর জনৈক উকিল। মন্ত্রী মহাশয় এই গরীবকে পাকড়াও করিলেন। সে নিরাশ্রয় হইয়াও পুরাণ শ্রবণ করিল। সে যেন ঠিক ফাঁসিকাষ্ঠে বসিয়া আছে। আহারের সময়েও তাহার অব্যাহতি নাই। এই ঘটনার পর তিনি আমাকে মহারাজা ও 'বড় ঠাকুরে'র মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মিটাইতে বলিলেন। বলিলেন উভয় পক্ষ আমাকে শ্রদ্ধা করেন, আমি এই কার্য্য পারিব। তবে পুত্রের যুবরাজত্ব রহিত হইলে আত্মহত্যা করিবেন। আমি নানা কারণে অসম্মত হইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে সেই ব্যারিষ্টার আবার আমার গৃহে অতিথি হইয়া উপস্থিত। তখন এক অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিলাম। তিনি 'বড় ঠাকুরে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সন্ধ্যার সময়ে আগরতলা পঁহুছেন। ইনি যুবক, এখনও ব্যবসায়ে এপ্রেণ্টিস মাত্র। কিন্তু ইহাতেই আগরতলায় এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহার 'বাঃ বুদ্ধিমান্' মন্ত্রী ও অমাত্যদের লইয়া সভাস্থ হইয়া, সমস্ত রাত্রি এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া, প্রভাত সময়ে স্থির করিলেন যে, এই মশককে বলপূর্ব্বক আগরতলা হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। মহারাজ ডাকিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে প্রভাতে আনিয়া, কর্ণেল সাহেবের—তাঁহার বেতন শুনিয়াছি পঞ্চাশ মুদ্রা—'অর্ডার্লি' কক্ষে আবদ্ধ করা হইল। 'অর্ডার্লি' গৃহও বংশনির্ম্মিত কুড়ে ঘর। তাহারও অর্দ্ধাঙ্গ রোগে ধরাশায়ী হইয়াছে। কর্ণেল সাহেবের সৈন্য সারজন ফলস্‌টাফের men in Buckram এর জীবন্ত আদর্শ। সাংখ্যায় তাহারা ৮৯৷৷১৫ জন, কি এইরূপ। তাহারা ভগ্ন পুরাতন পাথরি বন্দুক স্কন্ধে লইয়া ও শতগ্রন্থিযুক্ত শতরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাহাকে ভীষণরূপে বেষ্টন করিল। আবার মরাহাজা তাঁহার 'বাঃ বুদ্ধিমান্'দের লইয়া সভাস্থ হইলেন। ছয় ঘণ্টাকাল গুরুতর পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, শিকারকে ডাকবাঙ্গলায় পেট ভরিয়া আহার করাইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রেরণ করিতে হইবে। কি গুরুতর দণ্ড! ডাকবাঙ্গলায় বন্দী যাইবার সময়ে মন্ত্রীর গৃহে গেল। তিনি 'খাইছে! খাইছে!' বলিয়া চীৎকার করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া, দুই হাত পশ্চাতে লইয়া, তাহাকে চলিয়া যাইতে ঘন ঘন সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। বন্দী হাসিয়া আকুল। তাহার পর তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া, সে আগরতলা হইতে চলিয়া গিয়া, গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিল। অপরাধ ত 'অর্ডার্লি' কক্ষে উপবেশন ও ডাকবাঙ্গলায় আহার! দণ্ডস্বরূপ তাহাকে মহারাজার পাঁচ শত টাকা ক্ষতিপূরণ ও এক 'এপলজি' (ক্ষমাপত্র) দিতে হইল! হা অদৃষ্ট!

এরূপ 'বাঃ বুদ্ধিমান্'দের দ্বারা আগরতলার রাজকার্য্য-প্রহসন নিত্য অভিনীত হয়। যাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন, প্রায় সকলেই শাসনকার্য্যে অনভিজ্ঞ। সকলেই নকলনবিশ মাত্র। বৃটিশ রাজ্যে যে শাসনপ্রণালীর ফলে আসমুদ্রহিমাচল এই হাহাকার উঠিয়াছে, কাহারও ঘরে অন্ন জল নাই, তাহার নকল করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বৃটিশ রাজপুরুষেরা খড়্গহস্ত। কারণ, এই বন্দোবস্তের

ফলে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয় না, কোটি কোটি লোক মরে না। অতএব নকলনবিশেরাও ত্রিপুরারাজ্যে কায়েমি বন্দোবস্ত দিবেন না। তাহাতে এখন মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরারাজ্যের মহাদেব ম্যানেজার স্বয়ং বলদেব—তিনি শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমী সিবিলিয়ান। আর 'সন্দেশ' সাহেব—অপদেব। ত্রিপুরা রাজ্যের বলদেব— ঈশ্বর-পিতা, সন্দেশ সাহেব—ঈশ্বর-পুত্র এবং মন্ত্রী মহাশয়—'হোলি গোষ্ট' বা ঈশ্বর-ভূত। এই 'ত্রিনিতি'র ফলে কুমিল্লা নগরে পর্য্যন্ত কায়েমি বন্দোবস্তি নাই। তাই সহরব্যাপী ভদ্রলোকদেরও কুঁড়ে ঘর এবং তাহার প্রত্যেকের পার্শ্বে অসংখ্য কলনাদী ভেকপূর্ণ এক গর্ত্ত ও এক খণ্ড ধানক্ষেত। তাহা না হইলে জোত জমা সিদ্ধ হয় না। অথচ কায়েমি বন্দোবস্তি দিলে মহারাজা বোধ হয়, লক্ষ টাকা নজর ও বর্ত্তমান খাজনার চতুর্গুণ খাজনা পাইতে পারেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অগ্নিদেব বাজার নগর ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই কারণে আমি কমিশনর আফিস হইতে কায়েমি বন্দোবস্তি দেওয়ার জন্য এক কড়া আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক দিন শশী বলিলেন যে, ম্যানেজার সাহেব কাচারির নিকট এক খণ্ড জমি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে বন্দোবস্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বলরামের কাছে লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম আলাপ—"আমি তোমার কি করিতে পারি?" আমি একবার ভাবিলাম বলি—"রম্ভা কাটিতে পার?" আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"শুনিলাম, আপনি ঐ জমিটুক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে কায়েমি বন্দোবস্তি দিতে চাহিয়াছেন।" তিনি বলিলেন—"সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।" তাহার পর শশীর দিকে ফিরিয়া—"তুমি জান ত্রিপুরাবাসী সকলেই বিখ্যাত মিথ্যাবাদী।" শশী ভায়ার মুখ চূণ হইল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া গম্ভীর-ভাবে সায় দিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া—"আপনি কেন ও জমি চাহেন?" উত্তর—"ভাল বাড়ী পাই না। একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিব।" তিনি গর্জ্জন করিয়া—"কি? ভাল বাড়ী! বাঙ্গালীর জন্য ভাল বাড়ী? তোমাদের ঐ সবজজটি যে ঐ গরুর ঘরে আছে, তাহার বেতন কত?" আমি উত্তর দিলাম না। তিনি—"আপনি কত টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিবেন?" আমি—"তিন চারি হাজার।" তাহার পর অধোমুখে বলিলেন—"আমি সেখানে অবিবাহিত কর্ম্মচারীদের জন্য একটা 'বেরেক' প্রস্তুত করিব।" আমি বলিলাম—দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি বিবাহিত। তাহার পর চলিয়া আসিবার সময়ে বলিলেন,—"আমি কয়েক জনকে পাকা বাড়ীর জন্য কায়েমি বন্দোবস্তি দিয়া ঠকিয়া 'তোবা' করিয়াছি। কেহই পাকা বাড়ী প্রস্তুত করে নাই। ত্রিপুরাবাসী এমন জুয়াচোর ও মিথ্যাবাদী।" এই মহাপুরুষই আগরতলার 'ঈশ্বর পিতা'! ইঁনিই সেই লাট ইলিয়টের বন্ধু, এজেণ্ট মন্ত্রীকে তাড়াইবার জন্য যাঁহাকে বীরচন্দ্র মাণিক্য ম্যানেজার করিয়াছিলেন। এখন আবার সেই তিনিই মন্ত্রী, এবং ইনি ম্যানেজার। আগরতলায় বাঘ ভেড়ায় এক স্থানে জল পান করিতেছে। উভয়ে তখন বীরচন্দ্রের প্রিয়পুত্র 'বড় ঠাকুরে'র বন্ধু ছিলেন। এখন উভয়ে তাঁহার গ্রীবাচ্ছেদ করিয়াছেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সত্য মিথ্যা জানি না।

ইহার পর আমার বন্ধু আনন্দ রায়ের দ্বারা আমি নিজে ফেশন দিয়া, তাঁহার নিজের জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলাম। কেবল গৃহটির পরিমাণ ভূমিখণ্ডটুক কায়েমি ছিল। তিনি উহা আমার গৃহের মত সুসজ্জিত করিলেন, এবং আমি মহারাজার এক বাড়ীতে উঠিয়া গেলে, এই বাড়ীর সমস্ত উদ্যান তুলিয়া লইয়া, তাঁহার নূতন বাড়ীতে লাগাইলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও দুই জন জমিদার দুটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, এইরূপে সজ্জিত ও উদ্যানে ভূষিত করিলেন। কুমিল্লায় আমি না গেলে কুমিল্লার শোভাবর্দ্ধক এই তিনটি বাড়ী হইত না। আমার সেই আনন্দালয়ের চারি দিকে চট্টগ্রামের মুসলমান ইন্‌স্‌পেক্টর এখন পাঁচ হাত উচ্চ বেড়া দিয়া ঘিরিয়া, উহা তাঁহার 'অন্দর'

করিয়াছেন। এই ঘরে আমার পূর্ব্বে মিসেস উইলিয়ম বলিয়া এক বিবি থাকিতেন। আমি উহার নাম এখন Fort William (ফোর্ট উইলিয়ম) রাখিয়াছি।

বিতাড়িত মন্ত্রীর পুনরাবির্ভাবের সহিত স্থানীয় লোক ত্রিপুরারাজ্য হইতে আবার বিতাড়িত হইতেছে, এবং উহা আবার পূর্ব্ববঙ্গবাসীতে ছাইয়া যাইতেছে। কুমিল্লার বৃটিশ আফিস সকলেও আগাগোড়া—ঢাকা! সমস্ত আফিস এক দল। স্বয়ং সেরেস্তাদার মহাশয় দলপতি। তিনি থিওসফিষ্ট এবং দীর্ঘকেশধারী। ম্যানেজার বলরাম সাহেব এ জন্য তাঁহার নাম রাখিয়াছেন— High priest of the Amlahs (আমলাদিগের 'হাই প্রিষ্ট' বা গুরু)। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন চট্টগ্রামের সেই ভৃঙ্গি মহাশয়। তিনি এখন ডেপুটি। তিনি এজলাসের সংলগ্ন Retiring room (প্রস্রাব-কক্ষকে) তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমলাবর্গের তাম্রকূট সেবনের কক্ষে পরিণত করিয়াছিলেন। আমি আসিয়া একরাশি 'গুল' পরিষ্কার করাইয়াছিলাম। শুনিয়াছি. সময়ে সময়ে তিনি তাম্রকূট-যন্ত্রহস্তে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উহা পার্শ্বস্থ আমলার সঙ্গে সময়ে সময়ে এজলাসেও হস্তপরিবর্ত্তন করিত। উক্ত যন্ত্রের ও তাঁহার বর্ণ ও কণ্ঠ অভিন্ন। 'ধর্ম্মাবতার' সুবিচার করিতেছেন. কি তাম্রকূট সেবন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে মোক্তার ও অর্থী প্রত্যর্থীরা ঘোরতর 'গোস্তাকি' করিয়া ফেলিত। অতএব বলা বাহুল্য, আমি যে যে সেরেস্তার ভার পাইলাম, সমস্তেই কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা। অথচ তাহাতে হাত দিতে গেলে আলিপুরের মত previous practice (প্রচলিত দস্তুরের) দোহাই উঠে, এবং সমস্ত আমলা মহলে ধর্ম্মঘট হয়। যিনি আমার পেস্কার, তিনি প্রাচীন ডেপুটি, আমার শিক্ষক হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং এক দিন আমার রায়ের আইনের ভুল হইয়াছে বলিলেন। আমি তাঁহাকে তিন মাসের জন্য পদচ্যুত করিলাম। তখন সেই হাই প্রিষ্ট সরেস্তাদারের রক্ষিত আমলা-রাজ্যে আমার প্রতিকূলে ধর্ম্মঘট আরও দৃঢ় হইল এবং যে ডিপার্টমেণ্টে হাত দিই, সেখানেই 'পুরাতন' দস্তুর-অস্ত্র আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৌজি সেরেস্তা কবুল জবাব দিল যে. তাহারা আমার নিয়মমত কাজ করিতে পারিবে না। আমি আলিপুর হইতে অঙ্ক আনাইয়া কলেক্টরের কাছে রিপোর্ট করিলে তিনি কড়া আদেশ দিলেন। তখন কলের মত কাজ চলিতে লাগিল। ট্রেজারির কাজ আমার পূর্ব্ববর্ত্তী—রাত্রি আটটা নয়টার সময়ে করিতেন। আমি আদেশ দিলাম যে, তিনটার সময়ে একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের নিয়মমতে কাজ বন্ধ করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে, আমি চারিটার সময়ে টাকা তুলিয়া রাখিব। একাউণ্ট সেরেস্তা বলিল—অসম্ভব। তাহাদের চাকরি ছাড়িতে হইবে। দেখিতে দেখিতেই উহা সম্ভব হইল। আমি চারিটার সময়ে ট্রেজারি বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম। যখন সকল ডিপার্টমেণ্টে নিয়মিত কাজ চলিতে লাগিল তখন আমার ঘণ্টাখানিকের বেশী কাজ ছিল না। অবশিষ্ট সময়ে লাউঞ্জ চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সংবাদপত্র পড়িয়া দিন কাটাইতাম। কলেক্টর মিঃ হেরিসও (Harris) মিঃ কলিয়ারের মত লোক। তাঁহার অধীনে কয়েক মাস বড়ই সুখে কাটাইলাম। তাহার পর মিঃ মোরসেড (Mr. Morshead) আসিলেন। তিনি আমার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—আমি ডেপুটির কার্য্যপ্রণালীই বা কি? তবে আমার এই নিয়ম আছে যে, আমি আফিসে যাইবার পূর্ব্বে এক টুকরা কাগজে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের হেড ক্লার্ক, সে দিন কোন্ ডিপার্টমেণ্টের কত ক্ষণের কাজ আছে তাহা লিখিয়া পাঠাইবে। আমি প্রথম ফৌজদারির কার্য্য শেষ করিয়া তাহাদের একে একে ডাকি ও এক এক ডিপার্টমেণ্টের কাজ শেষ করি। মিঃ মোরসেড বলিলেন—বড় সুন্দর নিয়ম, তিনিও তাহা অবলম্বন

করিবেন। কিন্তু তিনি এক দীর্ঘ রেজিষ্টারি করিলেন। তাহাতে জরুরি, খুব জরুরি, সাধারণ ইত্যাদি অসংখ্য ঘর হইল। উহা পূরণ করিতে আমলাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। অথচ এক ডিপার্টমেণ্টের কাজে হাত দিয়া, আবার আর এক ডিপার্টমেণ্ট ডাকেন। এরূপে একটা আমলার হাট বসিয়া যায়। কাজ কিছুই হয় না। আমার ডিপার্টমেণ্টগুলির কার্য্য কলের মত চলিতেছে। আমি সংবাদপত্র পড়িয়া দিন কাটাই বলিয়া কোনও খোষামুদে ডেপুটি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন আমার কাজ কিছুই নাই। তিনি আমার স্কন্ধে ডিপার্টমেণ্টের পর ডিপার্টমেণ্ট চাপাইতে লাগিলেন। যেটাতে আমি হাত দিই, সেটাতেই গোলযোগ বাহির হইয়া পড়ে। মহাফেজখানা ও নকলসেরেস্তা আমার হাতে আসিলে, আমি কার্য্যের নূতন নিয়ম করিয়া দিলাম। মহাফেজ জবাব দিলেন—'মু পারিবি না অবধড়!' আমি তাহাতে টলিবার নহি। দুই দিন আমার নিয়মমতে কাজ না চলিতেই দুইটা ষ্ট্যাম্প চুরি বাহির হইয়া পড়িল। একজন মুসলমান নকলনবিশ দাখিলি পঁচিশ টাকার ষ্ট্যাম্প চুরি করিয়া লইয়া, বাজারে বন্ধক দিয়া, তাহার উপপত্নীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে। তাহার দুই বৎসর জেল হইল। ইহার পর সংস্কারের জন্য মিঃ মোরসেড একে একে প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট আমার হাতে দিয়া একবারে পাশ কাটাইলেন।

শেষে এক ফৌজদারি বিচার লইয়া গোল বাধিল। আমি এক পুলিসের মোকদ্দমা খালাস দিয়াছি। খালাসের অন্য কারণের মধ্যে এক কারণ এই দিয়াছি যে, বাদীর পুলিসের সমক্ষের এজাহার ও কোর্টের সমক্ষের জবানবন্দির মধ্যে ঘোরতর অনৈক্য আছে। মিঃ মোরসেড রায়ের এই অংশের পাশে নোট করিয়া দিলেন যে, বাদীকে আবার ডাকাইয়া, এই অমিল সকল মিল করিয়া লওয়া আমার উচিত ছিল। আমি লিখিলাম, উহা বিচারকের কার্য্য নহে; বাদীর উকিল, কি কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টরের কার্য্য। তিনি তাহার পর লিখিলেন—"আমি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে এই মতে ঐক্যমত হইতে পারি না।" আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম।" তিনি তাহার দুই এক দিন পরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সদরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ফৌজদারি কার্য্য দুই জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হাতে দিলে ভাল চলিবে। আমি উহা ভাল বিবেচনা করি। অতএব আপনার হাতে যে এক খানা আছে, তাহা উঠাইয়া লইতে চাহি।" আমি বলিলাম—"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমার এই বয়সে লোককে কয়েদ করা ও বেত মারা বড় প্রীতিকর কার্য্য নহে। আমি এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইলে বরং তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ হইব।" যাহা হউক, মোরসেড যদিও সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলেন—এমন কি, 'হাই প্রিষ্ট' পর্য্যন্ত ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার প্রতি কোনও অসদ্‌ব্যবহার করেন নাই। বরং আমাকে আমার রোগের সময়ে বারম্বার আমার গৃহে কার্য্য করিতে দিয়া, এবং অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ফৌজদারির কাজ চলিয়া যাইবার পর, আমার কার্য্যভার আরও লাঘব হইল। বহু ডিপার্টমেণ্ট আমার হাতে থাকাতেও আমার নিয়মমতে কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে চলিতেছিল যে, আমার ঘণ্টাখানিকের কাজও ছিল না। বারটার পর কাচারি যাইতাম, আর চারিটার পর চলিয়া আসিতাম। আমি কেমন করিয়া এত অল্প সময়ে এমন সুশৃংখলামতে এত কার্য্য করিতাম, স্বয়ং মোরসেড বারম্বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পুত্রের বিবাহ

চট্টগ্রামের বৈদ্যসংখ্যা মুষ্টিমেয়। সে জন্য বিবাহ—বিশেষতঃ কন্যার বিবাহ কষ্টকর হইয়াছে। যে কয়েক ঘর বৈদ্য আছে,—সমস্তই প্রায় 'বর্গি' বিপ্লবের সময়ে রাঢ়দেশ

হইতে সমাগত,—প্রায় সকলেই দরিদ্র। অতএব আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম, পুত্রকে কলিকাতা অঞ্চলে বিবাহ করাইয়া, চট্টগ্রামের বৈদ্যদের একটি সুবিধার ও উন্নতির পথ খুলিব। দুই ব্যারিস্টার ও খ্যাতনামা কবিরাজপরিবারের সঙ্গে কথাও চলিয়াছিল। এক ব্যারিস্টার-পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তাঁহার স্ত্রী ও আমার স্ত্রী উভয়কে 'বেহায়িন' করিবেন বলিয়া সর্ব্বদা রসিকতা করিতেন। আমি তাঁহাদের বরাবর এরূপ রসিকতা করিতে নিষেধ করিতাম। ইহার ফলে দুটি বালক বালিকার মনে একটা ভালবাসায় ছায়া পড়িয়াছিল। পুত্রকে যখন বিলাত পাঠানই আমার স্থির সংকল্প, তখন আমারও এই বিবাহে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার আত্মীয়েরা কিছুতেই তাহা হইতে দিবেন না। আমিও দেখিলাম, এরূপ বিবাহে এক দিকে আমার নয় পুরুষের কুলগৌরব পুত্রকে বলিদান দিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সমাজ, এবং প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ আমার মাতৃভূমি একরূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'আত্মীয়েরা' স্ত্রীকে ফিরাইয়া ফেলিলেন। তিনিও বলিতে লাগিলেন যে, কলিকাতা অঞ্চল হইতে বিবাহ করাইলে, বউ কেবল কলিকাতার দিকে টানিবে। দেশে আমাদের এই বংশগৌরব, এই প্রতিপত্তি ও বিষয়, সকলই ভাসিয়া যাইবে। আত্মীয়েরা আরও বলিলেন, বিবাহ কলিকাতায় হইলে তাঁহারা কেহ দেখিতে পাইবেন না। দেশের লোকেও কেহ দেখিতে পাইবে না। আমাদের পুরুষানুক্রমে কখনও পৈতৃক বাড়ীতে ভিন্ন বিবাহ হয় নাই। ঐরূপে বিবাহ পূর্ব্বপুরুষেরা অগৌরব মনে করিতেন। অতএব তাঁহাদের জিদ—আমার নিজগ্রামে, আমার জন্মস্থানে, বিবাহ এরূপ সমারোহে দিতে হইবে, যেন চট্টগ্রামে উহা আদর্শ হইয়া থাকে। কলিকাতা ছাড়িয়া চট্টগ্রামে বদলি হইবার এই বিবাহও এক কারণ। চট্টগ্রামে দেড় বৎসর নানা উৎপাতে কাটিয়া গেল। অতএব কুমিল্লা আসিবার পর এই প্রস্তাব চলিতে লাগিল। স্ত্রী মেয়ে যেটি দেখেন, সেটির সঙ্গেই বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। অবশেষে একটি মেয়েকে দেখিয়া এরূপ ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহের জবাব দিবেন বলিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। নির্ম্মল বলিল, —"বাবা! মা যাকে দেখে, তাকেই মায়ের পছন্দ হয়। তুমি একবার নিজে না দেখিয়া কিছু স্থির করিও না।" আমরা পিতাপুত্র উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু। আশৈশব তাহাকে আমি এরূপ ভাবে গঠিত করিয়া আনিয়াছি যে, আমি তাহার পিতা ও বন্ধু এবং সে আমার পুত্র ও বন্ধু। অতএব তাহার বিবাহের কথা পর্য্যন্ত সে আমার সঙ্গে অম্লানমুখে বলিত। আমি একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য এই মেয়েটিকে নিজে দেখিয়াছিলাম, এবং তখনই পত্নীকে বলিয়াছিলাম, তুমি এই মেয়েটিকে বিবাহ করাও না কেন ? তিনি চটিয়া লাল। বলিলেন,—"হাঁ, এত বড়মানুষের মেয়ে ছাড়িয়া, তিনি একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আনিয়া বিয়া করাইবেন!" কিন্তু আমার সেই কথাই অব্যর্থ হইল। মেয়ে দেখিয়া তিনিও তাহাকে পছন্দ করিতেন। পুত্রের যখন বয়স কুড়ি উত্তীর্ণ। তাহার হৃদয়ে সেই ব্যারিস্টার-কন্যাটির ছায়া ছিল। বিশেষতঃ গত বার কলিকাতা হইয়া বৈদ্যনাথ যাইবার সময়ে সে তাহাকে একপ্রকার প্রতিজ্ঞাবন্ধ করিয়াছিল। আমি পুত্রকে বুঝাইলাম, প্রথমতঃ আমার বংশের অগৌরব। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়দের অমত। তৃতীয়তঃ দেশ ও সমাজ ত্যাগ। কারণ, উক্ত ব্যারিস্টার মহাশয় হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। চতুর্থতঃ পাছে বিবাহ করাইয়া বিলাত পাঠাইলে বিলাতের খরচ তাঁহার ঘাড়ে পড়ে, তিনি বলিয়াছেন যে, পুত্র বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায়ে দাঁড়াইলে, তবে বিবাহ হইবে। তিনি জানেন যে, আমি আমার এক পুত্রের জন্য তাঁহার কাছে ভিক্ষার্থী হইব না। তবে যদি বিবাহের পর আমি মরি! সর্ব্বশেষে পুত্রকে অন্যূন তিন বৎসর বিলাতে থাকিতে হইবে। ব্যারিস্টার মহাশয় যদি ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠতর বর পাইয়া

তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া ফেলেন, তবে তাহা আমার ও পুত্রের কত বড় অপমান ও মনস্তাপের কথা হইবে। নির্ম্মল বুঝিল, এবং তাহার মাতার প্রস্তাবে সম্মত হইল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২২শে মাঘ শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজার দিবসে বিবাহ স্থির হইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া কবি ভ্রাতা রবিবাবু লিখিয়াছিলেন,—"সরস্বতীপূজার দিন গৃহে লক্ষ্মীস্থাপন করিয়া, নির্ম্মল মধ্যবর্ত্তিরূপে উভয় দেবীকে চিরসম্মিলনে গৃহাশ্রমে আবদ্ধ করিয়া রাখুন, এই আমার আশীর্ব্বাদ।" আমার স্নেহাস্পদ ভাই তারাচরণ তখন চট্টগ্রামে মুন্সেফ। তারা ধরিয়া বসিল যে, এই বিবাহে শুধু বাই-খেমটা ও যাত্রা হইলে হইবে না। সে সব আরও বিবাহে হইয়াছে। কিছু একটা নূতন দেখাইতে হইবে। আমি তদনুসারে তিনটি নূতন সঙ্কল্প করিলাম। প্রথমতঃ একটা নূতন রকম আসর কেবল বৃক্ষাদির দৃশ্যাবলীর দ্বারা করিব। কলিকাতায় চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত একটি লোককে আমার সমস্ত কল্পনা বুঝাইয়া দিলাম। সে উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিল। কিন্তু আমি কুমিল্লায়। কার্য্যের সময় সে ও আমার 'সাকৃত' এক খুড়তত ভাই যে আমাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আসর নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিল, উভয়েই বার বার জবাব দিল যে, তাহারা ইহার কিনারা করিতে পারিবে না। অতএব আমাকে কুমিল্লা হইতে বারম্বার তাহার বর্ণনা ও নক্‌সা আঁকিয়া পাঠাইতে হইল। দ্বিতীয়তঃ শান্তিপুরে রাসের সময়ে যেরূপ 'মিছিল' (procession) বাহির হইয়া থাকে, বর-যাত্রার সময়ে বরের চণ্ডেলের অগ্রে সেরূপ মিছিল থাকিবে। আমার বাড়ীতে যে ঠাকুর গড়ে, তাহার একটি ছেলেকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া, আমি পুতুল নির্ম্মাণ শিক্ষা করাইয়া আনিয়াছিলাম। এই কার্যের ভার তাহাকে দিলাম। পুতুলের মধ্যে স্মরণ হয়, রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ, হর গৌরী, শকুন্তলা দুষ্মন্ত, সাবিত্রী সত্যবান্, নল দময়ন্তী, রাম সীতা, অর্জ্জুন সুভদ্রা, এরূপ কতকগুলি পৌরাণিক মূর্ত্তি এবং কয়েকটি নর্ত্তকীর ও পরীর কল্পনা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ তিনটি মাত্র দৃশ্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র 'অপেরেট্টা' (operatta) লিখিলাম। প্রথম দৃশ্যে বর ও পুরোহিত। পুরোহিতের মুখে হিন্দু বিবাহের ব্যাখ্যা এবং বরের কয়েকটি উপাসনামূলক গান। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার কুলমাতা দশভুজার দ্বারা নন্দনের পারিজাতগ্রথিত পরিণয়-মালা আমার গৃহলক্ষ্মীকে প্রদান ও উভয়ের মুখে আশীর্ব্বাদ-গীত। তৃতীয় দৃশ্যে বর সভাসীন ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুই অপ্সরার নৃত্যগীত। আমি একমাস যাবৎ কুমিল্লায় তালিম দিয়া দুইটি বালককে নূতন প্রকারের নৃত্য শিখাইয়াছিলাম।

কলেক্টর মিঃ হেরিস আমাকে দশটি দিন মাত্র ছুটি দিয়াছিলেন। বিবাহের সাত মাত্র পূর্ব্বে আমি বাড়ী পঁহুছিলাম। দেখিলাম, এক দিকে তারাচরণ দেশব্যাপী সমস্ত ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করাইয়াছেন। দেশে একটা মহা sensation (তোলপাড়) পড়িয়া গিয়াছে। সকলে বলিতে লাগিলেন যে, সমস্ত চট্টগ্রাম জেলা হইতে তামাসা দেখিতে লোক আসিবে। অন্যূন দশ হাজার লোকের ভিড় হইবে। উহা সামলান অসাধ্য হইবে। অন্য দিকে সমস্ত কার্য্য আমার সংসার-জ্ঞানহীন ভ্রাতাদের অবহেলায় এরূপ অসম্পূর্ণ যে, আমার সমস্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন 'গেট' ইত্যাদি কিছু কিছু বাদ দিয়া, কাজ যথাসাধ্য শেষ করাইলাম। প্রত্যহ শত শত লোক খাটিতেছিল। বিবাহদিবস সন্ধ্যা হইতে না হইতে এমন তামাসাগিরের ভিড় হইল যে, আমার পর্য্যন্ত কোনও দিকে যাইবার সাধ্য নাই। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। যাহা হউক তারাচরণ ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রমেশ, আমার খুড়া ও পুত্রপ্রতিম অখিলবাবু ও অন্যান্য অভিভাবকেরা প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে সন্ধ্যার পর মিছিলের

পশ্চাৎ বর গ্রামপরিক্রমণে বাহির হইল। সমস্ত গ্রামে লোকের জনতা। যত দূর দেখা যাইতেছে, কেবল লোকসমারোহের পর লোকসমারোহ। মিছিল দেখিয়া সকলে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। গ্রামের বৃক্ষছায়ার অন্তরালে সেই আলোকশ্রেণী-সজ্জিত মিছিলের শোভা অবর্ণনীয়। আমরা দাঁড়াইয়া এই শোভা দেখিতেছি, এ দিকে আসরের অভিভাবক আসিয়া বলিলেন যে, বর সভাস্থ হইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু এখনও খেমটাওয়ালীরা নাচিতে উঠিল না। ঢাকার উৎকৃষ্ট বাই-খেমটা আমার ঢাকাস্থ বন্ধুগণ নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সভায় প্রবেশ করিব সাধ্য নাই। একজন নিমন্ত্রিত ডেপুটি ভিড়ে পড়িয়া চীৎকার করিতেছেন। তাঁহাকে ভিড় হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আমি আসরের দ্বারস্থ কনষ্টেবলকে কৌতুক করিয়া পিঠে চড় মারিয়া বলিলাম,—"ওরে হতভাগা! তোদের হাকিম একটি মারা যায়, আর তোরা তামাসা দেখ্‌ছিস্!" এক শত চৌকিদার কনষ্টেবল সহ সবইন্‌স্‌পেক্টর, ইনস্‌পেক্টর আসিয়াছেন। সকলেই তামাসা দেখিতেছে, ভিড় থামায় কে? আসরের প্রত্যেক স্তম্ভের গায় এক একটি চিত্রিত বৃক্ষ। কোথাও তালবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি তাল ধরিয়াছে। কোথায়ও কদলিবৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও ফলশোভিত নারিকেল বৃক্ষ। কোথাও পেঁপে গাছ। পেঁপে ফাটিয়া পড়িয়াছে ও বায়স বসিয়া খাইতেছে। কোথাও কৃষ্ণচূড়া, কোথাও নাগেশ্বর ফুলে পত্র ছাপিয়া গিয়াছে। নৃত্যস্থানের চারি কোণায় চারিটি নৃত্যশীলা পরী। তাহাদের মস্তকে পুষ্পস্তবকের মধ্যে 'কারবাইড' আলো। তাহাদের দুই হস্তে প্রসারিত রুমালে লেখা আছে—'শুভ বিবাহ'। নানাবিধ আলোকে এই সকল বৃক্ষ ও পক্ষী প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। নর্ত্তকীরা নাচিবে কি, আত্মহারা হইয়া একে অন্যকে এই দৃশ্য সকল দেখাইতেছে। আমি গিয়া ভর্ৎসনা করিলে তাহারা বলিল যে, তাহারা অনেক রাজা মহারাজা ও নবাবের আসরে নাচিয়াছে, বহুমূল্য ঝাড় লণ্ঠন দেখিয়াছে। কিন্তু এমন একটি সুন্দর আসর তাহারা দেখে নাই। সভাস্থ নিমন্ত্রিত দেশীয় বিদেশীয় ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও আসরের ঘোরতর সমালোচনা চলিতেছে। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—"অবশ্য কল্পনা বুঝিতেছি আপনার। কিন্তু তাহা এমন সুন্দররূপে কার্য্যে পরিণত করিল কে?" আমি আমার চিত্রকর, পুতুল-নির্ম্মাতা ও সেই খুড়তত ভাইকে দেখাইয়া দিলাম। তাঁহারা তাহাদের অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। চারি দিকে সহস্র সহস্র লোকের ভিড়। পুলিস গোল নিবারণে অক্ষম। ইন্‌স্‌পেক্টর পর্যন্ত জবাব দিলেন। তখন আমি উঠিয়া, আনন্দাশ্রুনয়নে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম,—"তোমরা দেখিবে বলিয়া আমি এই সকল আয়োজন করিয়াছি। তোমরা সকলে আমার দেশের লোক। তোমরা এরূপ গোল না করিয়া বসিয়া যাও ও মনের আনন্দে দেখ ও শুন।" তৎক্ষণাৎ সমস্ত লোক বসিয়া গেল, এবং গোল থামিয়া গেল। একজন বিদেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারী বলিলেন,—"দেখিলেন, লোকটির ক্ষমতা!"

আমার বন্ধু কলিকাতার এইচ. সি. গাঙ্গুলি মহাশয়েরা সুন্দর কবিত্বপূর্ণ নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে সমস্ত উৎসবের 'প্রোগ্রাম' ছাপা ছিল। আটটার পর 'অপেরা'। তাহার 'ষ্টেজ' বিবাহ-বেদীর পার্শ্বেই অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়া-ছিলাম। বেদীর উত্তর দিকে ষ্টেজ, এবং অপর তিন দিকে দর্শকদিগের বসিবার ফরাস-বিছানা। এই স্থানটিও পত্রে পুষ্পে ও আলোকে সজ্জিত ছিল। নির্ম্মল পূর্ব্বরাত্রিতে তাহার সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া গান করিয়া, প্রাতে আমাকে কবুল জবাব দিয়াছেন যে, তাঁহার গলা ধরিয়া গিয়াছে। তিনি 'অপেরা'য় গাইতে পারিবেন না। দেখিলাম, সত্য সত্যই তাহার গলা ধরিয়াছে। পুত্র আমার সকল বিষয়ে

এরূপ অসাবধান। আমার মনস্তাপের সীমা রহিল না। কিন্তু যেই যবনিকা উঠিল, এবং পুরোহিত আমাদের কুলমাতার দিকে দেখাইয়া, তাহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন, সে জানু পাতিয়া, প্রণাম করিয়া, মা! মা! বলিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া, 'হারমোনিয়াম' লইয়া বসিল, অকস্মাৎ তাহার গলা ছাড়িয়া দিল। আমার নির্ম্মলের প্রাণে ভক্তি আছে, সে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সজলনয়নে যখন কুলমাতার দিকে চাহিয়া গাইতে লাগিল, তখন শ্রোতাগণেরও চক্ষু সজল হইল। তাঁহারা 'বেঁচে থাক বাবা!' বলিয়া খুব বাহবা দিতে লাগিলেন। গান শেষ হইলে তাঁহারা 'এনকোর' 'এনকোর' করিতেছিলেন। তখন আমি ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম যে, একে পুত্রের গলা ধরিয়াছে, তাহাতে দশটার সময়ে বিবাহ। বলিলাম, বরের মুখে আরও গান আছে। বাহিরের আসরে নৃত্যগীত রাখিয়া, আমি কেবল বাছা বাছা শিক্ষিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে এই অপেরা শুনিতে আনিয়াছিলাম। তথাপি এই প্রাঙ্গণের বাহিরে এমন ভিড় হইল যে, ভয় হইল—লোকে বাড়ী ঘর উড়াইয়া দিবে। আমি তাহাদের চেঁচাইয়া বলিলাম যে, কাল আমি এই 'অপেরা' বাহিরের আসরে দিয়া, তাহাদিগকে দেখাইব। আমার পুরোহিত বি. এ., বি. এল। কিন্তু ভয়ে প্রথম তিনি কাঁপিতেছিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সাহস দিলে, তিনি হিন্দু-বিবাহের ব্যাখ্যা করিয়া বরকে বুঝাইতে লাগিলেন। বিদেশীয় নিমন্ত্রিতরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অভিনেতা কে? আমি বলিলাম, তিনি অভিনেতা নহেন, আমার প্রকৃত পুরোহিত, 'ষ্টেজ' হইতে নামিয়া তিনিই বিবাহ করাইবেন। অপেরার প্রত্যেক অঙ্কে তাঁহারা বাহবা দিলেন। শেষ হইলে বলিলেন যে, কলিকাতার 'ষ্টেজে'ও তাঁহারা এমন সুন্দর পরিচ্ছদ, নৃত্য, গীত ও অভিনয় দেখেন নাই। আমি পার্ব্বত্য মাতার সন্তান। নর্ত্তকী অপ্সরাদের কতক আমাদের পাহাড়ীয়া রমণীদের পোষাক দিয়াছিলাম।

'অপেরা'র পর বিবাহ আরম্ভ হইল। কন্যা পূর্ব্বদিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমার বংশের ছত্রিশ জাতি প্রজা। এত লোক বরের সঙ্গে যায় যে, দেশের প্রায় কেহ এই চোট সামলাইতে পারে না। অতএব শ্বশুরবাড়ীতে বিবাহ আমার বংশীয়দের বড় ঘটে না। দর্শকদের তখন বাহিরের আসরে যাইতে অনুরোধ করিলে, কেহ কেহ যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আহা! কি দেখিলাম! কি শুনিলাম! ইহার পর আর সেই বাই-খেমটার নাচ-গান শুনিতে যাইব না।' এই 'অপেরা'র মূল্য দশ হাজার টাকা। ইহার কাছে বাই-খেমটার নাচ এক কড়াও লাগে না।" দেখিলাম, তাঁহারা 'অপেরা' লইয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আসরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার কলিকাতা অঞ্চলের বন্ধু খ্যাতনামা সুলেখক ও 'রৈবতকের' সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,— তিনি তখন চট্টগ্রামের প্রধান জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন,—বলিলেন—"দাদা! তোমার মাথায় এত আছে জানিতাম না। তোমার বাড়ীর মাটির ঘর, কিন্তু ইহার কাছে ইমারত কোথায় লাগে? এক একটি ঘর এক একটি কবিতা। তাহার পর এই নৃত্য-গীত, পোষাক-পরিচ্ছদের কল্পনাই বা তুমি কোথায় পাইলে?" তাঁহার শিক্ষিত সুযোগ্য ভূম্যধিকারী মহাশয় বলিলেন,—"নৃত্য-গীতের ত কথাই নাই। কিন্তু আমি হিন্দু-বিবাহের ব্যাখ্যায় বিস্মিত হইয়াছি। কত বিবাহ দেখিয়াছি, কত বার বিবাহপদ্ধতি নিজে পড়িয়াছি। কিন্তু হিন্দু-বিবাহের মধ্যে যে এমন গভীর অর্থ আছে, আমি জানিতাম না। আজ আমার শিক্ষা হইল।"

ইহার পর বহু শত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের ও সহস্র সহস্র দর্শকের আহারের পর আমি রুগ্নদেহে মৃতবৎ পড়িয়া থাকি। শুনিলাম, সেই রাত্রিতে অনুমান পাঁচ হাজার

লোকে আহার করিয়াছিল। প্রদোষে তন্দ্রা ভাঙ্গিলে কি মধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল! আসরে যাত্রাওয়ালারা ভৈরব রাগিণী ধরিয়াছে। সম্মুখে সরোবরের গর্ভস্থ সজ্জিত 'জলটুঙ্গি'তে রোশনচৌকির বাঁশী ও ক্লারিয়নেটে ভৈরবী রাগিণী আলাপ করিতেছে। প্রাঙ্গণের অপর ভাগে 'ব্যান্ডমঞ্চে' 'ব্যান্ডের' বাঁশীতেও ভৈরব রাগিণী বাজিতেছে। উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভৈরব রাগিণী গ্রাম প্লাবিত করিয়া, গগন পূর্ণিত করিতেছে। দেখিলাম, সমস্ত বাড়ীতে ও পুষ্করিণীর পাড়ে নিমন্ত্রিতগণ চিত্রবৎ দাঁড়াইয়া এই সঙ্গীত নীরবে শুনিতেছেন। সে দিন সন্ধ্যার পর বাহিরের আসরে 'অপেরা' হইবার কথা। কিন্তু পাঁচটার সময় যাইয়া দেখি, আসরের অধ্যক্ষ সেই খুড়তত ভ্রাতা 'স্টেজ' বাঁধেন নাই। তিনি বলিলেন, পূর্ব্বরাত্রিতে বাই-খেমটারা মোটেও গায় নাই। মুফত টাকা লইবে। অতএব আজ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের গান তাঁহারা শুনিবেন। পুত্রও জবাব দিলেন যে. আজ তিনি কোনও মতে গাহিতে পারিবেন না। কিন্তু সন্ধ্যা না হইতেই বহু আত্মীয়ের অনুরোধে এবং বাই-খেমটাদের অনুনয়ে দেখি, পুত্র ও অন্যান্য অভিনেতারা সজ্জিত হইয়াছেন। বাই-খেমটারা জিদ করিয়া বসিয়াছে যে, 'অপেরা' না দেখিয়া তাহারা গাহিবেও না, নাচিবেও না। অতএব সেই খোলা আসরে অভিনয় হইল। দুর্গার নন্দী মহাশয়ের অভিনয়ে লোকে ও বাই-খেমটারা হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। পূর্ব্বদিনও তিনি খুব বাহবা পাইয়াছিলেন। তিনি একজন যাত্রাদলের পাকা অভিনেতা। 'অপেরা'র নর্ত্তকীর অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে বহি দেখিয়া বাই-খেমটারাও গাইতেছিল। 'অপেরা' শেষ হইল। তাহাদের উঠিতে বলিলে তাহারা বলিল,—"ইহার পর আমরা কি ছাই নাচিব, আর গাহিব? যাহা দেখিয়া শুনিয়া গেলাম, আমরা এ জীবনে ভুলিব না।" এরূপে তিন দিন তিন রাত্রি আসরে নৃত্য-গীত ও উৎসব চলিয়াছিল। ঢোল হইতে 'ব্যান্ড' রোশনচৌকি নহবৎ পর্য্যন্ত এমন বাদ্য নাই, গাজির গান হইতে বাই-খেমটা ও যাত্রা পর্য্যন্ত কিছুই আত্মীয়েরা বাদ দেন নাই। তদ্ভিন্ন বহুরূপী ইত্যাদি এমন তামাসা নাই, যাহা সংগৃহীত না হইয়াছিল। সমস্ত উৎসবে দশ দিনে দশ সহস্র লোক আহার করিয়াছিল। সম্মুখস্থ দীর্ঘ পুষ্করিণীর পাড়ে পর্য্যন্ত রান্নার চুলা পড়িয়াছিল। গ্রামের এমন বাড়ী নাই, যাহার বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া ভিড় উপস্থিত না করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলার সংখ্যাই কেবল প্রায় চারি শত ছিল। চতুর্থ দিবস এই উৎসব হইতে যখন আমি আমার কুমিল্লার নির্জ্জন গৃহে একা ফিরিয়া গেলাম, আমার কাছে যেন সকলই একটি বিচিত্র স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। কলিকাতা হইতে ও নানা স্থান হইতে বন্ধুরা আশীর্ব্বাদ উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের সেই 'পাগলী' বউকে যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, তাঁহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বউয়ের নাম চপলা।

চপলার প্রতি

"কে তুমি গো আলো-রাণী এসেছ মোদের ঘরে?
তোরে পেয়ে পিতা মাতা ভেসেছে স্নেহের সরে।
আয় কাছে একবার. দেখি ও রূপের খনি,
আয় লো চপলে বধূ! আয় কাছে আদরিণী!
অভাগিনী জেনে কি লো আসিবি না মোর কাছে?
দেখ এসে এই হৃদে কি প্রেম. কি স্নেহ আছে।
গোপনে হৃদয়তলে রেখেছি সে স্নেহ মোর।
সেই প্রেমে সেই স্নেহে ভরে দিব হৃদি তোর।

আয় তবে, আয় কাছে, ওলো স্নেহময়ী মেয়ে।
কি জ্বালা জ্বলিছে প্রাণে একবার দেখ চেয়ে।
পারিবি কি নিবাইতে এ দারুণ দাবানল?
আশা যে হয় না মনে নিবারিবে এ অনল।
দারুণ শোক আঁধারে হ'য়ে আছি দিশেহারা।
আলোময়ী তুই এসে দেখা এ সুখের ধরা।
তোরে পেলে ঘুচে যাবে হৃদয়ের শোক মোর;
তোর স্নেহে মগ্ন হব তোতেই রহিব ভোর।
'নীরদে'র বুকে চাঁদ, তাতে পড়ে তোর আলো,
কে না তোর রূপে ভোলে, কে না তোরে বাসে ভালো?
জগতের লোক তোর রূপে বিহ্বলা;
ভুবন ভুলান মেয়ে তুই চপলা!
শিখো স্নেহ শিখো ভক্তি ধর্ম্মে দিও মন,
ক্ষণপ্রভা চিরপ্রভা করো বিতরণ।"

এপ্রিল মাসে পত্নী পুত্রবধূকে লইয়া কুমিল্লা আসিলেন। পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা! তুমি লেখাপড়া কি পর্যন্ত জান;" বউ কহিল,—"বাবা! আমি কিছুই জানি না।" আমার মাথায় তৎক্ষণাৎ আকাশ ভাঙিগয়া পড়িলে আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। তাহার পিতা সপরিবারে সারা জীবন চট্টগ্রাম সহরে ফিরিঙ্গি মহলে কাটাইতেছেন। নিজে সুশিক্ষিত লোক, এবং দেশের একজন প্রধান মোক্তার। আমি মনে করিয়াছিলাম, যখন দেশের চাষার মেয়েরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা জানে, তখন তিনি তাঁহারা কন্যাকে ইংরাজি পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন। পুত্র কলিকাতার ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরতদের মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করিয়া আসিয়াছে। হা ভগবান্! কোথায় মনে করিয়াছিলাম, একটি ভাল শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করাইব, কোথায় একটি বনের পাখী ঘরে আনিলাম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা! তুমি অবশ্য বাঙ্গালা জান।" বউ ম্লানমুখে উত্তর করিল,—"না বাবা! আমি বাঙ্গালাও জানি না।" আমি বলিলাম,—"তোমার বাপ ত আমার মুণ্ডুটা খাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস ছিল তুমি ইংরাজি পর্য্যন্ত জান।" পুত্র কক্ষান্তর হইতে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"বাবা! তুমি যে দোকানদারদের মহাভারত পড়ার নকল করিয়া থাক—ম—হ—মহ, হয়ে আকার হা—মহা, ভয়ে আকার ভা, —মহাভা, র—ত—মহাভারত, বাঙ্গালাও সেরূপ জানে" এই বিদ্রূপে বালিকার মুখ আরও ম্লান হইল। সে বিষন্নমুখে বলিল,—"বাবা! আমি আপনার কাছে পড়িব। আমি এক বৎসরের মধ্যে লেখাপড়া শিখিব।" তাহার মুখ দেখিয়া আমারও মনে কষ্ট হইল। আমি তাহাকে তখন সস্নেহে বুকে লইয়া বলিলাম,—"তা বই কি মা! আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইব।" সে দিনই হাতেখড়ি দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম শিক্ষা দিতে লাগিলাম। বালিকার এমন তেজস্বিনী বুদ্ধি যে, সে সপ্তাহমধ্যে দুই হাতে হারমোনিয়মের পর্দ্দা টানিয়া, ছোট ছোট গান বাজাইতে ও গাইতে শিখিল। তাহার পিতৃমাতৃকুলে সঙ্গীতের স নাই। কাহাকে কিলাইলেও শব্দ করিবে না, পাছে কোনওরূপ 'সুর' বাহির হয়। আশ্চর্য্য! এই বালিকা এ শক্তি কোথা হইতে পাইল? তাহাকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া বিপদে পড়িলাম। কি পড়াইব? বউ এখনও বালিকা, দশ বৎসর মাত্র বয়স, শিশু বলিলেও চলে। কলিকাতার 'টেক্স্ট বুক কমিটি'র ত্রিমূর্ত্তির এবং তাঁহাদের ও শিক্ষা-বিভাগের 'আইনি বে-আইনি কুটুম্ব'গণের কৃপায়

যাহা বঙ্গদেশে পাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিচিত, তাহা সকলই অপাঠ্য। এই সকল নীরস, লালিত্যহীন, শ্রীক্ষেত্রের 'দন্তভাঙ্গা' শব্দপূর্ণ পুস্তক পাঠ করার তুল্য বালক-বালিকার পক্ষে অধিক কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না। অন্য দিকে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্কিমবাবুর কোনও উপন্যাসই পিতা পুত্রীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে পড়াইবার জো নাই। তখন অগত্যা আমার 'ভানুমতী' পড়াইতে আরম্ভ করিলাম, এবং বালিকা তাহা কেবল আনন্দে-পাঠ করিল, তাহা নহে। তাহার কোমল হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হইল। সে আমাকে একদিন বলিল,—"বাবা! আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাহি নাই। তুমি একটি জিনিস আমাকে আনাইয়া দিবে?" আমি—"কি মা?" সে—"বাবা! ভানুমতী যেরূপ বাল-গোপালমূর্ত্তি তাহার বক্ষের কাপড়ের মধ্যে রাখিত, সেরূপ মূর্ত্তি কি পাওয়া যায়?" আমি—"বোধ হয়, কাশীতে পাওয়া যাইতে পারে।" সে—"বাবা! আমাকে একটা মূর্ত্তি আনাইয়া দেও।" আমার বন্ধু উমাচরণবাবুকে পত্র লিখিয়া, একটি পিতলের লাড়ু-গোপালমূর্ত্তি তাহাকে আনাইয়া দিলাম। মূর্ত্তিটি কিছু বড়। বুকে বুকে রাখা যাইতে পারে না। বালিকা তাহার সুন্দর খাট ও আসন প্রস্তুত করিয়া, সেই মূর্ত্তি স্থাপিত করিল, এবং তাহাকে নিত্য স্নান না করাইয়া ও ফুলজল না দিয়া জলগ্রহণ করিত না। আর এক দিন আমি আফিস হইতে আসিলে, বউ আমাকে জলখাবার দিয়া বলিল, —"বাবা! 'ভানুমতী'র যে অংশ তুমি আমাকে কঠিন বলিয়া এখনও পড়াও নাই, পরে পড়াইবে বলিয়াছ, আমি তাহা নিজে পড়িয়াছি। বৈষ্ণবদের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস কি, আমি পড়িয়াছি ও একপ্রকার বুঝিয়াছি। তুমি আমাকে একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে কি?" বালিকা 'ভানুমতী' আনিয়া পড়িতে লাগিল, এবং আমি বুঝাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, ভক্তিতে বার বৎসর বয়স্কা বালিকার কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

পুত্রের বিলাতযাত্রা

দেখিতে দেখিতে পুত্রের বিলাতযাত্রার দিন নিকট হইয়া পড়িল। দুই কারণে তাহাকে বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এখন কোন মূল্য নাই বলিলেই চলে। অন্য দিকে আয়ুঃক্ষয়। জানি না, ভারতবাসী-দের কোন্ পাপে এই শিক্ষানলে তাহাদের নিরাপরাধ শিশুগুলি দগ্ধ হইতেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক বা যুবক, তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য গিয়াছে, যম তাহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। শরীরে স্বাস্থ্য নাই, হৃদয়ে আশা নাই, উৎসাহ নাই, সংসারে অবলম্বন নাই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এই আগুনে আমার একমাত্র সন্তানকে পোড়াইব না। দ্বিতীয়তঃ, রাণাঘাটের ম্যালেরিয়াতে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছিল। সে ম্যালেরিয়ার দোষ কিছুতেই ছাড়াইতে পারে নাই। আহার করিয়া স্কুলে যাইতেছে, চোখ দুটি লাল হইয়া জ্বর আসিল। স্কুলে পড়িতেছে, হঠাৎ জ্বর আসিল। কুমিল্লা এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানেও এই অবস্থা। অতএব বিলাতে না পাঠাইলে, তাহার ভবিষ্যৎ অতলে ডুবাইতে হয়। কেবল বিবাহ করাই নাই বলিয়া এ পর্য্যন্ত পাঠাই নাই। আমি নানা কারণে, বিশেষতঃ বিলাত-ফেরতদের দুরবস্থা দেখিয়া, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, তাহাকে বিবাহ না করাইয়া সেই প্রলোভনের নরকে পাঠাইব না। ৬ই সেপ্টেম্বরের 'মেলে' তাহার যাত্রার দিন স্থির হইল। কলিকাতার ব্যারিষ্টারাগ্রণী মিঃ এ. চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার বিলাত যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশমতে আগষ্ট

মাসে, বিবাহের ছয় মাস মাত্র পরে, নির্ম্মলকে ও পুত্রবধূকে লইয়া পত্নী কলিকাতা যাইতেছেন। আমাদের মনের অবস্থা কি, কেহ যদি একমাত্র সন্তানকে বিলাত পাঠাইয়া থাকেন, কেবল তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তাহাদের কলিকাতা-যাত্রার দিন আফিসে কাজ করিতে পারিতেছি না। থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। সেই অশ্রু-পূর্ণ অবস্থায় এক খণ্ড কাগজ লইয়া এই গীতি-কবিতাটি লিখিলাম,—

নির্ম্মাল্য

১

ওগো! যাও শুভ ক্ষণে, শুভ সমীরণে,
নাচিছে তরণী সাগরে!
লেখ হৃদয়ে ভরসা, শিরে নারায়ণ,
জীবনের ব্রত অন্তরে!

২

নাহি ফলে সাধনায়, নাহি হেন কাজ,
অমরত্ব মিলে সাধনে;
দেখ শ্রম-সফলতা সুবর্ণ অক্ষরে
অঙ্কিত মানব-জীবনে।

৩

কি ভয়! পিতার আশীষ, মাতার মমতা,
বালিকার প্রেম-অমৃত,
ওগো! রক্ষিবে তোমারে বিদেশে বিপদে
কবচের মত সতত।

৪

ওগো! যদি প্রলোভন করে আকর্ষণ
বলে পাপপথে তোমারে,
তুমি মনে ক'রো অশ্রু পিতার মাতার,
(তোমার) আশ্রয়বিহীনা লতারে।

৫

ওগা! হাসিবে চাঁদনি, হাসিবে না তারা?
ফুটিবে কুসুম প্রাঙ্গণে,
হায়! একটি কুসুম বিহনে তাহারা
রহিবে মরিয়া মরমে।

৬

ওগো! এ তিনের অশ্রু ত্রিবেণীর প্রায়
বহিবে নীরবে অঝোরে,
তুমি জয়মাল্য পরি আসি মুছাইও,
জুড়াইও প্রাণ আদরে।

আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া, গানটি পুত্রকে গাহিতে দিলাম। গাহিতে গাহিতে তাহার অশ্রু ধারায় পড়িতে লাগিল। স্থানে স্থানে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। আমি একটি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' বসিয়া নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলাম। বউ

ও আমার ভাইঝিরা মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়া কাঁদিতেছিল। স্ত্রী কার্য্যান্তরে ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,—"তুমি নির্ম্মলকে কি গান গাহিতে দিয়াছ। মেয়েরা ত কাঁদিয়া খুন হইল।" তখন তিনিও গান শুনিয়া, পুত্রকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই সন্ধ্যার সময়ে তাঁহারা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। তাঁহারা পঁহুছিবা মাত্র যে ব্যারিষ্টার-পরিবারে নির্ম্মলের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাঁহারা ছুটিয়া বউ দেখিতে আসিলেন। বউ আমার খুব সুন্দরী। তাহার বর্ণের তুলনা বাঙ্গালীর ঘরে বিরল। তবে তাহারা এক সান্ত্বনা পাইল। স্ত্রী বলিলেন, বউ লেখা পড়া, গান বাজনা, কিছুই জানে না। মেয়েরা আর সামলাইতে পারিল না। তাহারা স্ত্রীকে বলিল,—"এ মেয়ে কি তোমাদের ঘরে শোভা পায়? বিলাত-ফেরতার মেয়ে হইলে শোভা পাইত।" তাহারা হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিয়া উঠিলে. স্ত্রী বউকে বলিলেন,—"দেখিলে মা! ইহারা কেমন সুন্দর গাইতে বাজাইতে পারে। কই দেখি, তুমি বাজাইতে পার কি না।" তখন বউ সলজ্জভাবে বসিয়া, হারমোনিয়মে সুর দেওয়া মাত্র তাহাদের চোক কপালে উঠিল। তাহার পর যখন গান ধরিল, তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহাদের ঘষিয়া মাজিয়া শিক্ষা ও ঘষিয়া মাজিয়া গলা। ইহার স্বাভাবিক শক্তি, স্বাভাবিক গলা; তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে, বউ পূর্ব্বে কিছুই জানিত না। তাহার কেবল এই কয় মাসের মাত্র শিক্ষা। তাহারা বলিতে লাগিল যে, স্ত্রী তাহাদের তামাসা করিয়া এরূপ বলিতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস হইল যে, বউ বাপের বাড়ীতে বহু বৎসর শিক্ষা পাইয়াছে।

আমি দশ দিনের ছুটি লইয়া ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গেলাম। বন্ধুদের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া বিদায় হইতে পুত্রকে বন্ধুদের কাছে লইয়া গেলাম। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে লইয়া গেলে, প্রদ্যোৎকুমারেরা নির্ম্মলের মুখে উপরোক্ত বিদায়-গীতটি শুনিতে জিদ করিতে লাগিলেন। গানটি ইতিমধ্যে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাজ বলিলেন,—"নির্ম্মল কি গাহিতে পারে?" প্রদ্যোৎ বলিলেন,—"বাবা! নির্ম্মল সুন্দর গাহিতে পারে।" প্রদ্যোৎ নির্ম্মলের গান পূর্ব্বে আমার কলিকাতায় অবস্থানকালে শুনিয়াছিলেন। তখন মহারাজাও গানটি শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম, হারমোনিয়ম ভিন্ন গাহিতে পারিবে না। মহারাজ বলিলেন, তাঁহার বাড়ীতে কোনও ইংরাজী যন্ত্র নাই। কি আশ্চর্য্য! তিনি আদেশ করিলে তাঁহার বেতনভোগী সঙ্গীতব্যবসায়ী এস্রাজ হস্তে উপস্থিত হইল। নির্ম্মল লজ্জায় ও ভয়ে কিছুতেই গাহিবে না। মহারাজ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার কাছে বালক কি গাহিবে। তথাপি তিনি জিদ করাতে নির্ম্মল এস্রাজের সঙ্গে গাহিতে লাগিল। সে পূর্ব্বে কখনও এস্রাজের সঙ্গে গায় নাই। মহারাজ একখানি কৌচে অঙ্গ হেলাইয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন। নির্ম্মল গান আরম্ভ করিবা মাত্র তিনি ফরাসির নল ফেলিয়া, সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"বাহবা! কি মিষ্ট গলা! কি সুন্দর রচনা!" তাহার পর শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইল। গান শেষ হইলে তিনি গানের ও গায়কের বড়ই প্রশংসা করিলেন। আমাকে বলিলেন,—"নবীনবাবু! ইহাকে খুব ভাল করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইবে।" আমি বলিলাম,—"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ সে ভার গ্রহণ করিবেন। আমি গরিব, কিরূপে শিক্ষা দিব? তিনি বলিলেন, তিনি আনন্দের সহিত সে ভার লইবেন। নির্ম্মলকে বলিলেন,—"তুমি আমার একটি কথা রক্ষা করিবে। তুমি ইংরাজি গান, কি ইংরাজি যন্ত্রের সঙ্গে গাহিও না। তাহা হইলে তোমার গলা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইংরাজি সঙ্গীতের ও আমাদের সঙ্গীতের প্রাণ বিভিন্ন। আমাদের মূর্চ্ছনা প্রভৃতি ইংরাজি সঙ্গীতে নাই।" তাহার পর তিনি তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্তও লোকের পর লোক পাঠাইতে লাগিলেন যে, তিনিও নির্ম্মলের মুখে এই গানটি শুনিবেন। ইহাঁর সঙ্গে আমার প্রথম যৌবনে একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যাহা হউক, নির্ম্মলকে লইয়া আমি তাঁহার কাছে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে গেলাম। তিনি নির্ম্মলকে আপদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি একটি হারমোনিয়াম ফ্লুট আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। নির্ম্মল বাজাইয়া গাহিতে লাগিল। তিনি ও অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোকেরা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। মহারাজের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। গান শেষ হইলে ইহাঁরা সকলেও গানের ও গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন। মহারাজ গানটি আর একবার শুনিলেন। তিনি নির্ম্মলকে যেন বড় সস্নেহ চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাহার সুন্দর, নম্র, অমায়িক মূর্ত্তি ও ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন বলিলেন। তাহার পর অনেক আলাপ হইল। উঠিয়া আসিবার সময়ে তিনি নির্ম্মলকে ডাকিয়া কক্ষের এক কোণায় লইয়া কি বলিয়া বিদায় দিলেন। আমি তখন অন্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলাম। বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলে নির্ম্মল আমাকে বলিল,—"বাবা! ইনিও দেবতুল্য লোক। ইনি আমাকে কি বলিলেন জান? তিনি ত আমার বিলাতে সমস্ত খরচ দিতে স্বীকার করিলেন। বলিলেন—"বিলাতে তোমার যাহা কিছুর আবশ্যক হয়, আমার কাছে লিখিও। তোমার বাবার কাছে চাহিও না।" মহারাজার এই দয়ায় তাহার শিশু হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। আমি বলিলাম,—"আমি জীবিত থাকিতে, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, কেন পরের মুখাপেক্ষী হইবে? আমি যদি মরি, তবে মহারাজার সাহায্য গ্রহণ করিও এবং তাঁহাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিও।" তিনি কি স্নেহের চক্ষেই নির্ম্মলকে দেখিয়াছিলেন। যত দিন সে বিলাত না পঁহুছিয়াছিল, প্রতি দিন না কি তাঁহার আশ্রিত একজন ব্যারিষ্টাকে নির্ম্মল কত দূর গেল, জিজ্ঞাসা করিতেন। এরূপ না হইলে একটি কাঙ্গাল ব্রাহ্মণবালক এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং খ্যাত্যাপন্ন হইবে কেন?

সর্ব্বশেষে মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি যেরূপ নিষ্টাবান্ হিন্দু, আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি নির্ম্মলের বিলাত যাওয়া অনুমোদন করিবেন না। আমি বলিলাম,—"আপনি বোধ হয়, শুনিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন, নির্ম্মল এই 'মেলে' বিলাত যাইতেছে।" তিনি বলিলেন,—"ভর্ৎসনা করিব কেন? এখানের শিক্ষা অপেক্ষা সেখানের শিক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, এখানের বি. এল. অপেক্ষা সেখানকার ব্যারিষ্টারের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ, এতগুলি দেশ যে দেখিয়া যাইবে, ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা। তবে বলিতে পারেন যে, সামাজিক বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু আমি যত দূর এ অঞ্চলের পণ্ডিতদের অভিপ্রায় জানি, ইহাঁরা এখন হইতে আর কোনও আপত্তি করিবেন না। ইহাঁরা এখন বুঝিয়াছেন যে, দেশে কে না ম্লেচ্ছান্ন খাইতেছে। বিলাতে গিয়া খাইলে আর বিশেষ অপরাধ কি? বরং দায়ে ঠেকিয়া খাইতে হয়। অতএব এখন এ অঞ্চলের অনেক বিলাতফেরত আপনার পরিবারমধ্যে বাস করিতেছে।" তাহার পর নির্ম্মলকে বলিলেন,—"বিলাত বড় প্রলোভনের স্থান। তুমি যে কার্য্য সাধনের জন্য যাইতেছ, তাহা সাধন করিয়া, তোমার নির্ম্মল চরিত্র লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আর পূর্ব্বে ইংলিশ বারের পরীক্ষা নাম মাত্র ছিল। কিন্তু এখন উহা কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। অতএব তুমি সকল বিষয়ের পরীক্ষা একসঙ্গে না দিয়া, স্বতন্ত্র ভাবে দিও।" এই উপদেশে নির্ম্মলের বড় উপকার হইয়াছিল।

তাহার যাত্রার পূর্ব্বদিন, যে কন্যাটির সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, সে স্কুল হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিল। সে ইহার পূর্ব্বে একদিন নির্ম্মলকে তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। নির্ম্মল বলিয়াছিল, তাহার পিতামাতার কোনও দোষ নাই। বালিকার পিতামাতা বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবেন না বলিয়া জবাব দিয়াছিলেন। তখন বালিকা বলিয়াছিল, তাহার পিতামাতাই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আজ সে দ্বিতলের এক গবাক্ষে দাঁড়াইয়াছে এবং গবাক্ষের কাষ্ঠ বাহিয়া তাহার অশ্রুধারা নিম্নতলের প্রাঙ্গণে পড়িতেছে। দেখিয়া আমি ও পত্নী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া বলিলাম—"মা! তুই রাজরাণী হইবি। আমরা দরিদ্রের কি আছে? তুমি কোনও দুঃখ করিও না। তুমি নির্ম্মলকে এখন হইতে সহোদরের মত দেখিও।" আমি ও নির্ম্মল কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম। স্ত্রী তাহাকে হারমোনিয়াম লইয়া গান করিতে বলিলেন। সে বউয়ের দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া গাহিল,—

গীত

"তার সনে দেখা হ'লে, আমার কথা ব'ল ব'ল।
যে তাহারে ভালবাসে তারে কি কাঁদান ভাল।"

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্যটি যৌবন-বিবাহ-পক্ষপাতী অন্ধ সমাজ-সংস্কারককে উপহার দিলাম।

পরদিন কাশী হইতে আমার বন্ধু উমাচরণবাবুর দ্বারা প্রেরিত নির্ম্মলের জন্য বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ আসিল, এবং বন্ধুবর নটকুলতিলক অমৃতলাল বসু রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিযুক্ত একটি রজতপদক নির্ম্মলকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ সহ উপহার দিয়া, বিলাতে উহা তাহার চক্ষের সম্মুখে রাখিতে উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যার পর হাওড়া ষ্টেশনে সকলেই অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গেলাম। স্ত্রী ও পুত্রবধূ গাড়ীতে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি পুত্রকে লইয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিলাম। সে দিন হাইকোর্ট পূজার জন্য বন্ধ হইয়াছে। ষ্টেশন ইংরাজে পরিপূর্ণ। মিঃ এ. চৌধুরীর ভ্রাতা মিঃ জে. চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি ষ্টেশনে পুত্রকে ব্যারিষ্টার মিঃ উড্রফের পুত্রের সঙ্গে, এবং জষ্টিশ হেণ্ডার্সনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। নির্ম্মল যে কক্ষে যাইবে, সে কক্ষের অন্য আসনে আর একজন মিলিটারি বিভাগের সেনাপতি কর্ণেলের নাম লেখা রহিয়াছে। ঠিক ট্রেন খুলিবার সময়ে তিনি আসিয়া পঁহুছিলেন। মিলিটারিতে ষ্টেশন ভরিয়া গেল। নির্ম্মলকে পথে দেখিতে, যোগেশ তাঁহাকে বিলাতি ধরনে বলিলেন। তিনিও বিলাতি ধরনে সায় দিলেন। আমি তখন অগ্রসর হইয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে আমার একমাত্র সন্তান বলিয়া, নির্ম্মলকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। ইহাতে তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন,—"Poor man! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। আমি সমস্ত পথ বালককে দেখিব, এবং লণ্ডনে তাহার গৃহে পঁহুছাইয়া দিব।" আমি ধন্যবাদ দিতে না দিতে, পুত্রের মাথা গবাক্ষপথে আমার বুকে থাকিতে 'ইংলিশ মেল' খুলিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম। এক হাত যোগেশ ও অন্য হাত আমার বন্ধু হাইকোর্টের উকিল সিরাজল ইসলাম ধরিলেন। এত ক্ষণ পুত্র কাতর হইবে বলিয়া হৃদয় পাথর দিয়া চাপিয়া, রোদন সম্বরণ করিয়াছিলাম। আর পারিলাম না। হা ভগবান্! আমার একমাত্র সন্তান, যে একদিনও আমাদের চক্ষের অন্তর হয় নাই, যে শিশু আমাকে ছাড়া গৃহের বাহিরে যায় নাই, আজ সে বাইশ বৎসর বয়সে কোথায় চলিল! পিতামাতার কর্ত্তব্য কি গুরুতর! আমি দুই বন্ধুর বুকে মাথা

রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহারা এই অবস্থায় আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। সেখানে স্ত্রী ও বালিকা বধূ কাটা মাছের মত ছট্‌ফট করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল। হাওড়ার সেতু পার হইবার সময়ে পিতামাতার এবং বালিকা পত্নীর পবিত্র অশ্রুধারা ভাগীরথীর পবিত্র গর্ভে ঝরিল। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত রাত্রি এই হাহাকারে কাটাইয়া, প্রাতে কুমিল্লা রওনা হইলাম। পুত্রবিধুর পিতামাতার ও পতিবিধুর বালিকা পত্নীর অশ্রু আবার ধারায় সমস্ত দিন ষ্টীমারের কাষ্ঠ বাহিয়া ঝরিয়া পদ্মার স্রোতোবেগে ভাসিয়া গেল। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তিনজন কুমিল্লার শূন্য গৃহে পঁহুছিয়াই বম্বে টেলিগ্রাম করিলাম—"Our blessings and love. Heart within and God overhead". তাহার পর একখানি পত্র লিখিলাম। সেই পিতা পুত্রের অশ্রুসিক্ত পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

কুমিল্লা

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০।

"বাবা আমার!

দশরথ রাজার চার পুত্র ছিল। একমাত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছিলেন। সে বনবাসও ভারতবর্ষে। তথাপি দশরথ মরিয়াছিলেন আমি আমার একমাত্র দেবশিশুসম সন্তানকে এই দূর দেশে, এই নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছি। তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি। আমার মত পাষাণ কে আছে?

ট্রেন খুলিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম। যোগেশ ও সিরাজুল ইসলাম ধরিল। গাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিল। তাহার পর আমার পাষাণ হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া গেল, গলিয়া গেল। চপলা এ পর্য্যন্ত যে হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আমাদের এত সাহস ও সান্ত্বনা দিতেছিল, বুদ্ধিমতী মেয়ের সকলই অভিনয়। হাওড়া হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত সে এরূপ গলা ছাড়িয়া কাঁদিতেছিল ও ছট্‌ফট্ করিতেছিল যে, আমার অশ্রু আমার চক্ষে শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি পাষাণ, এ দৃশ্য কোনও পিতা এরূপ পাষাণবৎ সহ্য করিতে পারিত না।

রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাই নাই। সমস্ত রাত্রি সেই তড়িৎগতি গাড়ীর গবাক্ষে জ্যোৎস্না-লোকে তোমার মুখখানি দেখিয়াছি, এবং 'বাবা! বাবা!' ডাকিয়াছি।। তুমি শুনিয়াছিলে কি?

শনিবার শেষ রাত্রিতে আমরা নির্ম্মলশূন্য গৃহে আসি। আমাদের তিন দিন কাটিয়াছে। তিন বৎসরের তিন দিন কাটিয়াছে। তিন বৎসরে এরূপ কত ভীষণ তিন দিন আছে! এ তিন দিন কাটিয়াছে, সে সকল তিন দিনও কাটিবে। তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করিও না। তোমাকে না দেখিয়া আমরা মরিতে পারিব না।

বম্বে আমার দুই টেলিগ্রাম পাইয়াছিলে কি? আমার চুম্বন পাইয়াছিলে কি? ট্রেন খুলিবার সময়ে আমি পাষাণ যে চুম্বন করিতেও ভুলিয়াছিলাম! একটি কথাও যে কহিতে পারি নাই।

এ কয় দিন যেন আরব-সাগরে অর্ণবযান দুলিতেছে দেখিতেছি। না জানি, কি কষ্টই পাইতেছ।"

বম্বে হইতে পুত্রের টেলিগ্রাম পাইলাম। যথাসময়ে এডেন হইতে পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে,—"তোমার কেবল একমাত্র সন্তান নহে, তোমার বাইশ বৎসরের বন্ধু তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। আমার কেবল পিতা নহে, আমার বাইশ বৎসরের একমাত্র বন্ধুকে আমি ছাড়িয়া যাইতেছি।"

পুত্র বিলাতে

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর পুত্রের নির্ব্বিঘ্নে বিলাত পঁহুছিবার টেলিগ্রাম পাইলাম। যে শিশু কখনও ঘরের বাহিরে যায় নাই, সে মারসেলজ পথে সমস্ত ফ্রান্স একাকী পার হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছে! সেই 'কর্ণেল' সমস্ত পথে তাহাকে আপন পুত্রের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তিনি প্যারিসে নামিয়াছিলেন। নির্ম্মলকে তাঁহার সংগে প্যারিস দেখিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টীমারে নির্ম্মলের এক বাঙ্গালী সহযাত্রী জুটিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ভীরু যে, নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন! নির্ম্মল প্যারিসে, নামিলে তিনি একা কিরূপে বাকী পথ যাইবেন, এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাজেই নির্ম্মল কর্ণেলের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। মারসেলেজে তাহাকে সংগে করিয়া তিনি সমস্ত নগর দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহাকে হোটেলে আপন ব্যয়ে খাওয়াইয়াছিলেন। এরূপ ইংরাজকে দেবতার মত পূজা করিতে ইচ্ছা করে। জাষ্টিস হেণ্ডার্সন এবং যুবক উড্রফও সমস্ত পথ নির্ম্মলের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। লণ্ডনে পঁহুছিবার পর একজন বন্ধু লিখিলেন,—

"I was expecting Nirmal on the 30th Ultimo (Septr) in London, while he surprised us all by arriving a week earlier than the stated time. He showed great enterprise by landing at Marseilles and shooting across France by himself. It is a very creditable performance for a young boy who has been brought up as Nirmal has been.

Nirmal is such a sweet affectionate boy that nobody can help loving him. ... I am sure he will give a gool account of himself while he is here, and when he goes back home, he will go as a worthy son of the illustrious father of whom his country is proud."

শ্রীভগবানের কি অনন্ত কৃপা! ইংলণ্ডে পঁহুছিবা মাত্র নির্ম্মল আমার দেবলোকবাসী পিতামাতার পুণ্যে আর একজন দেবতুল্য লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতায় তিনি 'নন্দীবাবু' বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত এবং পূজিত। তিনি কুচবেহার রাজ্যের একজন জজ। তিনি এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। তাঁহার আর অধিক পরিচয় না দিয়া, তাঁহার প্রথম পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

লণ্ডন।
২৪শে কার্ত্তিক, ১৮২২ শকাব্দা।

সসম্মান নিবেদন।

মহাশয়ের নিকট আমি অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব। আপনি অদৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও আমার নিকট অপরিজ্ঞাত নহেন। কেন না, আপনি বঙ্গদেশের সাধারণ সম্পত্তি ও আমি বাঙ্গালী। আমি অপরিচিত হইয়াও পরিচিতের ন্যায় আজ আপনাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আপনার নির্ম্মলের প্রবাস-বন্ধু বলিয়া এইপ্রকার অধিকার স্থাপনা করিলাম। নির্ম্মল এখন আমার সহিত এক গৃহে বাস করিতেছে। তাহার কক্ষটি আমার কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী। মধ্যের ব্যবধানে একটি দ্বার আছে। নির্ম্মল প্রায়ই আমার কক্ষে বসিয়া লেখাপড়া করে। আমি তাহার স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত প্রবাসের অভিভাবকস্বরূপ।

আমি বয়সে বৃদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বয়সে যত বৃদ্ধ হই বা না হই, রোগে কিছু বর্ষানুচিত বার্দ্ধক্যগ্রস্ত। বালকের পক্ষে বৃদ্ধের সান্নিধ্য সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু এ দেশে আপনার নির্ম্মলের মত শিশুস্বভাববিশিষ্ট বালকের কিছুদিন বৃদ্ধের সহিত একত্রে থাকিলে কোন হানি না হইলেও হইতে পারে, এই জ্ঞানে আমি আপত্তি করি নাই।

যে বাটীতে থাকি, সেটি একটি ভাল Boarding House। এখানে যাহারা থাকে, তাহারা সকলেই ভদ্রলোক। বিদেশী Americanও এখানে প্রায় আসে। বাটীতে দুটি ডাক্তার Boarder আছে। সম্মুখে একটা বাগান আছে। তাহার জন্য এ স্থানটির নাম Endsleigh Gardens। নির্ম্মল ও আমার উভয়ের ঘর হইতে বাগানটি দেখিতে পাওয়া যায়। আমি যখন এ বাটীতে থাকিতে আসি, তখন আমার একজন শ্রদ্ধেয় ইংরাজ বন্ধু এই স্থানে থাকিতে পরামর্শ দেন। Landlady ভদ্রমহিলাও শিক্ষিতা ও প্রবীণা। যাহা খাইতে দেন, তাহা প্রচুর ও স্বাস্থ্যকর। নির্ম্মল আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে। বলে, অন্যত্র এরূপ আহারের সুবিধা নাই। Boarding House-এর কতকগুলি অসুবিধাও আছে। ইহাতে নিজের স্বানুবর্ত্তিতা চলে না। সাধারণ খাইবার সময়ে ইচ্ছা না থাকিলেও খাইতে হয়। সময়ে আসিয়া না জুটিলে Restaurantএ গিয়া খাইতে হয়। সাধারণ Drawing Roomএ বন্ধুবান্ধব আসিলে একাকী তাহাদিগকে receive করার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

এ বাটীর আর একটি সুবিধা আছে। স্নানের ঘরটি সুন্দর। সর্ব্বদাই গরম জল পাওয়া যায়। আর আমাদিগের ঘরের নিকট।

একটি অসুবিধা যে, এখান হইতে Innটি নিকটে নহে। হাঁটিয়া গেলে পঁচিশ মিনিট লাগে। নিকট দিয়া *Bus* যায়। হাঁটিতে না পারিলে *Bus*এ করিয়া বরাবর Inn অবধি যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'বাসে' করিয়া যাইতে হইলে দু পেন্স অর্থাৎ দুই আনা করিয়া ভাড়া দিতে হয়।

নির্ম্মল Gray's Inn join করিয়াছে। Gray's Inn অন্যান্য Inn অপেক্ষা দরিদ্র। কিন্তু এই Innএ অনেক বৃত্তি। আর খরচ মোটের উপর ত্রিশ পাউণ্ড কম। আমি Lincoln's Inn-এ যাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে সম্মত হইল না। Lincoln's Inn-এ যে Common room অর্থাৎ যেখানে Students বিশ্রাম করে, সে ঘরটা শুনি, খুব সুন্দর ও প্রশস্ত ও সুসজ্জিত। নির্ম্মলের Gray's Inn join করিবার কারণ, প্রথমতঃ আমি Gray's Inn-এর Member। দ্বিতীয়তঃ এই Inn-এ অনেক বাঙ্গালী আছে। আমি একজন শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করিতে উপদেশ দিয়াছি। নির্ম্মলের ইচ্ছা যে, আমার নিকট পড়ে। আমি নিজে পড়াইবার জন্য উপযুক্ত নহি। পারদর্শী নহিলে অধ্যাপনা উচিত নহে। সে জন্য যাহারা এই কার্য্য করে, তাহাদের একজনের কাছে শিখিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছি। নির্ম্মলের ইচ্ছা যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে Roman Law বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। সময় কিছু অল্প। এত শীঘ্র পরীক্ষা দেওয়া উচিত নয় বলিয়া মনে হয়। নির্ম্মল বেশ পড়িতেছে। এরূপ পড়িলে কৃতকার্য্য হইবে। প্রস্তুত না হইলে পরীক্ষা দিতে দিব না। অকৃতকার্য্য হইলে এককালে ভগ্নোদ্যম হইবে। আগামী March মাসে যে পরীক্ষা হইবে, তাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু যাহাতে ডিসেম্বরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, সেই ভাবে পড়িবার জন্য উপদেশ দিয়াছি।

আমি নিজে আগামী January মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব। আবার পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব ; কিন্তু কবে করিব, তাহা জানি না। আমি চলিয়া গেলে নির্ম্মল

নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িবে মনে করে। ভরসা, আর দুই তিন মাস থাকিলে আপনি নিজেই সব কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে।

আপনার নির্ম্মল বাস্তবিকই বড় সুবোধ ও শিষ্টস্বভাববিশিষ্ট। তাহার চরিত্র বালকের মত নির্ম্মল ও উদার। কিন্তু নিতান্ত সরল ও অনভিজ্ঞ। এ দেশে উন্নতির সোপান অনন্তপ্রসারী, অবনতির পথও তদ্রূপ। বাধা, বিঘ্ন ও প্রলোভনও প্রচুর। ধর্ম্মবন্ধন যত দিন শিথিল না হয়, বাধা বিঘ্নে কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু যে দিন সেই বন্ধন শিথিল হইবে, শত অভিভাবকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। আশীর্ব্বাদ করি, যেন আপনার নির্ম্মল নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্কভাবে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

নিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

একজন অপরিচিতের পুত্রের প্রতি ইংলণ্ডের মত সুদূর দেশে এরূপ দয়া কি মানুষের? ইহাঁর দ্বিতীয় পত্রখানি এরূপ—

LONDON,
30.XI.00

MY DEAR MR. SEN,

Nirmal has made over to me your kind letter of the 8th current. I am indeed so glad that, the chance or accident which was brought your boy and myself together, has also given me the pleasure and privilege of knowing one of my distinguished and illustrious countrymen from a closer point of view than is ordinarily permitted to the rank and file to which I belong. You have said such nice things of me that, had I possessed a larger share of egotism and vanity and a craving for compliment than I flatter myself I do, I would have found in the matter enough for gratification. I don't know whom I am to be more thankful to—my kind partial friends who have given me a character, or you who have not known me and yet have believed all that has been said. How I wish I deserved it all! I trust that an acquaintance sprung up under these circmstances will afford me large opportunities in future of knowing you yet more closely.

I have known your boy for the last seven weeks, four of which he has spent with me, sharing practically the same room. I have had ample opportunities for forming my own estimate of his character, and I am glad to be able to say that he is all that a fond father can desire. He is gentle, guiltless, unaffected and dutiful. His moral bearing is irreproachable. But he is too green and inexperienced in the ways of the world, and so require some amount of protective care and unobtrusive guidance. I say 'unobtrusive' advisedly, for I have a morbid horror of assertive domination (by crusty age) of receptive and impressionable youths crushing all individuality and checking spontaneous and natural growth. I don't believe in surveillance. There is no safe-guard more effective than a virtuous

আমি আপনার বিজয়া-মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। একমাত্র কুমার বাবা নির্ম্মলকে আপনার সেই বিপুল ভদ্রাসনে বিজয়ার-বিষণ্ণ গৃহস্বামীর ন্যায় দেখিতে পাইয়াছিলাম। স্বর্গীয় অখিলবাবুর মহাপ্রস্থান,—ভীষ্মদেবের মহাশর-শয়নে শ্রীকৃষ্ণের সম্মিলন!*—সে কি অনির্ব্বচনীয় মহাদৃশ্য কুমার নির্ম্মল আমার চক্ষে ধরিয়া দিলেন। আমি কুমার শুকদেব-মুখনিঃসৃত ভাগবতামৃত পানের ন্যায় তন্ময়প্রাণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। এইরূপে দুই ক্ষুদ্র স্বর্গের সম্যক্‌দর্শনে প্রাণে প্রাণে মরমে মরমে স্বর্গীয় দেবভাষায় কখনও কি কেহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন? যদি করিয়া থাকেন, তবে তিনি দেবতা, মানব নহেন। ঢাকায় মহা-সমারোহে আপনার অভ্যর্থনা ও ময়মনসিংহে আপনার গৃহনির্দ্দেশ ইত্যাদি কুমার আমার নিকট যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন।

আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী—

চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রধান উকিল ভ্রাতৃসম যাত্রামোহন লেঃ গবর্ণরের কাউন্সিলে সদস্য হইয়া আমার বদলির সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। এই বদলি তাঁহার প্রাণেও এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, তিনি আমাকে লিখিলেন যে, সয়তানের উৎপীড়ন আর সহ্য হইতেছে না। মেনেষ্টি-সয়তান-ঘটিত কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন যে, সুরেন্দ্রবাবু বেঙ্গলীতে এরূপ প্রবন্ধ ছাপিতে প্রস্তুত আছেন। আমি তাঁহাকেও লিখিলাম যে, যখন দেশবৈরী বলিয়া এত কাল আমি তাহার গায়ে হাত দিই নাই, এখন আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহার প্রতি অস্ত্রত্যাগ আমি করিব না। শ্রীভগবান্ এই অত্যাচারীদের বিচার করিবেন। অতএব তাঁহাদেরও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলাম। তাঁহারা আমার নিষেধ মানিলেন না। কারণ, আমি আসিবার পর চট্টগ্রামে একটা ঘোরতর আর্ত্তনাদ উঠিয়াছিল। 'বেঙ্গলী'তে মেনেষ্টি-সয়তানের কুকীর্ত্তিপূর্ণ এক প্রবন্ধ বাহির হইল। সয়তান 'মিরারে' এক টেলিগ্রাম ও 'বেঙ্গলী'তে তাহার উত্তরে এক পত্র পাঠাইয়া, আমাকে এরূপ সর্ব্বস্বান্ত করিবার পরও আক্রমণ করিয়া লিখিল যে, আমার বদলির দরুন আমি ও আমার seditious clique (রাজদ্রোহী দল) তাহার ও মহাযোগ্য কমিশনর মেনেষ্টির বিরুদ্ধে এরূপ কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছি। 'বেঙ্গলী'তে বোধ হয় যাত্রামোহন ও আমার পিসতত ভাই নগেন্দ্র ইহার যথোচিত প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দিলেন। কিন্তু এখন আমার আর চুপ করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া চক্র ধরিয়াছিলেন। তিনি শত অপরাধ ক্ষমা করিতে 'মহাভারত'-মতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। আমি এ পাপিষ্ঠ সম্বন্ধে এরূপ কোনও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম না। কেবল শৈশবে সহপাঠিত্বের অনুরোধে আমি তাহার এত অত্যাচার ক্ষমা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার এই কৃতঘ্নতার ও বিশ্বাসঘাতকার পর, ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিয়া আমার এরূপ সর্ব্বনাশ করিবার পরও, সে যখন আমাকে 'রাজবিদ্রোহী' বলিয়া আমার ফাঁসির চেষ্টা করিতেছে, তখন আত্মরক্ষার্থ আমার অস্ত্র ধরা উচিত। সে অকারণ আমার এত অনিষ্ট করিয়াছে। অতএব বোধ হয়, শ্রীভগবানের ইচ্ছা যে, আমার অস্ত্রে তিনি তাহাকে নিহত করিবেন। তাই বুঝি এত দিন তাহার পাপের দণ্ড দিতে বহু লোক চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছে। আমি প্রথমতঃ 'মিরারে' "That mendacious telegram"—"ঐ মিথ্যা টেলিগ্রাম"—শীর্ষক দুইখানি পত্র লিখিলাম। চট্টগ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। একে ত 'বেঙ্গলী'র প্রবন্ধে 'যুগলরূপে'র হৃৎকম্প ও মুখ শুষ্ক হইয়াছিল, তাহার উপর এই চাবুক-প্রহারে মিলিত মহিষাসুরের 'রক্তারক্তীকৃতাঙ্গ হত' হইল। কালী পেস্কার মিঃ এণ্ডার্সিনকে

* দাদার সহিত আমার সেই বিদায়ের দৃশ্য। হা কপাল! আমি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনীয়! স্নেহে, ভালবাসায়, মানুষ কি এত অন্ধ হয়?

উক্ত প্রবন্ধ দেখাইলে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন—"চট্টগ্রামে একজন মাত্র লোক আছে, যে এরূপ ইংরাজি লিখিতে পারে। ইংরাজদের মধ্যেও অল্প ইংরাজ এরূপ লিখিতে পারে।" তিনি কাগজ দুখানি লইয়া যান। তাহারা ইংরাজমহল বেড়াইয়া জীর্ণাবস্থায় ফিরিয়া আসে। কাষ্টম কলেক্টর গুড সাহেবের উপর উৎপীড়ন করাতে এবং সয়তান-সম্বলিত কুৎসাতে, শুনিয়াছি—ইংরাজমহলও মেনেষ্টির উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এবং ঘৃণা করিয়া কেহ তাহার সঙ্গে মিশিতেন না। এই সকল প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। উহাতে প্রকাশিত কলঙ্ক সকল এরূপ গুরুতর, এবং একজন কমিশনরের পক্ষে এত ঘৃণাস্পদ যে, গবর্ণমেণ্ট মেনেষ্টিকে তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম হইতে সরাইলেন। কেবল তাহা নহে, তাঁহাকে কমিশনার হইতে অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতম জেলা মালদহের—উহা একটা সবডিভিসন বলিলেও চলে—মাজিষ্ট্রেটিতে অবনমিত করিলেন। 'যুগলরূপ' আমার মস্তকে যেরূপ অকস্মাৎ বজ্র নিক্ষেপ করাইয়াছিল, সেরূপ অকস্মাৎ বজ্র তাহাদের মস্তকে পড়িল। সমস্ত চট্টগ্রামে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। লোকে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। শুনিয়াছি, মেনেষ্টি চলিয়া যাইবার সময়ে গুড সাহেব সয়তানকে রেলওয়ে ষ্টেশনেই ঘোরতর অপমানিত করেন। এই সময়ে মেনেষ্টি-সয়তান পালা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিবার জন্য 'বেঙ্গলী'তে "Chittagong affairs. Their humorous side. The genesis of a Rai Bahadur.—চট্টগ্রামের কেলেঙ্কারি! তাহাদের হাস্যকর দিক্। এক রায় বাহাদুরের জন্মবৃত্তান্ত" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখি। উহাতে সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটা হো হো হাসি উঠে। চট্টগ্রামের ত কথাই নাই। সেখানকার সাহেবমহলেও মাসেক পর্য্যন্ত এই প্রবন্ধ লইয়া বিরাট হাসি। কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন একদিন আমাকে, আমি এই প্রবন্ধের লেখক কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বলিলেন তিনি এমন humorous (রসিকতাপূর্ণ) লেখা আর কখনও পড়েন নাই। আরও বলিলেন যে, ইংরাজমহলে উহা এত ভাল লাগিয়াছিল যে, তাঁহারা তাঁহাদের 'কৃষ্টমাসে'র উৎসব উপলক্ষে ক্লাবের রঙ্গভূমিতে উহা অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি ঠিক 'কৃষ্টমাসে'র সময়ে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষ ভাগে বাহির হইয়াছিল। অনেকেরই বোধ হয়, এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি দেখিবার কৌতূহল হইবে। তাহা নিবৃত্ত করিবার জন্য উহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

CHITTAGONG AFFAIRS.

Their humorous side. The Genesis of a Rai Bahadoor.

Here is an interesting communication which the Government will do well to study, if for nothing else, only for the purpose of understanding why the honors bestowed by it have become an object of contempt in the eyes of the public :—

I. Thank God, Mr. Collier has returned, and with him fair weather, in proof whereof please take note that a Rai Great Old Back-Biting Bahadur had a most delightful scene, it is said, on the Railway platform with a redoubted Good Saheb. Mr. Good, a true sailor, is no respecter of persons, and as he had some very fresh scores to settle—Mr. Manisty having turned his last kind attentions to him,—settled they were on

the spot. The G. O. B. was completely floored, and lay like a heap of tallow, even Mr. Anderson—O irony of fate!—enjoying the scene. The laws of *karma* never had a swifter agent than Mr, F, Good, the energetic Collector of Customs and the Port-Officer of Chittagong.

He sang—"Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall."

In the evening, however, the G. O. B.'s manufactured son and Sam Weller, propped the G. O. B. up, when Mr. Manisty was sneaking out of Chittagong. Mr. Good, who was then in disguise to enjoy the scene, is said to have quoted Milton at the sight of the "poor honest man" the G. O. B.—

"If thou be'est he.
O how changed, How fallen!"

The recitation was so pathetic that the G. O. B. fainted, as the train started, shedding copious tears, and it was only by vigorous application of smelling salts that a little life was restored to that inordinate mass of fat, and a tragedy averted.

II. Though people call him the G. O. B. (great old back-biter) I like to be polite, and so does Mr. Anderson. I call him Fat Chand, and Mr. Anderson calls him Rai Bahadur. Well, Rai Fat Chand Bahadur is a good fellow, and can be very frank if it please him. He once told me—"Do you know, my boy, how I rose in the service?" I replied—"I am sure, I don't—I suppose by your sterling merits." He said, throwing his head aside—No. I have no sterling—not even a penny, and as for merit, it does not extend beyond the 3rd class of an Entrance School. *I rose by tact and Dollies*—Do you know what I do when I go to see a Saheb? Well, I begin at the stables.

"First *Salaam Ghora* Saheb! Then *Salaam* Syce Saheb! Then *Salaam* Coachman Saheb! Then *Salaam* Baburchi Saheb! Then *Salaam* Orderly Saheb! Then *Salaam* Khitmutgar Saheb Then *Salaam Aya Saheb! Then Salaam Dog Saheb! Finally Salaam* Hazor Saheb himself—

"Your honour! Your Excellency! Your Majesty! You Father! I son! I slave!" He paused and proudly looking at me for a little time in silence said. "take my word my boy! Do it, and you will see how rapidly you will rise in the service!" I said—"Many thanks. But I fear so many *Salaams* from the *Ghora Saheb* to the *Burra Saheb* may give me the lumbago!!" He looked at me sternly and said—"No. Habit—only habit. I have done it these thirty years, though fat as I am, and with this promontory of a belly, my making a *Salaam* is a geometrical problem."

III. He gradually waxed warm over his achievements and said, again throwing his head aside and looking and smiling at me slyly—"and do you know how I became a Rai Bahadur?" I replied—"No, but I suppose it was the sublimated result of a million of *Salaams* and *dolies*." 'No!' he replied in righteous indignation, "It is by twisting the tails of the Lushai expedition bullocks! And those who want to be Rai Bahadurs at Chittagong, must twist my tail!" Pointing significantly to his hind quarters. But my dear *Bengalee*, I swear I saw no tail there. The people say however that my friend Fat Chand always wraps himself up in a disreputable sort of dress particularly with a view to make that mighty instrument of honour and emolument invisible to the people of Chittagong."

IV. Now the poor boy Fatik Chand has gone wrong in the head for a Rai Bahadurship. His contention is very simple—"If Fat Chand could be a Rai Bahadur, why could not Fatik Chand be one?" As the fates would have it, Fatik Chand overheard the interesting and instructive conversation narrated *above*, and, as a lawyer, readily siezed the idea, and has since been assiduously twisting Rai Fat Chand Bahadur's tail. He even went the length of sending a lying telegram eulogising Fat Chand and his patron to one of the Calcutta dailies. Fat Chand gave him to understand that in addition to these patriotic services if he could cut a figure on the occasion to the Viceregal visit, he would be proclaimed a Rai Bahadur. And my dear *Bengalee*, a figure Fatik Chand did cut on that memorable occasion. He lit a few *Chirags* and lustily drummed on an empty Kerosine tin. But the Viceroy came and the Viceroy went and Fatik Chand remained—Fatik Chand! I found him the very image of despair standing *shamla*-headed before the Reception pavilion and gazing at the "Clive". This was a few minutes after the *Durbar*, in which Fat Chand "clothed in transcendant brightness, did outshine myriads though bright"—the poor dishonoured Zemindars and respectable men of Chittagong. I accosted him and said—"How d' you do, my dear Fatik Chand!" He exclaimed piteously—"Humbugged; Humbugged " I—by whom? He—By that Fat Villain! I—How? He—He made me spend Rs. 15 As. 13 p. 9 for nothing. Not even introduced to the Viceroy! I—O, you empty earth-oil-barrel! Rightly served.

Well, 'Empty earth-oil-barrel', is not an expression of abuse. It is not to be found in any dictionary of abuse not even in that one out of which Rai Fat Chand daily regales his subordinates to their faces, and his friends and superiors behind their backs. Still the poor boy, my dear *Bengalee*, fell into such a violent fit of crying, throwing up

his hands and legs, that I had to send for our good Collector Dr. Anderson to calm him. A most obliging man Dr. A. He gave the poor boy some of his 'sweet pills' for which he holds a patent,—I have seen it with my own eyes,—and patting him good-naturedly on the head consoled him thus—'My dear Babu Fatik Chand; don't be disconsolate. Things will come right at the right time. Don't worry yourself because my esteemed friend—an excellent man in his way —Fat Chand is a Rai Bahadur. Well, he took two Hony titles before he became Rai Bahadur—*Chalak Das* for dull cunning at school, and Ghasiram Das for abject servility in life. You are only a beginner in both. He has nothing under the sun to call his own, while you have, some property. Lay the scriptures to your heart—'sell all thou hast, give it away in *dolies*, and follow Fat Chand. The only other thing I can suggest is this—seated on Fat Chand's famous pot-bellied Rozinante behind him, and back to back thus'—Dr. A. showed it, placing the back of one hand against the back of the other—and go the way taken by the Viceregal *cortege* lustily drumming on your belly, and shouting in the Hasan Hossein style—Hai Manisty! Hai Manisty! Let Moulvie A., Mr. R. and the manufactured son go about gyrating and beating tom toms in that desperate Maharam fashion which used to drive Mr. Oldham mad, and let Babu G. like the Mohoram fool follow behind—shouting, Manisty ka Lashkar, Yah Hosen!' I dare say such a demonstration of loyalty will be duly wired by Mr. M. an excellent man in his way, and very able too,—to Head quarters, and then'—with a significant wink of the eye—'I verily say unto you, you shall have your reward!' The poor boy was thus composed to sleep and Mr. Good, our Municipal Chairman, extemporising a cradle out of a scavanger cart lying broken in the neighbour-hood,—a clever man Mr. Good and ready for all emergencies—put him into it. Thus another tragedy was averted."

If the above account of his rise and distinction is really and often given by any worthy, we have nothing to do with him. Our Fat Chand and Fatic Chand are mere *Dramatis personœ*. If the cap however *fits* any one he has only to thank himself. With this brief explanation, we have seriously to express our deep regret at the approaching retirement of our Collector, Mr. Anderson. Good, kind, and generous, with a kind word for every body, and easily accessible to every body, he would have left a fragrant name behind, if he had only not placed undeserved confidence as he must have found out by now, on a self-seeking time-server, a sanctimonious summer-fly, a veritable serpent under the grass. We do not blame him for it, for

faith in such a despicable character has been handed down as an administrative creed since some years. But now that Mr. Anderson has—let us hope—found him out, if he will break that evil tradition in handing over his charge to his successor, the people of Chittagong will bless him with a million tongues in his retirement. We wish him peace and prosperity. Looking back from his Island home across the sea while he will receive cold comfort from all that he was by his goodness induced to do, straining his sense of justice for the satisfaction of the insatiable vanity and selfishness of a vile man, the good that he has been able to do to the people at large, will bring him joy for ever. We wish him God speed.

বলা বাহুল্য, ফ্যাটচাঁদ রায় বাহাদুরের এই জন্মবৃত্তান্ত আমি তাঁহার শ্রীমুখে বহু বার শুনিয়াছি, এবং তাহার সারাংশ—ঘোড়া-সাহেব হইতে কুকুর-সাহেব পর্য্যন্ত সেলামের অদ্ভুত উপাখ্যান—পূর্ব্বে দিয়াছি। উভয়ে এই বজ্রে নিহত হইল। মালদহে গিয়া কিছু দিন পরেই মেনেষ্টি 'সিভিল সার্ভিস' হইতে অস্ত হইলেন। সয়তানের শোচনীয় পরিণাম পরে যথাস্থানে বলিব।

ময়মনসিংহের কার্য্য

ময়মনসিংহ একটা প্রকান্ড ডিষ্ট্রিক্ট। উহা ভাঙ্গিয়া দুই ডিষ্ট্রিক্ট করিবার প্রস্তাব বহু দিন হইতে চলিতেছে। অতএব উহা একটা heavy district (ভারি ডিষ্ট্রিক্ট) বলিয়া বিখ্যাত। মিঃ বি. সেনও বলিলেন যে, তিনি বেলা দশটা হইতে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতেন। আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, রোজ চল্লিশ পঞ্চাশখানা দরখাস্ত পড়িতেছে। পুলিসের চালানও প্রত্যহ অন্য জেলার দ্বিগুণ। অথচ সদর এলাকা দুই সবডিভিসনে বিভক্ত। আমি 'এ' সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত। মিঃ সেন একা দরখাস্তের এজাহার লইতে না পারিয়া অধীনস্থ ডেপুটিদের কাছে পাঠাইতেন। তাঁহারাও খাটিয়া খুন। এত বেশী মোকদ্দমার কারণ কি? ডেপুটিরা বলিলেন, এক কারণ, তখনকার বাঙ্গালি ব্রাহ্ম সেসন-জজ। দরখাস্ত, কি মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেই তিনি 'মোসন' গ্রহণ করেন, কৈফিয়ৎ তলব করেন, এবং তাহার পর পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেন। এ জন্য ডেপুটিরা দরখাস্ত ডিসমিস করা একরূপ বন্ধ করিয়াছেন। ছাই-মাটি যাহা হউক, দরখাস্ত রাখিতেই হইবে। টাউটরা এমন সুযোগ ছাড়িবে কেন? কাজে কাজে, দরখাস্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। কেবল মিথ্যা ও ছাই-ভস্মের নালিশ নহে, যত প্রকারের দেওয়ানি বিবাদ, অল্প খরচে ফৌজদারি আদালতে মারপিট ও অনধিকার প্রবেশের ছলনায় উপস্থিত হইতেছে। ইহার ফলে যেমন অন্য স্থানে আমি বলিয়াছি, খুন ও হাঙ্গামা বৃদ্ধি হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের মোকদ্দমাও বাড়িতেছে। আমি দরখাস্ত পাইয়াই কখনই ডিসমিস করি না। নিজে প্রমাণ তলব দিয়া, কি পঞ্চাইতের দ্বারা তদন্ত করাইয়া ও তাহার সম্বন্ধে আপত্তি শুনিয়া তবে ডিসমিস করি। প্রথম মোকদ্দমা এরূপে ডিসমিস করিলে 'মোসন' হইল। আমি সাক্ষীর জবানবন্দি না লিখিয়া ডিসমিস করিয়াছি কেন, জজ কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি আশী সিক্কা ওজনে কৈফিয়ৎ দিলাম যে, এরূপ তদন্তের সময়ে সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিবার কোনও আইন আমি জানি না, এবং আমি ত্রিশ বৎসর যাবৎ এইরূপই করিয়াছি। সমারি বিচারে তিন মাস মেয়াদ দিবার সময়েও যখন জবানবন্দি

লিখিতে হয় না, তখন আসামী তলবের পূর্ব্বে এক রাশি জবানবন্দি লিখিয়া সময় নষ্ট করিবার বিধান কোন্ আইনে আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিতে জজের কাছে প্রার্থনা করিলাম। এই কৈফিয়ৎ পাইবার সময়ে মাজিষ্ট্রেট রো (Rowe) না কি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, এত দিন পরে জজ has caught a Tartar (এক তুর্কির পাল্লায় পড়িয়াছেন)। জজ নীরবে আমার আদেশ বাহাল করিলেন। তখন নিম্নশ্রেণীর উকিলগণ আর এক ফিকির বাহির করিলেন। এক মোকদ্দমায় এই মর্ম্মে 'মোসন' দাখিল করিলেন যে, আমি এগারটার পূর্ব্বে কোর্টে আসিয়া, মোকদ্দমা ডাকিয়া ডিসমিস করি। আমি কৈফিয়ৎ লিখিলাম, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এগারটার পরে ভিন্ন আগে যে আফিসে আসি না, সকলেই জানে। তাহার পর মাজিষ্ট্রেট শীতের সময়ে মফঃস্বল যাওয়াতে প্রথমতঃ এক ঘণ্টা কাল আমাকে ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারের কার্য্য করিতে হয়, তাহার পর কোর্টে বসি। অতএব কোন্ উকিল এরূপ মিথ্যা মোসন দাখিল করিয়াছেন, আমি তাঁহার নাম চাহিলাম। জজ উকিলকে ধমকাইলেন, এবং আমার আদেশ বাহাল রাখিলেন। এই এক উৎপাত থামিল।

মোকদ্দমা বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণও ব্রাহ্ম জজ ও স্থানীয় ব্রাহ্ম সংবাদপত্র। একটি দলবদ্ধ বলাৎকারের (Gang rape) মোকদ্দমা হয়। ব্রাহ্ম সংবাদপত্র তাহা লইয়া চীৎকার করিতে করিতে গগন বিদীর্ণ করেন, এবং ব্রাহ্ম জজ তাহাতে আসামীদিগকে দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ করেন। সেই হইতে উক্ত সংবাদপত্র 'মহিলানিগ্রহ' ধূয়া ধরিয়া আছেন, এবং 'সতী রমণীর প্রতি দলবদ্ধ পাশব অত্যাচারে'র প্রবন্ধ এক স্রোতে বাহির হইতেছে। টাউটদের একটা মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক নালিশে, কি কোর্টে, কি পুলিসে, দলবদ্ধ বলাৎকারের অভিযোগ গাঁথিয়া দিতেছে। সামান্য মারপিটের, কি গরু খোয়ানের মোকদ্দমায়ও বাদী বলিতেছে, যে, তাহাকে মারপিট করিয়া, কি গরু কাড়িয়া লইয়া, বিবাদীরা দলবদ্ধ হইয়া তাহার স্ত্রী, কি ভগিনী, কি অন্য রমণীকে ধরিয়া 'নালিয়া ক্ষেতে' (কোষ্টা ক্ষেতে) লইয়া গিয়া সকলে বলাৎকার করিয়াছে। যে দরখাস্ত হাতে পড়িতেছে, তাহাতেই এইরূপ দলবদ্ধ বলাৎকার! পূর্ব্ববাঙ্গালা সমস্তই মুসলমানপ্রধান স্থান। পার্শ্ববর্ত্তী জেলা ঢাকা, ফরিদপুর, এমন কি, পীঠস্থান বরিশালে পর্য্যন্ত এরূপ মোকদ্দমার নাম-গন্ধ নাই। কেবল ময়মনসিংহে ইহার প্রাদুর্ভাবের কারণ কি? উকিল মোক্তারেরা বলিলেন,—"ধর্ম্মাবতার! ময়মনসিংহে নালিয়া ক্ষেত দেখা দিলেই বসন্তের কোকিল ডাকে।" বঙ্কিম বাবুর রোহিণীর মত তাঁহারা বলেন যে, এই অপরাধ কোকিলের। সে এমন অসময়ে ডাকে কেন? আমি বলিলাম যে, তবে তাঁহাদের 'ঐ কালো কোকিলের' নামেই দরখাস্ত করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহে কোকিল বধের জন্য পুরস্কার দিয়া, তাহা বিতরণের ভার ব্রাহ্ম মহাশয়দের উপর দেওয়া উচিত। কিন্তু কই, কোকিলের ডাক ত শুনি না। শুনি কেবল এই ব্রাহ্ম সম্পাদক মহাশয়ের ডাক। অথচ এরূপ অপরাধের কারণ ময়মনসিংহে যেরূপ অভাব, অন্য কোথাও তাহা নাই। এখানে অধিকাংশ নিম্ন সম্প্রদায়ের লোকের, বিশেষতঃ মুসলমানদের স্ত্রী, একাধিক 'ইস্ত্রী' (পত্নী) ত আছেই, তাহার উপর আবার গৃহের উপকরণের মত 'উপ'ও একটা, কি একাধিক আছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক গ্রাম্য হাট ও বাজারে অবিদ্যার আড্ডা আছে। হাটের জমিদারদের তাহাই সোনার কাটি, রূপার কাটি। তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা কত! শুনিয়াছি, ময়মনসিংহ সহরে পর্য্যন্ত পরব পার্ব্বণে, এমন কি, যাত্রার গানে পর্য্যন্ত তাহাদের যথাশাস্ত্র নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা হইয়া থাকে। এক জমিদারের হাটের অবিদ্যা অন্য জমিদার অপহরণ করিয়া তাঁহার হাটে লইলে, উভয়ের মধ্যে একটা 'ট্রোজান যুদ্ধ' উপস্থিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত 'হেলেনে'র উদ্ধার না হয়, সে পর্য্যন্ত মোকদ্দমানল নির্ব্বাপিত হয় না। হাট বাজার ছাড়াও শুনিয়াছি, যেখানে একটা বটবৃক্ষ আছে, তাহার নীচেই একটি অবিদ্যা বিরাজিতা। এক

গ্রামের ভূতের অধিকারে অন্য গ্রামের ভূত হস্তক্ষেপ করিলে যেমন একটা ভৌতিক যুদ্ধ উপস্থিত হয় বলিয়া প্রবাদ, ইহাদের মধ্যেও সেরূপ 'জুরিসডিক্‌সন্‌' (অধিকার) লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অতএব এরূপ সতী সাবিত্রীর দেশে কেন যে 'ঘোরতর মহিলা-নিগ্রহ' হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই 'গ্যাঙ্গ রেপের' প্রথম যে মোকদ্দমা আমার হাতে পড়িল, তাহাতে আমার সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল।

মোকদ্দমাটি এইরূপ।—একটি প্রকাণ্ড বাজারের কেন্দ্রস্থলে একটি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানীর একখানি ক্ষুদ্র মুদীর দোকান। তাহাতে চাটাইএর বেড়া, এবং অভ্যন্তরে একটি সুন্দরী যুবতী স্ত্রী। সে এমন স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে একাকিনী রাখিয়া বারাণ্ডায় শুইয়াছিল। পরদিন প্রাতে পুলিসে এজেহার দিয়াছে যে, রাত্রিতে তাহার স্ত্রী কাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাহার পর কোর্টে আসিয়া স্ত্রীরত্ন এক 'ঘোরতর মহিলানিগ্রহে'র অভিযোগ উপস্থিত করিলে, উহা তদন্তের জন্য পুলিসে যায়। সেই পুলিসই দীর্ঘকাল তদন্তের পর একটা দলবদ্ধ বলাৎকারের মোকদ্দমায় দুই জন মধ্যবিত্ত অবস্থার আসামী চালান দিয়াছে। এখন 'মহিলা মঙ্কের' বলিতেছেন যে, তাঁহার কুঁড়ের কোণা কাটিয়া, আসামীরা তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া, সম্মুখস্থ ক্ষুদ্র খালে এক নৌকায় সেই বাজারেরই নীচে সমস্ত রাত্রি আক্রমণ করিয়াছে, এবং প্রাতে অপর পারে এক নালিয়া ক্ষেতে রাখিয়া আসে। সেখানে তাঁহার স্বামী সাক্ষিগণকে লইয়া তাহার হারান ধন নালিয়া ক্ষেতে প্রাপ্ত হয়। তাহার পর এই নালিশ। মোকদ্দমার দুই সাক্ষী বলিতেছে, তাহারা দুপুর রাত্রিতে বঁড়শি দিয়া মাছ ধরিতেছিল। তাহারা দেখিল যে, এই নিগৃহীতা মহিলার মত একটি রমণী দুই বিবাদীর মধ্যে চলিয়া যাইতেছে। কোনও বেশ্যা যাইতেছে বলিয়া তাহারা দ্বিরুক্তি করিল না। জেরাতে প্রকাশ পাইল—জেরার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না, প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দির ভঙ্গী ও মুখের ভাব দেখিয়া আমি হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না,—জেরাতে প্রকাশ পাইল যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে দুইটি দল। ইংরাজ রাজ্যের কল্যাণে কোন্‌ গ্রামেই বা নাই? পরদিন প্রাতে যেমন বিবাদীর বিপক্ষ দল শুনিল যে, বাদীর স্ত্রী বাহির হইয়া গিয়াছে, তখনই তাহারা গিয়া তাহাকে শিকার করিল। সে নিতান্ত দরিদ্র লোক। তাহার পর এই নালিশ ও টাঁন্নদের দ্বারা যথাবিধি সাক্ষী গঠিত হইয়া, উপযুক্ত দক্ষিণাপ্রাপ্ত পুলিসের দ্বারা কোর্টে উপস্থিত হইল। ঘরের কোণা কাটিয়া স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক লইয়া গেল, অথচ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সতী রমণী বাজারের মধ্য দিয়া পদব্রজে চলিয়া গেলেন, সমস্ত রাত্রি নৌকাতে নিগৃহীতা হইলেন, অথচ একটুক উচ্চ বাচ্য করিলেন না —সতী কি না? একটুক উঃ শব্দ করিলেই বাজারের শত শত লোক ছুটিয়া আসিত। সর্ব্বশেষ পরদিন প্রাতে স্বামী পুলিসে এজাহার দেন যে, তাঁহার সন্দেহ, তাঁহার সতী মহিলা কাহারও সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছেন। অথচ এই মোকদ্দমা লইয়া ব্রাহ্ম সম্পাদক মহাশয় সপ্তাহের পর সপ্তাহ লোকের কর্ণ বধির করিয়া চীৎকার করিতেছিলেন! বলা বাহুল্য, বাদীর পক্ষেও দলাদলির কল্যাণে উকিল দেওয়া হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন, এই মোকদ্দমা সেশনে পাঠান উচিত। কারণ এরূপ আরও মোকদ্দমায় জজ 'সঙ্গীন' শাস্তি দিয়াছেন। বিবাদীর উকিল বলিলেন, তাহাতেই ত এইরূপ মিথ্যা মোকদ্দমার সৃষ্টি হইতেছে। আমি কিছু সঙ্কটে পড়িলাম। 'গ্যাঙ্গ রেপ' চুলোয় যাক্‌, তাহা ত হইতেই পারে না। জোর পরস্ত্রী বাহির করিয়া লওয়ার অপরাধ হইতে পারে। বাদী নিতান্ত দরিদ্র। অতএব সতী সহজেই এ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়া, আমার রায়ে 'গ্যাঙ্গ রেপে'র রহস্যটা জজের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলাম। সকলে বলিতে লাগিলেন যে, জজ নিশ্চয়ই এই মোকদ্দমা সেশনে পাঠাইতে আদেশ দিবেন। ব্রাহ্ম সম্পাদকের গলা একবারে পঞ্চমে উঠিল। কিন্তু ব্রাহ্ম জজ 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ করিয়া,

আমি যে শাস্তি দিয়াছিলাম, তাহাও রহিত করিলেন। বলিলেন, স্বামী যখন নালিশ করে নাই, তখন স্ত্রী বাহির করিবার অপরাধে শাস্তি হইতে পারে না। অথচ বাদী বেচারি প্রথমেই পুলিসে এই অপরাধেরই এজাহার দিয়াছিল। তিনি 'গ্যাঙ্গ রেপ' সম্বন্ধে কথাটিও কহিলেন না। যাহা হউক, প্রহসন বাড়াইবার জন্য পরদারহরণ অপরাধের নূতন নালিশ করিতে আমি স্বামীর নামে নোটিশ দিলাম। সে তখন আসিয়া দরখাস্ত দিল যে সে বিবাদীর সঙ্গে আপোষ করিয়াছে, অর্থাৎ কিছু পাইয়াছে, অতএব সে আর নালিশ করিতে চাহে না। আমার উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল—গরিব কিছু পায়। এরূপে এক বিরাট 'গ্যাঙ্গ রেপে'র পালা শেষ হইল। ইহার ফলে আমি যে চার মাস ময়মনসিংহে ছিলাম, কি পুলিসে, কি কোর্টে, আর 'গ্যাঙ্গ রেপে'র মোকদ্দমা হয় নাই।

মোকদ্দমা বৃদ্ধির তৃতীয় কারণ, পুলিসের একাধিপত্য। মাজিস্ট্রেট ও ডিঃ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট পুলিসের 'হস্তগত আমলক'। ময়মনসিংহ বহু ধনী জমিদারের রাজ্য। প্রজা ও প্রতিযোগী ভূম্যধিকারীর শাসনের এক অমোঘাস্ত্র—পুলিসকে হাত করিয়া, প্রজার নামে বদমায়েসি, কি শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত করা। শুনিলাম, এরূপ মোকদ্দমার এক এক রিপোর্টের মূল্য পাঁচ শত টাকা। দেখিলাম, প্রায় আড়াই শত বদমায়েসি ও দেড় শত শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত আছে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ সেন সমস্ত শীতকাল মফঃস্বল ঘুরিয়া, কুড়িটি বদমায়েসি মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন। কারণ, এরূপ মোকদ্দমা গবর্ণমেণ্টের আদেশ মতে স্থানীয় তদন্ত ভিন্ন নিষ্পত্তি হইতে পারে না। শুনিলাম, এক এক তদন্তে পঞ্চাশ ষাট মাইল কিছু দূর অশ্বে, কিছু দূর নৌকায়, কিছু দূর হস্তিপৃষ্ঠে, এবং অবশিষ্ট পথ পদব্রজে যাইতে হয়। আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। দেখিলাম, প্রত্যেক পুলিস-রিপোর্টের নীচে ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় তাঁহার দক্ষিণা আদায় করিয়া, 'জুডিসিয়াল তদন্ত আবশ্যক' লিখিয়া দিয়াছেন। আমি স্থির করিলাম যে, প্রথমতঃ তাঁহার এই করকণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিতে হইবে ও তাঁহাকে কিছু শিক্ষা দিতে হইবে। আমি মাজিস্ট্রেটের কাছে এক 'নোট' পাঠাইলাম। আমি প্রথমতঃ দেখাইলাম যে, বৎসরে ২৫টি হিসাবে ২৫০টি বদমায়েসি মোকদ্দমার স্থানীয় তদন্ত করিতে আমার দশ বৎসর লাগিবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রায়ই মোকদ্দমা দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে পুলিস দায়ের করিয়াছে। এখন সে সকল বদমায়েস সে গ্রামে আছে কি না, জীবিত আছে কি না, তাহারও স্থিরতা নাই। ইন্‌স্‌পেক্টর প্রত্যেক মাসে থানা পরিদর্শনে যাইতেছেন। তিনি সমস্ত মোকদ্দমা একবার তদন্ত করিয়া, উক্ত বদমায়েসেরা জীবিত ও সেই সেই স্থানে আছে কি না, এবং মোকদ্দমা চালাইবার কোনও প্রয়োজন আছে কি না এবং শান্তিরক্ষার মোকদ্দমায় এখনও শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না রিপোর্ট করিলে, তাহার পর প্রয়োজন-মতে 'জুডিসিয়াল তদন্ত' করা যাইতে পারিবে। মাজিস্ট্রেট ইহা অনুমোদন করিলেন। আমি চুপে চুপে এই আদেশ এবং চারি শত মোকদ্দমার সুদীর্ঘ শান্তিপ্রদ তালিকা ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়ের কাছে পাঠাইলাম। তাঁহার মাথায় বজ্র পড়িল। তিনি আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমি কিরূপে এই চারি শত মোকদ্দমার তদন্ত করিব?" আমি বলিলাম,—"আপনি প্রত্যেক মাসে থানা পরিদর্শনে এই সকল ঘটনাস্থানের নিকটে যান, আপনি পারিবেন না? তবে আপনি কেমন করিয়া ডেপুটি, কি জইণ্ট মাজিস্ট্রেটের ঘাড়ে এই কার্য্য চাপাইয়াছেন? আপনার ত থানায় থানায় পঞ্চ 'ম'কার সেবন ভিন্ন কোনও কাজ নাই বলিলেও চলে, তাহারা ত খাটিয়া খুন। তাহারা কিরূপে আড়াই শত বদমায়েসি মোকদ্দমার তদন্ত করিবে?" তিনি বড়ই বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি জানেন যে, এখন স্থানীয় তদন্ত হইলেও সকল মোকদ্দমার প্রায় কোনটাই টিকিবে না। অথচ নিজেও পূর্ণমাত্রায় দক্ষিণাটা লইয়াছেন। এখন কেমন

করিয়া মোকদ্দমা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্ট করিবেন। প্রয়োজন বলিয়া রিপোর্ট করিলে যদি বিচারে ডিসমিস হয়, তবে সমস্ত জবাবদিহি তাঁহার ঘাড়ে পড়িবে। অন্য দিকে এত মোকদ্দমা তদন্ত করা ঘোরতর পরিশ্রম ও ক্লেশের কথা। তিনি নিতান্ত কাতর হইলেন। আমি তখন বলিলাম,—"আচ্ছা, আসুন, আমাদের মধ্যে একটা সন্ধি হউক। আপনি প্রথমতঃ একটা মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া, উহা বিচারোপযোগী চালান দিন, এবং তাহার বিচারের ফলসাপেক্ষে অন্য মোকদ্দমার তদন্ত স্থগিত রাখিলেন বলিয়া রিপোর্ট করুন। এই মোকদ্দমার বিচারের পর অন্য মোকদ্দমাসমূহের যাহা হয় করা যাইবে। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন, এবং কিছু দিন পরে একা মোকদ্দমার জন পাঁচেক আসামী চালান দিলেন। বিচারে দাঁড়াইল যে, তাহারা সকলে অবস্থাপন্ন লোক, কেহ কেহ স্কুলের মাষ্টারি ও পণ্ডিতি করে। জমিদারের সঙ্গে বৃদ্ধি খাজনা লইয়া তাহাদের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে। জমিদারের নায়েব মহাশয় কোর্টে উপস্থিত থাকিয়া, কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টরের দ্বারায় মোকদ্দমা চালাইতেছেন। তাহাদের পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে বদমায়েসির গন্ধ নাই। ইন্‌স্‌পেক্টর স্বয়ং কোর্টে উপস্থিত। এরূপ মোকদ্দমা তিনি কেমন করিয়া চালান দিলেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার তদন্তের সময় এই সকল কথা প্রকাশ পায় নাই। আমি আসামীদের অব্যাহতি দিয়া, মোকদ্দমার নথি মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইলাম এবং আবার এক 'নোট' দিলাম যে, এই ত বদমায়েসি মোকদ্দমার নমুনা। অতএব অবশিষ্ট মোকদ্দমায় অনর্থক মূল্যবান্ সময় নষ্ট না করিয়া, সমস্ত খারিজ করিয়া দেওয়া উচিত। তাহার পর পুলিস হইতে বদমায়েসি মোকদ্দমার নূতন এক তালিকা আনাইয়া, আগামী শীতের সময়ে মফঃস্বল পরিদর্শন সময়ে মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং ও স্থানে স্থানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট গিয়া, স্থানীয় তদন্ত করিয়া মোকদ্দমা দায়ের করিলে, সকলের পক্ষে সুবিধা হইবে। মাজিষ্ট্রেট আমার এই প্রস্তাবও অনুমোদন করিলেন। অতএব এক হুকুমে আড়াই শত বদমায়েসি মোকদ্দমা খারিজ হইল। উকিল মোক্তারদের হাহাকার এবং সমস্ত দেশে একটা আনন্দধ্বনি উঠিল।

বাকী রহিল শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা। দেখিলাম, তাহার অধিকাংশই মহারাজা সূর্য্যকান্তের ও তাঁহার অংশীদার ভ্রাতা জগৎকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি, এখনও রোজ চার পাঁচটা করিয়া পুলিস-রিপোর্ট আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাদের উভয়ের ম্যানেজাররা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমি আবার তাঁহাদের ডাকাইলাম। এই সকল মোকদ্দমার প্রকৃত কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলে উভয়েই বলিলেন যে, মহারাজা সূর্য্যকান্ত জগৎকিশোরের এক পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। জগৎকিশোর আচার্য্য মহাশয়ের জননী পুণ্যবতী বিদ্যাময়ী দেব্যা একজন বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণী। তিনি মনে করিয়াছিলেন, এই পোষ্য নাম মাত্র। তাঁহাদের এক বাড়ী, তাঁহার ঘরের ছেলে ঘরেই থাকিবে, লাভের মধ্যে সে মহারাজা সূর্য্যকান্তের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে। মহারাজা সূর্য্যকান্তের মত এমন চতুর ও প্রকৃত ভূম্যধিকারী বোধ হয়, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই। তিনিও তাঁহার পিতার পোষ্য পুত্র। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিবলে তিনি তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা হইয়া ও কেবল মহারাজা হন নাই, তাঁহার অংশের তিন লক্ষ টাকার মুনাফা ছয় লক্ষ টাকা করিয়াছেন, এবং এখনও প্রত্যেক বৎসর উহা বৃদ্ধি করিতেছেন। তিনি যদিও বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ মাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের ভয়ে অন্যান্য ভূম্যধিকারীদের মত কলিকাতাবাসী, কিন্তু এরূপ শাসন-প্রণালী পরিচালিত করিয়াছেন যে, একটা পয়সার খরচ, কি সামান্য কার্য্যটুক পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমতি ছাড়া নিষ্পন্ন হয় না। শুনিয়াছি, গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য, বাড়ী ও জমিদারির খরচের জন্য, তাঁহার নিজ খরচের জন্য, এমন কি, প্রত্যেক বৎসর নূতন জমিদারী ক্রয় করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরগণা নিয়োজিত আছে।

এক পরগণার এক পয়সাও নিয়োজিত ব্যয় ভিন্ন অন্যরূপে ব্যয়িত হইতে পারে না। এমন সুন্দর শাসনপ্রণালী অন্য কোন জমিদারের আছে কি না জানি না। তিনি তাঁহার গৃহীত পুত্রকে পল্লীগ্রামে রাখিবেন কেন? তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা দিতেছেন। তদপেক্ষাও বিদ্যাময়ী দেব্যার বিশেষ আপত্তি যে, ছেলেকে তিনি 'সাহেব' বানাইতেছেন। এই কারণে বিদ্যাময়ী দেব্যার আদেশমতে, মহারাজা সূর্য্যকান্তের কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং প্রতিদানে মহারাজার আদেশমতে, বিদ্যাময়ী দেব্যার কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে এই সকল শান্তিরক্ষার মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। উভয়ের ম্যানেজাররা আমাকে বলিলেন যে, আমি একবার মুক্তাগাছা গিয়া যদি মহারাজকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পত্নী বিদ্যাময়ী দেব্যার কাছে লইয়া গিয়া, উভয়ের মিলন করিয়া দিতে পারি, তবে এই উৎপাত থামিয়া যাইবে। মহারাজা শীঘ্র ময়মনসিংহ আসিবেন। আমি সম্মত হইলাম, এবং প্রস্তাব করিলাম যে, আমি আপাততঃ এই সকল মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিব, এবং তাঁহারা আর এখন কোনও মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেন না, কি মফঃস্বলে কোনরূপ শান্তিভঙ্গের কার্য্য করিবেন না। তাঁহারাও সম্মত হইলেন। আমি তদনুসারে এই দেড়শত মোকদ্দমাও এক হুকুমে খারিজ করিয়া দিলাম। মাজিস্ট্রেট কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টরের মুখে শুনিয়া, আমাকে ডাকাইয়া, বিস্মিত ভাবে এরূপ অন্যায় আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম এবং বুঝাইলাম, যেখানে জমিদার দুজনের মধ্যে এই মনোবাদের দরুন এই সকল ভুয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে এই সকল মোকদ্দমার দ্বারা কি ফল হইবে। অতএব যাহাতে ইহাঁদের মনোমালিন্য দূর হয়, তিনিও তাহার চেষ্টা করিলে এই উৎপাত আর থাকিবে না। তিনি বলিলেন যে, আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। জানিবেন কেমন করিয়া? তাঁহাদের সম্পর্ক 'আর্দালি খুড়া' ও পুলিসের নরাধমদের সঙ্গে মাত্র। তাহা না হইলে আজ বৃটিশরাজ্যে এই হাহাকার উঠিবে কেন? যাহা হউক, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া, আমার এই কার্য্যেরও অনুমোদন করিলেন।

এই সকল কৌশলের ফলে মোকদ্দমার সংখ্যা দেখিতে দেখিতে কমিয়া গেল। যেখানে প্রত্যহ চল্লিশ পঞ্চাশখানা দরখাস্ত পড়িত, এখন দশ পনর খানির বেশী পড়ে না। মোক্তারেরা সারি বাঁধিয়া দরখাস্তের সময়ে বসেন ও কার্য্য শেষ হইলে ম্লানমুখে বলেন,—"ধর্ম্মাবতার! ময়মনসিংহে এমন কখনও হয় নাই। অথচ আপনার ত কোনও দোষ দিতে পারি না। আপনি ত কোনও দরখাস্ত ডিসমিস করেন না। লোকে নালিশ না করিলে আপনি কি করিবেন? আচ্ছা পূজার বন্ধের পর দরখাস্তের সংখ্যা আপনি কেমন করিয়া কমান, দেখা যাইবে।" পূজার পরও আমি যত কাল ছিলাম, আর মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। অন্যদিকে পুলিসের দক্ষিণামূলক মোকদ্দমা কয়েকটির রহস্য উদ্ভেদ করাতে পুলিস ধর্ম্মঘট করিল যে, আমি যতদিন ছুটিতে না যাই,—আমি ইতিমধ্যে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটির প্রার্থনা করিয়াছিলাম—তাঁহারা আর 'এ ফর্ম্ম' পাঠাইবেন না, কোনও মোকদ্দমা চালান দিবেন না। 'এ' বিভাগে আমার অধীনে দুইজন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বে তাঁহাদের ও মিঃ সেনের 'ন দিবা ন রাত্রি' খাটিতে হইত। মোকদ্দমার সংখ্যা কমিয়া যাওয়াতে তাঁহাদের একজনকে সরাইয়া লইয়া, কলেক্টর ট্রেজারি-অফিসার করিলেন। আর একজন নব যুবক, আমার সেই মাদারিপুরের সহকারী ডেপুটি, যিনি সেশনে আমার প্রতিকূলে 'দিনারা' মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়া, আমাকে সাক্ষী প্রস্তুত করার অভিযোগে পদচ্যুত করিয়া, জেলে দেওয়ার যোগাড় করিয়াছিলেন, তাঁহারই পুত্র। যাহা হউক, সে আমাকে শ্রদ্ধা করিত, আমিও তাহাকে স্নেহ করিতাম। তাহার 'ডিপার্টমেণ্টাল' পরীক্ষা

নিকট। তাহাকে মোকদ্দমা কিছু কম দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলে আমি বলিলাম যে, আমি তাহাকে মোটেও মোকদ্দমা দিব না। সে বিস্মিত হইয়া বলিল,—"অসম্ভব কথা। আপনি একা প্রতিটি বিভাগের কাজ কেমন করিয়া চালাইবেন। আর আমাকে একেবারে মোকদ্দমা না দিলে মাজিস্ট্রেট মনে করিবে, আমাকে বসাইয়া রাখিয়াছেন। তখন আমার উপর অন্য কাজ চাপাইবে। তাহাতে আমার উপকার না হইয়া বিপরীত হইবে।" আমি এ জন্য সামান্য একটুক কাজ দিতাম। অবশিষ্ট সমস্ত কাজ, ডিষ্ট্রিক্ট চার্জ্জের কাজ সন্ধ্যা আমি বারটা হইতে চারিটার মধ্যে শেষ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতাম। সকলে বলিতে লাগিলেন যে, ময়মনসিংহে এই দৃশ্য কেহ কখনও দেখাইতে পারেন নাই।

বড় আনন্দে দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিধাতা আমার ভাগ্যে লেখেন নাই। আমি গোলাপটি রোপণ করিলে, বিধাতা তাহাতে একটা কণ্টক ফুটাইয়া দেন। যেখানে যাই, যত সাবধানে থাকি, তথাপি একটা না একটা ঘটনা আসিয়া, উপরিস্থের সঙ্গে একটা ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া দিয়া, আমাকে তাঁহার বিরাগভাজন করে। এখানে এ পর্যন্ত মাজিস্ট্রেট রো সাহেবের সঙ্গে আমার বেশ চলিতেছিল। এই সুখ-শান্তির সময়ে আকাশে হঠাৎ কালো মেঘ দেখা দিল। একটি পশ্চিম অঞ্চলবাসী তাহার কন্যা শুদ্ধ পুলিসে উপস্থিত হইয়া কি এক নালিশ করে। পুলিস প্রভু দুজনেই—দুই সবইন্‌স্‌পেক্টর,—একসঙ্গে তাহার 'তদন্তে' সন্ধ্যার সময়ে বহির্গত হন। কন্যাটি নবযুবতী ও সুন্দরী। অতএব সমস্ত রাত্রি তাহাকে তাঁহাদের নৌকায় রাখিয়া 'তদন্ত' করেন। পরদিন প্রাতে এক স্থানে নৌকা লাগাইলে, তাহার অরসিক পিতা রসভঙ্গ বা তদন্তের বিঘ্ন করিলে গোলযোগ হয়। তাহাকে তাঁহারা প্রহার করিয়া, এবং তদুপরি তদন্তের কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকও আদায় করিয়া, পিতাপুত্রীকে তাড়াইয়া দেন। তাহারা কোর্টে আসিয়া মিঃ সেনের কাছে নালিশ করে। পূর্ব্বে ডেপুটিরা পুলিসের ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতিকূলেও নালিশ লইতে পারিতেন। কিন্তু এখন ইলিয়টি আমলে বোধ হয়, গোপনীয় আদেশ প্রচলিত হইয়াছিল যে পুলিসের বিরুদ্ধে স্বয়ং মাজিস্ট্রেট ভিন্ন আর কেহ নালিশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অতএব মিঃ সেন এই নালিশ মাজিস্ট্রেটের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাজিস্ট্রেট তদন্ত করিয়া, সবইন্‌স্‌-পেক্টরদ্বয়কে অব্যাহতি ত দিয়াছেনই, তাহার উপর বাদীকে ও তিন সাক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ফৌজদারিতে দিয়া, চার মোকদ্দমা মিঃ সেনের কাছে বিচারের জন্য অর্পণ করিয়াছেন। বাদী জজের কাছে মোসন করিল। ব্রাহ্ম জজ মহাশয় দীর্ঘ রায় লিখিয়া বাদীর নালিশ সমূলক সাব্যস্ত করিয়া, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে, তাহার বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, আর মাজিস্ট্রেটের বর্ণ অমল ধবল। অতএব উপসংহারকালে 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, মাজিস্ট্রেটের আদেশ আইনবিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার উহা রহিত করিবার ক্ষমতা নাই। ইহাও ঠিক নহে। বাদীর অভিযোগ যখন সেশনে বিচার্য্য, তখন উক্ত মোকদ্দমা সেশনে প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ করার তাঁহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। তত দূর সাহসে না কুলাইলে, তিনি মাজিস্ট্রেটের অবৈধ আদেশ রহিত করিবার জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে পারিতেন। আমার কলেজে পড়িবার সময়ে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, চুরি করিও না, মিথ্যা কথা বলিও না।" (তাহার পর গলা ছোট করিয়া)—"জো পাইলে কিন্তু সব সময় ছাড়িও না।" তিনি এখন জীবিত থাকিলে বলিতেন,—"সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দোহাই দিয়া গগন বিদীর্ণ করিও। কিন্তু কেবল জো পাইলে উহা কার্য্যে পরিণত করিও।" 'যা শত্রু পরে পরে'—জজ এই নীতি অবলম্বন করিয়া, এই বিপদ্ আমি

গরীব ডেপুটির স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে আমি এরূপ অবৈধ মোকদ্দমায় আসামীদের শাস্তি দি, সে পাপ আমার হইবে। আর ছাড়িয়া দি, আমিই ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্রোধানলে নিক্ষিপ্ত হইব। তাঁহার Conscience (বিবেক) এরূপে তিনি রক্ষা করিয়াছেন। 'জগদম্বা! আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' আমি তাঁহার রায় পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম, আর এক বিপদ্ দুই দিন না যাইতে আমার মস্তকে পতিত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট এই সকল মোকদ্দমা চালাইতে গবর্ণমেণ্ট প্লিডারকে নিয়োজিত করিয়াছেন। ময়মনসিংহে এই মোকদ্দমার কথায় আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে দেশ উলট-পালট হইতেছে। অতএব দরিদ্র আসামীদের প্রতি দয়া করিয়া একজন স্থানীয় ব্যারিষ্টার মোকদ্দমাটি বোধ হয় বিনা ফিসে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বাদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা নালিশের মোকদ্দমারই বিচার হইল। পুলিসের সবইন্‌স্‌পেক্টর এক জন দীনবন্ধুবাবুর "সন-ইন-ল—সার!" একে ত তাঁহার ইংরেজী বিদ্যা তদ্রূপ, তাহাতে তিনি আবার তোত্‌লা। ব্যারিষ্টার বাঙ্গালায় রসিকতাপূর্ণ প্রশ্ন করিতেছেন, আর সে গম্ভীর ভাবে তোত্‌লাইয়া তোত্‌লাইয়া তাহার অপূর্ব্ব ইংরাজিতে উত্তর দিতেছে। সে কিছুতেই বাঙ্গালা বলিবে না। কোর্টে একটা হাসির তুফান উঠিয়াছে। এইরূপ একটা গুরুতর অভিযোগ মিথ্যা স্থির করিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের এই গরীবদের ফৌজদারিতে দেওয়ার একমাত্র কারণ—পুলিসের এক 'ষ্টেশন ডাইরি'। তাহাতে লেখা আছে যে, সবইন্‌স্‌পেক্টরযুগল এই মোকদ্দমা তদন্তের জন্য পরদিন প্রাতে রওনা হইয়াছিলেন। বাদী, যে স্থানে তাহাকে প্রাতে নয়টার সময়ে পুলিশ প্রহার করিয়াছিল ও অর্থদণ্ড করিয়াছিল বলিয়া বলিয়াছিল, তাহা ষ্টেশন হইতে পনর কুড়ি মাইল ব্যবধান। অতএব থানা হইতে প্রাতে রওনা হইয়া, সেখানে নয়টার সময়ে নৌকায় পৌঁছা অসম্ভব। কাজেই বাদীর নালিশ মিথ্যা। কিন্তু পুলিস প্রভুদের জবানবন্দিতে পরিষ্কার প্রমাণ হইল যে, ষ্টেশন ডাইরিটি সম্পূর্ণ জাল। তাঁহারা উক্তরূপ 'তদন্তে'র উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার পর বাহির হইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে বাদী গোলযোগ করিয়া বিভ্রাট উপস্থিত করাতে, আত্মরক্ষার জন্য পরদিন প্রাতে রওনা হইয়াছেন বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন। ডায়রির পূর্ব্বের ও পরের লিখিত বৃত্তান্তের দ্বারা ইহা যে জাল, পরিষ্কার প্রমাণিত হইল। ডায়রির অন্যান্য পৃষ্ঠার দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হইল যে, আরও এরূপ মিথ্যা Entry (বৃত্তান্ত) উহাতে লেখা হইয়াছে। এই ডায়রিও যে সময়ে সদর পুলিস আফিসে আসিবার কথা, তাহার দুই দিন পরে আসিয়াছে। এই বিলম্বের কারণও পুলিস প্রভুরা কিছুই দিতে পারিলেন না। যে দিন এই মোকদ্দমার 'রায়' দিব, সে দিন কোর্টে গিয়া দেখি যে, উকিল, মোক্তার ও লোকে কোর্ট পরিপূর্ণ। আমি বাদীকে অব্যাহতি দিয়া, যেই আদেশ প্রচার করিলাম, কোর্টে একটা আনন্দধ্বনি উঠিল। এই মোকদ্দমার বিচার সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্লিডার অন্য তিন মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিতে আবেদন করিলেন। উহা স্থগিত রাখিলাম। কোর্টের ভিড় কমিয়া গেলে আমার সেই নব যুবক ডেপুটি আসিয়া বলিলেন,—"সকলে বলিতেছিল যে, নবীনবাবুর বড়ই সঙ্কট। যদি এরূপ মোকদ্দমায় তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে শাস্তি দেন, তবে তাঁহার যে সুনাম আছে, তাহা নষ্ট হইবে। আর যদি খালাস দেন, তবে তিনি শেষ জীবনে ঘোরতর বিপদে পড়িবেন। ব্লো সাহেবের যেরূপ জিদ্, সে সহজে তাঁহাকে ছাড়িবে না। অতএব আপনি কি করেন, সমস্ত দেশ উদ্‌গ্রীব হইয়া আপনার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল, এখন আপনার যেরূপ জয়ধ্বনি ও এই বিচার লইয়া যেরূপ আন্দোলন উঠিয়াছে, আমাদের অন্য

কোর্টের কাজ বন্ধ হইয়াছে। সকলে বলিতেছে—বাহাদুর ছেলে। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমন দেখিলাম। কিন্তু আপনি বিপদে পাড়বেন। রো সাহেব সহজে ছাড়িবে না।" সন্ধ্যার সময়ে আমার গৃহেও আমলা, মোক্তার ও উকিলের ভিড় হইল। সকলে বলিতে-ছিলেন যে, ডেপুটিদের মধ্যে এই সাহস ও স্বাধীনতা আর কেহ দেখাইতে পারিত না। সকলেরই আমার জন্য কিন্তু আশঙ্কা। তাহা অমূলক হইল না।

রো সাহেব এই সময়ে মফঃস্বলে ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টর তাঁহার আদেশমতে এই মোকদ্দমার ফল তাঁহার কাছে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। তিনিও টেলিগ্রাফ করিয়া নথি তলব দিয়াছিলেন। তিনি মফঃস্বলে যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার ছুটি মঞ্জুর হইলে তিনি ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্টমাসের বন্ধের দিন আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। তাহা হইলে তিন মাস ছুটির উপর আমি কৃষ্ট-মাসের বন্ধও পাইব। তিনি আমার প্রতি এত দূর সদয় ছিলেন। আফিস বন্ধের দিন প্রাতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আগে তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ খুব সম্মানের সহিত গ্রহণ করিতেন। আজ কিছুক্ষণ আরদালি মহাশয়ের সঙ্গে বারাণ্ডায় বসাইয়া রাখিয়া ডাকাইলেন। কক্ষে প্রবেশ করিলে করমর্দ্দন ত করিলেনই না। নগণ্যভাবে বসিতে বলিয়া, এক লাউঞ্জে বসিয়া মহামনো-নিবেশের সহিত 'ইংলিশম্যান' পড়িতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম—বাজি মাৎ। কথাই কহেন না। কয়েক মিনিট পরে আমি বলিলাম যে, আমার ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে। তাঁহার প্রতিশ্রুতিমতে আমি সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে ছুটিতে যাইতে চাহি। তিনি 'ইংলিশম্যানে' দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন,—বটে! কিন্তু আপনার স্থানে যে জয়েণ্ট মাজিস্ট্রেট নিয়োজিত হইয়াছেন, তিনি কৃষ্টমাসের মধ্যে আসিতে পারিবেন না লিখিয়াছেন। অতএব তিনি না আসিলে আমি ছাড়িতে পারিব না।" আমি—"আমি নিজে পীড়িত। আমার একমাত্র সন্তান চট্টগ্রামে ১০৭ ডিগ্রি জ্বরে ভুগিতেছে। ডাক্তারেরা তাহাকে জল-বাতাস পরিবর্ত্তনের জন্য তৎক্ষণাৎ পশ্চিম লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আমি কেমন করিয়া থাকিব? তাঁহার আমার প্রতি দয়া করা উচিত।" তিনি—"আপনার ফাইলের অবস্থা কিরূপ?" আমি—"আমার ফাইলে সামান্য কয়েকটি মোকদ্দমা আছে মাত্র। কোনও গুরুতর মোকদ্দমা নাই।" তিনি—এখনও 'ইংলিশম্যানে' দৃষ্টি—"সেই মিথ্যা নালিশের ও মিথ্যা সাক্ষীর চারি মোকদ্দমা কি হইল?" আমি—"বাদীর বিরুদ্ধের মোকদ্দমা মাত্র বিচার করিয়া, আমি আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছি। তিনি বিস্ময়ের সহিত আমার দিকে চাহিয়া —"কেন?" আমি—"আপনি যে পুলিস-ডায়রির উপর মাত্র নির্ভর করিয়া ইহাদের ফৌজদারিতে দিয়াছিলেন, উহা জাল সাব্যস্ত হইয়াছে। সমস্ত অবস্থা আপনি আমার 'রায়' দেখিলে জানিতে পারিবেন।" তিনি ক্রোধের সহিত আবার ইংলিশম্যানে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন,—"আমি অতিশয় সাবধানে বিচার করিয়া ইহাদের ফৌজদারিতে দিয়াছিলাম। অতএব আপনার বিচারের ফল শুনিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।" আমি—"আমি মানুষ। আমার ভুল হওয়া অসম্ভব নহে। আমি আসামীকে acquit করি নাই, discharge করিয়াছি মাত্র। আপনি ইচ্ছা করিলে তাহার পুনর্ব্বিচার করাইতে পারেন। তদ্ভিন্ন আর তিন মোকদ্দমায় আমি হাত দিই নাই। এ সকল মোকদ্দমার এখন অন্য অফিসারের দ্বারা বিচার হইবে।" তিনি নীরব রহিলেন। আমি দেখিলাম, আর বেড়া নাড়িয়া ফল নাই। অতএব আমি দাঁড়াইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম যে,—"আপনি যদি আমাকে আজই ছুটিতে যাইতে না দেন, তবে আমার একমাত্র পুত্রের জীবনের জন্য আমি আজই পেন্‌সনের দরখাস্ত করিয়া, চাকরি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" তিনি চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—আপনার কি

পেন্‌সনের সময় হইয়াছে? আমি আরও দৃঢ়তর কণ্ঠে—"হাঁ! আমার ত্রিশ বৎসরের অধিক চাকরি হইয়াছে। অতএব আমি যে দিন ইচ্ছা, সে দিন retire (অবসর গ্রহণ) করিতে পারি।" তিনি এবার নরম হইলেন। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা। আপনি আজই ছুটিতে যাইতে পারেন।" আমি তখন ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। আফিসে ছুটির চিঠি-পত্র স্বাক্ষর করিয়া বাসায় যাইতেছি, এমন সময়ে সেই ডেপুটি—আমার ভগ্ন কুটীরে সামান্য কয়েকখানি জিনিস দেখিয়া যাহার আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি ছুটিয়া আমার এজ-লাসে আসিয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমাকে সাহেব 'কৃষ্টমাসে'র ছুটি দিয়াছিল। এখন এই আদেশ পাঠাইয়াছে—আমাকে আপনার কার্য্যভার লইতে হইবে। মহাশয়! আমার উপায় কি? আপনি বন্ধের কয়টা দিন থাকিয়া যান।" আমি বলিলাম, তাহা অসম্ভব। তবে আর একজন ডেপুটি যখন থাকিতেছেন, তিনি সে কথা বলিয়া কাঁদাকাটা করিলে তাঁহাকেও যাইতে দিবে। বন্ধের মধ্যে ত আর কোনও মোকদ্দমার বিচার হইবে না।" তিনি বলিলেন,—"মহাশয়! তাহাও কি পারি? আপনার সাহস কি আমাদের আছে? শুনিলাম, আপনি মাজিষ্ট্রেটকে ধমকাইয়া ছুটি লইয়াছেন। কি জানি মহাশয়! আপত্তি করিলে যদি চটে। তবেই ত সর্ব্বনাশ!" আমি বাসায় চলিয়া গিয়া, তৎক্ষণাৎ আমার সেই যুবক ডেপুটির বাসায় চলিয়া গেলাম। সে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। সেখান হইতে সন্ধ্যার পর ট্রেনে রওনা হইব। শূন্য বাসায় আরদালিকে রাখিয়া, বলিয়া গেলাম যে, সাহেব যদি কোনও চিঠিপত্র পাঠায়, তবে যেন আমি কোথায় চলিয়া গিয়াছি, সে জানে না বলে। আমার ভয়, পাছে আবার এই ডেপুটির কাঁদা-কাটায় আমার যাওয়া বন্ধ করে। ষ্টেশনে গিয়া দেখি লোকারণ্য। আমি চারি মাস মাত্র ময়মনসিংহে ছিলাম। আমি কি করিয়াছি যে, সর্ব্বপ্রধান উকিলেরা পর্য্যন্ত আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন? ময়মনসিংহ বহু শিক্ষিত লোকের স্থান। এখানের মত যোগ্য ও শিক্ষিত মোক্তার আমি আলিপুরেও দেখি নাই। আমি চারিটি মাস বড় সুখে ময়মন-সিংহে কার্য্য করিয়াছিলাম। কোর্টেও ঠাট্টা তামাসা, গল্পে ও হাসিতে দিন কাটাইতাম। সকলে আমাকে ছুটির পর ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। এবার আমার ঘরের কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, আমি অসুস্থ হইয়াছি। ফিরিয়া আসিলে, তাঁহারা আমার জন্য Lowther Castle, কি এরূপ নামযুক্ত একটি সুন্দর বাড়ী নিযুক্ত করিবেন বলিলেন। আমার কাছেও ময়মনসিংহ নগর ও স্থানীয় ভদ্রসমাজ বড় ভাল লাগিয়া-ছিল। অতএব আমারও ফিরিয়া যাইবার বড় অনিচ্ছা ছিল না। তবে মানুষের আশা, কয়টিই বা সফল হয়? ট্রেনের সময় হইয়াছে: তাঁহারা বড় শ্রদ্ধার সহিত বিদায় দিতেছেন। এমন সময়ে সেই ডেপুটি তাঁহার একমাত্র সম্বল সেই ক্ষুদ্র ট্রাঙ্ক হস্তে উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, আমার পরামর্শমতে কার্য্য করাতে তাঁহাকে সাহেব ছুটি দিয়াছেন। অতএব আমারও একটা আশঙ্কা দূর হইল। তিনি তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! ষ্টেশনে এই ভিড় কি আপনার জন্য? আপনাকে বিদায় দিতে ময়মনসিংহ ভাঙ্গিয়া এত ভদ্রলোক আসিয়াছেন? মহাশয়! আপনি ত সহজ লোক নহেন! চার মাসে আপনি এরূপ popular (লোকপ্রিয়) হইয়াছেন! আপনি অসাধারণ লোক!" সকলে হাসিতে লাগিলেন। ট্রেন খুলিল, বাহ্য জগতের মত মানব-জীবনেও ছায়ালোক আছে। চট্টগ্রামের সেই বিপদের ছায়ার পর, আমার জীবনের এই একটা আনন্দালোক-পূর্ণ ক্ষুদ্র অঙ্ক ফুরাইল।

প্রাণান্ত পীড়া

জানি না, মস্তিষ্কের সঙ্গে মূত্রাশয়ের কি সংস্রব। ফেনীতে 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' লিখিবার সময়ে ঘন ঘন প্রস্রাব হইত। আমি মনে করিতাম, সাহিত্যসেবীদের মহাশত্রু 'বহুমূত্র' আমার প্রতিও কর প্রসারণ করিতেছে। রাণাঘাটে 'অমিতাভ' রচনার সময়ও এরূপে কাটিয়া গেল। কলিকাতায় 'প্রভাস' লিখিবার সময়ও এরূপ হইলে ডাক্তার মেকোনেলের কাছে গেলাম। তিনি কেমিক্যাল একজামিনারের দ্বারা প্রস্রাব পরীক্ষা করাইলেন। কোনও দোষ পাওয়া গেল না। তিনি বলিলেন, Constipation-এর দরুন এরূপ হইতেছে। সহোদরসম স্বনামখ্যাত কবিরাজ বিজয়রত্ন সেনও তাহাই বলিলেন। তাঁহার সহিত কি শুভ ক্ষণে দেখা। কলিকাতা আসিবার পর প্রথম দর্শন হইতেই তিনি আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন। বিজয়রত্ন একজন দেবচরিত্রের লোক। আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। তিনিও ডাক্তার নীলরতন সরকারের মত রোগী দর্শনে শ্রান্ত হইয়া, রাত্রি আট নয়টার সময়ে আমার গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন ও নানা আলাপে কাটাইতেন। দুই পরিবারের মধ্যেও পরম আত্মীয়তা হইল। ডাঃ মেকোনেল ও বিজয়রত্ন অনেক ঔষধ দিলেন, কিছুই ফল পাইলাম না। জনৈক রসিক বন্ধু বলিলেন, 'ব্লটিং পেপার' খাও। কেহ কেহ বলিলেন, কলিকাতার কলের জল ও কয়লার রান্না এই রোগের কারণ। কলিকাতা ছাড়িলেই এ উপদ্রব সারিয়া যাইবে। কলিকাতা পরিত্যাগের ইহাও এক কারণ। চট্টগ্রামে বদলি হইয়া আসিলে, সিভিল সার্জ্জন ডাঃ ড্রুরি (Dr. Drury) এ জন্য কতকগুলিন বিস্বাদ 'জারমন ওয়াটার' খাওয়াইলেন। সুহৃদ তারাচরণ কবিরাজ তাহার পর তাঁহার 'সোমরস', 'সূর্য্যরস', সকল রসই সেবন করাইলেন। কোনও ফল হইল না। ময়মনসিংহে দারুণ শীত। তাহাতে কুটীরের চাটাইয়ের বেড়ার সহস্র ছিদ্র দিয়া শীত অস্থি-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, কেবল এই রোগ বৃদ্ধি করিল এমন নহে, সময়ে সময়ে প্রস্রাব বন্ধ হইত। কখন বা ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হইতে লাগিল সিভিল সার্জ্জন ডাঃ এস্ (Ash)। প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই আমি কেমন তাঁহার সুনজরে পড়িলাম। তিনি লোকের কাছে বলিতেন যে, আমি অন্যান্য ডেপুটিদের মত নহি। আমি উচ্চজাতীয় লোক। "He belongs to a higher caste"। আমার কুটীরের সম্মুখ দিয়া তাঁহার জেলের পথ। তিনি জেল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে রোজ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নানাবিধ খোসগল্প করিতেন। তিনি আমার এরূপ পক্ষপাতী ও অনুরাগী হইলেন যে, আমার স্বকল্পিত 'রাইটিংগ টেবল' ও 'রাইটিংগ সোফা'র নকল প্রস্তুত করাইয়া আমার নিদর্শনস্বরূপ রাখিলেন। আমি উহাদের উপহার দিতে চাহিলে বলিলেন, তিনি তাহা লইবেন না। আমি এই টেবিলে কাগজ রাখিয়া ও এই সোফায় বসিয়া আমার কাব্যাবলি রচনা করিয়াছি। অতএব এই দুটি আমার পুত্রের প্রাপ্য, এবং তাহার দ্বারা দেব-প্রসাদের মত আমার গৃহে রক্ষিত হইবে। আমি বলিলাম, এই টেবিলে আমার সকল কাব্য রচিত হয় নাই। আমার ফেনীর টেবিল সোফা একজন ইংরাজ রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার আমার নিদর্শনস্বরূপ জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শুনিলাম, তিনি ফেনী হইতে যাইবার সময়ে আমার এই দুই চিহ্ন সঙ্গে করিয়া বিলাত লইয়া গিয়াছেন। এই সকল গুণেই ত ইংরাজ আমাদের প্রভু। একজন বাঙ্গালী কবির একটুক নিদর্শন রাখিতে ইহাঁদের এত আগ্রহ! কই, কোনও বাঙ্গালীকে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতে ত দেখি নাই। আমি তাঁহাকে আমার রোগের কথা বলিলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতেন,—"আপনার বয়স প্রায় আমার ডবল। আমার চুল পাকিয়া গিয়াছে, অথচ আপনি এখন যাবৎ প্রকৃতই 'নবীন'। অতএব আপনার শরীরে কোনও

রোগ আছে বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। উহা আপনার কবি-কল্পনা মাত্র। আমি জানি, আপনি ময়মনসিংহে কখনও থাকিবেন না। আপনি যখন ছুটির সার্টিফিকেট চাহেন, আমি তখনই দিব। রোগের ছলনার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু ক্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতেছে ও আমি কাতর হইতেছি দেখিয়া তিনি ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, এবং তিন মাসে ছুটির সার্টিফিকেট দিলেন। কেবল তাহাই নহে, চিফ সেক্রেটারি মিঃ বোল্টন ছুটি মঞ্জুর করিতেছেন না; তাঁহার বিশ্বাস, আমি ময়মনসিংহে বদলিতে অসন্তুষ্ট হইয়া পাশ কাটাইতে চাহিতেছি। তখন ডাঃ এস্ এক তীব্র সার্টিফিকেট দিয়া, আমাকে তৎক্ষণাৎ ছুটি দেওয়ার জন্য লিখিলেন। এবার মিঃ বোল্টন নাচার হইয়া ছুটি মঞ্জুর করিলেন। ময়মনসিংহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। নারায়ণগঞ্জে ট্রেন ভোর পাঁচটার সময়ে পঁহুছিল। একে ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগের শীত, তাহাতে নারায়ণগঞ্জে তিনটি বিস্তৃত মহানদনদীর সঙ্গম। ট্রেনের দ্বারগবাক্ষ খুলিলে শীতে কম্প উপস্থিত হইল। 'কৃষ্টমাসে'র বন্ধের ভিড়, কুলি পাওয়া কঠিন। ভৃত্যকে কয়েকটি ট্রাঙ্ক লইয়া আগে পাঠাইলাম। উহা একখানি প্রথম শ্রেণীর কেবিনে রাখিয়া, আবার আসিতে বলিলাম। তাহার আর দেখা নাই। ময়মনসিংহের বহু আমলা উকিল মোক্তার এই ট্রেনে আসিয়াছেন। তাঁহারা সাহায্য করিয়া, আমার সমস্ত জিনিসপত্র আমার জাহাজে উঠাইয়া দিলেন। কিন্তু কই, আমার ভৃত্য ও পূর্ব্বপ্রেরিত ট্রাংক সকল কোথায়? তিনটা 'ষ্টীমার' পাশাপাশি রহিয়াছে। তিনটা তিন দিকে যাইবে। এই দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আমি তিন ষ্টীমারে ঘুরিয়া ভৃত্যকে খুঁজিতে লাগিলাম। ডাকিতে ডাকিতে গলা ফাটিয়া গেল। সেই মহাহট্টগোলের মধ্যে কে কার কথা শুনে। প্রায় ঘণ্টাখানিক এরূপে দারুণ শীত ভোগ করিয়া তাহাকে পাইলাম। সে ট্রাঙ্ক লইয়া, ময়মনসিংহের কলেক্টরের সেরেস্তাদার চট্টগ্রামবাসী আমার এক বন্ধুর কাছে নিশ্চিন্তে বসিয়া তামাকুট সেবন করিতেছে। চাঁদপুরে পঁহুছিয়া ট্রেন পাইলাম না। আমার প্রেমাস্পদ খুড়তত ভ্রাতা মুন্সেফ তারাচরণের অতিথি হইয়া, আর একটা দিন দুর্গোৎসবের আনন্দে কাটাইলাম। রাত্রি নয়টার সময়ে ট্রেনে গেলে, আমার স্বদেশীয় এক ডেপুটি বেঙ্গল আফিসের ছোট চিত্রগুপ্ত মহাশয়কে আনিয়া আমার হাতে দাখিল করিয়া দিলেন। তিনি চন্দ্রনাথ দর্শনে যাইতেছেন। তাঁহাকে আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর কক্ষে তুলিলাম। ট্রেন উষার সময়ে সীতাকুণ্ড পঁহুছিয়াছে। আমরা নিদ্রিত। ডেপুটি মহাশয় আসিয়া আমাদের কক্ষের সমস্ত গবাক্ষ খুলিয়া বলিতেছেন,—"উঠুন! চন্দ্রনাথ ও চট্টগ্রামের পাহাড়ের শোভা দেখুন!" যেই আমরা বিছানায় উঠিয়া বসিলাম, আর যেন শরীরে তুষারবৃষ্টি হইল। ছোট চিত্রগুপ্ত ও আমি শীতে কম্পিতকলেবর হইয়া তাড়াতাড়ি গবাক্ষ বন্ধ করিলাম। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের ও এখানের অকস্মাৎ শীতভোগে আমার রোগ বৃদ্ধি হইল। আমি ঘন ঘন 'ওয়াটার ক্লসেটে' যাইতেছি দেখিয়া বন্ধু ব্যাপারখানা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম,—আমার অবস্থা এই। তথাপি আপনার বোল্টন সাহেবের বিশ্বাস যে, আমি ছলনা করিয়া ছুটি লইয়াছি। প্রাতে চট্টগ্রাম পঁহুছিয়া, বন্ধুকে লইয়া, পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়া, চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখাইলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, এবং কুয়াসায় সূর্য্যদেব অদৃশ্য। তাহাতে মাঘ মাসের পাহাড়ের বাতাসে আবার দুই ঘণ্টা শীতভোগ করিলাম। পল্লীগ্রামের বাড়ীতে পুত্র পীড়িত। আমার পাহাড়ের বাড়ীতে দিনটা কাটাইয়া, সন্ধ্যার জোয়ারে বাড়ী ছুটিলাম। রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত আবার শীতভোগ করিয়া বাড়ী পঁহুছিলাম। আহার করিয়া উঠিলে এরূপ উপর্য্যুপরি শীতভোগ নিবন্ধন প্রস্রাব একেবারে বন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইল,

ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলাম। গ্রাম ভাঙ্গিয়া বংশীয়গণ, ব্রাহ্মণ ও প্রজারা ছুটিয়া আসিল। আমাদের মগজাতীয় প্রজারা হস্‌পিটালের কম্পাউণ্ডারি করিয়া ডাক্তারি করে। তাহাদের একজন আসিয়া বলিল, 'কেথিটার' পাশ করিতে হইবে। এ রোগ ও কেথিটারের নামও কখন শুনি নাই। কিন্তু এরূপ যন্ত্রণা, যেন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যু হইবে। পত্নী পুত্র পরিবারবর্গের রোদনের ধ্বনিতে গৃহ পরিপূর্ণ। অগত্যা 'কেথিটার পাশ' করিতে দিলাম। 'মূর্খ বৈদ্য সমো যমঃ'—সে কেথিটার পাশ করিতে জানে না, রক্তপ্রবাহ ছুটাইল। রাত্রি প্রভাত হইলে চট্টগ্রাম সহরে রওনা হইলাম। বুঝিলাম, ইহা আমার অগস্ত্য-যাত্রা। পীড়িত পুত্র ও পত্নী অন্য দুই পাল্কিতে সঙ্গে চলিলেন। সমস্ত পথ উম্মাদের মত পাল্কি হইতে যন্ত্রণায় এক এক বার দুই চার মিনিট পরে লাফাইয়া পড়িতেছিলাম। এরূপ ভাবে নয় ঘণ্টাকাল প্রত্যেক সেকেণ্ডে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে বেলা তিনটার সময়ে সহরে হস্‌পিটালে গিয়া পঁহুছিলাম, এবং এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন বাবু কালীপ্রসন্ন কুমার কেথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইলেন। ঠিক যেন আগুনে জল পড়িল। চক্ষের পলকে সকল যন্ত্রণা নিবিয়া গেল। এ যেন যাদুকরের খেলা। হাসিতে হাসিতে আমার পাহাড়ের বাড়ীতে গেলাম।

কলিকাতায় একদিন সুহৃদ্‌শ্রেষ্ঠ বিজয়রত্ন বলিলেন যে, আমার 'কুরুক্ষেত্র'কে যাত্রা করিয়া, ভূষণ দাসের দল গাইতেছে। তিনি উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে, আমাকে উহা একদিন শুনিতে হইবে। প্রথিতনামা চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে গানে বিজয়রত্ন স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি বালক অভিমন্যুর অদ্ভুত অভিনয় করিতেছে। সে ঠিক যেন আমার কল্পনার অভিমন্যু। তাহার যেরূপ মধুর কণ্ঠ, সেরূপ সুন্দর দীর্ঘ মূর্ত্তি, তেমনই বিষাদগাম্ভীর্য্যমণ্ডিত মুখশ্রী, এবং তেমনই গৌরবব্যঞ্জক দেহভঙ্গি। এরূপ অভিনেতা কোনও রঙ্গালয়েও দেখি নাই। সে এই যাত্রাদলের প্রাণ। যাত্রা আগাগোড়া কীর্ত্তনের সুরে বাঁধা। শুনিলাম একজন গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত 'কুরুক্ষেত্র' হইতে এ যাত্রা রচনা করিয়াছেন। তিনি যদিও স্থানে স্থানে 'কুরুক্ষেত্রে'র উপর হাত চালাইয়া, যাত্রার অধিকারীর মত দুই একটা দৃশ্য দিয়া রসভঙ্গ করিয়াছেন, এবং সুভদ্রার শোকের মাহাত্ম্য না বুঝিয়া সেই সর্গ একেবারে মাটি করিয়াছেন, তথাপি 'কুরুক্ষেত্রে'র ভাষা ও ভাব লইয়া এমন মধুর কীর্ত্তন রচনা করিয়াছেন যে, তাহাতে পাষাণ দ্রব হয়। গঙ্গা-প্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবতীবাবুর আদরের ও আহারের আব্‌দারে যদিও আমি যাত্রাটি ভাল করিয়া শুনিতে পারিলাম না, তথাপি যাহা শুনিয়াছিলাম, বিশেষতঃ অভিমন্যুর অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। আমি ময়মনসিংহ থাকিবার সময়ে টাঙ্গাইলের এক যাত্রার দল ভূষণ দাসের এই পালা গাহিতেছিল, এবং এক মাস যাবৎ প্রত্যহ ময়মনসিংহ অশ্রুজলে প্লাবিত করিতেছিল। যদিও প্রত্যেক স্থানে আমি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, তথাপি কোনও কারণবশতঃ প্রথম যে বাসায় গান হয়, সে বাসায় গিয়াছিলাম না বলিয়া, অন্য বাসায়ও গেলাম না। কিন্তু সকলে আমাকে একবার এই যাত্রা শুনিতে জিদ করিতেছিলেন এবং তাঁহাদের মুখে গানের প্রশংসা ধরিতেছিল না। এমন সময়ে সুহৃদ্‌বর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আবকারি পরিদর্শন উপলক্ষে—হাস্যরসিকের উপযুক্ত কার্য্য!—ময়মনসিংহে আসিয়া দুই দিন আমার সঙ্গে কাটান। তিনি ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহের একটি যুবকের গান শুনিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। এবার আসিয়া তাহার গান শুনিতে চাহিলে আমি তাহাকে ডাকাইলাম। সে 'কুরুক্ষেত্রে'র কোনও গান গাইতে পারে কি না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বিস্মিত হইলাম, তিনি এ গান কোথায়

শুনিলেন। তিনি বলিলেন, ভূষণ দাসর এই পালা লইয়া কলিকাতা তোলপাড় হইতেছে। এমন কি, 'সঙ্গীতসমাজে' ও রবিবাবুদের বাড়ীতে পর্যন্ত এই যাত্রা হইয়াছে। সেই অভিমন্যুর অভিনয় দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'সঙ্গীতসমাজ' তাহাকে রাখিতে অনেক চেস্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ছাড়িয়া আসিলে, তাহার উপকারী ভূষণ দাসের দল ভাঙ্গিবে বলিয়া, সে এই কৃতঘ্নতা করিতে অসম্মত হইয়াছে।' পরে শুনিলাম, কুচবেহারের মহারাজ এই যাত্রা উপর্যুপরি দুই রাত্রি শুনিয়াছিলেন। টাঙ্গাইলের দল হইতে উক্ত যুবক মাত্র দুটি গান শিখিতে পারিয়াছে বলিলে, তিনি উহা শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সে তখন সেই দুটি গীত গাহিল। আমার অশ্রু ধারায় প্রবাহিত হইল। দুই গান এত সুন্দর ও এমন করুণরসের উচ্ছ্বাসপূর্ণ যে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। অভিমন্যু যুদ্ধে যাইতে উত্তরার কাছে বিদায় চাহিয়া গাইতেছেন,—

গীত

১

হে কৃষ্ণ ! কেশব ! হরে !
অনাথনাথ ! দীনবন্ধো !
করুণাসিন্ধো ! মুরারে !

২

আজি এ অনাথা
পাইল বিষম ব্যথা,
হাসি-কথা বিনে কিছু জান্‌তো না,—
কোমল কুসুম হৃদি,
কেন দুঃখ দিলে বিঁধি?
নিরবধি আনন্দ কি রহে না?

৩

দেখ লো উত্তরে, আমার
কাঁপে হৃদি মরমাধার,
এমন সজল নয়নে তুমি থেকো না।
পুতুল সাজায়ে,
থাক খেলা ল'য়ে, তুমি কেঁদো না।
আমি আসিব,—আসিব,—আসিব,—
তুমি কেঁদো না।
পুতুল সাজায়ে
থাক খেলা লয়ে, তুমি কেঁদো না॥
তবে যাই,—যাই,—যাই,—
তুমি কেঁদো না।

৪

আরও বলি শুন সতি!
মা আমার করুণাবতী;
কাছে থেকো, মা যেন কাঁদে না।

৫

বিদায় সাঙ্গ হলো,—
হরি! দেও এখন পথের সম্বল।
(হরি! তোমার কর্ম্মে প্রাণ সঁপেছি।)
এ অনাথা বালিকা রইল,
স্থান দিও চরণে তারে।

দ্বিতীয় গীত, অভিমন্যু যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তিম সময়ে গাহিতেছেন,—

গীত

১

আজি সাঙ্গ হ'ল রে আমারি জীবন!
অনন্ত সাগরে কাল-নীরে ধীরে নিমগন।

২

আমার আমিত্ব ল'য়ে
চলিলাম বিদায় হ'য়ে,
বিস্মৃতির তলে যাব অনন্তে মিশিয়ে।
যেমন জলে হয়, জলে লয়,
জলে পয়োবিম্ব যেমন।

৩

পাণ্ডব-শিবিরে সুত!
যেও যেও যেও ফিরে।

যেন পাণ্ডবের তেজ না ভেসে যায়
আঁখি-নীরে।
আমার মরণকথা,
শুনে যদি পান ব্যথা,
ব'লো, আমি দিয়েছি প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের তরে।
যেও ভদ্রা-মায়ের কাছে,
ব'লো, অভি তোমার ভাল আছে,
সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে দিয়ে,
অভি তোমার ভাল আছে।
আমি ষোড়শ বৎসরে
ষোড়শোপচারে,
পূজিনু কৃষ্ণনিধিরে।

৪

আদরিণী উত্তরারে দিও আমার এই মালা।
সে যে হাসি-তরঙ্গিণী,
হয় ত হাসছে এত বেলা।
তারে খেলতে ব'লো পুতুলখেলা।
(আবালবৃদ্ধ সবাই খেলে,
তারে খেলতে ব'লো পুতুলখেলা।)
খেলা সাঙ্গ হলে,
সবাই যাবে চলে,
কেহ ত্বরা, কেহ ধীরে।

৫

এস সুত! এস কাছে,
আমার অনেক কথা বলবার আছে,
হৃদয়ের গুপ্ত দ্বার কে যেন খুলেছে।
আমার এ মিনতি পদে,
যেন পরপদে,—
কৃষ্ণপদে,—হয় রে মিলন।

গ্রামের বাড়ী হইতে চট্টগ্রাম সহর পর্য্যন্ত সমস্ত পথ যখন মুহূর্ত্তেক যন্ত্রণার একটুক বিরাম হইত, আমি কখন বা—"হে কৃষ্ণ! কেশব! হরে!" কখন বা—"আজি সাঙ্গ হ'ল রে আমারি জীবন" গাইতেছিলাম। হস্‌পিটাল হইতে পাহাড়ের বাড়ীতে আসিয়া দুটি গান পত্নী পুত্রকে শুনাইলাম। তিন জনের অশ্রুতে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। এ রোগের সময়ে এই দুটি গান বরাবর আমার মুখে ছিল। সিবিল সার্জ্জন ডাঃ ড্রুরি দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, সেই মগ কম্পাউণ্ডার কেথিটার দিতে ভুল করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ফৌজদারিতে দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় করিয়া থামাইলাম। বলিলাম, সে আমার প্রজা। সে আমার ভালোর জন্যই করিয়াছিল। তাহার শিক্ষার অভাবে হিতে বিপরীত হইয়াছে। রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভুল পথে কেথিটার গিয়া ঘা করাতে মূত্রাশয়ে ফোড়া (abcess) হইল। আমার এই বাড়ী হস্‌পিটাল হইতে দূর বলিয়া, ডাঃ ড্রুরি আমাকে হস্‌পিটালের নিকটে এক বাড়ীতে লইলেন। এত বৎসর পরে তাঁহারা পরীক্ষার দ্বারা আমার প্রকৃত রোগ 'মূত্রাঘাত' বলিয়া নির্ণয় করিলেন। ডাক্তার বলিলেন যে, চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়সের পর মূত্রাশয়ের মুখের একটা শিরা (prostate gland) বড় হয়, এবং তাহাতে প্রস্রাব অবরোধ করাতে ঘন ঘন অল্প প্রস্রাব হয়। এই কারণেই যে আমার এত কাল এইরূপ হইতেছিল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। কোনওরূপে বেশী হিম লাগিলে এই শিরা আরও বেশী ফুলিয়া উঠে। তাহাতে আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। রোগ আরও বৃদ্ধি হইল। একদিন হঠাৎ খুব কম্পের সহিত জ্বর আসিল। আমার জীবনের আশা একপ্রকার ত্যাগ করিয়া, ডাক্তার ড্রুরি ও কালীপ্রসন্নবাবু অত্যন্ত যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার সাহেব দিনে কত বার আসিতেন। এমন কি, দুপুর রাত্রিতেও একা এক লণ্ঠনহাতে উপস্থিত হইতেন। দেশে একটা হাহাকার পড়িল। বলিয়াছি, দুই চারি জন হঠাৎ-অবতার শিক্ষিত মহাশয়েরা ছাড়া দেশের আপামর সাধারণ আমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে। শুনিয়াছিলাম, সর্ব্বপ্রধান উকিল গবর্ণমেণ্ট প্লীডার না কি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কেহ মরিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু আমি মরিলে চট্টগ্রাম শত হাত রসাতলে যাইবে। শত শত লোক প্রত্যহ আমাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এ দিকে ডাক্তার সাহেব আমার

স্ত্রী পুত্রকে পর্য্যন্ত আমার কক্ষে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। শুনিলাম, লোকে কালী-প্রসন্নবাবুর ও আমার বাসার লোকের পায়ে পড়িয়া বলিতেছিল—"আমরা কথা কহিব না, কেবল একটুক দেখিয়া আসিব।" ডাক্তার সাহেব তাহাতেও অসম্মত। লোকের এই শ্রদ্ধার কথা শুনিয়া আমি রোগশয্যায় অশ্রুবর্ষণ করিতাম, প্রাণে একটুক শান্তি পাইতাম। আমি যে চট্টগ্রামের জন্য বারম্বার বিপদাপন্ন হইয়াছি, সার্ভিসে উন্নতির আশা বলিদান দিয়াছি, এত দিনে তাহার প্রতিদান পাইলাম। আমি ডাক্তার সাহেবকে নিজে অনুনয় করিয়া বলিলাম যে, তাহাদের কক্ষদ্বার হইতে আমাকে দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিন। তিনি বরং চটিয়া উঠিলেন। একদিন রাত্রি এগারটার সময়ে তিনি অকস্মাৎ লণ্ঠন-হস্তে উপস্থিত। নির্ম্মল কক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"Who are you?" (তুমি কে?) তিনি "Get away! Get away!" (চলে যাও! চলে যাও!) বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। সে চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, আমার পুত্র। তিনি ক্রোধের সহিত বলিলেন—"আপনার পুত্র হউক, আর যে হউক, আপনি যদি এরূপে লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তবে আমি আপনার চিকিৎসা ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। আপনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, আপনার জীবন-মৃত্যুর মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে।"

যাহা হউক, ডাক্তার ড্রুরির যত্নে ও চিকিৎসায় আমার জীবন রক্ষা পাইল। চারি পাঁচ দিন পরে জ্বর ত্যাগ হইল। তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল। তিনি আমাকে ও আমার পরিবারকে বলিলেন, আর আশঙ্কা নাই। ক্রমে স্ত্রী পুত্র ও পরিবারবর্গকে, তাহার পর বন্ধুবান্ধবকে মাত্র কক্ষে আসিতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু আমার প্রতি তীব্র আদেশ যে, আমি বেশী কথা কহিতে পারিব না। ইহা আমার রোগযন্ত্রণা হইতেও অধিক হইল। মেনেণ্টির পতনের সহিত দেবতুল্য মিঃ কলিয়ার আবার কমিশনর হইয়া আসিয়াছেন। তিনি কয়েক মাসের জন্য মাত্র পাটনা না গেলে আমার এত বিপদ্ ঘটিত না। তিনি আমার রোগের সংবাদ পাইয়াই আমাকে পত্র লেখেন। তাহার পর প্রত্যহ দুই তিন বার লোক পাঠাইয়া খবর লইতেন। ডাঃ ড্রুরির কাছে আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে শুনিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া আবার পত্র লিখিলেন। এই সময়ে ভদ্রলোক মাত্রই আমাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আসে নাই কেবল সয়তানদাস। সে পথে ঘাটে আমার ভাইদের গলায় পড়িয়া কাঁদিয়া বলিত—"নবীন আমার আশৈশব বন্ধু। আমার কত উপকার করিয়াছে। তাহার এই ব্যারাম, আমি একটুক দেখিতে যাইতেও পারিতেছি না। কারণ, সে আমার উপর অনর্থক চটিয়াছে। আমার এবার রক্ষা নাই।" এই বলিয়া সে অশ্রু মুছিত। আমার ভাইয়েরা তাহা অভিনয় করিয়া দেখাইত। কিছুদিন পরে আমি আমার পাহাড়ের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম। এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেলে ডাঃ ড্রুরি আমাকে জল-বাতাস পরিবর্ত্তন জন্য বৈদ্যনাথ যাইতে উপদেশ দিলেন। আমি স্ত্রীপুত্র সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইলাম। ডাঃ ড্রুরির ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। তিনি আমার জীবনদাতা। তিনি আমার জন্য যেরূপ চিন্তিত হইয়াছিলেন, যেরূপ যত্নের সহিত আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন, এই মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ দেখাইয়াছিলেন, তাহা চিকিৎসক-সম্প্রদায়ে দুর্লভ। তাঁহার সেই সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলেই, তাঁহার ঈষৎ হাস্যযুক্ত সস্নেহ রসিকতাব্যঞ্জক কথা শুনিলে, আমার রোগের আপনিই যেন শান্তি হইত। তিনি শেষে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেন—"Well, your water-works all right?" (তোমার জলের কল ঠিক চলিতেছে?) তার পর বহুক্ষণ কাছে বসিয়া, আমার মাথায় ও পায় হাত বুলাইয়া কত গল্প করিতেন। এই সময়ে একদিন আমাকে বেঙ্গলীর সেই 'রায় বাহাদুরের জন্মবৃত্তান্ত' প্রবন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করেন, এবং উহার অত্যন্ত প্রশংসা করেন। তিনি আমার কাছে

একটি পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। একটি উপহার দিতে চাহিলে, তাহাও লইতে অসম্মত হন। বলেন, আমি 'গেজেটেড অফিসার'। অতএব তিনি গবর্ণমেণ্টের রুলমতে আমার কাছে কিছু লইতে পারেন না। ডাক্তার ড্রুরি! তুমি দেবতা, কি মানুষ তোমার পবিত্র নাম এই পরিবারে পুরুষানুক্রমে দেবতার মত পূজিত হইবে।

ইন্দ্রদেবের সঙ্গে আমার কি আড়াআড়ি আছে, জানি না। শ্রীকৃষ্ণ কৈশোরে তাঁহার পূজা বন্ধ করিয়াছিলেন। আমি শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক। বোধ হয়, এই অপরাধে তিনি চিরদিন আমার স্থানান্তরে যাইবার সময়ে বিশেষ কৃপা করেন। চট্টগ্রাম হইতে চাঁদপুর পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি জানুয়ারি মাসের শেষে ঝড় বৃষ্টি হইল। তাহাতে ট্রেনে হিম লাগিয়া, কলিকাতা পঁহুছিবামাত্র আমার আবার রোগ বৃদ্ধি হইল। এখানে ডাক্তার চার্লস্ চিকিৎসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এই অবস্থায় তিনি আমাকে বৈদ্যনাথ যাইতে দিতে পারেন না। এ জন্য এক পক্ষ কলিকাতা থাকিয়া, আবার কিছু সুস্থ হইয়া, আমি বৈদ্যনাথ গেলাম। কলিকাতায় প্রত্যহ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ দয়া করিয়া আমাকে দেখিতে আসিতেন। রোগশয্যায়ও তাঁহাদের সহানুভূতিতে আমি যথেষ্ট শান্তি পাইয়াছিলাম। বৈদ্যনাথ যাত্রার পূর্ব্বে একদিন চিফ সেক্রেটারি মিঃ বোল্টনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমার রুগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, আমি এরূপ পীড়িত হইয়াছি, তিনি তাহা মনে ভাবেন নাই। আমি বলিলাম, আমার এই গুরুতর পীড়ার কারণ তিনি। তিনি প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, আমাকে চট্টগ্রাম হইতে বদলি করিবেন না, সেখান হইতে পেন্‌সন লইতে দিবেন। অথচ দুই বৎসর না হইতেই তিনি অকস্মাৎ একটা কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, মেনেণ্টির মিথ্যা দোষারোপ শুনিয়া, আমাকে ময়মনসিংহ বদলি করিয়া, আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছেন। আমি বলিলাম, আমার চট্টগ্রামে মহাজনির অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি কাগজপত্র তাঁহাকে দেখাইতে আসিয়াছি। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আমি কোনও কাগজ দেখিতে চাহি না। মিঃ মেনেণ্টির সে সকল কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। কেবল আপনি স্থানীয় লোক, কমিশনরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে আর বেশী দিন চট্টগ্রামে রাখা উচিত নহে বলিয়া, আপনাকে বদলি করিয়াছিলাম। আমার সেই প্রতিশ্রুতি ভুলিয়াছিলাম। তবে বদলি আপনার রোগের কারণ নহে। আপনার রোগের কারণ, চট্টগ্রামের অস্বাস্থ্যকর জল বাতাস। ডেপুটিদের একটা দোষ আছে। ইচ্ছামতে একটা স্থান পাইলে মরিলেও তাহা ছাড়িতে চাহে না। বঙ্কিমবাবুর জামাতা রাখাল এরূপে বারাসতে থাকিয়া, বদলির ভয়ে ছুটি না লইয়া, জীবন হারাইয়াছে।" তিনি তাহার পর আমাকে বলিলেন—"যাহা হউক, সে সকল কথায় এখন প্রয়োজন নাই। আপনার শরীরের অবস্থা বড় শোচনীয়। আপনার জীবন কেবল সার্ভিসের জন্য নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্যও অত্যন্ত মূল্যবান। আপনি এখন বৈদ্যনাথ গিয়া স্বাস্থ্য লাভ করুন। তাহার পর আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করেন, আমি আপনাকে সে স্থানে বদলি করিব।" স্ত্রীপুত্রের, পরিবারের ও আত্মীয়বর্গের নিতান্ত ইচ্ছা যে, আমি কুমিল্লায় বদলি হই। কুমিল্লার স্বাস্থ্য ভাল। উহা পূর্ব্ববঙ্গের দার্জিলিঙ বলিয়া খ্যাত। কুমিল্লা চট্টগ্রামের খুব নিকট। রেলে পাঁচ ঘণ্টার পথ মাত্র। অতএব আমি কুমিল্লা চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"হাঁ, কুমিল্লা বেশ জায়গা। আপনার ছুটি শেষ হইলে আপনি আমাকে পত্র লিখিবেন। আমি আপনাকে কুমিল্লায় বদলি করিব।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বৈদ্যনাথ চলিলাম।

বৈদ্যনাথ

প্রাতের ট্রেনে হাওড়া হইতে রওনা হইয়া, ঠিক সন্ধ্যার সময়ে বৈদ্যনাথ পঁহুছিয়া, ভারতের খ্যাতনামা কৃতী পুত্র শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের গৃহে গেলাম। তিনি তখন

বৈদ্যনাথে ছিলেন না। গৃহ শূন্য পড়িয়াছিল। রাত্রিতে দারুণ শীত লাগিল। তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রাতে উঠিয়া দেখি, গৃহখানি লোমশ মুনির আশ্রম-বিশেষ। কপাটের শার্সি নাই বলিলেও চলে। তাহার স্থানে ভারতবর্ষের নানা স্থানের সংবাদপত্র, কোথায় বা পূর্ণ লগ্ন, কোথায় বা অর্দ্ধলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, এবং প্রাচীর ও গৃহতল নিষ্ঠীবনাদি বহু উপাদেয় পদার্থে রঞ্জিত। মতি ভায়ার কাছে সেই প্রাতেই লিখিলাম যে, এই গৃহখানি ভারতের কেবল রাজনৈতিক মহাতীর্থ নহে, কেবল এখানে রচিত বিচক্ষণ প্রবন্ধাদিতে রাজপুরুষগণের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তোপের গোলার মত পড়ে, তাহা নহে; 'অমিয় নিমাইচরিতে' যে অমিয় প্রেমের প্রবাহ বহিয়া স্বদেশে বিদেশে সংখ্যাতীত নর-নারীর হৃদয় জুড়াইতেছে, এই ক্ষুদ্র গৃহখানি তাহারই গঙ্গোত্তরী। অতএব ইহাকে তাঁহাদের একটি দেবালয়, কিম্বা বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাষায় 'কুঞ্জ' করিয়া রাখা উচিত। মতি লিখিলেন, তাঁহারা দরিদ্র লোক। গৃহের এরূপ অবস্থা তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট। মতি ভায়ার এই কথাটা অবশ্য ঠিক নহে। তাঁহারা অতুল সম্পত্তির অধিকারী। আসল কথা, শ্রীভগবান্ যাঁহাদের প্রতিভা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের বাহ্যিক বিষয়ে প্রায়ই বীতরাগ করেন। আমি শিশিরবাবুকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি, আমার ইচ্ছা হইল যে, ঘরখানি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া ও তাহার চারি দিকে উদ্যান বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া,—স্থানটি অতি সুন্দর—ইহার নাম 'অমিয়-নিমাই-কুঞ্জ' রাখি। যাহা হউক—দেখিলাম, আমার এই গৃহে থাকা অসম্ভব। কেবল ঘরের শোচনীয় অবস্থার জন্য নহে। আমার মনে কেমন ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল যে, এই গৃহ ভারতের একটি তীর্থ। এই গৃহে স্বয়ং শিশিরকুমার ভিন্ন অন্য কাহারও বাস করা উচিত নহে। বৈদ্যনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনের ঠিক পশ্চাৎভাগে একটি সুন্দর দ্বিতল গৃহ আছে। উহা বৈদ্যনাথের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহ বলিলেও চলে। শ্রীভগবান্ বৈদ্যনাথের কৃপায় এই বাড়ীখানি খালি ছিল। আমি তখনই উহা ভাড়া করিয়া, সেই বাড়ীতে গেলাম, এবং বাড়ীখানি পাইয়া প্রাণে বড় আনন্দ হইল। এই বাড়ীতে গিয়াই দিন দিন আমার স্বাস্থ্য ভাল হইতে লাগিল। ইহার দ্বিতল হইতে চারি দিকে বড় সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা দেখা যায়। কয়েক দিন পরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

একদিন প্রভাত হইয়াছে। সার্শি দিয়া ঘরে ঊষার আলোক আসিয়াছে। আমি ঠিক ঊষার সময়ে জাগি। কিন্তু ডাঃ চার্লস্ বলিয়া দিয়াছেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসেও বৈদ্যনাথে প্রাতে খুব কন্‌কনে শীত পড়ে। অতএব বেশ রৌদ্র না উঠিলে যেন আমি শয্যাত্যাগ না করি। আমি জাগিয়া আছি। এমন সময় একজন লোক যেন বুট পায়ে, খুব জোরে নীচে হইতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে। সিঁড়ি নীচের ঘরের বাহির দিকে। আমি 'কে! কে!" জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনও উত্তর পাইলাম না। উপরে দুটি ঘর। একটি বড় 'হল', তাহার পশ্চাতে একটি ছোট লম্বা কক্ষ। হলের তিন দিকে তিনটা আয়ত বারাণ্ডা। কিন্তু এক বারাণ্ডা হইতে অন্য বারাণ্ডায় যাওয়া যায় না। লোকটি উত্তরের বারাণ্ডা হইতে যেন লাফাইয়া পশ্চিম বারাণ্ডায় গেল। আমি এখনও 'কে! কে!' করিতেছি। কোনও উত্তর নাই। পশ্চিমের বারাণ্ডায় বাড়ীওয়ালার একটা বৃহৎ তক্তপোষ আছে। আমরা তাহাতে বসিয়া, সুদূরস্থ নীল শৈলশ্রেণীর আকাশপটে চিত্রিতবৎ শোভা দেখিতাম। সে একটি লাঠির দ্বারা এই তক্তপোষে এমন তিনটি গুঁতা দিল যে, সমস্ত বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। আমার সঙ্গে হল-কক্ষে স্বতন্ত্র ক্যাম্প-খাটে পুত্র এবং পশ্চাতের কক্ষে আর এক তক্তপোষে স্ত্রী ও নীচে একটি বালক ভৃত্য শুইয়াছিল। সকলে জাগিল। আমি 'কে! কে!' বলিয়া চেঁচাইতেছি। পুত্র ভয়ে তাহার বিছানায় বসিয়া কাঁপিতেছিল। কোনও উত্তর না পাইয়া, নীচের ঘরে আমার কনিষ্ঠ সহোদর, পাচক ও এক ভৃত্য শুইয়াছিল, আমি

তাহাদের নাম করিয়া ডাকিলাম। কোনও উত্তর নাই। বালক ভৃত্য বারাণ্ডায় গিয়াছে না কি জিজ্ঞাসা করিলে, স্ত্রী বলিলেন—সেও বিছানায় বসিয়া ভয়ে কাঁপিতেছে। আমি বলিলাম, এ কি বিচিত্র কথা!' রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। বালক ভৃত্যকে দ্বার খুলিতে বলিলাম। তাহার পর আমরা সমস্ত বারাণ্ডা ও নীচের ঘর ও চারি দিকের মাঠ দেখিলাম। কোথায়ও কোনও লোকের চিহ্নমাত্র নাই। ব্যাপার কি, কিছুই বুঝিলাম না। প্রাতে পেন্সন্‌ প্রাপ্ত, বৈদ্যনাথবাসীও 'হাওয়াখোর' বাবুরা প্রায়ই কবিদর্শনে আসিতেন। আজ প্রাতে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের এই কথা বলিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, বৈদ্যনাথে বড় চোরের ভয়। এ কোনও চোরের কার্য্য। কিন্তু চোর প্রভাতে আসিয়া এরূপ তক্তাপোষে গুঁতা দিবে কেন? সয়তানের এক আত্মীয় এই বাড়ীর হাতায় এক খোলার ঘরে থাকিতেন। তিনি আসিয়া বলিলেন যে, তিনি তিন বৎসর এই বাড়ীতে আছেন। ভাড়াটিয়া না থাকিলে তিনি একা উপরের ঘরে শয়ন করেন, কিন্তু কখনও কোনও ভয় পান নাই। আমি জানি, আমাদের তীর্থগুলিতে নানাবিধ পাগল থাকে। আমার বিশ্বাস হইল, এ কোনও পাগলের কার্য্য। পাগল বারাণ্ডা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করাও বিচিত্র নহে।

কিছুক্ষণ পরে ডাক আসিল। কলিকাতা হইতে সেই 'জ্যোতিঃ'-সম্পাদকের একখানা কার্ড পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্ব্বদিন কলিকাতায় সেই সয়তানের কন্যার কাছে এক টেলিগ্রাম আসিয়াছে যে, তাহার পিতার সে দিন প্রাতে চট্টগ্রামে মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীপুত্রকে কার্ড দেখাইয়া বলিলাম যে, আমার বোধ হয় উহা মিথ্যা টেলিগ্রাম। পাপিষ্ঠ চট্টগ্রামে এত ঘৃণিত যে, তাহার মাথাব্যথা হইলে লোকে বলে—"বেটা এবার মরিয়াছে।" অথবা তাহার কোনও শত্রু এই দুষ্টামি করিয়াছে। তাহার সেই আত্মীয়, তাহার স্ত্রী ও সন্তানেরা বরাবর আমাদের কাছে থাকে। এ কথা প্রকাশ করিতে আমি স্ত্রী পুত্রকে নিষেধ করিলাম। যাহার জমিদারি সয়তানের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াতে সে আমার মস্তকে সেই বজ্রাঘাত করিয়াছিল, সে হিংসায় অন্ধ হইয়া এক মোকদ্দমায় সেই জমিদারের সর্ব্বনাশ করিতে, সেই জমিদার তাহার মাতার সত্ত্বমতে গৃহীত নহে—ক্রীত, বলিয়া ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে। জমিদার তাহার বিরুদ্ধে ৩০,০০০ টাকার ক্ষতিপূরণের নালিশের আর্জি মুসাবিদা করাইয়া কলিকাতার উকিল ব্যারিষ্টারকে দেখাইতে পাঠাইয়াছেন। সীতা-কুণ্ডের দেবসম্পত্তি মোহন্তের নিজের সম্পত্তি, উহা দেবতার বিত্ত নহে, বলিয়া পাপিষ্ঠ আর এক মোকদ্দমায় ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল। আমি এই জবানবন্দির নকল আনাইয়া, এই সাক্ষ্য মিথ্যা কি না, সুরেন্দ্রবাবুর দ্বারা কাউন্সিলে প্রশ্ন দিয়াছি। তদ্ভিন্ন "A Tragedy in five acts (পাঁচ অঙ্কে শোকান্ত নাটক) নাম দিয়া, আমি তাহার সমস্ত কুকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত করিয়া, 'বেঙ্গলী'তে পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি। এই পাঁচটিই এত গুরুতর যে, প্রত্যেকের জন্য তাহার পদচ্যুতি হইবার কথা। আমাকে যে 'জ্যোতিঃ-সম্পাদক কার্ড লিখিয়াছে ,সে সুরেন্দ্রবাবুর কাছেও তাহার মৃত্যু-সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছে। আমার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সয়তানের ষড়যন্ত্রে 'জ্যোতিঃ' কাগজ বন্ধ হইয়াছে, এবং সম্পাদক ঘোরতর উৎপীড়িত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া কলিকাতায় আমার কাছে এই পীড়িত শয্যায় কাঁদিয়া পড়িলে আমি তাহাকে সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়াছি। সুরেন্দ্র-বাবু তখন তাঁহার 'সিমুলতলা' বাটীতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ট্রেনে একজন লোক দ্বারা সেই সংবাদ আমাকে জানাইয়া কাউন্সিলে উক্ত প্রশ্ন পাঠাইবেন কি না, এবং উক্ত নাটকের প্রথম অঙ্ক সেই সপ্তাহে ছাপিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে, সয়তানের মৃত্যুসংবাদ সত্য হইলে আমি দুই এক দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম হইতে পত্র পাইব। আপাততঃ প্রশ্ন ও প্রবন্ধ তিনি স্থগিত রাখিবেন।

সে দিন সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাদের কেমন ভয় করিতে লাগিল। অন্য দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা বারাণ্ডায় কাটাইয়াছি, এবং ঘরের চারি দিকের বিস্তৃত মাঠে বেড়াইয়াছি, কিন্তু আজ যে এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে যাইতে ভয় হইতেছে। স্ত্রী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে, নিকটে একটা বাড়ীতে একজন লোক মৃত্যু-শয্যায়, তাহাতে সম্ভবতঃ এরূপ ভয় বোধ হইতেছে। সে লোকটিও চট্টগ্রামবাসী। সয়তান তাহাকে ব্রাহ্ম করিয়া, তাহার দ্বারা এক বিধবা বিবাহ করাইয়াছে। সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া বৈদ্যনাথে আসিয়াছে। আমি তাহাকে চিনি না। কখনও নামও শুনি নাই। আমি বৈদ্যনাথে আসিয়াছি শুনিয়া, সে আমাকে দেখিতে চাহিল। আমি ও স্ত্রী উভয়ে গেলাম। দেখিলাম, বিধবাটি তাহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়। অনেকগুলি সন্তান হইয়াছে। রোগের শেষ অবস্থা। বড় বিচিত্র কথা যে, বিধবাবিবাহকারী ভায়া ব্রাহ্ম এখন মৃত্যুশয্যায় কেবল 'বাবা বৈদ্যনাথ ! বাবা বৈদ্যনাথ !' করিতেছে, এবং মন্দিরের দিকে দেখিতেছে। হতভাগ্য তাহার মাতা ও ভগিনীকে দেখিতে আকুল হইয়াছে। আমাকে বার বার বলিল— "আপনি আমাকে চট্টগ্রামে নিয়া একবার আমার মা বোনকে দেখান।" বিধবাবিবাহের পর আর তাহাদের দেখে নাই। আমি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া বলিলাম—"তুমি একটুক সারিয়া উঠিলে, আমি বাড়ী যাইবার সময়ে তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব এবং যেরূপে পারি, তোমার মা বোনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইব।" হা অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় ! তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কি ভাবে স্থাপন করিয়াছিলে, আর আজ তাহা কতকগুলি অদূরদর্শীর হাতে পড়িয়া কি হৃদয়বিদারক শোচনীয় দৃশ্য সকল দেখাইতেছে ! একটি মধ্যমবয়সী বিধবাকে এরূপে বিবাহ দিয়া, এবং সংসারে কতকগুলিন হতভাগ্য সন্তান আনিয়া, সর্ব্বশেষ মৃত্যুশয্যায় ইহাকে এরূপ অনুতপ্ত করিয়া, কি ধর্ম্ম সাধিত হইয়াছে? এই বিধবা এতগুলি অনাথ শিশু লইয়া কি করিবে, কোথায় যাইবে? পূর্ব্ব-দিন অপরাহ্নে এই হতভাগাকে আমরা দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সন্ধ্যা হইতে তাহার আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় আমাদের হৃদয় পর্য্যন্ত ছাইয়াছে। স্ত্রীকে বলিলাম যে, এই জন্যই আমাদের ভয় বোধ হইতেছে। আমার সিস্‌টাইটিস্‌ রোগ। রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হয় না। বহু বার উঠিয়া প্রস্রাব করিতে হয়। সমস্ত রাত্রি যেন ঘরের খড়খড়ি পড়িতেছিল। ঠিক যেন বাহির হইতে কেহ নাড়িতেছে। পরদিবসের রাত্রিও এই ভাবে কাটিল।, তৃতীয় দিবস আমার খুড়তত ভাই রমেশের পত্র পাইলাম যে ঠিক, যে সময়ে আমাদের বাড়ীতে সেই উপদ্রব হইয়াছিল, সেই সময়ে সয়তানের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। অনেকের সন্দেহ যে, সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। রমেশ আরও লিখিয়াছে, সেই দিন ৪টার সময়ে আমাদের পাহাড়ের রান্নাঘর ইত্যাদিতে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। কিরূপে আগুন লাগিল, কেহ বলিতে পারে না। আমি কলিকাতায় যখন খুব পীড়িত, তখন এক দিন রাত্রি নিশীথের সময়ে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় না কি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি। স্ত্রী পুত্র ছুটিয়া আসিলে এবং কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় না কি বলি যে, সয়তান অসুরের মত একটা কালো লোক লইয়া আসিয়াছিল, এবং আমার গলা টিপিয়া ফেলিতে বলিতেছিল। একটি কালো মেয়ে আসিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছে। স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, মা জয়কালী রক্ষা করিয়াছেন। এত শত্রুতা করিয়া ও আমাদের এত দুঃখ দিয়া' হতভাগার তৃপ্তি হয় নাই। এখন প্রাণে মারিবার চেষ্টায় আছে। ' তিনি রাত্রি ৪টার সময় কাঁদিতে কাঁদিতে জয়কালীর বাড়ীতে পূজা দিতে চলিয়া যান। পরদিন প্রাতে তাঁহাকে না দেখিয়া, তিনি কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে পুত্র বলিল—"বাবা! তোমার কি গত রাত্রির কথা কিছু মনে নাই?" তখন এই সকল কথা বলিয়া সে বলিল যে, তাহার

মা কালীঘাটে পূজা দিতে গিয়াছেন। স্ত্রী আমাকে এই ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন—"কলিকাতায় তুমি সেই স্বপ্ন দেখিয়াছিলে। মরিয়াও বুঝি আমাদের ছাড়িতেছে না। দেশে ঘরগুলি পোড়াইয়া, এখানে আমাদের আজ দুদিন যাবৎ তিষ্ঠিতে দিতেছে না।" সে দিন সমস্ত রাত্রি আমি ঘুমাইতে পারিলাম না। নীচের ঘরের কপাটের সারা রাত্রি শব্দ হইতেছিল। আমি প্রাতে উঠিয়া স্ত্রীকে বলিলাম—"কাল রাত্রিতে বুঝি, ভ্রাতা কপাটগুলিন খোলা রাখিয়া শুইয়াছিলেন, কি বারম্বার কপাট খুলিয়া বাহিরে যাতায়াত করিতেছিলেন। কপাটের শব্দে আমি এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা যাইতে পারি নাই।" আমি স্নানকক্ষে গেলাম, স্ত্রী বিষয় কি জানিতে নীচে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া নিতান্ত ভীতা হইয়া বলিলেন—"না। আমাদের এ বাড়ীতে থাকা হইবে না। অন্য বাড়ী দেখ। কাল রাত্রিতে অতুল ও চাকরেরাও ঘুমাইতে পারে নাই। সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে।" ভ্রাতা, পাচক ও ভৃত্য, স্ত্রীর পিছে পিছে আসিয়াছিল। দেখিলাম, তাহাদের চোক কপালে উঠিয়াছে। তাহারা বলিল যে, আহারের পর কপাট বন্ধ করিয়া তাহারা শুইতে যাইতেছে, এমন সময়ে বোধ হইল, যেন দক্ষিণ দিকের কপাটে কে ধাক্কা দিতেছে। তাহারা কোনও ভিখারী, কি পাগল মনে করিয়া, লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া চারি দিকে দেখিল, কিন্তু কোনও লোকের সাড়া-শব্দ পাইল না। তাহার পর আবার শুইতে যাইতেছে, আবার সেরূপ কপাটে আঘাত। কপাট যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। আবার তাহারা বাহির হইয়া দেখিল, কিছুই দেখিতে পাইল না। এরূপে তিন চারি বার দেখিয়া, তাহারা দা ও লণ্ঠন সম্মুখে রাখিয়া, তিন জনে ভয়ে জড়সড় হইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। স্ত্রী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া বলিতেছেন—"শ্রীনাশা মরিয়াও আমাদের তিষ্ঠিতে দিবে না।" আমি অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলাম—"আমি এ জীবনে তাহার কোনও অনিষ্ট করি নাই। বরং যথাসাধ্য ছাত্রজীবন হইতে আমি তাহার সাহায্য করিয়াছি। যদি আমাকে এরূপ হিংসা করিয়াছে বলিয়া, তাহার আত্মার অশান্তি হইয়া থাকে, আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলাম। শ্রীভগবান্‌ও তাহাকে ক্ষমা করুন। সে যেন আর আমাদের প্রতি এ উৎপাত না করে।" আমরা ইহার পর এক মাসের অধিক বৈদ্যনাথে ছিলাম। আর কখনও কোন উৎপাত হয় নাই। বৈদ্যনাথে অনেকে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন। ইহার দুই দিন পরে ঋষিতুল্য পূজনীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাড়ীতে না কি একটা উৎপাত হইয়াছিল?" আমি বলিলাম—"আপনি কি তাহা বিশ্বাস করিবেন? আমিও এত দিন করি নাই।" তিনি বলিলেন—"আমি বিশ্বাস করি। আমার বাড়ীতেও ঠিক এরূপ একটা ঘটনা হইয়াছিল।" তিনি তাহার বৃত্তান্ত 'মিরার', কি কোন কাগজে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিলেন। ঘটনাটি এইরূপ—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও একজন আত্মীয় বড় বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা দুজনে বরাবর পরলোকের কথা লইয়া তর্ক করিতেন, দুজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যিনি আগে মরিবেন, পরকাল থাকিলে তিনি অপরকে যে প্রকারে হউক, তাহার প্রমাণ দিবেন। এখন বিধাতার ইচ্ছায় তাহার কিছুদিন পরে আত্মীয়টির মৃত্যু হয়। যে বাড়ী মহারাজা সূর্য্য-কান্ত কিনিয়াছেন, রাজনারায়ণবাবু তখন সেই বাড়ীতে ছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার ঘরে হঠাৎ কি এক অজ্ঞাত ফল পড়িতে লাগিল। চৌকি পাহারা দিয়া কিছুই হইল না। দেওঘরের সবডিভিসন্যাল অফিসারকে সংবাদ দিলে তিনি পুলিস পাহারা দিলেন। কিন্তু কিছুতে উপদ্রব নিবারণ হইল না। কোথা হইতে ফল কিরূপে পড়ে, কিছুই বুঝা গেল না। একদিন তিনি হল-ঘরে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে 'টুক' করিয়া একটা ফল তাঁহার সম্মুখের টেবিলে পড়িল। সে দিন হঠাৎ তাঁহার সেই

আত্মীয়ের প্রতিশ্রুতির কথা যাহা তাঁহার পুত্র হইতে শুনিয়াছিলেন, মনে পড়িল। তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হাঁ হে, তুই কি অমুক? তুই সেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলি, তাই কি এরূপে ফল ফেলিতেছিস। তাহা যদি হয়, কই—আর একটি ফল ফেল্ দেখি!” তনখই ‘টুক’ করিয়া আর একটি ফল পড়িল। তখন তিনি বলিলেন—“বটে! আচ্ছা, বুঝা গেল। তুই এখন তোর সদ্গতি দেখ্। আর এ উপদ্রব করিস্ না।” তাহার পর হইতে আর সে উপদ্রব হয় নাই। সত্যই কবিগুরু সেক্ষপিয়ার বলিয়াছেন—

“স্বর্গে মর্ত্ত্যে আছে বহু ঘটনা এমন
স্বপ্নেও ‘দর্শন’ যাহা করে নি দর্শন।”

ইহার পর চট্টগ্রাম হইতে এক আত্মীয় নরাধমের মৃত্যুর এক দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি লিখিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে তাঁহাকে বলিয়াছিল—“নবীন আমার পিছে লাগিয়াছে। এবার আমার রক্ষা নাই। আমি এবার মরিব, এবং সেখানে গিয়া আবার ক্রিকেট খাড়া করিয়া রাখিব। নবীন ও তোমরা গেলে, তোমাদের সঙ্গে আবার ছেলেবেলার মত ক্রিকেট খেলিব। নবীন একদিন বুঝিবে—আমি নহে, তাহার আত্মীয়েরা তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে।” তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু হওয়াতে সকলের সন্দেহ হয় যে, সে উক্ত ড্যামেজের মোকদ্দমার ও আমার ভয়ে আত্মহত্যা করিয়াছে। স্থানীয় ব্রাহ্ম সংবাদপত্রে এই সন্দেহ অমূলক বলিয়া, এক প্রবন্ধও তাহার পক্ষে প্রকাশিত হইল। শুনিলাম, সে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিল যে, সে তিন ফাঁকি খেলিয়া যাইতেছে,—প্রথম, লেখাপড়া না জানিয়াও সে একজন উচ্চ কর্ম্মচারী ও রায় বাহাদুর হইয়াছে। দ্বিতীয়, সম্পূর্ণরূপে বধির হইয়াও সে একটা দেশের উপর এই প্রভুত্ব করিয়াছে। তৃতীয়, একটা দেশ তাহার শত্রু হইয়াও কেহ তাহার কিছু করিতে পারে নাই। দেশে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিয়াছে। তাহার আত্মহত্যা সত্য কি মিথ্যা জানি না। যেরূপেই হউক, বড় সংকট সময়ে সে স্বধামে চলিয়া গিয়াছিল। আর কিছুদিন থাকিলে তাহার বিপদের সীমা থাকিত না। বিশেষত যে মিঃ কলিয়ারের ভয়ে সে ছুটি লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেই মিঃ কলিয়ার আবার কমিশনর হইয়া আসিয়াছেন। তাহার পরিণাম এই হইল! আর সে যাহার এই বিপদ্ ঘটাইয়াছিল ও যাহাকে মৃত্যুশয্যায় পর্য্যন্ত শায়িত করিয়াছিল, সে এখনও জীবিত এবং সম্মানের সহিত রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ও আজ পুত্রের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সুখ-শান্তিতে জীবনসন্ধ্যা অতিবাহিত করিতেছে। হায় ভগবান্! তুমি এরূপে তোমার সূক্ষ্ম ধর্ম্ম ও কর্ম্মনীতির দ্বারা দুষ্কৃতের বিনাশ ও সুকৃতের পরিত্রাণ সাধন কর!

একে রুগ্ন। তাহাতে এই সকল ঘটনায় প্রাণে কেমন নিরানন্দ ও উদাসীনতা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বৈদ্যনাথও নিরানন্দের স্থান। মন্দির ও ক্ষুদ্র নন্দনপাহাড় ভিন্ন দেখিবার কিছুই নাই। যে শ্রীক্ষেত্র দর্শন করিয়া আসিয়াছে, এ মন্দির ও তাহার উৎসবাদি তাহার চক্ষে কিছুই লাগে না। আর যে পার্ব্বতী মাতার পুত্র, তাহার চক্ষে ক্ষুদ্র নন্দনশৈল কিছুই নহে। এই নিরানন্দ ও নির্জ্জনতার মধ্যে শ্রীভগবান্ একটি আনন্দের জ্যোতিঃ সঞ্চার করিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া গৃহে ফিরিয়াছি, এমন সময়ে সেই সয়তানের আত্মীয় বলিলেন যে, দুটি স্ত্রীলোক ষ্টেশনে আমার বাড়ীর অনুসন্ধান করিতেছিল, তিনি তাহাদের আনিয়া তাঁহার ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছেন। কারণ, আমার ঘরে সে সময়ে কেহ ছিল না। স্ত্রী ও নির্ম্মল মন্দিরে গিয়াছেন। বৈদ্যনাথে দুটি স্ত্রীলোক আমার অনুসন্ধান করিতেছে!—আমি বিস্মিত হইয়া তাহাদের দেখিতে গেলাম।

দেখিয়া, আমার বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। অনেক ভদ্রমহিলা সময়ে সময়ে আমার কাব্যাবলী পাঠ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে সেইরূপে কলিকাতা অঞ্চলের দুটি রমণী আমাকে পত্র লিখিতেছিলেন। উভয়েই শিক্ষিতা। একজনের শিক্ষা এত দূর যে, তিনি আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্র লিখিতেছেন যে, তাহার উত্তর দিতে আমার গলদ্ঘর্ম্ম হইত। আমি সপরিবারে কখনও কলিকাতা গেলে তাঁহাদের সংবাদ দিতে তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে জন্য এবার পীড়িত হইয়া কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তাঁহাদের কাছে পুত্রের দ্বারা কার্ড পাঠাইলে, তাহারা দুজনেই আমাকে দেখিতে আসেন, এবং প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই দুজনেই যেন চিরপরিচিতা আত্মীয়ার মত ব্যবহার করিতে ও স্ত্রীকে মা বলিতে আরম্ভ করেন। দেখিলাম, তাঁহারা দুজনেই আসিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পর আত্মীয়। আমি পরম আদরে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়া, স্ত্রীর কাছে মন্দিরে সংবাদ পাঠাইলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহাদের জন্য ষ্টেশনে লোক পাঠাইতে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে পত্র পাই নাই। সঙ্গে যে একটি লোক ছিল, সে জলখাবার আনিতে যে মধুপুর ষ্টেশনে নামিল, আর উঠিতে পারিল না। অতএব তাঁহারা সেখান হইতে সঙ্গিহীনা অবস্থায় বৈদ্যনাথ ষ্টেশনে চলিয়া আসেন। স্ত্রী ও পুত্র ছুটিয়া আসিলেন। এ দুটিকে লইয়া গৃহ আনন্দে পূর্ণ হইল। একজন কৃষ্ণা, অন্যা গৌরী। উভয়েই সুন্দরী, ক্ষীণাঙ্গী, মধ্যযৌবনা। কৃষ্ণা গম্ভীরা, বঙ্কিমবাবুর ভ্রমর। নির্ম্মল তাহাকে 'ফিলজফার' দিদি বলিত। গৌরী ঠিক যেন কমলমণি ;—একটি আনন্দের ফোয়ারা। দুটিই হতভাগিনী। একজনের স্বামী মতিচ্ছন্ন ও চিরুদ্দেশ। অন্যটি বাল-বিধবা। একজনের চাপা ঈষৎ হাসি। অন্যের হাসিধ্বনিতে গৃহ দিন রাত্রি মুখরিত। আমি তাহাকে পাগলী বলিয়া ডাকিতাম। আমি দেখিতে দেখিতে সুস্থ হইলাম। প্রত্যহ প্রাতে একবার হাওয়া ভক্ষণে বাহির হইতাম। কখন কখন এই দুটি আমার সঙ্গে যাইত। সমস্ত দিন আহাদের সঙ্গে পুস্তক পাঠে ও নানা আমোদে কাটাইতাম। নির্ম্মলের দার্শনিক দিদি দুপুরবেলা আমার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া প্রথম রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, তাহার পর গীতা পড়িত, এবং নানা বিষয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করিত। পাগলীর এ সকল আসে না। সে কবিতা পড়ে, কবিতা লেখে, এবং সমস্ত দিন হাসি তামাসা করে। অপরাহ্নে আমি আবার হাওয়া ভক্ষণে বাহির হইতাম। সময়ে সময়ে নন্দনশৈলে সায়াহ্নের নির্ম্মল আকাশতলে বসিয়া মধুসূদনের জীবনীলেখক যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ব্রাহ্মসঙ্গীত শুনিতাম। তীর্থস্থান ও হাওয়াভক্ষণস্থান বঙ্গ-মহিলার মুক্তিরাজ্য। এখানে পুরুষেরা যেরূপ হাওয়া খাইতে বাহির হন, অপরাহ্নে মহিলারাও দলে দলে সেই সর্পিণীর কার্য্য করিতে বাহির হন। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা গানবাজনা ও আমোদে কাটাইতাম। আমার নির্ম্মল বেশ গাহিতে পারে। অনেক ভদ্রলোক তাঁহাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া, পরিবারদের তাহার গান শুনাইতে কত খোসামুদি করিতেন। এরূপে বৈদ্যনাথের বাকী সময় বড়ই সুখে কাটিল।

বৈদ্যনাথের অনতিদূরে একটি বড় নির্জ্জন শান্তিপ্রদ স্থানে একজন সন্ন্যাসী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বহু দিন হইতে আছেন। তিনি একজন পেন্‌সনপ্রাপ্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের গুরু। একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া অনেক হাওয়াখোর ভদ্রলোক তাঁহার আশ্রমে গেলেন। তিনি আমাকে পাইয়া বসিলেন, এবং নানামতে তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। আমি তখন খুলিয়া বলিলাম যে, আমিও একজন খ্যাতনামা সন্ন্যাসীর শিষ্য। তিনি আমাদের বেশ খাওয়াইলেন। ভারতের অতীত আশ্রমের স্মৃতি, তাঁহার আশ্রম

দেখিলে ছায়ার মত হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। বড় আনন্দে একটা দিন কাটাইলাম। ইহার পর একদিন সেই রমণী দুটি ও নির্ম্মলকে সঙ্গে করিয়া স্ত্রী আশ্রম দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলে, সন্ন্যাসী বলিলেন—"মাই! আনন্দ মন্ মে।" এই দার্শনিক কথা তাঁহার না বলিলেও চলিত। কিন্তু যেই বলিয়াছেন, অমনি সেই 'দার্শনিক দিদি' তাঁহাকে পাকড়াও করিল। সে বলিল—"কেন? বাহিরে কি আনন্দ নাই? সংসারটি কি মিথ্যা?" পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পুরিয়া। দুজনের মধ্যে ঘোরতর দার্শনিক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসীর দুই একজন গ্রাজুয়েট শিষ্যও আছেন। স্ত্রী বিদায় হইয়া আসিবার সময়ে তাঁহাদের একজন স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এটি কি আপনার কন্যা?" স্ত্রী বলিলেন, তাঁহার কন্যা নহে, সে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। শিষ্য বলিলেন—"বাপ! অসাধারণ মেয়ে! বাবাজীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।" স্ত্রী বাড়ী আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তোমার দার্শনিক 'মানি' বাবাজীকে ভারি জব্দ করিয়া আসিয়াছে।"

পাগলি হি হি হাসিয়া কহিল,—"ওগো! তোমার মানিকে আজ থেকে ভট্টাচার্য্য উপাধি দেও। বাবা গো! অত বড় সন্ন্যাসীটাকে হেস্ত-নেস্ত করে এসেছে।" আমি বলিলাম,—"সে কি মৃণাল! তুই এত বড় একটা সন্ন্যাসীর সঙ্গে লড়্তে গিয়েছিলি?" সে গম্ভীরভাবে বলিল,—"লড়্তে যাব কেন? গায়ে পড়ে লাগলে আমি তাকে ছাড়্ব কেন? ও কিসের সন্ন্যাসী! একজন ঘোর বিলাসী। মা! তুমি শুন্লে না, রাত্রিতে আহারের জন্য পায়রা আর মাগুর মাছ বলে দিলে।" আমিও দেখিয়াছিলাম, তিনি একজন 'দস্তুর-মতাবেক' গৃহী হইয়াছেন। স্মরণ হয়, ধানের গোলা পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলাম। তবে আমার পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি মহাশয় তাঁহার বড় ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি আমাকে যোগসাধনা করিতে বলিতেন। যোগ কি হয়? বড় আনন্দ হয়, কিছু দিন পরে একটা জ্যোতি দেখা যায় এবং আয়ু দীর্ঘ হয়। আনন্দ আর জ্যোতি যাহাই হউক আয়ু দীর্ঘ হওয়া কি বড় বাঞ্ছনীয়? স্বয়ং গ্লাডষ্টোন মৃত্যু ভিক্ষা করিতেন। ইহার সমস্ত পরিবারকে এ সন্ন্যাসী যোগ শিক্ষা দিতেছিলেন। সকাল ও সন্ধ্যার সময়ে স্ত্রীলোকেরা বড় বড় চাদর জড়াইয়া, চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিত। আমার গুরুদেব এরূপ যোগকে 'বুজরুকি ও ভোজকে বাজি' বলিতেন। ডেপুটি মহাশয়ও আর যাহা পাইয়া থাকুন, আয়ু বড় বেশী পাইয়াছেন বোধ হয় না। কারণ, ইহার অল্প দিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

জীবনের এই আনন্দের অঙ্ক ফুরাইল। ছুটি শেষ হইয়া আসিলে, বোল্টন সাহেবকে কুমিল্লা বদলির জন্য লিখিলাম। যথাসময়ে উত্তর না পাইয়া বড় চিন্তিত হইলাম। পুত্র এক দিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলিল,—"বাবা! আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, তোমার কুমিল্লা বদলির অর্ডার আসিয়াছে।" সে ছুটিয়া পোষ্ট আফিসে গেল। সত্য সত্যই সেই ডাকে কুমিল্লা বদলির সংবাদ আসিয়াছে। আমরা বৈদ্যনাথ ছাড়িবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। সে দিন হইতে বালিকা দুটির চক্ষের জল ধারায় পড়িতে লাগিল। তাহাদের অশ্রু দেখিয়া, তাহাদের ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া, আমার হৃদয়ও ডুবিয়া গেল। আমরাও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহাদের সঙ্গে করিয়া বৈদ্যনাথ ত্যাগ করিলাম, এবং কলিকাতার নিকট এক ষ্টেশনে তাহাদের রাখিয়া গেলাম। সমস্ত পথে তাহাদের অশ্রুর বিরাম ছিল না। ষ্টেশনের সেই বিদায়-দৃশ্যে পাষাণ দ্রব হইল। স্বয়ং ষ্টেশন মাষ্টার এই দৃশ্য দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহারা আপনার কে হয়?" আমি বলিলাম, —"কিছুই হয় না।" তিনি বিস্মিত হইলেন। ট্রেন খুলিল। যতদূর দেখা যাইতেছিল তাহাদের অশ্রু ষ্টেশনের একটি স্তম্ভ বাহিয়া, ও আমাদের অশ্রু গাড়ীর গবাক্ষ বাহিয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সেই কাতর মুখ আমি

জীবনে ভুলিতে পারিব না। ইহার পর যখন সেই ষ্টেশন হইয়া গিয়াছি, যে স্থানে তাহারা দাঁড়াইয়াছিল, সেই স্থানটি দেখিয়া আমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি। ধরাতলে রমণী-হৃদয়ই স্বর্গ এবং প্রকৃত স্নেহই সুধা। শ্রীভগবান্ দুটির হতাশ হৃদয়ে সুখ শান্তি বর্ষণ করুন। বৈদ্যনাথ হইতে বাড়ী গেলাম। তাহার পর কুমিল্লায় গেলাম।

কুমিল্লা

স্মরণ হয়, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সন্ধ্যার ট্রেনে চট্টগ্রাম হইতে আমি একা রওনা হইয়া, রাত্রি তিনটার সময়ে কুমিল্লা প'হুছিলাম। পথে ফেনীতে বহু ফেনীবাসী দেখিতে আসিয়াছিল। কুমিল্লা বদলিতে তাহাদের বড় আনন্দ। কারণ, কুমিল্লা ফেনীর খুব নিকট। দেবতার সঙ্গে আমার যেরূপ সম্পর্ক, সারা রাত্রিতে একটু একটু বৃষ্টি হইতেছিল। পুরাতন বন্ধু বাবু শশিভূষণ দত্ত কুমিল্লার ডিঃ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ষ্টেশন হইতে তাঁহার গৃহে, তাঁহার এক অপূর্ব্ব 'ডগ কার্টে' লইয়া গেলেন। গাড়ীখানি প্রকৃতই 'ডগ কার্ট'। কারণ টাট্টু দুটি শশী ভায়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন জানি না, 'ডগ' (কুকুর) অপেক্ষা তাহারা বড় বেশী বড় হইবে না। শশী রায়বাহাদুর হইয়া যখন তাহাদের যুড়িতে চালাইতেন, আমি তখন বাহক দুটিকেও 'রায়বাহাদুর' ও 'খাঁ বাহাদুর' উপাধি দিয়াছিলাম। শশী নিজেও একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন চট্টগ্রামে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, শশী তখন একজন বাঙ্গালী এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পুত্রের 'প্রাইভেট টিচার' হইয়া চট্টগ্রামে আসে। সে অবস্থায় অসাধারণ উদ্যোগ, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বলে শশী ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা একটুক একটুক শিক্ষা করিয়া, 'ওভারসিয়ার' হইতে চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া, বহুকাল সেখানে অতিবাহিত করে। তাহার পর কয়েক বৎসর যাবৎ শশী কুমিল্লার ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার। চট্টগ্রামে এমন নরনারী নাই যে, যে শশীকে চেনে না ও ভালবাসে না। কুমিল্লায়ও তদ্রূপ। বলা বাহুল্য, শশীও সাহেব সেবায় ও বশীকরণে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু শশী সর্ব্বজনোপকারী, কাজেই সর্ব্বজনপ্রিয়। জেলার সর্ব্ব-প্রধান রাজকর্ম্মচারী হইতে পেয়াদা ও মুটে মজুর পর্য্যন্ত শশী সকলের সাহায্যকারী, সকলের বিপদের বন্ধু, সঙ্কটের মন্ত্রী, রোগের ঔষধ, দুঃখের দুঃখী, সুখে সুখী। শশী সত্য সত্যই তৃণ হইতে নীচ, শশীর তরুর মত সহ্যগুণ, এবং শশী মানহীন ব্যক্তিরও মানদাতা। অতএব ভগবান্ এমন লোকের উন্নতি করিবেন না কেন? শশী ভায়ার 'রায়বাহাদুরি' বৈঠকখানাখানিও তাঁহার 'ডগ কার্টে'র যুড়ি। উহা মুকুন্দরামের কালকেতুর 'কুঁড়িয়া ঘর'। এ গৃহে নিশির অবশিষ্ট অংশ কাটাইয়া, প্রাতে প্রথমে স্নেহাস্পদ ভ্রাতা তারাচরণের বাসায় গেলাম। দু এক দিন আগে তারাচরণ চাঁদপুর হইতে বদলি হইয়া, এখানের মুন্সেফ হইয়া আসিয়াছে। এটি আমার বিশেষ সান্ত্বনার বিষয় হইয়াছিল। তাহার পর ভায়ারা আমার জন্য যে 'বাঙ্গলা' ঠিক করিয়াছিলেন, আমার সেই ভবিষ্যৎ আবাস দেখিতে গেলাম। তাঁহারা লিখিয়াছিলেন, এই 'বাঙ্গলা'তে এক মেম সাহেব ছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তবে চট্টগ্রামের 'বাঙ্গলা'র মত হইবে। কিন্তু ও হরি! গৃহ দেখিয়া ও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, যে, এও সেই ময়মনসিংহের বাঙ্গলার দ্বিতীয় সংস্করণ, কি সহোদর ভ্রাতা। সেইরূপ দুখানি মাত্র কামরা। ময়মনসিংহের 'বাঙ্গলা'য় চাটাইয়ের বেড়া ছিল, এটিতে বাঁশের বেড়া। তাহার মেজে পাকা ছিল; ইহার তাহাও নাই। তাহার বারান্ডা খোলা ছিল; ইহার পশ্চিমমুখী বারান্ডায় বাঁশের জাফরি। দেখিতে ঠিক যেন চট্টগ্রামের মুর্গি রাখিবার ঘর। আমার চক্ষু সজল হইল। আমার সেই পাহাড়ের বাড়ীতে আবার

কয়েক দিন কাটাইয়াছি। হায় ভগবান্! আবার কি আমাকে এরূপ গৃহে আনলে? বুঝিলাম, আমার পরীক্ষা শেষ হয় নাই? ময়মনসিংহে এরূপ গৃহে থাকিয়া, মৃত্যুশয্যায় শায়ী হইয়াছিলাম। সেই রোগগ্রস্ত শরীরে কিরূপে এ ঘরে থাকিব? শুনিলাম, ইহার অপেক্ষা ভাল ঘর কুমিল্লায় পাওয়া যাইবে না। গৃহস্বামী বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সঙ্গে ছিলেন। তিনি একজন স্থানীয় জমিদার ও বড় কণ্ট্রাক্টর এবং সহৃদয় লোক। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আমি এই ঘরের যেরূপ পরিবর্ত্তন করিতে বলিব, তিনি আমার সুবিধার জন্য তাহা করিবেন। আমি বলিলাম,—"সে বড় সহজ কথা নহে। তিনি আমার জন্য এত টাকা ব্যয় করিবেন কেন?" তিনি বলিলেন—"আমার পছন্দে তাঁহার ঘরের উন্নতি হইলে তাঁহারই লাভ।" আমি বলিলাম,—"তাহা হইলে আমি ইহার উপর কবিগিরি করিতে পারি।" সেই দিনই এই গৃহে আসিয়া, পরদিন হইতে তাহাতে কবি-কল্পনা খাটাইতে আরাম্ভ করিলাম। প্রথম অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া, চারি দিকে দরজা জানালা কাটাইলাম। দুই দিকে দুইখান চৌচালা কামরা, এবং সম্মুখে বারাণ্ডার জাফরি ফেলিয়া দিয়া, অষ্টকোণসমন্বিত এক আটচালা বারাণ্ডার মধ্যস্থলে নূতন ফ্যাসানে যোগ করিয়া দিলাম। মেজে পাকা করিয়া লইলাম। সমস্ত দ্বার ও জানালায় আয়না ও কাঠের কপাট দিলাম, এবং বেড়ার গায়ে ভিতর দিকে আর এক প্রস্থ চাটয়ের বেড়া ও উপরে চাটায়ের ছাদ দিয়া, বাহিরে বাসন্তী রং ও ভিতরে কক্ষে কক্ষে গোলাপী, আসমানি ও সামুদ্রী রং দিলাম। সম্মুখের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক গোল বেদী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার শীর্ষস্থানে কামিনী এবং তাহার চারি পার্শ্বে কলিকাতা হইতে আনিয়া উদ্যান-তাল রোপণ করিলাম। প্রাঙ্গণের প্রান্ত সীমায় নানাবিধ ফুল রোপণ করিয়া, স্থানে স্থানে বিচিত্র কেয়ারি করিয়া, season flower (ঋতুফুল) বসাইলাম, এবং স্থানে স্থানে 'গেট' ও কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর নানাবিধ লতা তুলিয়া দিলাম। পশ্চাতের প্রাঙ্গণে নানাবিধ ফলবৃক্ষ কলিকাতা হইতে আনাইয়া লাগাইলাম। বাড়ীর নাম রাখিলাম গৃহস্বামীর নামে Anand Lodge (আনন্দলয়)। কুমিল্লায় একটা sensation (তোলপাড়) পড়িয়া গেল। প্রত্যহ ছোট বড় কত লোক আমার দৌলতখানা দেখিতে আসিতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বৃদ্ধ পুলিশ-সাহেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন,—"নবীনবাবু! আমার স্ত্রী প্রত্যহ এই পথ দিয়া যান। তিনি বলিলেন আপনি এই পচা গর্ত্তটাকে একটি স্বর্গে পরিণত করিয়াছেন। তাই আমি দেখিতে আসিলাম।" বাঙ্গালীর ঘর সাহেব দেখিতে আসিয়াছেন—কি অকথ্য সম্মান! বাহিরে সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রশংসা আর তাঁহার মুখে ধরে না। তিনি বলিলেন,—"আমি শুনিয়াছি, আপনি বাঙ্গালার প্রধান কবি। এই যাদুগিরি কবিরই উপযুক্ত। এ স্থানটি যেন কোনও যাদুকর পরিবর্ত্তন করিয়াছে।" এক দিন মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার ভ্রাতা পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল 'বাইক' করিয়া আমার গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন।' আমি সেই অষ্টকোণ বারাণ্ডার সবুজ চিকের মধ্যে বসিয়া 'কবিগিরি' করিতেছি। মাজিষ্ট্রেটের ভাই চেঁচাইয়া পশ্চাৎ হইতে বলিলেন,—"Halloh! what's this? Is it a theatre? (বাহাবা, এটা কি? এটি কি থিয়েটার?)" মাজিষ্ট্রেট বলিলেন,—"না। আমার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নবীন-বাবুর ঘর। এটা আগে একটা নরক ছিল।"

কুমিল্লা সহরটি বড়ই সুন্দর। স্থানে স্থানে কয়েকটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা পানীয় জলের জন্য রক্ষিত (reserved) হইয়াছে। স্বচ্ছ গভীর নীল সলিলে তরঙ্গ খেলিতেছে। ইহাই কুমিল্লার সুস্বাস্থ্যের একমাত্র কারণ। আয়ত রাস্তার দুই ধারে বিশাল বট ও অশ্বত্থশ্রেণী। দ্বিতীয় প্রহর দিবসেও রাস্তা শীতল ছায়ান্বিত। কিন্তু আগরতলার

রাজনীতির কল্যাণে সমস্ত সহরে কেবল টিনের ছাউনিযুক্ত বাঁশের ঘর। বড় বড় জমিদারের দৌলতখানাও এরূপ। দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আগরতলা রাজ্যটার উপর বিধাতার কি অভিশাপ আছে। শাসনকার্য্যে যাহার কিঞ্চিন্মাত্র অভিজ্ঞতা আছে, এমন লোককে মন্ত্রী নিয়োজিত করা আগরতলার রাজনীতি নহে। বহু পূর্ব্বে চট্টগ্রামবাসী আমার আত্মীয়েরা আগরতলার পুরুষানুক্রমিক দেওয়ান ছিলেন। চট্টগ্রাম সহরে এ জন্য যেখানে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল, তাহা এখনও 'দেওয়ান-বাজার' বলিয়া পরিচিত। চট্টগ্রামের শেষ দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র রায়। তাঁহার পর হইতে আগরতলা পূর্ব্ববঙ্গের একচেটিয়া মহল হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য একজন বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পে তাঁহার সমকক্ষ ভারতবর্ষে কেহ ছিল না। তবে রাজকার্য্যে তিনি বড় বীতরাগ ছিলেন। তিনি কিরূপে পূর্ব্ববঙ্গের একটি দলের ক্রীড়াপুতুল হইয়াছিলেন, ইহারা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য কিরূপে তাঁহার রাজ্যে এক জলপ্লাবন ঘটাইয়াছিল, সেই 'জলপ্লাবনে কিরূপে মহারাজার স্থানীয় কর্ম্মচারী সকলে ভাসিয়া গিয়া, তাহাদের স্থান ষড়যন্ত্রকারীদের আত্মীয় water fowls 'জলচরেরা' পালে পালে আসিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাতে কিরূপে মহারাজ চৌদ্দ পনর লক্ষ টাকার ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন' ও সমস্ত রাজ্যে জলচরদের উৎপীড়নে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, এবং এই আগুন হইতে ত্রিপুরা-রাজ্য রক্ষা করিতে গিয়া, আমি কিরূপ ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলাম, তাহা আমার ফেনী-জীবনীতে বলিয়াছি। সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমার জনৈক বন্ধু এসিস্টেন্ট পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। তিনি মহারাজার বিরুদ্ধে এই সকল বিশৃঙ্খলা উপলক্ষে রিপোর্ট করিয়া মহারাজাকে শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। এই সুযোগে গবর্ণমেণ্ট রাজ্যটি গ্রাস করিবার ছিদ্র খুঁজিতে লাগিলেন। নোয়াখালির সেই 'মানিনী মাজিস্ট্রেট' আমার কাছে রিপোর্ট চাহিলে আমি লিখিলাম যে, তখন মহারাজার ফেনীর জমিদারীতে কোনওরূপ অশান্তি নাই। তিনি আমার কাছে বত্রিশ প্রশ্ন পাঠাইয়া, মহারাজার প্রত্যেক তহসিল কাছারি পরিদর্শন করিয়া, তাহার উত্তর দিতে আদেশ করিলেন। উত্তর এক রাশি গেল। তাহাতে বরং ইহাই প্রকাশ পাইল যে, প্রজারা খাজনা দিতেছে না। তাহাদের রামরাজ্য হইয়াছে, 'মানিনী' ইহাতে দাঁত ফুটাইতে না পারিয়া, আমি মহারাজার পক্ষপাতিত্ব করিতেছি বলিয়া, আমার ফেনী হইতে বদলির জন্য আমার বিরুদ্ধে ঘোরতর রিপোর্ট করিলেন। আমার রক্ষা যে, তখন লায়েল সাহেব কমিশনর। তিনি আমাকে বেশ জানিতেন। এই সময়ে লেঃ গবর্ণর সার ষ্টুয়ার্ট বেলি এই সকল গোলযোগের জন্য চট্টগ্রাম আসিলেন। তখন রেল খোলে নাই। কুমিল্লা একপ্রকার অগম্য স্থান ছিল। এজেণ্টবাবু ও মহারাজার এক দেওয়ান লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করিতে চট্টগ্রাম যাইবার সময়ে আমার ফেনীর গৃহে আহার করিয়া গেলেন। তাহার দুই দিন পরে প্রাতে আমি কয়েকজন দর্শকের সঙ্গে আলাপ করিতেছি, দেওয়ান বিষণ্নমুখে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, আমার সঙ্গে তাঁহার একটা গোপনীয় কথা আছে। আমি উঠিয়া কক্ষান্তরে গেলে, তিনি আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"আপনি স্বীকার করুন যে, আপনি আমাদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবেন।" আমি বলিলাম—"এ কি কথা? অকস্মাৎ এ প্রস্তাব কেন? ষ্টুয়ার্ট বেলি কি বড় উৎপাত করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন,—"সে সকল কথা বলিবার আমার সময় নাই। যত শীঘ্র পারি, আমাকে আগরতলায় যাইতে হইতেছে। আপনি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মহারাজাকে বলিতে আমি অনুমতি চাহি।" আমি বলিলাম যে, এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ের আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে অক্ষম। আমি যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করি, তবে কেবল বেতনের অনুরোধে করিব না। যদি কার্য্য করিতে পারি বুঝি,

তবেই করিব। অতএব মহারাজ আমাকে কি নিয়মে লইতে চাহেন, তাহা লিখিলে আমি আমার অভিপ্রায় জানাইব। তিনি চলিয়া গেলেন, আর অমনি এজেণ্টবাবু প্রবেশ করিলেন। তিনি এ পথে ফিরিবেন না বলিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্ময় প্রকাশ করিলে, তিনি সে কথার উত্তর না দিয়া, দেওয়ানের সঙ্গে আমার কি কথা হইল, আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রাতার মত বিশ্বাস করিতাম। সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"তুমি যদি যাও, তব আর কথা নাই। , আগরতলার পরম সৌভাগ্যের কথা হইবে। তবে যে নিয়ম স্থির কর তৎসম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করিও।" আমি বলিলাম,—"তাহা নিশ্চয় করিব। কিন্তু তুমি মন্ত্রী হও না কেন? তুমি এত দিন আগরতলায় আছ। রাজ্যের সকল অবস্থা জান। অতএব তোমাকে ফেলিয়া মহারাজা অন্য লোক খুঁজিতেছেন কেন?" তিনি বলিলেন,—"তুমি এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছ। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি এ পদ স্বীকার করিব না। আমি এতকাল মহারাজার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। এখন কি তাঁহার চাকরি করিতে পারি?"

তাহার পর সমস্ত বঙ্গদেশ বিস্ময়ে পূরিত করিয়া, 'অমৃতবাজার' প্রকাশ করিল যে, এজেণ্টবাবু কুমিল্লার মাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া, মহারাজকে ভয় দেখাইয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা পাঁচ বৎসরের জন্য রাজ্যত্যাগ-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছেন। 'অমৃতবাজার' আগুন জ্বালাইয়া এই পত্র পোড়াইল। বীরচন্দ্র মাণিক্য বড় চতুর লোক ছিলেন। তাঁহার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল যে, এজেণ্ট মহাশয় কেবল তাঁহার মন্ত্রী হইবার জন্য তাঁহার উপর এই সকল উৎপীড়ন ঘটাইতেছেন। কিছুদিন পরে আমি বন্ধুর নিকট হইতে পত্র পাইলাম,—"তুমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে, আমি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়াছি। মহারাজার নুণ খাইব, ইহা আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল।" আমি বলিলাম,—"বটে! never consenting consented." তিনি আমার কাছে একটা শাসন-প্রণালী চাহিয়াছেন। আমি বলিলাম,—আমি কি প্রণালী পাঠাইব। তিনি আমার অপেক্ষা, ত্রিপুরারাজ্যের খবর অধিক রাখেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িলেন না। তখন জমিদারীটা কয়েকটি 'সার্কেলে' (বিভাগে) বিভাগ করিয়া, প্রত্যেক 'সার্কেলে' একজন ম্যানেজার নিয়োজিত করিতে, এবং আরও কি কি করিতে, লিখি। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার 'জবাকুসুম-সঙ্কাশ' মলাটযুক্ত প্রথম Administration Report (বার্ষিক রিপোর্ট) আমাকে পাঠাইয়া, তাহার প্রত্যেক 'প্যারার' পার্শ্বে আমার মত লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি দেখিলাম, উহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জন্য লিখিত। লিখিলাম যে, ইহাতে মহারাজা অসন্তুষ্ট হইবেন এবং এই রিপোর্ট হয় ত তাঁহার মন্ত্রিত্বের শেষের আরম্ভ। তাহাই হইল। কিছুদিন পরে শুনিলাম, মহারাজ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এবং তিনি পদরক্ষার জন্য তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর ইলিয়টের কাছে রাজ্য জরিপের দরখাস্ত করিয়াছেন। ইলিয়ট জন্মান্তরে বোধ হয়, জরিপের আমিন ছিলেন। জরিপ তাঁহার একটা হলোওয়ের বটি, সর্ব্বশাসন রোগের ঔষধ। দারভাঙ্গার মহারাজা পার্লিয়ামেণ্টে তাঁহার এই বটির প্রতিকূলে প্রশ্ন উঠাইলেন। ষ্টেট-সেক্রেটারি তাহার উত্তরে বলিলেন যে, উহা এমন উৎকৃষ্ট চিজ যে পার্ব্বত্য ত্রিপুরার স্বাধীন রাজা তাহার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। এইরূপে ইলিয়টের মুখ রক্ষা হইলে, তিনি কুমিল্লায় আসিলেন। চতুর মহারাজ এক চালে বাজিমাৎ করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ইলিয়টের একজন বিশেষ বন্ধুকে পদচ্যুত মন্ত্রীর স্থলে তিনি ম্যানেজার করিয়াছেন। তখন এজেণ্ট মন্ত্রী ঘোরতর অপমানিত হইয়া ডেপুটি কলেক্টরত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঘোর বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। চুলে খোঁপা বাঁধিলেন, মৎস্য মাংস ত্যাগ করিলেন।

আমি কুমিল্লায় আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে বীরচন্দ্র মাণিক্য পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কুমিল্লায় আসিয়া শুনিলাম যে, বর্ত্তমান মহারাজা 'জলচরের দল খাটাইয়া' তাড়াইয়া দিয়া, নিজে 'সুন্দররূপে' রাজ্যশাসন করিতেছেন। কিন্তু 'জলচরের' মধ্যে এজেন্টের বন্ধুরূপী এক কচ্ছপ ছিল। সে আবার ধীরে ধীরে রাজ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং কুমিল্লায় আসিয়া শুনিলাম যে, কচ্ছপের বাহন পেন্সন লইয়া, পূর্ব্ব অপমান পকেটস্থ করিয়া, আবার ঘন ঘন আগরতলায় যাতায়াত করিতেছেন। তাহার পর মহারাজা তাঁহার এক পুত্রকে হঠাৎ যুবরাজপদে বরণ করিলেন। ত্রিপুরা-রাজ্যের পুরুষানুক্রমিক নিয়মানুসারে যিনি মহারাজা হন, তিনি একজন 'যুবরাজ' ও 'বড় ঠাকুর' মনোনীত করেন। মহারাজ, অভাবে যুবরাজ রাজা হন এবং বড় ঠাকুর যুবরাজ হন। বর্ত্তমান 'বড় ঠাকুর' একজন সুশিক্ষিত তেজস্বী লোক। তিনি এই যুবরাজ নিয়োগের প্রতিকূলে আপিল করিলেন। আগরতলায় আবার আগুন জ্বলিল। আগরতলায়ও 'বাঃ বুদ্ধিমানদের' আধিপত্য। কচ্ছপ বুঝাইলেন যে, তাঁহার বাহন পুরাতন এজেণ্ট ভিন্ন এ আগুন আর কে নিবাইতে পারে? কাজেই তিনি আবার সহস্র রজত-মুদ্রায় বৈরাগ্য ছাড়িয়া মন্ত্রী হইয়াছেন, খোঁপা কাটিয়াছেন, আবার মৎস্য মাংস ধরিয়াছেন। কিন্তু সে আগুন এখনও দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, এবং পার্ব্বত্য ত্রিপুরা-রাজ্য ভস্ম হইতেছে। এই মন্ত্রীকেই তাড়াইবার জন্য বীরচন্দ্র মাণিক্য আপন রাজ্যের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, ব্রিটিশ-রাজ হইতে সনন্দ লইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তদনুসারে বর্ত্তমান মহারাজা কেবল রাজার সনন্দ মাত্র পাইয়াছিলেন। তিনি এখনও নিজে সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিতে পারেন নাই। একটি অষ্টমবর্ষীয় বালকও বুঝিতে পারে যে, এ সময়ে তাঁহার কাহাকেও যুবরাজ করিবার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না। জীবনের কিছুই নিশ্চয়তা নাই। হয় ত তাঁহার পূর্ব্বে বড় ঠাকুরের, কি তাঁহার পুত্রের মৃত্যু ঘটিতে পারে। তিনি মৃত্যু-শয্যায়ও যাহাকে ইচ্ছা, যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু মহারাজ অপেক্ষা করিতে পারিলেও মন্ত্রী মহাশয় যে পারেন না। তাঁহার ষাটবৎসর বয়স। বৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া মাসে মাসে সহস্র মুদ্রা উপার্জ্জনের আর সময় কই? মহারাজার নাম রাধাকিশোর। আমি তাঁহাকে 'সাধা কিশোর' বলিয়া থাকি। পূর্ব্বে একটা তপস্যা না করিলে কেহ ত্রিপুরার মহারাজাকে দেখিতে পাইত না। এখন মহারাজ যেখানে সেখানে যান, যখন তখন কুমিল্লায় আসেন, এবং তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বনামধন্য 'সন্দেশ সাহেবে'র পার্শ্বে বসিয়া নগর ভ্রমণ করেন। সন্দেশ সাহেব তাঁহাকে বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গুঁতা দিয়া এটা সেটা দেখান। নগরবাসীরা দেখিয়া ম্রিয়মাণ হয়।

একবার তিনি এরূপ দলবলে কুমিল্লা আসিয়াছেন। কারণ, লেঃ গভর্ণর কুমিল্লায় আসিতেছেন। মন্ত্রী মহাশয় 'বড় ঠাকুরে'র জনৈক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া, ব্যারিষ্টারকে তাঁহার আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন। সে তখনই বলিল,—"তোমার আত্মীয়তা রাখ, তুমি এখন বড় ঠাকুরের গ্রীবাচ্ছেদী আগরতলার ঘৃণিত মন্ত্রীর মত কথা কহ।" তাহার পর দুই জনের মধ্যে ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ উপস্থিত। শেষ মারামারির গতিক হইলে, আগরতলার এমন একটি মূল্যবান্ মন্ত্রিহত্যার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমি তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। তিনি তখন বলিলেন যে, তিনি একটা কথার পরামর্শের জন্য আসিয়াছিলেন—মহারাজা লেঃ গভর্ণরের অভ্যর্থনার জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবেন কি না। আমি কোনও মত প্রকাশ করিতে চাহিলাম না। কিন্তু তিনি ছাড়িবেন না। পরে বলিলাম, আগে মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লেঃ গভর্ণর আগরতলায় যাইতেন। এখন মহারাজা নিজে তোমার পূর্ব্বমন্ত্রিত্বের ফলে লেঃ গভর্ণরের সঙ্গে

সাক্ষাতের জন্য কুমিল্লা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন! তাহার পরও কি তিনি মহারাজকে রেলওয়ে ষ্টেশনে লইয়া আর্দ্দালিদের পার্শ্বে দাঁড় করাইতে চাহেন? তিনি বলিলেন যে, তবে উহা আমার মত নহে বলিয়া তিনি মহারাজাকে বলিবেন। কারণ, মহারাজা আমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন। তাহার পর এক দিন তাঁহাকে আমার গৃহে প্রাতঃকালে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছি। আমার আরও দুটি বন্ধু নিমন্ত্রিত ছিলেন। বড় ঠাকুরকে লঙ্ঘন করিয়া মহারাজার যে যাহাকে তাহাকে—এমন কি, মন্ত্রী মহাশয়কে পর্য্যন্ত যুবরাজ করিবার অধিকার আছে—ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি আগরতলার ইতিহাস আরম্ভ করিলেন। এই পুরাণ পাঠের আরম্ভেই আমি অন্য কার্য্যের ছলনায় সরিয়া পড়িলাম। এক বন্ধুর তন্দ্রা আসিল। দ্বিতীয় বন্ধু ফেনীর জনৈক উকিল। মন্ত্রী মহাশয় এই গরীবকে পাকড়াও করিলেন। সে নিরাশ্রয় হইয়াও পুরাণ শ্রবণ করিল। সে যেন ঠিক ফাঁসিকাষ্ঠে বসিয়া আছে। আহারের সময়েও তাহার অব্যাহতি নাই। এই ঘটনার পর তিনি আমাকে মহারাজা ও 'বড় ঠাকুরে'র মধ্যস্থ হইয়া এই বিবাদ মিটাইতে বলিলেন। বলিলেন উভয় পক্ষ আমাকে শ্রদ্ধা করেন, আমি এই কার্য্য পারিব। তবে পুত্রের যুবরাজত্ব রহিত হইলে আত্মহত্যা করিবেন। আমি নানা কারণে অসম্মত হইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে সেই ব্যারিষ্টার আবার আমার গৃহে অতিথি হইয়া উপস্থিত। তখন এক অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিলাম। তিনি 'বড় ঠাকুরে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সন্ধ্যার সময়ে আগরতলা পঁহুছেন। ইনি যুবক, এখনও ব্যবসায়ে এপ্রেণ্টিস মাত্র। কিন্তু ইহাতেই আগরতলায় এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। মহারাজ তাঁহার 'বাঃ বুদ্ধিমান্' মন্ত্রী ও অমাত্যদের লইয়া সভাস্থ হইয়া, সমস্ত রাত্রি এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিয়া, প্রভাত সময়ে স্থির করিলেন যে, এই মশককে বলপূর্ব্বক আগরতলা হইতে বিতাড়িত করিতে হইবে। মহারাজ ডাকিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে প্রভাতে আনিয়া, কর্ণেল সাহেবের—তাঁহার বেতন শুনিয়াছি পঞ্চাশ মুদ্রা—'অর্ডালি' কক্ষে আবদ্ধ করা হইল। 'অর্ডালি' গৃহও বংশনির্ম্মিত কুড়ে ঘর। তাহারও অর্দ্ধাঙ্গ রোগে ধরাশায়ী হইয়াছে। কর্ণেল সাহেবের সৈন্য সারজন ফলস্টাফের men in Buckram এর জীবন্ত আদর্শ। সাংখ্যায় তাহারা ৮৷৷১৫ জন, কি এইরূপ। তাহারা ভগ্ন পুরাতন পাথরি বন্দুক স্কন্ধে লইয়া ও শতগ্রন্থিযুক্ত শতরূপ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাহাকে ভীষণরূপে বেষ্টন করিল। আবার মরাহাজা তাঁহার 'বাঃ বুদ্ধিমান্'দের লইয়া সভাস্থ হইলেন। ছয় ঘণ্টাকাল গুরুতর পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, শিকারকে ডাকবাঙ্গলায় পেট ভরিয়া আহার করাইয়া, হস্তিপৃষ্ঠে রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রেরণ করিতে হইবে। কি গুরুতর দণ্ড! ডাকবাঙ্গলায় বন্দী যাইবার সময়ে মন্ত্রীর গৃহে গেল। তিনি 'খাইছে! খাইছে!' বলিয়া চীৎকার করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়া, দুই হাত পশ্চাতে লইয়া, তাহাকে চলিয়া যাইতে ঘন ঘন সঙ্কেত করিতে লাগিলেন। বন্দী হাসিয়া আকুল। তাহার পর তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া, সে আগরতলা হইতে চলিয়া গিয়া, গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিল। অপরাধ ত 'অর্ডালি' কক্ষে উপবেশন ও ডাকবাঙ্গলায় আহার! দণ্ডস্বরূপ তাহাকে মহারাজার পাঁচ শত টাকা ক্ষতিপূরণ ও এক 'এপলজি' (ক্ষমাপত্র) দিতে হইল! হা অদৃষ্ট!

এরূপ 'বাঃ বুদ্ধিমান্'দের দ্বারা আগরতলার রাজকার্য্য-প্রহসন নিত্য অভিনীত হয়। যাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন, প্রায় সকলেই শাসনকার্য্যে অনভিজ্ঞ। সকলেই নকলনবিশ মাত্র। বৃটিশ রাজ্যে যে শাসনপ্রণালীর ফলে আসমুদ্রহিমাচল এই হাহাকার উঠিয়াছে, কাহারও ঘরে অন্ন জল নাই, তাহার নকল করাই তাহাদের একমাত্র কার্য্য। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বৃটিশ রাজপুরুষেরা খড়্গহস্ত। কারণ, এই বন্দোবস্তের

ফলে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয় না, কোটি কোটি লোক মরে না। অতএব নকলনবিশেরাও ত্রিপুরারাজ্যে কায়েমি বন্দোবস্ত দিবেন না। তাহাতে এখন মন্ত্রী মহাশয়, ত্রিপুরারাজ্যের মহাদেব ম্যানেজার স্বয়ং বলদেব—তিনি শ্বেতাঙ্গ পশ্চিমী সিবিলিয়ান। আর 'সন্দেশ' সাহেব—অপদেব। ত্রিপুরা রাজ্যের বলদেব— ঈশ্বর-পিতা, সন্দেশ সাহেব—ঈশ্বর-পুত্র এবং মন্ত্রী মহাশয়—'হোলি গোষ্ট' বা ঈশ্বর-ভূত। এই 'ত্রিনিতি'র ফলে কুমিল্লা নগরে পর্য্যন্ত কায়েমি বন্দোবস্তি নাই। তাই সহরব্যাপী ভদ্রলোকদেরও কুঁড়ে ঘর এবং তাহার প্রত্যেকের পার্শ্বে অসংখ্য কলনাদী ভেকপূর্ণ এক গর্ত্ত ও এক খণ্ড ধানক্ষেত। তাহা না হইলে জোত জমা সিদ্ধ হয় না। অথচ কায়েমি বন্দোবস্তি দিলে মহারাজা বোধ হয়, লক্ষ টাকা নজর ও বর্ত্তমান খাজনার চতুর্গুণ খাজনা পাইতে পারেন। প্রায়ই মধ্যে মধ্যে অগ্নিদেব বাজার নগর ধ্বংস করিয়া থাকেন। এই কারণে আমি কমিশনর আফিস হইতে কায়েমি বন্দোবস্তি দেওয়ার জন্য এক কড়া আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক দিন শশী বলিলেন যে, ম্যানেজার সাহেব কাচারির নিকট এক খণ্ড জমি গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে বন্দোবস্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া বলরামের কাছে লইয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম আলাপ—"আমি তোমার কি করিতে পারি?" আমি একবার ভাবিলাম বলি—"রম্ভা কাটিতে পার?" আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"শুনিলাম, আপনি ঐ জমিটুক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে কায়েমি বন্দোবস্তি দিতে চাহিয়াছেন।" তিনি বলিলেন—"সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।" তাহার পর শশীর দিকে ফিরিয়া—"তুমি জান ত্রিপুরাবাসী সকলেই বিখ্যাত মিথ্যাবাদী।" শশী ভায়ার মুখ চূণ হইল, কিন্তু মাথা নাড়িয়া গম্ভীর-ভাবে সায় দিলেন। তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া—"আপনি কেন ও জমি চাহেন?" উত্তর—"ভাল বাড়ী পাই না। একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিব।" তিনি গর্জ্জন করিয়া—"কি? ভাল বাড়ী! বাঙ্গালীর জন্য ভাল বাড়ী? তোমাদের ঐ সবজজটি যে ঐ গরুর ঘরে আছে, তাহার বেতন কত?" আমি উত্তর দিলাম না। তিনি—"আপনি কত টাকা ব্যয় করিয়া বাড়ী প্রস্তুত করিবেন?" আমি—"তিন চারি হাজার।" তাহার পর অধোমুখে বলিলেন—"আমি সেখানে অবিবাহিত কর্ম্মচারীদের জন্য একটা 'বেরেক' প্রস্তুত করিব।" আমি বলিলাম—দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি বিবাহিত। তাহার পর চলিয়া আসিবার সময়ে বলিলেন,—"আমি কয়েক জনকে পাকা বাড়ীর জন্য কায়েমি বন্দোবস্তি দিয়া ঠকিয়া 'তোবা' করিয়াছি। কেহই পাকা বাড়ী প্রস্তুত করে নাই। ত্রিপুরাবাসী এমন জুয়াচোর ও মিথ্যাবাদী।" এই মহাপুরুষই আগরতলার 'ঈশ্বর পিতা'! ইনিই সেই লাট ইলিয়টের বন্ধু, এজেণ্ট মন্ত্রীকে তাড়াইবার জন্য যাঁহাকে বীরচন্দ্র মাণিক্য ম্যানেজার করিয়াছিলেন। এখন আবার সেই তিনিই মন্ত্রী, এবং ইনি ম্যানেজার। আগরতলায় বাঘ ভেড়ায় এক স্থানে জল পান করিতেছে। উভয়ে তখন বীরচন্দ্রের প্রিয়পুত্র 'বড় ঠাকুরে'র বন্ধু ছিলেন। এখন উভয়ে তাঁহার গ্রীবাচ্ছেদ করিয়াছেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সত্য মিথ্যা জানি না।

ইহার পর আমার বন্ধু আনন্দ রায়ের দ্বারা আমি নিজে ফেশন দিয়া, তাঁহার নিজের জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইলাম। কেবল গৃহটির পরিমাণ ভূমিখণ্ডটুক কায়েমি ছিল। তিনি উহা আমার গৃহের মত সুসজ্জিত করিলেন, এবং আমি মহারাজার এক বাড়ীতে উঠিয়া গেলে, এই বাড়ীর সমস্ত উদ্যান তুলিয়া লইয়া, তাঁহার নূতন বাড়ীতে লাগাইলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও দুই জন জমিদার দুটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, এইরূপে সজ্জিত ও উদ্যানে ভূষিত করিলেন। কুমিল্লায় আমি না গেলে কুমিল্লার শোভাবর্দ্ধক এই তিনটি বাড়ী হইত না। আমার সেই আনন্দালয়ের চারি দিকে চট্টগ্রামের মুসলমান ইন্‌স্‌পেক্টর এখন পাঁচ হাত উচ্চ বেড়া দিয়া ঘিরিয়া, উহা তাঁহার 'অন্দর'

করিয়াছেন। এই ঘরে আমার পূর্ব্বে মিসেস উইলিয়ম বলিয়া এক বিবি থাকিতেন। আমি উহার নাম এখন Fort William (ফোর্ট উইলিয়ম) রাখিয়াছি।

বিতাড়িত মন্ত্রীর পুনরাবির্ভাবের সহিত স্থানীয় লোক ত্রিপুরারাজ্য হইতে আবার বিতাড়িত হইতেছে, এবং উহা আবার পূর্ব্ববঙ্গবাসীতে ছাইয়া যাইতেছে। কুমিল্লার বৃটিশ আফিস সকলেও আগাগোড়া—ঢাকা! সমস্ত আফিস এক দল। স্বয়ং সেরেস্তাদার মহাশয় দলপতি। তিনি থিওসফিষ্ট এবং দীর্ঘকেশধারী। ম্যানেজার বলরাম সাহেব এ জন্য তাঁহার নাম রাখিয়াছেন— High priest of the Amlahs (আমলাদিগের 'হাই প্রিষ্ট' বা গুরু)। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন চট্টগ্রামের সেই ভৃঙ্গি মহাশয়। তিনি এখন ডেপুটি। তিনি এজলাসের সংলগ্ন Retiring room (প্রস্রাব-কক্ষকে) তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয় বন্ধু পূর্ব্ববঙ্গবাসী আমলাবর্গের তাম্রকূট সেবনের কক্ষে পরিণত করিয়াছিলেন। আমি আসিয়া একরাশি 'গুল' পরিষ্কার করাইয়াছিলাম। শুনিয়াছি. সময়ে সময়ে তিনি তাম্রকূট-যন্ত্রহস্তে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং উহা পার্শ্বস্থ আমলার সঙ্গে সময়ে সময়ে এজলাসেও হস্তপরিবর্ত্তন করিত। উক্ত যন্ত্রের ও তাঁহার বর্ণ ও কণ্ঠ অভিন্ন। 'ধর্ম্মাবতার' সুবিচার করিতেছেন. কি তাম্রকূট সেবন করিতেছেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সময়ে সময়ে মোক্তার ও অর্থী প্রত্যর্থীরা ঘোরতর 'গোস্তাকি' করিয়া ফেলিত। অতএব বলা বাহুল্য, আমি যে যে সেরেস্তার ভার পাইলাম, সমস্তেই কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা। অথচ তাহাতে হাত দিতে গেলে আলিপুরের মত previous practice (প্রচলিত দস্তুরের) দোহাই উঠে, এবং সমস্ত আমলা মহলে ধর্ম্মঘট হয়। যিনি আমার পেস্কার, তিনি প্রাচীন ডেপুটি, আমার শিক্ষক হইতে ইচ্ছা করিলেন এবং এক দিন আমার রায়ের আইনের ভুল হইয়াছে বলিলেন। আমি তাঁহাকে তিন মাসের জন্য পদচ্যুত করিলাম। তখন সেই হাই প্রিষ্ট সরেস্তাদারের রক্ষিত আমলা-রাজ্যে আমার প্রতিকূলে ধর্ম্মঘট আরও দৃঢ় হইল এবং যে ডিপার্টমেণ্টে হাত দিই, সেখানেই 'পুরাতন' দস্তুর-অস্ত্র আমার উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তৌজি সেরেস্তা কবুল জবাব দিল যে. তাহারা আমার নিয়মমত কাজ করিতে পারিবে না। আমি আলিপুর হইতে অঙ্ক আনাইয়া কলেক্টরের কাছে রিপোর্ট করিলে তিনি কড়া আদেশ দিলেন। তখন কলের মত কাজ চলিতে লাগিল। ট্রেজারির কাজ আমার পূর্ব্ববর্ত্তী—রাত্রি আটটা নয়টার সময়ে করিতেন। আমি আদেশ দিলাম যে, তিনটার সময়ে একাউন্টেণ্ট জেনারেলের নিয়মমতে কাজ বন্ধ করিয়া হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে, আমি চারিটার সময়ে টাকা তুলিয়া রাখিব। একাউণ্ট সেরেস্তা বলিল—অসম্ভব। তাহাদের চাকরি ছাড়িতে হইবে। দেখিতে দেখিতেই উহা সম্ভব হইল। আমি চারিটার সময়ে ট্রেজারি বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতাম। যখন সকল ডিপার্টমেণ্টে নিয়মিত কাজ চলিতে লাগিল তখন আমার ঘণ্টাখানিকের বেশী কাজ ছিল না। অবশিষ্ট সময়ে লাউঞ্জ চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সংবাদপত্র পড়িয়া দিন কাটাইতাম। কলেক্টর মিঃ হেরিসও (Harris) মিঃ কলিয়ারের মত লোক। তাঁহার অধীনে কয়েক মাস বড়ই সুখে কাটাইলাম। তাহার পর মিঃ মোরসেড (Mr. Morshead) আসিলেন। তিনি আমার কার্য্যপ্রণালী কিরূপ, জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—আমি ডেপুটির কার্য্যপ্রণালীই বা কি? তবে আমার এই নিয়ম আছে যে, আমি আফিসে যাইবার পূর্ব্বে এক টুকরা কাগজে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের হেড ক্লার্ক, সে দিন কোন্ ডিপার্টমেণ্টের কত ক্ষণের কাজ আছে তাহা লিখিয়া পাঠাইবে। আমি প্রথম ফৌজদারির কার্য্য শেষ করিয়া তাহাদের একে একে ডাকি ও এক এক ডিপার্টমেণ্টের কাজ শেষ করি। মিঃ মোরসেড বলিলেন—বড় সুন্দর নিয়ম, তিনিও তাহা অবলম্বন

করিবেন। কিন্তু তিনি এক দীর্ঘ রেজিষ্টারি করিলেন। তাহাতে জরুরি, খুব জরুরি, সাধারণ ইত্যাদি অসংখ্য ঘর হইল। উহা পূরণ করিতে আমলাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত। অথচ এক ডিপার্টমেণ্টের কাজে হাত দিয়া, আবার আর এক ডিপার্টমেণ্ট ডাকেন। এরূপে একটা আমলার হাট বসিয়া যায়। কাজ কিছুই হয় না। আমার ডিপার্টমেণ্টগুলির কার্য্য কলের মত চলিতেছে। আমি সংবাদপত্র পড়িয়া দিন কাটাই বলিয়া কোনও খোষামুদে ডেপুটি তাঁহাকে বলিয়া দিলেন আমার কাজ কিছুই নাই। তিনি আমার স্কন্ধে ডিপার্টমেণ্টের পর ডিপার্টমেণ্ট চাপাইতে লাগিলেন। যেটাতে আমি হাত দিই, সেটাতেই গোলযোগ বাহির হইয়া পড়ে। মহাফেজখানা ও নকলসেরেস্তা আমার হাতে আসিলে, আমি কার্য্যের নূতন নিয়ম করিয়া দিলাম। মহাফেজ জবাব দিলেন—'মু পারিবি না অবধড় !' আমি তাহাতে টলিবার নহি। দুই দিন আমার নিয়মমতে কাজ না চলিতেই দুইটা ষ্ট্যাম্প চুরি বাহির হইয়া পড়িল। একজন মুসলমান নকলনবিশ দাখিলি পঁচিশ টাকার ষ্ট্যাম্প চুরি করিয়া লইয়া, বাজারে বন্ধক দিয়া, তাহার উপপত্নীর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছে। তাহার দুই বৎসর জেল হইল। ইহার পর সংস্কারের জন্য মিঃ মোরসেড একে একে প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট আমার হাতে দিয়া একবারে পাশ কাটাইলেন।

শেষে এক ফৌজদারি বিচার লইয়া গোল বাধিল। আমি এক পুলিসের মোকদ্দমা খালাস দিয়াছি। খালাসের অন্য কারণের মধ্যে এক কারণ এই দিয়াছি যে, বাদীর পুলিসের সমক্ষের এজাহার ও কোর্টের সমক্ষের জবানবন্দির মধ্যে ঘোরতর অনৈক্য আছে। মিঃ মোরসেড রায়ের এই অংশের পাশে নোট করিয়া দিলেন যে, বাদীকে আবার ডাকাইয়া, এই অমিল সকল মিল করিয়া লওয়া আমার উচিত ছিল। আমি লিখিলাম, উহা বিচারকের কার্য্য নহে ; বাদীর উকিল, কি কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টরের কার্য্য। তিনি তাহার পর লিখিলেন—"আমি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে এই মতে ঐক্যমত হইতে পারি না।" আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম।" তিনি তাহার দুই এক দিন পরে আমাকে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"আপনি আমাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সদরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ফৌজদারি কার্য্য দুই জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হাতে দিলে ভাল চলিবে। আমি উহা ভাল বিবেচনা করি। অতএব আপনার হাতে যে এক খানা আছে, তাহা উঠাইয়া লইতে চাহি।" আমি বলিলাম—"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমার এই বয়সে লোককে কয়েদ করা ও বেত মারা বড় প্রীতিকর কার্য্য নহে। আমি এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইলে বরং তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ হইব।" যাহা হউক, মোরসেড যদিও সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছিলেন—এমন কি, 'হাই প্রিষ্ট' পর্য্যন্ত ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আমার প্রতি কোনও অসদ্‌ব্যবহার করেন নাই। বরং আমাকে আমার রোগের সময়ে বারম্বার আমার গৃহে কার্য্য করিতে দিয়া, এবং অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। ফৌজদারির কাজ চলিয়া যাইবার পর, আমার কার্য্যভার আরও লাঘব হইল। বহু ডিপার্টমেণ্ট আমার হাতে থাকাতেও আমার নিয়মমতে কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে চলিতেছিল যে, আমার ঘণ্টাখানিকের কাজও ছিল না। বারটার পর কাচারি যাইতাম, আর চারিটার পর চলিয়া আসিতাম। আমি কেমন করিয়া এত অল্প সময়ে এমন সুশৃঙ্খলামতে এত কার্য্য করিতাম, স্বয়ং মোরসেড বারম্বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পুত্রের বিবাহ

চট্টগ্রামের বৈদ্যসংখ্যা মুষ্টিমেয়। সে জন্য বিবাহ—বিশেষতঃ কন্যার বিবাহ কণ্টকর হইয়াছে। যে কয়েক ঘর বৈদ্য আছে,—সমস্তই প্রায় 'বর্গি' বিপ্লবের সময়ে রাঢ়দেশ

হইতে সমাগত,—প্রায় সকলেই দরিদ্র। অতএব আমি ইচ্ছা করিয়াছিলাম, পুত্রকে কলিকাতা অঞ্চলে বিবাহ করাইয়া, চট্টগ্রামের বৈদ্যদের একটি সুবিধার ও উন্নতির পথ খুলিব। দুই ব্যারিস্টার ও খ্যাতনামা কবিরাজপরিবারের সঙ্গে কথাও চলিয়াছিল। এক ব্যারিস্টার-পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। তাঁহার স্ত্রী ও আমার স্ত্রী উভয়কে 'বেহায়িন' করিবেন বলিয়া সর্ব্বদা রসিকতা করিতেন। আমি তাঁহাদের বরাবর এরূপ রসিকতা করিতে নিষেধ করিতাম। ইহার ফলে দুটি বালক বালিকার মনে একটা ভালবাসার ছায়া পড়িয়াছিল। পুত্রকে যখন বিলাত পাঠানই আমার স্থির সংকল্প, তখন আমারও এই বিবাহে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার আত্মীয়েরা কিছুতেই তাহা হইতে দিবেন না। আমিও দেখিলাম, এরূপ বিবাহে এক দিকে আমার নয় পুরুষের কুলগৌরব পুত্রকে বলিদান দিতে হইবে ; দ্বিতীয়তঃ হিন্দু সমাজ, এবং প্রাকৃতিক শোভাপূর্ণ আমার মাতৃভূমি একরূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 'আত্মীয়েরা' স্ত্রীকে ফিরাইয়া ফেলিলেন। তিনিও বলিতে লাগিলেন যে, কলিকাতা অঞ্চল হইতে বিবাহ করাইলে, বউ কেবল কলিকাতার দিকে টানিবে। দেশে আমাদের এই বংশগৌরব, এই প্রতিপত্তি ও বিষয়, সকলই ভাসিয়া যাইবে। আত্মীয়েরা আরও বলিলেন, বিবাহ কলিকাতায় হইলে তাঁহারা কেহ দেখিতে পাইবেন না। দেশের লোকেও কেহ দেখিতে পাইবে না। আমাদের পুরুষানুক্রমে কখনও পৈতৃক বাড়ীতে ভিন্ন বিবাহ হয় নাই। ঐরূপে বিবাহ পূর্ব্বপুরুষেরা অগৌরব মনে করিতেন। অতএব তাঁহাদের জিদ—আমার নিজগ্রামে, আমার জন্মস্থানে, বিবাহ এরূপ সমারোহে দিতে হইবে, যেন চট্টগ্রামে উহা আদর্শ হইয়া থাকে। কলিকাতা ছাড়িয়া চট্টগ্রামে বদলি হইবার এই বিবাহও এক কারণ। চট্টগ্রামে দেড় বৎসর নানা উৎপাতে কাটিয়া গেল। অতএব কুমিল্লা আসিবার পর এই প্রস্তাব চলিতে লাগিল। স্ত্রী মেয়ে যেটি দেখেন, সেটির সঙ্গেই বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করেন। অবশেষে একটি মেয়েকে দেখিয়া এরূপ ক্ষেপিয়া উঠিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ বিবাহের জবাব দিবেন বলিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। নির্ম্মল বলিল, —"বাবা! মা যাকে দেখে, তাকেই মায়ের পছন্দ হয়। তুমি একবার নিজে না দেখিয়া কিছু স্থির করিও না।" আমরা পিতাপুত্র উভয়ে উভয়ের পরম বন্ধু। আশৈশব তাহাকে আমি এরূপ ভাবে গঠিত করিয়া আনিয়াছি যে, আমি তাহার পিতা ও বন্ধু এবং সে আমার পুত্র ও বন্ধু। অতএব তাহার বিবাহের কথা পর্য্যন্ত সে আমার সঙ্গে অম্লানমুখে বলিত। আমি একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য এই মেয়েটিকে নিজে দেখিয়াছিলাম, এবং তখনই পত্নীকে বলিয়াছিলাম, তুমি এই মেয়েটিকে বিবাহ করাও না কেন ? তিনি চটিয়া লাল। বলিলেন,—"হাঁ, এত বড়মানুষের মেয়ে ছাড়িয়া, তিনি একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আনিয়া বিয়া করাইবেন!" কিন্তু আমার সেই কথাই অব্যর্থ হইল। মেয়ে দেখিয়া তিনিও তাহাকে পছন্দ করিতেন। পুত্রের যখন বয়স কুড়ি উত্তীর্ণ। তাহার হৃদয়ে সেই ব্যারিস্টার-কন্যাটির ছায়া ছিল। বিশেষতঃ গত বার কলিকাতা হইয়া বৈদ্যনাথ যাইবার সময়ে সে তাহাকে একপ্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল। আমি পুত্রকে বুঝাইলাম, প্রথমতঃ আমার বংশের অগৌরব। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়দের অমত। তৃতীয়তঃ দেশ ও সমাজ ত্যাগ। কারণ, উক্ত ব্যারিস্টার মহাশয় হিন্দুসমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। চতুর্থতঃ পাছে বিবাহ করাইয়া বিলাত পাঠাইলে বিলাতের খরচ তাঁহার ঘাড়ে পড়ে, তিনি বলিয়াছেন যে, পুত্র বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া ব্যবসায়ে দাঁড়াইলে, তবে বিবাহ হইবে। তিনি জানেন যে, আমি আমার এক পুত্রের জন্য তাঁহার কাছে ভিক্ষার্থী হইব না। তবে যদি বিবাহের পর আমি মরি! সর্ব্বশেষে পুত্রকে অন্যূন তিন বৎসর বিলাতে থাকিতে হইবে। ব্যারিস্টার মহাশয় যদি ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠতর বর পাইয়া

তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া ফেলেন, তবে তাহা আমার ও পুত্রের কত বড় অপমান ও মনস্তাপের কথা হইবে। নির্ম্মল বুঝিল, এবং তাহার মাতার প্রস্তাবে সম্মত হইল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২২শে মাঘ শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজার দিবসে বিবাহ স্থির হইল। ইহা লক্ষ্য করিয়া কবি ভ্রাতা রবিবাবু লিখিয়াছিলেন,—"সরস্বতীপূজার দিন গৃহে লক্ষ্মীস্থাপন করিয়া, নির্ম্মল মধ্যবর্ত্তিরূপে উভয় দেবীকে চিরসম্মিলনে গৃহাশ্রমে আবদ্ধ করিয়া রাখুন, এই আমার আশীর্ব্বাদ।" আমার স্নেহাস্পদ ভাই তারাচরণ তখন চট্টগ্রামে মুন্সেফ। তারা ধরিয়া বসিল যে, এই বিবাহে শুধু বাই-খেমটা ও যাত্রা হইলে হইবে না। সে সব আরও বিবাহে হইয়াছে। কিছু একটা নূতন দেখাইতে হইবে। আমি তদনুসারে তিনটি নূতন সঙ্কল্প করিলাম। প্রথমতঃ একটা নূতন রকম আসর কেবল বৃক্ষাদির দৃশ্যাবলীর দ্বারা করিব। কলিকাতায় চিত্রবিদ্যায় শিক্ষিত একটি লোককে আমার সমস্ত কল্পনা বুঝাইয়া দিলাম। সে উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিল। কিন্তু আমি কুমিল্লায়। কার্য্যের সময় সে ও আমার 'সাকৃত' এক খুড়তত ভাই যে আমাকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আসর নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিল, উভয়েই বার বার জবাব দিল যে, তাহারা ইহার কিনারা করিতে পারিবে না। অতএব আমাকে কুমিল্লা হইতে বারম্বার তাহার বর্ণনা ও নক্‌সা আঁকিয়া পাঠাইতে হইল। দ্বিতীয়তঃ শান্তিপুরে রাসের সময়ে যেরূপ 'মিছিল' (procession) বাহির হইয়া থাকে, বর-যাত্রার সময়ে বরের চণ্ডেলের অগ্রে সেরূপ মিছিল থাকিবে। আমার বাড়ীতে যে ঠাকুর গড়ে, তাহার একটি ছেলেকে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া, আমি পুতুল নির্ম্মাণ শিক্ষা করাইয়া আনিয়াছিলাম। এই কার্য্যের ভার তাহাকে দিলাম। পুতুলের মধ্যে স্মরণ হয়, রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ, হর গৌরী, শকুন্তলা দুষ্মন্ত, সাবিত্রী সত্যবান্, নল দময়ন্তী, রাম সীতা, অর্জ্জুন সুভদ্রা, এরূপ কতকগুলি পৌরাণিক মূর্ত্তি এবং কয়েকটি নর্ত্তকীর ও পরীর কল্পনা তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। তৃতীয়তঃ তিনটি মাত্র দৃশ্যবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র 'অপেরেট্টা' (operatta) লিখিলাম। প্রথম দৃশ্যে বর ও পুরোহিত। পুরোহিতের মুখে হিন্দু বিবাহের ব্যাখ্যা এবং বরের কয়েকটি উপাসনামূলক গান। দ্বিতীয় দৃশ্যে আমার কুলমাতা দশভুজার দ্বারা নন্দনের পারিজাতগ্রথিত পরিণয়-মালা আমার গৃহলক্ষ্মীকে প্রদান ও উভয়ের মুখে আশীর্ব্বাদ-গীত। তৃতীয় দৃশ্যে বর সভাসীন ও তাহাকে বেষ্টন করিয়া দুই অপ্সরার নৃত্যগীত। আমি একমাস যাবৎ কুমিল্লায় তালিম দিয়া দুইটি বালককে নূতন প্রকারের নৃত্য শিখাইয়াছিলাম।

কলেক্টর মিঃ হেরিস আমাকে দশটি দিন মাত্র ছুটি দিয়াছিলেন। বিবাহের সাত মাত্র পূর্ব্বে আমি বাড়ী পঁহুছিলাম। দেখিলাম, এক দিকে তারাচরণ দেশব্যাপী সমস্ত ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করাইয়াছেন। দেশে একটা মহা sensation (তোলপাড়) পড়িয়া গিয়াছে। সকলে বলিতে লাগিলেন যে, সমস্ত চট্টগ্রাম জেলা হইতে তামাসা দেখিতে লোক আসিবে। অন্যূন দশ হাজার লোকের ভিড় হইবে। উহা সামলান অসাধ্য হইবে। অন্য দিকে সমস্ত কার্য্য আমার সংসার-জ্ঞানহীন ভ্রাতাদের অবহেলায় এরূপ অসম্পূর্ণ যে, আমার সমস্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন 'গেট' ইত্যাদি কিছু কিছু বাদ দিয়া, কাজ যথাসাধ্য শেষ করাইলাম। প্রত্যহ শত শত লোক খাটিতেছিল। বিবাহদিবস সন্ধ্যা হইতে না হইতে এমন তামাসাগিরের ভিড় হইল যে, আমার পর্য্যন্ত কোনও দিকে যাইবার সাধ্য নাই। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। যাহা হউক তারাচরণ ও তাঁহার সহোদর ভ্রাতা রমেশ, আমার খুড়া ও পুত্রপ্রতিম অখিলবাবু ও অন্যান্য অভিভাবকেরা প্রাণপণ করিয়া খাটিতেছেন। সর্ব্বাগ্রে সন্ধ্যার পর মিছিলের

পশ্চাৎ বর গ্রামপরিক্রমণে বাহির হইল। সমস্ত গ্রামে লোকের জনতা। যত দূর দেখা যাইতেছে, কেবল লোকসমারোহের পর লোকসমারোহ। মিছিল দেখিয়া সকলে আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিল। গ্রামের বৃক্ষছায়ার অন্তরালে সেই আলোকশ্রেণী-সজ্জিত মিছিলের শোভা অবর্ণনীয়। আমরা দাঁড়াইয়া এই শোভা দেখিতেছি, এ দিকে আসরের অভিভাবক আসিয়া বলিলেন যে, বর সভাস্থ হইবার সময় উপস্থিত, কিন্তু এখনও খেমটাওয়ালীরা নাচিতে উঠিল না। ঢাকার উৎকৃষ্ট বাই-খেমটা আমার ঢাকাস্থ বন্ধুগণ নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সভায় প্রবেশ করিব সাধ্য নাই। একজন নিমন্ত্রিত ডেপুটি ভিড়ে পড়িয়া চীৎকার করিতেছেন। তাঁহাকে ভিড় হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আমি আসরের দ্বারস্থ কনষ্টেবলকে কৌতুক করিয়া পিঠে চড় মারিয়া বলিলাম,—"ওরে হতভাগা! তোদের হাকিম একটি মারা যায়, আর তোরা তামাসা দেখ্‌ছিস্‌!" এক শত চৌকিদার কনষ্টেবল সহ সবইন্‌স্‌পেক্টর, ইনস্‌পেক্টর আসিয়াছেন। সকলেই তামাসা দেখিতেছে, ভিড় থামায় কে? আসরের প্রত্যেক স্তম্ভের গায় এক একটি চিত্রিত বৃক্ষ। কোথাও তালবৃক্ষ, কাঁদি কাঁদি তাল ধরিয়াছে। কোথায়ও কদলিবৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও ফলশোভিত নারিকেল বৃক্ষ। কোথাও পেঁপে গাছ। পেঁপে ফাটিয়া পড়িয়াছে ও বায়স বসিয়া খাইতেছে। কোথাও কৃষ্ণচূড়া, কোথাও নাগেশ্বর ফুলে পত্র ছাপিয়া গিয়াছে। নৃত্যস্থানের চারি কোণায় চারিটি নৃত্যশীলা পরী। তাহাদের মস্তকে পুষ্পস্তবকের মধ্যে 'কারবাইড' আলো। তাহাদের দুই হস্তে প্রসারিত রুমালে লেখা আছে—'শুভ বিবাহ'। নানাবিধ আলোকে এই সকল বৃক্ষ ও পক্ষী প্রকৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। নর্ত্তকীরা নাচিবে কি, আত্মহারা হইয়া একে অন্যকে এই দৃশ্য সকল দেখাইতেছে। আমি গিয়া ভর্ৎসনা করিলে তাহারা বলিল যে, তাহারা অনেক রাজা মহারাজা ও নবাবের আসরে নাচিয়াছে, বহুমূল্য ঝাড় লণ্ঠন দেখিয়াছে। কিন্তু এমন একটি সুন্দর আসর তাহারা দেখে নাই। সভাস্থ নিমন্ত্রিত দেশীয় বিদেশীয় ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও আসরের ঘোরতর সমালোচনা চলিতেছে। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—"অবশ্য কল্পনা বুঝিতেছি আপনার। কিন্তু তাহা এমন সুন্দররূপে কার্য্যে পরিণত করিল কে?" আমি আমার চিত্রকর, পুতুল-নির্ম্মাতা ও সেই খুড়তত ভাইকে দেখাইয়া দিলাম। তাঁহারা তাহাদের অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। চারি দিকে সহস্র সহস্র লোকের ভিড়। পুলিস গোল নিবারণে অক্ষম। ইন্‌স্‌পেক্টর পর্য্যন্ত জবাব দিলেন। তখন আমি উঠিয়া, আনন্দাশ্রুনয়নে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম,—"তোমরা দেখিবে বলিয়া আমি এই সকল আয়োজন করিয়াছি। তোমরা সকলে আমার দেশের লোক। তোমরা এরূপ গোল না করিয়া বসিয়া যাও ও মনের আনন্দে দেখ ও শুন।" তৎক্ষণাৎ সমস্ত লোক বসিয়া গেল, এবং গোল থামিয়া গেল। একজন বিদেশীয় উচ্চ কর্ম্মচারী বলিলেন,—"দেখিলেন, লোকটির ক্ষমতা!"

আমার বন্ধু কলিকাতার এইচ. সি. গাঙ্গুলি মহাশয়েরা সুন্দর কবিত্বপূর্ণ নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে সমস্ত উৎসবের 'প্রোগ্রাম' ছাপা ছিল। আটটার পর 'অপেরা'। তাহার 'ষ্টেজ' বিবাহ-বেদীর পার্শ্বেই অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়া-ছিলাম। বেদীর উত্তর দিকে ষ্টেজ, এবং অপর তিন দিকে দর্শকদিগের বসিবার ফরাস-বিছানা। এই স্থানটিও পত্রে পুষ্পে ও আলোকে সজ্জিত ছিল। নির্ম্মল পূর্ব্বরাত্রিতে তাহার সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে বহু রাত্রি পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া গান করিয়া, প্রাতে আমাকে কবুল জবাব দিয়াছেন যে, তাঁহার গলা ধরিয়া গিয়াছে। তিনি 'অপেরা'য় গাইতে পারিবেন না। দেখিলাম, সত্য সত্যই তাহার গলা ধরিয়াছে। পুত্র আমার সকল বিষয়ে

এরূপ অসাবধান। আমার মনস্তাপের সীমা রহিল না। কিন্তু যেই যবনিকা উঠিল, এবং পুরোহিত আমাদের কুলমাতার দিকে দেখাইয়া, তাহাকে প্রণাম করিতে বলিলেন, সে জানু পাতিয়া, প্রণাম করিয়া, মা! মা! বলিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া, 'হারমোনিয়াম' লইয়া বসিল, অকস্মাৎ তাহার গলা ছাড়িয়া দিল। আমার নির্ম্মলের প্রাণে ভক্তি আছে, সে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সজলনয়নে যখন কুলমাতার দিকে চাহিয়া গাইতে লাগিল, তখন শ্রোতাগণেরও চক্ষু সজল হইল। তাঁহারা 'বেঁচে থাক বাবা!' বলিয়া খুব বাহবা দিতে লাগিলেন। গান শেষ হইলে তাঁহারা 'এনকোর' 'এনকোর' করিতেছিলেন। তখন আমি ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম যে, একে পুত্রের গলা ধরিয়াছে, তাহাতে দশটার সময়ে বিবাহ। বলিলাম, বরের মুখে আরও গান আছে। বাহিরের আসরে নৃত্যগীত রাখিয়া, আমি কেবল বাছা বাছা শিক্ষিত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোককে এই অপেরা শুনিতে আনিয়াছিলাম। তথাপি এই প্রাঙ্গণের বাহিরে এমন ভিড় হইল যে, ভয় হইল—লোকে বাড়ী ঘর উড়াইয়া দিবে। আমি তাহাদের চেঁচাইয়া বলিলাম যে, কাল আমি এই 'অপেরা' বাহিরের আসরে দিয়া, তাহাদিগকে দেখাইব। আমার পুরোহিত বি. এ., বি. এল।' কিন্তু ভয়ে প্রথম তিনি কাঁপিতেছিলেন। আমি ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে সাহস দিলে, তিনি হিন্দু-বিবাহের ব্যাখ্যা করিয়া বরকে বুঝাইতে লাগিলেন। বিদেশীয় নিমন্ত্রিতরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অভিনেতা কে? আমি বলিলাম, তিনি অভিনেতা নহেন, আমার প্রকৃত পুরোহিত, 'ষ্টেজ' হইতে নামিয়া তিনিই বিবাহ করাইবেন। অপেরার প্রত্যেক অঙ্কে তাঁহারা বাহবা দিলেন। শেষ হইলে বলিলেন যে, কলিকাতার 'ষ্টেজে'ও তাঁহারা এমন সুন্দর পরিচ্ছদ, নৃত্য, গীত ও অভিনয় দেখেন নাই। আমি পার্ব্বত্য মাতার সন্তান। নর্ত্তকী অপ্সরাদের কতক আমাদের পাহাড়ীয়া রমণীদের পোষাক দিয়াছিলাম।

'অপেরা'র পর বিবাহ আরম্ভ হইল। কন্যা পূর্ব্বদিন আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন। আমার বংশের ছত্রিশ জাতি প্রজা। এত লোক বরের সঙ্গে যায় যে, দেশের প্রায় কেহ এই চোট সামলাইতে পারে না। অতএব শ্বশুরবাড়ীতে বিবাহ আমার বংশীয়দের বড় ঘটে না। দর্শকদের তখন বাহিরের আসরে যাইতে অনুরোধ করিলে, কেহ কেহ যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,—"আহা! কি দেখিলাম! কি শুনিলাম! ইহার পর আর সেই বাই-খেমটার নাচ-গান শুনিতে যাইব না।' এই 'অপেরা'র মূল্য দশ হাজার টাকা। ইহার কাছে বাই-খেমটার নাচ এক কড়াও লাগে না।" দেখিলাম, তাঁহারা 'অপেরা' লইয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা আসরে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার কলিকাতা অঞ্চলের বন্ধু খ্যাতনামা সুলেখক ও 'রৈবতকের' সমালোচক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়,—তিনি তখন চট্টগ্রামের প্রধান জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন,—বলিলেন—"দাদা! তোমার মাথায় এত আছে জানিতাম না। তোমার বাড়ীর মাটির ঘর, কিন্তু ইহার কাছে ইমারত কোথায় লাগে? এক একটি ঘর এক একটি কবিতা। তাহার পর এই নৃত্য-গীত, পোষাক-পরিচ্ছদের কল্পনাই বা তুমি কোথায় পাইলে?" তাঁহার শিক্ষিত সুযোগ্য ভূম্যধিকারী মহাশয় বলিলেন,—"নৃত্য-গীতের ত কথাই নাই। কিন্তু আমি হিন্দু-বিবাহের ব্যাখ্যায় বিস্মিত হইয়াছি। কত বিবাহ দেখিয়াছি, কত বার বিবাহপদ্ধতি নিজে পড়িয়াছি। কিন্তু হিন্দু-বিবাহের মধ্যে যে এমন গভীর অর্থ আছে, আমি জানিতাম না। আজ আমার শিক্ষা হইল।"

ইহার পর বহু শত নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের ও সহস্র সহস্র দর্শকের আহারের পর আমি রুগ্নদেহে মৃতবৎ পড়িয়া থাকি। শুনিলাম, সেই রাত্রিতে অনুমান পাঁচ হাজার

লোকে আহার করিয়াছিল। প্রদোষে তন্দ্রা ভাঙ্গিলে কি মধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল! আসরে যাত্রাওয়ালারা ভৈরব রাগিণী ধরিয়াছে। সম্মুখে সরোবরের গর্ভস্থ সজ্জিত 'জলটুঙ্গি'তে রোশনচৌকির বাঁশী ও ক্লারিয়নেটে ভৈরবী রাগিণী আলাপ করিতেছে। প্রাঙ্গণের অপর ভাগে 'ব্যাণ্ডমঞ্চে' 'ব্যাণ্ডের' বাঁশীতেও ভৈরব রাগিণী বাজিতেছে। উষার আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভৈরব রাগিণী গ্রাম প্লাবিত করিয়া, গগন পূর্ণিত করিতেছে। দেখিলাম, সমস্ত বাড়ীতে ও পুষ্করিণীর পাড়ে নিমন্ত্রিতগণ চিত্রবৎ দাঁড়াইয়া এই সঙ্গীত নীরবে শুনিতেছেন। সে দিন সন্ধ্যার পর বাহিরের আসরে 'অপেরা' হইবার কথা। কিন্তু পাঁচটার সময় যাইয়া দেখি, আসরের অধ্যক্ষ সেই খুড়তত ভ্রাতা 'ষ্টেজ' বাঁধেন নাই। তিনি বলিলেন, পূর্ব্বরাত্রিতে বাই-খেমটারা মোটেও গায় নাই। মুফত টাকা লইবে। অতএব আজ অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত তাহাদের গান তাঁহারা শুনিবেন। পুত্রও জবাব দিলেন যে, আজ তিনি কোনও মতে গাহিতে পারিবেন না। কিন্তু সন্ধ্যা না হইতেই বহু আত্মীয়ের অনুরোধে এবং বাই-খেমটাদের অনুনয়ে দেখি, পুত্র ও অন্যান্য অভিনেতারা সজ্জিত হইয়াছেন। বাই-খেমটারা জিদ করিয়া বসিয়াছে যে, 'অপেরা' না দেখিয়া তাহারা গাহিবেও না, নাচিবেও না। অতএব সেই খোলা আসরে অভিনয় হইল। দুর্গার নন্দী মহাশয়ের অভিনয়ে লোকে ও বাই-খেমটারা হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। পূর্ব্বদিনও তিনি খুব বাহবা পাইয়াছিলেন। তিনি একজন যাত্রাদলের পাকা অভিনেতা। 'অপেরা'র নর্ত্তকীর অভিনেতাদের সঙ্গে সঙ্গে বহি দেখিয়া বাই-খেমটারাও গাইতেছিল। 'অপেরা' শেষ হইল। তাহাদের উঠিতে বলিলে তাহারা বলিল,—"ইহার পর আমরা কি ছাই নাচিব, আর গাহিব? যাহা দেখিয়া শুনিয়া গেলাম, আমরা এ জীবনে ভুলিব না।" এরূপে তিন দিন তিন রাত্রি আসরে নৃত্য-গীত ও উৎসব চলিয়াছিল। ঢোল হইতে 'ব্যাণ্ড' রোশনচৌকি নহবৎ পর্য্যন্ত এমন বাদ্য নাই, গাজির গান হইতে বাই-খেমটা ও যাত্রা পর্য্যন্ত কিছুই আত্মীয়েরা বাদ দেন নাই। তদ্ভিন্ন বহুরূপী ইত্যাদি এমন তামাসা নাই, যাহা সংগৃহীত না হইয়াছিল। সমস্ত উৎসবে দশ দিনে দশ সহস্র লোক আহার করিয়াছিল। সম্মুখস্থ দীর্ঘ পুষ্করিণীর পাড়ে পর্য্যন্ত রান্নার চুলা পড়িয়াছিল। গ্রামের এমন বাড়ী নাই, যাহার বাড়ীতে আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া ভিড় উপস্থিত না করিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলার সংখ্যাই কেবল প্রায় চারি শত ছিল। চতুর্থ দিবস এই উৎসব হইতে যখন আমি আমার কুমিল্লার নির্জ্জন গৃহে একা ফিরিয়া গেলাম, আমার কাছে যেন সকলই একটি বিচিত্র স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। কলিকাতা হইতে ও নানা স্থান হইতে বন্ধুরা আশীর্ব্বাদ উপহার পাঠাইয়াছিলেন। বৈদ্যনাথের সেই 'পাগলী' বউকে যে সুন্দর কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। বউয়ের নাম চপলা।

চপলার প্রতি

"কে তুমি গো আলো-রাণী এসেছ মোদের ঘরে?
তোরে পেয়ে পিতা মাতা ভেসেছে স্নেহের সরে।
আয় কাছে একবার, দেখি ও রূপের খনি,
আয় লো চপলে বধূ! আয় কাছে আদরিণী!
অভাগিনী জেনে কি লো আসিবি না মোর কাছে?
দেখ এসে এই হৃদে কি প্রেম, কি স্নেহ আছে।
গোপনে হৃদয়তলে রেখেছি সে স্নেহ মোর।
সেই প্রেমে সেই স্নেহে ভরে দিব হৃদি তোর।

আয় তবে, আয় কাছে, ওলো স্নেহময়ী মেয়ে।
কি জ্বালা জ্বলিছে প্রাণে একবার দেখ চেয়ে।
পারিবি কি নিবাইতে এ দারুণ দাবানল?
আশা যে হয় না মনে নিবারিবে এ অনল।
দারুণ শোক আঁধারে হ'য়ে আছি দিশেহারা।
আলোময়ী তুই এসে দেখা এ সুখের ধরা।
তোরে পেলে ঘুচে যাবে হৃদয়ের শোক মোর;
তোর স্নেহে মগ্ন হব তোতেই রহিব ভোর।
'নীরদে'র বুকে চাঁদ, তাতে পড়ে তোর আলো,
কে না তোর রূপে ভোলে, কে না তোরে বাসে ভালো?
জগতের লোক তোর রূপে বিহ্বলা;
ভুবন ভুলান মেয়ে তুই চপলা!
শিখো স্নেহ শিখো ভক্তি ধর্ম্মে দিও মন,
ক্ষণপ্রভা চিরপ্রভা করো বিতরণ।"

এপ্রিল মাসে পত্নী পুত্রবধূকে লইয়া কুমিল্লা আসিলেন। পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা! তুমি লেখাপড়া কি পর্যন্ত জান;" বউ কহিল,—"বাবা! আমি কিছুই জানি না।" আমার মাথায় তৎক্ষণাৎ আকাশ ভাঙিগয়া পড়িলে আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। তাহার পিতা সপরিবারে সারা জীবন চট্টগ্রাম সহরে ফিরিঙ্গি মহলে কাটাইতেছেন। নিজে সুশিক্ষিত লোক, এবং দেশের একজন প্রধান মোক্তার। আমি মনে করিয়াছিলাম, যখন দেশের চাষার মেয়েরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা জানে, তখন তিনি তাঁহারা কন্যাকে ইংরাজি পর্য্যন্ত শিক্ষা দিয়াছেন। পুত্র কলিকাতার ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরতদের মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি করিয়া আসিয়াছে। হা ভগবান্! কোথায় মনে করিয়াছিলাম, একটি ভাল শিক্ষিতা মেয়ে বিবাহ করাইব, কোথায় একটি বনের পাখী ঘরে আনিলাম। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা! তুমি অবশ্য বাঙ্গালা জান।" বউ ম্লানমুখে উত্তর করিল,—"না বাবা! আমি বাঙ্গালাও জানি না।" আমি বলিলাম,—"তোমার বাপ ত আমার মুণ্ডুটা খাইয়াছেন। আমার বিশ্বাস ছিল তুমি ইংরাজি পর্য্যন্ত জান।" পুত্র কক্ষান্তর হইতে বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"বাবা! তুমি যে দোকানদারদের মহাভারত পড়ার নকল করিয়া থাক—ম—হ—মহ, হয়ে আকার হা—মহা, ভয়ে আকার ভা, —মহাভা, র—ত—মহাভারত, বাঙ্গালাও সেরূপ জানে" এই বিদ্রূপে বালিকার মুখ আরও ম্লান হইল। সে বিষন্নমুখে বলিল,—"বাবা! আমি আপনার কাছে পড়িব। আমি এক বৎসরের মধ্যে লেখাপড়া শিখিব।" তাহার মুখ দেখিয়া আমারও মনে কষ্ট হইল। আমি তাহাকে তখন সস্নেহে বুকে লইয়া বলিলাম,—"তা বই কি মা! আমি তোমাকে লেখাপড়া শিখাইব।" সে দিনই হাতেখড়ি দিলাম, এবং সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম শিক্ষা দিতে লাগিলাম। বালিকার এমন তেজস্বিনী বুদ্ধি যে, সে সপ্তাহমধ্যে দুই হাতে হারমোনিয়মের পর্দ্দা টানিয়া, ছোট ছোট গান বাজাইতে ও গাইতে শিখিল। তাহার পিতৃমাতৃকুলে সঙ্গীতের স নাই। কাহাকে কিলাইলেও শব্দ করিবে না, পাছে কোনওরূপ 'সুর' বাহির হয়। আশ্চর্য্য! এই বালিকা এ শক্তি কোথা হইতে পাইল? তাহাকে বাঙ্গালা পড়াইতে গিয়া বিপদে পড়িলাম। কি পড়াইব? বউ এখনও বালিকা, দশ বৎসর মাত্র বয়স, শিশু বলিলেও চলে। কলিকাতার 'টেক্স্ট বুক কমিটি'র ত্রিমূর্ত্তির এবং তাঁহাদের ও শিক্ষা-বিভাগের 'আইনি বে-আইনি কুটুম্ব'গণের কৃপায়

যাহা বঙ্গদেশে পাঠ্য পুস্তক বলিয়া পরিচিত, তাহা সকলই অপাঠ্য। এই সকল নীরস, লালিত্যহীন, শ্রীক্ষেত্রের 'দন্তভাঙ্গা' শব্দপূর্ণ পুস্তক পাঠ করার তুল্য বালক-বালিকার পক্ষে অধিক কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না। অন্য দিকে আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্কিমবাবুর কোনও উপন্যাসই পিতা পুত্রীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে পড়াইবার জো নাই। তখন অগত্যা আমার 'ভানুমতী' পড়াইতে আরম্ভ করিলাম, এবং বালিকা তাহা কেবল আনন্দে-পাঠ করিল, তাহা নহে। তাহার কোমল হৃদয় ভক্তিতে আর্দ্র হইল। সে আমাকে একদিন বলিল,—"বাবা! আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাহি নাই। তুমি একটি জিনিস আমাকে আনাইয়া দিবে?" আমি—"কি মা?" সে—"বাবা! ভানুমতী যেরূপ বাল-গোপালমূর্ত্তি তাহার বক্ষের কাপড়ের মধ্যে রাখিত, সেরূপ মূর্ত্তি কি পাওয়া যায়?" আমি—"বোধ হয়, কাশীতে পাওয়া যাইতে পারে।" সে—"বাবা! আমাকে একটা মূর্ত্তি আনাইয়া দেও।" আমার বন্ধু উমাচরণবাবুকে পত্র লিখিয়া, একটি পিতলের লাড়ু-গোপালমূর্ত্তি তাহাকে আনাইয়া দিলাম। মূর্ত্তিটি কিছু বড়। বুকে বুকে রাখা যাইতে পারে না। বালিকা তাহার সুন্দর খাট ও আসন প্রস্তুত করিয়া, সেই মূর্ত্তি স্থাপিত করিল, এবং তাহাকে নিত্য স্নান না করাইয়া ও ফুলজল না দিয়া জলগ্রহণ করিত না। আর এক দিন আমি আফিস হইতে আসিলে, বউ আমাকে জলখাবার দিয়া বলিল, —"বাবা! 'ভানুমতী'র যে অংশ তুমি আমাকে কঠিন বলিয়া এখনও পড়াও নাই, পরে পড়াইবে বলিয়াছ, আমি তাহা নিজে পড়িয়াছি। বৈষ্ণবদের শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস কি, আমি পড়িয়াছি ও একপ্রকার বুঝিয়াছি। তুমি আমাকে একবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে কি?" বালিকা 'ভানুমতী' আনিয়া পড়িতে লাগিল, এবং আমি বুঝাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, ভক্তিতে বার বৎসর বয়স্কা বালিকার কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

পুত্রের বিলাতযাত্রা

দেখিতে দেখিতে পুত্রের বিলাতযাত্রার দিন নিকট হইয়া পড়িল। দুই কারণে তাহাকে বিলাত পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এখন কোন মূল্য নাই বলিলেই চলে। অন্য দিকে আয়ুঃক্ষয়। জানি না, ভারতবাসী-দের কোন্ পাপে এই শিক্ষানলে তাহাদের নিরাপরাধ শিশুগুলিন দগ্ধ হইতেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালক বা যুবক, তাহার ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইয়াছে। তাহার স্বাস্থ্য গিয়াছে, যম তাহাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছেন। শরীরে স্বাস্থ্য নাই, হৃদয়ে আশা নাই, উৎসাহ নাই, সংসারে অবলম্বন নাই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, এই আগুনে আমার একমাত্র সন্তানকে পোড়াইব না। দ্বিতীয়তঃ, রাণাঘাটের ম্যালেরিয়াতে তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছিল। সে ম্যালেরিয়ার দোষ কিছুতেই ছাড়াইতে পারে নাই। আহার করিয়া স্কুলে যাইতেছে, চোখ দুটি লাল হইয়া জ্বর আসিল। স্কুলে পড়িতেছে, হঠাৎ জ্বর আসিল। কুমিল্লা এরূপ স্বাস্থ্যকর স্থান, এখানেও এই অবস্থা। অতএব বিলাতে না পাঠাইলে, তাহার ভবিষ্যৎ অতলে ডুবাইতে হয়। কেবল বিবাহ করাই নাই বলিয়া এ পর্য্যন্ত পাঠাই নাই। আমি নানা কারণে, বিশেষতঃ বিলাত-ফেরতদের দুরবস্থা দেখিয়া, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, তাহাকে বিবাহ না করাইয়া সেই প্রলোভনের নরকে পাঠাইব না। ৬ই সেপ্টেম্বরের 'মেলে' তাহার যাত্রার দিন স্থির হইল। কলিকাতার ব্যারিষ্টারাগ্রণী মিঃ এ. চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া তাহার বিলাত যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার উপদেশমতে আগষ্ট

মাসে, বিবাহের ছয় মাস মাত্র পরে, নির্ম্মলকে ও পুত্রবধূকে লইয়া পত্নী কলিকাতা যাইতেছেন।' আমাদের মনের অবস্থা কি, কেহ যদি একমাত্র সন্তানকে বিলাত পাঠাইয়া থাকেন, কেবল তিনিই বুঝিতে পারিবেন। তাহাদের কলিকাতা-যাত্রার দিন আফিসে কাজ করিতে পারিতেছি না। থাকিয়া থাকিয়া চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। সেই অশ্রু-পূর্ণ অবস্থায় এক খণ্ড কাগজ লইয়া এই গীতি-কবিতাটি লিখিলাম,—

নির্ম্মাল্য

১

ওগো! যাও শুভ ক্ষণে, শুভ সমীরণে,
নাচিছে তরণী সাগরে!
লেখ হৃদয়ে ভরসা, শিরে নারায়ণ,
জীবনের ব্রত অন্তরে!

২

নাহি ফলে সাধনায়, নাহি হেন কাজ,
অমরত্ব মিলে সাধনে;
দেখ শ্রম-সফলতা সুবর্ণ অক্ষরে
অঙ্কিত মানব-জীবনে।

৩

কি ভয়! পিতার আশীষ, মাতার মমতা,
বালিকার প্রেম-অমৃত,
ওগো! রক্ষিবে তোমারে বিদেশে বিপদে
কবচের মত সতত।

৪

ওগো! যদি প্রলোভন করে আকর্ষণ
বলে পাপপথে তোমারে,
তুমি মনে ক'রো অশ্রু পিতার মাতার,
(তোমার) আশ্রয়বিহীনা লতারে।

৫

ওগা! হাসিবে চাঁদনি, হাসিবে না তারা?
ফুটিবে কুসুম প্রাঙ্গণে,
হায়! একটি কুসুম বিহনে তাহারা
রহিবে মরিয়া মরমে।

৬

ওগো! এ তিনের অশ্রু ত্রিবেণীর প্রায়
বহিবে নীরবে অঝোরে,
তুমি জয়মাল্য পরি আসি মুছাইও,
জুড়াইও প্রাণ আদরে।

আফিস হইতে বাড়ী আসিয়া, গানটি পুত্রকে গাহিতে দিলাম। গাহিতে গাহিতে তাহার অশ্রু ধারায় পড়িতে লাগিল। স্থানে স্থানে কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। আমি একটি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' বসিয়া নীরবে আকাশের দিকে চাহিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলাম। বউ

ও আমার ভাইঝিরা মাটিতে গড়াইয়া গড়াইয়া কাঁদিতেছিল। স্ত্রী কার্য্যান্তরে ছিলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন,—"তুমি নির্ম্মলকে কি গান গাহিতে দিয়াছ। মেয়েরা ত কাঁদিয়া খুন হইল।" তখন তিনিও গান শুনিয়া, পুত্রকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সেই সন্ধ্যার সময়ে তাঁহারা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। তাঁহারা পঁহুছিবা মাত্র যে ব্যারিস্টার-পরিবারে নির্ম্মলের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাঁহারা ছুটিয়া বউ দেখিতে আসিলেন। বউ আমার খুব সুন্দরী। তাহার বর্ণের তুলনা বাঙ্গালীর ঘরে বিরল। তবে তাহারা এক সান্ত্বনা পাইল। স্ত্রী বলিলেন, বউ লেখা পড়া, গান বাজনা, কিছুই জানে না। মেয়েরা আর সামলাইতে পারিল না। তাহারা স্ত্রীকে বলিল,—"এ মেয়ে কি তোমাদের ঘরে শোভা পায়? বিলাত-ফেরতার মেয়ে হইলে শোভা পাইত।" তাহারা হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান করিয়া উঠিলে, স্ত্রী বউকে বলিলেন,—"দেখিলে মা! ইহারা কেমন সুন্দর গাইতে বাজাইতে পারে। কই দেখি, তুমি বাজাইতে পার কি না।" তখন বউ সলজ্জভাবে বসিয়া, হারমোনিয়মে সুর দেওয়া মাত্র তাহাদের চোক কপালে উঠিল। তাহার পর যখন গান ধরিল, তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহাদের ঘষিয়া মাজিয়া শিক্ষা ও ঘষিয়া মাজিয়া গলা। ইহার স্বাভাবিক শক্তি, স্বাভাবিক গলা; তাহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না যে, বউ পূর্ব্বে কিছুই জানিত না। তাহার কেবল এই কয় মাসের মাত্র শিক্ষা। তাহারা বলিতে লাগিল যে, স্ত্রী তাহাদের তামাসা করিয়া এরূপ বলিতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস হইল যে, বউ বাপের বাড়ীতে বহু বৎসর শিক্ষা পাইয়াছে।

আমি দশ দিনের ছুটি লইয়া ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় গেলাম। বন্ধুদের পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া বিদায় হইতে পুত্রকে বন্ধুদের কাছে লইয়া গেলাম। মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের কাছে লইয়া গেলে, প্রদ্যোৎকুমারেরা নির্ম্মলের মুখে উপরোক্ত বিদায়-গীতটি শুনিতে জিদ করিতে লাগিলেন। গানটি ইতিমধ্যে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাজ বলিলেন,—"নির্ম্মল কি গাহিতে পারে?" প্রদ্যোৎ বলিলেন,—"বাবা! নির্ম্মল সুন্দর গাহিতে পারে।" প্রদ্যোৎ নির্ম্মলের গান পূর্ব্বে আমার কলিকাতায় অবস্থানকালে শুনিয়াছিলেন। তখন মহারাজাও গানটি শুনিতে বড় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম, হারমোনিয়ম ভিন্ন গাহিতে পারিবে না। মহারাজ বলিলেন, তাঁহার বাড়ীতে কোনও ইংরাজী যন্ত্র নাই। কি আশ্চর্য্য! তিনি আদেশ করিলে তাঁহার বেতনভোগী সঙ্গীতব্যবসায়ী এস্রাজ হস্তে উপস্থিত হইল। নির্ম্মল লজ্জায় ও ভয়ে কিছুতেই গাহিবে না। মহারাজ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁহার কাছে বালক কি গাহিবে। তথাপি তিনি জিদ করাতে নির্ম্মল এস্রাজের সঙ্গে গাহিতে লাগিল। সে পূর্ব্বে কখনও এস্রাজের সঙ্গে গায় নাই। মহারাজ একখানি কৌচে অঙ্গ হেলাইয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন। নির্ম্মল গান আরম্ভ করিবা মাত্র তিনি ফরাসির নল ফেলিয়া, সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—"বাহবা! কি মিষ্ট গলা! কি সুন্দর রচনা!" তাহার পর শুনিতে শুনিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইল। গান শেষ হইলে তিনি গানের ও গায়কের বড়ই প্রশংসা করিলেন। আমাকে বলিলেন,—"নবীনবাবু! ইহাকে খুব ভাল করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিতে হইবে।" আমি বলিলাম,—"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ সে ভার গ্রহণ করিবেন। আমি গরিব, কিরূপে শিক্ষা দিব? তিনি বলিলেন, তিনি আনন্দের সহিত সে ভার লইবেন। নির্ম্মলকে বলিলেন,—"তুমি আমার একটি কথা রক্ষা করিবে। তুমি ইংরাজি গান, কি ইংরাজি যন্ত্রের সঙ্গে গাহিও না। তাহা হইলে তোমার গলা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইংরাজি সঙ্গীতের ও আমাদের সঙ্গীতের প্রাণ বিভিন্ন। আমাদের মূর্চ্ছনা প্রভৃতি ইংরাজি সঙ্গীতে নাই।" তাহার পর তিনি তাহার মস্তকে হস্ত দিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্তও লোকের পর লোক পাঠাইতে লাগিলেন যে, তিনিও নির্ম্মলের মুখে এই গানটি শুনিবেন। ইহাঁর সঙ্গে আমার প্রথম যৌবনে একবার মাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। যাহা হউক, নির্ম্মলকে লইয়া আমি তাঁহার কাছে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে গেলাম। তিনি নির্ম্মলকে আপদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি একটি হারমোনিয়াম ফ্লুট আনাইয়া রাখিয়াছিলেন। নির্ম্মল বাজাইয়া গাহিতে লাগিল। তিনি ও অন্যান্য উপস্থিত ভদ্রলোকেরা স্তম্ভিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। মহারাজের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। গান শেষ হইলে ইহাঁরা সকলেও গানের ও গায়কের খুব প্রশংসা করিলেন। মহারাজ গানটি আর একবার শুনিলেন। তিনি নির্ম্মলকে যেন বড় সস্নেহ চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাহার সুন্দর, নম্র, অমায়িক মূর্ত্তি ও ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন বলিলেন। তাহার পর অনেক আলাপ হইল। উঠিয়া আসিবার সময়ে তিনি নির্ম্মলকে ডাকিয়া কক্ষের এক কোণায় লইয়া কি বলিয়া বিদায় দিলেন। আমি তখন অন্য ভদ্রলোকদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলাম। বাটী হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িলে নির্ম্মল আমাকে বলিল,—"বাবা! ইনিও দেবতুল্য লোক। ইনি আমাকে কি বলিলেন জান? তিনি ত আমার বিলাতে সমস্ত খরচ দিতে স্বীকার করিলেন। বলিলেন—"বিলাতে তোমার যাহা কিছুর আবশ্যক হয়, আমার কাছে লিখিও। তোমার বাবার কাছে চাহিও না।" মহারাজার এই দয়ায় তাহার শিশু হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তাহার দুই চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। আমি বলিলাম,—"আমি জীবিত থাকিতে, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, কেন পরের মুখাপেক্ষী হইবে? আমি যদি মরি, তবে মহারাজার সাহায্য গ্রহণ করিও এবং তাঁহাকে পিতৃবৎ জ্ঞান করিও।" তিনি কি স্নেহের চক্ষেই নির্ম্মলকে দেখিয়াছিলেন। যত দিন সে বিলাত না পঁহুছিয়াছিল, প্রতি দিন না কি তাঁহার আশ্রিত একজন ব্যারিষ্টাকে নির্ম্মল কত দূর গেল, জিজ্ঞাসা করিতেন। এরূপ না হইলে একটি কাঙ্গাল ব্রাহ্মণবালক এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী এবং খ্যাত্যাপন্ন হইবে কেন?

সর্ব্বশেষে মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি যেরূপ নিষ্টাবান্ হিন্দু, আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি নির্ম্মলের বিলাত যাওয়া অনুমোদন করিবেন না। আমি বলিলাম,—"আপনি বোধ হয়, শুনিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন, নির্ম্মল এই 'মেলে' বিলাত যাইতেছে।" তিনি বলিলেন,—"ভর্ৎসনা করিব কেন? এখানের শিক্ষা অপেক্ষা সেখানের শিক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতীয়তঃ, এখানের বি. এল. অপেক্ষা সেখানকার ব্যারিষ্টারের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী। তৃতীয়তঃ, এতগুলি দেশ যে দেখিয়া যাইবে, ইহাও একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষা। তবে বলিতে পারেন যে, সামাজিক বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু আমি যত দূর এ অঞ্চলের পণ্ডিতদের অভিপ্রায় জানি, ইহাঁরা এখন হইতে আর কোনও আপত্তি করিবেন না। ইহাঁরা এখন বুঝিয়াছেন যে, দেশে কে না ম্লেচ্ছান্ন খাইতেছে। বিলাতে গিয়া খাইলে আর বিশেষ অপরাধ কি? বরং দায়ে ঠেকিয়া খাইতে হয়। অতএব এখন এ অঞ্চলের অনেক বিলাতফেরত আপনার পরিবারমধ্যে বাস করিতেছে।" তাহার পর নির্ম্মলকে বলিলেন,—"বিলাত বড় প্রলোভনের স্থান। তুমি যে কার্য্য সাধনের জন্য যাইতেছ, তাহা সাধন করিয়া, তোমার নির্ম্মল চরিত্র লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আর পূর্ব্বে ইংলিশ বারের পরীক্ষা নাম মাত্র ছিল। কিন্তু এখন উহা কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। অতএব তুমি সকল বিষয়ের পরীক্ষা একসঙ্গে না দিয়া, স্বতন্ত্র ভাবে দিও।" এই উপদেশে নির্ম্মলের বড় উপকার হইয়াছিল।

তাহার যাত্রার পূর্ব্বদিন, যে কন্যাটির সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, সে স্কুল হইতে আমাদের বাড়ীতে আসিল। সে ইহার পূর্ব্বে একদিন নির্ম্মলকে তাহার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। নির্ম্মল বলিয়াছিল, তাহার পিতামাতার কোনও দোষ নাই। বালিকার পিতামাতা বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্ব্বে বিবাহ দিবেন না বলিয়া জবাব দিয়াছিলেন। তখন বালিকা বলিয়াছিল, তাহার পিতামাতাই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আজ সে দ্বিতলের এক গবাক্ষে দাঁড়াইয়াছে এবং গবাক্ষের কাষ্ঠ বাহিয়া তাহার অশ্রুধারা নিম্নতলের প্রাঙ্গণে পড়িতেছে। দেখিয়া আমি ও পত্নী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া বলিলাম—"মা! তুই রাজরাণী হইবি। আমরা দরিদ্রের কি আছে? তুমি কোনও দুঃখ করিও না। তুমি নির্ম্মলকে এখন হইতে সহোদরের মত দেখিও।" আমি ও নির্ম্মল কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলাম। স্ত্রী তাহাকে হারমোনিয়াম লইয়া গান করিতে বলিলেন। সে বউয়ের দিকে সজলনেত্রে চাহিয়া গাহিল,—

গীত

"তার সনে দেখা হ'লে, আমার কথা ব'ল ব'ল।
যে তাহারে ভালবাসে তারে কি কাঁদান ভাল।"

আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই দৃশ্যটি যৌবন-বিবাহ-পক্ষপাতী অন্ধ সমাজ-সংস্কারককে উপহার দিলাম।

পরদিন কাশী হইতে আমার বন্ধু উমাচরণবাবুর দ্বারা প্রেরিত নির্ম্মলের জন্য বিশ্বেশ্বরের আশীর্ব্বাদ আসিল, এবং বন্ধুবর নটকুলতিলক অমৃতলাল বসু রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিযুক্ত একটি রজতপদক নির্ম্মলকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ সহ উপহার দিয়া, বিলাতে উহা তাহার চক্ষের সম্মুখে রাখিতে উপদেশ দিলেন। সন্ধ্যার পর হাওড়া ষ্টেশনে সকলেই অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গেলাম। স্ত্রী ও পুত্রবধূ গাড়ীতে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি পুত্রকে লইয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিলাম। সে দিন হাইকোর্ট পূজার জন্য বন্ধ হইয়াছে। ষ্টেশন ইংরাজে পরিপূর্ণ। মিঃ এ. চৌধুরীর ভ্রাতা মিঃ জে. চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি ষ্টেশনে পুত্রকে ব্যারিষ্টার মিঃ উড্রফের পুত্রের সঙ্গে, এবং জষ্টিশ হেণ্ডার্সনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। নির্ম্মল যে কক্ষে যাইবে, সে কক্ষের অন্য আসনে আর একজন মিলিটারি বিভাগের সেনাপতি কর্ণেলের নাম লেখা রহিয়াছে। ঠিক ট্রেন খুলিবার সময়ে তিনি আসিয়া পঁহুছিলেন। মিলিটারিতে ষ্টেশন ভরিয়া গেল। নির্ম্মলকে পথে দেখিতে, যোগেশ তাঁহাকে বিলাতি ধরনে বলিলেন। তিনিও বিলাতি ধরনে সায় দিলেন। আমি তখন অগ্রসর হইয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে আমার একমাত্র সন্তান বলিয়া, নির্ম্মলকে তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলাম। ইহাতে তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি বলিলেন,—"Poor man! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। আমি সমস্ত পথ বালককে দেখিব, এবং লণ্ডনে তাহার গৃহে পঁহুছাইয়া দিব।" আমি ধন্যবাদ দিতে না দিতে, পুত্রের মাথা গবাক্ষপথে আমার বুকে থাকিতে 'ইংলিশ মেল' খুলিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম। এক হাত যোগেশ ও অন্য হাত আমার বন্ধু হাইকোর্টের উকিল সিরাজল ইসলাম ধরিলেন। এত ক্ষণ পুত্র কাতর হইবে বলিয়া হৃদয় পাথর দিয়া চাপিয়া, রোদন সম্বরণ করিয়াছিলাম। আর পারিলাম না। হা ভগবান্! আমার একমাত্র সন্তান, যে একদিনও আমাদের চক্ষের অন্তর হয় নাই, যে শিশু আমাকে ছাড়া গৃহের বাহিরে যায় নাই, আজ সে বাইশ বৎসর বয়সে কোথায় চলিল! পিতামাতার কর্ত্তব্য কি গুরুতর! আমি দুই বন্ধুর বুকে মাথা

রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহারা এই অবস্থায় আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। সেখানে স্ত্রী ও বালিকা বধূ কাটা মাছের মত ছট্‌ফট করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছিল। হাওড়ার সেতু পার হইবার সময়ে পিতামাতার এবং বালিকা পত্নীর পবিত্র অশ্রুধারা ভাগীরথীর পবিত্র গর্ভে ঝরিল। গৃহে ফিরিয়া সমস্ত রাত্রি এই হাহাকারে কাটাইয়া, প্রাতে কুমিল্লা রওনা হইলাম। পুত্রবিধুর পিতামাতার ও পতিবিধুর বালিকা পত্নীর অশ্রু আবার ধারায় সমস্ত দিন ষ্টীমারের কাষ্ঠ বাহিয়া ঝরিয়া পদ্মার স্রোতোবেগে ভাসিয়া গেল। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তিনজন কুমিল্লার শূন্য গৃহে পঁহুছিয়াই বম্বে টেলিগ্রাম করিলাম—"Our blessings and love. Heart within and God overhead". তাহার পর একখানি পত্র লিখিলাম। সেই পিতা পুত্রের অশ্রুসিক্ত পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

কুমিল্লা

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯০০।

"বাবা আমার!

দশরথ রাজার চার পুত্র ছিল। একমাত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছিলেন। সে বনবাসও ভারতবর্ষে। তথাপি দশরথ মরিয়াছিলেন আমি আমার একমাত্র দেবশিশুসম সন্তানকে এই দূর দেশে, এই নির্ব্বাসনে পাঠাইয়াছি। তথাপি আমি বাঁচিয়া আছি। আমার মত পাষাণ কে আছে?

ট্রেন খুলিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিলাম। যোগেশ ও সিরাজুল ইসলাম ধরিল। গাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিল। তাহার পর আমার পাষাণ হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া গেল, গলিয়া গেল। চপলা এ পর্য্যন্ত যে হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আমাদের এত সাহস ও সান্ত্বনা দিতেছিল, বুদ্ধিমতী মেয়ের সকলই অভিনয়। হাওড়া হইতে বাড়ী পর্য্যন্ত সে এরূপ গলা ছাড়িয়া কাঁদিতেছিল ও ছট্‌ফট্ করিতেছিল যে, আমার অশ্রু আমার চক্ষে শুকাইয়া গিয়াছিল। আমি পাষাণ, এ দৃশ্য কোনও পিতা এরূপ পাষাণবৎ সহ্য করিতে পারিত না।

রাত্রিতে কেহ নিদ্রা যাই নাই। সমস্ত রাত্রি সেই তড়িৎগতি গাড়ীর গবাক্ষে জ্যোৎস্না-লোকে তোমার মুখখানি দেখিয়াছি, এবং 'বাবা! বাবা!' ডাকিয়াছি।। তুমি শুনিয়াছিলে কি?

শনিবার শেষ রাত্রিতে আমরা নির্ম্মলশূন্য গৃহে আসি। আমাদের তিন দিন কাটিয়াছে। তিন বৎসরের তিন দিন কাটিয়াছে। তিন বৎসরে এরূপ কত ভীষণ তিন দিন আছে! এ তিন দিন কাটিয়াছে, সে সকল তিন দিনও কাটিবে। তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করিও না। তোমাকে না দেখিয়া আমরা মরিতে পারিব না।

বম্বে আমার দুই টেলিগ্রাম পাইয়াছিলে কি? আমার চুম্বন পাইয়াছিলে কি? ট্রেন খুলিবার সময়ে আমি পাষাণ যে চুম্বন করিতেও ভুলিয়াছিলাম! একটি কথাও যে কহিতে পারি নাই।

এ কয় দিন যেন আরব-সাগরে অর্ণবযান দুলিতেছে দেখিতেছি। না জানি, কি কষ্টই পাইতেছ।"

বম্বে হইতে পুত্রের টেলিগ্রাম পাইলাম। যথাসময়ে এডেন হইতে পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে,—"তোমার কেবল একমাত্র সন্তান নহে, তোমার বাইশ বৎসরের বন্ধু তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছে। আমার কেবল পিতা নহে, আমার বাইশ বৎসরের একমাত্র বন্ধুকে আমি ছাড়িয়া যাইতেছি।"

পুত্র বিলাতে

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর পুত্রের নির্ব্বিঘ্নে বিলাত পঁহুছিবার টেলিগ্রাম পাইলাম। যে শিশু কখনও ঘরের বাহিরে যায় নাই, সে মারসেলজ পথে সমস্ত ফ্রান্স একাকী পার হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছে! সেই 'কর্ণেল' সমস্ত পথে তাহাকে আপন পুত্রের মত যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। তিনি প্যারিসে নামিয়াছিলেন। নির্ম্মলকে তাঁহার সঙ্গে প্যারিস দেখিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু ষ্টীমারে নির্ম্মলের এক বাঙ্গালী সহযাত্রী জুটিয়াছিলেন। তিনি এরূপ ভীরু যে, নির্ম্মলচন্দ্র তাঁহার অভিভাবক হইয়াছিলেন! নির্ম্মল প্যারিসে, নামিলে তিনি একা কিরূপে বাকী পথ যাইবেন, এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাজেই নির্ম্মল কর্ণেলের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। মারসেলেজে তাহাকে সঙ্গে করিয়া তিনি সমস্ত নগর দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহাকে হোটেলে আপন ব্যয়ে খাওয়াইয়াছিলেন। এরূপ ইংরাজকে দেবতার মত পূজা করিতে ইচ্ছা করে। জষ্টিস হেণ্ডার্সন এবং যুবক উড্রফও সমস্ত পথ নির্ম্মলের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। লণ্ডনে পঁহুছিবার পর একজন বন্ধু লিখিলেন,—

"I was expecting Nirmal on the 30th Ultimo (Septr) in London, while he surprised us all by arriving a week earlier than the stated time. He showed great enterprise by landing at Marseilles and shooting across France by himself. It is a very creditable performance for a young boy who has been brought up as Nirmal has been.

Nirmal is such a sweet affectionate boy that nobody can help loving him. ... I am sure he will give a gool account of himself while he is here, and when he goes back home, he will go as a worthy son of the illustrious father of whom his country is proud."

শ্রীভগবানের কি অনন্ত কৃপা! ইংলণ্ডে পঁহুছিবা মাত্র নির্ম্মল আমার দেবলোকবাসী পিতামাতার পুণ্যে আর একজন দেবতুল্য লোকের আশ্রয় প্রাপ্ত হইল। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন। কলিকাতায় তিনি 'নন্দীবাবু' বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত এবং পূজিত। তিনি কুচবেহার রাজ্যের একজন জজ। তিনি এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। তাঁহার আর অধিক পরিচয় না দিয়া, তাঁহার প্রথম পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

লণ্ডন
২৪শে কার্ত্তিক, ১৮২২ শকাব্দা।

সসম্মান নিবেদন।

মহাশয়ের নিকট আমি অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অদৃষ্টপূর্ব্ব। আপনি অদৃষ্টপূর্ব্ব হইলেও আমার নিকট অপরিজ্ঞাত নহেন। কেন না, আপনি বঙ্গদেশের সাধারণ সম্পত্তি ও আমি বাঙ্গালী। আমি অপরিচিত হইয়াও পরিচিতের ন্যায় আজ আপনাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি। আপনার নির্ম্মলের প্রবাস-বন্ধু বলিয়া এইপ্রকার অধিকার স্থাপনা করিলাম। নির্ম্মল এখন আমার সহিত এক গৃহে বাস করিতেছে। তাহার কক্ষটি আমার কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী। মধ্যের ব্যবধানে একটি দ্বার আছে। নির্ম্মল প্রায়ই আমার কক্ষে বসিয়া লেখাপড়া করে। আমি তাহার স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত প্রবাসের অভিভাবকস্বরূপ।

আমি বয়সে বৃদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বয়সে যত বৃদ্ধ হই বা না হই, রোগে কিছু বর্ষানুচিত বার্দ্ধক্যগ্রস্ত। বালকের পক্ষে বৃদ্ধের সান্নিধ্য সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু এ দেশে আপনার নির্ম্মলের মত শিশুস্বভাববিশিষ্ট বালকের কিছুদিন বৃদ্ধের সহিত একত্রে থাকিলে কোন হানি না হইলেও হইতে পারে, এই জ্ঞানে আমি আপত্তি করি নাই।

যে বাটীতে থাকি, সেটি একটি ভাল Boarding House। এখানে যাহারা থাকে, তাহারা সকলেই ভদ্রলোক। বিদেশী Americanও এখানে প্রায় আসে। বাটীতে দুটি ডাক্তার Boarder আছে। সম্মুখে একটা বাগান আছে। তাহার জন্য এ স্থানটির নাম Endsleigh Gardens। নির্ম্মল ও আমার উভয়ের ঘর হইতে বাগানটি দেখিতে পাওয়া যায়। আমি যখন এ বাটীতে থাকিতে আসি, তখন আমার একজন শ্রদ্ধেয় ইংরাজ বন্ধু এই স্থানে থাকিতে পরামর্শ দেন। Landlady ভদ্রমহিলাও শিক্ষিতা ও প্রবীণা। যাহা খাইতে দেন, তাহা প্রচুর ও স্বাস্থ্যকর। নির্ম্মল আহারের বন্দোবস্ত দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছে। বলে, অন্যত্র এরূপ আহারের সুবিধা নাই। Boarding House-এর কতকগুলি অসুবিধাও আছে। ইহাতে নিজের স্বানুবর্ত্তিতা চলে না। সাধারণ খাইবার সময়ে ইচ্ছা না থাকিলেও খাইতে হয়। সময়ে আসিয়া না জুটিলে Restaurantএ গিয়া খাইতে হয়। সাধারণ Drawing Roomএ বন্ধুবান্ধব আসিলে একাকী তাহাদিগকে receive করার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

এ বাটীর আর একটি সুবিধা আছে। স্নানের ঘরটি সুন্দর। সর্ব্বদাই গরম জল পাওয়া যায়। আর আমাদিগের ঘরের নিকট।

একটি অসুবিধা যে, এখান হইতে Innটি নিকটে নহে। হাঁটিয়া গেলে পঁচিশ মিনিট লাগে। নিকট দিয়া *Bus* যায়। হাঁটিতে না পারিলে *Bus*এ করিয়া বরাবর Inn অবধি যাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু 'বাসে' করিয়া যাইতে হইলে দু পেন্স অর্থাৎ দুই আনা করিয়া ভাড়া দিতে হয়।

নির্ম্মল Gray's Inn join করিয়াছে। Gray's Inn অন্যান্য Inn অপেক্ষা দরিদ্র। কিন্তু এই Innএ অনেক বৃত্তি। আর খরচ মোটের উপর ত্রিশ পাউণ্ড কম। আমি Lincoln's Inn-এ যাইতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে সম্মত হইল না। Lincoln's Inn-এ যে Common room অর্থাৎ যেখানে Students বিশ্রাম করে, সে ঘরটা শুনি, খুব সুন্দর ও প্রশস্ত ও সুসজ্জিত। নির্ম্মলের Gray's Inn join করিবার কারণ, প্রথমতঃ আমি Gray's Inn-এর Member। দ্বিতীয়তঃ এই Inn-এ অনেক বাঙ্গালী আছে। আমি একজন শিক্ষকের নিকট পড়াশুনা করিতে উপদেশ দিয়াছি। নির্ম্মলের ইচ্ছা যে, আমার নিকট পড়ে। আমি নিজে পড়াইবার জন্য উপযুক্ত নহি। পারদর্শী নহিলে অধ্যাপনা উচিত নহে। সে জন্য যাহারা এই কার্য্য করে, তাহাদের একজনের কাছে শিখিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছি। নির্ম্মলের ইচ্ছা যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে Roman Law বিষয়ে পরীক্ষা দেয়। সময় কিছু অল্প। এত শীঘ্র পরীক্ষা দেওয়া উচিত নয় বলিয়া মনে হয়। নির্ম্মল বেশ পড়িতেছে। এরূপ পড়িলে কৃতকার্য্য হইবে। প্রস্তুত না হইলে পরীক্ষা দিতে দিব না। অকৃতকার্য্য হইলে এককালে ভগ্নোদ্যম হইবে। আগামী March মাসে যে পরীক্ষা হইবে, তাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবে। কিন্তু যাহাতে ডিসেম্বরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, সেই ভাবে পড়িবার জন্য উপদেশ দিয়াছি।

আমি নিজে আগামী January মাসে ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব। আবার পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিব; কিন্তু কবে করিব, তাহা জানি না। আমি চলিয়া গেলে নির্ম্মল

নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িবে মনে করে। ভরসা, আর দুই তিন মাস থাকিলে আপনি নিজেই সব কাজ চালাইয়া লইতে পারিবে।

আপনার নির্ম্মল বাস্তবিকই বড় সুবোধ ও শিষ্টস্বভাববিশিষ্ট। তাহার চরিত্র বালকের মত নির্ম্মল ও উদার। কিন্তু নিতান্ত সরল ও অনভিজ্ঞ। এ দেশে উন্নতির সোপান অনন্তপ্রসারী, অবনতির পথও তদ্রূপ। বাধা, বিঘ্ন ও প্রলোভনও প্রচুর। ধর্ম্মবন্ধন যত দিন শিথিল না হয়, বাধা বিঘ্নে কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু যে দিন সেই বন্ধন শিথিল হইবে, শত অভিভাবকেও রক্ষা করিতে পারিবে না। আশীর্ব্বাদ করি, যেন আপনার নির্ম্মল নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্কভাবে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

নিঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন।

একজন অপরিচিতের পুত্রের প্রতি ইংলণ্ডের মত সুদূর দেশে এরূপ দয়া কি মানুষের? ইহাঁর দ্বিতীয় পত্রখানি এরূপ—

LONDON,
30.XI.00

MY DEAR MR. SEN,

Nirmal has made over to me your kind letter of the 8th current. I am indeed so glad that, the chance or accident which was brought your boy and myself together, has also given me the pleasure and privilege of knowing one of my distinguished and illustrious countrymen from a closer point of view than is ordinarily permitted to the rank and file to which I belong. You have said such nice things of me that, had I possessed a larger share of egotism and vanity and a craving for compliment than I flatter myself I do, I would have found in the matter enough for gratification. I don't know whom I am to be more thankful to—my kind partial friends who have given me a character, or you who have not known me and yet have believed all that has been said. How I wish I deserved it all! I trust that an acquaintance sprung up under these circmstances will afford me large opportunities in future of knowing you yet more closely.

I have known your boy for the last seven weeks, four of which he has spent with me, sharing practically the same room. I have had ample opportunities for forming my own estimate of his character, and I am glad to be able to say that he is all that a fond father can desire. He is gentle, guiltless, unaffected and dutiful. His moral bearing is irreproachable. But he is too green and inexperienced in the ways of the world, and so require some amount of protective care and unobtrusive guidance. I say 'unobtrusive' advisedly, for I have a morbid horror of assertive domination (by crusty age) of receptive and impressionable youths crushing all individuality and checking spontaneous and natural growth. I don't believe in surveillance. There is no safe-guard more effective than a virtuous

নাটক ও বিবিধ রচনা

নৈদাঘ-নিশীথ-স্বপ্ন

(মহাকবি সেক্সপিয়ারের A Midsummer Night's Dream অবলম্বনে)

(নাটক)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

সুরেশ্বর	...	...	...	বৈজয়ন্তী নগরের রাজা
অজয়	...	...	...	প্রমদার পিতা, রাজ-অমাত্য
বিনোদবিহারী				প্রমদার প্রণয়াথী
বিপিনবিহারী	...	...	...	এবং বালসহচর
ফুলেশ্বর	...	...	...	প্রিয় বয়স্য
কানাই	...	...	...	সূত্রধার
রামা	...	...	...	স্বর্ণকার
পদা	...	...	...	তন্তুবায়
ছিরে	...	...	...	কর্ম্মকার
তিনু	...	...	...	কাঁসারী
পাঁচু	...	...	...	দর্জ্জী
হেমলতা	...	...	...	ভাবী রাণী
প্রমদা	...	...	...	অজয়ের কন্যা, বিনোদানুরক্তা
মানদা	...	...	...	বিপিনের অনুরক্তা, প্রমদার সখি, অন্য অমাত্য-কন্যা
অনঙ্গ	...	...	...	পরীদিগের রাজা
ত্রিতারা	...	...	...	পরীদিগের রাণী
পঞ্চু বা পাঁচু	...	...	...	পরীদিগের বিদূষক,

বেলফুল, বকফুল, বকুলফুল, বেগুনফুল, পরীবর্গ অনুচরবর্গ ইত্যাদি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৈজয়ন্তীনগর—রাজবাটী

(সুরেশ্বর, হেমলতা, ফুলেশ্বর এবং পরিচারকবর্গের প্রবেশ)

সুরেশ্বর। দেখ প্রিয়ে হেমলতে! শুভ-বিভাবরী
আসিয়াছে বিজলীবেগে; চারি দিন আর,
উদিবে নবীনচন্দ্র, চারি দিন আর,
তবু মনে হয়—কত ধীরে ধীরে যেন
হইতেছে কলাহীন ওই ক্ষীণ-শশী।
বিলম্বে বাসনা প্রিয়ে, বাড়িছে কেবল।

হেমলতা। চারি দিন, প্রিয়তমে, নিবিবে সহসা
নিশি কোলে; চারি নিশি পোহাবে স্বপনে,
তখন দেখিবে শশী—রজতের ধনু
নব-নব, আমাদের বিবাহ-বিলাসে।

সুরেশ্বর। যাও ফুলেশ্বর!
ভাসাও গে রাজধানী আমোদ-সাগরে;
জাগাও গে আনন্দের মৃদুল লহরী,
বিষাদে পাঠাও বনে, অথবা শ্মশানে,
যেন কালছায়া তার না দেখি নয়নে!

[ফুলেশ্বরের প্রস্থান]

হেমলতে, বীরবেগে সকৃপাণ করে,
লভিয়াছিলাম আমি তোমার তোমার প্রণয়,
কিন্তু তব পরিণয়, বিলাসীর বেশে
লভিব, কুসুম-দামে, আনন্দ-উৎসবে।
(অজয়, প্রমদা, বিনোদ এবং বিপিনের প্রবেশ।)

অজ। সুকৃতি সুরেশ্বর দীর্ঘজীবী হউন।

সুরে। মহাত্মা অজয়ের সম্ভাষণে প্রীত হইলাম। নূতন সংবাদ কি?

অজ। মাথামুণ্ডু! কালের বিচিত্র গতি! আমার কন্যা প্রমদার বিরুদ্ধে রাজসমক্ষে অভিযোগ করিতে আসিলাম। বিপিন! মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াও। মহারাজ! আমি ইহার সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই। বিনোদ! অগ্রসর হও। মহারাজ! এই দুরাচার আমার কন্যাকে কি মোহিনী করিয়াছে!

দিয়াছে গলার তার কবিতার মালা;
করিয়াছে বিনিময় প্রেম-নিদর্শন;
সচন্দ্র-নিশীথে মুক্ত গবাক্ষে তাহার
ক'রেছে কৃত্রিম-কণ্ঠে কৃত্রিমতাময়
প্রেমের সঙ্গীত,—হায়! কল্পনা তাহার
ক'রেছে অঙ্কিত চারু সুকেশ-বলয়ে,
কোমল-কুসুম-দামে,—প্রবঞ্চনা-জালে
হরিয়াছে বালিকার কোমল-হৃদয়।

তাহাতে কন্যা আমার অবাধ্য হইয়াছে। মহারাজ! যদি প্রমদা বিপিনের সঙ্গে বিবাহে সম্মত হয়, ভাল, না হয় রাজ্যের চিরপ্রসিদ্ধ প্রথা-অনুসারে কন্যা বলক্রমে বিপিনকে কিম্বা শমনকে প্রদান করিবার রাজাজ্ঞা হউক।

সুরে। প্রমদে! তুমি কি বল? তোমার পিতার আদেশ প্রতিপালন করা উচিত; তোমার পক্ষে তোমার পিতা দেবতা এবং তোমার সৌন্দর্য্যদাতা। তুমি তাঁহার কাছে একটি মোমের পুতুলবিশেষ; তিনি তোমাকে গড়িয়াছেন, তিনি তোমাকে ভাঙিতেও পারেন। বিশেষতঃ বিপিন একজন যোগ্য পাত্র।

প্রম। বিনোদও তেমনি যোগ্য পাত্র!

সুরে। বিনোদ নিজে যোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন তোমার পিতার অভিমত পাইতে পার নাই, তখন বিপিনকেই যোগ্যতর মনে করিতে হইবে।

প্রম। পিতা যদি আমার চক্ষে দেখিতেন—

সুরে। বরং তোমার চক্ষু তাঁহার অভিমত মতে দেখা উচিত।

প্রম। মহারাজ! ক্ষমা করিবেন। আমি জানি না, আমি কি প্রকারে এত প্রগল্‌ভা হইলাম। আমি জানি না, মহারাজের সমক্ষে আমার মনের ভাব খুলিয়া বলা আমার পক্ষে কতদূর শীলতা-সঙ্গত। কিন্তু আমি মহারাজের কাছে জানিতে চাহি, আমি বিপিনের সঙ্গে বিবাহে অসম্মত হইলে আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অমঙ্গল কি হইতে পারে?

সুরে। মৃত্যু কিম্বা তপোবন। অতএব, প্রমদে! তোমার মন পরীক্ষা করিয়া দেখ। তোমার পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তপস্বিনীবেশে আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় শীতল নির্ম্মল চন্দ্রের দিকে চাহিয়া উপাসনা-গীত গাহিয়া গাহিয়া তোমার মরুপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে।

সাধু, যারা উপেক্ষিয়া শোণিত-প্রবাহ,
এরূপে সাজিতে পারে যৌবনে-যোগিনী,
কিন্তু ধরাতলে ধন্য সেই সুকুসুম
নির্জ্জনে নবীন বৃন্তে না ফুটি, না ঝরি,
সুগন্ধে মোহিত করে মানবের মন।

প্রম। তেমতি ফুটিব আমি, তেমতি ঝরিব,
নরনাথ! তবু নাহি সমর্পিব আমি,
প্রাণ নাহি চায়ে যারে, প্রণয় আমার।

সুরে। সময় লও; আগামী অমাবস্যা দিন, যেদিন, আমি আমার প্রণয়িনীর সহিত চিরপ্রেমপাশে বদ্ধ হইব, সেইদিন তোমার পিতার আজ্ঞার অবাধ্যতার জন্য হয় ত মরিতে কিম্বা তাঁহার ইচ্ছানুসারে বিপিনকে বিবাহ করিতে অথবা করালিনীর মন্দিরে চির-তপস্যাব্রত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আসিও।

বিপি। প্রমদে! এখনও ভাবিয়া দেখ। বিনোদ! তোমার অমূলক বিবাহ-সাধ পরিত্যাগ কর।

বিনো। বিপিন, তুমি প্রমদার পিতার ভালবাসা পাইয়াছ, তাহাতেই সুখী হও; প্রমদার ভালবাসা পাইলেই আমার যথেষ্ট।

অজ। নরাধম! উপহাস করিতেছ। সত্য বিপিন আমার ভালবাসা পাইয়াছে। অতএব, যাহা আমার, আমার ভালবাসা তাহাকে, তাহা অর্পণ করিবে। প্রমদা আমার, অতএব প্রমদাতে আমার যে অধিকার আছে, আমি তাহাকে প্রদান করিলাম।

বিনো। অর্থে, কি বংশ-মর্য্যাদায়, আমি কোন অংশে বিপিনের ন্যূন নহি। আমার প্রণয় অসীম। কিন্তু এ সকল অহঙ্কার তুচ্ছ, যখন প্রমদা আমাকে ভালবাসে। তবে আমি কেন তাহার আশা ত্যাগ করিব? আমি বিপিনের মুখের উপর বলিতেছি যে, সে নন্দের

কন্যা মানদাকে ভালবাসিত এবং তাহার মনোহরণ করিয়াছিল। সেই সরলা কন্যা, এই কলুষিত লম্পটকে এখনও দেবতার ন্যায় উপাসনা করে।

সুরে। এরূপ বাক্‌বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই। প্রমদে! তুমি তোমার কন্যাকে তোমার পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী করিতে চেষ্টা কর। এই দেশের রাজনীতি অনুসারে চলিতে আমি এক চুলও অন্যথা করিব না। মরিতে অথবা তপোবনে প্রবেশ করিতে প্রস্তুত হও। অজয় এবং বিপিন, আমাদের সঙ্গে আইস; আমাদের শুভবিবাহ-সম্বন্ধে কোন বিশেষ কার্য্যে তোমাদিগকে নিযুক্ত করিব।

অজ। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রমদা এবং বিনোদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

বিনো। কেন প্রিয়তমে তব কপোল মলিন—
সহসা গোলাপ কেন হতেছে বিলীন?

প্রম। সলিল বিহনে বুঝি শুকাইয়া যায়;—
এখনি করিব সিক্ত নয়ন ধারায়!

বিনো। একি পরিতাপ! প্রিয়ে বুঝিতে না পারি,
ইতিহাসে, উপন্যাসে অথবা জীবনে—
যথা দেখি, যথা শুনি, যথা পড়ি, প্রাণ,
প্রকৃত প্রেমের স্রোত বহে না সমান।
হয় ত বিভিন্ন রক্ত—বংশ প্রতিকূল—

প্রম। উচ্চে নীচে প্রেম, হায়! বিধাতার ভুল।

বিনো। হয় ত বয়সদোষে অপাত্রে পতিত,—

প্রম। কি ঘৃণা! প্রাচীন প্রেম নবীন সহিত?

বিনো। কিম্বা—প্রেমনির্ব্বাচক বন্ধুর নয়ন—

প্রম। নরক! পরের চক্ষে প্রেম নির্ব্বাচন!

বিনো। সমানে সমানে কিম্বা প্রেম বিনিময়
হ'ল যদি; মৃত্যু, পীড়া, বিগ্রহ অকালে
করিবে ছায়ায়, কিম্বা স্বপ্নে পরিণত।
মেঘাচ্ছন্ন অমানিশি-বিদ্যুতের মত,
মুহূর্ত্তে ঝলসি যাহা পৃথিবী গগন,
না দেখিতে অন্ধকারে লুকায় বদন!

প্রম। প্রেমের কণ্টক যদি বিধাতার লিপি,
তবে কেন, প্রিয়তমে হইবে অধীর?
নিশ্বাস, স্বপন, চিন্তা, অশ্রুর মতন;
জানিলাম এ কণ্টক প্রেম-সহচর।

বিনো। শুন প্রমদা, এক উত্তম উপায় আছে। আমার একজন সম্পত্তিশালিনী, অপুত্রা, বিধবা পিষী এখান হইতে কিছু দূরে বাস করেন। তিনি আমাকে আপন সন্তানের মত স্নেহ করিয়া থাকেন। সেই স্থানটি এই রাজ্যের বহির্ভূত। প্রমদা, তুমি যদি সেখানে যাইতে সম্মত হও, তবে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে পারি। যদি আমার প্রতি আন্তরিক প্রণয় থাকে, তুমি কাল রাত্রে তোমার পিত্রালয় হইতে গোপনে বাহির হইয়া যাইবে। নগরের অনতিদূরে বনের মধ্যে যেখানে বসন্তোৎসব উপলক্ষে একদিন প্রভাতে তোমার এবং মানদার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি সেখানে তোমার প্রতীক্ষা করিব।

প্রম। প্রাণের বিনোদ, আমি অনঙ্গ-আয়ুধে,
কিম্বা সেই স্বর্ণচূড় তীক্ষ্ণতম বাণে,

কিম্বা যে অনলে জ্বলি, অনঙ্গমোহিনী,
পুড়িল অনঙ্গ যবে হর নেত্রানলে,
দ্রবিল নয়নজলে পাদপ, পাষাণ—
করিনু প্রতিজ্ঞা—কাল তোমার সহিত
নিশ্চয় সংকেত স্থানে হইব মিলিত।

বিনো। প্রতিজ্ঞা যেন মনে থাকে, প্রাণ! দেখ মানদা আসছে।

(মানদার প্রবেশ।)

প্রম। ভাল আছ, মানদা? কোন্ সৌন্দর্য্যে মোহিত করিয়া আসিলে?

মান। সৌন্দর্য্য আমার! কেন কর প্রবঞ্চনা?
তোমার সৌন্দর্য্যে কেন মোহিত বিপিন?
তব নেত্র ধ্রুবতারা; প্রভাত কাকলি
কৃষকের কাণে কত মধুরতাময়!
তা হ'তে মধুরতর প্রমদা তোমার
বচন-সঙ্গীত; বড় সাধ মনে—শিখি
তব সুমধুর স্বর, নয়ন-সন্ধান,
সপ্রেম কটাক্ষ;—যদি সসগরা ধরা।
হইত আমার, আমি রাখিয়া বিপিনে
দিতাম সমস্ত ধরা তোমায়, সুন্দরি।
তোমার সৌন্দর্য্যে দেহ হলে পরিণত।
শিখাও—কেমনে তুমি চাহ, সুভাগিনি!
শিখাও—কি ইন্দ্রজালে বিপিনের মন
করিয়াছ আজ্ঞাহীন; শিখিব এখন।

প্রম। আমি তাহার প্রতি মুখভঙ্গি করি, তথাপি সে আমাকে ভালবাসে।

মান। আমার হাসিতেও যদি আমি সে মুখভঙ্গির কৌশল শিখিতে পারিতাম।

প্রম। আমি তাহাকে তিরস্কার করি, তথাপি সে আমাকে ভালবাসে।

মান। বিধাতঃ! যদি আমি উপাসনার দ্বারাও তাহার সেই ভালবাসা পাইতে পারিতাম।

প্রম। আমি তাহাকে যত ঘৃণা করি, সে তত আমার সঙ্গ লয়।

মান। আমি তাহাকে যত ভালবাসি, সে আমাকে তত ঘৃণা করে!

প্রম। সে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা: মানদা, আমার কি দোষ?

মান। দোষ?—তোমার সৌন্দর্য্য। যদি সেই দোষ আমার হইত।

প্রম। তুমি সুস্থির হও, সে আর আমার মুখ দেখিতে পাইবে না। আমি এবং বিনোদ কল্য এখান হইতে পলায়ন করিব।

যত দিন বিনোদে না করেছি দর্শন,
ছিল এ নগরী যেন স্বর্গের মতন।
না জানি এ প্রেমে কি যে আছে বিদ্যমান,
করিয়াছে স্বর্গ মম নরক সমান।

বিনো। মানদা, মনের কথা বলিব তোমায়,
কালি নিশাকালে যবে শশাঙ্কসুন্দরী
দেখিবে রজত-মুখ সলিল-দর্পণে,
তরল মুকুতাময় করি দূর্ব্বাদল
পালাবে বাসর-ছাড়ি প্রেমিক-যুগল।

প্রম। কাননে যেখানে বোন্‌ তোমায় আমায়
শুইয়াছি কত দিন কুসুম-শয্যায়,
মধু মাখা মনোকথা কহেছি দুজনে,
সেখানে মিলিব আমি বিনোদের সনে।
যবে জন্মভূমি হ'তে ফিরাব নয়ন
অন্বেষিব নব দেশে নব প্রিয়জন।
বিদায়! আমার তুমি খেলার সঙ্গিনী,
কি বলিব, রেখো মনে আমায় ভগিনি,
ঈশ্বর কৃপায় হ'বে বিপিনভামিনী!
বিনোদ, যুগলনেত্র রবে নিরসন,
কালি যতক্ষণে পুনঃ না হবে মিলন।

[প্রস্থান।]

বিনো। বিদায়, মানদা; তুমি বিপিনে যেমন
বাস ভাল, সে তোমায় বাসুক তেমন।

[প্রস্থান।]

মান। পৃথিবীতে কারো অপেক্ষা কেহ কত সুখী! এই নগরীতে আমাকে সকলেই তাহার সমান সুন্দরী বলিয়া প্রশংসা করে, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? বিপিন তেমন মনে করে না; যাহা সে ভিন্ন সকলে জানে, সে তাহা জানিবে না! কি আশ্চর্য্য! সে যতই প্রমদার রূপে মোহিত হইয়া ভুল করিতেছে, আমি ততই তাহার গুণে ভ্রমান্ধ হইতেছি। গুণশূন্য নিকৃষ্ট পদার্থকেও প্রেমে শোভা এবং প্রতিভাসম্পন্ন করিয়া তোলে—

প্রণয় নিরখে মনে, না দেখে নয়নে
মন্মথ-চিত্রিত তাই মুদ্রিত নয়নে।
প্রেমের নাহিক রুচি, নাহিক বিচার;
পক্ষ আছে, চক্ষু নাই,—মূরতি তাহার :
তাই বসে—প্রেম যেন বালক, সরল;
নির্ব্বাচন-শক্তি তার এতই দুর্ব্বল!
দেখিয়াছিল না যবে নেত্র প্রমদার,
বিপিন বলিত,—"আমি একান্ত তোমার",—
কতই প্রতিজ্ঞা যেন শিলা বরিষণ!
প্রমদার রূপপ্রভা লেগেছে এমন,
সে শিলায়, এবে তাহা জলের মতন।

আমি তাহাকে প্রমদার পলায়নের কথা বলিব, তাহা হইলে সে নিশ্চয় কাল রাত্রে তাহার অনুসন্ধানে বনে প্রবেশ করিবে; আর আমি যদি ইহার জন্য শুধু ধন্যবাদটুকু পাই, তাহাও আমার পক্ষে বহুমূল্য। সে বনে যাইবার এবং ফিরিয়া আসিবার সময়ে আমি যে তাহাকে দেখিতে পাইব, তাহাই আমার পক্ষে এই পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বৈজয়ন্তী নগরী—কানাইয়ের বাটী।

(কানাই, রামা, ভুতো, ছিরে, তিনু এবং পাঁচুর প্রবেশ।)

[illegible]। আমাদের দল সব এয়েছে ত?

ভুতো। তুই ফর্দ্দমতে একে একে তাদের ডেকে দেখ্‌ না।

কা। এ যে ফর্দ্দ! সবটিই সহর-বাছা লোক! সকলে বলে যে, রাজার বিয়ে-রাত্রে

থিয়েটার কর্‌বার জন্যে এমন লোক আর পাওয়া যাবে না।

ভূ। কানাই, প্রথম বল, কি নাটক নাচতে হবে। তারপর যারা নাচবে, তাদের নাম পড়িস; তবে সে কথার যুত্‌ হয়।

কা। আমাদের নাটকের নাম (পড়িতে পড়িতে) "শোকাবহ হাস্যান্তক নটন্যাস ইন্দ্রজিত বধ।"

ভূ। বড় মজার বহি। আমি ঠিক বল্‌ছি, ওতে বড় মজা আছে। এখন কানাই, তোর নাচওলাদের ডাক্‌। দাঁড়াও হে, সার করে দাঁড়াও।

কা। আমি যেমন ডাক্‌বো, উতোর করিস। ভূতনাথ তাঁতি।

ভূ। হেঁ্য দে! আমার পাঠ কি বল্‌, তারপর আর নাম করিস্‌।

কা। ভূতো, তুই ইন্দ্রজিত সাজ্‌বি।

ভূ। ইন্দ্রজিত কি ছিলো রে। রসিক না বিক্ষি?

কা। হ্যাঁ রে, রসিক; পীরিতির জন্য পরাণ দিয়েছিলো।

ভূ। তবে কাঁদতে হবে বুঝি? তা হলে তুই দেখিস, আমি আসর ভাসিয়ে দেব। কিন্তু বিক্ষি হলে বেশী কাঁদতে পার্‌তাম—

"যদি পাষাণে বীজ না হবে অঙ্কুর,
তবে কেন বলি তোরে দয়াল ঠাকুর।"

দেখ্‌ছিস্‌ কেমন রামপ্রসাদী! এখন আর বাকি সকলের নাম বল্‌।

কা। শ্রীরাম কর্মকার।

ছি। হেথা।

মা। তুই প্রমীলা সাজবি।

ছি। সেটা কি বলরামের গোষ্ঠী নাকি?

কা। না রে, ইন্দ্রজিতের "ইস্তিরী"।

ছি। না ভাই, আমাকে মেয়েমানুষ সাজাস নে, আমার দাড়ি উঠ্‌ছে।

কা। তাতে আটকাবে না; তোর যে মুখোস্‌ থাকবে। খুব ছোট করে কথা বল্‌বি।

ভূ। যদি মুখোস পরতে হয়, তবে আমি প্রমীলাও সাজবো। আমি খুব ছোট ছোট বল্‌বো। "প্রমীলা প্রমীলা," "প্রাণের ইন্দ্রজিত," "তোমার প্রমীলা," "তোমার দুঃখিনী জননী।"

কা। দূর গাধা, সীতা রামের মা নহে, মাগ। তুই ইন্দ্রজিত সাজবি, আর ছিরে প্রমীলা হবে।

ভূ। আচ্ছা।

কা। বেচারাম দর্জ্জি।

বে। হাজির, কানাই।

কা। বেচারাম, তুমি ইন্দ্রজিতের দ্রৌপদী সাজ্‌বে। রামচন্দ্র স্বর্ণকার—

রা। হেথা, কানুরাম।

কা। তুমি ইন্দ্রজিতের বাবা, আমি প্রমীলার বাবা। তিনকড়ি কাঁসারি। তুমি হনুমান সাজ্‌বে। আর তাহলেই একখানি থিয়েটার হলো!

তি। হনুমানের পাঠ লেখা আছে? তাহলে আমাকে দেও, আমি শীঘ্র মুখস্থ করতে পারিনে।

কা। তোর শিখতে হবে না, তুই বক্তৃতা করে ফেলিস্‌। কারণ, তোর পাঠ কেবল গজরান মাত্র।

ভূ। আমি হনুমান সাজ্‌বো। এমন গজরাব যে, লোকের পিলে উল্‌টে দেব। রাজা শুনে খোস্‌ হবে।

কা। তাহলে তুই এক বিটকেলে কারখানা করে ফেল্‌বি; রাণী শুনে হয় ত মূর্চ্ছা যাবে! তাহলেই আমাদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

সকলে। তাহলে আমাদের সক্কোলের ফাঁসি দেবে।

ভু। রানী ভয়ে রাজাকে বাপ ডেকে ফেল্‌লে তো ফাঁসি দেবে! কিন্তু ভয়ে আমি গলা এত চাড়িয়ে নেব যে, পায়রার ডাকে মধুর মধুর গজরাব। বুলবুলের ডাকে গজরায়ে সকলের আক্কেল গুড়ুম করে দেব।

কা। তুই কেবল ইন্দ্রজিত সাজবি। রাম তোর মত আলকাতরা-মাখা তেলাল জোরা ছিল।

ভু। আচ্ছা তবে তাই সাজবো। হনুমানের নেজে আগুন দিতে হবে ত? নেজে আগুন দিলে যে আসর পুড়ে যাবে।

কা। এই নে তোদের পাঠ। কাল মুখস্থ করে রাত্রে বনের ভিতর যাবি। সেখানে জ্যোৎস্নায় বসে মুজ্‌রো হবে; তা না হলে কালেজের যত বদ ছেলে আমাদের পেছনে লাগবে, আর সব মাটি করবে। সেই বটতলা—বুজ্‌লি?

সকলে। আচ্ছা।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৈজয়ন্তী নগরীর নিকটস্থ বন।

(বিপরীত দিক হইতে একজন পরী এবং পণ্ডুর প্রবেশ।)

পণ্ডু। কিলো পরি! কোথায় যাচ্ছ?

পরী। পর্ব্বতে, গহ্বরে
অরণ্য ভিতরে
কণ্টক বনে।
সমুদ্রের জলে,
জ্বলন্ত অনলে,
ভ্রমি ফুল বনে, আনন্দ মনে।
জ্যোৎস্নায় জিনিয়া, চঞ্চল পায়,
পরীগণ বেগে ছুটিয়া যায়—
আদেশেন যবে পরীর রাণী
গাঁথি রত্নমালা জলধির তলে,
অবচায় মধু কুসুম দলে,
নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হরিয়া আনি।
আজি পুনঃ যাই আদেশে তাঁহার,
গোলাপের দলে ঝুলাতে নীহার,
আসিবেন হেথা পরীর রাণী।

পণ্ডু। পরীরাজ আজি হেথা উৎসব-কারণ
আসিবেন; সাবধানে ক'রো আগমন,
রাণীসহ চারি চক্ষু না হয় মিলন।

অতীব সুন্দর এক নৃপতি-তনয়,
হরিয়া এনেছে রাণী কৌতূহলময়।
সহচর করি সঙ্গে রেখেছে তাহায়,
জ্বলে রাজা ঈর্ষানলে দেখিয়া যুবায়।
চাহে রাজা, নিজে তারে অনুচর ক'রে,
পাঠাইতে দূর দেশে, বন-বনান্তরে।
কিন্তু রাণী না ছাড়ে প্রাণপণ.
সাজায় কুসুম দামে হৃদয়রঞ্জন।
দু'জনে যথায় মিলে—বনে, উপবনে,
নির্ঝরিণী-কুলে চারু নক্ষত্র কিরণে—
কুটিল কলহ বাধে: ভয়ে পরীগণ
ফুলে ফুলে লুকাইয়া বাঁচায় জীবন।

পরী। চিনেছি তোমায় আমি, চিনেছি এখন,
তুমি সে চতুর পরী, নাম "পঞ্চানন"।
সেই তুমি. গ্রামে গ্রামে কুমারী সকলে,
ভয় দেখাইয়া, শূন্যে হাস কুতূহলে;
সর চুরি কর তুমি গোয়ালিনী ঘরে
কাঁটা ফুটাইয়া দেও মালিনীর করে।
কভু তুমি পশ গিয়া দুধের ভিতর,
অনিশ্বাসে মথি দুধ গোয়ালিনী মরে।
নিশীথ-পথিকগণে পথ ভুলাইয়া,
হাস তুমি উচ্চ হাসি, করতালি দিয়া।
যাহারা তোমায় বলে সাধু "পঞ্চানন",
সাধিতে তাদের কার্য্য কর প্রাণপণ।

পঞ্চু। ধরা পড়েছি।
আমি সে আমোদ প্রিয় পরী নিশাচর,
সতত আমোদে বঞ্চি "অনঙ্গ" অন্তর।
ঘুড়ী হয়ে ডাকি আমি ঘোড়া যায় ছুটে,
সহিসেরা দেয় গালি. শানে মাথা কুটে।
বীরাঙ্গনা-পান-পাত্রে লুকাইয়া থাকি,
অধরে তুলিতে সুরা ভোঁ ভোঁ করে ডাকি।
"বাবাগো"! বলিয়া মাগী পাত্র দেয় ফেলে,
হাসির তরঙ্গ উঠে নাগর মণ্ডলে।
ঠানদিদি গল্প ছাঁদি আসর-জাঁকান,
আমাকে ত্রিপদী ভাবি বসিবারে যান।
কটাক্ষেতে আমি হই অন্তর তখন,
চিতপাত হ'য়ে বুড়ী ভূতলে পতন।
কাশে বুড়ী, নানা ছন্দে আধঘণ্টা ধরি,
আনন্দে বালকবৃন্দ যায় গড়াগড়ি।
বাপরে! ওই অনঙ্গ আসছে।

পরী। ঐ আমার রাণীও আসছে। আজ একটা লঙ্কাকাণ্ড হবে দেখ্‌ছি।

(এক দিক হইতে পারিষদ সহ অনঙ্গ, অন্য দিক হইতে পরিচারিকা সহ ত্রিতারার প্রবেশ।)

অনঙ্গ। কি মানিনী ত্রিতারা, এই জ্যোৎস্না রাত্রিতে কেন?

ত্রিতারা। কি ঈর্ষাতুর অনঙ্গ? পরীগণ! সরে যা। তুমি কি জান না, আমি তোমার আশা ত্যাগ ক'রেছি?

অনঙ্গ। পাপীয়সি! আমি তোর স্বামী নহি?

তেমতি আমি কি পত্নী নহিগো তোমার!
কিন্তু জানি, পরীরাজ্য করি পরিহার,
গিয়াছিলে কোথা তুমি, বাঁশরীর স্বরে,
প্রণয়-কবিতা-হারে, হরিবার তরে,
প্রেমময়ী প্রণয়িনী হেমলতাময়?
জানি, নাথ, আজি কেন হেথা আগমন;
হবে সেই বীরাঙ্গনা প্রেয়সী তোমার—
রাজা-সুরেশ্বর রাণী। পেয়ে সমাচার,
আসিয়াছি সাজাইতে ফুলশয্যা তার।

অনঙ্গ। নির্লজ্জ ত্রিতারা, ছি ছি বলিলে কেমনে,
এমন কলঙ্ক কথা। ভাবিয়াছ মনে,
জানি নাই, তব প্রেম সুরেশ্বর-সনে।
তুমি না হরিয়াছিলে—ভুলেছ কি আর?
হৃতা "সুরবালা" হতে হৃদয় তাহার?

ত্রিতারা। এ সব নিশ্চয় তব ঈর্ষ্যার সৃজন।
মধ্যম বসন্ত হতে মিলেছি যখন,
কিবা গিরি, কি গহ্বরে, অরণ্যে, কান্তারে,
নির্ম্মল নির্ঝর-কুলে, স্রোতস্বতী-ধারে,
কিম্বা সমুদ্রের চারু ধবল বেলায়,
নাচিত অপ্সরা নিত্য, চুম্বিয়া ধরায়,
মধুর স্বপনে যবে সমীরণ বহে।
ভাঙিগয়াছ ক্রীড়া তুমি ঈর্ষার কলহে।

অনঙ্গ। যদি শোধরাইতে চাহ, তাহা অনায়াসে পার। সেই ছোঁড়াটাকে আমার অনুচর করিতে দাও।

ত্রিতারা। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও!
এই পরীরাজ্য যদি দেও বিনিময়ে,
তবু না পাইবে তারে। জননী তাহার
ছিল উপাসক মম। দূর, সুবাসিত
ভারত-সমীরে বসি নিশীথ-সময়ে,
কতই রূপসী কথা, শুনাত আমারে,
অভাগিনী; কত সুখে, নীল-সমুদ্রের
সুবর্ণবালুকাময়ী সৈকতে বসিয়া,
হাসিতাম দুই জনে—দেখি ক্রীড়াশীল,
সমীরণে গর্ভবতী তরণীর পাল।
অনুকারি সেই পাল, পূর্ণ গর্ভবতী,
চঞ্চল চরণে চলি সৈকতে বেলার,

আনিত শম্বুক, শিলা, কতই আদরে—
যেন কত বহুমূল্য বাণিজ্যের ধন।
কিন্তু অভাগিনী হায়! আছিল মানবী;
মরিল প্রসব কালে। মাতৃহীন শিশু
পালিতেছি, জননীর স্মৃতি-নিদর্শন—
প্রাণান্তে অহারে নাহি ছাড়িব কখন।

অনঙ্গ। তুমি আর কতদিন এই বনে থাকিবে।

ত্রিতারা। সম্ভবত সুরেশ্বরের বিবাহ পর্য্যন্ত। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে নাচিতে ইচ্ছা কর, এবং আমাদের জ্যোৎস্না-ক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে আমাদের সঙ্গে আইস; না হয়, এখান হইতে যাও, আমি তোমার ক্রীড়া স্থান অনুসরণ করিব না।

অনঙ্গ। আমাকে সেই ছোঁড়াটাকে দেও, তাহ'লে আমি তোমার সঙ্গে যাই।

ত্রিতারা। বলিয়াছি, এই সমুদয় পরী রাজ্যের বিনিময়েও দেব না। পরীগণ! চল। তোমার দিব্বি, যদি আমি আর এখানে থাকি।

[সঙ্গিনীদিগের সহিত ত্রিতারার প্রস্থান]

অনঙ্গ। আচ্ছা, যাও। এই বন পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই আমি এই অপমানের প্রতিফল দিচ্ছি। পণ্ডু! শোন্! তোর মনে আছে,—

সমুদ্রের অন্তরীপে বসি এক দিন,
শুনিতেছিলাম সুখে মধুর সঙ্গীত—
মকর-বাহিনী এক বারিদেবী মুখে।
উত্তাল জলধি সেই সুমধুর স্বরে
ধরিলা প্রশান্ত ভাব; নক্ষত্র নিচয়
খসিয়া পড়িতেছিল উন্মত্তের মত—
শুনিতে সে বারিজার তরল সঙ্গীত।

পণ্ডু। হাঁ, মনে আছে।

অনঙ্গ। ঠিক সেই সময়ে, সখে! দেখিলে না তুমি।
দেখিলাম শূন্য পথে সশস্ত্র মন্মথ—
উপরে শীতল চন্দ্র, নীচে ধরাতল—
সুচারুহাসিনী এক সিমন্তিনী-পানে
হানিলা সুতীক্ষ্ন শর, শরাসন হ'তে,
শতকোটি চিত্ত বাণ বিঁধিতে সক্ষম।
কিন্তু মদনের সেই জ্বলন্ত সন্ধান,
সজল চন্দ্রমা লোকে নিবিল সহসা;
চলি গেলা বামা, রূপে জগতের রাণী;
কুমারী চিন্তায় মগ্না, কল্পনা-স্বপনে।
তখন কামের বাণ হইল পতন
এক ক্ষুদ্র শ্বেত-পুষ্পে, আরক্ত এখন
প্রেম অস্ত্রাঘাতে। তুমি যাও, ত্বরা করি
আন সেই ফুল; রস সরস যাহার—
দিলে নিদ্রা নিমীলিত নয়ন পল্লবে,
কিবা নর, কিবা নারী, নিদ্রান্তে যাহারে—
দেখিবে প্রথম চাহি, হবে তার তরে
প্রণয়ে পাগল। তুমি যাও, আসিও ফিরিয়া

আঁখির পলকে পুনঃ। এক দণ্ডে আমি—
দিব উত্তরীয় এই পৃথিবী গলায়।

[পণ্ডুর প্রস্থান]

অনঙ্গ। এই ফুলটা পেলে, ত্রিতারা কোথায় ঘুমায়, তা দেখ্‌বো এবং তার চক্ষে উহার রস দেব। ঘুম ভেঙ্গে, সে সিংহই দেখুক, ভালুকই দেখুক, বাঘই দেখুক আর ষাঁড়, বাঁদর কিংবা বনমানুষই দেখুক, পাগলের মত তার পিছে ছুটে যাবে। আর একটি শিকড়ের রস দিলেই এই ভ্রম কেটে যাবে। কিন্তু তা করার পূর্ব্বে ছোঁড়াটাকে হাত করতে হবে। এরা আবার কে?—তা আমাকে ত দেখ্‌তে পাবে না। মজা ক'রে এদের কথাটি শুনে নিই।

(বিপিন ও তৎপশ্চাৎ মানদার প্রবেশ)

বিপিন। আমি ত তোমাকে বলেছি যে, আমি তোমাকে ভাল বাসিনে, তবু কেন তুমি আমাকে ভূতের মত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ? বিনোদ এবং সুন্দরী প্রমদা কোথায়? আমি একটিকে খুন করবো, আর একটি আমাকে খুন করে রেখেছে। তুমি বলেছিলে না—তারা এই বনে পালিয়ে এয়েছে? কিন্তু, তারা কই? তুমি যাও না? ভাল জ্বালাতন করলে যে!

মানদা। নিষ্ঠুর! আমায় কেন কর আকর্ষণ,
চুম্বক হৃদয় তব, লৌহ সম মন;
তব আকর্ষিণী-শক্তি কর পরিহার,
তোমার পশ্চাতে আমি যাইব না আর।

বিপিন। আমি কি তোমায় অনুরক্ত করিতে চেষ্টা করি? আমি কি তোমায় বলি যে, আমি তোমার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি? বরং আমি কি তোমায় স্পষ্টাক্ষরে বলি নাই যে, আমি তোমাকে কখনও ভালবাসি নাই, ভালবাসিতে পারিব না?

মানদা। আমি তথাপি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমার কুকুর। বিপিন, তুমি আমাকে যত প্রহার কর, আমি তত তোমার শরীর লেহন করি। আমাকে নিতান্ত পক্ষে তোমার কুকুরটির ন্যায় ব্যবহার কর, মার, পদাঘাত কর, তথাপি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে অনুমতি দেও। তোমার প্রণয়ে ইহার অপেক্ষা নীচস্থান আর কি হইতে পারে? তথাপি আমার পক্ষে তাহা স্বর্গ।

বিপিন। দেখ, আমার ঘৃণা আর অধিক উত্তেজিত করিও না। তোমাকে দেখিলে আমার গায়ে জ্বর হয়।

মানদা। তোমাকে না দেখিলে আমি পীড়িত হই।

বিপিন। সহর ছেড়ে, যে তোমাকে ভালবাসে না—তাহার সঙ্গে রাত্রিতে একাকিনী তোমার ঐ নবীন যৌবন-রত্ন লইয়া বনে প্রবেশ করা, তোমার পক্ষে নিতান্ত নির্লজ্জের কার্য্য হইয়াছে।

মানদা। তোমার চরিত্রে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে।
যখন নিরখি আমি তোমার বদন,
রজনী তখন মম নাহি লয় মনে।
কেমনে বলিব বল, অরণ্য নির্জ্জন?
তুমি যার আছ কাছে, আছে ভূমণ্ডল।
বিপিন! আমার তুমি সংসার সকল।

বিপিন। আমি এখনই ঐ জঙ্গলে লুকাব, তুমি হিংস্র বন্যজন্তুর মুখে পতিত হবে।

মানদা। হিংস্রতম পশু যেই তাহারো হৃদয়,
কঠিন তোমার মত না হবে কখন।
পালাও, ইহাতে কিছু কলঙ্ক তোমার;

পালাবেন ইন্দ্র, শচী ছুটিতে পশ্চাতে,
পলাইবে ব্যাঘ্র পড়ি হরিণীর হাতে।
পলাইবে শ্যেনপক্ষী দেখি কপোতিনী,
পলাইবে বীর্য্য দেখি অবলা রমণী।

বিপিন। আমি বাপু, তোমার সঙ্গে আর ছড়া কাটতে পারি না, তুমি আমাকে যেতে দাও। তুমি যদি তবু আমার পিছে পিছে এস, তবে এই বনে আমি তোমায় অপমান করিব।

মানদা। হা অদৃষ্ট! দেবালয়ে, নগরে, প্রান্তরে।
কোথা নাহি অপমান করিছ আমার;
নারীর সম্মান তুমি জান না কি হায়!
না সাধে রমণী, সাধে পুরুষ বামায়।
যাইব পশ্চাতে, হ'ক স্বরগ নরক,
প্রণয় পাশক হ'ক জীবন-ঘাতক।

[প্রস্থান]

অনঙ্গ। যাও শশিমুখি! নাহি ছাড়িতে এ বন,
সে যাবে পশ্চাতে, তুমি পালাবে তখন।

(পণ্ডুর প্রবেশ)

ফুল এনেছ! সাবাস পণ্ডু!

পণ্ডু। এই নিন্

অনঙ্গ। দাও, আমাকে দাও।
জানি আমি সেই স্থান স্রোতস্বতী তীরে;
যথায় বাসন্তী-লতা চন্দ্রাতপ তলে,
কুসুম-পল্লব-কক্ষে, স্নাত চন্দ্র-করে,
কুসুম-শয্যায় শুয়ে, ত্রিতারা সুন্দরী,
নিদ্রা যায় নৃত্যশ্রমে, পুষ্প আবরণে
লুকাইয়া পুষ্পময়ী মুরতি তাহার,
যাইব তথায়; দিলে এই পুষ্পেরস
নয়নে তাহার, হবে নিদ্রান্তে হৃদয়
সংখ্যাতীত ঘৃণাষ্পদ কল্পনা পূরিত।

পণ্ডু, তুমি ইহার কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া এই বনের মধ্যে প্রবেশ কর। দেখিবে, একজন সুন্দরী যুবতী, একজন দম্ভপূর্ণ যুবকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছে। তুমি ঐ ফুলের রস তার চোখে দিবে; কিন্তু এমনই সময়ে দিবে, যেন নয়ন মেলিলে সেই স্ত্রীলোকটিই তাহার প্রথম দৃশ্য পদার্থ হয়। কাক ডাকিবার পূর্ব্বে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে।

পণ্ডু। নৃপতির আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বন

(ত্রিতারার সহচরীগণসহ প্রবেশ)

ত্রিতারা। আইস সকলে
বারেক নাচিয়া গাও অপ্সরা-সঙ্গীত,
যাও তার পর কেহ, ফেলিতে বাছিয়া,
গোলাপের ক্ষুদ্র পোকা, মল্লিকা বেলার;

ওই যে কর্কশ কণ্ঠ দুরন্ত পেচক—
তুলেছে বিকট ধ্বনি বিজন বিপিনে—
তাড়াও তাহারে কেহ; কেহ বা কোমল
শীতল সঙ্গীত স্বরে, নিদ্রাসুখকরী
নয়ন পল্লবে মম কর আকর্ষণ।
(পরীদিগের গান এবং ত্রিতারার নিদ্রা।)

পরী। চল, আমরা যাই, রাণীর নিদ্রা হয়েছে। একজন মাত্র দূরে প্রহরী থাক।
[প্রস্থান]

(অনঙ্গের প্রবেশ এবং ত্রিতারার নেত্রে পুষ্পেরস প্রদান।)

অনঙ্গ। দেখিবে যাহারে নয়ন খুলি,
তার প্রেমে যাবে জগৎ ভুলি,
কাঁদিবে বিষাদ-লহরী তুলি,
হ'ক সে বানর, অথবা নর,
বনের বরাহ, আকাশ চর,
হ'বে প্রাণ হ'তে অধিকতর।

[প্রস্থান]

(বিনোদ এবং প্রমদার প্রবেশ।)

বিনো। বনপর্য্যটনে তুমি ক্লান্ত প্রিয়তমে।
ভুলিয়াছি পথ আমি যেন মনে লয়,
এখানে বিশ্রামি প্রিয়ে, যাবত গগনে
আনন্দ প্রভাত-রশ্মি না হয় উদয়।

প্রমদা। বিনোদ, তোমার শয্যা কর অন্বেষণ,
আমি এই দূর্ব্বাদলে পাতিব শয়ন।

বিনোদ। মম ভুজোপরে রাখ মস্তক সুন্দর,
এক প্রাণ, এক শয্যা দুই কলেবর।

প্রমদা। না—না নাথ! ক্ষমহ এই কুমারী বালায়,
রমণীর লজ্জারত্ন অমূল্য ধরায়।
জানি আমি তব প্রেম অমর অচল,
তথাপি সঙ্কোচ, নারী-হৃদয় দুর্ব্বল।

বিনোদ। বিনোদের প্রেম, প্রিয়ে, বিনোদের প্রাণ,
প্রেম যাবে, প্রাণ রবে, প্রেয়সী আমার!
ভাবিও না মনে! নিশি হয় অবসান,
নিদ্রা যাও, নিদ্রা যাব অদূরে তোমার।
(উভয়ের নিদ্রা)
(পঞ্চুর প্রবেশ)

পঞ্চু। বাবা! বনে ঘুরে ঘুরে প্রাণটা গেল; কৈ কাকেও ত পেলেম না যে ফুলের রস চোকে দিয়ে প্রেমের ঢেউ তুলে একবার মজা দেখি, বা! এরা কে, এও ত একটি পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক দেখ্‌ছি। আচ্ছা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে! বাবা! মাটিতে পড়ে এত ঘুম! তবে এরাই বা হবে! দিব্বি স্ত্রীলোকটি! ভয়েতে এই বেটা কাট-খোট্টার কাছে শোয় নাই। বেটা চাষা। ঘুমোও তুমি, তোমার চোকে পুরোমাত্রায় এই পীরিতের রস ঢেলে দিচ্ছি! য়া ঘুমোচ্ছ, এই এবার জাগ্‌লে আর শীঘ্র ঘুমের ভাবনা ভাবতে হবে না। কাজ ত হ'ল, আমি এখন অনঙ্গের কাছে যাই। [প্রস্থান]

(বিপিন এবং মানদার প্রবেশ)

মানদা। বিপিন! আমাকে খুন কর্ত্তে হয় কর, তথাপি একবার দাঁড়াও।

বিপিন। দেখ, আমি তোমাকে বারবার বলছি—ভাল হবে না, তুমি আমার পিছু পিছু এস না।

মানদা। প্রাণেশ্বর! তুমি কি আমাকে এরূপে পরিত্যাগ করে যাবে? না, এত নিষ্ঠুর হয়ো না।

বিপিন। তোমার যদি লজ্জা ভয় কিছুই না থাকে, তুমি থাক; আমি চল্লেম।

[প্রস্থান]

মানদা। আর ত পারি না; প্রাণ যায় যে আমার!

(দ্রুত নিশ্বাস)

যত উপাসনা, ঘৃণা বাড়িছে তাহার।
প্রমদাই সুখী, চারু নয়ন তাহার,
না জানি কতই শোভা, সৌন্দর্য্য আধার
কিসে নেত্র তার, এত হইল উজ্জ্বল?
অশ্রুতে? আমারও ত নয়নের জল
ঝরে দিবা নিশি; না—না. কুরূপিণী আমি,
পশু পলাইছে দূরে দেখি তনুখানি!
বিপিন মানব, তবে কি দোষ তাহার,
আমায় পিশাচী মত করে পরিহার।
জানিলাম—প্রবঞ্চক আরসি আমার,
তুলনায় আমার নয়ন প্রমদার
বিস্ফারিত নেত্র সহ।

একি? বিনোদ? মাটিতে শুয়ে? মৃত না জীবিত? কৈ, কোন রক্ত কি ক্ষত তো দেখছি না! বিনোদ? ও বিনোদ? বিনোদ?

বিনোদ। (জাগিয়া) পশিব অনলে আমি তোমার কারণ।
নির্ম্মলা মানদা, স্বচ্ছ দরপণ মত
বক্ষ তব, অন্তরালে কোমল হৃদয়
ওই দেখিতেছি আমি। কোথায় বিপিন,
মরিবে পাপিষ্ঠ আজি করবালে মম।

মানদা। ছি! ছি! বিনোদ. অমন কথা বলো না। বালাই! সে তোমার প্রমদাকে ভালবাসে বলেই বা কি হলো, তোমার প্রমদা ত তা'কে ভালবাসে না। তবে, বাপু, তোমার সুখের ব্যাঘাত কি?

বিনোদ। সুখ? প্রমদার প্রেমে সুখ? অনুতাপে মরি,
কি যে কষ্টে কাল তার অনুরাগে পড়ি
কাটানু? প্রমদা নহে—মানদা আমার
প্রাণেশ্বরী! প্রাণেশ্বরী। বিনিময়ে তার,
চাহি না ইন্দ্রের শচী, মন্মথমোহিনী
মানদা! আমার তুমি জীবনসঙ্গিনী।
মনের বাসনা প্রিয়ে, জ্ঞানের অধীন,
সে জ্ঞানে বুঝিনু, রূপ তোমার অসীম।
সময়েতে ফুটে ফুল; সময়ে আমার
হ'লো এতদিনে প্রিয়ে জ্ঞানের সঞ্চার।

করিল তোমার চারু নয়নে মোহিত,
অনন্ত প্রেমের কাব্য যথায় লিখিত।

মানদা। বিনোদ! কেন আমার প্রতি এই উপহাস? আমি কিসে তোমার এই উপহাস-ভাজন হইলাম! ইহা কি আমার পক্ষে যথেষ্ট নহে যে, বিপিনের কাছে আমি ঘৃণিত, একদিন, একবার, তাহার একটি সুদৃষ্টি পেতে পারি না! তার উপর তুমিও কি আমার রূপ নাই বলে উপহাস করতে লাগলে? কেন আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার? কেন এরূপ ঘৃণিত ভাবে আমাকে তোমার ভালবাসা জানাচ্ছ? আমি জানতেম তুমি ভদ্রতার আদর্শ—

তা অদৃষ্ট! এক জন ঘৃণা করে যারে,
সমস্ত জগৎ কি গো উপহাসে তারে?

[প্রস্থান]

বিনোদ। ভাগ্যিস্ প্রমদাকে দেখে নাই! প্রমদে! তুমি সুখে নিদ্রা যাও, কিন্তু আর বিনোদের নিকট এসো না। যেমন অতি মিষ্টি খাইলে টক্ খাইতে ইচ্ছা করে, কিম্বা যে দুষ্কর্ম্মের দ্বারা লোক একবার প্রতারিত হয়, সেই কাজকে সে যেরূপ ভয়ানক ঘৃণা করে, আমারও সেইরূপ হয়েছে। আমার আর ইহাকে দেখতে ইচ্ছা করছে না। যাই দেখি মানদা কোথায় গেল। প্রাণপণে তাহার প্রণয় পাবার চেষ্টা করব।

[প্রস্থান]

প্রমদা। (জাগিয়া) উঃ! মলেম গো! বিনোদ! আমায় রক্ষা কর। আমার বুকের উপর থেকে এই সাপটি টেনে ফেল। উঃ একি ভয়ানক স্বপ্ন! বিনোদ! দেখ, ভয়ে আমার গা কাঁপছে। আমার বোধ হচ্ছিল, যেন একটি সাপ এসে আমার অন্তঃকরণটি খেয়ে ফেল্‌ছে, আর তুমি তামাসা দেখ্‌ছ, আর হাস্‌ছ! বিনোদ!—একি?—কোথায়? বিনোদ! প্রাণ! একি?—শব্দের সঙ্গে চলে গেলে নাকি? কোন শব্দ, কোন কথাই শুনা যাচ্ছে না যে! সর্ব্বনাশ!—তুমি কোথায় গেলে? দোহাই তোমার, কথা কও, আমি ভয়ে মূর্চ্ছা যাচ্ছি যে! সেকি, তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমার নিকটে নাই! তোমাকে পাই, আর মৃত্যুকেই পাই—

[ত্রাসে বেগে প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বন—ত্রিতারা নিদ্রিতা।

(কানাই, রামা, ভূতো, ছিরে, তিনু ও পাঁচুর প্রবেশ।)

ভূতো। সব এয়েছ ত?

কানাই। বা! বা! কি মজার মুজরার স্থান হয়েছে। এই খোলা যায়গাটা হবে আমাদের "এছটেজ" আর এই জঙ্গলটি হবে "গ্রিণরুম"। রাজার কাছে যে রকম ক'রে দেখাতে হবে, আজ এখানেও সেইরূপ পুরা মুজরা করতে হবে।

ভূতো। কানাই?

কানাই। কিরে গদা, কি?

ভূতো। দেখ, তোর নাটকে এমন সব কারখানা আছে, যা লোকে ভাল বল্‌বে না। প্রথমতঃ ইন্দ্রজিৎ তরবার খুলে আপনাকে আপনি খুন করবে—এ রাণী কখনও দেখতে পারবে না। তার উপায় কি?

তিন। তাই ত'।

পাঁচু। ঐ খুনটা বাদ দিতে হবে।

ভুতো। বাদ দেব কেন, আমি তার পথ ঠাউরে রেখেছি। আমি আসরে নেবে প্রথমেই বলে রাখবো যে, আমরা খুনোখুনি করবো না, আর ইন্দ্রজিৎ বাস্তবিক মরবে না। বরং একেবারে বলে ফেলবো—ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ নহে, ভুতো তাঁতি। তা হ'লে আর কোন সন্দেহ থাক্‌বে না।

কানাই। তাই-ই কর্‌তে হবে—আর তার জন্যে একটা ছড়া বাঁধতে হবে।

তিনু। রাণী কি সিংহী দেখে ভয় পাবে না?

পাঁচু। ভয়? আমার বোধ হয়, বাছুরের মত লেজ তুলে পালাবে।

ভুতো। তাই ত! মেয়েমানুষের কাছে সিংহী? বাপরে! তা হবে না। দুর্গা-ঠাকুরুণের পায়ের নীচে মিন্‌সে চোরাকে কেমন কামড়ে ধরেছে, দেখছিস্‌ ত। সেই সিংহী যদি আবার নড়ে-চড়ে, রাণী ত রাণী, রাণীর বাপ রাজা শুদ্ধ হুমড়ে পড়বে।

কানাই। তার জন্যে আর একটি ছড়া বেঁধে বলতে হবে—সিংহী, সিংহী নহে।

ভুতো। সিংহীবেটার নাম বলে দিতে হবে; আর অর্দ্ধেক মুখ, সিংহীর গলার উপর দিয়ে দেখা যাওয়া চাই। আর সে বল্‌বে,—"রাণি! মা রাণি! তুমি ডরিও না, তুমি ভয় পেয় না। তুমি যদি ভেবে থাক আমি সিংহী, সেটা তোমার ভুল, আমিও অন্য এক মানুষের মত এক মানুষ।" তারপর, সে তার নাম বল্‌বে, আরো বলে ফেল্‌বে যে, আমি রামা।

কানাই। আচ্ছা তা যেন হলো, কিন্তু আর দুটো খটকা আছে। "এছটেজে" চাঁদনি আনবি কেমন করে? ইন্দ্রজিৎ আর প্রমীলা চাঁদনিতে মিলেছিল যে!

তিনু। কেন সেখানে দোকান সাজিয়ে দেব, আর বলবো—এটি চাঁদনি।

কানাই। আরে গাধা, চাঁদনি বাজার নহে, চাঁদের চাঁদনি।

তিনু। বটে, আমাদের থিয়েটারের রাতে চাঁদনি উঠ্‌বে না?

ভুতো। পাঁজি দেখ, পাঁজি দেখ, দেখ—সে রাতে চাঁদনি হবে কি না।

কানাই। ঠিক সে রাত চাঁদনি হবে।

ভুতো। তার আর মুস্কিল কি? আমরা যে ঘরে আসর করবো, সে ঘরের একটা জানালা খুলে রাখবো।

কানাই। তা না হয়, একজনা গায়ে সব জঙ্গল বেঁধে আর একটা লণ্ঠন হাতে করে, চাঁদ সেজে আসবে। কিন্তু আর একটা চাই—একটা দেয়াল চাই। কারণ পুরাণে আছে যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমীলা ছিদ্র দিয়ে কথা কয়েছিল।

তিনু। তা দেয়াল সাজালেই হবে, কি বলিস ভুতো?

ভুতো। হাঁ একজন গায়ে চুন-শুরকি মেখে দেয়াল হবে। আর এমনি আঙ্গুল খুলে থাকবে, যা'তে তার ভিতর দিয়ে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলা কথা কইতে পারে।

কানাই। এখন সব ঠিক হলো, এখন দেখি সব বাপের বেটারা মুজরো কর। ইন্দ্রজিৎ, তুই আরম্ভ কর; যখন তোর পাঠ শেষ হবে, তুই ঐ জঙ্গলের মধ্যে যাবি, আর পাঠ শেষে সকলেই সেরূপ করবে।

(পঞ্চুর পশ্চাতে প্রবেশ)

পঞ্চু। পরীরাণীর শয়ন-কক্ষে এত নিকটে এরা কে? বা! এরা যে আচ্ছা অভিনয় আরম্ভ করেছে! আচ্ছা, আমি দর্শক হচ্ছি; যদি আবশ্যক হয়, "এক্টারও" হবো।

কানাই। ইন্দ্রজিৎ, কৈ বল্‌তে আরম্ভ কর। প্রমীলা, তুমি দাঁড়াও।

ভুতো। প্রেমের প্রমীলা তুমি কুসুমের কলা—

কানাই। বাপের কলা খা, কুসুমের কলা কিরে? কুসুম-কোমলা।

ভুতো। হাঁ, হাঁ, কুসুম-কোমলা, কুসুম-কোমলা, কুসুম-কোমলা, (মুখভঙ্গি করিয়া

আওড়ান।)

কুসুমসৌরভময় নিশ্বাস তোমার।

ও কিসের শব্দ? তুমি একটু দাঁড়াও, এখনি আসব। [প্রস্থান]

ছিরে। আমি কি এখন বলবো?

কানাই। বলবি বই কি? ঢেঁকিরাম বুঝতে পারলি না, ও শব্দ শুনে কিসের শব্দ—তা দেখতে গেলো; এখনি আবার আসবে।

ছিরে। (আওড়ান)—

বীরবর ইন্দ্রজিৎ দূর্ব্বাদলশ্যাম,
প্রেমের পোলাও তুমি রস-ঘৃতে মাখা,
ক্লান্তিহীন প্রেম তব, হায় মরি যেন
ভাড়াটে গাড়ীর যুগ্ম অশ্বিনীকুমার।
মিলিব দুজনে শালা মন্দির-সমীপে।

কানাই। দূর বেটা বক্কেশ্বর? "শালার মন্দির" তোর কোন্ শালা শিখিয়েছিল? বেটা "শৈল মন্দির"কে শালার মন্দির করে ফেলেছে! ঐ দিকে আবার ইন্দ্রজিতের পাঠ শুদ্ধ বলে ফেল্লে। বেটা জাত কর্ম্মকার, যেন লোহা পেটাচ্ছে। তুই "অশ্বিনীকুমার" পর্য্যন্ত বলে চুপ করবি।

ছিরে। হাঁ, ভাড়াটে গাড়ীর যুগ্ম "অশ্বিনীকুমার"।

(পঞ্চু এবং গাধার মুখোস মাথায় ভূতোর প্রবেশ।)

ভূতো। প্রমীলে! তোমার আমি নিতান্ত তোমার।

কানাই। বাপ-রে! রাক্ষস! ওরে ভূতে পেয়েছেরে! পালারে পালা।

[চীৎকার করিতে করিতে পঞ্চু ও ভূতো ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

পঞ্চু। বা! বেশ মানিয়েছে। দিব্বি ইন্দ্রজিৎ হয়েছে। একে আজ সারা রাত্রি বনে বনে ঘুরিয়ে মজা করতে হবে।

জঙ্গলে জঙ্গলে পল্লবে বনে।
ঘুরিবে বেড়াবে আমার সনে;
কভু ঘোড়া আমি, কুকুর কখন,
কভু সিংহ আমি; করিব গর্জ্জন,
ভূতের আগুন দেখাব কখন।

[বগল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান]

ভূতো। বাপের কলা খা; এ শালারা পালালো কেন? আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বুঝি এ ফিকির করেছে।

তিনু। ও ভূতো, তুই এমন হলি কেমন করে? একি দেখছি?

ভূতো। তোর মাথা হয়েছি। তোর গাধার মুণ্ড, তুই তেমনি দেখছিস্।

[তিনুর ভয়ে প্রস্থান ও কানাইয়ের প্রবেশ]

কানাই। ও ভূতো, ও ভূতো, এ কি হলো, তোর মাথা বদলে গিয়েছে।

[ভয়ে প্রস্থান]

ভূতো। আমি এ শালাদের বাঁদরামি বুঝতে পেরেছি। তারা বুঝেছে, আমি গাধা, আমি এতে ভয় পাবো। আমি এখান থেকে এক-পা সরবো না; দেখি, তারা কি করে! আমি বাবুর মত বেড়াব, আর গান করবো; তারা শুনবে, আর বুঝবে যে, ভূতো ভূতের ভয় করে না।

ত্রিতারা। (জাগিয়া) কোন দেব আমি হায়,
ফুলশয্যা হ'তে জাগালে আমায়?

(ভূতের গান ও নৃত্য)

ত্রিতারা। মানব, বিনয় করি গাও আর বার,
শ্রবণ, মোহিত শুনি সুমধুর স্বর,
নয়ন, নিরখি ওই মূরতি সুন্দর।
তব রূপে তব গুণে ভুলিনু এমন,
দেখিয়া হৃদয় হলো প্রেমেতে মগন।

ভূতো। সুন্দরি! তোমার বোধ হয়, বুদ্ধির ভুল হয়েছে। আর বুদ্ধি আর পিরীত এক জায়গায় থাকে না। আমায় যে সময়ে সময়ে সুন্দর দেখায়, তা বড় মিথ্যা নহে।

ত্রিতারা। তুমি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সুন্দর।

ভূতো। না, তার কোনটাই নাই। বুদ্ধি থাকলে আমি এ বন থেকে বেরুতে পারতেম। ও শালাদের ফিকিরে পড়ে, রাতটা এমনি গেল; কাল তাঁতিনী ঝাঁটার উপর ঝাঁটা দেবে—পিটে তাঁত বসাবে।

ত্রিতারা। ছাড়িবে না বল? না না, এমন বাসনা
করিও না প্রাণনাথ! ছাড়িতে দিব না।
নহি হীনা পরী আমি; এখনো আমার
যৌবন বহিছে পূর্ণ বসন্ত-সম্ভার।
তুমি মম প্রাণনাথ, চল মম সনে,
সেবিবে তোমায় পরী সহচরীগণে।
প্রবেশি জলধি তলে হরিয়া রতন,
সাজাবে মুকুটে তব চারু চন্দ্রানন;
কুসুম-শয্যায় তুমি করিলে শয়ন,
করিবে অপ্সরা-গীত সুধা-বরিষণ।
ঘুচাব তোমার জড় মানবত্ব আমি,
হইবে পরীর মত সমীরণ-গামী।
এস বেল, বকফুল, বকুল, বেগুন।

(বেলফুল, বকফুল, বকুলফুল, বেগুনফুল, প্রভৃতি সহচরীর প্রবেশ)

বেল। সব এয়েছিস?
বক। এয়েছি গো।
বকুল। এয়েছি।
বেগুন। এয়েছি।
সকলে। রাণীর কি আজ্ঞা?

ত্রিতারা। বিনয়ে তোমরা এই সুজনে তুষিবে।
বেড়াবে অরণ্যে, সঙ্গে নাচিবে গাহিবে,
দোলাইবে গলে তার পারিজাত-হার,
আনিয়া অমৃত-ফল যোগাবে আহার।
পান-হেতু পুষ্পমধু করিবে হরণ;
মধুমক্ষিকার মোম আলোক-কারণ
হরিবে; জোনাকি, ক্ষুদ্র অনল-নয়নে,
জ্বালাইয়া সেই বাতি, প্রাণের সখায়
উঠাইবে শোয়াইবে কুসুম-শয্যায়।
প্রজাপতি চারুচক্ষে, চন্দ্রের কিরণে,

মুদিত নয়নে হাত করিবে ব্যজন।
সকলে তাহাকে কর প্রীতি-সম্ভাষণ।

বেল। প্রণাম মহাশয়!

বেল। প্রণাম।

বক। প্রণাম।

বেগুন। প্রণাম।

ভুতো। আমি হুজরীদিগকে আশীর্ব্বাদ করি। আমি হুজরীদিগের নাম জানতে চাই।

বক। বকফুল।

ভুতো। হুজরী বকফুল, আমি আপনাকে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম। আমি যেন পুজার সময়ে আপনাকে হাজির পাই। মহাশয়ীর নাম?

বেল। বেলফুল।

ভুতো। দিব্বি নাম? যেমন চেহারাটি, তেমনি নামটি। সুন্দরি, আমি যেন বিছানার নিকট আপনাকে পাই। মহাশয়ীর নাম?

বেগুন। বেগুনফুল।

ভুতো। বড় খুসী হলেম। আমি কিছু বেশী বেগুন ধ্বংস করি, আপনি বিরক্ত হবেন না। আমি হলপ করিয়া বলিতে পারি, আমি কখনও বেগুন ফুল খাই নাই—তবে ভুতনাথ বেগুনভাজির বড় ভক্ত বটেন, যদি পরীরাজ্যে তাহা পাওয়া যায়, তবে আমি আর এ মুল্লুক ছেড়ে যাব না।

ত্রিতারা। চল সখি! নিয়ে সাথে নিকুঞ্জে আমার;
ওই দেখ নিশানাথ, সজল নয়ন
জাগরণে; নিশি শেষে কাঁদেন যখন,
কাঁদে পুষ্পচয়; ভাসে নীহারে বদন;
অস্পৃষ্ট সতীত্বে যেন বিষাদিত মন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনের অন্য অংশ

(অনঙ্গের প্রবেশ)

অনঙ্গ। না জানি ত্রিতারা নিদ্রা ভঙ্গে কি দেখে ক্ষেপেছে!

(পণ্ডুর প্রবেশ)

এই যে পণ্ডু এয়েছে। ক্যিরে ক্ষেপা! আজ এই বনে রাত্রি কেমন যাচ্ছে?

পণ্ডু। মহারাজ! রাণী এক অদ্ভুত জানোয়ার নিয়ে ক্ষেপেছেন। রাণী যখন নিদ্রিতা ছিলেন, তাঁর নিকুঞ্জে কতকগুলি কামার, কাঁসারী একত্র হইয়া রাজার বিবাহ রাত্রির জন্যে, এক নাটকাভিনয় শিক্ষা কচ্ছিল। তাদের মধ্যে যেটি নেহাত বোকা, সে ইন্দ্রজিৎ সেজেছিল; সে বেটা যাই একটি বনে প্রবেশ করেছে, অমনি তার মাথায় একটি গাধার মুণ্ড বসিয়ে দিয়েছি। যেই ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার সঙ্গে কথা কইতে এলেন, আর এক তামাসা আরম্ভ হলো। যেমন হঠাৎ একটি বন্দুক আওয়াজ শুনে চরের পাখিগুলি চেঁচাচেঁচি করে উড়ে যায়, তেমনি সঙ্গীরা পালাতে লাগলো। একজন আর একজনের গায়ে পড়ে আছাড় খেতে লাগলো। কেহ-বা "খুন কল্লে" "খুন কল্লে" বলে চীৎকার ক'রে লোক ডাক্‌তে লাগলো, আর বনের কাঁটায় পড়ে পড়ে ক্ষত বিক্ষত হতে লাগলো। আমি গাধা মুণ্ড ইন্দ্রজিৎকে সেখানে রেখে এলেম, গোলমালে রাণী জেগে যাই তাহাকে দেখেছেন, অমনি গাধার পিরীতে ক্ষেপে গেছেন।

অনঙ্গ। বাহবা পণ্ডু! সাবাস! বড় মজা হয়েছে তো। আশার অতিরিক্ত হয়েছে।

সে দুটোর চোকে যে ফুলের রস দিতে বলেছিলাম, তাহা দিয়েছিস?

পঞ্চু। যুবকটি ঘুমুচ্ছিলো, তার চোকে রস দিয়ে এসেছি, আর সেই যুবতী কাছে বসেছিল, জাগলেই তাকে দেখ্‌বে।

(প্রমদা এবং বিপিনের প্রবেশ)

অনঙ্গ। সরে দাঁড়া—এই সেই যুবকটিই বটে।

পঞ্চু। যুবতীটি সেই; কিন্তু সেই পুরুষটি নহে।

বিপিন। কেন তিরস্কার কর অনুরক্ত জনে,
রাখ এই বিষ রাশি শত্রুর কারণে।

প্রমদা। তিরস্কার তুচ্ছ কথা—তা হ'তে অধম
ব্যবহার-যোগ্য তুমি পাপী নরাধম।
নাশিয়াছ যেই রক্তে, হও নিমজ্জিত,
বধিয়া আমায়! হায়! অভিন্ন যেমন
দিবা, দিবাকর, ছিনু আমরা দু'জনে।
নিদ্রাগত প্রমদায় ফেলিয়া কাননে,
সে গিয়েছে ছেড়ে? না, না, মানে না যে মনে
আকাশ ছাড়িতে পারে ওই চন্দ্রমায়,
বিনোদ ছাড়িতে তবু পারে না আমায়।
অবশ্য তাহাকে তুমি ক'রেছ নিধন,
হন্তার মতন তব মুরতি ভীষণ।

বিপিন। হন্তা নহি, হত আমি, প্রমদা তোমার
নিষ্ঠুরতা-বিদ্ধ এই হৃদয় আমার।
হন্তা তুমি তবু হায়! মুরতি তোমার
ওই চন্দ্র জিনি হায়! শোভার আধার।

প্রমদা। কি ছাই এরূপ, মম বিনোদের কাছে।
বিপিন! বল না হায়! সে কি বেঁচে আছে?

বিপিন। খাক্ তার মৃত দেহ শৃগাল গৃধিনী।

প্রমদা। পাপিষ্ট! নির্দ্দয়! তুই চণ্ডাল অধম!
আকাশে কি নাহি বজ্র রে তোর কারণ?
রমণীর ধৈর্য্যচ্যুত করিলি আমারে,
সত্যই কি হত তুই করেছিস্ তারে?
মানব সমাজে তোর না হইবে স্থান,
নরক-নিবাসী তুই নারকী প্রধান।
কি সাধ্য জাগ্রতে তুমি চাবে তার পানে
নিদ্রায় কি তবে তারে বধিলে পরাণে?
ধন্য পরাক্রম তব, নিদ্রিত হনন।
সামান্য ভুজঙ্গে, কি গো পারে না তেমন?
অথবা ভুজঙ্গ হ'তে তুমি নীচাশয়,
ভুজঙ্গ তোমার মত স্বার্থপর নয়।

বিপিন। কেন মিছে তিরস্কার কর ক্রোধময়ি,
আমি বিনোদের রক্তে কলঙ্কিত নই;
এখনো সত্যতে ক'রে নই শ্বাসরোধ,

প্রমদা। পায়ে পড়ি, বল ভাল আছে ত বিনোদ?

বিপিন। যদি বা বলিতে পারি, কি ফল আমার?
প্রমদা। প্রমদার মুখ তুমি দেখিবে না আর।
জীবিত কি মৃত, প্রাণ বিনোদ আমার,
তুমি, ঘৃণিতের সাথে থাকিবে না আর। [প্রস্থান]
বিপিন। নিস্ফল এ বাদিনীর পশ্চাৎ গমন,
ক্লান্ত দেহ, এইখানে করিব শয়ন।
যতই বিষাদ মন হতেছে প্রবল;
ততই নিদ্রার ঋণ বাড়িছে কেবল,
আজি এইখানে দেখি করিয়া শয়ন,
শোধিতে সে ঋণ যদি পারি কিছুক্ষণ

(নিদ্রা)

অনঙ্গ। পণ্ডু, করেছিস কি? তুই কার প্রকৃত প্রেমের মাথা খেয়ে এসেছিস?

পণ্ডু। মহারাজ! বিধাতার ভুল, আমার দোষ নাই। (স্বগতঃ) পঞ্চাননও নিজে প্রকৃত প্রেম কখনও জানেন নাই; তিনি বাড়ী বাড়ী ফলার খেয়ে কিম্বা এরূপ গালি খেয়ে বেড়ান। পরের প্রকৃত প্রেম কেমন করেই বা বুঝবেন।

অনঙ্গ। বায়ুবেগে এই বনে ক'রে অন্বেষণ,
মানদা সুন্দরী দেখ কোথায় এখন।
প্রণয়ে পীড়িত বামা, বিমলিন মুখ,
নিশ্বাস অনলে তার শুকাইছে বুক।
পাতি মায়াজাল তারে আনগে এখানে,
পুষ্পরসে রঞ্জি আমি ইহার নয়ন।
পণ্ডু। এই তীরবেগে আমি চলিনু এখন

[পণ্ডুর প্রস্থান]

অনঙ্গ। স্মর শরাঘাতে আরক্ত বরণ
কুসুমাসব
পশিয়া নয়নে উথল ইহার
প্রণয় স্রব।
মেলিলা নয়ন মানদার পানে
দেখিবে যবে;
ভাঙ্গিবে স্বপন, মানদা তখন
প্রেয়সী হবে।

(পণ্ডুর প্রবেশ)

পণ্ডু। পরীরাজ! দেখুন—মানদা আসছে। আর দেখুন—যে যুবার চোখে আমি ফুলের রস দিয়েছিলাম, সে কেমন সাধাসাধি করছে। ছোঁড়ার যেন মাতৃবিয়োগ হয়েছে! একবার মজাটা দেখুন। হরি হরি! মানুষ জাতি কি এতই পাগল?

অনঙ্গ। সরে দাঁড়া, ওরা যে গোল কচ্ছে, তাতে আমার ভয় হচ্ছে—পাছে বিপিন জেগে উঠে।

পণ্ডু। তাহলে হন্দ মজাই হবে; একটি মেয়েমানুষ নিয়ে দুটিতেই ক্ষেপে উঠবে। দোহাই মহারাজ! এই ঝগড়াটা মাটি করবেন না, দেখা যাক, শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়।

(বিনোদ আর মানদার প্রবেশ)

বিনোদ। মানদা! তোমার কেন এ বিষম ভ্রম!
উপহাস করিতে কি ঝরে অশ্রুজল?

এই দেখ সিক্ত মম যুগল নয়ন,
তবু কি আমার প্রেম রহস্য কেবল?

মানদা। কেন এই বিড়ম্বনা? কেন প্রবঞ্চনা?
তব প্রেম প্রমদায়—আমায় ছলনা!
ছাড়িয়াছ কি গো প্রমদার আশা?
ভুলিলে কি ভুলা যায় প্রেম ভালবাসা?

বিনোদ। ভালবাসিতাম তারে ছিলাম অজ্ঞান!

মানদা। আমায় বাসিছ ভাল, কিসে হলো জ্ঞান?

বিনোদ। বিপিন তাহার, ভালবাসে না তোমায়!

বিপিন। (জাগিয়া)—
মানদে! রূপসি! তুমি মন্মথমোহিনী!
অতুল তোমার নেত্র, নীলমণি জিনি।
আরক্ত অধর তব—কি চারু-দর্শন!
মধুপূর্ণ সুধাফল চুম্বনের ধন
যবে কর-পদ্ম তুমি কর সঞ্চালন,
মানসে কনক-পদ্ম সলিল-বরণ।
দেও প্রিয়তমে সেই কর সুকোমল!
বারেক চুম্বিয়া হই প্রেমেতে বিহ্বল।

মানদা। হা বিধাতঃ! হা নরক! তোমরা সকলে,
দহিবে আমাকে তীব্র রহস্য-অনলে?
তোমাদের হৃদয় কি এতই পাষাণ?
নাহি দয়া!—অবলার এত অপমান?
করিয়াছ, কর ঘৃণা; তাহাতে কি হায়!—
পুরিল না সাধ? ছি ছি বল না আমায়!
মানুষ কি নহ? ধর মানুষ আকার;
আমি কুলবালা—মোরে এই ব্যবহার?
সমস্ত হৃদয় সহ ঘৃণা কর যারে,
কেন এ প্রশংসা?—কেন বিড়ম্বনা তারে?
প্রতিযোগী দুইজন প্রেমে প্রমদার;
এখন আমায় একি ছলনা আবার!
শুধু উপহাস তরে? এ বীরত্ব সার—
দুঃখিনী রমণীনেত্রে অশ্রুর সঞ্চার!

বিনোদ। বিপিন! নির্দ্দয় তুমি ছাড় না ছলনা। •
আমার হৃদয়েশ্বরী মানদা ললনা!
প্রমদা প্রেমিক তুমি, ছাড় না তাহায়;
প্রমদার প্রেম-রাজ্য দিলাম তোমায়।
মানদা আমার এই জীবনে জীবন,
বেসেছি, বাসিব ভাল, যাবত মরণ।

মানদা। আমি যে আর উপহাস সহ্য ক'রতে পারছি না।

বিপিন। বিনোদ! প্রমদা তবু, চাহি না তাহায়।
ভুলিয়াছি তার প্রেম-স্বপনের প্রায়।

তাহার নিকটে মম আতিথ্য গ্রহণ
মানদা আমার চির প্রেম নিকেতন।

বিনোদ। মানদে! জানিও তুমি, সব প্রবঞ্চনা।

বিপিন। যদি তুচ্ছ কর প্রেম, নিজে যা জান না,
সমুচিত প্রতিফল পাইবে তাহার।
ওই আসিছেন দেখ, প্রেয়সী তোমার।

(প্রমদার প্রবেশ।)

প্রমদা। তমসা রজনী করে নয়ন নিষ্ফল;
কিন্তু করে সেই মত শ্রবণ প্রবল।
বিনোদ! তোমারে নাহি দেখিল নয়ন;
আনিল হেথায়, স্বর শুনিয়া শ্রবণ।
নির্দ্দয়! কেমনে এলে ছাড়িয়া আমায়?

বিনোদ। কেমনে থাকিব বল, প্রেমে লয়ে যায়।

প্রমদা। আমারে ছাড়িয়ে হায়, বিনোদে আমার
কার প্রেমে নিতে পারে?

বিনোদ। প্রেমে—মানদার।
নিশীথিনী শোভাময়ী শশি তারাহারে;
মানদার রূপে আরও উজলে তাহারে।
অকারণ কেন তুমি আইলে হেথায়?
ঘৃণা করি ছেড়ে এনু, বুঝিলে না হায়!

প্রমদা। এ কথা মনের নয়—মুখের কেবল।

মানদা। বটে বটে! এ মন্ত্রণা তোমার কৌশল।
তিন জনে এ মন্ত্রণা করিয়াছ হায়!
করিবে আমোদ ভাল লইয়া আমায়।
রে প্রমদা কালামুখী! কৃতঘ্ন কামিনী!
যুগল প্রণয়ী সহ করেছ মন্ত্রণা,
জঘন্য রহস্য-জালে বঞ্চিতে আমারে?
ভুলেছিস সব কথা ভগিনীর প্রেমে
করেছি প্রতিজ্ঞা কত মিলিয়া দু'জনে?
কত দিন, কত সুখে, বসিয়া বিরলে,
চঞ্চল চরণ কালে কতই লাঞ্ছনা
দিয়েছি উভয়ে মিলি—বিচ্ছেদের ভয়ে?
ভুলেছ কি—সাধের সে শৈশব-সখিত্ব—
ছিনু সহপাঠী যবে, সরল হৃদয়ে?
দু'টি শিল্প-সুনিপুণা দেববালা মত,
রচিতাম এক ফুল।—একই বসনে,
কত সুখে একাসনে বসিয়া দু'জনে,
গাহিতাম গান কত, সম সুরতানে!

মানদা। আহা মরি!—যেন, এক কর, এক স্বর,
এক প্রাণ, এক দেহ, একই সকল।
তেমনি আমরা বোন্ বাড়িনু দু'জনে,
যেন, মুগ্ধ চারু রম্ভা—সরল কোমল,

স্বতন্ত্র, অথচ সেই স্বাতন্ত্র্যে মিলিত।
এক বৃন্তে যেন দুই বিনোদ কুসুম,
এক প্রাণ, তবু দুই ভিন্ন কলেবর।
সে প্রেম—সে ভালবাসা ছিঁড়িয়া এখন,
তুমিও মিলিলে সখি, পুরুষের সনে—
উপহাসে ব্যথা দিতে দুঃখিনী জীবনে?
রমণীর ধর্ম্ম একি? ধর্ম্ম বন্ধুতার?
করিবে রমণীজাতি তব তিরস্কার।

প্রমদা। আমি ভাই তোমার রাগ দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছি না, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ!

মানদা। বিনোদে কি বল নাই, তুমি নিন্দাচ্ছলে
প্রশংসিতে মম নেত্রে বদনমণ্ডলে?
দ্বিতীয় নায়ক তব কুহকী বিপিনে—
এই মাত্র যে আমাকে ঠেলিয়াছে পায়—
বলনি ডাকিতে মোরে—"মন্মথ মোহিনী!
ত্রিদিবসুন্দরী!" বলি? অভাগিনী আমি,
অন্যথা আমারে কেন হেন সম্ভাষণ?
তব প্রেমে বিনোদের পরিপূর্ণ প্রাণ,
সে কেন ছলনা করি, করে প্রেমদান?
জানি আমি তব সম নহি রূপবতী,
না দোলে গলায় মম প্রণয়ী ব্রততী।
দুঃখিনী আমার মত নাহি এ সংসারে;
যে না ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে!
তাই কি উচিত হেন ঘৃণিতে আমারে?

প্রমদা। তুমি কি বলছ বোন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মানদা। ভাল কপটতা! এবে মিলিল বচন;
আমি ফিরাইলে মুখ, হাসি পরস্পরে
করিও না নয়ন ভঙ্গি—মিলিয়াছ ভাল!
থাকিলে সে দয়া মায়া শীলতা তোমার,
করিতে না হেন ব্যঙ্গ আমায় কখন।
চলিলাম বোন! দোষ আমারি সকল;
মৃত্যুই ইহার এক প্রতিকার-স্থল!

বিনোদ। মানদে, দাঁড়াও শুন, রহ এক তিল;
প্রেয়সী! জীবন মম! মানদা সুন্দরী।

মানদা। চমৎকার!

প্রমদা। প্রাণ! হেন ব্যঙ্গ করিও না আর!

বিপিন। বিনয় বিফল হ'লে শিখাইব বলে।

বিনোদ। বলে? তুই শিখাইবি বলে? প্রমদার
বিনয়ের সমতুল পরাক্রম তোর?
মানদে! তোমার প্রেম আমার জীবন;
কৃত্রিম প্রেম বলিবে যে জন,
তার রক্তে মম বাক্য করিব প্রমাণ।

বিপিন। আমার প্রেমের কাছে তুচ্ছ সেই প্রেম।
(মানদাকে চাহিয়া)
বিনোদ। মিথ্যাবাদি! দেখা অস্ত্রে প্রেমের প্রমাণ।
বিপিন। দেখাইব আয়।
প্রমদা। হায় একি সর্ব্বনাশ!
(বিনোদের কর ধারণ)
বিনোদ। দূর হ রে কালামুখি।
বিপিন। না না,—বিধুমুখি!
কেন কষ্ট পাও তুমি, ছাড় না উহারে?
হেন কাপুরুষ কভু, পাবে কি এ বনে?
বীরত্ব মুখেই শুধু!
বিনোদ। দূর হ, সরে যা ছাড়, ছেড়ে দে আমায়;
পিশাচি! ছাড়িব তোরে ভুজঙ্গের মত!
প্রমদা। কেন এ নিষ্ঠুর ভাব। কেন রূপান্তর,
বল প্রিয়তম!
বিনোদ। তোর প্রিয়তম! তুই কাল কুরূপিণী,
ঘৃণিত ঔষধি, বিষ, দূর হ' ডাকিনী।
প্রমদা। ছাড় এই ব্যঙ্গ আর।
মানদা। ব্যঙ্গ তোমারি সকল।
বিনোদ। বিপিন, রাখিব পণ তোমার সহিত।
বিপিন। কি দৃঢ় বন্ধন তব! ইচ্ছা করে মম,
হইতে ওরূপ বন্দি, দেখাতে বিক্রম।
বিনোদ। তোর ইচ্ছা মারি আমি, অবলা রমণী;
যদিও তাহারে সত্য ঘৃণা করি আমি,
কিন্তু কোন কষ্ট দিতে পারিব না তারে।
প্রমদা। ঘৃণার অধিক কষ্ট কি আছে জগতে?
ঘৃণিছ আমায় নাথ! কোন্ অপরাধে?
আমি কি প্রমদা নহি? তুমি সে বিনোদ?
যেমন ছিলাম আমি, আছি ত তেমন।
এ নিশীথে কত ভাল বাসিলে আমায়;
এই নিশীথেই হায় ছাড়িলে আমায়?
কেন? ক্ষম দেবগণ!
বিনোদ। সত্য কথা বলি;
তোমায় দেখিতে আর নাহি মম সাধ।
ছাড় আশা, ত্যজ ভ্রম, ফিরে যাও ঘর!
নিশ্চয় জানিও, তুমি ঘৃণিত আমার;
মানদা সুন্দরী মম প্রাণ-প্রণয়িণী।
প্রমদা। ধিক কুহকিনী! ধিক নারী-কলঙ্কিনী।
ধিক তস্করিণী! তুই আসিলি নিশীথে,
হরিতে সর্ব্বস্ব মম প্রাণেশ-হৃদয়।
মানদা। ভাল কথা! খেয়েছ কি শীলতা নারীর?
খেয়েছ লাজের মাথা? খাইতে কি চাহ—

আমার লাজের মাথা? নীচ-সম্ভাষণে
সম্ভাষিতে তোরে—রসনা বেদনা পায়!
দূর হ'রে পোড়ামুখি! নীচতার ছবি।

প্রমদা। নীচতার ছবি? ওহো, বুঝিয়াছি আমি,
দু'জনের দেহ-ছায়া করেছ তুলনা!
খর্ব্ব আমি, দীর্ঘাঙ্গিনী তুমি—বুঝিয়াছি,
দোলায়ে দীর্ঘাঙ্গ তার হরিয়াছ মন।
খর্ব্ব আমি! সুসজ্জিত তালতম্বী তুমি!
তালগাছ! হও দীর্ঘ, নয়ন তোমার—
ছুঁইতে পারিবে তবু নখর আমার।

মানদা। দেখ, আমি তোমাদের পায়ে পড়ি। তামোদের রঙ্গ করতে ইচ্ছা হয়, কর, কিন্তু ইহাকে আমায় আক্রমণ করতে দিও না। গালাগালিতে আমার বিদ্যা অল্প; আর আমি যথার্থ অবলা। সে যেন আমাকে মারে না। তোমরা মনে করতে পার যে, সে কিছু বেঁটে, সে আমার সঙ্গে জোরে পারবে না।

প্রমদা। বেঁটে! আবার শোন।

মানদা। প্রমদা, দেখ বোন আমাকে এরূপ গালাগালি দিও না। আমি তোমাকে চিরকাল ভালবেসেছি, কখনও তোমার কোন মন্দ করি নাই, কখনও তোমার কোন কথা কাহাকে বলি নাই। কেবল বিপিনকে ভালবাসি বলে, তোমাদের এই বনে পালিয়ে আস্‌বার কথাটি তাকে মাত্র বলেছিলাম। সে তোমাদের পশ্চাৎ এসেছে; আর তার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তার পশ্চাৎ এসেছি। এস, তার প্রতিফল পেয়েছি, মুখ খেয়েছি, মার খেয়েছি, শেষে পদাঘাত পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। তা বোন, আমার মূর্খতা আমি মাথায় ক'রে নগরে চল্‌লাম। তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা আর আমার পশ্চাৎ আসিও না। দেখ, আমি কেমন সরল, প্রণয়ে বিহ্বল, আমাকে আর জ্বালা দিও না।

প্রমদা। যেতে হয় দাও তুমি, কে রাখে ধরিয়া!

মানদা। অবোধ হৃদয়, যাহা যেতেছি রাখিয়া!

প্রমদা। বিনোদের কাছে?

মানদা। না না, বিপিনের পায়ে।

বিনোদ। মানদে! তুমি প্রমদার ভয় করিও না; তোমার কেশাগ্রও ছুঁতে পার্‌বে না।

বিপিন। তুমি তাহার সারথি হইলেও কোন ভয় নাই।

মানদা। মা গো, প্রমদা যখন রাগে, তখন যেন বুনো বিড়াল। সে যখন পাঠশালায় পড়্‌তো, তখন ও একটি ক্ষুদ্র খেঁকশেয়ালি ছিল। এখনও যদি ক্ষুদ্র, তবু ওতে বিষ কত!

প্রমদা। আবার ক্ষুদ্র! কেবল ক্ষুদ্র, আর খর্ব্ব! এ ভিন্ন আর কথা নাই! তোমরা কি তাকে এরূপ ক'রে আমার নিন্দে কর্‌তে দেবে? সর, আমাকে একবার ওর কাছে যেতে দেও, আমি তালগাছটা একবার মেপে নিই।

বিনোদ। তুই এক পা এগোবি, আমি অমনি তোকে পোকাটির মত ডলে মার্‌বো।

বিপিন। দেখ, যে তোরে ভালবাসে না, তার খোসামুদি করে কি ফল? আর "মানদা, মানদা" করিস্‌ না। আবার মানদার নাম মুখে আন্‌বি, তবে তার প্রতিফল পাবি।

বিনোদ। কি তোর হাতে প্রতিফল? চল, মানদাতে কার অধিকার বেশী—অস্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করি।

বিপিন। চল মাখনলাল! কীচক-বধ দেখ্‌বে।

[বিপিন এবং বিনোদের প্রস্থান]

প্রমদা। সর্ব্বনাশি! তোরই জন্যে এই আগুন জ্বলল। পালাস-নে।

মানদা। তোর কাছে আমি আর থাক্‌ব না। তোর হাত দু'খান বিজলি-বেগে চলে, আমি তোর কাছে পার্‌ব না। আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান]

প্রমদা। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—এ কি হলো!

[প্রস্থান]

অনঙ্গ। পঞ্চু, এসব তোর কীর্ত্তি। তুই বোধ হয় জেনে-শুনে আমোদ দেখবার জন্যে এসব করেছিস্।

পঞ্চু। দোহাই মহারাজের, আমি সত্য সত্যই ভুলেছিলাম। আপনি এক যুবক ও এক যুবতীর কথা বলেছিলেন; আমিও এক যুবতী ও এক যুবক পেয়েছিলাম, আর যেমন আদেশ ছিল, তাহাই প্রতিপালন করিয়াছিলাম। কিন্তু মহারাজ, ভুল করে অন্যায় করি নাই; এদের ঝগড়াতে দু'শ' মজা!

অনঙ্গ। গিয়েছে যুবকদ্বয়, প্রণয়ে পাগল,
অন্বেষিতে এই বনে সংগ্রামের স্থল।
যাও পঞ্চু, নিশীথিনী কর তমোময়;
লুকাইয়া গগনের আলোক নিচয়,
আচ্ছাদিয়া কুয়াসার ঘন আবরণে,
প্রতিকূল পথে ল'বে যুবক দু'জনে।
বিনোদের মত স্বর করিয়া তোমার,
করিবে বিপিনে তুমি শত তিরস্কার।
সেইরূপ বিপিনের স্বর অনুকারি,
দু'জনে দু'দিকে ল'বে এরূপে প্রতারি।
শমনের প্রতিবিম্ব নিদ্রায় যেমন
গুরু করে বিনোদের মুদিবে নয়ন,
এই লতিকার রস নয়নে তাহার
দিলে ঢেলে, এ ভ্রম ঘুচিবে যুবার।
নিদ্রান্তে ভাবিবে যুবা সকলি স্বপন,
সুখে বৈজয়ন্ত-গৃহে ফিরিবে তখন।
আমি যাই, রাণী হ'তে লয়ে সে কুমার,
মোহ-স্বপ্ন হতে তারে করিতে উদ্ধার।

পঞ্চু। যান প্রভু, বিলম্বের নাহি অবসর।
রজনী-রথের অশ্ব, লঙ্ঘিয়া অম্বর,
চলিছে নক্ষত্র বেগে; ঊষার কিরণ
ছাইছে পূরবাকাশ। অপদেবগণ
ছুটিয়াছে পালে পালে শ্মশানে-গহ্বরে
লুকাইতে পাপ দেহ সভয় অন্তরে।

অনঙ্গ। কিন্তু পঞ্চু, আমাদের রূপ অন্যতর।
আমরা প্রভাতে কেলি করি মনোহর।
আমরা বেড়াই বনে প্রফুল্লিত মন;
যদবধি পূর্ব্বাকাশ, করি উন্মোচন
তিমির কপাট, বর্ষে আরক্ত অনল
অনন্ত সমুদ্রগর্ভে, কিরণ বিমল,

নীল লবনাম্বু করি সুবর্ণে মণ্ডিত।
যা হক, বিলম্ব আর না হয় উচিত।

[প্রস্থান]

পঞ্চু। আকাশে উড়িয়ে,
নাকে দড়ি দিয়ে,
ঘুরাব বনে;
নগরে প্রান্তরে,
পঞ্চানন স্বরে,
বিচল মনে।
কে না ছুটে যায়, বিচল মনে!
এই যে একটি সম্মুখে উপস্থিত।

(বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ। কৈ, দাম্ভিক বিপিন কোথায়? এখন উত্তর করিস্ না কেন?
পঞ্চু। এখানে, ধূর্ত্ত! তরবারি হস্তে আমি প্রস্তুত; তুই এখন কোথায়?
বিনোদ। এই তোর যম আসছে।
পঞ্চু। আয়! চল সমান জায়গায় চল।

[স্বর অনুসরণ করিয়া বিনোদের প্রস্থান]

(বিপিনের প্রবেশ)

বিপিন। বিনোদ! চুপ—করেছিস্। রে ভীরু! রে পলাতক! কোথায় কোন্ জঙ্গলে লুকিয়েছিস্ বল্!
পঞ্চু। কাপুরুষ! দম্ভ তোর নক্ষত্রের কাছে।
বড় যুদ্ধসাধ আছে?
আয় ভীরু, আয় দেখি, আয় নরাধম্,
কশাঘাতে পৃষ্ঠে রক্ত করিব নির্গম।
তোর জন্যে তরবারি যে করে ধারণ,
রমণী-অধম সেই।
বিপিন। দাঁড়া সেইখানে।
পঞ্চু। বুঝিব বীরত্ব তোর, চল অন্য স্থানে।

[প্রস্থান]

(বিনোদের প্রবেশ)

বিনোদ। পলায় সম্মুখে, আর করে আবাহন,
আমি অগ্রসর হলে করে পলায়ন।
নিকৃষ্ট আমার চেয়ে বেশী দ্রুতগামী;
ছুটিয়াছি আমি, তত নহি দ্রুত আমি।
সব অন্ধকার, পথ না দেখে নয়ন;
শুইব এখানে, দিবা আসুক এখন।
যদি পাই তারে, দিবা! তোমার কৃপায়,
সমুচিত শিক্ষা আমি শিখাব উহায়।

(নিদ্রা)

(পঞ্চু ও বিপিনের প্রবেশ)

পঞ্চু। ভীরু! কেন নহ অগ্রসর?

বিপিন। সাহস যদ্যপি এত, রহ সম্মুখীন।
ভালমতে জানি আমি প্রকৃতি তোমার;—
নহ ক্ষম—সম্মুখে দাঁড়াতে ক্ষণকাল,
ইতস্ততঃ পলায়ন ভরসা কেবল।
কৈ কোথায় এখন তুমি?

পঞ্চু। এই আমি—এস এই দিকে।

বিপিন। বুঝিয়াছি উপহাস করিতেছ তুমি?
সমুচিত ফললাভ করিবে ইহার—
দিবসে যদ্যপি পাই দেখিতে তোমায়।
যাও এবে! শ্রান্তিভারে এ তনুবল্লরী—
শান্তি-আশে নতপ্রায় নীহার-শয়নে।
পূরব-গগনে ঊষা উঁকি দিবে যবে,
তোমার প্রভাব আমি দেখিব তখন।
(শয়ন ও নিদ্রা)
(মানদার প্রবেশ)

মানদা। ক্লান্তিময়ী মন্থরগামিনী বিভাবরী!
চঞ্চলচরণে ত্বরা করহ প্রয়াণ।
দেব দিবাকর! পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি'
দেখাও শান্তির বিভা—দিবা সমাগমে
ফিরে যাহে যেতে পারি বৈজয়ন্তপুরী
ত্যজিয়া সংসর্গ হেন ঘৃণার আকর।
এস নিদ্রে বিরামদায়িনী শান্তিময়ী!
শান্তিক্রোড়ে ভুলাইয়া রাখ তনয়ারে।
বিষাদ-বিকল সদা নিঝর-নয়ন।
মুদিত করহ তারে বিস্মৃতি-আধারে।
(শয়ন ও নিদ্রা)

পঞ্চু। একটি দু'টি তিনটি, কোথায় গেল আরটি,
ঘোড়ায় ঘোড়ায় চাট্টি মিলে যাবে।
বিরসমুখে ঐ আসে, ছি ছি ছি মদ্না হাসে
আহা! ছুঁড়িদের পাগল বানাবে।
(প্রমদার প্রবেশ)

প্রমদা। এত ক্লান্তি, এত দুঃখ না ভুঞ্জিনু কভু।
নীহার-নিষিক্ত দেহ, কণ্টকে ব্যথিত;
না পারি চলিতে আর, গমনে অক্ষম;
পরিক্লান্ত পদদ্বয়—না চলে ইচ্ছায়।
এখানে বিরাম লভি—প্রভাত আশায়।
দ্বন্দ্বক্ষেত্রে রক্ষিবেন বিনোদে ঈশ্বর
(শয়ন ও নিদ্রা)

পঞ্চু। ভূমি প'রে, অকাতরে, অঘোরে ঘুমাও।
চোখে চোখে রস মেখে, বিভ্রম ঘুচাও।
(বিনোদের চক্ষে রস প্রদান)
যখন জাগিবে, আনন্দ পাইবে,

সম্মুখে হেরিয়ে গৃহিণী-রতন।
চলিব কথায়, সবারে জানায়,
নাহি হয় পর আপনার জন।
কারো ক্ষতি হলো না
কারো কষ্ট রৈলো না;
যে যারে ভালবাসে,
সে গেল তার পাশে,
আমি এবে করি পলায়ন॥
তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনাংশে বিনোদ, বিপিন, মানদা ও প্রমদা নিদ্রিত।

ত্রিতারা ও ভূতোর প্রবেশ; সঙ্গে সঙ্গে বেলফুল, বকফুল বকুলফুল ও বেগুনফুল প্রভৃতি পরীগণ; তৎপশ্চাতে অলক্ষ্যে অনঙ্গ।

ত্রিতারা। এস নাথ বস এই কুসুম-আসনে,
চুমিব বয়ান চারু—বড় সাধ মনে।
সাজাইয়া সুগন্ধি—গোলাপে কেশদাম
হেরিব নয়ন ভরি, মুরতি সুঠাম।

ভূতো। বেলফুল, কোথায়—কই?

বেলফুল। হুজুরে হাজির এই!

ভূতো। এস, তোমায় মাথায় গুঁজে রাখি! কৈ বকফুল মশায়! আপনি কোথায়?
আজ্ঞে এই যে হাজির!
আচ্ছা, তুমি যাও—তৈরি থাক গে, বিশকর্ম্মা পূজার দিন কচুপাতে করে তুলি আনবো—হাজির থেকো। কৈ, বকুলফুল মশায় আপনি গেলেন কোথায়?

বকুলফুল। দাসী আজ্ঞাধীনা সদা।
কি আদেশ, পালিব এখনি!

ভূতো। অত সঙ্কোচে আর কাজ কি!
এস তোমায় মাথায় তুলে রাখি!

ত্রিতারা। প্রাণনাথ, শুনিবে কি—সঙ্গীত মধুর!

ভূতো। গাওনায় আমি খুব বাহাদুর!
দলের মধ্যে 'সেরা' একটর!

বাজনাও আমি যেমন বুঝি, তেমন আর কেউ নয়! কেবল ভাই! বাজনার মধ্যে যদি বল তো ঢাক!—কি মধুর ঠাণ্ডা বাদ্যি ভাই! আমি বড় ভালবাসি ঢাকের বাদ্যি! ভাল নয় কি ভাই?

ত্রিতারা। কিবা দ্রব্য খাইতে বাসনা প্রিয়তম!

ভূতো। রাঙা রাঙা ভাত, শুঁটকি মাছের ঝোল,
পুঁই-ডাঁটার চচ্চরি!
আহা-হা! আমরি!

ত্রিতারা। দধি দুগ্ধ ক্ষীর সর নবনী মাখন।
কিবা অভিমত নাথ, করি আয়োজন।

ভূতো। গুড় আর মুড়ি, একটা পাকাকলা!
আহা! যেন সক্‌সক্‌ কর্‌ছে এ নোলা!
পারতো করগে যোগাড় গপাগপ্‌ সারো!
ঘুম আসছে আমার এখন আমি ঘুমবো।
একটুখানি সরে যাও, মিনতি তোমায়।
মানা ক'রে দিও সবে, যেন না জাগায়।

ত্রিতারা। নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে কর শ্রান্তি দূর,
এ কর-পল্লবে দাসী, করিবে ব্যজন।
পরীগণ! যাও এবে নিজ নিজ স্থানে। [পরীদের প্রস্থান]
অনুরাগে ফুলময়ী মাধবী বল্লরী,
ভুজপাশে তমালে বেড়িয়া রহে সদা;
ফুল্লফুলে শোভাময়ী কতই লতিকা—
পাদপের উষর কণ্টক দেহ 'পরে—
ঘিরে রহে হীরক-অঙ্গুরী সম ছাঁদে;
প্রাণনাথ পাশে দাসী রহিবে তেমতি।
(উভয়ে নিদ্রা)
(পঞ্চুর প্রবেশ)

অনঙ্গ। (অগ্রসর হইয়া)—
এস পঞ্চু দেখেছ কি অদ্ভুত কৌতুক?
ক্ষোভ হয়, দেখে হেন বিহ্বল প্রণয়!
বনান্তে সেদিন যবে দেখা মোর সনে;
বাধিল উভয়ে দ্বন্দ্ব; তিরস্কার কত
করিলাম তায়—ঘৃণিত পশুর পিছে
প্রেম-অন্বেষণ-হেতু! আশ্চর্য্য পতন!
কি কৌতুক! সুবাসিত ফুলের মুকুটে
সাজাইয়া দেয় রাণী রাসভের শির!
নিশির শিশির শোভে গোলাপ-মুকুলে
সুচিকন মুক্তাবিম্ব প্রায়; এবে হায়!
নয়ন-পল্লবে বসি, অশ্রু-রূপে যেন,
বিলাপিছে আপনার অসম্মান হেরি!
ইচ্ছামত তিরস্কার করিলাম কত;
শীলতার শান্তি-ভিক্ষা মাগিল তখন
চাহিলাম বালকে আবার; বিনা বাক্যে
করিল অর্পণ—নিজ সহচরী সহ;
পাঠাইলা পরীরাজ্যে নিকুঞ্জে আমার।
করগত আজি সে কুমার; যাই এবে
দৃষ্টির বিভ্রম তার করি গিয়ে দূর।
নিদ্রামগ্ন বৈজয়ন্তবাসী সূত্রধর;
দেও পঞ্চু খুলে দেও মুখোস তাহার;
নিদ্রাভঙ্গে—জাগরণে, সবাকার সনে—
ফিরে যাহে যেতে পারে বৈজয়ন্তপুরে
অমূলক স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছু যেন,

মনে কেহ নাহি করে রাত্রির ঘটনা।
যাই আমি, রাণীর বিভ্রম করি দূর।
(চক্ষে ফুলের রস দিতে দিতে)
'যেমন ছিলে, তেমনি হও,
যেমন দেখতে তেমনি চাও;
মদন-শরে ফুলের রসে,
পাও সে বন, উঠহ হেসে।'
প্রাণের ত্রিতারা উঠ পরীরাণী।

ত্রিতারা। নাথ! নাথ! একি দেখি অদ্ভুত দর্শন!
গর্দ্দভের প্রেমে মুগ্ধ ছিনু এতক্ষণ!

অনঙ্গ। ভালবাসা তার প্রতি পড়েছে তোমার।

ত্রিতারা। কেমনে ঘটিল হেন অদ্ভুত ব্যাপার!
কি ঘৃণা! লজ্জার কথা! হা ধিক আমার!

অনঙ্গ। বৃথা অনুতাপে আর কিবা প্রয়োজন;

পঞ্চু। এখন মুখোসটা ওর মাথা থেকে সরিয়ে ফেল। প্রিয়ে ত্রিতারা! তুমি গান গাও।

(ত্রিতারার গান)

মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ প্রাণ। এস প্রিয়ে,
ভমি ধীরে নিদ্রালুদিগের দিকে গিয়ে।
কপোত-কপোতী সম আমরা দুজন—
বদ্ধ পুনঃ হইলাম নব অনুরাগে।
প্রমোদিনী নিশীথিনী কালি সুরপুরে—
পরিণয় উৎসবে প্রমত্ত হ'বে সবে;
সুরেশ্বর মিলিবেন হেমলতা সনে—
সানন্দ-লহরী চির-বিজলী খেলিবে।
সে আনন্দ দ্বিগুণিত করিবারে প্রিয়ে,
নৃত্যগীতে সুরেশ্বরে তুষ্টিব আমরা।

পঞ্চু। পরীরাজ! আজি কি আনন্দ অনুপম!
প্রভাতী-কাকলী-গীতি গায় মনোরম।

অনঙ্গ। হের প্রিয়ে, নীরবে নিশীথ চলি যায়;
আমরাও ধরি এস, পদাঙ্ক তাহার।
চঞ্চল চরণে চাঁদ চলে কক্ষপথে,
পশ্চাতে তাহারে ফেলে চল গৃহে যাই।

ত্রিতারা। এস নাথ, যাই তবে আপন আলয়ে।
যাত্রাকালে ব'লো মোরে রাত্রির ঘটনা;
কি হেতু নরের সহ, ভূমির উপরে,
নিদ্রিত ছিলাম আমি, আপনা ভুলিয়া! [উভয়ের প্রস্থান]
(সুরেশ্বর, হেমলতা, অজয় এবং অনুচরবর্গের প্রবেশ)

সুরেশ্বর। ধীরে ধীরে অবসিত চারি বিভাবরী।
মধুর কাকলী-স্বনে-আবাহন-গীতি

সুপ্রভাতে বসাইছে রত্নসিংহাসনে।
আজি সে সুখের দিন!—আনন্দলহরী
খেলে প্রাণে—অচঞ্চল বিজলী-সমান।
সে মধুযামিনী আজি!—সুনীল অম্বর
ভাসিবে হাসিবে স্রোতে শুভ্র নিরমল,
শরতের রজত-প্রতিমা নিশামণি—
প্রতিচ্ছবি ধরিবেন—স্বচ্ছ হৃদাকাশে;
বিবাহ-বিলাসে হ'ব বিভোর দুজনে।
এস প্রিয়ে! দেখি গিয়ে—কিবা নবসাজে
সাজিয়াছে বৈজয়ন্ত পুরী মনোরম—
উঠিয়াছে কি মধুর সঙ্গীত-লহরী,
পবন-হিল্লোল-সনে দূর নভোস্থলে।

হেমলতা। যেন নাথ! সে উল্লাসে বিশ্ব মাতোয়ারা
আনন্দে নিঝর কিবা নাচে; পিকবধূ
নিভৃত নিকুঞ্জ কিবা মাতায় সঙ্গীতে।
হাসে ধরা মনোহরা-শোভে বনস্পতি
নবীনা বল্লরী সহ—সে নব-বসনে।
যেদিকে নিরখি প্রাণ!—উলাস-অলস
সবে হেরি—কি মধু সঞ্চয়ে আহা মরি!

সুরেশ্বর। (হঠাৎ মানদা প্রভৃতিকে দেখিয়া)—
দেখ—দেখ!—এ কারা এখানে? নিতম্বিনী—
সুচারুহাসিনী বামা!—অপ্সরা, কি পরী?

অজয়। নরনাথ! নহে এরা—অপ্সরী কি পরী!
প্রমদাসুন্দরী এই—তনয়া আমার'
কৃতঘ্ন বিনোদ এই, ওই সে বিপিন!
মানদা—নন্দের কন্যা, ওই সুরপতি!
বিস্ময় মানিনু এবে! অদ্ভুত দর্শন!—
নিদ্রাগত চারিজনে রহে এক ঠাঁই?

সুরেশ্বর। এসেছে নিশ্চিত এরা—রাখিতে সম্মান—
আমাদের, বিবাহ-উৎসব আজি শুনি'।
নিদ্রাভঙ্গে—জাগরণে, দেখিবে এখনি,
সে আনন্দে একান্তে করিবে যোগদান।
ভাল কথা মনে হ'লো! আজি না অজয়!
প্রমদা উত্তর দিবে—কারে ভালবাসে?

অজয়। সত্য প্রভু। আজি তার উত্তরের দিন।

সুরেশ্বর। যাও তবে! আদেশ করহ অনুচরে—
ভেরীনাদে জাগাইতে সুপ্ত-সবাকারে।

(ভৃত্যের ভেরী-বাদন। বিপিন, বিনোদ, মানদা এবং প্রমদার সচমকে জাগরণ)

সুমঙ্গল করুন বিধাতা। সমাগত—
এবে সে সুখদা ঋতুরাজ! আশা মোর—
কপোত-কপোতী সম র'হ অনুরাগে।

বিনোদ। ক্ষম দাসে, নরনাথ!

সুরেশ্বর। দাঁড়াও তোমরা সবে সম্মুখে আমার।
জানিতাম—পরস্পরে ছিল বৈরীভাব;
মধুর মিলন হেন—অপূর্ব্ব ঘটন!
এত দ্বেষ—এত ঘৃণা, কোথা গেল এবে?
চির-নিমিলিত বুঝি সুষুপ্তি-আঁধারে!

বিনোদ। নাহি জ্ঞান—কি উত্তর দিব নরনাথ!
নিদ্রিত কি জাগরিত—বিভ্রম এমন!
সর্ব্বসাক্ষী দেবগণ—জানেন তাঁহারা;
না জানি নিশ্চিত কিছু—কেন বা এখানে!
গভীর আঁধারে ঘেরা সূক্ষ্ম স্মৃতিপাশে—
যতটুকু ক্ষীণদৃষ্টি পারে প্রবেশিতে,
সত্য ততটুকু দেব!—এইমাত্র জানি—
অমরার কঠোর বিধান হ'তে দূরে—
প্রমদার প্রেম-আশে আসিনু পলা'য়ে।

অজয়। ধর্ম্মরাজ! পাইলেন—প্রচুর প্রমাণ।
চোরের উচিত শাস্তি করুন বিধান।
কি বঞ্চনা-প্রতারণা—দেখছ বিপিন!
পিতা আমি—কন্যা নহে মম আজ্ঞাহীন?
প্রমদা তোমার পত্নী—আমার আদেশে!
দোঁহার অজ্ঞাতে তারে হরিল অনা'সে।

বিপিন। নরনাথ! যেই দিন নিভৃত নিশীথে—
বনপথে পলায়ন করিল দু'জনে;
সে বারতা মানদাসুন্দরী আনি দিলা।
সচকিতে ছুটিনু পশ্চাতে, মানদাও—
ধরিল বিহ্বল-প্রাণে পদাঙ্ক আমার।
এবে নাথ! জানি না কি দেব-প্রভা-গুণে—
দেবশক্তি সংশয় নাহিক তাহে কিছু—
এত প্রেম ভালবাসা প্রমদার প্রতি—
গলিল নীহার-সম!—কোথা ভেসে গেল!
এখন—এখন শুধু তার—অন্ধস্মৃতি
বিলাপিছে—শৈশবের ক্রীড়ানক সম।
হৃদয়ের অধীশ্বরী মানদাসুন্দরী—
নয়নের আনন্দ-দায়িনী সে আমার—
এতদিন অজ্ঞানে ভুলিয়া ছিনু তারে।
বিকার-বিভ্রান্ত রোগী অথবা যেমন—
অমৃতে অমৃত-জ্ঞানে করে পরিহার।
এবে সে বিভ্রম দূর!—নীরস রসনা
তৃপ্ত পুনঃ সরস মধুর সুধাপানে।
আমি তার, সে আমার, তারে চাই শুধু—
মানদাসুন্দরী মম জীবনসঙ্গিণী।

সুরেশ্বর। শুভক্ষণে মিলিয়াছ প্রেমিকযুগল।
কিরূপে ঘটিল হেন, শুনিব সকল।

বৃথা অভিযোগ আর তোমার অজয়!
বিধিমতে হউক—প্রেমের চিরজয়।
মহেশ-মন্দিরে আজি, উৎসবের সনে,
চিরবন্ধ হ'বে সবে প্রণয় বন্ধনে।
ধীরে ধীরে দিনমণি নভে সমুদিত;
সূক্ষ্ম হ'তে খর তাপ ক্রমে প্রস্ফুটিত।
এস সবে! আর না—বিলম্বে কাজ নাই।
পরিণয়-উৎসবে মাতিগে চল যাই।
হেমলতে!—হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী!
এস প্রিয়ে!—জীবনের চির-সহচরী!

[সুরেশ্বর, হেমলতা, অজয় এবং অনুচরবর্গের প্রস্থান]

বিপিন। সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর—স্মৃতি লয়প্রায়!
সুদূর অচল যেন মেঘে পরিণত।

প্রমদা। এ নয়ন—নূতন-সৃজিত মনে লয়!
সে ধাঁধাঁ এখন যেন হইয়াছে লয়।

মানদা। বিনোদে লভিনু আজি! কি আনন্দ মনে!
পুনঃপ্রাপ্ত হারানিধি যেন শুভক্ষণে।

বিপিন। নিশ্চিত বলিতে পার কেহ—আমরা কি
আছি জাগরিত? কিম্বা, দেখি, ঘুমঘোরে
অদ্ভুত স্বপন? মনে কি পড়ে না কা'রো—
আছিলেন সুরপতি হেথা? আদেশিলা—
আমাসবে, হইবারে অনুগামী তাঁর?

প্রমদা। সত্য বটে! পিতাও ছিলেন তাঁর সনে।

মানদা। সুরেশ্বরী হেমলতা!—তাও প'ড়ে মনে!

বিনোদ। আদেশিলা—মন্দিরে যাইতে তাঁর সনে।

বিপিন। তবে তো নিদ্রিত নই? আছি জাগরণে!
চল যাই দ্রুতপদে—পশ্চাতে তাঁদের।
যেতে যেতে মীমাংসা হইবে স্বপনের। [সকলের প্রস্থান]

ভূতো। (জাগিয়া)—আমার পালা প'লে, আমায় ডাকিস্‌রে—ডাকিস! এই দেখ্‌—ইন্দ্রজিতের 'পার্ট' আমার ঠিক মনে আছে—"প্রাণের ইন্দ্রজিৎ—সুন্দরীর মাথা!" ওরে ও কানাই! ওরে ও ছিরে কামার! ওরে ও তিনে কাঁশারী! ওরে বেটা পে'চো! তোরা সব গেলি কোথা রে? ওরে—আমায় খানিকক্ষণ ভূতে নিয়ে গিইছিলো রে—এখন আবার ঘুম-পাড়িয়ে রেখে গিয়েছে রে! কি স্বপন রে বাবা!—এমন তো কখনও দেখিনি দাদা! খুলে বল্‌লে, লোকে বল্‌বে—গাধা! কোথায় নিয়ে গিইছিলো রে—কেউ বল্‌তে পারে না—কেউ জানে না! কি হইছিলাম—কি কইছিলাম—কিছু বলা যায় না—কিছু শোনা যায় না! ওরে সত্যি বল্‌ছিরে—সত্যি! কানে তা দেখ্‌তে পা'য়া যায় না, চোকে তা' শুন্‌তে পাবিনে, জিবে তা হজম হবে না, হাতে তার আস্বাদ পাওয়া যাবে না! ওরে অদ্‌ভুত রে—অদ্‌ভুত! দেখা হ'লে, কানাইয়েকে বলবো—এর একটা ছড়া বাঁধ্‌তে: আর সে-ছড়ার নাম হ'বে—"ভূতোর কেচ্ছা!" কি ভূতো-নন্দী কারখানা বাবা! খুব মজা হ'বে তা'হলে—আমার পালার শেষে 'পের্‌মিলে' যেই মরে যা'বে, তখন এক্‌বার ঐ কেচ্ছাটা সব্বাইকে গেয়ে শোনাবো। খুব মজা হবে! বাহবা!—খুব মজা হবে!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৈজয়ন্তীনগর—কানাইয়ের বাড়ী

কানাই। ওরে ভূতোর বাড়ী কেউ একবার যা রে—যা! সে এলো কি না, দেখ?

পেঁচো। তাকে আর পাওয়া যাবে না—আর পাওয়া যাবে না! তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে—ভূতে!

ছিরে। সে না এলে যে সব মাটি! বক্তৃতা কর্‌বে কে রে?

কানাই। ইন্দ্রজিৎ সাজ্‌বার লোক তার মত এদেশে আর কেউ নেই রে—কেউ নেই।

ছিরে। সে যেন হুবহু ইন্দ্রজিৎ ছিল—হুবহু ইন্দ্রজিৎ!

কানাই। ঠিক রে ঠিক!—সে যেন ইন্দ্রজিতের সাক্ষেৎ প্রেত-আত্মা ছিল রে!

ছিরে। 'প্রেমের হাঁদা' কি রে? সে যেন ইন্দ্রজিতের ভূতটি হয়ে জন্মেছিলো!

(রামার প্রবেশ)

রামা। সুরেশ্বর এইবার দেব-মন্দির থেকে আস্‌ছেন। তাঁর সংগে আরও দু'তিনটি সম্ভ্রান্ত স্ত্রী-পুরুষ আছেন। এই সময় আমাদের 'প্লে' আরম্ভ কর্‌তে পার্‌লে বেশ দশ টাকা পোষাতে পার্‌তো!

ছিরে। কোথায় গেলি ভূতো—বাবা রে! তোর চার আনা রোজ ছিল—তাও মারা গেল; বেশির ভাগ—রাজা আবার আমাদের এখনি শূলে ঝুলোবে রে—বাবা!

(ভূতোর প্রবেশ)

ভূতো। এরা সব পাগল হ'ল নাকি?

কানাই। ভূতো—ভূতো! এইছিস বাবা—এইছিস্? বাঁচালি বাছা—বাঁচালি আজ।

ভূতো। বড় মজার কথা—বড় মজার কথা! কিন্তু বল্‌বো না—বল্‌বো না! অদ্‌ভুত—অদ্‌ভুত।

কানাই। কি ভূতো? কি—কি? কোথায় গিইছিলি?

ভূতো। সে কথা বলছি-নে—একটুও না! এখন চল, রাজার খাওয়া-দাওয়া হ'য়েছে, থিয়েটার আরম্ভ করা যাক্‌গে! নে—সব দাড়িটাড়িগুলো প'রে নে; নে—নিজের পার্টটা' এক-একবার দেখে নে, নে—আরও নে—গরম দুধ আর মরিচের গুঁড়ো খেয়ে গলাটা সানিয়ে নে! গলা সায়েস্তা না হ'লে 'প্লে'-তে সুর বেরোবে কি ক'রে? চল চল! কিন্তু সে কথা আমি আর কাউকে বল্‌ছিনে—বড় মজা—বড় আশ্চর্য্য!

[প্রস্থান]

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—সুরেশ্বরের প্রাসাদ

(সুরেশ্বর, হেমলতা, ফুলেশ্বর, অমাত্যগণ এবং অনুচরগণের প্রবেশ)

হেমলতা। প্রাণেশ্বর! বিস্ময় জাগিল বড় মনে—
অদ্ভুত বচন কহে প্রেমিকনিচয়।

সুরেশ্বর। অসম্ভব! অলীক কাহিনী অনুমানি;
প্রত্যয় না করি কভু উপকথা হেন।
বিকার-বিকল-বুদ্ধি উন্মাদ-প্রেমিক,
নিমগণ কল্পনা-হিল্লোলে অনুখন;
কত গড়ে, কত ভাংগে—কল্পনা-কৌশলে,
জ্ঞানের অতীত তাহা—না হয় ধারণা।

প্রেমিক, পাগল, কবি—তিনই সমান;
বিজড়িত কল্পনা-সূত্রেতে মমছাঁদে।
প্রেতমূর্ত্তি—উন্মাদ নিরখে অগণিত—
অনন্ত নরকে যার স্থান—অকুলান।
প্রেমিক—বিকৃত-মনা, হেনারে সদাই—
প্রেতপাশে অনুগম অপ্সরী-সুষমা।
সুমোহন কল্পনা-বিলোল আঁখিধারে—
দেখে কবি—অনিমিষে ত্রিদিব-ত্রিলোক;
অজানিত আদেশের কতই কাহিনী,
অন্তরে গাঁথিয়া রাখে কল্পনার হারে;
শূন্যগর্ভ বায়ুবিম্ব—অদৃশ্য, অস্থায়ী—
অভাবিত রূপগুণে সাজায়ে যতনে,
বিশ্ববাসে প্রতিষ্ঠিত করে ধ্রুব-সম।
যে উলাসে উছসিত হৃদি-সরনিধি,
নেহা'রে অনাসে তার উৎস নিরমল।
গভীর নিশীথে যথা গাঢ় অন্ধকারে—
গুল্মপুঞ্জে, ঋক্ষভ্রমে, ভয়ের সঞ্চার।

হেমলতা। কিন্তু নাথ! শুনিলে যে রাত্রির কাহিনী,
মনে হ'লে—সম্মিলন অপরূপ হেন;
কল্পনা-সৃজিত চিত্র না হয় ধারণা,
সত্যের জীবন্ত জ্যোতিঃ স্বতঃ-প্রস্ফুটিত।
সংঘটন—যেরূপ হউক নরনাথ!
বড়ই চমকপ্রদ, নাহিক সংশয়!

সুরেশ্বর। হের প্রিয়ে! আসে ওই প্রেমিকনিচয়,
আনন্দ-উল্লাস-পূর্ণ সহাস-বদন।

(বিপিন, বিনোদ, প্রমদা ও মানদার প্রবেশ)

এস,—এস, আনন্দবর্দ্ধন প্রিয়জন!
নবপ্রেমে অনুরাগে বন্ধ হ'য়ে এবে,
সে সুখ-লহরে চির রহ নিমগন।

বিপিন। তদধিক আনন্দ-হিল্লোল নরনাথ!
রাজপুরে প্রাসাদে হউক প্রবাহিত!

সুরেশ্বর। এস সবে, দেখি এবে—আছে কিবা
রঙরঙ্গ-নৃত্যগীত বাদ্য-আয়োজন।
প্রহরেক ব্যবধান সান্ধ্যভোজ পরে—
তবে সে নিদ্রার কাল: এ দীর্ঘ সময়,
কৌতুক কাটাতে কিবা হয়েছে উদ্যোগ?
কোথায় অধ্যক্ষ এবে—রঙ্গ-বিভাগের?
কি রঙ্গের-নাটকের, হয়েছে ব্যবস্থা—
সময়ের সূচীভেদ দূর করিবারে?
ডাক দেখি ফুলেশ্বরে—জানি সবিশেষ।

ফুলেশ্বর। 'সর্ব্বজয়ী প্রবল' প্রতাপ সুরপতি!
আজ্ঞাধীন দাস তব-আছে উপস্থিত।

সুরেশ্বর। সন্ধ্যার তামসী ছায়া অপসারি দূরে,
কিবা রঙ্গে, কি সঙ্গীতে মাতাইবে প্রাণ?
অলস-মন্থর-পদে চলে কালগতি,
উল্লাস-আবেশে কিবা, কাটাইবে তারে?
ফুলেশ্বর। নরনাথ! এই তার আছে বিবরণ।
প্রথমে কি হবে তাহা করুন মনন
(একখানি কাগজ প্রদান।)
সুরেশ্বর। [পাঠ] "দুর্য্যোধন-উরুভঙ্গ—ভীমের বিক্রম।
যবনিকা অন্তরালে গীত মনোহর।"
না চাহি শুনিতে উহা; ভীমের কাহিনী—
সবিস্তারে বলেছি সেদিন প্রেয়সীরে।
[পাঠ] "সূর্পনখা-নাসাচ্ছেদ—লঙ্কার সমর;
মারীচের মায়ামৃগ—জানকী-হরণ।"
পুরাতন-চর্ব্বিতচর্ব্বণ অভিনয়;
শুনিয়াছি—অসুর-সমরে জয়ী যবে।
[পাঠ] "একাকার,—সমাজ-বিপ্লব-নাট্যরঙ্গ।
শিক্ষাপ্রদ সরঙ্গ মধুর মনোহর।"
রঙ্গপূর্ণ ব্যঙ্গনাট্য—তীব্র মর্ম্মভেদী।
বিবাহ-উৎসবে তাহা নহে উপযোগী।
[পাঠ] "শোকাবহ হাস্যান্তক ইন্দ্রজিত-বধ।
অভিনব—দীর্ঘসূত্রী ক্ষুদ্র নটন্যাস।"
শোকাবহ—অথচ হইবে হাস্যান্তক।
দীর্ঘসূত্রী—কিরূপে হইতে পারে ক্ষুদ্র?
অদ্ভুত কাহিনী! যেন—উষ্ণ হিমশীলা!
পারে কি ঘটিতে হেন—সংযোগ বিষম!
ফুলেশ্বর। ক্ষুদ্র অতি—সংশয় নাহিক তাহে কিছু;
সংক্ষিপ্ত এ হেন—না হয় স্মরণ।
দীর্ঘসূত্রী—তবে যে কহিনু নরনাথ!
অশিক্ষিত-অভিনেতা—সে দোষ তাদের।
অভিনয়ে অনিপুণ—উচ্চারণ ক'রে
বিমলিন; বিনিময়ে বাড়ায় সময়।
প্রমীলার চিতাশয্যা—ইন্দ্রজিত-বধ;
মর্ম্মভেদী ঘটনা, নিশ্চিত শোকাবহ।
কিন্তু নাথ! দেখিয়া সে প্রথম দিনের
অভিনয়; সত্য বটে, তিতিল নয়ন—
অশ্রুনীরে; তবে সে শোকের অশ্রু নহে—
ক্ষোভ এই, হাসিতে হাসিতে নাড়ি ছিঁড়ে।
সুরেশ্বর। কেবা তোরা—অভিনয়ে নিপুণ এমন!
কোথায় বসতি করে—কিবা পরিচয়?
ফুলেশ্বর। বৈজয়ন্তবাসী, মূর্খ শ্রমজীবি তারা,
অজ্ঞান-আঁধারে পূর্ণ অন্তর তাদের;
না জানি শব্দ-ভাষা, অফুটন্ত স্মৃতি,

এবে এই পণ্ডশ্রম করিল কেবল—
সুরনাথে তুষিবারে বিবাহ উৎসবে।

সুরেশ্বর। ভাল ভাল।—দেখিব তাদের অভিনয়।

ফুলেশ্বর। আপনার যোগ্য তাহা, নহে নরনাথ!
দেখিয়াছি ভালমতে—বৃথা শ্রম সার॥
আরো বৃথা মনে হ'ত—যদি না জাগিত
মনে উদ্দেশ্য তাদের—পরিশ্রম দৃঢ়,
অসহ দারুণ যত্ন, তুষিতে সুরেশে।

সুরেশ্বর। সেই অভিনয় আজি দেখিতে মনন।
নহে তা নিন্দার যোগ্য, অনুষ্ঠান যার—
কর্ত্তব্য পালন সদা, সরল অন্তরে।
যাও ফুলেশ্বর—ত্বরা, আনহ তাদের। [ফুলেশ্বরের প্রস্থান]
আসন গ্রহণে তুষ্ট করুন সকলে।

হেমলতা। হেন মতে, সরল নিরীহ জনে নাথ!
কষ্ট দে'য়া অকারণ, নাহি লাগে ভাল।

সুরেশ্বর। মধুরভাষিণী প্রিয়ে! কোমল পরাণে—
দিবা না দারুণ ব্যথা—সে কঠিন দৃশ্যে।

হেমলতা। তবে কেন প্রাণনাথ! কহে ফুলেশ্বর—
না জানে তাহারা কিছু—অজ্ঞ অভিনয়ে?

সুরেশ্বর। প্রাণেশ্বরী! অজ্ঞতার বাড়াব আদর।
অজ্ঞতার অকারণে দিব ধন্যবাদ।
প্রমাদে প্রসন্নভাব করিব প্রকাশ।
গুণের না হোক যত, দেখাব আদর—
কর্ত্তব্য-পালন-হেতু—ক্ষুদ্র-সাধ্য-জ্ঞানে।
অভিনয় যেরূপ হউক বিধুমুখী!
আমি তা করিব মনে—সম্ভ্রমজ্ঞাপক।
কম্পিত চরণ কিম্বা বিষণ্ণ বদন;
ছেদাছেদ ভেদাভেদ বুঝিতে অক্ষম;
বিকল কণ্ঠের স্বর, ভয়েতে বিহ্বল;
বলিতে বলিতে কথা সহসা নীরব;—
এইরূপ যাহা কিছু উপাজিবে ত্রুটি,
সকলি করিব জ্ঞান—সম্মানসূচক।
সংক্ষেপে কহিনু প্রাণ, মনঃ-অভিলাষ;
দিবা না' সরল প্রাণে বেদনা নিশ্চিত।
(ফুলেশ্বরের প্রবেশ)

ফুলেশ্বর। অনুমতি আপনার—যাচে নরনাথ।
প্রস্তাবনা পাঠ হেতু অভিনেতৃগণ।

সুরেশ্বর। ভাল কথা! আসিতে বলহ প্রস্তাবকে!

(বাদ্যধ্বনি)
(কানাইয়ের প্রবেশ)

প্রস্তাবনা পাঠ। আপনাদের বিরক্ত করা বা কষ্ট দেওয়া আমাদের ইচ্ছা। নহে কেবল

সদিচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে। এসেছি—আপনাদের পরিতাপ প্রদান করিতেও। নহে—কেবল সম্মান দেখাইবার জন্য। আমরা আসিয়াছি।

সুরেশ্বর। লোকটার হ্রস্বদীর্ঘ ছেদ-বিচ্ছেদ কোনই জ্ঞান নেই।

বিপিন। আওড়াতে হয়, বাস্, আউড়ে গেল—না আছে তার মাথা, না আছে মুণ্ডু: কম, ছেদ, কিছুরই বোধ নেই। এই জন্যেই পণ্ডিতগণ বলে থাকেন—অনেক বাজে কথা ক'য়ার চেয়ে একটি সাচ্চা কথাই ভাল।

হেমলতা। বাস্তবিকই; বালকেও সবচেয়ে ভাল ক'রে বল্‌তে পারে। কেবল যেন হা'র ভেতর থেকে একটা শব্দ বেরিয়ে গেল—না আছে তার মানে, না আছে কিছু।

সুরেশ্বর। সুতোয় যেন জড়াপট্‌কা বেধে গিয়েছে; সবই আছে, কিন্তু এলো-থেলো—খেই-হারা। যাক্—এর পর কে?

(ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা প্রভৃতি দল-বলের প্রবেশ। প্রস্তাবনা পাঠের ন্যায় হাস্যজনক অভিনয়। রাত্রি অধিক হওয়ায়, সকলের প্রস্থান।)

(পণ্ডুর প্রবেশ।)

নিশীথিনী নীরবতাময়; দূর বনান্তরে
কেশরীর গভীর গর্জ্জন—অস্ফুটন্ত
প্রতিধ্বনি প্রবেশ নগরে; ঊর্দ্ধমুখ
শার্দ্দুলের চীৎকারে কেবল নিশামণি,
হাসে নীল নভে; উল্লাস বিকট-স্বরে
পেচকের কঠোর কণ্ঠ গায়—
দিবসের সূচীভেদে দেখায়ে ভ্রূকুটি
কালের করাল ছায়া!—শ্মশানের
সুদূর প্রান্তরে—অট্টহাসে হাসে যেন—
প্রেতমূর্ত্তি পিশাচের—লকলক জিহ্বা।
নীলিম মুকুটে কিবা শোভাময়ী চারু,
অনুচর আমরা তাঁহার—হরষিত
অপার হরষে; যাই এবে, রাজ-কার্য্যে;
সমুদিবে অরুণ-পতাকা ক্ষণ পরে,
জানাইবে—বিরাম সময় সমাগত;—
গমনের পথ তাঁর করি পরিষ্কার।

(দলবল-সহ অনঙ্গ এবং ত্রিতারার প্রবেশ।)

অনঙ্গ। পরিক্লান্ত নিশামণি—অলস মন্থর
পদে করিয়াছে প্রয়াণ—গৃহ-অভিমুখে।
জ্বলিতেছে মিটি মিটি ক্ষীণ দীপালোক—
মুমূর্ষু-অন্তিম রোগী সম-সুরপুরে।
সময়ের দ্রুতগতি—চলিছে ত্বরিত
আগে আসে; বিলম্বে বিফল হ'তে পারে
অন্তরের একান্ত পিয়াস—সুরেশ্বরে
শুভদিনে একান্তে তুষিতে নৃত্যগীতে।
চল-চল প্রাণেশ্বরী, নৃত্যগীতে চারু,
আনন্দ-প্রবাহ পুনঃ করি প্রবাহিত।

ত্রিতারা। প্রাণনাথ! চির অনুগামী দাসী তব,
যেবা আজ্ঞা, করিব পালন প্রাণপণে।

চলুন ত্বরায় তবে, তুষিতে সুরেশে—
সুমধুর নৃত্যগীতে মাতাইতে পুরী।

অনঙ্গ। অরুণের তরুণ কিরণ—পূবাকাশে
প্রতিচ্ছায়া প্রস্ফুটিত হইলে তাহার;
দম্পতি ত্রিতয়ের নব—আশীর্ব্বাদ শুভ
করিব প্রভাতে দোঁহে; করিব জ্ঞাপন—
অন্তরের অভিলাষ সুখে যেন চির
প্রেমের লহরে পূত কর নিমগন।
রোগে শোকে সন্তাপে বিচ্ছেদে যেন কভু
কষ্ট নাহি পায় কোন দম্পতি-নিচয়।
জন্মিবে যা' তাহাদের বংশের দুলাল
ভবিষ্যতে, শ্রীমান সুন্দর যেন হয়।
মৃণাল সমান বাহু, কমল বদন,
গণ্ডদেশ আভাময় গোলাপ রক্তিমে;
বীর্য্যবান, কীর্ত্তিমান্ অতুল-বিক্রম,
বিনীত, বিদ্বান সর্ব্বগুণান্বিত—
এরূপ সুপুত্র যেন জন্মে তাঁহাদের।
প্রাসাদের চারিভিতে যেন সমভাবে,
শান্তির হিল্লোল চির রহে বহমান।
প্রিয়া-সনে, সুরেশ্বর—সরগের পতি,
অনন্ত আনন্দে যেন রহেন মগন।
পরীগণ! চল সবে—মিলিগে প্রভাতে,
সুরেশ্বরে আশীর্ব্বাদ করিতে এমতে

[সকলের প্রস্থান।]

পণ্ডু। ভ্রান্তি ভাবে অঘটন ঘটিল তেমন:
সংশোধন বহু কষ্টে হইয়াছে তার।
দোষী আমি—অপরাধ সম্পূর্ণ স্বীকার;
ছায়া-জ্ঞানে কায়াহীনে করিবেন ক্ষমা।
ভাবিবেন—ছিলেন যখন তন্দ্রাঘোরে,
দেখেছেন এ সকল স্বপ্ন বিভীষিকা।
স্বপ্নময় অমূলক অলীক কাহিনী,
মতান্তরে করিবেন বিধিমতে দূর।
ক্ষমাভিক্ষা মাগি আমি সুজন সমীপে,
কেহ যেন আর মোরে না দেন গঞ্জনা।
ঘটনা—বিধির সৃষ্টি, কি করিব আমি?
কৌতুকে হয়েছি শুধু নিমিত্তের ভাগী।
ঘটনার কুরগতি করিয়া স্মরণ,
ক্ষমা করিবেন মোরে—শেষ নিবেদন।

[প্রস্থান।]

সম্পূর্ণ

শুভ-নির্ম্মাল্য।

প্রথম অঙ্ক।

(বর ও পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত। বৎস! আমি কুশধ্বজের সন্তান। তোমার নয় পুরুষের আমরা পুরোহিত। তোমার আজ শুভ বিবাহ। তুমি নব যৌবনে উত্তীর্ণ হইয়া আজ সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনের উপযোগী হইবে। তোমাকে এই শুভদিনে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের উদ্বাহ-জীবন সুদীর্ঘ সুবাসিত সুখ-কুসুম-হারে পরিণত হউক, এবং উহা ধর্ম্মের বিমল আলোকে প্রোদ্ভাসিত হইয়া তোমার প্রাচীন বংশ সমুজ্জ্বল করুক।

বর। গুরুদেব! ধর্ম্ম কি?

পু। বৎস! জীব মাত্রই এই সংসারে সুখান্বেষণ করে। এক কথায়, ধর্ম্ম সেই সুখান্বেষণ। তুমি জান দেহ, মন ও আত্মা লইয়াই মানুষ। এই তিনেরই কতকগুলিন প্রবৃত্তি আছে। এই সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই সুখ। তাহাদের চরম চরিতার্থ শ্রীভগবানে। বালক সুন্দর অক্ষর সম্মুখে রাখিয়া যেমন অক্ষর লেখা অভ্যাস করে, শ্রীভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া মানুষ এই চরিতার্থতার অনুশীলন করিবে। যে যতদূর অগ্রসর হইবে, সে তত সুখী, সে তত ধার্ম্মিক। এই অনুশীলনের, এই সুখান্বেষণের নাম ধর্ম্ম। যাহাতে এই অনুশীলনের শিক্ষা দেয়, তাহার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। যে কার্য্যের দ্বারা এই অনুশীলন সাধিত হয়, তাহার নাম কর্ম্ম।

বর। গুরুদেব! উদ্বাহের দ্বারা কিরূপে এই ধর্ম্ম সাধিত হইবে?

পু। বৎস! সর্ব্বপ্রকার অনুশীলনের মূলে প্রেম-প্রবৃত্তি। জ্ঞানের প্রতি তোমার প্রেম না থাকিলে তুমি জ্ঞানের অনুশীলন করিবে কেন? তদ্রূপ দীন দুঃখীকে প্রেম না করিলে তাহাকে দয়া করিবে কেন? মানুষের জন্ম হইতেই হৃদয়ে এই প্রেমধারা বহিতে আরম্ভ করে। মানুষ প্রথমে মাতাকে, তাহার পর পিতাকে, তাহার পর খেলার সঙ্গী-সঙ্গিনীকে প্রেম করে। কিন্তু বিবাহ না হইলে পত্নীপ্রেম এবং সন্তান না হইলে বাৎসল্যপ্রেম, তাহার হৃদয়ে উন্মেষিত হয় না; তাহার প্রেমপ্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা হইতে পারে না। পিতৃ-মাতৃ-প্রেম ও সখ্যপ্রেম হইতে পত্নী ও বাৎসল্য প্রেম গাঢ়তর। এইরূপে মানুষে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তানকে প্রেম করিয়া জীবকে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তানবৎ প্রেম করিতে শিখে। তাহার পর সর্ব্বজীবভূত শ্রীভগবানকে পিতা, মাতা, সখা, পত্নী ও সন্তান অপেক্ষায় অধিক প্রেম করিতে শিখে। এই মধুর ভাবেই প্রেমের চরিতার্থতা। অতএব বুঝিলে কি এই ধর্ম্ম-সাধনার পথে পত্নী প্রধান সহায়, এইজন্য তিনি সহধর্ম্মিণী। এইখানে ভারতীয় আর্য্য-বিবাহের সঙ্গে অন্য বিবাহের পার্থক্য। অন্য বিবাহে পত্নী সহ-সংসারিণী মাত্র, আর্য্য-বিবাহে পত্নী সহধর্ম্মিণী। এই বিবাহে প্রতিজ্ঞা করিতে হয়।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধামি।
মম চিত্তমনু চিত্তন্তে হস্তু।
মম বাচমেক মনা জুষস্ব
প্রজাপতি স্তা নিযুনক্তু মহ্যম্।
ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধান্যস্থিভিরস্থীনি
মাংসৈ মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

এই বিবাহে পতি পত্নী ধর্ম্মসাধনের জন্য এক রক্তে, এক মাংসে, এক আত্মায় পরিণত হয়। জীবনের সঙ্গে এই সম্মিলন বিচ্ছিন্ন হয় না। বৎস! তুমি এই শুভ বিবাহ দিনে প্রজাপতি শ্রীভগবানকে প্রণাম কর। সহস্র সহস্র বার প্রণাম কর এবং তাঁহার চরণে তোমাদের যুগল হৃদয় অর্পণ কর।

বর। (জানুপাতিয়া)

"নমো নমস্তেতু সহস্র কৃত্বা
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠাতস্তে
নমোস্তেতু সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥"

গীত।

(১)

তুমি প্রজাপতি বিশ্বেশ্বর,
তুমি নাথ! বিশ্ব জীবন।
তোমাতে গ্রথিত বিশ্ব অগণিত,
সূত্রে মণি অগণন।

(২)

সেই প্রেম-সূত্রে দুটী ক্ষুদ্র ফুল
গাথি প্রেমে, নারায়ণ!
দুইটী শিশুর যুগল হৃদয়
চরণে কর গ্রহণ॥

(৩)

দিও দেহে শক্তি, দিও হৃদে ভক্তি,
জ্ঞানে আলোকিও মন।
তব প্রেম-রথে, নিও তব পথে,
সম্মিলিত এ জীবন॥

পু। বৎস! এখন শ্রীভগবানের অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীখৃষ্ট, শ্রীমহম্মদ এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে তুমি নমস্কার কর। ই'হারা যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বর। (নমস্কার)

পু। বৎস! পিতৃলোকস্থ তোমার পুণ্যবান পূর্ব্বপুরুষ ও রমণীগণকে নমস্কার কর। তাঁহাদের পুণ্যে ৩০০ বৎসর যাবৎ ধনে, গৌরবে, বিদ্যায়, সাহিত্যে শিল্পে, সঙ্গীতে তোমার এই বংশ চট্টগ্রামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখন যে ইহার এইরূপ অধঃপতন হইতেছে তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের নিকট এই শুভদিনে প্রার্থনা কর, নমস্কার কর।

বর। (নমস্কার)

পু। বৎস! যিনি পরোপকার ব্রতে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ত্রিদিবে চলিয়া গিয়াছেন, যাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের গাথা এখনও চট্টগ্রামের সীমা হইতে সীমান্তরে উপকথার মত প্রচলিত যিনি বজ্রের তুল্য তেজস্বী ও দৃঢ় এবং কুসুমের তুল্য সুকোমল-হৃদয় ছিলেন, যাঁহার প্রেম ও করুণা জাহ্নবীর মত অজস্র ধারায় বহিত, সেই—

"সমাজের শিরোমণি সদ্‌গুণ ভাণ্ডার,
বিপদে প্রসন্ন মুখ মোহন আকার,
সরল হৃদয়, পরদুঃখে ম্রিয়মাণ,
প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান"—

মস্তকের উপর চাহিয়া দেখ, তোমার সেই পুণ্যশ্লোক পিতামহ ও তোমার খুল্ল পিতামহ—রূপে প্রকৃত গোপীমোহন ও মদনমোহন—ও তোমার শিশুবৎ সরলা পিতামহী—মা আমার—প্রকৃত রাজরাজেশ্বরী—কি প্রসন্ন সস্নেহ মুখে অন্তরীক্ষে বসিয়া তোমার এই শুভবিবাহ দেখিতেছেন। তুমি তাঁহাদের প্রণাম কর।

বর। মরি মরি কিবা রূপ! কি জ্যোতি বিমল
আকাশ করিয়া পূর্ণ শত চন্দ্রালোকে!
কি সৌরভ বহিতেছে, অবারিত দ্বার
যেন নন্দনের! কিবা কোমল মধুর
বহিছে সঙ্গীত স্রোত, সুখ স্রোত যেন
পুণ্যের নির্ঝরে বহে পবিত্র শীতল।
অনাথ শিশুর মত এ প্রৌঢ় বয়সে
কাঁদেন জনক মম যাঁহাদের তরে—
গুরুদেব! ইঁহারা কি কহ সেই মম
পিতামহ পিতামহী খুল্ল পিতামহ?
যিনি নিত্য গৃহে গোপীমোহন স্বরূপে,
শিব রূপে যিনি নিত্য বংশীয় শ্মশানে,
সুপবিত্র কুলতীর্থে—সভক্তি পূজিত,
ইনি কি আমার কহ সেই পিতামহ?
আমার জীবন আজি হইল সার্থক।
দেব দেবি! তোমাদের অযোগ্য শিশুর
প্রাণপূর্ণ ভক্তিপূর্ণ অযোগ্য প্রণাম
লও পাদপদ্মে প্রেমে, লও দয়া করি!
যেই পিতৃ-মাতৃ-প্রেমে চির আত্মহারা
পিতা মম,—দেব দেবি! কর সঞ্চারিত
সেই পিতৃ-মাতৃ-প্রেম হৃদয়ে আমার!
আমি শিশু পিতামাতা দেবতা আমার,
না জানি দেবতা অন্য; পিতৃ-মাতৃ-সেবা
মম ধর্ম্ম, নাহি জানি অন্য ধর্ম্ম আমি।
(নমস্কার)

পু। বৎস! এইবার পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণকে, তোমার পিতা-মাতাকে, তোমার পিতৃব্য-পিতৃব্যানীকে, তোমার বংশীয়গণকে, তোমার বিপুল বংশের প্রজাগণকে এবং তোমার স্বদেশবাসীগণকে প্রণাম কর। (শ্রোতৃবর্গের প্রতি) আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন, এই বিবাহ যেন এই বংশের ও এই দেশের একটি মঙ্গল-গর্ভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দম্পতী যুগল সুখী ও দীর্ঘায়ুঃ হইয়া স্ববংশের ও স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করে!

বর। (নমস্কার)

(কোনও পণ্ডিত মহাশয় এইখানে সভায় দাঁড়াইয়া একটি আশীর্বাদশ্লোক পাঠ করিবেন।)

পু। নির্ম্মল! এইবার তোমার অক্ষয় সৌন্দর্য্য ও পুণ্যাধার মাতৃভূমিকে নমস্কার কর। মাতা জন্ম দিয়া থাকেন, মাতৃভূমি অন্ন, জল, সুখ, সমৃদ্ধি প্রদান করেন। মাতৃভূমি সর্ব্ব-মঙ্গলা, সর্ব্বার্থসাধিকা।

বর। (নমস্কার)

(১)

মা! মা! মা! তৃষিত অন্তরে
ডাকিতেছি মাগো! পরাণ ভ'রে।
শৈল-কিরীটিনী সাগর-কুন্তলা
সরিৎ-মালিনী ডাকি মাগো! তোরে।

(২)

জীবন প্রথমে হৃদি রক্তে, শ্যামা!
পূজিব চরণ হৃদয় বাসনা।
শিশু হৃদয়ের কাতর কামনা
পূরাও পার্ব্বতি! পরম আদরে।

(৩)

হৃদয়ের রক্ত, নয়নের জল,
প্রেম বিগলিত পবিত্র শীতল,
বরষি চরণে মাগো! অবিরল
জুড়াইব প্রাণ চিরদিন তরে।

পু। বৎস! যিনি প্রজাপতি শ্রীভগবানের শক্তি-প্রতিমা, যিনি মাতৃরূপে, দশভুজে বিপদ-বিঘ্ন-নাশিনী দশভুজারূপে নয়পুরুষ যাবৎ তোমাদের গৃহে বিরাজ করিতেছেন, এইবার সেই জগজ্জননী কুলমাতাকে দর্শন ও নমস্কার কর। (পটোত্তোলন এবং দশভুজার সমক্ষে এক মিনিট আরতি ও হুলুধ্বনি।)

বর। (নমস্কার) মা! মা!

"নিরখি তোমারি পানে, তোমারি সন্তান দুজনে
প্রবেশে সংসারে আজি দেখ মা! কৃপানয়নে!
যথা নীরবিন্দুদ্বয়
পদ্মপত্রে এক হয়,
তেমনি হে দয়াময়ি! মিলাইও দুই জনে!
সংসার মোহ মায়ায়
যদি পথ ভুলে যায়,
কৃপা করি কৃপাময়ি! ফিরাইও সেইক্ষণে!
রেখ মাগো! মনে রেখ,
মাতা হয়ে কাছে থেক,
নয়নে নয়নে রেখে দিও স্থান শ্রীচরণে।"

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(পুষ্পমালা করে দ্বিভুজা ভগবতী ও গৃলক্ষ্মীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। মা জগজ্জননী! সর্ব্বে মঙ্গলে!

ভগবতী। তুমি বাছা! কেন আমাকে ডাকিয়াছ! আমি যেখানে থাকি, ভক্তের আহ্বানে আমার হৃদয় পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত, প্রাণ আকুলিত হয়। আমি আনন্দে অধীরা হই। তোমার আহ্বানে এবং তোমার পুত্র নির্ম্মলের স্তবে আকর্ষিত হইয়া কৈলাস হইতে আসিয়াছি।

লক্ষ্মী। মা! তুমি যেমন আনন্দময়ী, তেমনই দয়াময়ী। মা! আজ তোমার দুই ভক্ত পরিবারের পুত্র-কন্যার শুভবিবাহ। তুমি তাহাদের শিশু-শিরে তোমার পবিত্র নির্ম্মাল্য দিয়া শুভ পরিণয়-মালা তাহাদের কণ্ঠে প্রদান কর। মা! আমি এই দীন পরিবারের পর্ণগৃহের দীনা গৃহলক্ষ্মী। আমি তোমার কন্যাদের মধ্যে পর্ণ-গৃহবাসিনী হইলেও

আমার হৃদয়ে শান্তি, সংসারে কীর্ত্তি আছে। আমার পুত্রগণ পুরুষানুক্রমিক সরল। ইহাদের হৃদয়ে প্রেম আছে—দ্বেষ নাই, শান্তি আছে—লোভ নাই, পরহিতৈষিতা আছে—পরশ্রীকাতরতা নাই। বরের প্রপিতামহ একজন বিখ্যাত প্রতিভাসম্পন্ন স্বভাবজাত শিল্পী ছিলেন। তাহার পিতামহের তেজস্বিতা, দানশীলতা ও পরহিতৈষিতা এদেশে প্রবাদের মত প্রচলিত। কন্যাও এদেশের একটি প্রাচীন বিখ্যাত পবিত্র বংশের দুহিতা,—পবিত্রা পারিজাত-মালা। তাহার পিতাও সুশিক্ষিত, সদাশয়, সহৃদয় ব্যক্তি। মা! দুইটি প্রধান মহৎকুল, দুইটি মহৎরক্ত—এই শুভ পরিণয়ে সম্মিলিত হইতেছে। এই সম্মিলিত পুষ্পচন্দন তোমার চরণে অর্পণ করিলাম।

গীত।

(১)

দেও মা! আনন্দময়ি! দেও মা চরণাশ্রয়
যুগল সন্তানে তোমার এ শুভ বিবাহ দিনে!
তুমি মা! সর্ব্বমঙ্গলা, শুভ পরিণয়-মালা
গাঁথিয়া মঙ্গল করে দেও গলে শুভক্ষণে!

(২)

সংসার বিঘ্ন সাগরে, রাখিও অভয় করে,
বরষি বরদ করে সুখ-শান্তি স্নেহ মনে।
যেন কর্ণফুলী মত বহে সুখস্রোত শত
দীনা জন্মভূমি বক্ষে এই শুভ সম্মিলনে।

(৩)

গঙ্গা যমুনার মত হয় যেন পরিণত
এ মিলন মহাতীর্থে এই ভিক্ষা ও চরণে।
রোগ, শোক, দুঃখভরা হরি পার্ব্বতী মাতার,
বহে যেন মা! তোমার প্রেম সাগর-সঙ্গমে!

ভগবতী। বাছা! আমি জানি দুইটী পরিবার আমার পুরুষানুক্রমিক ভক্ত, দুই গৃহই আমার ভক্তি-তীর্থ। আমি এই গৃহে দশভুজারূপে নিত্য বিরাজিতা। এই শুভ-বিবাহ আমারই অভিপ্রায়ে প্রজাপতি সংঘটিত করিয়াছেন। আমি নিজ করে এই মঙ্গল-মালা গাঁথিয়া আনিয়াছি। লও বাছা! উহা গ্রহণ কর। (মালা অর্পণ)

এই মালার সূত্র—প্রেম, ইহার অনন্ত ফুল—অনন্ত সুখ, ইহার সুশীতল সৌরভ—কীর্ত্তি। এই মালা পুত্র-কন্যার গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাদের শিরে এই পারিজাত কুসুম-রাশি (পুষ্প-পাত্র অর্পণ) বর্ষণ করিও। আশীর্ব্বাদ করি দুই মহৎ রক্তের সম্মিলন চট্টল ইতিহাসে মহাতীর্থ বলিয়া পূজিত হউক।

গীত।

(১)

লও মা মঙ্গল ডালা, লও মা! মঙ্গল মালা,
গাঁথিয়াছি পারিজাতে সিক্ত মন্দাকিনী জলে!

(২)

প্রেম-সূত্রে এ মালার, সুখ-শান্তি পুষ্প তার,
গেথেঁছি অনন্ত সূত্রে, গেথেঁছি অনন্ত ফুলে।
কীর্ত্তি তার সুসৌরভ, পুণ্য তার সুধা সব
চর্চ্চিত চন্দনে—মম চির কৃপা—হে সরলে!

(৩)

এই মালা পরাইয়া, পারিজাত বরষিয়া,
বাঁধি চির প্রেম-হারে বসাইও মম কোলে!
অভয় বরদ কর রাখি শিরে নিরন্তর
রাখিব মায়ের মত চোখে চোখে পলে পলে।
(ভগবতীর বিকট মূর্ত্তি অনুচরের প্রবেশ)

অনু। হাঁরে বেটি! তুই এতনা দৌড় কর্ত্তে আছিস, আর তোর বাপ হুঁয়া বট্‌কে বট্‌কে কাঁদতে আছে।

ভগবতী। দূর পোড়ার মুখো! আমার বাপ কিরে, তোর বাপ বল?

অনু। আচ্ছা! আচ্ছা! হামার বাপ ত আছেই। ছে ছকলের বাপ, তবে তোর বাপ হইল না? তুই ছকলের মা! তুই তবে তার মা হইলি না? হামার বুদ্‌ধি আছে, বুদ্‌ধি আছে, কেমন মাই ঠিক? হা! হা! হা! (হাস্য)

ভগবতী। বুদ্ধি তোর মাথা আর মুণ্ড! যেমন রূপখানি, তেমন বুদ্ধিখানি। পোড়ার মুখো আমাকে এখানে জ্বালাইতে আসিল। (লক্ষ্মীর প্রতি) মা! এটা বাঙ্গালা দেশের হিন্দুস্থানী দরওয়ানের ভূত।

অনু। আমি পোড়ার মুখো নঁহি, কেমন ছুন্দর মুখো। হা! হা! হা! (হাস্য) হামি আছিবার ছমে ভোলা কহিল কি হামি ছিদ্দি ঘুট্‌তে বছলাম, তুই ভগবতীকে শীঘ্‌ঘির নিয়ে আছবি। তুই ত মাই এতনা দৌড় কর্‌লি। ভোলা ছিদ্দি ঘোটার ডাণ্ডা দিয়া আমার ছির তুড়িয়া দিবে। হামার বুদ্‌ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য)

ভগবতী। নারে, আমি পুত্র-কন্যার বিবাহ-উৎসব ছাড়িয়া যাইতে পারিব না। তুই যা!

অনু। ঠিক কথা! তুই এখানে পূজা খা, আর হামি ছেখানে ডাণ্ডা খাই। সাধি বাড়ীতে আছিয়া হামি কুচ খাইতে ভি পাইলাম না, ক্ষুধায় হামার পেটটা জ্বলিয়া যাইতে আছে। তোর ছিংহ বেটা ক্ষুধায় (মুখ-ভঙ্গি করিয়া) হুম্‌হাম্‌ কর্ত্তে আছে। ছেত হামার মুণ্ডটা খাইয়া ফেলিতে চাহে। হামারে মুণ্ড ছাড়া দেখলে তোর অপ্সরাগণ সাধি করেগা কি? হামার বুদ্‌ধি আছে, বুদ্‌ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য)

ভগবতী। অপ্সরাগণের ত আর মরিবার স্থান নাই, তাই এমন গুণধরকে বিবাহ করিবে। বটে, তোর ক্ষুধা পাইয়াছে? (গৃহলক্ষ্মীর প্রতি) মা! এটাকে কিছু খাবার দাও ত! (গৃহলক্ষ্মীর একদোনা সন্দেশ প্রদান) তুই সব খাইস না। সিংহকে লইয়া অর্দ্ধেক দে।

অনু। হামি তোর বাপ হিমালয়, হামার উদরটা একটা গহবর; হামি আগে এটা পূরণ করি। হামার বুদ্‌ধি আছে, বুদ্‌ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য ও দাঁত বাহির করিয়া মুখভঙ্গি করিয়া সন্দেশ খাওয়া) বহুত আচ্ছা! এখন ছিংহ মামার লিয়ে এই কেলাপাতটা লিয়া যাই। (উঠিতে উঠিতে উদর ভারে ২।৩ বার পড়িয়া যাওয়া) ছিংহ মামার চৌদ্দপুরুষেও কেলাপাত খায় নাই। হামার বুদ্‌ধি আছে, বুদ্‌ধি আছে। হা! হা! হা! (হাস্য) বম্‌ ভোলানাথ! বম্‌ বম্‌! বর কন্যাকি জয়! হামার পেটের জয়! বম্‌ বম্‌! হামি একটা গীত গাইব, মাই তোরা ছুনূ।—

(পাছাতে হাতে তাল দিয়া মাথা নাড়িয়া নৃত্য ও গীত)

এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী
এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী
এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী
এত্‌না বড়া পেট আউর এত্‌না লম্বা দাড়ি।

ভগবতী। পোড়ার মুখো! এখনও গেলি না! (লক্ষ্মীর প্রতি) মা! ত্রিশূলটা লইয়া আইস ত!

অনু। দোহাই মা তোর! তুই লাঠি মার, ডান্ডা মার, তোর ওই ত্রিশূলটা মারিস্ না। তার এক খোঁটায় তিন খোঁচা লাগে, হামার পেটটা ফাটিয়া যাবে। হামি চললাম।

গীত।

এক ছছুরা গিয়াথা ছছুর কি বাড়ী (ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ গীত গাইতে গাইতে পেট ঢুলাইয়া প্রস্থান)।

ভগবতী। দেখিলি মা! এই সব ভূত লইয়াই আমার সংসার।

লক্ষ্মী। তাহা ত ঠিক মা! পঞ্চভূত লইয়াই তোমাদের সংসার।

তৃতীয় অঙ্ক।

(বর আসীন। অপ্সরাগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ)

গীত।

"সুখের রাতি জ্বালহে বাতি,
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়ে, বোঁটা ফেলি দিয়ে
গাঁথহে চিকণ মালা॥
অগুরু চন্দন, কুসুম আসন,
সপুষ্প লবঙ্গ ডাল।
শুভ আলিপনা, কুসুম বিছানা,
রাখহে কদম্বের মাল॥
সুবাসিত বারি, পূরি হেম ঝারি,
রাখহ শীতল করি।
পিক শুক সারী, ডাক ত্বরা করি,
নিকুঞ্জ বসুক ঘেরি॥"

১ম অ। আয়ুষ্মান্! আমরা ত্রিদিবের অপ্সরা। আপনাদের সর্ব্বমঙ্গলা কুল-মাতা দশভুজা দেবী আপনার শিশু-হৃদয়ের প্রার্থনা শুনিয়া শুভ-নির্ম্মাল্য স্বরূপ এই পারিজাত-হার আপনার মা চপলার শুভ পরিণয়ের জন্য আপনার গৃহলক্ষ্মী মাতার করে অর্পণ করিয়াছেন। জননী কৈলাসে বসিয়া স্বীয় পবিত্র করে নন্দনজাত কুসুমে এই মালা গাঁথিয়াছেন। জননী আশীর্ব্বাদ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছেন, এই মালার অনন্ত-পুষ্প অনন্ত-সুখ-শান্তির নিদান হইবে এবং এই পরিণয়ের দ্বারা এই কুল-গৌরব ও কুলশ্রী বর্দ্ধিত হইবে। জননী ও আপনার গৃহলক্ষ্মী অন্তরীক্ষ হইতে আপনার শুভ-বিবাহ দর্শন করিবেন। আপনি এই মালা গ্রহণ করুন। (মালা প্রদান)

বর। কুলমাতা ও গৃহলক্ষ্মী মাতার শ্রীচরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। (মালা গলায় ধারণ)

১ম অ। জননীর আজ আনন্দের সীমা নাই। জগজ্জননীর আনন্দে আজ জগত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

গীত।

আনন্দ উছলি যায় নিশামণি কিরণে,
আনন্দ উছলি যায় নীলিমায় গগনে।
নব বসন্তের প্রায়
আনন্দে বহিয়ে যায়,

চুমি মনোরম শোভা কুসুমিত কাননে,
আনন্দে দেবতাগণ,
করে পুষ্প বরিষণ,
নব দম্পতির শিরে প্রীতিফুল্ল বদনে।

১ম অ। চল্ সখি চল্ দেখ কি নির্ম্মল
নব বসন্তের চাঁদিনী হাসি!
গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে
তুলি কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম রাশি॥
প্রথম বসন্ত, প্রথম ফুটন্ত
ফুলের বহিয়া প্রথম ঘ্রাণ।
প্রথম মলয় কি মধুরে বয়
গাইছে কোকিল প্রথম গান॥
বসন্ত পঞ্চমী বঙ্কিম চাঁদিনি
নির্ম্মল চন্দ্রের নির্ম্মল হাসি।
বড় শুভ নিশি শুভ তিথি মিশি
কিবা পুণ্যক্ষণ উঠিছে ভাসি॥
চল কুঞ্জে কুঞ্জে তুলি পুঞ্জে পুঞ্জে
নব বসন্তের ফুলের রাণী।
চপলা সঞ্চারি চপলা কুমারী
এ শুভ-বিবাহে সাজায়ে আনি॥
নবীন আকাশে প্রীতির আবাসে
কি শোভা হইবে এ মধুমাসে।
যখন অচলা নির্ম্মলা চপলা
শোভিবে নির্ম্মল চন্দ্রের পাশে!
চল কুঞ্জে কুঞ্জে তুলি পুঞ্জে পুঞ্জে
নব বসন্তের ফুলের রাণী।
চপলা সঞ্চারি চপলা কুমারী
এ শুভ-বিবাহে সাজায়ে আনি॥

গীত।

"কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে চললো রঙ্গিনী
আয়লো স্বজনি!
দুকুল ভরিয়া কুসুম তুলিয়ে সাজাব কামিনী
বালা বিনোদিনী—
চললো রঙ্গিনি! আয়লো স্বজনি!
প্রকৃতি হাসিয়ে চায়,
সুষমা ঝরিছে তায়।
ধীর মলয়, আকুল করে হৃদয়,
ফুলের মাঝে, ফুলের সাজে, ফুলের কামিনী—
সাজাব রমণী,
চললো রঙ্গিনি! আয়লো স্বজনি!

॥ যবনিকা পতন ॥

নবীনচন্দ্রের বক্তৃতা*

ফেণী জুবিলী বিদ্যালয়ের ১৮৮৬ ইংরাজির প্রথম বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী

আজ এই ফেণী বিদ্যালয়ের উদ্যোগকারীগণের একটি বড় সুখের দিন—আজ ফেণী উপবিভাগের একটি বড় শুভ দিন। ২ বৎসর পূর্ব্বে কেহ যদি আমাকে বলিত এখানে এরূপ একটি উচ্চ অঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে, তাহার জন্য এতাদৃশ উপযোগী একখানি গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে, আমি নিশ্চয় তাহাকে বাতুল মনে করিতাম। ২ বৎসর পূর্ব্বে এ স্থানের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল তাহা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর অবিদিত নাই। উপস্থিত সভাপতি মহোদয়েরও তাহা স্মরণ থাকিতে পারে সম্মুখস্থ প্রশান্ত নীল-নির্ম্মল-সলিলা দীঘির উত্তর ও পূর্ব্ব পার ব্যাপিয়া অরণ্য বিভাগের একটি ক্ষুদ্র উপরিভাগ স্থাপিত ছিল। বিভাগীয় কর্ম্মচারী নেকড়ে বাঘ তাহাতে আনন্দে আধিপত্য করিতেন। ইহাঁরা বোধ হয় পশুরাজ্যের ডেপুটি ও মুন্সেফ। চিরপ্রসিদ্ধ সুচতুর শৃগাল মহোদয়েরা তাঁহাদের উকীল ও ... শিয়ালিগণ টন্নী। তাহাদের কার্য্যপ্রণালী Parliamentary রকমের ছিল। দিনে তাঁহারা বড় কিছু কার্য্য করিতেন না, কিন্তু সন্ধ্যা হইলেই টন্নিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিতেন এবং উকিল মোক্তারগণ তারস্বরে যেন ঘোরতর তর্কবিতর্ক ও বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন। সে ঐকতান সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তিনি আর ভুলিতে পারিবেন না। পার্শ্বে দুর্দ্দান্ত বৃটিশ রাজ্যের শান্তিরক্ষক ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীরা অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের গৃহাদির এরূপ অবস্থা ছিল যে বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে তাহাতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের ঘোরতর বিড়ম্বনা করিতে পারিতেন। ঐদিকে বাজারে খান দুই ঘর ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের ২টী করিয়া চাল এবং তাহাতে মিলিত ২টী জিনিস—সেই পৌরাণিক চিঁড়া আর গুড়[১]। স্থানে স্থানে মোক্তার ও আমলাদের কয়েকখানি গৃহ ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে এখন সেরূপ গৃহ বড় নাই। অন্যথা রৌদ্র ও বৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া অল্প আয়তনে অল্প ব্যয়ে কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ হইতে পারে আমাদের উত্তরাধিকারীগণ শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। একদিন রাত্রিযোগে শিবির হইতে ফিরিয়া আসিয়া নুন মিলিল না বলিয়া আমি সপরিবারে উপবাসে রহিলাম। ভারতচন্দ্রের

> খুন হয়েছিল বাছা চুণ চেয়ে চেয়ে।
> শেষে না কুলাল কড়ি আনিলাম চেয়ে॥[২]

আমাদের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল—

> "খুন হয়েছিল বাপু নুন চেয়ে চেয়ে।
> শেষে না মিলিল আর রহিলাম শুয়ে॥"

এই স্থানে নুনটুকু পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত না।[৩]

* ভারতবর্ষ—আষাঢ় ১৩৪১

১। একখানি দোতলা কুড়ে ঘর আছে। তাহাতে সীতাকুণ্ডু যাত্রীদের জন্য চিঁড়ে ও গুড়মাত্র পাওয়া যায় (আমার জীবন ৪র্থ ৬পৃঃ)।

২। বিদ্যাসুন্দর—ভারতচন্দ্র।

৩। নুন 'চেয়ে' না পাইয়া একরাত্রি যে অনাহারে ছিলাম, তাহা বলিয়াছি। আড়াই মাইল ব্যবধান না গেলে পর্য্যন্ত যায় না (ঐ ঐ)

উপবিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াই মফঃস্বল বাহির হইলাম। সেখানে সর্ব্বত্রে দেখিলাম নুনের অভাব থাকুক না থাকুক গুণের অভাব ভয়ঙ্কর। প্রচুর পরিমাণে পাইলাম খুন আর আগুন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই খুন দুইটি একত্রে পাইলাম। এরূপ জোর নরবলি বোধ হয় আমাদের তান্ত্রিক ইতিহাসেও নাই। ত্রিপুরেশ্বরের অধিকারে সর্ব্বত্রে যেন দাবানল জ্বলিতেছিল। তাহার উপর ঘরের আগুন[৪] দেখিয়া আবার ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়িল—

"কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন"

দেখিলাম এই অঞ্চলের অধিবাসীগণের অন্য কোনও গুণ না থাকিলেও "কপালে আগুন" যথেষ্ট আছে। বৎসরের মধ্যে কত লোকের এখনও কপাল পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার উপর শিক্ষা-বিভাগের আগুন—শিক্ষা-বিভাগ আমাকে ক্ষমা করিবেন। নিম্ন প্রাইমারী, উচ্চ প্রাইমারী minor, model, middle class এরূপ পঞ্চরঙ্গের স্কুল পঙ্গপালের মত দেশ ছাইয়া গিয়াছে। Inspector, Assitant Inspector, Dy-Inspector, Sub-Inspector— বাপরে, Inspector-ই চারি রকমের। তাহার উপর Inspecting Guru! এই পঞ্চ রকমের তত্ত্বধারকেরা ছোটাছুটি করিতেছেন। দেশে এই পঞ্চাঙ্গ বৃষোৎসর্গ সম্পাদিত হইতেছে। 'বৎসোৎসর্গ' বলিলে বোধ হয় কথাটা আরও ঠিক হয়[১] একদিন বেহার অঞ্চলে আমার শিবির-ঘরে এক অদ্ভুত মূর্ত্তি উপস্থিত। সে একে জাতিতে মুসলমান তাহাতে মহামূর্খ। জিজ্ঞাসা করিলাম।—"তোম্ কোন্ হ্যায়"? উত্তর 'হুজুর! ইনস্পেক্‌টিং গরু।' আমি একটু হাসিয়া বলিলাম— "তোম্ কোন্ মৌজাকা ক্ষেত পয়মাল কর্ত্তে হো?" উত্তর—'ক্ষেতকা গরু নাহি হ্যায়. পাঠশালাকা গরু।' আমি বুঝিলাম কথাটা ঠিক্। শিক্ষাবিভাগের দ্বারা দেশে এরূপ অপূর্ব্ব নর-গরুরই সৃষ্টি হইতেছে। গুরু নাম থাকলে তাঁহার পুষ্যগণের এরূপ বিপদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াই বোধ হয় আমাদের সুযোগ্য ডেঃ ইনস্পেক্টার তাঁহার সুদীর্ঘ নূতন নিয়ম মানায় ইহাদের "পণ্ডিত" উপাধি দিয়াছেন। এতদিন পরে আমাদের অধ্যাপকদের অন্ন মারা গেল।

এই পঞ্চরঙ্গ শিক্ষা একমাত্র কর্ম্মের উপযোগী শিক্ষা প্রদান করিতেছে—পেয়াদাগিরি বা কনষ্টেবলগিরি[৫] কিন্তু পেয়াদা বা কনষ্টেবল সংখ্যায় অল্প। অতএব এই হতভাগ্যগণ একদিকে আপনার পৈতৃক ব্যবসায়ের উপর বীতশ্রদ্ধ এবং অন্যদিকে উক্তরূপ রাজকর্ম্মে বঞ্চিত হইয়া বেনামা দরখাস্তকারী এবং টাউট হইয়া দেশের "কপালে আগুন" জ্বালিয়া দিতেছে। এই উপবিভাগের উৎকৃষ্ট একজন সূত্রধর, একজন স্বর্ণকার,... একজন ভৃত্য পর্য্যন্ত তুমি পাইবে না, কিন্তু পেয়াদা চাহ পালে পালে পাইবে। জনৈক নিম্ন ব্যবসাজীবী

৪। ফেণীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎপাত ছিল গৃহদাহ—ঐ ৩১ পৃঃ।

৫। এ ত শিক্ষাদান নহে বলিদান। যাহারা পাশ হইতেছে, তাহাদের মধ্যে দুই একজন কোনমতে এণ্ট্রান্স স্কুল পর্য্যন্ত পড়িতে যাইতেছে। অবশিষ্ট পেয়াদাগিরি বা কনেষ্টবলেগিরির উমেদার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। বাসার চাকর পাইবে না, কিন্তু পেয়াদাগিরি বা কনষ্টেবলগিরি খালি হইলে দুইশত লোক উমেদার হইবে এবং বিনা পয়সায় বাসায় চাকরী করিতে সম্মত হইবে। যাহাদের তাহাও জুটে না, তাহারা "টাউটগিরি" করে এবং মিথ্যা মোকদ্দমায় দেশের সর্বনাশ ঘটায়। যাহাদের সে শক্তি নাই, সে রাণী এলিজেবেথের সময়ের ইতিহাস উদ্ধৃত করিয়া হাকিমদের কাছে বেনামী পত্র লেখে (আমার জীবন—৪১, ৭ পৃ)।

৬। এখন "প্রাইমারী" বা মহামারী শিক্ষার কল্যাণে সকল জাতির লোক লেখাপড়া শিখে। উদ্দেশ্য পেয়াদাগিরি কি "কনষ্টেবুলি"। তাহাও অধিকাংশের জোটে না। ইহারা হয় টাউট। দেশ টাউটে মোক্তারে ছাইয়া গিয়াছে। গ্রামে দুটি লোকের মধ্যে একটু সামান্য বিবাদ হইলে দুই পক্ষেই অমনি ছারপোকার মত টাউট বা মোক্তার জুটিল এবং নানা মিথ্যা প্রলোভনে উত্তেজিত দুই পক্ষের দ্বারাই অতিরঞ্জিত মিথ্যা মোকদ্দমা করিল (ঐ, পৃঃ ৩৬)।

একদিন তাহার একটি পুত্রকে লইয়া আমার কাছে উপস্থিত। আমি তাহার পুত্রকে তাহার ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া আমার কাছে রাখিতে বলিলাম। সে বলিল—"কর্ত্তা! তাহাকে বিদ্যাপাঠ করাইতেছি।" তাহার পিতা নিজ ব্যবসায়ে প্রায় ১৫/২০ টাকা মাসে উপার্জ্জন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই হতভাগা উক্ত পণ্ডরংগর বিদ্যাপাঠ করিয়া কি করিবে? যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ এই প্রাইমারি বা মহামারিতে ব্যয়িত হইতেছে, তাহার দ্বারা যদি এই উপবিভাগের কেন্দ্রস্থলে একটি শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হইত, এবং ব্যবসায়ীর পুত্রগণ স্বীয় স্বীয় ব্যবসা শিক্ষা করিতে পারিত তবে দেশের কি প্রভূত মঙ্গল হইত!

শিক্ষা-বিভাগ বলিবেন—তাঁহারা বলিয়া থাকেন—"আমরা কিঞ্চিৎ General Education বা সাধারণ শিক্ষা দিতেছি মাত্র, আমরা কি কাহাকেও আপন আপন ব্যবসা ত্যাগ করিতে বলিতেছি?" বলিতেছ বৈ কি? শিল্প বা Technical Education এর সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা বা General Education সংযুক্ত হইলে সোনায় সুগন্ধের সংযোগ হয়। কিন্তু শিল্প শিক্ষা হইতে শিল্পীর সন্তানকে বিরত করিয়া খানিকটা সাধারণ শিক্ষা তাহার গলাধঃকরণ করিয়া দেওয়া তাহার ইহকাল ও পরকাল খাওয়া...............আর সাধারণ শিক্ষাই বা কিরূপ হইতেছে। পূর্ব্বেও ত দেশে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ছিল। এখনও সেই পাঠশালাই আছে; তবে তাহার শত নাম সহস্র নাম হইয়াছে মাত্র। আমরা যাহাকে "মুড়ি" বলিতাম শিক্ষা-বিভাগ তাহাকে "ভাজা চাউল" বলেন মাত্র। তবে শিক্ষা-প্রণালীর অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বটে। পূর্ব্বে হিন্দু সন্তানেরা অক্ষর শিক্ষা হইলেই পড়িতে শিখিত—

"ক য়ে কমলা দেবী কমল বদনী"

কিম্বা

"ক য়ে কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু করুণানিদান"

এখন পড়ে—

ক য়ে কদলি কলা কচুপোড়া খাও।"

পূর্ব্বে অক্ষর লিখিতে শিখিলে তাহারা পূর্ব্বপুরুষদের এবং দেবদেবীর নাম লিখিত। এখন তৎপরিবর্ত্তে লেখে—

"গণ্ডার গবয় গাধা"

তখন নীতিপূর্ণ শ্লোক সকল মুখস্থ করিত, এখন শিক্ষা করে—"মানুষ দুই পায়ে গমন করে, তাহার লেজ নাই।" তখন পড়িত—ধ্রুব চরিত, প্রহ্লাদ চরিত, কৃষ্ণ চরিত, চৈতন্য চরিত। এখন পড়ে—"ডুবাল চরিত"। তখন পড়িত দেব চরিত—এখন পড়ে পশু চরিত। তখন তাহাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য—কাঠাকালি, নৌকা কালি, মাটি কালি ইত্যাদি মুখে মুখে কসিতে পারিত। এখন শ্লেট পেন্সিল লইয়া যোগ আর বিয়োগ করিতে মৃত্যুযোগ ও প্রাণবিয়োগ ঘটে। তখন হিন্দু সন্তানের শিক্ষক হিন্দু এবং মুসলমান সন্তানের শিক্ষক মুসলমান ছিল। উভয় স্থলেই শৈশব হইতে বালকের তরল হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ রোপিত হইত। এখন অনেক স্কুলে হিন্দু সন্তানের শিক্ষক মুসলমান, এবং মুসলমান সন্তানের শিক্ষক হিন্দু এবং সর্ব্বত্রে ধর্ম্মশিক্ষা বর্জ্জিত। ইহার পরিণাম কি হইতেছে, দিন দিন কি হইবে, তাহা ভাবিবার কথা, চিন্তা করিবার কথা। ইতিমধ্যে এই সুশিক্ষা-বৃক্ষে জাল গুরু, জাল ছাত্র এবং জাল মোক্তার পর্যান্ত ফলিয়াছে। এখনই অধর্ম্মে দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। ধর্ম্মাধিকরণ পর্য্যন্ত জুয়া-গৃহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিষয় বড় গুরুতর। এই প্রদেশের ভাগ্য যাঁহার হস্তে নিহিত, তিনি সভাপতি আসনে আসীন। আমি সেই জন্যই এই বিষয়টী কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম।

সে যাহা হউক, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, দুই বৎসর পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এই

শিক্ষা মাত্রই প্রচলিত ছিল না। যে ইংরাজী শিক্ষা এখন কি জ্ঞান শিক্ষার, কি উপজীবিকা লাভের একটি প্রধান সোপান, তাহার নামগন্ধও কোথাও ছিল না। ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ একটি লোকও এই উপবিভাগে অন্বেষণ করিলে পাওয়া যাইত না। চট্টগ্রাম—৬০ মাইল, কুমিল্লা—৪০ মাইল এবং নোয়াখালি—২৬ মাইল না গেলে সামান্য ইংরাজী কি বিদ্যাশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা ছিল না। অতএব এখানে একটি প্রবেশিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাহার স্থাপন করা একরূপ স্বর্গের সিঁড়ি নির্ম্মাণ করা। প্রথম বিঘ্ন মুনসেফি আদালত দেওয়ানগঞ্জ হইতে উঠাইয়া আনিতে না পারিলে এখানে কোনও মতে এরূপ একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সে এক অসাধ্যসাধন। তাহা লইয়া ১০ বৎসরব্যাপী এক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আবার হাত দেওয়া মাত্র দেওয়ানগঞ্জের ভদ্রমণ্ডলী সেই পূর্ব্ব জিদে পড়িয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়গণকে দোহাই দিয়া বলিতে লাগিলেন যে মুন্‌সেফি ফেণীতে উঠিয়া গেলে একটি খণ্ড প্রলয় হইবে। অনেক যত্নের পর মুন্‌সেফি উঠিয়া আসিল। ইতিমধ্যে একবার কিঞ্চিৎ ভূমিকম্প হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা যে ফেণীতে মুনসেফি উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া হইয়াছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এখন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় তাঁহারাই বলিবেন যে যেখানের দেশ সেখানে আছে, কিছু ব্যত্যয় ঘটে নাই। কার্য্যটি যে প্রকৃত লোকহিতকর হইয়াছে, তাহার প্রমাণ অধিক দূরে অন্বেষণ করিতে হইবে না। এই বিদ্যালয় তাহার জীবন্ত প্রমাণ এবং তাঁহারাই ইহার স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবকারী এবং প্রধান উদ্যোগী।

দ্বিতীয় বিঘ্ন টাকা। এই পাপ কলিযুগের মধ্যভাগে রূপচাঁদ

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং"............তৎপদ দর্শন লাভ............পারে। তিনিই প্রধান নমস্য। তিনি যাহাকে কৃপা করেন, সে নরাধম পাপী হইলেও সৎ, তিনি যাহাকে অকৃপা করেন সে অনাহারে চিৎ এবং তিনিই সকল আনন্দের নিদান। অতএব তিনিই সচ্চিদানন্দ। তাঁহাকে লাভ করা ত সামান্য সাধনা কি তপস্যার কথা নহে। এই উপবিভাগটি দুই জন ভূম্যধিকারীর অধিকারে মাত্র প্রধানতঃ বিভক্ত। তাঁহারা উভয়ে বিদেশীয়, উভয়ে ঋণ-কর্দ্দমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অতএব একরাশি সচ্চিদানন্দ কিরূপে সংগ্রহ হইবে? কিন্তু উদ্যোগকারীগণ তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তাঁহারা জানিতেন দশের লাঠি একের বোঝা। অতএব তাঁহারা গ্রামে গ্রামে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। যে যাহা দেয় তাহাই লইলেন, মুষ্টিভিক্ষা অর্থাৎ এক আনা পয়সা পর্য্যন্ত তাঁহারা আনন্দে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সফলতার পথে লোকের একটি বিশ্বাস কণ্টক (?) হইয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটি "কৃষি প্রদর্শনী মেলা" হয়। তাহার জন্য প্রভূত অর্থ সংগৃহীত হয়। একটি মধ্যবিৎ অবস্থার লোক উদ্যোগকারী জনৈককে বলিল—"আমাদের কাছে হইতে আর একবার কি এক পরীদর্শনীর জন্যে টাকা উঠাইয়া বলিয়াছিল, ফেণীতে গেলে কত তামাসা দেখিতে পাইবে, তোমাদের কৃষিরও কত উন্নতি হইবে। তাহা নিশ্বাস করিয়া ফেণীতে গেলাম। পরী ত দেখিলাম ২জন খেমটী নাচিতেছিল, তাহা দেখিতে গিয়া গল্লাধাক্কা খাইলাম। কৃষির উপকার ত করিলে এই পর্য্যন্ত। তোমরা নাম করিয়া পয়সা নিয়া শেষে খেমটার নাচ আর গলাধাক্কা দশনী করিবে না ত?" ইহাদিগকে অনেক যত্নে বুঝান হইল যে সেরূপ কোনও প্রদর্শনী হইবে না। যে অর্থ সংগৃহীত হইতেছে, তাহার কড়া-ক্রান্তি হিসাব তাহাদিগকে দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহাদের মন হইতে সে সন্দেহ গেল না। তথাপি উদ্যোগকারীগণ যাহা সংগ্রহ করিতে পারিলেন, তাহা তাঁহাদের আশাতীত। সৎকার্য্যে স্বয়ং ভগবান সহায় হন।

কিন্তু এবার উদ্যোগকারীগণ ঘোরতর বিপদস্থ হইলেন। তাঁহারা নোয়াখালির চিরপ্রসিদ্ধ চুক্‌লিখোরগণের দণ্ডে নিপতিত হইলেন। 'চুক্‌লিখোর' কথাটির সংস্কৃত কোনরূপ প্রতিশব্দ আছে কি না জানি না। না থাকিবারই কথা। কারণ এ পাপ পূর্ব্বে

এ দেশে ছিল না। কিন্তু তাহার ইংরাজী শব্দটীর অর্থ—"পৃষ্ঠদংশক।" এই নরাধম নরকীটদিগকে আমি মনুষ্য সমাজের "ছুঁচো" মনে করি। ইহাদিগকে তুমি দেখিবে না, ইহারা পবিত্র আলোককে ভয় করে, কেবল গন্ধের দ্বারা তুমি বুঝিতে পারিবে যে তোমার সুনাম কলঙ্কিত করিয়া গেল। দেশের দুর্ভাগ্য যে রাজপুরুষগণের কাছে এ নরাধমগণেরই বিশেষ প্রতিপত্তি। ইঁহারা এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের কিরূপ অনিষ্ট করিতে এবং ইহার উদ্যোগকারীগণকে কিরূপ বিপদস্থ করিতে চাহিয়াছিল...তাহা বলিবার নহে। আপনারা তাহাদের অলক্ষিত দুর্গন্ধের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারেন বুঝিয়া লইবেন। প্রয়োজনোচিত অর্থ সংগৃহীত হইলে উদ্যোগকারীগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এমন সময় নোয়াখালির "কৃষি প্রদর্শনীর" বিজ্ঞাপন আসিয়া পহুঁছিল। তাঁহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এ অঞ্চলের লোকেরা কৃষিপ্রদর্শনীর অর্থ বিশেষতঃ গলদেশের বেদনা দ্বারা যেরূপ অনুভব করিয়াছিল, ইহাদের কাছে আর অর্থ চাহিলে পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। চাওয়াও উচিত নহে, কারণ এইমাত্র তাহারা এই বিদ্যালয়ের জন্যে একবার আনুকুল্য করিয়াছে। এই অর্থের এক কপর্দ্দকও কৃষি প্রদর্শনীর জন্যে পাঠাইলে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য হয়। সাধারণের যে সন্দেহের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়া পড়ে।

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ"—এইরূপ বিষম সংকটে পড়িয়া উদ্যোগকারীগণ ফেণীর উকীল মোক্তার ও রাজকর্ম্মচারীগণ হইতে এই বিদ্যালয়ের জন্যে যে অর্থ চাহিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু এই অর্থের অল্পতাই তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠদংশকগণের দারুণ দন্তে নিক্ষিপ্ত করিল। আয়োজন সমুদয় প্রস্তুত ছিল, তাঁহারা উপায়হীন হইয়া ১৮৮৬ ইংরাজীর ১ম জুন দিবসে এই বিদ্যালয় খুলিলেন। ঐদিন তাহার শীরের উপর মেঘ সঞ্চার হইতে... ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর এখানে পদার্পণ করিলেন। শুনিলাম তিনি এরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে তিনি শুনিয়াছেন যে এই বিদ্যালয়ের জন্য বলপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করা হইয়াছে। আপনারা "পৃষ্ঠদংশকের" দুর্গন্ধ পাইতেছেন কি? তিনি চলিয়া গেলেন। তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু তারিণীলাল চৌধুরী এই গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন: এবং এরূপ একটি বিদ্যালয় রক্ষা করা তাঁহার সাধ্যাতীত বলিয়া বিদ্যালয় সমিতির সভ্যগণকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিলেন। এই ব্রহ্মাস্ত্র হইতে যে এই নবাঙ্কুরিত বিদ্যালয়টি রক্ষা পাইল, সে কেবল সভ্যগণের সংসাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতার এবং কার্য্যদক্ষতার ফল। এই দেশশুদ্ধ লোক কিসের জন্যে তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিবে। তাঁহারা এই ব্রহ্মাস্ত্র তৃণবৎ তর্জ্জনী সঞ্চালনে বিফল করিলেন এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত গৃহ নিম্মাণ কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। পৃষ্ঠদংশকগণের প্রথম ষড়যন্ত্র বিফল হইল। কিন্তু এই অন্ধকারের কীট একবার পদাঘাতে মরে না—ইহাদের প্রাণ কুকুরের প্রাণ। ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্থানান্তরিত হইয়া যাইবার সময়েও লিখিলেন যে তিনি কোনও বিশ্বস্ত লোকের কাছে শুনিয়াছেন যে সবডিবিজনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর আদেশ মত ফেণীর ভূতপূর্ব্ব সবরেজিষ্ট্রার প্রত্যেক দলিলের নিয়মিত ফিসের উপর ৵. করিয়া স্কুলের...অতএব তিনি ফেরত ডাকে স্কুলের আয়ের হিসাব চাহিয়া পাঠাইলেন। তাহা পাঠান হইল এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি মহাশয়ের জন্য কিঞ্চিৎ তিক্ত উপহারও পাঠান হইল[৭]। হিসাব ফিরাইয়া

৭। 'বাবু! আমি এক বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াছি। আপনি আপনার এলাকায় সব-রেজিষ্টারদের প্রত্যেক দলীলের রেজেষ্টারী ফিসের উপর আপনার স্কুলের জন্য ।০ করিয়া টেক্স উশুল করিতে আদেশ করিয়াছ। একথা সত্য কিনা আমি জানিতে চাহি।' আমি শান্তভাবে উত্তর দিলাম—'আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা একটা 'কালা মিথ্যা কথা' (black lie) কোন্ গাজী (black guard) আপনাকে এরূপ মিথ্যা কথা বলিয়াছে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহার নাম

দিয়া লিখিলেন উপরোক্ত টাকা যে আয়ের হিসাবে থাকিবে সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহা প্রত্যাশা করেন নাই, অতএব ব্যয়ের হিসাব চাহিলেন, এবং সেই দিনই তিনি এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া যান, সেদিন তাহা ফিরিয়া পাঠাইলেন। ফেণীর সবরেজিস্ট্রার অন্যরূপ অর্থের আনুকূল্য করা দূরে থাকুক নিজে যে মাসিক চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাহারও এক পয়সা পর্য্যন্ত দিয়াছিলেন না। ইহাতেই রক্ষা। কিন্তু অনেকে ত স্থানে স্থানে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অনেক সঙ্গীতসম্পন্ন ব্যক্তিও দান করিয়াছেন। মনে করুন যদি ফেণীর সবরেজিস্ট্রার সেরূপ কিছু করিতেন, তাহা হইলে এরূপ নরাধম নর কীটের ঘৃণাস্পদ মিথ্যাপবাদে এই বিদ্যালয় ও তাহার উদ্যোগকারীগণ কি ঘোরতর বিপদস্থ হইতেন, তাহা আপনারা একবার কল্পনাও করিতে পারিবেন কি? তবে ভূতপূর্ব্ব মাজিস্ট্রেট বাহাদুরই বা করিবেন কি? দেশীয়দের মধ্যে যাঁহারা পদস্থ, যাঁহাদিগকে তিনি "ভদ্রলোক" বলিয়া জানেন, তাঁহারা যে এরূপ জঘন্য ব্যবসার ব্যবসায়ী তাহা তিনি কি প্রকারে বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশের এমনই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে যে এরূপ ঘোরতর ধর্ম্মজ্ঞানহীন স্বার্থপরায়ণ পাপিষ্ঠেরা ভিন্ন প্রকৃত "ভদ্রলোক" রাজপুরুষদের সংস্পর্শে বড় আইসেন না, আসিলেও সর্ব্বার্থসাধক চাটুতায় অপটু বলিয়া স্থান পান না। যাহাই হউক উদ্যোগকারীগণ এবম্বিধ কত অপবাদ ও অপমানরাশি নতশিরে সহ্য করিয়াছেন তাহা বাস্তবিক কল্পনাতীত। তবে—"নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিত দুর্গতিং তাত গচ্ছতি"[৮]—এই ভগবদ্বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহারা বুক বাঁধিয়াছিলেন। বলিয়াছি ভগবান সৎকর্ম্মের সহায়। তিনি তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের মুখ প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। আর সেই বিশ্বস্ত মহোদয়েরা? নরকের কৃমি নরকে বিলীন হইয়াছে। শীঘ্র হউক আর বিলম্বেই হউক...প্রায়শ্চিত্ত...এখন যে দুর্গতি হইয়াছে তাহা দেখিলে পাষাণেরও দয়া হইবে।

আমাদের উদ্দেশ্য না থাকিলে আমরা এই ঘৃণিত কথার উল্লেখ করিয়া এই পবিত্র বিদ্যালয়ের পবিত্র বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী কলুষিত করিতাম না। প্রথম উদ্দেশ্য—দরিদ্র জ্ঞানপিপাসু শিশুগণের মুখ হইতে যে টাকাটা আমরা কাড়িয়া নিয়া কৃষিপ্রদর্শনীর জন্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার ব্যয়াবশিষ্ট অর্থ হইতে যদি আমাদের সাধু, শ্রদ্ধাস্পদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহাশয়ের সুললিত ভাষায়—"শ্রীমনানন্দ রামস্য কৃপয়া দীনবানকে" পাইতে পারি, তবে এই দীনবালকগণের ও দরিদ্র বিদ্যালয়ের বিশেষ উপকার হয়।

পাঠাইবেন। আমি তাহার নামে মিথ্যা অপবাদের জন্য অভিযোগ আনিতে চাহি। আপনি ইংরাজ এবং আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী। আপনি অবশ্য এরূপ পাজী পৃষ্ঠদংশককে (Rascally back biter) ঘৃণা করিবেন।

৮। গীতা ৬।৪০

অমিয় নিমাইচরিত

শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর লীলা বর্ণন।*

ভারতবর্ষে একজন মাত্র শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ আছেন। তিনিই শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ। ইহা ভাবিতে গেলে মনে একটা গভীর দুঃখের উদয় হয়, কিন্তু সে সঙ্গে একটা সুশীতল সান্ত্বনা আসিয়াও সে দুঃখের অপনয়ন করে। দুঃখ,—দ্বিতীয় শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ কেহ নাই। আর দুই এক জন শিশিরকুমার ঘোষ থাকিলে বুঝি ভারতমাতার অশ্রুবেগ আরও কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইত, সপ্তশত বৎসরের বিষাদমণ্ডিত মুখে আশার বালসূর্য্যের হাসি আরও কিঞ্চিৎ উজ্জ্বলতর হইয়া ভাসিয়া উঠিত, ধমনীতে নবজীবনের স্রোত আরও কিঞ্চিৎ খরবেগে প্রবাহিত হইত। সান্ত্বনা,—শ্রীশিশিরকুমারের মত প্রতিভাশালী মহাপুরুষ পৃথিবীতে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব আমাদের শতাব্দীতে, আমাদের এই দীনা জীবনহীনা জন্মভূমিতে যে একজনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বঙ্গমাতার পক্ষে, বঙ্গবাসীর পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। আমাদের এই শতাব্দীতে বঙ্গদেশে বহু মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণদাস, ব্যবহার নীতি ক্ষেত্রে শ্রীদ্বারকানাথ ও শ্রীউমেশচন্দ্র, দানক্ষেত্রে শ্রীঈশ্বরচন্দ্র, এবং কাব্যক্ষেত্রে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীমধুসূদন। ইঁহারা সকলেই ক্ষণজন্মা, দেবপ্রতিভাসম্পন্ন ও প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু শ্রীশিশিরকুমারের মত কাহারও প্রতিভা হিমালয় সানু হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, গঙ্গা হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই, আসিন্ধু হিমাচল ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর এরূপ কার্য্য করে নাই। "অমৃতবাজার পত্রিকা" এবং "অমৃতবাজার পত্রিকা"র শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ নব্যভারতের সঞ্জীবন মন্ত্র। শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ নব্যভারতের নব জীবনের প্রণব। মহারাষ্ট্র দেশের বরদা রেলওয়ে ষ্টেশনে একজন বাঙ্গালী পর্য্যটক 'টিকিট' কিনিতেছেন। "টিকিট কালেক্টর" একজন মহারাষ্ট্র দেশীয় ভদ্রলোক। পরিধানে ধুতি, গায়ে চাপকান, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। পর্য্যটককে স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বাঙ্গালী?" পর্য্যটক আত্মপরিচয় দিলে তাঁহাকে পরম সমাদরে তাঁহার কক্ষে আহ্বান করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শ্রীশিশিরকুমার ঘোষকে চিনেন?" তিনি শিশিরকুমার সম্বন্ধে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন—"কন্‌গ্রেস ও শিশিরকুমার ঘোষ মাত্র আমাদের ভবিষ্যত আশা।" এরূপে ভারতবর্ষের স্বাধীন বা অধীন রাজ্যে যেখানে যাও সেখানেই শিশিরকুমারের নাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনিবে। দরিদ্রের কুটীর হইতে সম্রাজ্ঞী-প্রতিনিধির প্রাসাদ পর্য্যন্ত শিশিরকুমারের নাম সর্ব্বত্র উৎপীড়িতের আশ্রয়, উৎপীড়নকারীর আতঙ্ক। ভারতের ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে ইংলণ্ডের "মহাসভা" পর্য্যন্ত শিশিরকুমারের প্রতিভা বিদ্যুল্লতার ন্যায় বিচিত্র ক্রীড়া করিতেছে।

যশোহর জেলার একটি সামান্য পল্লীতে, অতিসামান্য অবস্থায়, জন্মগ্রহণ করিয়া, পদগৌরব হীন, অর্থ হীন, আশ্রয় হীন শিশিরকুমার কিরূপে এতাদৃশ প্রতিষ্ঠাভাজন হইলেন? তাহার একমাত্র উত্তর—প্রেমে। তাঁহার কৃতিত্বের মূলমন্ত্র কি?—প্রেমে। তাঁহার অপূর্ব্ব আত্মচরিতের—'শিশিরকুমার চরিতের'—ভিত্তিভূমি কি?—প্রেমে। প্রেমে মানুষকে দেবতা করিতে পারে, দেবতাকে নরলোকে অবতীর্ণ করিতে পারে। প্রেমে পৃথিবীকে স্বর্গ করিতে পারে, স্বর্গকে পৃথিবীতে আনিতে পারে। Heaven itself descends in love —প্রেমে স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, ইহা কবি-কল্পনা নহে। আমরা শিশিরকুমারের

* শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ দাস কর্তৃক গ্রন্থিত। কলিকাতা বাগবাজার, অমৃতবাজার পত্রিকা অফিস হইতে প্রকাশিত।

জীবনে, এই মহা সত্যের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাঁহার জীবনে প্রেমের কি অপূর্ব্ব আবর্ত্তন। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে পবিত্র বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেম-গঙ্গা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত কলেবরা হইয়া এবং ভারতভূমি উর্ব্বরা ও পবিত্র করিয়া আজ কি অনন্ত সমুদ্রে পরিণত হইয়াছে। সেই বিষ্ণুপদ তাঁহার পিতৃমাতৃ প্রেম; সেই অনন্ত সমুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেম। তাহার মন্থনের দেবদুর্লভ ফল—এই অমিয় নিমাইচরিত।*

শিশিরকুমার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে দীক্ষিত হইলেন। জ্ঞানের ঐরাবতকে উড়াইয়া শিশির-কুমারের প্রেমগঙ্গা শ্রীগৌরাঙ্গের দিকে অবারিত, অজস্র বেগে ছুটিল। "এই অনন্তের পাছে যে অনন্ত আছে" শিশিরকুমারের "প্রেমসিন্ধু" বহু সাধনার পর সেই অনন্তের দিকে ছুটিল। তখন শিশিরকুমারের হৃদয়ের অবস্থা কি হইল, তাঁহার নয়নে কি স্বর্গ খুলিয়া গেল—তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি তাঁহার "অভিন্ন কলেবর শ্রীবলরাম দাস"এর যে দুটি পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভে 'প্রার্থনায়' শ্রীভগবানের চরণে অর্পণ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

"তপ্ত বালুকায় আছিনু শুইয়া, চকিতের মত এলো
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
গৌর আমায় নিয়া গেল।
কি গুণে আইল, কেন দয়া হলো,
কিছু আমি নাহি জানি।
সরল বলিতে, শ্রীগৌর আমার,
অসাধন চিন্তামণি।
কুঞ্জে নিয়া গেল, অঙ্গ জুড়াইল,
আমি ইতি উতি চাই,
সুন্দর এমন শীতল কানন,
কভু আমি দেখি নাই।"

কি প্রেমাস্পদ, শান্তির সম্পদ, আনন্দপ্রদ স্থান! ইহাই বুঝি শ্রীমদ্ভাগবতকারের বৃন্দাবন। ইহাই সেই "শ্যামকুঞ্জ", "রাধাকুঞ্জ।" বৃন্দাবনের বালক বালিকাদের গাহিতে শুনিয়াছিলাম—

"শ্যামকুঞ্জ, রাধাকুঞ্জ, গিরি গোবর্দ্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন।"

গীত কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, হৃদয় উদ্বেলিত করিয়াছিল। কিন্তু কই? সে বৃন্দাবন ত চক্ষে দেখি নাই। আজ শিশিরকুমার সেই বৃন্দাবন দেখাইলেন। সেই বৃন্দাবন তাঁহার হৃদয়ে দেখিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষার জর্জ্জরিত, পাশ্চাত্য দর্শনে উৎপীড়িত, পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রতারিত আমরা হতভাগ্যগণ কি এই "সুন্দর এমন, শীতল কানন" দেখিতে পাইব না? ভগবন্! তুমি দয়াময়। আমাদের এ দুর্গতি দেখিয়া বুঝি এত দিনে তোমার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে। যেই জীবের উদ্ধারের জন্য তুমি কিশোর বয়সে কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলে, তাহাদের উদ্ধারের জন্যই বুঝি তুমি প্রতিভাশালী শিশির-

* এই প্রবন্ধে নিমাইচরিত রচয়িতার অতি উৎকৃষ্ট জীবন বৃত্তান্ত অংশটুকু স্থানাভাবে বশতঃ অপ্রকাশিত রহিল। কিন্তু সে অংশ এতই উৎকৃষ্ট যে পাঠকবর্গকে তাহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত করিতে হইল বলিয়া আমরা একান্ত ক্ষুব্ধ হইলাম এবং কল্পনা রহিল যে সুবিধা পাইলে কোন—সময়ে তাহা প্রকাশিত করিয়া আমরা নিজেও পরম আনন্দিত হইব এবং পাঠকবর্গেরও আনন্দ-বর্দ্ধন করিব। সঃ।

কুমারকে এরূপে তোমার শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিয়াছিলে এবং তাঁহার হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া তোমার এ 'অমিয়' চরিত প্রণয়ন করাইয়াছে।

পাঠক বোধ করি এখন বুঝিয়াছেন "অমিয় নিমাই চরিত" কি অমূল্য গ্রন্থ—বুঝিয়াছেন কি সমুদ্র, কি সাধনার দ্বারা মন্থন করিয়া শিশিরকুমার এই অমিয় তুলিয়াছেন। তাঁহার ভগবতপ্রেম সেই ক্ষীরসমুদ্র, তাঁহার অধ্যবসায় সেই মন্থনদণ্ড এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা সেই মথনরজ্জু। এক মাত্র তাঁহার স্বজাতিকে—মানব জাতিকে—এই অমিয় পান করাইবার জন্য তিনি ক্ষীণ, রুগ্ন শরীরে এ সমুদ্র মন্থনশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। বলরাম দাসের কবিতার দ্বারা তিনি এই মহৎ উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছেন—

"যেন উপকার আপনি করিলে
আমি শোধ দিব ধার।
এই জগ মাঝে গৌরাঙ্গ গাওয়ার,
যতোদিন বাঁচি আর।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা লিখিয়া লিখিয়া
আগে জানাইব জীবে।
শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা কর্ণেতে পশিলে,
অবশ্য তোমার হবে।
এমন পাষাই ত্রিজগতে নাই
যে গৌরাঙ্গ-লীলা পড়ি,
ধৈর্য্য ধরি রবে মোটে না কান্দিবে,
না দিবে সে গড়াগড়ি।"

আমাদের বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণ-চরিত' এবং শিশিরকুমারের "অমিয় নিমাই চরিত" আমাদের সাহিত্যে ও ধর্ম্মে দুইটি যুগ সঞ্চারী গ্রন্থ। 'কৃষ্ণ চরিত' অনেকে পড়িয়াছেন; সেই 'আদর্শে মনুষ্য' বা ঈশ্বরাবতার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। এখন একবার "অমিয় নিমাই চরিত" পড়িয়া প্রেমাবতার দেখিয়া প্রাণ শীতল করুন। সত্য সত্যই "এমন পাষাণ ত্রিজগতে নাই" যে শিশির কুমারের এই প্রেমভাণ্ডার গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমে আর্দ্র হইবে না। প্রেমে ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইবেই, তদ্ভিন্ন এই গ্রন্থ পড়িবার আর একটি গুরুতর প্রয়োজন আছে। তাহা কি? বলিতেছি।

অনেক দিনের কথা নহে—এমন কি সে দিনের কথা বলিলেও চলে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ণে অঙ্গুলি অর্পণ করিতেন। খৃষ্টান মিশনরির, ও তস্য শিষ্য ব্রাহ্মদের কল্যাণে, ততোধিক কৃষ্ণোপাসকদের কল্যাণে, শ্রীকৃষ্ণের তুল্য নিন্দাস্পদ ও ঘৃণাস্পদ এ জগতে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আমি "থিওসফি সোসাইটির" কৃপায় ও বঙ্গ সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্রের ও দু একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের কৃপায়, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নয়নাবরণ বোধ হয় কিঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ এখন তাঁহাদের মধ্যে যেন দাঁড়াইবার কিঞ্চিৎ স্থান পাইয়াছেন। এখন চারি দিতে গীতা ও গীতার শ্রীকৃষ্ণ লইয়া দেশব্যাপী একটা তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে। অনেকেরই কাছে এখন শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর 'অবতার' না হউন, অন্ততঃ 'আদর্শপুরুষ'। পৌরাণিক যুগের শেষ সময় হইতে যে কর্দ্দম রাশিতে শ্রীকৃষ্ণ চাপা পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই মঙ্গময় ইচ্ছাক্রমে যেন তাহা সরিয়া যাইতেছে এবং তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ণ ঐশ্বর্য্যে আমাদের নয়নে আবির্ভূত হইতেছেন। প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাবলে দেশে এক প্রকার 'কৃষ্ণ ভক্তির' বাতাস বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। তথাপি তাঁহার ব্রজলীলা সম্বন্ধে সন্দেহ এখনও বোধ হয় সকলের হৃদয় হইতে সমান ভাবে অন্তর্হিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ 'ব্রজলীলা' অপ্রমাণ্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিয়াছিলেন। এখন যদিও মহৎ ব্যক্তির

ন্যায় ভ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ সমালোচনা 'কৃষ্ণচরিতের' নূতন সংস্করণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার মহাগ্রন্থে 'কৃষ্ণপ্রেম' কথাটি কোথাও পাইলাম না। তিনি অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে গোপীদের 'কৃষ্ণভক্তি' বলিয়াছেন, 'কৃষ্ণপ্রেম' বলেন নাই তাহাদের সেই কৃষ্ণভক্তি পতিভক্তির সদৃশ বলিয়াছেন, কিন্তু পতিপ্রেম সদৃশ বলিতে যেন সাহস করেন নাই। এই পর্য্যন্ত উঠিয়া উপসংহার কালে আবার আরও নামিয়া পড়িয়াছেন। তিনি উপসংহারে বলিয়াছেন—'ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই...তিনি শৈশবে রূপ-লাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গুণে সকলে সর্ব্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন।...গেপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন; সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব ও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।"

এখন জিজ্ঞাস্য যে যখন শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর মাত্র বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ "সর্ব্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন" না বলিয়া "সর্ব্বজনের প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন" বলিতে ক্ষতি কি? "গোপ বালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন" না বলিয়া "গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি প্রেমশালী ছিলেন" বলিতে ক্ষতি কি? "কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, এমন একটি দেবপ্রতিভাসম্পন্ন, দেবরূপসম্পন্ন, বালক দেখিলে আমরা ঊনবিংশতি শতাব্দীর শিক্ষিত মহোদয়গণও কি প্রেমে অধীর হইয়া, তাঁহার পূজা করিতে যাই না? কোমলপ্রাণা রমণীগণ কি পতি পুত্র ত্যাগ করিয়া তাঁহার পূজার্থ ছুটিয়া যান না? প্রেমে অধীর হইয়া তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া, বুকে লইয়া, মুখে চুম্বন করেন না? তাঁহাকে কি আপন পতিপুত্রের অধিক প্রেম করেন না? যাহারা তাঁহার প্রতি এরূপ প্রেমবান হইবে, তিনি কি তাহাদের প্রতি প্রেমবান হইবেন না? পল্লীগ্রামে সামান্য একটি সুন্দর সন্ন্যাসী বালক আসিলে কি কাণ্ডটা হইয়া থাকে তাহা কি কেহ দেখেন নাই? লেখক স্বচক্ষে এরূপ একটি কাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তবে 'কিশোর' শ্রীকৃষ্ণের এবং সরলা অশিক্ষিত 'কিশোরী' গোপীগণের প্রেমে কলঙ্ক স্পর্শিবে কেন? কিশোর বয়স্ক একটি বালক ঘোরতর পাপিষ্ঠ হইলে ত সেরূপ প্রেম তাহার পক্ষে অসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব গ্রন্থে মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিতেই প্রাধান্য স্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু সে কৃষ্ণচরিতের পূজা কুত্রাপি নাই। আসিন্ধু হিমাচল ব্রজলীলার কৃষ্ণেরই পূজা প্রচলিত। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজলীলার কৃষ্ণপ্রেমে ও গোপী প্রেমেই দশা প্রাপ্ত হইতেন কেন? তাহা হইলেই বুঝিতে হইতেছে যে ব্রজলীলার মধ্যে আধ্যাত্মিক, রূপক ও উপন্যাস থাকিলেও এই 'কৃষ্ণপ্রেম' ও 'গোপীপ্রেম' রূপক কি উপন্যাস লইয়া এরূপ উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? তাই বলিতেছিলাম শিশিরকুমারের এই 'অমিয় নিমাইচরিত' পড়িবার একটা অতি গুরুতর প্রয়োজন আছে। এই অসামান্য গ্রন্থ পাঠ করিলে 'কৃষ্ণপ্রেম' ও 'গোপীপ্রেম' যে কি পবিত্র পাষাণদ্রবকারী 'অমিয়' তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। শিশিরকুমারের এই অদ্ভুত গ্রন্থের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকের কাছে দিবার সময় আমরা এই কথাটা আরও খুলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ চরিত ব্রজের প্রেমলীলার একটি জীবন্ত, জ্বলন্ত, অভ্রান্ত উদাহরণ। এই প্রেমলীলার পবিত্রতা, উচ্চতা, গভীরতা এবং জীবের পরিত্রাণকারিতা অচিন্তনীয় উদাহরণের ছলে বুঝাইয়া দিবার জন্যই বুঝি শ্রীকৃষ্ণ আবার শ্রীগৌর হইয়া এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। হায়! আমরা পতিত বঙ্গবাসী তাঁহাকে এখনও চিনিলাম না।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

পত্রাবলী

॥ ১ ॥

Rangoon, 11 York Road.
২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬।

ভাই গিরিশ!

২০ বৎসর বয়সে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি 'সিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এই মাত্র পড়া শেষ করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান। আমি যখন 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখি, তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন।

আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংকরণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কি না বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেইজন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সে সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।

তোমার 'গীতাবলীর' সঙ্গে তোমার জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া উহার একখণ্ডও পাঠাইতে গুরুদাস বাবুকে লিখিলাম। এই সুদূর প্রবাস হইতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার অদ্ভুত জীবন যেন সুখ-শান্তিতে শেষ হয়!

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ২ ॥

Rangoon, 11 York Road.
২৩শে মার্চ্চ, ১৯০৬।

ভাই গিরিশ,

তোমার ৭ই মার্চ্চের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি যেরূপ ভোলানাথ, তুমি যে আমার পত্রের উত্তর দিবে, আমি কখনো মনে করিয়াছিলাম না। অতএব এই ত্যাগ স্বীকারের জন্য আমার ধন্যবাদ বলিব কি? তাহার অর্থত বুঝি না, আমার আন্তরিক প্রীতি গ্রহণ কর।

পৌরাণিক কাল বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। অতএব এখন কলিকাতা-রেঙ্গুণের মধ্যে সেতু বন্ধন করিয়া তোমার ছন্দ সম্বন্ধে একটা লড়াই চলিবে কি না বড় সন্দেহের কথা। আমি একজন চিররোগী। শীঘ্র যে কলিকাতা যাইব, সে আশা নাই। তুমিও কলিকাতার রঙ্গালয়ের রঙ্গপূর্ণ বৃহৎ উদরটি লইয়া সমুদ্রের এপারে আসিবে তাহাও অসম্ভব। আমার বোধ হয়—এ জীবনে তুমি 'মহারাষ্ট্র-পরিখা'র বাহিরে; কলিকাতার পাঁচ রকমের আনন্দও পাঁচ রকমের দুর্গন্ধ ছাড়িয়া, কখনও যাও নাই। যদি একবার মহারাষ্ট্র-দুর্গের বাহিরে এই ব্রহ্মদেশে আসিয়া যুদ্ধ দাও, তবে একবার ছন্দ লইয়া যুদ্ধ করি। ব্রহ্মদেশ প্রকৃতই Land of Pagodas and Plams —দেখিবার যোগ্যস্থান। তোমাকে একবার পাইলে তালা চাবি দিয়া ২ মাস বন্ধ করিয়া রাখিয়া একখানি নাটক লেখাইয়া লই।

আমার বিশ্বাস রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভা পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

কেবল সিরাজদ্দৌলা নহে, তোমার যখন যে বহি বাহির হয়, আমি তাহা কিনিয়া আনিয়া আগ্রহের সহিত পড়ি। শুনিয়াছি অনেক "সাহিত্যসিংহ" অন্যের লেখা বাঙ্গলা বহি পড়েন না। কেবল নিজের বহিই পড়েন। অনেকের বহির পাঠকও বোধ হয় নিজে গ্রন্থকার। কিন্তু আমি ক্ষুদ্র লোক। আমার সেই বড়মানুষী নাই। তোমার "গীতাবলীর" একখণ্ডও আনাইয়া তোমার জীবনীটি পড়িলাম। ঠিক কথা। তোমার বন্ধুবান্ধব বড় কম। তুমি পীঠস্থান কলিকাতায় এক জীবন বলিদান দিলে। কিন্তু কলিকাতার অল্প লোকেই বোধ হয় তোমাকে চিনে, ও আমার মত তোমায় শ্রদ্ধা করে।

সুরেশের (সমাজপতির) দ্বারা অক্ষয়বাবু এক দীর্ঘপত্র লিখিয়া আমি কেন ঐরূপ ভাবে সিরাজদ্দৌলার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বাচৌড়া কৈফিয়ত চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—তিনি লিখিয়াছেন—ইতিহাস, আমি লিখিয়াছি—কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম 'মার্স মেন'। তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধ হয় আমিই প্রথম গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছিলাম। অক্ষয়বাবু তাহার পর আমাকে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র ছাপাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে পলাশীর যুদ্ধের জন্য গবর্ণমেণ্টের বিষচক্ষে পড়িয়া এক জীবনে অশেষ দুর্গতি-ভোগ করিয়াছি। পত্রখানি ছাপাইলে আমার দুর্গতি আরো বাড়িবে মাত্র।

ভাল, আমার "কুরুক্ষেত্র" খানি কি তুমি অভিনয় করাইতে পার না? তাহার 'যাত্রা' হইয়া ত শুনিতেছি কলিকাতা ও সমস্ত বঙ্গদেশ কাঁদিতেছে।

হাতের লেখা সম্বন্ধে আমিও তোমার কনিষ্ঠ কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার বিয়া হইত না।

ভরসা করি এখন ভাল আছ। 'গীতাবলীর' ছবিতে দেখিলাম যে, শরীরটা একেবারে খোয়াইয়াছে এবং মূর্ত্তিখানি গণেশের মত করিয়া তুলিয়াছ। এখন কোন্ নূতন খেয়াল লইয়া নিজে নাচিবার, ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টায় আছ?

অমৃতবাবুকে ২ খানি পত্র লিখিয়া উত্তর পাই নাই। দেখা হইলে বলিও ভায়া বোধ হয় এখন 'স্বদেশী' রসের রসিক।

তোমারই—নবীন।

॥ ৩ ॥

Rangoon, 11 York Road.
'Plam Grdbe'. ২৭।৮।০৬

ভাই গিরিশ,

তোমার ২০শে জুলাইর পত্র পাইয়াছি। আমি কিছু অসুস্থ ছিলাম, তুমিও 'মীরকাসিম' লইয়া ব্যস্ত, তাই এতদিন উত্তর লিখি নাই। সংবাদপত্রেও দেখিতেছি 'মীরকাসিমের' বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে। তুমি ক্ষণজন্মা লোক। এই বয়সেও যেন তোমার প্রতিভা দিন দিন আরো বর্দ্ধিত হইতেছে।

আমার অনুরোধ, তুমি ৭ দিনে প্রসব না করিয়া, কিছু বেশী দিন সময় লইয়া 'আমাদের দেশের বর্ত্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্ম্মনীতি, দরিদ্রতা, অন্নহীনতা, জলহীনতা, শিক্ষাবিভ্রাট, চাকরি-বিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারি-বিভ্রাট, বিচার-বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি,—সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া একখানি Comico-tragic নাটক লিখিয়া দেশ রক্ষা কর। বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনটা স্থায়ী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চে

যে স্বদেশ লইয়া কাঁদিয়াছি, এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাহা শুনিয়াছেন, এবং দেশের হৃদয়ে এই সব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙ্গমঞ্চের দ্বারা তুমি যেরূপ স্থায়ী ও বর্দ্ধিত করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। 'নীলদর্পণের' মত এই একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে। উহা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে—অভিনীত হইয়া দেশে নূতন জীবন সঞ্চার করিবে। তুমি রঙ্গমঞ্চের দ্বারা ধর্ম্মে ও প্রেমে দেশ বহুবার মাতাইয়াছ। এবার স্বদেশ-প্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবনব্রত উদ্‌যাপন কর। তুমি এই বইখানিতে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গদ্যের সহিত চালাইবে। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর পারি, তোমার উক্ত রচনায় আমি সাহায্য করিব। আমার অনুরোধটা রক্ষা করিবে কি? আমার এরূপ পেড়াপিড়ির দরুন বঙ্কিমবাবু 'আনন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন। তাঁহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর পরে উহার কি অমৃত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি 'আনন্দমঠে' দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপূজার সঙ্গে পূজার পদ্ধতিও দেখাইবে।

'দানি' বাবাজির মীরকাসিমের অভিনয় এত ভাল হইয়াছে শুনিয়াছি—বড় সুখী হইলাম। বাবাজির অভিনয় দেখিয়া বহুপূর্ব্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে অভিনয়ে বাবাজি পিতার যোগ্যপুত্র হইবেন।

আমার আর 'ছেলেপুলে' কি? যদিও শ্রীভগবান একটি ক্ষুদ্র সৈন্যের প্রতিপালন ভার আমি দরিদ্রর স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন,—আর উহাই আমার জীবনের এক সান্ত্বনা —আমার নিজের এক সন্তান মাত্র। নির্ম্মলকে তুমি কলিকাতায় বড় ভালবাসিতে এবং তাহার গানের প্রশংসা করিতে। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে এক বৎসর কলিকাতায় শিক্ষানবিসি করিয়া, নির্ম্মল এখানে ব্যবসা করিতে গত বৎসর আসে। আমিও Extension of Service অস্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে এখানে আসি। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে—নির্ম্মল প্রথম মাসেই ১২০০ টাকা পায়. এবং এ ১৷৷. বৎসর যাবত তাহার আয় ১২০০ হইতে ২০০০। তাহার মাসিক ব্যয়ই প্রায় ১৫০০। তাহার এই আশাতীত কৃতকার্য্যতা শ্রীভগবানের কৃপা, আমার পিতার পুণ্যফল এবং আমার চট্টগ্রামের মুসলমানদের সাহায্য। এখানে তাহাদের সংখ্যা অল্প, এবং ইহারা আমার পুত্র বলিয়া নির্ম্মলকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছে। শ্রীভগবানের অসীম দয়ায় আমার পিতৃত্ব ঘুচিয়া এখন দ্বিতীয় পুত্রত্ব অবস্থা। কি আশ্চর্য্য, এইমাত্র আমার ৪ বৎসা বড় নাতিনী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল—"তাতা! তাতা! এই গ্রন্থাবলী নেও।" দেখিলাম "গিরিশ গ্রন্থাবলী"!

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন:

॥ ৪ ॥

Rangoon, 11 York Road.
১২।১০।০৬

ভাই গিরিশ,

তুমি এই নির্ব্বাসিতের সপ্রেম বিজয়ার আলিঙ্গন গ্রহণ করিও। বাড়ীতে পূজা, কিন্তু পুত্র—দুইটি বড় মকদ্দমার আবদ্ধ হওয়াতে এ বৎসর বাড়ী যাইতে পারি নাই। পূজা—এই নির্ব্বাসনের দেশে নিরানন্দে কাটাইয়াছি। ইহার মধ্যে আনন্দ যাহা—তোমার পাঁচখানি নাটক পূজার উপহার পাইয়া অনুভব করিয়াছি। কিন্তু এ অপব্যয় কেন? তুমি ত মহাপুরুষ, কখনো আমাকে তোমার কোন বহি উপহার পাঠাও নাই। আমি বরাবর যখন যে বহি বাহির হইয়াছে কিনিয়া পড়িয়াছি। আমিও কখনো তোমাকে উপহার পাঠাই নাই, কারণ তুমি পড়িবে না। যাক, 'মীরকাসিম' নূতন পড়িলাম। অন্য বহি সকল আর একবার এই নিরানন্দের সময় পড়িয়া বড়ই আনন্দ পাইলাম। 'ভ্রান্তি' ও

'বলিদান' আমার বড়ই ভাল লাগিল। 'স্বর্ণলতার' পূর্ব্বে কি পরে হতভাগিনী বাঙ্গালার 'অধঃপতনের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর দেখি নাই। একজন 'রুদ্রসেন' দিয়া সেক্ষপীয়ারের 'অথেলোর' অনুবাদ করিয়াছেন। তুমি উহা একবার পড়িয়া দেখিবে কি? ভরসা করি তাহাতে তুমি 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ ও তোমার 'অমিত্রছন্দের মধ্যে তারতম্য কি বুঝিতে পারিবে।

'মীরকাসিম'ও সিরাজদ্দৌলার সমকক্ষ বলিয়া বোধ হইল। তবে মীরকাসিমের প্রস্তাবনা (Plot) অধিকতর জটিল। ভাল, ইঁহারা উভয় যে এরূপ দেবচরিত্রসম্পন্ন ও দেশহিতৈষী Angel and Patriot ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি কিছু থাকে, সে সকল একটা পরিশিষ্টে দিলে ভাল হয়।

উপহারের সঙ্গে তোমার কোন পত্র পাই নাই। ভরসা করি তাহার কারণ—শারীরিক অসুস্থতা নহে। আবার কি কোন নাটকি নেশায় পড়িয়াছ?

তোমার ভ্রান্তি নাটকের ফটোটাও কি ভ্রান্তি? এক একটা ফটো যেন নিতান্ত ভ্রান্তিই বোধ হইল। আপনি মহাপুরুষ বলিয়া মূর্ত্তিটা এক এক সময়ে এক রকম হয়?

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

পুঃ—ফাউনটেন পেনের কল্যাণে লেখাটা আগাগোড়া তোমার ফটোর মত নানামূর্তি ধারণ করিল। ক্ষমা করিও।

॥ ৫ ॥

Rangoon, 11 York Road.
১৯।১১।০৬

ভাই গিরিশ,

তোমার ১৬ই অক্টোবরের পত্র পাইয়াছি। তুমি অসুস্থ শুনিয়া তোমাকে জ্বালাতন করিতে এতদিন উত্তর দি নাই। নিজে ও পুত্রবধূর পীড়া হওয়াতে 'লেডি' ও 'অলেডি' ডাক্তারদের ছোটাছুটিতে বড় বিব্রত ছিলাম। বউ এখন সারিয়াছেন।

তুমি তবে এবার একটা অসাধ্য কর্ম্ম করিয়াছ। তুমি কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলে! শুধু তাই নহে, একেবারে শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলে! সাধে কি গোটা ভারতটায় এত ঘন ঘন ভূমিকম্প হইয়াছে! কেবল জগন্নাথদেবত্রয়ের 'চন্দ্রমুখ' মাত্র যদি দর্শন করিয়া ফিরিয়া থাক, তবে তুমি বড় হতভাগ্য। তুমি পুরীর সমুদ্র শোভা একবার তোমার কবিত্ব ও ভাবভরা হৃদয়ে কি দেখ নাই? আহা! কি দৃশ্য! আমি ৭ মাস সেই সমুদ্র-সৈকতের একটা বাঙ্গালায় ছিলাম এবং দিনরাত্রি সমুদ্রের দিকে আত্মহারা চাহিয়া থাকিতাম।

নির্ম্মল তোমার আশীর্ব্বাদ পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছে। নির্ম্মল তোমার ভক্ত! এখনো সর্ব্বদা তোমার গান গাইয়া থাকে। একবার রাণাঘাটে তোমার একটি গান গাইলে, রবিবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন? গানটী বড় সুন্দর না?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন —"গানটি কার?" আমি বলিলাম "গিরিশের"। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"শুনিয়াছি লোকটা বেশ গান বাঁধিতে পারে।" আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম!

ভায়া! আমার দুজনের প্রাণটা বুঝি চিরদিনই তাজা থাকিবে। আমি তাজা রাখিয়াছি, তুমি কি রাখ নাই। আমি ডেপুটির পালে পড়িয়া নথি ঘাঁটিয়াছি। তুমিও রঙ্গভূমির তরঙ্গে পড়িয়া যে কেবল রঙ্গরসটুকু পাইয়াছ এমন ত বোধ হয় না। একটা দুটা নহে, এতগুলি রঙ্গভূমি সৃষ্টি করা, ও তাহার পরিচালনা করা, এবং তজ্জন্যে এতগুলি নাটক লেখা বড় রসের কার্য্য নহে।

অতএব তুমি "আল্‌সে কুঁড়ে" না হইলে, এই তাম্রকুটসেবী বঙ্গদেশ "আল্‌সে কুঁড়ে" আর কে? এই কৈফিয়ত আমি শুনিব না। আমার প্রস্তাবিত নাটকটি তোমাকে লিখিতে

হইবে। আর ৭ দিনে প্রসব করিতে পারিবে না। উহার জন্যে দীর্ঘ সময় নিয়া, তোমার নাটক মন্দিরের সুদর্শন চূড়া স্বরূপ উহা স্থাপিত করিতে হইবে।

হিমালয় যখন একবার টলিয়াছেন, আর এক-একবারও পারেন। একবার যখন তুমিং কলিকাতার—ধূলি, ধূম্র ও হট্টগোলপূর্ণ কলিকাতার—মায়া কাটাইয়া পুরী যাইতে পারিয়াছ, তখন ইচ্ছা করিলে এই Palm Pagoda"র দেশেও আসিতে পার। ৩ দিন অনন্ত সমুদ্রের নির্ম্মল বাতাস সেবন করিলে ও তাহার অবর্ণনীয় শোভা দেখিলে, তোমার ভাবুকের হৃদয় আনন্দে বিভোর হইবে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ৬ ॥

ফেণী
শিবির, ফেণী-তীর।
৬।৩।৮৯

প্রীতিভাজন,

বড় বিপদের কথা। বাঙ্গালাতে পত্র লিখিতে হইলে, প্রথমতঃ সম্বোধন লইয়া এক মহা সংকটে পড়িতে হয়। একবার ভাবিয়াছিলাম, "প্রিয় ঠাকুরদাস বাবু!" লিখিব। বাঙ্গালা কবিতার ও অর্দ্ধ-সরকারী (demi-official) এবারতের কল্যাণে 'প্রিয়' শব্দটি এমনি অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে না। তাহার পর ভাবিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ, 'নমস্কার নিবেদনঞ্চমেতৎ' লিখিব। কিন্তু আপনি আমার প্রতি একদিনের মাত্র আলাপে যেরূপ সহৃদয়তা ও সমহৃদয়তা দেখাইছেন, এই ভক্তিপূর্ণ পুরাতন 'সরকারী এবারত' আপনার মনোমত হইবে কি না সন্দেহ হইল। তাই পাঁচপোয়াও নহে, সাতপোয়াও নহে, ভিন্দিপাল গোছের এক 'প্রীতিভাজন' আপনার প্রতি নিক্ষেপ করিলাম।

কাল শিবিরে—জানেন, আমরাও ধর্ম্মাবতার। আমাদেরও শিবির আছে, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র আছে। রথের স্বরূপ কাষ্ঠাসনে বসিয়া অর্থী-প্রত্যর্থী স্বরূপ কৌরব-পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ সাধন করি। পুলিশ নাগপাশ, আপিল-আদালত—ব্রহ্মাস্ত্র। উকীল-মোক্তার-- শৃগাল-কুকুর। টুর্ণি মহাশয়েরা—কাক-শকুনি। ... তৃতীয় সংখ্যা মালঞ্চ' পাইলাম পৌরাণিক গন্ধমাদনও কি এরূপ কোনও জিনিষ ছিল? শিবিরে প'হুছিয়া এক নিশ্বাসে শেষ করিলাম। শেষে যথা ব্যবস্থা শেম্পেন-সংযুক্ত "রস" পান করিয়া শরীরের গ্লানি দূর করিলাম। ভরসা করি মালঞ্চ এই ব্যবস্থাটির 'পেটেণ্ট' লইবেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সাহিত্য-রোগের ইহা একটি অমোঘ ঔষধ।

আপনি জানেন লোকের বিজ্ঞতায় আঘাত করিলে বড় প্রাণে লাগে যখন 'মালঞ্চ' বাহির করিবার প্রস্তাব করেন—উঃ নামটি কি অশ্লীল—আমি বিজ্ঞতার সহিত বলিয়া-ছিলাম—

ওরে কেলে সোণা! করি তোরে মানা,
নিদ্রাগত প্যারী, বাঁশি বাজাও না।"

আমাদের সাহিত্য-সিংহদের মুরুব্বিয়ানাতে শ্রীমতী বঙ্গভাষার এখন সুযুপ্তি যুগ উপস্থিত। এখন 'বঙ্গবাসীর' পেশাদারি হিন্দুয়ানীর ও বিডন ষ্ট্রীটের হরি-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে আপনার বাঁশি বাজিতেছে ভাল। একদিকে উপরোক্ত পেশাদারি সাহিত্যের ষড়জ রব, অন্য দিকে 'প্রচার' 'নবজীবনে'র ধর্ম্মান্দোলনের গভীর বৈধতের মধ্যে মালঞ্চের কড়ি-মধ্যম বড়ই মধুর লাগিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপে আমার বিজ্ঞতায় আঘাত করা আপনার ভাল কার্য্য হইতেছে না।

অনেকদিন পরে বিহারী বাবুর কবিতা পড়িলাম। পড়িয়া মোহিত হইলাম। বহু দিন পরে যেন একটি প্রকৃত বাঙ্গালা কবিতা পড়িলাম। শুনিয়াছি, বিহারীবাবু—ঠাকুরবাড়ীর

'কবি-গুরু'। একদিন জনৈক বন্ধু রবিবাবুর কবিতা সম্বন্ধে বলিতেছিলেন যে তাঁহার কবিতা তাঁহার কবিতার দ্বারাই সমালোচনা করা যায়—"গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে!"

"বসন্তের বাতাসটুকু মত,
ও সে ব'য়ে গেল, ক'য়ে গেল না।
ও সে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল না!"

তিনি বলিলেন, রবিবাবুর কবিতাও বসন্তের বাতাসটুকু মত 'বয়ে যায়, ক'কয়ে যায় না; ছুঁয়ে যায়, নুয়ে যায় না।' বলা বাহুল্য, ইহা সমালোচনা নহে— caricature যাহা হউক, বিহারীবাবুর কবিতা ত সেরূপ নহে। উহা বয়েও যায়, কয়েও যায়, ছুঁয়েও যায়, নুয়েও যায়।

'মালঞ্চ' অতি সুন্দর হইয়াছে। 'কংগ্রেস' প্রবন্ধটি পড়িয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। উহা আপনার লেখনীর অযোগ্য। তাহার একটি প্রমাণ—'বঙ্গবাসী' উহা মুরুব্বিয়ানার সহিত উদ্ধৃত করিয়াছিল। ভগবান করুন, এ দুর্দ্দশা যেন মালঞ্চের আর না ঘটে।

আপনার তৃণগুচ্ছের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র তৃণকেও দেখিয়া প্রীত হইলাম। ধন্যবাদ দিব কি? বড় বাসি জিনিস।

আমার পদ্য যেমন, গদ্যও তেমন, হাতের অক্ষর ততোধিক খোসখত। অতএব পত্রখানি পড়িতে পারিবেন কি না সন্দেহ।

প্রীতিপ্রার্থী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ৭ ॥

ফেণী
২৫।৩।৮৯

ভাই ঠাকুরদাস,

তবে আর ভাই, আবরণ রাখিব না।

"তারে পারি না ছাড়িতে, মন কহে ফিরাইতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁও না"

—বড় কবিত্বের কথা বটে, কিন্তু বড় মনোকষ্টের কথাও বটে। এরূপ শিষ্টাচারের আবরণ বড় রাখিতে আমি জানি না, পারি না। এ জীবনে সেই জন্য অনেক দুর্ভোগ ভুগিয়াছি।

তোমার পত্রবাহক আসিল। স্ত্রী দিবা-নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নিজে পাঠ করিতে লাগিলেন। তোমার উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুললিত ভাষা, আর তাঁহার নিদ্রা-ভঙ্গ কণ্ঠ, কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। কিন্তু তোমার মত লোক যদি একটি ক্ষুদ্র মানবকে এরূপ করিয়া বাড়াও, তবে সে কি প্রকারে মাথা স্থির রাখিবে!' একবার হেম বাবুর কথা মনে করিও—

নাচের পুতুল হয় কি মানুষ
তুল্লে উঁচু করে?"

'মালঞ্চে' আমার 'আবাহন' কবিতার উল্লেখ দেখিয়া আমিও মনে করিয়াছিলাম কথাটা কি জিজ্ঞাসা করিব! না করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। ইহার সহিত তোমার যে এরূপ একটি জীবন্ত শোকের স্মৃতি জড়িত ছিল, আমি ভাবি নাই। পড়িতে পড়িতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে অশ্রুপাত করিলাম। দুঃখ তোমার আমার উভয়ের। সংসারের বলিলেও ক্ষতি নাই। এ সংসারে হৃদয়ের সংখ্যা এত অল্প! তোমার পত্রখানি পড়িয়াছি পর্য্যন্ত কি যেন তাহার একটি শোকোদ্দীপক ছায়া আমার হৃদয়ে ভাসিতেছে। আমি যেন কখনও তাহা ভুলিতে পারিব না।

তুমি বলিয়াছ, কংগ্রেসের দোষ দেখাইয়া সমালোচনা শত্রুতা নহে। এলাহাবাদ কংগ্রেসের সময় আমি মদনমোহন মালবীর কাছে অপরিচিত ভাবে গিয়া প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল তাহার দোষের আলোচনা করি। অথচ আসিবার সময় উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের আবেগে যেন উন্মত্ত হইয়া চির-পরিচিতের মত গলাগলি করিয়া আসি। সে অনেক কথা। দোষ-প্রদর্শন এক। বিদ্বেষ আর। আমি তোমার হৃদয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে বিদ্বেষের স্থান হইতে পারে না। আমি বুঝিয়াছিলাম তোমার প্রবন্ধটিতে কেবল রহস্যের ছড়াছড়ি, মূলকথা অল্প। তবে গভীর রহস্য (Humoner) যে অল্প লোকেই বুঝে বঙ্গবাসীর মুরুব্বিয়ানা তাহার প্রমাণ।

কোনো একটি কার্য্যের সমালোচনা করিতে হইলে কার্য্যটিই দেখা উচিত নহে? হয় তো ইহাতে কেহ নামের জন্যে, কেহ স্বার্থের জন্যে, কেহ কেবল গোলে হরিবোল দেওয়ার জন্যে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু যদি কার্য্যটি ভাল হয়, তাহার উদ্দেশ্য ভাল হয়, আমি তাহাতেই যথেষ্ট প্রীত হই। মানুষ অপূর্ণ, তাহার কার্য্যাবলীও অপূর্ণ। অতএব মানুষের সমস্ত কার্য্যে দোষ ত থাকিবারই কথা। মহামতি Cobden বহুবর্ষ Corn law আন্দোলনের পর বলিয়াছিলেন—"We have so long been talking sad rubbis." আমি এই কংগ্রেসের মধ্যে ভগবানের হস্ত দেখি। ইহার আদর্শ সেই রাজসূয় যজ্ঞ। তাহার পর আর এরূপ যজ্ঞ ভারতে সংঘটিত হয় নাই। যেই কৃষ্ণনীতির ফল রাজসূয়, সেই কৃষ্ণনীতি ইংরাজ অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া, আজ তাহার ফল—এই জাতীয় কংগ্রেস।

তুমি রৈবতক-সমালোচনায় না নিজেই এই গভীর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস দিয়াছিলে? যখন ভগবানের রাজসূয়ে বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, তখন এ মানবের রাজসূয়ে ঘটিবে, ইহাতে আর বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে যে দোষ ও অভাব আছে তাহা সহৃদয়তার সহিত ধীর ভাবে, বিনীত ভাবে দেখাইয়া দেওয়া অতি মহৎ কার্য্য। বিনীত ভাবে—কারণ আমার মত কি ভ্রান্ত হইতে পারে না? দেশের এতগুলি উচ্চদরের লোকের মত কি আমার মতের অপেক্ষা অভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নহে? তাহাতে কি আমাদের শ্রদ্ধাবান হওয়া উচিত নহে? দেশের মাননীয় ব্যক্তিগণকে মান্য করিতে জানি না, ইহাই আমাদের বাঙ্গালী জাতির একটী প্রধান কলঙ্ক ও প্রধান দুরদৃষ্ট।

দুইটী ক্ষুদ্র কবিতা পাঠাইলাম। খৃষ্ট জীবনী তোমার হাতে দিতে পারি, যদি মালঞ্চে ছাপিবার সঙ্গে সঙ্গে একখানি Pamphlet ছাপিয়া দেও। অতিরিক্ত ব্যয় আমি দিব। তবে একসঙ্গে পারিব না।

বেড়াইবার সময়ে স্ত্রীর কাছে সকল স্থান হইতে এক এক পত্র লিখিয়াছি। তাহা ছাপিতে দিতে পারি। ডায়ারী ফায়ারী আমার ছিল না, ভাই।

তোমারই
নবীন।

॥ ৮ ॥

ফেণী, ১৮।৪।৮৯

ভাই ঠাকুরদাস,

তোমার বিপদের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমাদের উভয়েরি অদৃষ্ট যেন সমান বোধ হইতেছে। আর কিছু গুণ থাকুক না থাকুক উভয়েরই কপালে আগুন আছে। আমারও দেশস্থ বাসাবাড়ীটি পুড়িয়া গিয়াছে। পরিবারেরা রক্ষা পাইয়াছে—ইহার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

আমার কাছে, বহুদিনের রোগ-শয্যায় অনুবাদিত Mid Summer night's Dream আছে। তুমি যদি চাহ, বরং তাহা পাঠাইয়া দি। ইহা 'মালঞ্চে'র উপযোগী

হইতে পারে। অনুবাদ শেষ হয় নাই। তবে যাহা হইয়াছে, তাহা ছাপিতে ছাপিতে অবশিষ্ট শেষ করিয়া দিতে পারিব। তবে সবটা তোমাকে revise করিতে হইবে। সে সময় কি প্রবৃত্তি আমার নাই। তাহা ছাড়া কেমন একটা রোগ আছে, যাহা লিখি—কাটিতে পারি না।

কংগ্রেস সম্বন্ধে আর মস্তক কণ্ডুয়ণ করিব না। যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রবন্ধটি ফিরাইয়া পাঠাইলাম। এইটি তোমার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তুমি ভাই তোমার কল্পনার সৃষ্টিগুলি যদি সংসারে খোঁজ, তাহা হইলে শুধু পণ্ডশ্রম হইবে। কেহ কখনো ঐ সকল ideal বা আদর্শ সংসারে পাইয়াছে কি না জানি না, আমি পাই নাই। বৃন্দাবনের কি কবিত্বপূর্ণ, ধীর সমীর সমুনাতীর-মধুর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-পূর্ণ, চিত্রই কল্পনার চক্ষে দেখিতাম! আর সেই বৃন্দাবন দেখিলাম রামচন্দ্রের ঐতিহাসিক অনুচরবর্গের রাজ্য! এখন আমার কল্পনায় জয়দেব খুড়োর কবিত্বে বাড়াবাড়ি ছিল বলিয়া সে দোষ বৃন্দাবনের নহে।

আমার বহুমূল্য "উপদেশ" রাশি তুমি যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পার। গালি দেবে না ত? তোমার সমালোচক জাতকে দেখিলে যে ভয় হয়!

ভাল কথা মনে পড়িয়াছে। এবার 'মালঞ্চে' ফুল্লরাকে দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। ফুল্লরা ফুলটি লেখনীর কোমল স্পর্শে কি সুন্দরই ফুটিয়াছে! আমি তোমাকে পূর্ব্বে লিখিব মনে করিয়াছিলাম যে 'মালঞ্চে' সমালোচনাটা যেন নিয়মিত হয়। আমি বোধ হয় এলাহাবাদে তোমাকে বলিয়াছিলাম সমালোচনার অভাবে বাঙ্গালা সাহিত্য হীনপ্রভ হইয়া পড়িতেছে। 'বঙ্গবাসী'র মডেল ভগিনীতে আর বিজ্ঞাপনীতে বাজার গরম। যদি কালে-ভদ্রে একখানি ভাল পুস্তক বাহির হয়, তাহা জানিবার যো নাই; কারণ কে বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করিয়া বহি কিনিবে—ঘোরতর মূর্খ ভিন্ন? অথচ সকল পুস্তক সমালোচনা করিতে গেলে তোমার সময়ের ও সুক্ষমের উভয়েরই শ্রাদ্ধ হইবে। অতএব তুমি যদি ভাল বহিগুলো মাত্র সমালোচনা কর, তাহা হইলেই বাঙ্গালা সাহিত্যেরও বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ উপকার হইবে এবং তাহারা এই বিজ্ঞাপনের জুয়াচুরি হইতে রক্ষা পাইবে; অথচ মন্দ পুস্তককে নিন্দা করিলে যে লেখকের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, তাহা হইতেও রক্ষা পাইবে। তোমার অসাধারণ সমালোচনা-শক্তি আছে বলিয়াই এই কয়টি কথা বিশেষ করিয়া লিখিলাম।

প্রীতি-আকাঙ্ক্ষী—নবীন।

॥ ৯ ॥

প্রীতিভাজন—

আজ ডাকে Mid Summer Night's Dream যত দূর অনুবাদিত আছে, পাঠালাম। নাম 'অপূর্ব্ব স্বপ্ন' কি 'নৈদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন' যাহা ভাল বুঝেন দেবেন। আর প্রত্যেকবার Proof দেখিবার সময় বেশ করিয়া সব সংশোধন করিয়া দিতে হইবে; বড় তাড়াতাড়ি লেখা। যখন চাকরী যায়-যায় হইয়াছে, মাথার উপর ঝড় বজ্র গর্জ্জন করিতেছে—রোগে শয্যাশায়ী—সেই গভীর মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা ভুলিবার জন্যে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া এই অনুবাদ করি। এরূপ একটী সূচনা দিয়া ছাপিতে আরম্ভ করিবেন। আমার নাম দিবেন না। সুকবি-টুকবি যাহা বলিতে হয় বলিবেন।

ভ্রমণের পত্রের কথা বারান্তরে হইবে। চাকরী অসুখের হইয়া উঠিয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। কিন্তু কবি বলিয়াছেন—"অসুখের শেষ চাকরী করা" চাকরী সর্ব্বত্র দুঃখের। অতএব অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কিছু করিয়া ফেলিবেন না।

আর একটি কবিতা পাঠাইলাম। ব্যক্তিগত, যদি উচিত বুঝেন, ছাপিতে পারেন।

প্রীতি-প্রার্থী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ১০॥

ভাই ঠাকুরদাস বাবু—

আজ 'বুকপোষ্টে' আমার 'কুরুক্ষেত্র' পাঠাইলাম। স্নেহের উচ্ছ্বাসে আপনি যে বেগার খাটিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, ভরসা করি হস্তলিপির পরিমাণ ও অসারত্ব দেখিয়া অনুতাপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। যাহা হউক, "মরদ কি বাত হাতি কি দাঁত।" যখন কথা দিয়াছেন, চারা নাই। এ সম্বন্ধে আমার কয়েকটি অনুরোধ আছে।

১। এরূপ কাব্য একচোটে পড়িয়া না গেলে তাহাতে যদি রস কিছু থাকে ও তাহার সম্যক উদ্রেক হয় না। তাহার দোষ-গুণও ভাল বুঝা যায় না। তবে আমার মত জগদ্বি-খ্যাত মহাকবিবরের মহাকাব্য—কেমন 'বঙ্গবাসী'র ধরণের হইল ত?—এক চোটে পড়া একটি ঘোরতর ত্যাগ স্বীকারের কথা, তাহা জানি। তবে যখন স্নেহের দায়ে এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার উদ্‌যাপন করিতে হইবে। এই ক্লেশটুকু স্বীকার করিতে হইবে।

২। বলা বাহুল্য প্রশংসার কিছু থাকিলেও তাহা শুনিবার জন্যে এই ভার গ্রহণ করিতে বলিব কি?—আপনার প্রশংসা শুনিতে চাহিতেছি না। অতএব চোখ হইতে চক্ষুলজ্জার ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া কঠোর সমালোচকের দৃষ্টিতে আপনি কেবল দোষ অনুসন্ধান করিবেন, এবং যেমন পড়িয়া যাইবেন অমনি হস্তলিপিতে পেন্সিলে দোষযুক্ত স্থানে এক-একটি আঁক কি অক্ষর বসাইয়া একখানি স্বতন্ত্র কাগজে নোট করিয়া স্পষ্ট ভাষায় দোষটা দেখাইয়া দিবেন। সমস্ত কাব্যখানি পড়া শেষ হইলে দু-চার কথায় মোটের উপর আপনার কাছে কেমন লাগিল লিখিয়া কাগজখানি হস্তলিপি শুদ্ধ 'বেয়ারিং বুকপোষ্ট' আমার কাছে পাঠাইবেন।

৩। মহাপুরুষ ভূতনাথের আবির্ভাব আপনার কাছে কিছু অসঙ্গত বোধ হইতে পারে। দুর্ব্বাসা এরূপ ঘোরতর ষড়যন্ত্রের মধ্যে এরূপ একটা মূর্খকে রাখিবেন কেন? কিন্তু একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন যে এরূপ মূর্খকে রাখা বরং সঙ্গত। বিশেষতঃ সে অন্য কোনও কথার ধার ধারিত না। কেবল শিব সাজিয়াছিল, তাহাও যে কেন, সে জানিত না। কেবল জানিত যে দুর্ব্বাসা ঋষি বলিয়া ছদ্মনামে নাগবালার বিবাহ করিয়াছে। দুর্ব্বাসা জানিতেন যে এই হস্তী-মূর্খ ভয়ে কখনও একথা প্রকাশ করিবে না।

৪। জরৎকারু ঠাকুরাণীর প্রতি কৃষ্ণের মনের ভাব যে এখনো খুলিয়া বলিবার না; জানি না আপনি কি মনে করেন। এরূপ mystery তে কি একটুকু মিষ্টত্ব, একটুকু গভীরত্ব নাই। বিচক্ষণ সমালোচকের কাছে mystery ও বড় নহে।

৫। শেষের দিকে সর্গগুলো একটুকু বেশী দীর্ঘ হইয়াছে কি? একাদশ সর্গে অভিমন্যুর ভাবী গৃহ বর্ণনাটা একটুকু বেশী হইয়াছে কি? এইটা কমানো যায়, কিন্তু আর সকল সর্গ যে কমাইতে পারিব বোধ হয় না।

৬। পুরাতন তামাদি ধরণে কাব্যের শেষে একরূপ পুরাতন—নবীনভাবে ভণিত্য দুইটা দেওয়া হইয়াছে।—নম্বর A ও B। দুইটার মধ্যে কোন্‌টা আপনার ভাল লাগিল এবং দিব কি না, লিখিবেন।

৭। "কুরুক্ষেত্রে'র আখ্যান-ভাগ 'রৈবতকের' সঙ্গে গাথা। যাহারা 'রৈবতক' পড়ে নাই, তাহাদের পড়িবার জন্যে 'রৈবতকের' আখ্যানটি কুরুক্ষেত্রের মুখপত্রে দেওয়া উচিত কি না লিখিবেন। যদি উচিত বুঝেন তবে আমার নিজের অপূর্ব্ব ভাষায় তাহা না দিয়া আমি আপনার 'রৈবতকের' সমালোচনাটা (উদ্ধৃত অংশবাদ দিয়া) দিতে চাহি। আপনার সেই সৌন্দর্য্য ও সোহাগভরা লীলাময়ী ভাষা আমি কোথায় পাইব? অবশ্য ইহাতে

একটুকু দোকানদারী ভাব থাকিবে। এই বঙ্গবাসী ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাপন-যুগে কিঞ্চিৎ আত্ম-প্রশংসা না হয় করিলামই বা। 'সাহিত্য আপনার কাছে পাঠাইতে বলিয়াছিলাম। তাহাতে—রৈবতকের সমালোচনা পড়িয়াছেন কি? কেমন লাগিল? তাহা হইতেও স্থানে স্থানে আখ্যানভাগ উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারি। তবে লেখককে আমি চিনি না। সম্পাদককেও না। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রবন্ধ চাহিয়া পত্র লেখেন মাত্র। আমি আপনাকে দেখাইয়া দিয়াছিলাম।—যা শত্রু পরে পরে। তবে আজ এ পর্যন্ত। বলা বাহুল্য আপনার মতের জন্যে আমি পথ চাহিয়া থাকিব। যত শীঘ্র পারেন পাঠাইলে বড় আপ্যায়িত ও উপকৃত হইব। কাব্যখানির প্রাপ্তি সংবাদ একখানি কার্ডে লিখিবেন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

পুঃ—আর একটি কথা না বলিলে কাব্যের আরম্ভভাগ বুঝিতে সম্যক পারিবেন না। 'নীরেন্দ্র' আমার প্রথম শিশুটির নাম ছিল। তাহাকে দশমাস বয়সে পদ্মাতীরে রাখিয়া আসিয়াছি। এখন একটি ১২ বৎসরের পুত্রই আমার একমাত্র সন্তান। তাহার নাম 'নির্ম্মল। রৈবতকের আরম্ভে স্ত্রীর নাম আছে। মানুষের মন কি অচিন্ত্য পদার্থ!

॥ ১১ ॥

ফেণী, ২০।৩।৯১

ভাই ঠাকুরদাস বাবু,

'কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে আর গোটা দুই কথা লিখিতে ভুলিয়াছিলাম।

১। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দ্বাদশ দিবসের অপরাহ্ণ হইতে 'কুরুক্ষেত্র' আরম্ভ হইয়া পরদিন সন্ধ্যার সময় ষোড়শ সর্গ শেষ হইয়াছে—অল্পাধিক এক অষ্ট প্রহর দিনের ঘটনামাত্র লইয়া এই কাব্যখানি। কেবল সপ্তদশ সর্গটি যুদ্ধের পরদিবস রাত্রির শেষ ভাগে আরম্ভ করিয়া প্রভাতে শেষ করিতে হইয়াছে।

২। সমুদায় শবদাহ একদিবসে হইয়াছিল যেন, মহাভারত পড়িয়া এরূপ বোধ হয়। তাহাতেই এ সর্গটি সরাইয়া পিছাইয়া নিতে হইয়াছে। কিন্তু ১৮ দিন পর্য্যন্ত মহারথীদের শব এ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া পচিতেছিল ও কুকুর শৃগালের আহার্য্য হইয়াছিল—কথাটা কেমন বড় অসংগত বোধ হয় না কি? কিন্তু এ সর্গটি আগাইয়া আনিবারও যো নাই। তাহা হইলে 'মহাভারত' স্থাপন করিয়া কাব্যখানি শেষ করা যায় না।

৩। শেষ তিন সর্গ যখনই পড়িতে বসিবেন, তখনই সময় হাতে রাখিয়া পড়িবেন, যাহাতে এক নিশ্বাসে শেষ করিতে পারেন। এটি আমার বিশেষ অনুরোধ। তাহা হইলে আমি যে উচ্ছ্বাসে আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এ তিন সর্গ লিখিয়াছি, তাহার কথঞ্চিৎ আপনার হৃদয়ে উদ্রেক হইবার সম্ভব। তবে যে হৃদয়ের আবেগে আমি নির্জ্জন শিবিরে অধীর হইয়া কাঁদিয়াছিলাম,, তাহার ভাষা আমার সাধ্যায়ত্ব নহে।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

॥ ১২ ॥

ফেণী, ১০।২।৯২

ভাই ঠাকুরদাস বাবু,

অনেক দিন পত্র পাই নাই। কিছু দিন হইল আপনার কাছে লিখিয়াছিলাম যে আমি একটী বৃহৎ ব্যাপারে হাত দিয়াছি। ভগবানের ইচ্ছায় ব্যাপারটি একপ্রকার শেষ হইয়াছে। আপনি জ্বালাতন ভোগ করিতে যে আগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অবসর হইবে কি? নূতন কাব্যখানিকে রৈবতকে'র দ্বিতীয় বা উত্তর ভাগ বলিলেও চলে।

আপনি 'রৈবতকে'র প্রথম ও প্রধান সমালোচক। অতএব ক্লেশ স্বীকার করিয়া যদি প্রেসে যাইবার পূর্ব্বে কাব্যখানি আপনি একবার দেখিয়া দিতে পারেন, বড় অনুগৃহীত হইব। আমি যেরূপ নিৰ্জ্জন প্রদেশে নিঃসহায় অবস্থায় এই দুরাশার কার্য্য করি, একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব এমন একটি লোক পাই না। কাব্যখানি দেখিবার জন্যে পাঠাইতে পারি—আপনি ভিন্ন এমন বন্ধুও আর দেখি না।

ভরসা করি ভাল আছেন। 'মালঞ্চ' বুঝি নিতান্ত গা ঢাকা দিলেন। আমার নৈদাঘ নিশীথ স্বপনের কি হইল? ফেরত পাওয়া যাইবে কি?

প্রীতিপ্রার্থী—
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

॥ ১৩ ॥

Lahore
The 25th November.

My Dear Sir,

I am now on a trip to the N.W. and got your letter at Lahore. I cannot sufficiently thank you for it, and the three pamphlets, you have so kindly sent me. The one, that bears your name, is sufficiently worthy of your pen. But with due respect to brother Okhoy Baboo's opinion—I call him dada—I still think that it ought to have come out as a magazine article. In its present stage, I doubt if it will receive the attention, which it deserves. As for your juvenile efforts, I found some of them really entertaining. Poets in all countries have been more or less credited with prophecy. You have done me the honour of calling me by the former name. I will therefore, repay the compliment with a prophecy. I predict a glorious literary future for you, only if you would develop and *conserve* your rising powers. It was no compliment, your critique on "Raibatak" would have done credit to any of our literary lions. I am not at all surprised to hear that it proved distasteful to some of them, for some of them have done and are doing still—may their shadow never grow less—their utmost, to destroy me, and if I still live, it is no fault of theirs. In the present instance, I think, the sting of the offence lay not a little on the very superior abilitv displayed in the review—so different from paragraphs laid on paragraphs of fulsome and loathsome adulation.

Thanking, you again for your kind expressions, which I only wish I could deserve, and looking forwords with pleasurable expectation for making your personal acquaintance. I remain, in a hurry

Yours very sincerely
Nobin Ch. Sen.

॥ ১৪ ॥

My Dear Thakurdas Bhaya,—

I am indeed sorry to hear that you have left your late service and turned on a new leaf since. On which paper staff are you serving now and what are pour prospects? Are you quite happy here? If not, can I do anything for you.

I have read that great book, "অমিয়-নিমাই চরিত" of Shishir K. Ghose, editor of Amrita B. Patrika, which I wish you to review in your best form in নব্যভারত বা সাহিত্য The review should be done with a heart-full of love and admiration for its distinguished author, and still more for the *truly divine subject* of the book. It should be such as to melt even stones. I am writing to *Moti Dada* (Babu Motilal Ghose) to send you a copy of the book. I think a far better arrangement would be for you to see him personally with this letter. It will introduce you to them as a brother of mine, and will enable you to know many things which will be of much use in writing out the review. Further if you are in difficulties now, confide them to their noble hearts—you will not find truer and warmer in the world, and I am sure they will give you a helping hand. I need only say, Shishir Babu,—I call him Shejda, is my ideal. See him once at any cost, and you will return a changed man, with a heart full of love. May wish me to publish the review over my signature. If written by you, I shall have no objection to sign it, but I am sure, your own name will be as good a recommendation for the book.

I would have written the same myself, though it is not in my line, and with an unpleasant transfer hanging over my head I am ill at ease. If it falls, I shall have to take leave of all literary work for 3 years.

Yours offectionately,
Nobin Ch. Sen.

॥ ১৫ ॥

ভাই ঠাকুরদাস বাবু,

আপনার মত লোক একটি 'বাঙ্গাল'কে এত বাড়াইতে গেলে, তাহার মাথা ঠিক্ থাকিবে কেন? যাঁহার রৈবতকের সমালোচনা পড়িয়া আমি অক্ষয় বাবুর লেখা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম—যাঁহার বাঙ্গালা ভাষার উপর, ভাবের উপর অধিকার আমি কাহারও অপেক্ষা ন্যূন মনে করি না, তাঁহার মুখের প্রশংসায় স্থির থাকিতে পারিব কেন? তাহার উপর আবার এতাদৃশ আত্ম-ক্ষুদ্রতার কথা পাড়িলে আমার বড় হাসি পায়। যাহা হউক, নূতন কাব্য আমি বোধ করি আর ১০/১৫ দিনের মধ্যে পাঠাইতে পারিব।

শ্রীমান কেদার নাথ রায়কে আমি চিনি। তাঁহার সমালোচনা আমি পড়িয়াছি। কারণ আমি National Magazine এর একজন গ্রাহক। তাহাতে আপনি এত চটিয়া বড় অরসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। আর বাস্তবিক কুমারী কামিণীর বইখানি বেশ। এমন 'সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতু' যে বেথুন স্কুলের শিক্ষকতায় এই অতুল শ্রীসম্পন্না প্রতিভা ক্ষয় করিতেছেন, তাহা ভাবিলে দুঃখ হয়। তিনি এবং ... রায় একদিন আমার খুব গোঁড়া ছিলেন। তখন তিনি বাঁকিপুরে মুন্সেফ ছিলেন, আমি বেহারে ছিলাম। আমাকে মহা অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ খাওয়াইয়াছিলেন। এখন যদি গালি দেন, তাহা আমি সৃষ্টির প্রকৃত চেলার মত গ্রহণ করিতে পারি। ...

আপনার মত আরো বন্ধু Indian Mirror রে প্রতিবাদ পাঠাইয়াছিলেন শুনিয়াছি। কিন্তু শ্রীমান্ কেদারনাথ রায় S. C. S. (এখন P. C. S.) এখন শেয়ালদহের "জাইণ্ট বাবু"। Mirror কেমন করিয়া এরূপ প্রতিবাদ ছাপিবেন? আপনারাও যে কেন এ ungallant কাযটা করিতে গিয়াছিলেন বুঝি না। 'আর্য্য-দর্শন' একদিন আমাকে বাঙ্গালার 'হোমার' বলিয়া—হায়! এ বয়সে কত কি হইলাম—যখন নির্জ্জলা গালি দিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কেহ কেহ প্রতিবাদ করিতে অনুমতি চাহিলেন। আমি লিখিলাম এরূপ গালির একমাত্র প্রতিবাদ আছে...। যদি তাহা কেহ পার, কর, না হয় চুপ করিয়া থাক।

Pioneer কি বলিয়াছেন দেখি নাই ... জানিতাম না যে এই বিবাহ-বিভ্রাট সম্বন্ধে শত্রু, মিত্র, মধ্যস্থ সকলেই আমার পত্র আংশিক উদ্ধৃত করিয়াছে। কিন্তু বলি কি, এই অপোগণ্ড বিল্‌টা পাশ হইলে পৃথিবীটা থাকিবে ত? বাঙ্গলা proper টা থাকিবে বলিয়া ত বোধ হয় না। যদি আইনটাকে reprospective effect দেওয়া হয়, ব্রাহ্মণী কিছু গোল বাধাইবেন না ত? আমি আগে ধরা পড়িব। একবার হরি হরি বল!

স্নেহাকাঙ্ক্ষী—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

॥ ১৬ ॥

পুরী—সমুদ্রতীর।

প্রিয় ঈশান,

বঙ্গদেশে গ্রন্থকারের অভাব থাকুক আর না থাকুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমালোচকের অভাব নাই। বঙ্গদর্শনের ভূতপূর্ব্ব ক্ষণজন্মা সম্পাদক হইতে ঐ "আড্ডা বিহারিণী পত্রিকা"র সম্পাদক পর্য্যন্ত সকলেই সমালোচক। অতএব তুমি যদি তোমার কবিতাগুলি প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে প্রকাশের পূর্ব্বে আমার কি অন্য কাহারো মত জানিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ তোমার কবিতাগুলিতে "যুক্তাক্ষর ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইত্যাদি অক্ষরের অধিক প্রণয়" আছে কি না আমার স্মরণ নাই। সে দিন মাত্র একজন সমালোচক অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে "সুকবিজনোচিত রচনাতে এরূপ প্রণয় অমার্জ্জনীয়।" এমত অবস্থায় তোমার কবিতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া কেন আমি তীব্র কটাক্ষভাজন হইতে যাইব?

তবে একটী কথা বোধ হয় বলিতে পারি। তোমার যে সকল কবিতা আমি তোমার মুখে শুনিয়াছি—যুক্তাক্ষর থাকিলেও তাহাদের কবিত্বে এবং লালিত্যে আমি মোহিত হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইয়াছিল যেন কবিতা স্রোতের ন্যায় বহিয়া গিয়াছে, কোন স্থানে কষ্ট-কল্পনার ছিহ্ন নাই, বরং স্মরণ হয়, স্থানে স্থানে কবিত্ব-শক্তির সুন্দর বিকাশ দেখিয়াছিলাম। বড় সুখের হইতে যদি তোমার সুললিত আবৃত্তি-শক্তি এ কবিতার সঙ্গে প্রকশ করিতে পারিতে।

তোমার বন্ধুতাভিলাষী

নবীন।

॥ ১৭ ॥

ভাই,

উচ্ছ্বাসের এই কবিতাগুলি পড়িয়া আমার প্রথম বোধ হইয়াছিল, কোনও নব্য-তন্ত্রের শ্রেষ্ঠ কবির লেখা। যখন দেখিলাম যে, আধুনিক কবিতার লালিত্যও মাধুর্য্যের সঙ্গে ভাবজটিলতা নাই, কোনও স্থানে অর্থ করিতে গলদঘর্ম্ম হইতে হয় না, তখন বুঝিলাম যে, বাঙ্গালার দুই সম্প্রদায় লেখকের গুণভাগ লইয়া লেখক এক নূতনতর পথ অবলম্বন করিয়াছেন। তার পর যখন তোমার মুখে শুনিলাম, লেখক একজন অল্পবয়স্ক যুবক, এবং তিনি একজন ধনীর সন্তান, তখন আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণিত হইল। আনন্দের দুইটি কারণ;—তিনি এ বয়সে এমন সুন্দর, সুললিত ও ভাবপূর্ণ কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেন, এবং আমাদের দেশের কমলার বরপুত্রগণ অকিঞ্চিৎকর আমোদ-প্রমোদে জীবন ক্ষয় না করিয়া জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এই নবীন লেখক দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গসাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করুন, ও আপনি যশস্বী হউন।

রাণাঘাট। স্নেহাকাঙ্ক্ষী

৮ই শ্রাবণ, ১৩০১। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ১৮ ॥

চট্টগ্রামের পৌরাণিক নাম "চট্টল"। শৈলকিরিটিণী সাগরকুন্তলা সরিৎমালিনী চট্টল-মাতার নৈসর্গিক শোভা অতুলনীয় এজন্য সৌন্দর্য্যগ্রাহী বৌদ্ধেরা জননীর নাম "রম্যভূমি" রাখিয়াছেন। আবার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও চমৎকারিত্বে চন্দ্রশেখর ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ অগ্নিপূর্ণ পবিত্র বাড়ব ও লবণাক্ষ প্রস্রবণের এবং মনোহর জলপ্রপাত সহস্র ধারার তুলনা চট্টগ্রামে নাই। ভারতের সমস্ত তীর্থ-দর্শন করিয়া যিনি একবার চন্দ্রশেখরের অভ্রভেদী সানুদেশ 'চন্দ্রনাথের শ্রীমন্দিরে'র ছায়াতে বসিয়া সম্মুখস্থ অনন্ত বারিধির নীল চঞ্চল শোভা, উভয় পার্শ্বস্থ অনন্ত গিরিমালার স্থির শ্যাম তরঙ্গায়িত শোভা, এবং পশ্চাতে অনন্ত বিস্তৃত শস্যশ্যামলা প্রান্তরে নদ-নদীর বঙ্কিম গতির ব্যবচ্ছেদে পাদপসমাচ্ছন্ন অসংখ্য গ্রামাবলীর শোভা সন্দর্শন করিবেন ; যিনি বাড়ব ও লবণাক্ষ কূলে শীতল সলিলের সহিত তীব্র বৈশ্বানরের ক্রীড়া দেখিবেন, সর্ব্বশেষে নির্জ্জন উপত্যকায় গিরিপার্শ্ববাহী সহস্রধারার জলপ্রপাত ও কুমারীকুন্ড দেখিবেন, তাঁহাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীভগবানের বিচিত্র লীলা ও মহিমাব্যঞ্জক এমন তীর্থ আর কোথায়ও নাই।

আমি উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ দর্শন করিয়াছি, এমন তীর্থ আর কোথাও দেখি নাই। যাহা দর্শন করিলে দর্শকের পাষাণ হৃদয়ও এরূপে শ্রীভগবানের মহিমায় স্তম্ভিত, ভক্তিতে আপ্লুত এবং প্রেমে পবিত্র হয়। কিন্তু এ পবিত্র তীর্থাবলির আজ কি শোচনীয় অবস্থা! "ভানুমতী" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসে উহার এরূপ একটি ক্ষুদ্র চিত্র আছে।

"মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি। এই আদিনাথ, আর ওই সুদূরে মেঘের পরে চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথায়ও এক স্থানে এত তীর্থ নাই। কিন্তু এই পবিত্র তীর্থসকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে। যে আসনে এ জনপদ 'গোমতীবন ও রত্নবনের মত মহাযোগী বসিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কি মহন্তই বা বসিয়াছে! ইহারা ত মোহন্ত নহে—মোহান্ধ! 'গোমতীবন ও রত্নবনের বাৎসরিক ব্যক্তিগত ব্যয় ছিল ৪০৲ টাকা তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসী সেবায় ব্যয়িত হইত। তাঁহারা স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির সমীপবর্ত্তী আস্তানে কৌপিন মাত্র পরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত কলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশি অতিবাহিত করিতেন।

যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেবসেবার্থ যথাই)। "প্রণামী" প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। চন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব্ব মোহন্ত ("কিশোবন) যৌবন প্রারম্ভে সে আস্তানে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির সমক্ষে বা বক্ষের উপরে বলিলেও চলে এক দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, এবং বিদেশীয় উপকরণে সজ্জিত করিয়া, সন্ন্যাস আরম্ভ করেন! তাহার পর সে অট্টালিকা ও গিরিশেখরস্থ আস্তান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া এখন বহুদূরে সমতলক্ষেত্রে এক নূতন আস্তান এবং আর এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই সন্ন্যাসে পূর্ণাহুতি প্রদান করিতেছেন। ইহার চরিত্র-কাহিনী ধর্ম্মাধিকরণে পর্য্যন্ত বারম্বার কীর্ত্তিত হইয়াছে। উহা আমার অকথ্য। বাড়বের মোহন্ত সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে বিবাহ করিয়া শুনিতেছি, দেববিত্তের দ্বারা স্ত্রীপুত্রাদির নামে সম্পত্তি সঞ্চয় কিরিতেছে।

যাত্রিগণ এ মোহন্তদের প্রণাম করিয়া "প্রণামী" দেওয়া থাকুক, তাহাদের কোনরূপ সংস্রবে পর্য্যন্ত আসিতে চাহে না। কাজেই তীর্থধাম "রেলওয়ে" পরিণত হইয়াছিল। মোহন্তেরা টিকিট কাটিয়া, তীর্থধামের সমক্ষে ঘেরা দিয়া, প্রহরী রাখিয়া বলপূর্ব্বক প্রণামীর স্থলে এতকাল "কর" বা টেক্স আদায় করিতেছিল। মহামাণ্য হাইকোর্ট সেই ঘোরতর উৎপীড়ন হইতে আপাততঃ যাত্রীগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় মোহন্তদের আত্মসেবায় নিঃশেষ হইতেছে। দেব এবং অতিথি, সন্ন্যাসীর সেবা নাম মাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরও সোপাণাবলী পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এভাবে আর কিছুদিন চলিলে এদেশের তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে।

সাতটি ব্রাহ্মণ পরিবার এই তীর্থের সেবায়েত অধিকারী পাণ্ডা বলিয়া পরিচিত, এবং পুরুষানুক্রমে এ সকল দেবতার সেবা পূজা করিয়া আসিতেছেন। এই ব্রাহ্মণগণের স্বত্বাপহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মোহন্ত কিশোরীবন দেববিত্ত অপব্যয়ে প্রিভি-কাউন্সিল পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল মোকর্দ্দমা করিয়া নিষ্ফলকাম হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের একমাত্র মহাব্রত। তীর্থধ্বংস হইলে মোহন্তদের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই। তাহারা যে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের স্বেচ্ছাচার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিবে। কিন্তু তীর্থ রক্ষার উপায় কি? হিন্দুর পবিত্র তীর্থ সকল কি কর্ত্তব্য-জ্ঞানহীন মোহন্তের চিরলীলাস্থল হইবে? অতএব যাহাতে চন্দ্রনাথ তীর্থাদির মাহাত্ম্যেরও শোচনীয় অবস্থার প্রতি হিন্দুদিগের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই "চন্দ্রনাথ-মাহাত্ম্য" প্রকাশিত হইল। আশার কথা এই যে, ইতিমধ্যেই এই তীর্থের দুরবস্থার প্রতি হিন্দুসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আশা করি, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসাধারণের অনুগ্রহে এই তীর্থক্ষেত্র রক্ষা পাইবে।

নবীনচন্দ্র সেন।
কুমিল্লা ২৩।১।০২

॥ ১৯ ॥

স্নেহের হরকিশোর!

কাল দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া সংবাদ দিয়াছেন যে, শরৎ আসন্ন শয্যায় শায়িত। শুনিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। কয়েকবার তোমাকে টেলিগ্রাম করিতে গেলাম, লেখনী চলিল না, কাল দিনরাত্র কিভাবে কাটাইয়াছি বলিতে পারি না। আজ প্রাতে তোমার পত্র দেখিয়াই বুঝিলাম যে আমার সহোদরপ্রতিম শরৎ নাই। আর সেই সৌম্য, শান্ত, সুন্দর মূর্ত্তি দেখিব না। এই কার্য্যজীবন উদ্‌যাপন সময়ে আমি দেশে একমাত্র শরতের দিকেই চাহিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, তাহার দ্বারা শ্রীভগবানের আরও দুটী কাজ করাইব।

কিন্তু শরৎ যাহা করিয়াছে, তাহাতে শ্রীভগবান তাহার কর্ম্মফল ছায়া মোচন করিয়া তাঁহাকে এই কঠোর পাপ-পূর্ণ জগৎ হইতে তাহার পুণ্যলোকে লইয়া গিয়াছেন। অতএব তোমার আমার দুঃখ নাই, শরৎ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ অল্প সময়ে শরৎ সীতাকুণ্ড তীর্থের অঙ্কে অঙ্কে তাহার নাম অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। শরৎ চলিয়া গিয়াছে, সীতাকুণ্ডে তাহার তীর্থবন্ধু নাম রাখিয়া গিয়াছে, তুমি শোকে অধীর হইও না। শরমেত শ্মশানভস্ম তোমার ললাটে মাখিয়া তোমার জন্য সে যে উচ্চ আদর্শের পিতৃত্ব, পুত্রত্ব ও তীর্থরক্ষা ব্রত রাখিয়া গিয়াছে, তাহা গ্রহণ কর। তুমি তাহার অনাথ শিশুদিগকে কখনও পিতার অভাব, বৃদ্ধ পিতামাতাকে কখনও জ্যেষ্ঠপুত্রের অভাব এবং সীতাকুণ্ড তীর্থকে কখনও রক্ষকের এবং হিতৈষীর অভাব অনুভব করিতে দিবে না। শরৎ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তোমাকে শক্তি দিবে, সাহায্য দিবে, তোমার মস্তকে মহাশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবে।

শোকাকুল হৃদয়

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ২০ ॥

সপ্রমাণ নিবেদন—

অফিসে আসিবার সময়ে আপনার পত্রখানি পাইয়া বড় প্রীতিলাভ করিলাম। যাহাতে আপনার মাতৃ-ভূমির সর্ব্বপ্রধান গৌরব এই তীর্থগুলির রক্ষা হয়, তাহার চেষ্টা করা আমার জীবনব্রত। এই দশ বৎসর যাবৎ আমি ফেণি থাকিবার সময় হইতে কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু দেশের একটী লোকও সহায় পাইলাম না; বরং কেহ কেহ প্রতিকুলতা করিলেন। আমার দাদা অখিল বাবু সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সীতাকুণ্ডে গিয়া আপনাদের খাসি খাওয়াইয়া কিশোর বনের সঙ্গে ভ্রাতা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসিলেন। আমি যে কলিকাতায় আসিয়াছি তীর্থ সংরক্ষণও আমার এক উদ্দেশ্য। কাউনসিলে ও ইংরাজী যে আন্দোলন হইতেছে, আহা আমারই চেষ্টার ফল। এখন স্থির করিয়াছি যে আগামী শীতের সময় গভর্ণর জেনেরল কি লেঃ গভর্ণর কাউনসিলে নূতন একটা আইন উপস্থিত করিব। গত সংখ্যক "বেঙ্গলীতে" এ সম্বন্ধে প্রস্তাব আমার লেখা আগামী সংখ্যাতেও আমার লেখা আইনের পাণ্ডুলিপি থাকিবে। পড়িয়া আপনাদের মত লিখিবেন।

আমি আপনারা অধিকারীদের বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে ফুল বিল্বপত্রের জন্য মকদ্দমা না করিয়া আপনারা পাপিষ্ঠ নরাধমগুলিকে পদচ্যুত করিবার মকদ্দমা করুন। কিন্তু আপনারা তাহা না করিয়া নিষ্ফল মকদ্দমায় অর্থ ও জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। এখনও যদি মোহন্তেরা টিকেট কাটিয়া কর লয় আপনারা হাইকোর্টের রায় হস্তে করিয়া এবার কোনও যাত্রীকের দ্বারা ফৌজদারীতে ৩৪১ ও ৩৮৪ ধারা মতে নালিশ উপস্থিত করান, তদ্ভিন্ন কিশোরী বন পাকাবাড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রায় ৪০,০০০ টাকা দেবসম্পত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে বলিয়া ৪০৬।৪০৮ ধারামতে আপনারা কেহ নিজে বাদী হইয়া তাহার নামে ও নিজ পক্ষে জমিদারী কিনিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে বলিয়া এবং বাড়বের পাপিষ্ঠের নামে ফৌদারীতে আর দুইটী স্বতন্ত্র মকদ্দমা উপস্থিত করুন। ইহাতে আপনাদের বিশেষ অর্থব্যয় হইবে না। তাহাতেও আমি সাহায্য করিতে ইচ্ছুক। এরূপ তিনটী মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আমাদের নূতন আইনের প্রস্তাব বেশ জোর পাইবে।

তীর্থ না থাকিলে আপনাদের ফুল বিল্বপত্রের স্বার্থে কি হইবে? ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যাহাতে তীর্থ রক্ষা দ্বারা আপনাদের সকলের প্রধান স্বার্থ সাধিত হয়, তাহার চেষ্টা করুন। গোপনে পরামর্শ করিয়া আমাকে সকল বিষয়ের উত্তর লিখিবেন:

আপনার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই পত্রের কথা প্রকাশ করিবেন না। শ্রীমান শরচ্চন্দ্র অধিকারী এখন কোথায়?

আশীর্ব্বাদক
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন:

॥ ২১ ॥

স্নেহের হরকিশোর,

তোমার প্রেরিত "বেল" পাইলাম। তুমি একবার আমার সংগে শীঘ্র দেখা করিও। আমার দিন ফুরাইয়াছে। সীতাকুণ্ড তীর্থ সম্বন্ধে তোমাকে শেষ কয়েকটি কথা বলিব। আশা করি আমার অসম্পূর্ণ শেষ আশা তোমার দ্বারা পূর্ণ হইবে। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ও আশা আমার অপূর্ণ রহিল। বেশী কিছু লিখিতে পারিলাম না, শক্তি নাই— শেষ দেখা দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।
নয়াপাড়া।

॥ ২২ ॥

শ্রদ্ধাস্পদ দাদা মহাশয়,

আপনার ৮ই বৈশাখের পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। 'বান্ধবের' ২য় সংখ্যা পড়িয়াও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। প্রথম বঙ্গদর্শন ও বান্ধব বঙ্গসাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের কি প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছিলে, বোধ হয়, আপনি জানেন। এখন সেরূপ সমালোচনা কোনও মাসিক কি সাপ্তাহিক পত্রে থাকে না। যাহা থাকে তাহার উপর পাঠক সম্প্রদায় বিশ্বাস হারাইয়াছে। ইহার ফলে আবার অপকৃষ্ট সাহিত্যে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। এখন একখানি ভাল বই বাহির হইলে কিনিতে পারি না, কারণ জানিবার উপায় নাই। ইহাতে বঙ্গ-সাহিত্যের যে কি ক্ষতি হইতেছে তাহাও আপনি জানেন। অতএব যখন আপনার মত একজন মহারথী বঙ্গসাহিত্যের আবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তখন ভরসা করি এ ঘোরতর অভাব দূর হইবে। সেদিন অক্ষয় দাদার কি একখানি কাগজে সমালোচনা পড়িয়া বড়ই হাসি পাইল। অক্ষয় দাদাও যদি এ পথের পথিক হন, তবে বঙ্গসাহিত্য আজ কাহার দিকে চাহিবে? বঙ্গসাহিত্যে আপনার স্থান বড় উচ্চে. আপনার কথার মূল্য বড় অধিক। অতএব আপনার 'বান্ধবের' উপর motto লিখিবেন—"খাতির ন দারত্।" তবে সত্য কথা প্রিয় ভাষায়ও বলা যায়। "বঙ্গদর্শন" অপ্রিয় ভাষায় বলিতেন বলিয়া তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল। তবে তাহাতে বড় কায হইয়াছিল। আপনাকে বড় শ্রদ্ধা করি। তাই এই কথাগুলিন ও গুরুতর অভাব সম্বন্ধে Confidentially লিখিলাম না। * *

আপনার আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিলাম। অবতরণীকায়* আমার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহার যোগ্য নহি। এখানে একটি কথা মনে পড়িতেছে। রৈবতক. কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের plot পড়িয়া বঙ্কিম বাবু ও প্রফুল্ল উভয়ে আমাকে কাব্য লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কেবল একমাত্র আপনি লিখিয়া ছিলেন— "Conception grand. Execution ও সেরূপ grand হইলে উহা কেবল বঙ্গসাহিত্যে নহে, জগতের সাহিত্যেও একটী অতুলনীয় কাব্য হইবে।"* আপনি এ গরিব ভ্রাতার এ

তিনখানি বহি পড়িয়াছেন কি? যদি পড়িয়া থাকেন তবে এখন Execution সম্বন্ধে আপনার মত কি তাহা জানিতে পারি কি? রাজকার্য্য ছাড়িয়া এখন সাহিত্য কার্য্যে আবার মন দিয়াছেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ বহি তিনখানির ২০০০ করিয়া Edition দুই . Edition বিক্রিও হইয়া গিয়াছে। তথাপি. আপনার মত জানিতে ইচ্ছা করে। কেন? শুধু প্রশংসা শুনিবার জন্য নহে। ভাবি সংস্করণে ইহাদের কিছু উন্নতি করিতে পারি কি না, তাহা জানিবার জন্যে। "পলাশির যুদ্ধের" এরূপ উন্নতি আপনার সমালোচনায় পর যে করিয়াছিলাম তাহা বোধ হয় জানেন। * *

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ২৩ ॥

শ্রদ্ধাস্পদ দাদা মহাশয়,

আমি রাজকার্য্য হইতে চির-অবসর গ্রহণ করিয়া এখন একজন দরিদ্র পল্লিবাসী সামান্য ভদ্রলোক। কেন এ পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন। শুনিলাম আপনিও জয়দেবপুর রাজ্যের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য দার্শনিক। ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন কি?

পল্লিগ্রামস্থ বাটিতে 'বান্ধব' পাইয়াছি। পল্লিগ্রামের শান্তি ছায়ায় বসিয়া উহা পাঠ করিয়া প্রাণে কি যে শান্তি পাইয়াছি বলিতে পারি না। বাঙ্গালার 'মাসিক' শ্রাদ্ধ হাড় জ্বালাতন হইয়াছে। এতকাল পরে যেন বাঙ্গালা পড়িলাম, যাহা পড়িবার যোগ্য, পড়িয়া চিন্তা করিবার যোগ্য তাহা পড়িলাম। আপনার লেখার পূর্ব্ববৎ সেই ওজস্বীতা আছে। এখন যেন অপেক্ষাকৃত সরল ও মধুর হইয়াছে। "আবার এ কাণ্ড কেন"— তাহা আমাকে চক্ষে দেখিয়া বুঝাইবার পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ বুঝিয়াছি।

একবার না জানিয়া উভয় একসঙ্গে 'ক্লিওপেট্রা' লিখিয়াছিলাম। আপনি গদ্যে, আপনি পদ্যে। আবার দেখিতেছি দুজনে একপথের পথিক। আপনি শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমিও ১৷৷ বৎসর যাবত আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তাঁহার ধ্যানা করিতেছি। তবে হৃদয়ে এত অশান্তি, মাথার উপর এত বিপদ, যে এতকালেও ত সর্গের অধিক লিখিতে পারি নাই। এখন মনে করিতেছি পূজনীয় সেজদা (শিশির বাবু) নাই। যখন লিখিয়াছেন, আপনি যখন লিখিতেছেন তখন আমার আর লিখিবার কিছু প্রয়োজন নাই। কেবল 'অমিতাভ' শেষ করিবার সময়ে শ্রীভগবানের এই শেষ লীলাও লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া পত্র লিখিতেছেন, তাই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। তবে আমি শিশির বাবু হইতে ভিন্ন পথের পথিক। কিন্তু অনুমানে বোধ হইতেছে যে, আপনি ও আমি একই পথাবলম্বী। তবে আপনার সেই পাণ্ডিত্য ও উচ্চ মনস্বীতা আমি কোথায় পাইব? তবে আপনি যে পথ কাটিয়া যাইবেন আমি সেই পথে আমার ক্ষুদ্র স্রোত চালাইতে পারি কি না দেখিব।

খণ্ড কবিতা লিখিতে এখন শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। মন ও শরীরের এরূপ অবস্থা যে এখন কবিতা আমার পঞ্চক্রোশের মধ্যেও পদার্পণ করিতে পারেন না। রোগের কথা আর কি লিখিব? ঘোরতর চক্রীর চক্রে পড়িয়া ময়মনসিংহ বদলি হই, এবং সেখানে একখানি কুঁড়ে ঘরে জলাভূমিতে দারুণ শীত কাটাইয়া যে রোগ লইয়া বাড়ী আসি, এখন যাবত তাহা ভুগিতেছি। ইহার আর আরোগ্য নাই।

তাহার ওকালতী কেমন চলিতেছে?

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

॥ ২৪ ॥

চট্টগ্রাম
৩১।১।৯৭

আপনার আশীর্ব্বাদ লইয়া শুক্রবার রাত্রিতে কলিকাতা ছাড়ি এবং রবিবার প্রাতে আমার পার্বতী মাতার অংকে ২০ বৎসর নির্বাসনের পর উপস্থিত হই। বহুতর লোক আমার অভ্যর্থনার জন্যে রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং পুষ্পগুচ্ছ পুষ্পমালা ও কবিতার দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করেন। সে অবধি কি গৃহে, কি অফিসে এত দর্শকের ভিড় যে আমি আপনার শ্রীচরণে সমুদ্রের এই প্রান্ত হইতে প্রণাম প্রেরণ করিতে সময় পাই নাই। আমাদের স্থানীয় পত্রিকায় যে সকল কবিতা বাহির হইয়াছে পাঠাইলাম। অবসর মতে একবার পাঠ করিলে দেখিবেন আমার মাতৃভূমি কিরূপ কবিতাময়ী। রবিবার প্রভাতে যখন নিদ্রা হইতে উঠিয়া রেলের গাড়ী হইতে চন্দ্রশেখরের মনোহর শোভা এবং মাতৃভূমি পর্ব্বতমালা দেখিলাম, তখন সত্য সত্যই আমি হৃদয়ের আবেগে "মা+মা" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম এবং যেই গীতটি ছাপা হইয়াছে উহা রচনা করিয়া গাইতে গাইতে এখানে আসিয়া পঁহুছিলাম।

শিক্ষা ও সমিতি ও অবশিষ্ট কার্য্য শেষ হইয়াছে কি না জানিতে বড়ই লালায়িত। আপনার বিশেষ কৃপা ভিন্ন এই শিশু উদ্ধার কার্য্য শেষ হইবে না। ভগবান বুঝি এতদিনে শিশুদের শিক্ষাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিলেন। বাতাস যেন ফিরিতেছে। দেখিতেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালী হইতে তাঁহাদের সন্তানদিগকে উদ্ধার করবার জন্যে আমাদের বিধাতাপুরুষগণ কৃত প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। এ সময়ে আপনি একটুকু চেষ্টা করিলে শ্বেত শিশুদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণ শিশু বধ নিবারণ করিতে পারিবেন।

এই দূরস্থ সেবক যেন ওই দেব হৃদয়ের স্নেহও শ্রীচরণের ছায়া হইতে বঞ্চিত না হয়।

শুনিলাম এবার Entrance পরীক্ষাও পরীক্ষক "কমা ঝলসাইয়াছেন।"

চরণ ছায়া প্রার্থী
নবীন

॥ ২৫ ॥

রাণাঘাট

দেব!

আপনার দয়া-লিপি-খণ্ড আমি পাইয়াছি এবং আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে পাঠ করিয়াছি। আমি কৈশোরে আপনার ছাত্র ছিলাম পত্রখানি পড়িয়া বুঝিলাম যে এই প্রৌঢ় বয়সেও যদি আপনার শ্রীচরণতলে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম, তবে কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম ও মনুষত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারিতাম।

এই পত্রে আপনার পূর্ব্বমত যেরূপ দয়া করিয়া আমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং উহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা আমার শিরধার্য্য—। আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত এ গুরুতত্ত্ব কাব্যে আমি কেন হস্তক্ষেপ করিলাম, আমি কেন ইহা এরূপভাবে লিখিলাম, আমি কিছুই জানি না। কিছুই পূর্ব্বে এরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করি নাই। আপনি হীরেন্দ্রবাবুর লিখিত এবং "সাহিত্য" প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখিয়া থাকিবেন বঙ্কিমবাবু স্বয়ং তীব্র ভাষায় আমাকে নিরত করিয়া ছিলেন। কিন্তু জানি না কে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে যেন অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া কলের পুতুলের মত চালাইলেন। আজি তাঁহারই শ্রীঅঙ্গুলী নির্দেশ আপনার এ পত্রখানিতে দেখিতেছি। পত্রখানি না

হইলে ঠিক এমন সময়ে আমার কাছে আসিবে কেন? আমি এইমাত্র "প্রভাস" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাব্য সম্বন্ধে আপনি দয়া করিয়া যে দোষ দেখাইয়াছেন, তাহা যত দূর পারি এ কাব্যখানিতে খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব। যদি কাব্যখানি কোনও দিন আপনার শ্রীকরে অর্পণ করিতে পারি এবং আপনি যদি তখনও তাহাকে দূর্ব্বাসার প্রতিভূ করিলে ভাল হইবে বিবেচনা করেন, তবে অন্য সংস্করণে তাহাই করিব। আমি ফলতঃ 'প্রভাসে' একেবারে এরূপভাবে খুলিয়া দেখাইব যে, কাব্যে বিবাহ বিবাহই নহে, কেবল একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। তাহা হইলে, সে বাস্তবিকই একটি প্রতিভূ স্বরূপ দাঁড়াইবে।

পুরাণের দোহাই দেওয়াতে আপনি লিখিয়াছেন—"মহাভারতের জরৎকাম দূর্ব্বাসার পত্নী নহেন, জরৎকাম মুনীর পত্নী।" অতএব আমি যে কেন তাহাকে দূর্ব্বাসার পত্নী কল্পনা করিলাম—এই—সম্বন্ধে আমার কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিৎ। কিন্তু আপনি আপনার শিষ্য ও উপাসককে যে বিনয়ের ভাষায় পত্র লিখিয়াছেন, তুমি কলুষিত চিত্ত মহা মূর্খ আপনাকে কি ভাষায় আমার হৃদয়ের ভাব জানাইব? ভবিষ্যতে আপনি যদি দয়া করিয়া আমাকে পত্র লেখেন তবে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিবেন না। আমি তাহাতে বড়ই ব্যথিত হই। আমার আকাঙ্খা অযোগ্য ছাত্র ও উপাসক স্বরূপ আপনার শ্রীচরণতলে স্থান পাই। আমি নিম্নলিখিত কারণ জরৎকারুকে দূর্ব্বাসার পত্নী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি।

১। দূর্ব্বাসার অভিশাপে এবং অনার্যহস্তে শ্রীকৃষ্ণর অপমৃত্যু।
১। অনার্য্য হস্তে শ্রীকৃষ্ণের পুরনারীর অপহরণ।
৩। অনার্য্য এবং নাগ হস্তে পরীক্ষিতের অপমৃত্যু।
৪। আস্তিকের দ্বারা জন্মজয় কর্ত্তৃক নাগ বিনাস নিবারণ। সর্প * * কে আমি আর্য্য অনার্য্যের যুদ্ধ বলিয়াই বুঝি।
৫। আস্তিকের পিতা জরৎকারুর অদ্ভূত উপাখ্যান।
৬। স্ত্রী পুরুষের এক নাম। অতএব ছদ্মনাম।
৭। গর্ভমুখে অধঃশির পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধারের জন্যে নাগ কন্যার বিবাহ অধঃপতিত বৈদিক ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্যে conventional alliance বলিয়া বুঝি।
৮। পত্নী বর্জ্জন উপাখ্যানে দেখি যে জরৎকার ঋষি ঠিক দূর্ব্বাসা প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতএব জরৎকারু তাঁহারই ছদ্মনাম।

আপনি উপরোক্ত ঘটনাগুলি একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন আমি কেন দূর্ব্বাসাকে জরুৎকার, পতি বলিয়া কল্পনা করিয়াছি এবং তাঁহার নাগদের সহিত সম্মেলন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকূলতা আমার কাব্য কয়েকখানির মূলসূত্র করিয়াছি। আস্তিক যে অনার্য্য পক্ষীয় ব্রাহ্মণদের নেতার পুত্র ছিলেন এবং সে নেতৃত্বে সন্ধি করিয়া নাগযুদ্ধ নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না, এবং স্বয়ং বঙ্কিমবাবু স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, দূর্ব্বাসা প্রমুখ ঋষিদের এক সম্প্রদায় কৃষ্ণের বিপক্ষ হইয়া ছিলেন। ইচ্ছা আছে—'প্রভাস' শেষ হইলে এ সকল কথা একটা দীর্ঘ প্রবন্ধে আমার মত সমর্থন করিয়া প্রকাশিত করিব।

"অধর্মের শেষ ধ্বংশ, নহে সংশোধন"—

আমি দেখিতেছি শেষ কথাটার অর্থ লইয়াই আমার সঙ্গে আপনার অনেকটা মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি বোধ হয় অর্থ করিয়াছেন, সংশোধনের দ্বারা অধর্মের শেষ হয় না, ধ্বংশের দ্বারাই শেষ হয়। যদি তাহা হয়, আমি শেষ কথাটা সেভাবে ব্যবহার করি নাই। আমার অর্থ এই যে অধর্ম্মের যখন শেষ বা চরম অবস্থা হয়, তখন আর সংশোধনের সময় থাকে না, ধ্বংশেই অনিবার্য এবং ধ্বশের দ্বারাই কেবল তাহাদের জন্মান্তরে সদ্‌গতির সম্ভব। যাহা হউক কুরুক্ষের দ্বিতীয় সংস্করণ ইতিমধ্যেই

আরম্ভ হইয়াছে। আমি এই পদটি পরিবর্ত্তন করিয়া দিব।

ভরসা করি আপনি বলিয়াছেন আপনার কোনও কথার প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে আমি এই পত্রখানি লিখিলাম না। আমার মত মূর্খের তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে মহাভারতের ঘটনাগুলির আমি কি ভাবে দেখিয়াছি—কেবল তাহা বলিবার জন্যে এ দীর্ঘপত্র লিখিয়া আপনার আবার মূল্যবান সময় নষ্ট করিলাম। আরো একটি উদ্দেশ্য আছে,—গুরুদেবের সঙ্গে কৃষ্ণকথা কহিয়া আনন্দলাভ করি ও শিক্ষা লাভ করি।

স্নেহ ও শিক্ষাকাঙ্খী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

॥ ২৬ ॥

রাণাঘাট

দেব !

কল্য আমার পিতৃশ্রাদ্ধের পবিত্র দিন পবিত্র "গীতার" একখণ্ড কবিতা অনুবাদ আপনার পবিত্র চরণে উপহার প্রেরণ করিয়াছি। এক এক খণ্ড 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' আপনার পাদপদ্মে উপহার দিবার জন্য আমার পুস্তক বিক্রেতার কাছে লিখিয়াছিলাম। ভরসা করি তাহাও পাইয়াছেন। আমি আপনার একজন অযোগ্য ছাত্র। সেই ছাত্র-জীবন হইতে আপনার দেবমূর্ত্তির ও দেব প্রকৃতির পূজা করিয়া আসিয়াছি।

আপনার গৌরবোন্নতি পশ্চিম সভ্যতার সর্ব্বধ্বংসকারী উত্তাল তরঙ্গমালার মধ্যে আপনার মৈনাকবৎ অবস্থিতি, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাবিভ্রাটগ্রস্থ স্বদেশীয়দের শিরোপরে ধ্রুব নক্ষত্রবৎ অধিষ্টান, দর্শন করিয়া আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ও উত্তরোত্তর গৌরবে পূর্ণ হইয়াছে। অনেক দিন অনেকবার আশা করিয়াছি আপনার শ্রীচরণে আমার অযোগ্য কাব্য সকল পুষ্পাঞ্জলিরূপে অর্পণ করিব, একবার সেই চরণাম্বুজ দর্শন করিয়া জীবন পবিত্র করিব, কিন্তু আশা হইয়াছে ভরসা হয় নাই, সাহস হয় নাই। পরিষদের গত অধিবেশনে আপনার অভয় লাভ করিয়া আজ সেই ভরসা ও সাহস পাইয়াছি। তাই আপনার অভিপ্রায় মত 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' প্রেরিত হইল। গীতার অনুবাদ উপাসকের ভক্তির উপায় মাত্র। উহা জননী দেবীর করকমলে অর্পণ করিবেন। প্রথম সংস্করণ পাইয়া শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়বাবু লিখিয়াছিলেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী আমার অনুবাদ মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে পঞ্জীকার মত অনুবাদখানি বাংলার ঘরে ঘরে থাকিতে পারে তাহার মূল্য কমাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভরসা করি জননী দেবী উহা গ্রহণ করিবেন। ভক্তের সামান্য পুষ্প দূর্ব্বাও দেবীরা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পরিষদ সম্বন্ধে ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ও পাঠ্যাদি সম্বন্ধে আমার অনেক কথা নিবেদন করিবার আছে। যদি আপনি, কুমার বিনয়কৃষ্ণ, মিঃ আর. সি. দত্ত, হীরেন্দ্র ও রবীন্দ্রবাবু কোথায়ও সুবিধামত একটি ক্ষুদ্র অধিবেশন করেন, তবে আমি উহা নিবেদন করিতে পারি।

স্নেহাকাঙ্খী
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

॥ ২৭ ॥

রাণাঘাট

পরম পূজনীয়

আপনার দুইখানি স্নেহলিপি পাইয়াছি। রাজকীয় ও স্বকীয় নানা উৎপাতে ছিলাম বলিয়া তজ্জন্যে আপনার পাদপদ্মে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে পারি নাই।

আপনি যে দুটি বিষয়ে অমত প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে দুটি কথা বলিতে চাই। প্রথম দোষ কারুর চরিত্রে পরিব্রতা ধর্ম্মের অভাব। এ সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করিবেন যে, কারুর চরিত্র আমি এখনও শেষ করিতে পারি নাই। যদি কুলায় এ দাসত্ব জীবনে অবসর পাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভগবানের কৃপা হয়, তবে আর একখানি কাব্যে অসম্পূর্ণ চরিত্রগুলি পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আছে, তবে এটুকু এখন বলিতে হইবে যে, ব্রজের গোপীদিগের যদি পতিব্রতার অপলাপ না ঘটিয়া থাকে, তবে কারুর ঘটিতে পারে না। তাহাদের প্রকৃত স্বামী ছিল। কারুকে ঊনবিংশতি শতাব্দীর শিক্ষা ও সত্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি তত দূর যাই নাই। আমি পরিষ্কার রূপে বলিয়াছি যে, তাহার দুর্বাসার সহিত বিবাহ একটা ষড়যন্ত্র মাত্র—

সে নিজ মুখে বলিয়াছে—

> "দুর্ব্বাসা আমার নহে পতি
> আমি পত্নী নহি দুর্ব্বাসার।
> উভয়ে উভয়ে মাত্র দেখি—
> উভয়ের সেতু আকাঙ্খার।"
>
> —৯৮ পৃষ্ঠা।

দয়া করিয়া ৯৮।৯৯ পৃষ্ঠা দুটি আবার পড়িয়া দেখিবেন।

তবে পরে আপনি যে বলিয়াছেন, যে কারুকে দুর্ব্বাসার পত্নী না করিয়া hostage করিলে ভাল হইত, তাহা হইলে পুরাণ সঙ্গত হইত না। পুরাণ ও মহাভারত মতে জরৎকারু নামে জরৎকারুর এক স্বামী ছিল। সে উপাখ্যানটি পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার স্ত্রীলোকের ছদ্মনাম এবং তিনি দুর্ব্বাসা প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে তাহা পত্রে লেখা অসম্ভব। আপনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে আপনার দেবতুল্য প্রতিভা বলে অনেক বুঝিতে পারিবেন। আপনার দ্বিতীয় অমতের বিষয়—

"অধর্ম্মের শেষ ধ্বংস নহে সংশোধন।"

আপনার মতে—"রোগনাশ রোগার্ত্তের আরোগ্য সাধন।" কারুর পতিত্বতার দোষারোপ করিলে যেরূপ ব্রজলীলা যায়, এ কথা বলিলেও কৃষ্ণবতারত্ব অস্বীকার করিতে হয়। কারণ আপনার শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—

> সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
> করিতে সাধন,
> স্থাপন করিতে ধর্ম্ম করি আমি যুগে যুগে
> জনম গ্রহণ।

"বিনাশায় চ দুষ্কৃতান"—ইহাই কৃষ্ণাবতারের, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এবং যদুবংশ ধ্বংশের মূলতত্ত্ব

আমার 'কৈফিয়ৎ' এ পর্য্যন্ত। 'তলব করিতে আপনারা যেরূপ মুক্তহস্ত, কৈফিয়ৎ দিতেও আমার বড় অপটু নহি। আপনি তলব করিয়াছেন বলিয়া পাঁচ রকম ফেনাইয়া দিলাম। না হয় লিখিবার সময় যে এরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিয়াছিলাম তাহা নহে। তখন কেবল "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

চরণানুগত
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

২১৪ পৃষ্ঠায় দুর্ব্বাসা সম্বন্ধে কথা কয়টি আপনার অভিপ্রায় মতে দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্ত্তন করিব।

॥ ২৮ ॥

পরম পূজনীয়!

আপনার প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বাদ পত্রখানি পাইয়া শিরোধারণ করিলাম। কিন্তু উহাতে প্রীতি লাভ করিতে পারিলাম না। আপনি এই অযোগ্য শিষ্যের প্রতি কি অপরাধে—'আপনার' 'আপনার' করিয়া এতগুলি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্য এটি উপাধির ও সম্মানের যুগ। কিন্তু এ যুগেও যদি এ ক্ষুদ্র জীব আপনার স্নেহ বাক্যে একবিন্দু স্থান্য পায় তাহা হইলে আপনাকে পরম সম্মানিত ও চরিতার্থ মনে করিব।

গীতার অনুবাদ আপনার ভালো লাগিয়াছে শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। আপনার অপেক্ষা গীতার অর্থ ও মাহাত্ম্য আজ ভারতে কে বুঝিতে পারে?

আমি চন্ডীরও এরূপ অনুবাদ করিয়াছি। যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে একখন্ড আপনার কাছে উপহার পাঠাইতে আমার পুস্তক বিক্রেতাকে লিখিব। গীতার অনুবাদের এই দ্বিতীয় সংস্করণেও মুদ্রাকর আমাকে অল্প কৃপা করেন নাই। অনেক স্থলে কলিকাতার তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর ঘোড়ার মিলের মত ছন্দের ও মিল হ্রস্ব দীর্ঘ করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্য ভুলের ত কথাই নাই।

যদি আপনি যথার্থই ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'রৈবতক' ও 'কুরুক্ষেত্র' পাঠ করেন এবং মোটের উপর দু' চার কথায় তাহার দোষগুণ দেখাইয়া ভূতপূর্ব্ব শিষ্যকে শিক্ষা দেন, তবে কত যে উপকৃত হইব বলিতে পারি না। প্রধান বিচারালয়ের খ্যাতিনামা বিচারক বলিয়া নহে ভারতের একজন প্রধান মনস্বী বলিয়া আপনার কাছে এ ভিক্ষা। রৈবতকের দুর্ব্বাসা চরিত্র অনেক স্থানে আমি ঘৃণাস্পদ ও লঘু ইচ্ছা করিয়া করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতেছি। শ্রীভগবানের পূর্ব্ব স্মৃতিতে ও নানা কারণে প্রকৃত ব্রজলীলার বড় একটা আভাস দিয়াছিলাম। যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাতে পথ অনেক পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থের কিঞ্চিৎ আভাস দিতাম।

আপনার গভীর চিন্তা ও ধীশক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দুই খন্ড উপহার কল্য পাইয়াছি। তজ্জন্যে আমার ভক্তি গ্রহণ করিবেন। আমি বক্তৃতা দুইটি যথা সময়ে দৈনিক পত্রে পড়িয়াছিলাম। আপনি যেখানে যাহা বলেন সকলই যত্নের সহিত পড়িয়া থাকি। কারণ এখনও আমি আপনার একজন নগণ্য ছাত্র মাত্র। এখনও শ্রীচরণতলে বসিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারি। যদি পূজার বন্ধে ভগবান সময় দেন এবং আপনি বাড়ীতে থাকেন, তবে অভয় পাইলে এ উদ্দেশ্যে শ্রীচরণে উপস্থিত হইব। স্নেহাকাঙ্খী

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

॥ ২৯ ॥

...আপনি সেই অমর কবি (মাইকেল) মধুসূদন দত্তের স্বয়ং কবিতামৃতময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী। আপনার কবিতার ও কবিত্বশক্তির কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? পন্ডিত ও কবিপ্রবর তারাকুমার আমার একজন ভক্তিভাজন শৈশব-বন্ধু তাঁহার মত আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কল্পনার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ। নারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া আপনার মত রমণীরত্নের দ্বারায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সমুজ্জ্বল করুন। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন!

॥ ৩০ ॥

আমার (নবীনচন্দ্র সেনের) শেষ কথা

১। বাঁশের কাঠাম [প্রস্তুত] করিয়া তাহা নেওয়ারের মারকিন দিয়া ছাইয়া তাহাতে আমাকে শ্মশানে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নিবে।

২। চন্দন ও বিভূতি মাখাইয়া গেরুয়া রঙ্গের কাপড় পরাইয়া, মাথায় গেরুয়া রঙ্গের পাগড়ি বাঁধিয়া ও সাথে গেরুয়া রঙ্গের চাদর দিয়া ঢাকিবে। যদি মুখ বিকৃত না হয় মুখ আঢাকা রাখিবে।

৩। যদি পাওয়া যায় ঘি ও চন্দন দিয়া দাহন করিবে। শিববাড়ীর পূর্ব্বদিকে বাগানের মধ্যে দাহন করিবে। পুরক ইত্যাদি ভোলা (১) কি পুটু (২১ দিবে।

৪। নির্ম্মলকে এ সংবাদ টেলি দিবে। নির্ম্মল ভাগীরথী তীরে সুপবিত্র গঙ্গার জলে সামান্য ব্যয়ে শ্রাদ্ধ করিবে।

৫। স্ত্রী, রমেশ, (৩) রমেশকে (৪) সব সংসারের ভার দিলাম। তিনজনে পরামর্শ করিয়া সব সংসার............তাহাদের কাছে আমার একমাত্র ভিক্ষা (৫) .... সংসার চালাইবে। স্ত্রী ও রমেশের কাছে আমার একমাত্র ভিক্ষা যে অভিমান ও জিদ উহা আমার চিতায় করিবে। সকলেই মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। এবং এই সংসারের দ্বারা

(৬)

১১। লাইফ ইনসিওরেন্সের হইতে যে টাকা পাইবে, তাহার............দ্বারা পাহাড়ের ঘর নির্ম্মাণ করিবে ও অন্যান্য ঘর মেরামত করিবে ও জমিদারীর আয়ের দ্বারা সংসার চালাইবে ও বাকী টাকা দ্বারা সংসার চালাইবে ও সকলে এখন যে ভাবে আছে সে ভাবে চালাইবে। ভাগ করিলে কোনমতে এ সংসার রক্ষা হইবে না। ঝগড়া বিবাদ না করিয়া তাহাতে জমিদারীর টাকা ও ধানের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিবে। পূর্ব্বে জমিদারীর আয় দ্বারা সকল প্রতিপালন হইতে পারে—সকলে মিলিয়া তাহা করিবা। আমি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, তাহা দ্বারা............বশীভূত হইয়া কেবল কাটাকাটি ....করিবে না। যাহাতে সংসার চলে কেবল অভিমান না করিয়া কার্য্য করিবা ও সংসার চালাইবা। কথায় কথায় কাটাকাটি করিবে না।............বিদ্যাবুদ্ধি কিছুই নাই। অথচ অভিমান গগনস্পর্শী। সকলেই বিবেচনা করে আমি একজন বুদ্ধিমান্। কেবল এইমাত্র। এই কেবল............তথাচ কাহারও কিছু বুদ্ধি নাই। কেবল লড়াই। ও আত্মীয়গণের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবে। মন দৃঢ় রাখিবে। কেবল হামবরা হামবরা করিয়া কার্য্য করিবে না। কাহারও সহিত পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য না করিবা। রমেশ ও নগেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবা। সকলই সমান গাধা। অথচ সকলই মনে করে আমি একজন অতি বুদ্ধিমান্।

(১) ইনি কবির ভ্রাতুষ্পুত্র; অশোকচন্দ্র সেন এ'র বাবার নাম। খুব সম্ভবত ইনি এখন মান্দালেতে আছেন। বার্মা গভর্ণমেণ্টের টেলিফোন ডিপার্টমেণ্টে ইনি কাজ করেন।

(২) প্রাণকুমার সেন মহাশয়ের ছেলে; এ'র আসল নাম চঞ্চলকুমার সেন। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন।

(৩) কবির সম্পর্কে ভাই।

(৪)রমেশ পুরোহিত—চট্টগ্রাম জজ কোর্টের উকিল।

(৫) এতদূর পর্য্যন্ত কবিবরের নিজের হাতের লেখা। ইহার পরবর্তী অংশ কবির কথামত অন্য দুই ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

(৬) পরের কিছু অংশ পাওয়া যায় নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।